বাহারে শরীয়ত

লেখক

মৌলানা ঃ আমজাদ আলী সাহাব

প্রকাশক

মোহাঃ সাইদুর রাহমান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক(নিউ মার্কেট)

রুম নং - ৫০ ,জেলা ঃ মালদহ।

ফোন নং - ০৩৫১২-২৪৪১৪৮

মোবাইল ঃ ০৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

বাহারে শরীয়ত

লেখক -

মৌলানা ঃ আমজাদ আলী সাহাব

প্রকাশক

মোহাঃ সাইদুর রাহমান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক(নিউ মার্কেট)

রুম নং - ৫০ ,জেলা ঃ মালদহ।

ফোন নং - ০৩৫১২-২৪৪১৪৮

মোবাইল ঃ ০৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

প্রকাশক -

মোহাঃ সাইদুর রাহমান আশরাফী

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট)

রুম নং - ৫০

জেলা ঃ মালদহ।

ফোন - ০৩৫১২-২৪৪১৪৮

মোবাইল - ০৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

প্রথম প্রকাশ - ০১-০৭ - ২০০৯

মূল্য - তিনশত টাকা মাত্র। ৩০০/-

প্রাপ্তি স্থান -

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক (নিউ মার্কেট)

জেলা ঃ মালদহ।

ফোন - ০৩৫১২-২৪৪১৪৮

মোবাইল - ০৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের রুহের মাগফেরাত কামনার্থে গ্রন্থখানা তাঁরই নামে উৎসর্গ করলাম, যার অনুপ্রেরণায় গ্রন্থখানা বঙ্গানুবাদ করা সম্ভব হয়েছে।

অনুবাদক—

অনুবাদকের কথা

সদরুশ শরীয়ত হযরত মুফ্‌তি আমজাদ আলী সাহেব (রহঃ) বিরচিত 'বাহারে শরীয়ত' কিতাবটির বঙ্গানুবাদে হাত দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাংলাভাষায় এ ধরণের কিতাব নেই বললেই চলে। আমার মতে প্রতিটি মুসলমানের ঘরে এ কিতাবটি রাখা একান্ত প্রয়োজন। এ কিতাবটি ঠিকমত অধ্যয়ন করতে পারলে কোন আলেমের কাছে ধর্ণা দিতে হবেনা। আকাইদ, আমাল, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে এ কিতাবে। ২০ খন্ডে বিভক্ত এ কিতাবটির প্রথম খন্ড প্রকাশিত হলো। ইনশাআল্লাহ অবশিষ্ট খন্ডগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকবে।

প্রথম খন্ডে আকীদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ আকীদা হচ্ছে মূল ভিত্তি। আকীদা ঠিক না হলে আমল কোন কাজে আসবেনা। তাই লেখক সর্বাগ্রে আকীদাকে স্থান দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর যাত সিফাত, রিসালত, হাশর-নশর, বেহেশত-দোযখ, ঈমান-কুফর-জ্বীন, ফিরিশতা, ইমামত, বেলায়েত ইত্যাদি সম্পর্কিত সঠিক আকীদার বর্ণনা করেছেন এবং সাথে সাথে বাতিল আকীদার খোলস উন্মোচন করেছেন, যাতে মুসলমানগণ সঠিক আকীদার উপর অটল থাকতে পারেন।

কিতাবটি উর্দুভাষাভাষীদের কাছে খুবই সমাদৃত। এমন কোন উর্দুভাষাভাষী নেই, যিনি কিতাবটি সম্পর্কে অবহিত নন। এমনকি বাংলাভাষাভাষীদের মধ্যেও অনেকেই কিতাবটির নাম জানেন কিন্তু ভাষা-জ্ঞানের অভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। আশা করি, এবার তাদের সেই অভাব দূরীভূত হবে। ভাষাকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করার চেষ্ঠা করেছি। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রবীণ সাংবাদিক জনাব নুর মোহাম্মদ রফিক সাহেবের সক্রিয় সাহায্য নিয়েছি। তা সত্ত্বেও ভাষা ও মুদ্রণগত কিছু ভুলক্রটি রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরিয়ে নেয়া হবে।

পরিশেষে পাঠক সমাজের একান্ত সহযোগিতা ও আন্তরিক দু'আ কামনা করি, যাতে অতি সহসা কিতাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারি।

—অনুবাদক

সূচীঃ

	বিষয়		পৃষ্ঠা
★	আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কিত আকীদা	-	২
★	নবুয়াত সম্পর্কিত আকীদা	-	১০
	নবীগণ নিষ্পাপ	-	১৪
★	ফিরিশতা সম্পর্কিত আকীদা	-	২৪
★	জ্বীন সম্পর্কিত আকীদা	-	২৫
★	আলেমে বরযখ সম্পর্কিত আকীদা	-	২৬
	মৃত্যুর পর শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক	-	২৭
	মুনকার-নকিরের প্রশ্নাবলী	-	২৮
	কবর আযাব	-	৩০
	নবী ও ওলীগণের শরীর মাটি খেতে পারেনা	-	
★	পুনরুত্থান ও হাশরের বর্ণনা	-	৩২
	কিয়ামতের আলামত	-	৩২
	হিসাব-নিকাশ	-	৩৮
	হুযূর আলাইহিস সালামের শাফায়াত	-	৪০
★	বেহেশতের বর্ণনা	-	৪৭
★	দোযখের বর্ণনা	-	৫৩
★	ঈমান ও কুফরের বর্ণনা	-	৫৮
	কাফির ও মুরতাদের জন্য মৃত্যুর পর দু'আ করা কুফরী	-	
★	বাতিল ফেরকা	-	৬৩
	কাদিয়ানী ফেরকা ও তাদের আকীদা	-	৬৪
	রাফেজী ফেরকা	-	৭০
	ওহাবী ফেরকা ও তাদের আকীদা	-	৭১
	লা-মযহাবী ও তাদের আকীদা	-	৮০
★	ইমামতের বর্ণনা	-	৮২
	খিলাফতে রাশেদা	-	৮৩
★	বেলায়েতের বর্ণনা	-	৮৯

মূল লেখকের বক্তব্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ انزل القرآن وهدنا به الى عقائد الايمان واظهر
هذا الدين القويم على سائر الاديان والصلاة والسلام الاتمان فى كل حين
وآن على سيد ولد عدنان سيد الانس والجان الذى جعله الله تعالى مطلعا
على الغيوب فعلم ما يكون وما كان وعلى آله وصحبه وابنه وحزبه ومن
تبعهم باحسان - واجعلنا منهم يا رحمن يا منان -

অধম আবুল উলা আমজাদ আলী আযমী রিজভী বর্তমান যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা উপলব্ধি করলাম যে সাধারণ মুসলমান ভাইদের জন্য সহজ ও সরল ভাষায় সঠিক মাসআলাসমূহের এমন একটি কিতাব লিখা একান্ত প্রয়োজন, যেখানে দৈনন্দিন ব্যবহৃত মাসআলাসমূহ স্থান পায়। তাই নানা ব্যস্ততা ও ঝামেলা সত্ত্বেও আল্লাহর উপর ভরসা করে কলম ধরলাম। এক খন্ড লিখার পর চিন্তা করলাম যে, আমল শুদ্ধ হওয়াটা নির্ভর করে সঠিক আকীদার উপর, অথচ অনেক মুসলমান আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞ। এদের জন্য সঠিক প্রয়োজনীয় আকীদাসমূহের জ্ঞান একান্ত দরকার। বিশেষ করে বর্তমানে অনেক ছদ্মবেশী মুসলমান বের হয়েছে, যারা নিজেদেরকে আলেম বলে দাবী করে, আসলে ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অনেক অজ্ঞ মুসলমান তাদের ধোঁকায় পড়ে ধর্মচ্যুত হচ্ছে। তাই আমি এ কিতাবের প্রথম খন্ডে ইসলামের সঠিক আকীদাসমূহ বর্ণনা করার মনস্থ করেছি এবং আগের লিখিত খন্ডটি দ্বিতীয় খন্ড হিসেবে সন্নিবেশিত করা হবে। আশা করি, মুসলমান ভাইগণ এ কিতাবখানা অধ্যয়ন করে নিজের ঈমানকে সতেজ করবেন এবং অধমের জন্য মাগফিরাত, উভয় জাহানে মঙ্গল এবং ঈমান ও মযহাবে আহলে সুন্নাতের উপর অটল থেকে যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি, এ দু'আ করবেন।

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَتَوَفَّنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ
خَيْرِ الْاَنَامِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَادْخِلْنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ دَارَ السَّلَامِ
اٰمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত সম্পর্কিত আকীদা

১নং আকীদা ঃ আল্লাহ এক। তাঁর যাত (ব্যক্তিসত্তা), সিফাত (গুণাবলী) কার্যাবলী, হুকামাদি ও নামসমূহের মধ্যে কোন শরীক নেই। (কুরআন করীম, উসূলে বযদবী ২৮ পৃঃ, মুসামেরা ৪৪ পৃঃ ও সায়েরাতুল মুতামেদ ৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিনি ওয়াজিবুল ওজুদ অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন (কিতাবুল আরবাঈন ৯৩ পৃঃ, শরহে আকাইদে নসফী ২৩ ও ২৬ পৃঃ, মুসামেরা ২২ ও ২৪ পৃঃ)। ইবাদত বা উপসনার তিনিই একমাত্র যোগ্য। (কুরআন করীম)

২নং আকীদা ঃ তিনি কারো পরওয়া করেননা এবং কারো মুখাপেক্ষীও নন বরং সমগ্র জাহান তাঁরই মুখাপেক্ষী। (কুরআন করীম সূরা ইখলাস)।

৩নং আকীদা ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর যাত সম্পর্কে জানা অসম্ভব। কারণ যে জিনিষটা ধারণায় আসে, সেটা জ্ঞানের আওতাধীনে এসে যায়। অথচ কেউ তাঁর যাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেনা। অবশ্য তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে সিফাত সম্পর্কে এবং সেই সিফাতের মাধ্যমে তাঁর যাত সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। (শরহে আকাইদ ৩০২ পৃঃ)

৪নং আকীদা ঃ আল্লাহর সিফাত তাঁর যাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, আবার বহির্ভূতও নয় অর্থাৎ সিফাত তাঁর যাতের বা সত্বার নাম নয়, তবে তাঁর যাতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। (নিবরাস ১৯১ পৃঃ, শরহে আকাইদ ৩৪ ও ৩৫ পৃঃ, আল-মোতামেদ ৫১ পৃঃ)

৫নং আকীদা ঃ আল্লাহর যাত বা সত্বার ন্যায় তাঁর সিফাত বা গুণাবলী অনাদি, অনন্ত ও চিরস্থায়ী। (শরহে আকাইদ ৩৩ ও ৩৫ পৃঃ)

৬নং আকীদা ঃ তাঁর সিফাত মখলুক বা সৃষ্ট নয় এবং কুদরতের পর্যায়ভুক্তও নয়। (নিবরাস ১৯১ পৃঃ)

৭নং আকীদা ঃ আল্লাহর যাত ও সিফাত ব্যতীত বাকী সব হাদেছ (সৃষ্ট) অর্থাৎ আগে ছিলনা, পরে হয়েছে (শরহে আকাইদ ৩৩ ও ৩৫ পৃঃ)

৮নং আকীদা ঃ আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীকে যে সৃষ্ট বা অস্থায়ী বলবে, সে গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহী।

৯নং আকীদা : যে জগতের কোন কিছুকে চিরস্থায়ী মনে করে বা অস্থায়ী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফির।

১০নং আকীদা : তিনি কারো বাপও নন, বেটাও নন এবং তাঁর কোন স্ত্রীও নেই। যে তাঁর বাপ বা বেটা আছে বলে বা তাঁর স্ত্রী আছে বলে দাবী করে, সে কাফির। এমনকি তা সম্ভবপর বললেও গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহী হিসেবে গণ্য হবে।(কুরআন)

১১নং আকীদা : তিনি জীবিত অর্থাৎ তিনি স্বয়ং জীবিত এবং সবার জিন্দেগী তাঁর উপরই নির্ভরশীল। তিনি যাবে যখন চান, জীবিত করেন এবং যখন-ইচ্ছা করেন মৃত্যুদান করেন. (কুরআন)

১২নং আকীদা : যে জিনিষটি অসম্ভব, এর থেকে আল্লাহ তা'আলা পাক। অসম্ভব ওটাকে বলা হয়, যা হতে পারেনা। যেটা কুদরতের অধীন, সেটা মওজুদ হতে পারে এবং সেটাকে অসম্ভব বলা যায়না। যেমন দ্বিতীয় খোদা অসম্ভব অর্থাৎ হতে পারে না। যদি এটা কুদ্রতের অধীন মনে করা হয়, তাহলে অসম্ভব রইলো না। কিন্তু একে অসম্ভব মনে করা না হলে, খোদার একত্বকে অস্বীকার করা হয়। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার বিলীন হওয়াটা অসম্ভব। কিন্তু একে যদি আল্লাহর কুদ্রতের অধীন মনে করা হয়, তাহলে আল্লাহর উলুহিয়ত বা খোদায়ীত্বকে অস্বীকার করা হয়। (মুসামেরা ৩৯৩ পৃঃ)

১৩নং আকীদা : খোদার কুদরতের প্রত্যেক কিছু মওজুদ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য কোন সময় বাস্তবায়িত না হলেও সম্ভবপর হওয়াটা জরুরী। (আল-মুতামেদ ২৬ পৃঃ আল-মুনতাকেদ ৬৬ পৃঃ)

১৪নং আকীদা : তিনি প্রত্যেক সুন্দর ও কামালিয়াতের প্রাণকেন্দ্র। তিনি দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত অর্থাৎ তাঁর মধ্যে দোষ ক্রটি পাওয়া যাওয়াটা অসম্ভব। এমনকি 'পরিপূর্ণও নয়, ক্রটিপূর্ণও নয়'- এ রকম হওয়াটাও অসম্ভব। যেমন মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, ওয়াদাভঙ্গ, অত্যাচার, অজ্ঞতা, নির্লজ্জতা ইত্যাদি দোষ তাঁর থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। 'আল্লাহ মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখে'- এ রকম বলা মানে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা এবং আল্লাহকে দোষী সাব্যস্ত করা তথা অস্বীকার করা বোঝায়। আর অসম্ভব বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান না হওয়া মানে কুদরতের দুর্বলতা মনে করাটা বাতুলতা মাত্র। উছুলে বযদবীর ২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, এতে কুদরতের কোন দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে না; দুর্বলতা

প্রকাশ পাচ্ছে ওসব অসম্ভব বিষয়সমূহের যাদের মধ্যে কুদরতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা নেই।

১৫নং আকীদা : হায়াত, কুদরত, শোনা, দেখা, বাকশক্তি, ইলম ও ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব সিফাত বা গুণাবলী। কিন্তু কান, চোখ ও মুখ দিয়ে শোনা, দেখা ও কথা বলা নয়। কেননা এগুলো হচ্ছে সাকার। কিন্তু আল্লাহ সাকার থেকে পবিত্র। অথচ তিনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর আওয়াজ শোনেন এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু, যা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও দেখা যায়না, তিনি তা দেখেন। তাঁর দেখার জন্য ওসব কিছুর প্রয়োজন হয়না। তিনি প্রত্যেক কিছু দেখেন ও শোনেন। (শরহে আকাইদ ৩৮ পৃঃ)

১৬নং আকীদা : অন্যান্য সিফাতের ন্যায় আল্লাহর কালাম বা বাকশক্তিও কদীম বা অনাদি এবং তা হাদেছ ও মখলুখ বা সৃষ্ট নয়। যে কুরআন করীমকে সৃষ্ট মনে করে, সে আমাদের ইমাম হযরত আবু হানিফা (রাঃ) ও অন্যান্য ইমামদের মতে কাফির বলে বিবেচ্য। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এটা প্রমাণিত আছে। (শরহে আকাইদ ৪১ পৃঃ, নিবরাস ২২৩ পৃঃ)

১৭নং আকীদা : তাঁর কালাম বা বাকশক্তি আওয়াজ থেকে পবিত্র। আমরা যে কুরআন শরীফ স্বীয় মুখ দিয়ে তেলাওয়াত করি ও কাগজে লিখি, এর বাণী অনাদি ও উচ্চারণহীন। আমাদের এ তিলাওয়াত, লিখা ও উচ্চারণ হলো হাদেছ বা সৃষ্ট। অর্থাৎ আমাদের পড়াটা হাদেছ কিন্তু যেটা আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে কদীম, আমাদের লিখাটা হচ্ছে হাদেছ কিন্তু আমরা যা লিখেছি তা হচ্ছে কদীম; আমাদের শোনাটা হাদেছ কিন্তু যা শোনেছি, তা কদীম, আমাদের মুখস্থ করাটা হাদেছ কিন্তু যা আমরা মুখস্থ করেছি, তা কদীম। যেমন আলোটা কদীম কিন্তু ঔজ্জ্বল্যটা হাদেছ। (শরহে আকাইদ ৪২ পৃঃ)

১৮নং আকীদা : তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন বস্তু নেই। অর্থাৎ আংশিক-সামগ্রিক, বর্তমান-অবর্তমান, সম্ভব-অসম্ভব সবকিছু অনাদিকাল থেকে জানেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জানবেন। প্রতিটি জিনিষ পরিবর্তন হয় কিন্তু তাঁর জ্ঞান পরিবর্তন হয়না। তিনি মনের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই। (মুসামেরা ৬২ পৃঃ, শরহে আকাইদ ৪২ পৃঃ, শরহে মওয়াকেফ ৮ পৃঃ)

১৯নং আকীদা : তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত। সত্ত্বাগত জ্ঞানের অধিকারী হওয়াটা একমাত্র আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। যেই ব্যক্তি সত্ত্বাগত

অদৃশ্য বা দৃশ্য জ্ঞান খোদা ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রমাণ করে, সে কাফির।

২০নং আকীদা ঃ তিনি প্রত্যেক কিছুর সৃষ্টিকর্তা। বস্তু হোক বা কর্ম হোক সবকিছু তাঁরই সৃষ্ট। خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ - (কুরআন করীম)

২১নং আকীদা ঃ আসল রিজিকদাতা হচ্ছেন তিনি, ফিরিশ্তা ও অন্যান্যগণ হচ্ছে বাহক ও পরিবেশক। (কুরআন করীম)

২২নং আকীদা ঃ তিনি ভালমন্দ প্রত্যেক কিছু তাঁর অনাদি জ্ঞান অনুসারে নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। যার যেই রকম হওয়ার ছিল এবং যার যেই রকম করার ছিল, তিনি স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয়ে সেই রকমই লিখে রেখেছেন। তাই এ রকম বলার কোন অবকাশ নেই যে, যেই রকম তিনি লিখে দিয়েছেন, সে রকম আমাদেরকে করতে হচ্ছে। আসলে আমরা যে রকম করার ছিলাম, সেই রকমই লিখে দিয়েছেন। জায়েদের বেলায় পাপ লিখা হয়েছে, যেহেতু সে পাপাচারী হবার ছিল। যদি পূণ্যবান হতো, তাহলে নিশ্চয়ই পূণ্য লিখা হতো। তাই তাঁর এ জ্ঞান বা লিখা কাউকে বাধ্য করেননি। (আল-মুনতাকেদ ৩৩ পৃঃ ও অন্যান্য আকাইদের কিতাব দ্রষ্টব্য)

তকদীরের অস্বীকারকারীদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অগ্নিউপাসক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৩নং আকীদা ঃ কযা বা নিয়তি তিন প্রকার (১) মুবরম হাকীকী, যা একমাত্র খোদায়ী জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ (২) মুয়াল্লাক মহায, যা ফিরিশতাদের ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং (৩) মুয়াল্লাক শিবা বেমুবরম, যা ডাইরীতে উল্লেখ নেই; কেবল খোদার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

'মুবরম হাকীকী' নামক নিয়তি অপরিবর্তনশীল। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে কেউ যদি এ ধরণের নিয়তির পরিবর্তনের জন্য কোন প্রার্থনা করে, তাঁকে এ দুরাশা থেকে নিরাশ করা হয়। ফিরিশ্তাগণ কউমে লুতের জন্য আযাব নিয়ে আসলো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জানতে পেরে ওদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। এমনকি দস্তুরমত স্বীয় মাবুদের সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান। يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (কউমে লুতের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করতে লাগলো।) কুরআনে করীমের এ আয়াতটি সে সব ধর্মদ্রোহীদের মুখে চুন কালি দিয়েছে, যারা খোদার দরবারে তাঁর প্রিয় বান্দাদের কোন মর্যাদা নেই বলে মনে করে

এবং বলে যে খোদার দরবারে একটু বড় করে নিঃশ্বাস ফেলারও অবকাশ নেই। অথচ আল্লাহ তাআলা নিজেই বলতেছেন, 'কউমে লুত প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগলো।' হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, মেরাজের রাত্রে হুযূর আলাইহিস সালাম এমন একটি আওয়াজ শুনলেন- কে যেন খুব জোর গলায় কথা বলতেছে। হুযূর আলাইহিস সালাম জিব্রাইল আমীন (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন- ইনি কে? জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন- তিনি হলেন হযরত মুসা (আঃ)। তখন হুযূর আলাইহিস সালাম আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- স্বীয় রবের সাথে এ রকম রাগান্বিত হয়ে কথা বলতেছেন? আরয করলেন, আল্লাহ জানেন যে, ওনার মেজাজ খুব গরম। যখন কুরআন শরীফের وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ - (অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা আপনাকে এতটুকু প্রদান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন) এ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন- إِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ আমি রাজি হবোনা, যদি আমার একটি উম্মতও দোযখে থাকে। হাদীছ শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে, মুসলমান মা-বাপের যেসব শিশু গর্ভাবস্থায় মারা যায়, কিয়ামতের দিন তারা স্বীয় মা-বাপের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর সাথে এমনভাবে ঝগড়া করবে, যেমনি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার সাথে ঝগড়া করে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বলবেন- أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ ওহে স্বীয় মাবুদের সাথে ঝগড়াকারী কচি শিশুরা! নিজেদের মা-বাপের হাত ধরো এবং তাদেরকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও। অপ্রাসঙ্গিক অনেক কিছু বলা হলো- তবে এটা ঈমানদারদের জন্য খুবই উপকারী এবং মানুষরূপী শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষাকারী। আমরা বলছিলাম যে কউমে লুতের প্রতি আযাব নাযিল হওয়াটা কজায়ে মুবরম হাকীকী অর্থাৎ অটল নিয়তি ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেহেতু এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছিলেন, সেহেতু তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝

(হে ইব্রাহীম এর থেকে বিরত থাকো, নিশ্চয়ই তাদের প্রতি আযাব নাযিল হবে, যা প্রত্যাহার করার মত নয়)।

যেগুলো কযায়ে মুয়াল্লাক قضاءِ معلق অর্থাৎ শর্তযুক্ত নিয়তি, সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রায় আওলিয়া কিরামের ক্ষমতা রয়েছে। তাঁদের প্রার্থনার দ্বারা এদিক সেদিক করা যায়। যেসব নিয়তি মধ্যম স্তরের, যেগুলোকে ফিরিশতাগণের

ডাইরী মোতাবেক মুবরম (অটল নিয়তি) বলা যায়, সেগুলোর বেলায়ও বিশিষ্ট বুযর্গানে কিরাম হস্তক্ষেপ করতে পারেন। যেমন সায়্যিদুনা গাউছে আযম (রাঃ) বলেন- আমি কযায়ে মুবরম অর্থাৎ অটল নিয়তিকে বাধা দিয়ে থাকি। এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে- إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ
নিশ্চয় দু'আ নিয়তিকে প্রতিহত করে দেয়।)

মাসআলা (১)ঃ কথা ও তকদীরের বিষয়টা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বেশী চিন্তা-ভাবনা করলে, বিপথগামী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এ বিষয়ে তর্ক করতে নিষেধ করেছেন। (শরহে আকাইদ ও নিবরাসদ্রষ্টব্য)

সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নিন যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পাথর ও অন্যান্য জড় পদার্থের মত অনুভূতিহীন ও অনড় বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করেননি; বরং তাদেরকে এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন। কোন কাজ ইচ্ছা করলে করতে পারে আবার না-ও করতে পারে। এর সাথে তাদেরকে জ্ঞানও দেয়া হয়েছে। যার বদৌলতে ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি চিনতে পারে এবং প্রত্যেক প্রকারের আসবাবপত্র দেয়া হয়েছে। যে কেউ যখন যে কাজ করতে চাইবে সে রকম হাতিয়ার পেয়ে যাবে এবং সেই অনুপাতে কাজের মূল্যায়ন করা হবে। নিজেকে একেবারে ক্ষমতাহীন বা একেবারে স্বাধীন মনে করা উভয়টা গোমরাহের পরিচায়ক।

মাসআলা (২) ঃ কোন মন্দ কাজ করে নিয়তির দিকে ইঙ্গিত করা বা খোদার ইচ্ছা বলা ঠিক নয়। বরং কোন ভাল কাজকে আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করা এবং মন্দ কাজকে কু-প্রবৃত্তির দিকে ইঙ্গিত করাটাই হচ্ছে ধর্মীয় বিধান।

২৪নং আকীদা ঃ আল্লাহ তা'আলা দিক, কাল, গতি, স্থিতি, আকার-আকৃতি এবং যাবতীয় অঘটন থেকে পবিত্র। (মুসামেরা ৩১ পৃঃ, মুসায়েরা ৩৯৩ পৃঃ)

২৫নং আকীদা ঃ পার্থিব জীবনে আল্লাহর দিদার লাভ একমাত্র নবী আলাইহিস সালামের জন্য খাস (আল-মুনতাকিদ ৬১ পৃঃ) এবং পরকালে প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানদের জন্য সম্ভব বরং অবশ্যম্ভাবী। রুহানী বা স্বপ্নযোগে সাক্ষাত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আওলিয়ায়ে কিরামের জন্যও সম্ভব।

আমাদের ইমাম হযরত আবু হানিফা (রাঃ) স্বপ্নে একশ'বার আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। (আল-মুনতাকিদ ৬১-৬২ পৃঃ)

২৬নং আকীদা ঃ আল্লাহর সাথে দিদারটা হচ্ছে অবর্ণনীয়। অর্থাৎ দেখবে কিন্তু বলতে পারবেনা যে, কি রকম দেখবে। যে জিনিষটা দেখা যায়, সেটা দূরে হবে অথবা নিকটে হবে; সেটা, যে দেখবে তার কোন একদিকে হবে, উপরেও হতে পারে, নীচেও হতে পারে, ডানে-বামে বা আগে-পিছেও। কিন্তু আল্লাহকে দেখার বেলায় এসব কিছু থাকবেনা। তাঁকে দেখাটা এসব থেকে পবিত্র হবে। তাহলে কিভাবে দেখবে, এ ধরণের প্রশ্ন করার কোন অবকাশ নেই। ইন্‌শাআল্লাহ যখন দেখবে, তখন বুঝে আসবে। সারকথা হলো- যে পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি কাজ করে, সেটা খোদা নয় এবং যেটা খোদা, সেই পর্যন্ত জ্ঞান বা চিন্তাধারা পৌঁছতে পারেনা। দিদারের সময় সবকিছু জেনে নেয়াটাও অসম্ভব।

২৭নং আকীদা ঃ আল্লাহ যেটা চান এবং যেরকম চান সেরকম করেন। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ নেই এবং তাঁর ইচ্ছা থেকে বিরত রাখার মতও কেউ নেই। তাঁর কোন নিদ্রা বা তন্দ্রা নেই। তিনি সমগ্র জাহানের রক্ষক। তিনি পরিশ্রান্ত বা কাতর হননা। তিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। তিনি মা-বাপ থেকেও বেশী দয়ালু। তাঁর রহমত হচ্ছে ভগ্ন হৃদয়ের আশ্রয়স্থল। বড়াই ও ইজ্জত একমাত্র তাঁরই জন্য শোভা পায়। তিনি মায়ের গর্ভে যেরকম ইচ্ছা, সেরকম আকৃতি গঠনকারী- يصوركم فى الارحام كيف يشاء
তিনি গুনাহ মাফকারী, তওবা গ্রহণকারী ও কহর-গজব দানকারী। তাঁর ধরা খুবই কঠিন, তাঁর ছাড় ব্যতীত কেউ ছাড়া পাবেনা-
فعال لما يريد ويفعل ما يشاء

উল্লেখিত আকীদাসমূহ কুরআন করীম ও আসমায়ে ইলাহীয়া থেকে সংগৃহীত, যা হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে ছোট জিনিষকে বড় ও বড় জিনিষকে ছোট করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী করেন এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করেন। তিনি অপদস্থ ব্যক্তিকে মর্যাদাবান এবং মর্যাদাবান ব্যক্তিকে অপদস্থ করেন। যাকে চান সঠিক পথে আনয়ন করেন এবং যাকে চান সোজা পথ থেকে বিপথগামী করেন। যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন, আর যাকে ইচ্ছা মরদুদ করে দেন। যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে ছিনিয়ে নেন। তিনি যা কিছু করেন, তা ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফ মাফিক। তিনি জুলুম থেকে পবিত্র। তার ক্ষমতা সর্বাধিক। সবকিছু তাঁর অধীনে কিন্তু তিনি কারো অধীনে নন। তিনি

মজলুমের ফরিয়াদ শোনেন এবং জালিমদেরকে শাস্তি দেন। তাঁর অভিপ্রায় ও ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। তবে তিনি ভাল কাজে সন্তুষ্ট ও মন্দ কাজে নারাজ হন। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত যে তিনি এ রকম কোন কাজের নির্দেশ দেননা, যা ক্ষমতার বাইরে। ছওয়াব-আযাব, বান্দার সাথে ভাল-মন্দ আচরণ কোনটার বেলায় তিনি বাধ্য নন। তিনি যা ইচ্ছা, তা করেন বা নির্দেশ দেন। অবশ্য তিনি স্বীয় মেহেরবানীতে মুসলমানদের বেহেশতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা করেছেন এবং বিচার অনুসারে কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। তাঁর ওয়াদা অপরিবর্তনীয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কুফরী ছাড়া প্রত্যেক ছোট-বড় গুণাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন।

২৮নং আকীদা ঃ তাঁর প্রতিটি কাজ আমাদের জানা-অজানা-অগণিত রহস্যে ভরপুর। তাঁর কাজে নিজস্ব কোন গরজ বা উদ্দেশ্য নেই এবং কোন লক্ষ্যও নেই। তাঁর কাজ কোন কারণ বা ফর্মুলার ধার ধারেনা। যেমন তিনি স্বীয় রহমতের দ্বারা সৃষ্ট জগতের প্রতিটি বস্তুর কারণ ও আদি কারণের মধ্যে একটি সম্পর্ক রেখেছেন। যার ফলে চোখ দেখার কাজ করে, কান শোনার কাজ করে, আগুন দগ্ধ করে এবং পানি তৃষ্ণা নিবারণ করে। তবে আল্লাহ তা'আলা না চাইলে লক্ষ চোখ থাকা সত্বেও প্রকাশ্য দিবালোকে পাহাড়ও দেখবে না আর প্রজ্বলিত আগুন একটি চুলও জ্বালাতে পারবেনা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে কাফিরেরা কীযে ভয়াল আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, কেউ কাছে ঘেঁষতে পারছিল না। অগ্নিকুণ্ডের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কাছে এসে আরয করলেন, কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা? উত্তরে বললেন- 'আছে, তবে আপনার কাছে নয়'। পুনরায় জিব্রাঈল আরয করলেন- ঠিক আছে, তাঁকেই বলেন, যার সাহায্য আপনার প্রয়োজন। উত্তরে তিনি বললেন- عِلْمُهُ بِحَالِي كَفَانِي عَنْ سُؤَالِي
(আমার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, আবেদনের কোন প্রয়োজন নেই।)

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইরশাদ হলো- يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (হে আগুন, ইব্রাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে যাও।) এ নির্দেশ শুনে পৃথিবীর সমস্ত আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। উলামায়ে কিরাম বলেন যে, যদি উক্ত وسلما আয়াতে (ওয়াসালামান) শব্দ না বলতেন, তাহলে সেই আগুন এমন ঠাণ্ডা হয়ে যেত, যা ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য কষ্টদায়কহতো।

নবুয়াত সম্পর্কিত আকীদা

আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে জানা যেমন প্রয়োজন, অনুরূপ নবীদের বেলায় জায়েয, ওয়াজিব ও অসম্ভব সম্পর্কে জানাও প্রয়োজন। নতুবা ওয়াজিবকে অস্বীকার ও অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে কাফির হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অজ্ঞতার কারণে অনেকেই ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করতে পারে বা মুখ দিয়ে ঈমান বিধ্বংসী কথা বের হতে পারে। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

১নং আকীদা ঃ নবী ওই ধরণের সম্মানিত মানবকে বলা হয়, যাঁর কাছে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠিয়েছেন। আর রসূল কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ফিরিশ্তাদের মধ্যেও রসূল রয়েছেন। (আল-আরবাঈন ৩৩ পৃঃ, শরহে আকাইদ ৯৪ পৃঃ;

২নং আকীদা ঃ নবীদের সবাই পুরুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন মহিলা বা জ্বীন ছিলনা। (কুরআন করীম, সূরা জ্বীন ২৯ পৃঃ ও শরহে আকাইদ)

৩নং আকীদা ঃ নবী প্রেরণ করাটা আল্লাহ তাআলার জন্য বাধ্যগত ব্যাপার নয়। তিনি স্বীয় মেহেরবানীতে মানুষের হেদায়েতের জন্য নবীগণকে পাঠিয়েছেন। (উসূলে বযদবী ১২৬ পৃঃ)

৪নং আকীদা ঃ নবী হওয়ার জন্য ওহীর প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ হোক বা ফিরিশতার মাধ্যমে হোক। (তমহীদ ১২৬ পৃঃ)

৫নং আকীদা ঃ নবীদের মধ্যে অনেকের কাছে আল্লাহ তা'আলা সহীফা এবং আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন। ওগুলোর মধ্যে চারটি কিতাব খুবই প্রসিদ্ধ। এগুলো হচ্ছে (১) তৌরাত, যেটা হযরত মুসা (আঃ) এর প্রতি (২) যবুর, যেটা হযরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি (৩) ইনজিল, যেটা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি এবং (৪) সবচেয়ে আফযল কিতাব কুরআন, যেটা সবচেয়ে আফযল নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ সবচেয়ে আফযল হওয়া মানে এতে ছওয়াব বেশী। নচেৎ আল্লাহ এক, তাঁর কালামও এক সমান। এতে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বলার কোন অবকাশ নেই। (শরহে আকাইদ ও নিবরাস ৪৬৫

<u>৬নং আকীদা</u> ঃ আসমানী কিতাবসমূহ ও সহীফাসমূহ সঠিক এবং সবই আল্লাহর কালাম। ওসব কিতাব ও সহীফাসমূহের মধ্যে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। তবে এটা স্মর্তব্য যে আগের কিতাবসমূহের হেফাজতের দায়িত্ব তৎকালীন উম্মতদের উপর অর্পিত হয়েছিল কিন্তু তারা এর যথাযথ হেফাজত করতে পারেনি। তাই আল্লাহর কালাম যেরূপ অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের হাতে সেরূপ থাকেনি; তাদের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা এতে তাহরীফ করেছে অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছামত পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। সুতরাং ওসব কিতাব থেকে যদি কোন উদ্ধৃতি আমাদের সামনে পেশ করা হয়, তা যদি আমাদের কিতাবের (কুরআন) সাথে মিল থাকে, তাহলে গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় তাহরীফ করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। আর যদি মিল-গরমিল কিছুই বোঝা না যায়, তাহলে স্বীকার-অস্বীকার কোনটাই করা যাবেনা, বরং বলতে হবে اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ (আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি আমরা ঈমান এনেছি)। (নিবরাস ৩৬৫ পৃঃ)

<u>৭নং আকীদা</u> ঃ এ ধর্ম যেহেতু সব সময়ের জন্য, সেহেতু কুরআন শরীফের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। যেমন ইরশাদ ফরমান- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ (কুরআন শরীফ আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি এর হেফাজতকারী।) তাই সারা বিশ্ববাসী একত্রিত হলেও এর কোন অক্ষর বা নোক্তা পরিবর্তন করা অসম্ভব। যদি কেউ বলে কুরআন শরীফের কিছু পারা বা সূরা বা আয়াত বা একটি অক্ষর কেউ পরিবর্তন করেছে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা সে উপরোক্ত আয়াতকে অস্বীকার করলো।

<u>৮নং আকীদা</u> ঃ কুরআন মজিদ আল্লাহর কিতাব হওয়া সম্পর্কে নিজেই দলীল। যেমন আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতেছেন-

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

(তোমাদের যদি এ কিতাবের প্রতি, যা আমি আমার একান্ত প্রিয় বান্দার (হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) কাছে নাযিল করেছি, কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে অনুরূপ একটি ছোট্ট সূরা উপস্থাপন কর। এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা না পার, এবং কখনই পারবেনা, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।) তাই কাফিরেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও অনুরূপ একটি আয়াত তৈরী করতে পারেনি এবং পারবেও না।

<u>মাসআলা</u> ঃ আগের কিতাব সমূহ কেবল নবীদের মুখস্থ থাকতো কিন্তু এটি কুরআন শরীফের মুজিযা বলা যায়, মুসলমানের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করতে পারে।

<u>৯নং আকীদা</u> ঃ কুরআন শরীফের সাতটি পঠনরীতি খুবই প্রসিদ্ধ এবং সর্বসম্মত; অর্থগত দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। সব পঠনরীতিই সঠিক বলে বিবেচ্য। এতে উম্মতের জন্য একটি সুবিধা হলো যে যার জন্য যে পঠনরীতি সহজ, সে সেই রীতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে পারবে। শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, যে দেশে যেই পঠন রীতি প্রচলিত, আওয়ামের সামনে সেই রীতি অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়। যেমন আমাদের দেশে হযরত হাফস (রাঃ) এর বর্ণিত পঠনরীতি অনুযায়ী কিরাত পাঠ করা হয়। লোকেরা অজ্ঞতার কারণে পঠনরীতি অস্বীকার করলে কুফরী হিসেবে বিবেচ্য হবে।

<u>১০নং আকীদা</u> ঃ কুরআন করীম আগের কিতাবসমূহের অনেক আহকাম রহিত করে দিয়েছে। কুরআন করীমেরও কতেক আয়াত কতেক আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে।

<u>১১নং আকীদা</u> ঃ নোছখ বা রহিতকরণের অর্থ হচ্ছে কতেক আহকাম কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জারী হয়ে থাকে। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়না যে এ হুকুম
2 কতদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। যখন নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যায়, তখন অন্য হুকুম অবতীর্ণ হয়। যার ফলে বাহ্যতঃ মনে হয় যে, আগের হুকুমটা তুলে নেয়া

হয়েছে। মনসুখ মানে অনেকে 'বাতিল হওয়া' বলে থাকে। কিন্তু এটা খুবই অন্যায়। আল্লাহর সমস্ত আহকাম হক, এতে বাতিল শব্দ প্রয়োগের কোন অবকাশনেই।

১২নং আকীদা ঃ কুরআন শরীফের কতেক আয়াত মুহকেম অর্থাৎ সুস্পষ্ট যা আমাদের বুঝে আসে আর কতেক আয়াত হচ্ছে মুতশাবা অর্থাৎ যার পূর্ণভাব আল্লাহ ও তাঁর হাবীব ছাড়া আর কেউ জানে না। মুতশাবাত আয়াত নিয়ে ওই ব্যক্তিই মাথা ঘামায়, যার মন পবিত্র নয়।

১৩নং আকীদা ঃ ওহী নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি ওহী, নবী ছাড়া অন্য কারো জন্য, হতে পারে বলে মনে করে, সে কাফির। স্বপ্নের মধ্যে নবীদেরকে যেসব বিষয় জ্ঞাত করা হতো তাও ওহী হিসেবে গণ্য। এতে মিথ্যা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ওলীগণের অন্তরে কোন কোন সময় নিদ্রা বা জাগ্রতবস্থায় বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়। এটাকে ইল্‌হাম বলে। (নিবরাস ১০৫ পৃঃ) যাদুকর, কাফির ও ফাসিকগণ যে জ্ঞান লাভ করে থাকে, তাকে শয়তানী ওহী বা শয়তানী জ্ঞান বলা হয়। (মুতাকাদ ১১৭ পৃঃ)

১৪নং আকীদা ঃ নবুয়াত অর্জিত নয়, অর্পিত। এটি একমাত্র আল্লাহর দান। কেউ ইবাদত ও রিয়াজতের সাহায্যে এটি অর্জন করতে পারেনা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, স্বীয় মেহেরবানীতে তাঁকে দান করেন। তবে তাঁকেই দান করেন, যাকে আগে থেকেই উক্ত দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেন। উল্লেখ্য যে, নবীগণ নবুয়াত প্রাপ্তির আগে থেকেই সকল অসৎ চরিত্র থেকে পবিত্র ও সকল সৎচরিত্রের অধিকারী হয়ে বেলায়তের শেষ পর্যায়ে পৌছে যান। তাঁরা বংশ, শরীর, কথাবার্তা চালচলন ইত্যাদির দিক দিয়ে নিখুঁত হয়ে থাকেন। তাঁদেরকে পূর্ণাঙ্গ-জ্ঞান দান করা হয়, যা অন্যান্যদের তুলনায় হাজার হাজার গুণ বেশী কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের জ্ঞান নবী-রসূলের জ্ঞানের লক্ষ ভাগের এক ভাগও হতে পারেনা।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ
مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥

(আল্লাহ জানেন, কিভাবে তাঁর রেসালত সৃষ্টি করবেন। এটি তাঁরই অবদান, যাকে ইচ্ছা দান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড়ই মেহেরবান) যদি কেউ

মনে করে যে, মানুষ নিজের সাধনা ও রিয়াজতের সাহায্যে নবুয়তের স্তর পর্যন্ত পৌছতে পারে, সে কাফির। (আল-মুনতাকিদ ১১৪ পৃঃ, মুসায়েরা ও মুসামেরা ২২৬ পৃঃ, তমহীদ ও মুতাকিদ ২১৭ পৃঃ)

১৫নং আকীদা ঃ যে ব্যক্তি নবী থেকে নবুয়াত বিলুপ্ত হতে পারে বলে মনে করে, সে কাফির। (আরবাঈন ৩২৯ পৃঃ)

১৬নং আকীদা ঃ নবীদের নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। নিষ্পাপ হওয়াটা একমাত্র নবী ও ফিরিশতাগণের বৈশিষ্ট্য। নবী ও ফিরিশতা ব্যতীত কেউ নিষ্পাপ নয়। শরীয়তের ইমামদেরকে নবীদের মত নিষ্পাপ মনে করাটা গোমরাহী ও ধর্মহীনতার পরিচায়ক। ইসমতে আম্বিয়া বা নবীগণ নিষ্পাপ হওয়া মানে আল্লাহ তাঁদেরকে পাপমুক্ত রাখার জন্য ওয়াদাবদ্ধ। কিন্তু ইমাম ও পীর-আওলিয়াদের আওলিয়াদের জন্য এ রকম কোন ওয়াদা নেই। তাই নবীদের থেকে গুণাহ প্রকাশ পাওয়াটা অসম্ভব। (আরবাঈন ৩২৯ পৃঃ)

১৭নং আকীদা ঃ নবীগণ শির্‌ক, কুফরী, ওই ধরণের কাজ, যদ্দারা মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হতে হয়, যেমন মিথ্যা, আত্মসাৎ, অজ্ঞতা ইত্যাদি ও মান-সম্মান বিবর্জিত আচরণ থেকে নবুয়াতের আগে ও পরে সর্বসম্মতভাবে পবিত্র। কবিরা গুণাহ থেকেও তাঁরা পবিত্র। এমনকি নবুয়াতের আগে ও পরে তাঁরা ইচ্ছাকৃত সগিরা গুণাহ থেকেও পবিত্র। (উসুলে বযদবী ১৬৭ পৃঃ)

১৮নং আকীদা ঃ আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া আলাইহিস সালামের কাছে তাঁর বান্দাদের জন্য যতসব আহকাম নাযিল করেছেন, তাঁরা সবগুলো যথাযথ পৌছে দিয়েছেন। যদি কেউ বলে যে কোন নবী কোন হুকুম ভয়ের কারণে বা অন্য কোন কারণে বান্দাদের কাছে পৌছাননি, সে কাফির। (মুনতাকিদ ১২১ পৃঃ)

১৯নং আকীদা ঃ আল্লাহর হুকুম পৌছানোর বেলায় নবীদের কোন ভুলত্রুটি হওয়া অসম্ভব। (মুসামেয়া ২৩৪ পৃঃ)

২০নং আকীদা ঃ নবীদের শরীর কুষ্ঠ, শ্বেত ইত্যাদি ঘৃণ্য রোগ থেকে পবিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। (মুনতাকিদ ১৩২ পৃঃ ও মুসামেরা ২২৬ পৃঃ)

২১নং আকীদা ঃ আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে ইলমে গায়ব দান করেছেন। আসমান জমীনের প্রতিটি অণু পরমাণু নবীদের সামনে উদ্ভাসিত। তাঁদের এ ইলমে গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান) খোদা প্রদত্ত। প্রদত্ত জ্ঞান আল্লাহর জন্য অসম্ভব। কেননা তার কোন সিফাত বা কামালিয়াত কারো প্রদত্ত হতে পারেনা, বরং তাঁর

সমস্ত গুণাবলী স্বত্বাগত। যারা আম্বিয়া কিরাম এমনকি হুযূর আলাইহিস সালামের কোন প্রকারের গায়বী ইলম নাই বলে দাবী করে, তাঁদের বেলায় কুরআন করীমের এ আয়াতটি প্রযোজ্য–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۝

অর্থাৎ কতেক আয়াতকে বিশ্বাস করে আর কতেক আয়াতকে অস্বীকার করে। কেবল অস্বীকৃতি সূচক আয়াত তাদের চোখে পড়ে। যেসব আয়াতে হুযূর আলাইহিস সালামের ইলমে গায়বের কথা বর্ণিত হয়েছে, ওগুলোকে অস্বীকার করে। অথচ উভয় আয়াতই সঠিক। অস্বীকৃতি সূচক আয়াতের দ্বারা স্বত্বাগত ইলমে গায়বকে বোঝানো হয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য আর স্বীকৃতি সূচক আয়াত দ্বারা প্রদত্ত ইলমে গায়বকে বোঝানো হয়েছে, যা আম্বিয়া কিরামেরই শান এবং খোদার শানের বিপরীত।

<u>২২নং আকীদা</u> ঃ আম্বিয়া কিরাম সমস্ত মখলূক এমনকি ফিরিশতাদের থেকেও আফযল। ওলীগণ যতবড় মরতবা সম্পন্ন হোন না কেন, কোন নবীর বরাবর হতে পারেন না। যদি কেউ নবী নয় এমন কাউকে নবী থেকে আফযল বা বরাবর মনে করে, সে কাফির।

<u>২৩নং আকীদা</u> ঃ নবীর তাযীম ফরযে আইন বরং সমস্ত ফরযের উর্ধে। কোন নবীকে অবজ্ঞা করা বা অস্বীকার করা কুফরী।

<u>২৪নং আকীদা</u> ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হুযুর আলাইহিস সালাম পর্যন্ত অনেক নবী পাঠিয়েছেন। কতেক নবীর কথা সুস্পষ্টভাবে কুরআন মজিদে উল্লেখিত আছে আর কতেকের নেই। যাঁদের পবিত্র নাম সুস্পষ্টভাবে কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে, তাঁরা হলেন– হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত শুয়াইব (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত ইলিসা (আঃ), হযরত ইয়াহিয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত জুলকিফল (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ) ও হুযুর সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

<u>২৫নং আকীদা</u> ঃ হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ তা'আলা মা-বাপ ছাড়া মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় খলিফা মনোনীত করে তাঁকে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান দান করেছেন। ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দান করা হয়েছিল আদমকে সিজ্‌দা করার জন্য। ইব্‌লিস্ ব্যতীত সবাই সিজ্‌দা করলেন। ইব্‌লিস্ জ্বীন বংশীয় ছিল এবং খুব বড় আবেদ পরহিজগার ছিল বিধায় তাকে ফিরিশতাদের মধ্যে গণ্য করা হতো। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে সবসময়ের জন্য মরদুদ হয়ে গেল। (কুরআন করীম)

<u>২৬নং আকীদা</u> ঃ আদম (আঃ) এর পূর্বে কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিলনা। সকল মানুষ তাঁর সন্তান। এ জন্য মানুষকে বনী আদম অর্থাৎ আদমের বংশ বলা হয় এবং হযরত আদমকে আবুল বশর অর্থাৎ মানুষের পিতা বলা হয়।

<u>২৭নং আকীদা</u> ঃ সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আঃ) আর কাফিরদের কাছে প্রেরিত সর্বপ্রথম রসূল হলেন হযরত নূহ (আঃ), যিনি সাড়ে নয়শত বছর হেদায়েত করে গেছেন। তাঁর যুগের কাফিরেরা ছিল খুবই নিষ্ঠুর ও নির্মম। তারা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত এবং ঠাট্টা করতো। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন মুসলমান হয়েছিল, বাকী সব কাফিরই রয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন। যার ফলে এমন তুফান বা জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল যে, সমগ্র জমীন ডুবে গিয়েছিল। কেবল সেই মুষ্টিমেয় মুসলমান ও প্রত্যেক জীব-জন্তুর এক এক জোড়া, যা কিশ্‌তিতে উঠানো হয়েছিল, বেঁচে ছিল। (কুরআন করীম)

<u>২৮নং আকীদা</u> ঃ নবীদের কোন সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ জায়েয নেই। কেননা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক নবীর প্রতি আস্থা রাখা হলে, কোন নবী বাদ পড়া বা নবী নয় এমন কাউকে নবীর অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উভয়টা কুফরী। সুতরাং এ ধরণের আকীদা রাখতে হবে যে, আল্লাহর প্রতিটি নবীর প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে।

<u>২৯নং আকীদা</u> ঃ নবীদের মধ্যে বিভিন্ন পদ-মর্যাদা রয়েছে। সবাই একই বরাবর নন। আমাদের আকা মওলা হুযুর আলাইহিস সালাম সবার চেয়ে আফযল। হুযুরের পর সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। তাঁর পরে হলেন, হযরত মুসা (আঃ)। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত

নূহ (আঃ)। তাঁদেরকে مرسلين الوالعزم বলা হয়। এ অতি সম্মানিত পাঁচ নবী অন্যান্য সকল নবী, রসূল, মানব-দানব, জ্বীন-ফিরিশতা ও খোঁদার সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে শ্রেষ্ঠ। যেমনি হুযুর আলাইহিস সালাম সকল রসূলগণের সরদার বরং সবচেয়ে আফযল, তেমনি হুযুরের বদৌলতে তাঁর উম্মত রা অন্যান্য সকল উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ।

৩০নং আকীদা ঃ সকল নবী আল্লাহর দরবারে মর্যাদাবান। তাঁদেরকে আল্লাহর সামনে নগণ্য চামার সমতুল্য মনে করা সুস্পষ্ট বেয়াদবী ও কুফরীতুল্য।

৩১ নং আকীদা ঃ নবীর নবুয়াতের সত্যতার একটি প্রমাণ হচ্ছে, তাঁরা নিজেদের সত্যবাদীতার সমর্থনে অসম্ভব কোন একটা কিছু করার দায়িত্ব নেন এবং অস্বীকারকারীদেরকে চ্যালেঞ্জ দেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাঁরা অসম্ভবকে বাস্তবায়িত করে দেখান কিন্তু অস্বীকারকারীরা তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। এটাকে মু'জিযা বলা হয়। (শরহে আকাইদ ৯৪ পৃঃ)

যেমন হযরত সালেহ (আঃ) এর উষ্ট্রি, হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া ও হাতের তালু থেকে আলো বের হওয়া, হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করা আর আমাদের নবী করীম আলাইহিস্ সালামের মু'জিযারতো কোন সীমা নেই।

৩২নং আকীদা ঃ যে কেউ নবী না হয়ে নবী দাবী করলে, সে তার দাবীর সমর্থনে অসম্ভব কোন একটা কিছু করে দেখাতে পারবেনা। তা নাহলে আসল-নকলের কোন পার্থক্য থাকবেনা।

বিঃদ্রঃ- নবুয়াতের আগে নবীদের থেকে যেসব অস্বাভাবিক কাজ প্রকাশ পায়, তাকে আরহাস বলা হয়, আওলিয়া কিরাম থেকে যা প্রকাশ পায়, তাকে কারামাত বলা হয়, সাধারণ মুমিনদের থেকে যা প্রকাশ পায়, তাকে মায়ুনিয়াত বলা হয়, কাফিরদের থেকে তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যা প্রকাশ পায়, তাকে এস্তেদরাজ এবং তাদের বিপরীত যা প্রকাশ পায়, তাকে ইহানত বলা হয়। (বিয়ালী ১৪২ পৃঃ)

৩৩নং আকীদা ঃ নবীগণ নিজ নিজ কবরের মধ্যে পার্থিব জিন্দেগীর মত স্বশরীরে জীবিত আছেন, পানাহার করেন এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাতায়াত করেন আল্লাহর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষণিকের জন্য মৃত্যুবরণ করে পুনরায় জীবিত হয়ে গেছেন। তাঁদের জিন্দেগী শহীদদের জিন্দেগী থেকে অনেক উর্ধে। এ জন্য

শহীদদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হয় এবং তাঁদের স্ত্রীদের ইদ্দত পালন করার পর অন্যান্যদের সাথে বিবাহ হতে পারে। কিন্তু নবীদের বেলায় এসব জায়েযনেই।

বিঃদ্রঃ- এ পর্যন্ত সকল নবী সম্পর্কিত আকীদা বর্ণিত হলো। এবার বিশেষ করে হুযূর আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত আকীদাসমূহ অবলোকন করুন।

৩৪নং আকীদা ঃ অন্যান্য নবীগণ নির্দিষ্ট কোন কউমের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর আলাইহিস সালাম সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি অর্থাৎ ইনসান-জ্বীন ফিরিশতা, জীবজন্তু ও অন্যান্য জড় পদার্থ ইত্যাদির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর অনুসরণ মানুষের জন্য যেমন ফরয, অন্যান্য সৃষ্টিকুলের জন্যও তেমনি অবশ্য কর্তব্য। (তমহিদ ৭৬ পৃঃ, মুসামেরা ২৩৬ পৃঃ, আল-মুনতাকিদ ১৩৭ পৃঃ)

৩৫নং আকীদা ঃ হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফিরিশতা, মানুষ, জ্বীন, হুর-গেলমান, জীব-জন্তু বৃক্ষলতা মোটকথা সারা জগতের জন্য রহমত স্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য তিনি বিশেষ দয়াবান। যেমন কুরআন শরীফে আছে- وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

৩৬নং আকীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালাম হলেন শেষ নবী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবী প্রেরণের সিলসিলা হুযূর আলাইহিস সালামের আগমনের পর বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই হুযূরের যুগে বা পরে কোন নতুন নবী হতে পারেনা। যদি কেউ হুযূরের যুগে বা পরে নতুন নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করে বা জায়েয মনে করে, সে কাফির। (কুরআন করীম, মুসামেরা ২৩৭ পৃঃ ও শরহে আকাইদ ৫৭ পৃঃ)

৩৭নং আকীদা ঃ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে হুযূর আলাইহিস সালাম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সবাইকে পৃথক পৃথকভাবে যেই কামালিয়াত দান করা হয়েছে, সে সবগুলোর সমষ্টি হুযূরকে দেয়া হয়েছে এবং তাছাড়া সেই কামালিয়াতও হুযূরকে দান করা হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। এবং অন্যরা যা কিছু পেয়েছেন, হুযূরের বদৌলতেই এবং পবিত্র হস্ত থেকেই পেয়েছেন। তাঁর ওসিলাতেই অন্যরা কামালিয়াত লাভ করেছেন। হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীয় প্রভুর মেহেরবানীতে স্বয়ং কামিল। তাঁর এ কামালিয়াত অন্য কোন কিছুর বদৌলতে নয়। বরং তিনি নিজের দ্বারা গুণান্বিত হয়ে কামালিয়াত লাভ করেছেন। (আল-মুতামেদ ১২৯ পৃঃ)

৩৮নং আকীদা ঃ হুযূরের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব। হুযূরের বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে কাউকে হুযূরের মত বললে, সে গুমরাহ বা কাফির। (আল-মুতামেদ ১৩৩ পৃঃ)

৩৯নং আকীদা ঃ আল্লাহ তা'আলা হুযূর আলাইহিস সালামকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাহবুবের মর্যাদা দান করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহরই রেজামন্দি কামনা করে আর আল্লাহ স্বয়ং তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি চান।

৪০নং আকীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামের বিশেষত্বের মধ্যে মেরাজ অন্যতম। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা এবং ওখান থেকে সপ্ত আসমান ও আরশ-কুরসি পরিভ্রমণ এবং আরশের উপরে রাতের কিছুসময় স্বশরীরে অবস্থান- এ সৌভাগ্য কোন মানুষের বা ফিরিশতার কখনও হয়নি ও হবেও না। আল্লাহকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর কালাম শুনেছেন। তিনি আসমান জমীনের সমস্ত মখলুককে পুংখানু পুংখরূপে অবলোকন করেছেন। (শরহে আকাইদ ১০১ পৃঃ)

৪১নং আকীদা ঃ আগে-পরের সমস্ত সৃষ্টিকুলই হুযূর আলাইহিস সালামের মুখাপেক্ষী। এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ও হুযূরের মুখাপেক্ষী।

৪২নং আকীদা ঃ কিয়ামতের দিন শাফায়াতে কুবরার অধিকারী হবেন একমাত্র হুযূর আলাইহিস সালাম। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর আলাইহিস সালাম শাফায়াত করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো পক্ষে শাফায়াত করার সাহস হবে না। যতজন শাফায়াতকারী আছেন, আসলে সবাই হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপেই সুপারিশ করবেন এবং একমাত্র হুযূর আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। এ ব্যাপক সুপারিশ বা শাফায়াতে কুবরা মুমিন, কাফির, নেক্কার-বদকার সবার জন্য হবে। বিচারের অপেক্ষাটা এত যন্ত্রণাদায়ক হবে যে, মানুষ অস্থির হয়ে মনে মনে বলবে আমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হোক, তবুও ভাল, এ অপেক্ষা আর সহ্য হচ্ছেনা'। এ যন্ত্রণা থেকে কাফিরগণও হুযূরের বদৌলতে রেহাই পাবে। এর জন্য প্রশংসা করবে। প্রশংসার এ জায়গার নাম 'মকামে মাহমুদ'। শাফায়াত আরও কয়েক প্রকারের আছে। যেমন বিনা বিচারে অনেক লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। এর সংখ্যা ৪৯০ কোটি পর্যন্ত জানা আছে, কিন্তু এর চেয়ে আরও অনেক বেশী লোক হবে,

যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাল জানেন। তিনি এমন অনেক লোককে দোযখ থেকে রক্ষা করবেন, যাদের বিচার হয়ে দোযখী বলে সাব্যস্ত হবে। কতেককে তিনি সুপারিশ করে দোযখ থেকে বের করে আনবেন, কতেকের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করাবেন এবং কতেকের শাস্তি লাঘব

৪৩নং আকীদা ঃ হুযূরের জন্য সবরকমের শাফায়াত প্রমাণিত আছে। আবদার সহকারে, বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বা অনুনয়-বিনয় করে তিনি সুপারিশ করতে পারবেন। তাঁর এ শাফায়াতকে যে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট।

৪৪নং আকীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামকে সুপারিশের সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যেমন তিনি ইরশাদ ফরমান, اُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ (আমাকে সুপারিশের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۝

(আপনার ঘনিষ্টদের জন্য এবং সাধারণ মুমিন নর-নারীদের গুণাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন) একে শাফায়াত না বলে আর কি বলা যায়? হে আল্লাহ আমাদেরকে সেই দিন তোমার হাবীবের শাফায়াত নসীব করুন, যেদিন ধন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। আরও কয়েক ধরণের সুপারিশ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে। ইন্শাআল্লাহ 'পরকালীন অবস্থা' শীর্ষক আলোচনায় আলোকপাত করা হবে।

৪৫নং আকীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি মহব্বতের উপর ঈমান নির্ভরশীল বরং সেই মহব্বতের নামই ঈমান। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূরের প্রতি মহব্বত মা-বাপ সন্তান-সন্ততি এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছু থেকে বেশী হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারেনা। (হাদীছ)

৪৬নং আকীদা ঃ হুযূরের আনুগত্য মানে আল্লাহরই আনুগত্য। হুযূরের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য অসম্ভব। বর্ণিত আছে, যে কাউকে ফরয নামাযরত অবস্থায় যদি হুযূর আলাইহিস সালাম তলব করেন, তক্ষুণি সাড়া দিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হও এবং যতক্ষণ প্রয়োজন হুযূরের সাথে আলাপ আলোচনা কর, নামায ঠিকই থাকবে এবং এর দ্বারা নামাযের কোন ক্ষতি হবেনা।

৪৭নং আকীদা ঃ রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি সম্মান বা সম্মানবোধ ঈমানের অংগ। ঈমানের পর রসূলে

করীমের তাযীম করা অন্যান্য ফরয কাজ থেকে অগ্রগণ্য। এ আকীদার জোরালো সমর্থন সেই হাদীছে রয়েছে, যেথায় বর্ণিত আছে যে, খায়বরের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে 'সাহ্বা' নামক স্থানে হুযূর আলাইহিস্ সালাম আসর নামায পড়ে হযরত মওলা আলী (কঃ) এর জানুর উপর মস্তক মুবারক রেখে বিশ্রাম নিলেন। হযরত আলী কিন্তু আসর নামায তখনো পড়েননি। এদিকে সময় চলে যাচ্ছিল। কিন্তু জানু হটানোর দ্বারা হুযূরের স্বপ্নের কোন ব্যাঘাত হতে পারে- এ ধারণায় জানু হটালেন না। শেষ পর্যন্ত সূর্য ডুবে গেল। হুযূর যখন চক্ষু মুবারক খুললেন, তখন হযরত আলী স্বীয় নামাযের কথা আরয করলেন। হুযূরের নির্দেশে অস্তমিত সূর্য ফিরে আসলো এবং মওলা আলীর নামায আদায় করার পর পুনরায় ডুবে গেল। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে তিনি (কঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায, আবার আসরের নামায হুযূরের নিদ্রার জন্য কুরবানী করে দিয়েছিলেন। করবেনই না বা কেন, আমরা হুযূরের বদৌলতেইতো ইবাদতসমূহ পেয়েছি। এর সমর্থনে অপর আর একটি হাদীছ হলো- হিজরতকালে ছুর পাহাড়ের গুহায় প্রথমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) প্রবেশ করে দেখলেন যে, ওখানে অনেক গর্ত রয়েছে। তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ওসব গর্তগুলো বন্ধ করে দেন। একটি গর্ত বাকী ছিল, ওটাতে নিজের পায়ের আঙ্গুলি দিয়ে হুযূরকে আহবান করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লাম) তথায় তশরীফ নিয়ে গিয়ে হযরত সিদ্দীক আকবরের জানুর উপর পবিত্র মস্তক রেখে বিশ্রাম নিলেন। সেই গুহায় একটি সাপ হুযূরের সাক্ষাতের প্রত্যাশী ছিল। সাপটির মাথাটি হযরত সিদ্দীক আকবরের পায়ের সঙ্গে লাগছিল। কিন্তু হুযূরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে মনে করে তিনি পা হটালেন না। পরিশেষে সাপটি পায়ে কামড় দিল। যন্ত্রণায় সিদ্দীক আকবরের চোখের পানি হুযূরের চেহারা মুবারকে পতিত হলে, তাঁর ঘুম ভেংগে যায়। ঘটনা প্রকাশ করলে হুযূর আলাইহিস সালাম দংশিত স্থানে নিজের থুথু লাগিয়ে দিলেন। সাথে সাথে বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রতি বছর এ বিষক্রিয়া প্রকাশ পেত। বার বছর পর এ বিষক্রিয়ায় তিনি শাহাদতবরণকরেন।

<u>৪৮নং আকীদা</u> ঃ হুযূরের পার্থিব জিন্দেগীতে তাঁকে যে রকম সম্মান করা হতো, এখনও তদ্রুপ সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। যখন হুযূরের আলোচনা হয়, তখন একান্ত মনোযোগ সহকারে ও স্বসম্মানে তা শোনা এবং পবিত্র নাম

উচ্চারিত হলে দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهِ الْكِرَامِ وَصَحْبِهِ الْعِظَامِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

হুযূরের প্রতি মহব্বতের একটি আলামত হচ্ছে বেশী করে যিক্র করা ও দরূদ শরীফ পড়া এবং নাম মুবারক লিখার পর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণভাবে লিখা। কতেক লোক সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে (সঃ) বা (সল্লম) লিখে থাকে, এটা নাজায়েয ও হারাম। হুযূরের বংশ সাহাবায়ে কিরাম, মুহাজেরীন, আনসার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের সাথে মহব্বত রাখা ও হুযূরের দুশমনদের সাথে দুশমনী পোষণ করাও হুযূরের প্রতি মহব্বতের অন্যতম আলামত। এটা সকলের জানা আছে যে, হুযূরের প্রতি মহব্বতে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন এমনকি জন্মভূমিও ত্যাগ করেছিলেন। এক সাথে হুযূরের প্রতি মহব্বত ও হুযূরের শত্রুদের প্রতি মহব্বত কিছুতেই হতে পারেনা। যে কোন একটাকেই গ্রহণ করতে হবে। বিপরীত ধর্মী দু'টি বিষয় কিছুতেই একত্রিত হতে পারেনা। হয়তো বেহেশতের পথে চলো, অথবা জাহান্নামে যাও। এটাও মহব্বতের অন্যতম আলামত যে হুযূরের শানে ব্যবহৃত শব্দগুলো যেন সম্মানবোধক হয়। যে সব শব্দ কম সম্মানবোধক সেগুলো যেন কখনও ব্যবহার করা না হয়। হুযূরের পবিত্র নাম নিয়ে ডাকা জায়েয নাই, বরং 'ইয়া নবীয়াল্লাহ', ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ বলতে পারেন। মদীনা শরীফে যাবার যদি কারো সৌভাগ্য হয়, তাহলে রওজা মুবারক থেকে চার হাত দূরে নামাযে দাঁড়ানোর মত হাত বেঁধে অবনত মস্তকে দরূদ ও সালাম পেশ করবেন। অতি নিকটে বা অতি দূরে দাঁড়াবেন না এবং এদিক সেদিক তাকাবেন না। আর সাবধান। আওয়াজ যেন উচ্চ না হয়। নচেৎ সারা জীবনের ইবাদত বেকার হয়ে যাবে। হুযূরের কথা বার্তা, কাজকর্ম ও আমল সম্বন্ধে অবগত হয়ে এর অনুসরণ করাও হুযূরের প্রতি মহব্বতের পরিচায়ক।

<u>৪৯নং আকীদা</u> ঃ হুযূর আলাইহিস সালামের কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, ও চাল-চলনকে যে ঘৃণার চোখে দেখে, সে কাফির।

<u>৫০নং আকীদা</u> ঃ হুযূর আলাইহিস সালাম হলেন আল্লাহর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রতিনিধি। সমগ্র জাহানকে তাঁর কর্তৃত্বাধীন করে দেয়া হয়েছে। তিনি যেটা ইচ্ছা সেটা করতে পারেন, যাকে ইচ্ছা, তাকে দিতে পারেন এবং যার থেকে যা ইচ্ছা ছিনিয়ে নিতে পারেন। সমগ্র জাহান তাঁর আদেশের অধীন। তিনি

তাঁর প্রভু ছাড়া অন্য কারো অধীন নন। সকল মানুষের অভিভাবক হলেন তিনি। যে তাঁর অভিভাবকত্ব স্বীকার করবেনা, সে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। আসমান-জমীন বেহেশত-দোযখ সবই তাঁর আওতাধীন। বেহেশত-দোযখের চাবি তাঁর হাতে অর্পিত হয়েছে। রিজিক রোজগার, খায়ের-বরকত এবং সব রকমের অনুদান হুযূরের দরবারেই বন্টন করা হয়। দুনিয়া-আখেরাত হুযূরের অবদানের একটি অংশ বিশেষ। শরীয়তের আহকাম প্রণয়নের দায়িত্ব হুযূরের হাতেই দেয়া হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে কারো জন্য কোন কিছু হারাম করতে পারেন আবার কারো জন্য হালাল করতে পারেন এবং কোন ফরয কাজ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন।

৫১নং আকীদা ঃ সর্বপ্রথম হুযূর আলাইহিস সালাম নবুয়াতের পদমর্যাদা লাভ করেন। মিছাকের দিন সকল নবীর থেকে হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান ও সাহায্যের ওয়াদা নেয়া হয়েছিল এবং সেই শর্তেই তাঁদেরকে নবুয়াত প্রদান করা হয়েছিল। হুযূর আলাইহিস সালাম হলেন নবীদের নবী এবং সমস্ত আম্বিয়া কিরাম তাঁরই উম্মত। সকল নবীই তাঁদের ওয়াদা মোতাবেক হুযূরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হুযূর আলাইহিস সালামকে তাঁর সত্ত্বার বিকাশস্থল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, এবং হুযূরের নূরের দ্বারা সমগ্র জগতকে আলোকিত করেছেন। তাই তিনি সব জায়গায় বিরাজমান।

প্রয়োজনীয় মাসআলা ঃ নবীদের থেকে যে সব ভুল-ক্রটি প্রকাশ পেয়েছে, কুরআন তিলাওয়াত ও হাদীছ রেওয়ায়েত করার সময় যতটুকু চোখে পড়ে তা ব্যতীত অন্য সময় এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি একান্ত হারাম। অন্যদের এ ব্যাপারে নাক গলানোর কি অধিকার আছে? আল্লাহ তা'আলা হলেন তাঁদের মালিক এবং তাঁরা হলেন তাঁর প্রিয় বান্দা। তিনি যে রকম ইচ্ছা সে রকম বর্ণনা করতে পারেন এবং তাঁরাও যতটুকু ইচ্ছা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অন্যরা সে সব বাক্যকে দলীল হিসেবে উথাপন করতে পারে না। বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে মরদুদ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁদের যে সব কাজকে ভুল-ক্রটি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, আসলে এর পিছনে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন আদম আলাইহিস সালামের ভুল না হলে দুনিয়া আবাদ হতোনা, আসমানী কিতাব নাযিল হতোনা, রসূল আসতেন না, জিহাদ হতোনা এবং অগণিত ছওয়াবের পথ বন্ধ থাকতো। আদম (আঃ) এর একটি ভুলের ফলে সে সব পথ উন্মোচিত হয়েছে। আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত বান্দাদের দোষ-ক্রটি নেক বান্দাদের নেকী অপেক্ষা অনেক শ্রেয়ঃ। حسنات الابرار سيأت المقربين

ফিরিশতা সম্পর্কিত আকীদা

১নং আকীদা ঃ ফিরিশতাগণ নূরের তৈরী। আল্লাহ তা'লা তাঁদেরকে যে রকম ইচ্ছা, সে রকম আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাঁরা কোন সময় মানুষের আকৃতিতে এবং কোন সময় অন্য আকৃতিতে আবির্ভূত হন। (আল-ওয়াকিত ৪৭ পৃঃ)

২নং আকীদা ঃ ফিরিশতাগণ আল্লাহর যা হুকুম, তাই করে থাকেন। খোদার হুকুম ছাড়া তাঁরা ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ কোন কিছু করেন না। তাঁরা হলেন আল্লাহর নিস্পাপ বান্দা; তাঁরা সগিরা-কবিরা সব রকম গুণাহ থেকে পবিত্র। কুরআন করীমে বর্ণিত আছে- ويفعلون ما يؤمرون যা নির্দেশ করেন, তা পালন করেন। (তমহিদ ১৫ পৃঃ, শরহে আকাইদ ৯৯ পৃঃ, আরবাঈন ৩৩৫ পৃঃ)

৩নং আকীদা ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নানা রকম দায়িত্ব দিয়েছেন। কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে নবীদের কাছে ওহী পৌছানো, কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের শরীরের আভ্যন্তরীন অংশ দেখাশোনা করা, কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে যিকরের মাহফিল খুঁজে বের করে তথায় হাজির হওয়া, কতেক মানুষের আমলনামা লিখার কাজে নিয়োজিত। অনেকের দায়িত্ব হচ্ছে হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হওয়া, কতেকের দায়িত্ব হুযূরের সমীপে মুসলমানদের সালাত-সালাম পৌছানো, কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে মৃতের কাছে সওয়াল করা, কারো দায়িত্ব হচ্ছে জান কবজ করা, কতেকের দায়িত্ব হচ্ছে আযাব দেওয়া, কারো দায়িত্ব হচ্ছে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া। এসব ছাড়া আরও অনেক দায়িত্ব ফিরিশতাগণ পালন করে থাকেন। (কুরআন করীম)

৪নং আকীদা ঃ ফিরিশতাগণ পুংলিঙ্গও নন, স্ত্রী লিঙ্গও নন। (শরহে আকাইদ ১৯ পৃঃ)

৫নং আকীদা ঃ ফিরিশতাগণকে স্থায়ী বা খালেক মনে করা কুফরী। (কুরআন করীম, শরহে আকাইদ ৯৯ পৃঃ)

৬নং আকীদা ঃ ফিরিশতাদের সংখ্যা একমাত্র তাঁদের সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তাঁর জানানোর ফলে তাঁর রসূলও জানেন। চারজন ফিরিশতা খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন হযরত জিব্রাইল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ), হযরত ইস্রাফিল (আঃ) ও হযরত আজরাইল (আঃ)। এ চারজন ফিরিশতা অন্যান্য ফিরিশতাদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদাশালী। (তমহিদ ১৪ পৃঃ)

৭নং আকীদা ঃ যে কোন ফিরিশতার সাথে সামান্যতম বেআদবী কুফরী। অজ্ঞলোকেরা অনেক সময় কোন দুশমনকে বা পাওনাদারকে দেখলে বলে- মলেকুল মাওত বা আজরাঈল ফিরিশতা এসে গেছে। এ ধরণের বাক্য প্রায় কুফরী সমতুল্য। (তমহীদ ১৫ পৃঃ)

৮নং আকীদা ঃ ফিরিশতাগণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা ফিরিশতাকে সৎকর্মের শক্তি বৈ অন্য কিছু নয় মনে করা কুফরী।

জ্বীন সম্পর্কিত আকীদা

১নং আকীদা ঃ জ্বীনকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যেও কতেককে যে কোন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তারা খুবই দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে। অসৎ প্রকৃতির জ্বীনকে শয়তান বলা হয়। জ্বীনেরা মানুষের মত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রাণ ও শরীর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধিও আছে। পানাহার ও জীবন মরণও তাদের মধ্যে আছে। (কুরআন, হাদীছ, আরবাঈন ৩৩৭ পৃঃ)

২নং আকীদা ঃ ওদের মধ্যে মুসলমানও আছে, কাফিরও আছে তবে মানুষের তুলনায় তাদের মধ্যে কাফিরের সংখ্যা বেশী। তাদের মুসলমানের মধ্যে নেককারও আছে, ফাসিকও আছে, সুন্নীও আছে আবার বাতিল পন্থীও আছে। তাদের ফাসিকের সংখ্যা মানুষের তুলনায় বেশী। (কুরআন-হাদীছ)

৩নং আকীদা ঃ তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা অসৎ শক্তির নাম জ্বীন বা শয়তান রাখা কুফরী।

আলমে বরযখ সম্পর্কিত আকীদা

দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝখানে আর একটি আলম বা জগত আছে, একে আলমে বরযখ বলা হয়। মৃত্যুর পর ও কিয়ামতের আগে সমস্ত মানুষ ও জ্বীনকে নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুসারে তথায় অবস্থান করতে হবে। এ আলমে বরযখ দুনিয়া থেকে অনেক বড়। দুনিয়ার সাথে আলমে বরযখের তুলনা মায়ের পেটের সাথে পৃথিবীর তুলনার মতোই। আলমে বরযখটা কারো জন্য আরামদায়ক আবার কারো জন্য কষ্টদায়ক।

১নং আকীদা ঃ প্রত্যেক মানুষের জন্য যে আয়ুষ্কাল নির্ধারিত, তার এদিক-সেদিক হতে পারেনা। যখন আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন হযরত আজরাইল (আঃ) জান কবজের জন্য আসেন, তখন ঐ ব্যক্তির ডানে বামে যতদূর দেখা যায় শুধু ফিরিশতা আর ফিরিশতা। মুসলমানের আশে পাশে রহমতের ফিরিশতা আর কাফিরের আশে-পাশে আযাবের ফিরিশতা থাকে। সেই সময় প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ইসলামের সত্যতা সূর্য থেকে অধিক উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই সময়ের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু তখনতো অদৃশ্য নেই বরং সবকিছু দৃশ্যমান হয়ে গেছে।

২নং আকীদা ঃ মৃত্যুর পর মানুষের শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক বজায় থাকে, যদিওবা রূহ শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। শরীরের উপর যা কিছু ঘটবে, এর প্রভাব রূহের উপর গিয়ে পড়বে, যেরূপ পার্থিব জীবনে হয় বরং এর থেকে আরও বেশী হবে। পৃথিবীতে ঠাণ্ডা পানীয়, শীতল বায়ু, নরম বিছানা, মজাদার খাবার প্রভৃতির স্বাদ শরীর যেমন লাভ করে, রূহও তাতে আরাম ও স্বাদ পেয়ে থাকে। এর বিপরীত হলে রূহের উপরও তদ্রুপ বর্তায়। রূহের আরাম ও কষ্টের জন্যও কতেকগুলো বিশেষ কারণ রয়েছে, যদ্বারা রূহের আরাম বা কষ্ট হয়ে থাকে। অনুরূপ আলমে বরযখের মধ্যেও একই অবস্থা হয়ে থাকে।

৩নং আকীদা ঃ মৃত্যুর পর মুসলমানের রূহ পদমর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় স্থান পেয়ে থাকে। কতেকের রূহ কবরে, কতেকের রূহ জমজম কূপের কাছে, কতেকের রূহ আসমান-জমীনের মাঝামাঝি স্থানে, কতেকের রূহ

প্রথম, দ্বিতীয় এভাবে সপ্তম আসমানে পর্যন্ত স্থান পেয়ে থাকে। কারো কারো রূহ আসমান সমূহেরও উর্ধে স্থান পায়। কারো কারো রূহ আরশের নীচে আলোকবর্তিকার মধ্যে এবং কারো কারো রূহ ইল্লিনের মধ্যে থাকে। কিন্তু যেথায় থাকুক না কেন, স্বীয় শরীরের সাথে যথারীতি সম্পর্ক বজায় থাকে। কেউ কবরের পাড়ে আসলে, তাকে দেখে, চিনে ও কথা শোনে। রূহের জন্য কবরের সন্নিকট হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীছ শরীফে এর উদাহরণ এভাবে দিয়েছে যে, একটি পাখী প্রথমে পিঞ্জারায় বন্ধ ছিল, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইমামগণ বলেন– إِنَّ النُّفُوْسَ الْقُدْسِيَّةَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ اِتَّصَلَتْ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَتَرٰى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ ؕ

অর্থাৎ– পবিত্র রূহসমূহ যখন শরীরের গণ্ডি থেকে পৃথক হয়ে উর্ধজগতে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তখন কিন্তু ওখান থেকে সবকিছু প্রত্যক্ষদর্শীর মত দেখে থাকেন ও শুনে থাকেন।) হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخَلّٰى سَرْبُهٗ يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ ۝

(যখন কোন মুসলমান মারা যায়, তখন তার রাস্তা খুলে দেয়া হয়, এবং যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে।) শাহ আবদুল আযীয সাহেব বলেন– "রূহের জন্য কাছে ও দূরের জায়গা এক বরাবর।" কাফিরদের দুষ্ট আত্মাসমূহের কিছু সংখ্যক কবরে বা শ্মশানে থাকে, কিছু সংখ্যক ইয়ামন দেশের বরহুত নামক নালায় থাকে। কতেক রূহ জমীনের প্রথম দ্বিতীয় এভাবে সপ্তম স্তরে পর্যন্ত থাকে। কতেক রূহ এর নীচে সিজ্জিনেও থাকে। তবে যে সেই কবর বা শ্মশানের পার্শ্ব দিয়ে যায়, তাকে চিনে, দেখে ও তার কথা শুনে। কিন্তু এদিক-সেদিক যাওয়ার কোন অধিকার নেই; এক প্রকার বন্দীর মতই থাকে।

৪নং আকীদা ঃ 'রূহ অন্য শরীরে' মানুষের হোক বা পশুর হোক চলে যায়, যাকে পুনর্জন্ম বলা হয়– এরকম ধারণা ভুল এবং একে বিশ্বাস করাটা কুফরী।

৫নং আকীদা ঃ মৃত্যু মানে শরীর থেকে রূহ পৃথক হয়ে যাওয়া, রূহের মৃত্যু নয়। যে রূহ বিলুপ্ত হয়ে যায় বলে, সে বদ্ আকীদা পোষণকারী।

৬নং আকীদা ঃ মৃত লোকেরা কথা বলে। তাদের কথা সাধারণ জ্বীন ও মানুষ ছাড়া সকল প্রাণী ও অন্যান্যরা শুনতে পায়। (বুখারী ১ম খণ্ড ১৮৪ পৃঃ)

৭নং আকীদা ঃ মৃতকে যখন কবরে দাফন করা হয়, তখন কবর চাপ দেয়। যদি সে মুসলমান হয়, তাহলে কবরের চাপটা এমন মনে হয় যেমন মা আদর করে আপন শিশুকে বুকে চেপে ধরে। আর যদি কাফির হয়, তাহলে এমন জোরে চাপ দেয় যে এদিকের হাড় ওদিকে এবং ওদিকের হাড় এদিকে এসে যায়। (শরহে আকাইদ ও নিবরাস)

৮নং আকীদা ঃ দাফনকারীগণ যখন দাফন করে ওখান থেকে চলে আসে, তখন মৃতব্যক্তি তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। ঐ সময় দু'জন ফিরিশ্তা দাঁত দিয়ে মাটি ভেদ করে তার কাছে আসে। তাদের আকৃতি ভয়ংকর প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের শরীরের রং কাল, চোখ ডেকসির আকারের মত কাল ও নীল বর্ণের এবং অগ্নিশর্মা, তাদের মাথার চুল পা পর্যন্ত প্রসারিত এবং দাঁত কয়েক হাত লম্বা, যদ্বারা মাটি ভেদ করে কবরে প্রবেশ করে। তাদের এক জনের নাম মুনকার, অপরজনের নাম নকির। মৃতব্যক্তিকে তর্জন-গর্জন করে উঠাবে এবং একান্ত কঠোর ভাবে কর্কশ ভাষায় প্রশ্ন করবে– (১) مَنْ رَّبُّكَ তোমার সৃষ্টিকর্তা কে? (২) مَا دِيْنُكَ (তোমার ধর্ম কি?) (৩) مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ (এ মহৎ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে?) মৃতব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, তাহলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলবে رَبِّىَ اللّٰهُ (আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবে دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ (আমার ধর্ম ইসলাম) এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবে هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (তিনি হলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফিরিশতাদ্বয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করবে– তোমাকে এসব কথা কে বলেছে? উত্তরে বলবে– আল্লাহর কিতাব থেকে জানতে পেরেছি এবং তার উপর ঈমান এনেছি ও বিশ্বাস করেছি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে বলবে, আমাদের জানা ছিল যে তুমি এরকম বলবে। সেই সময় আসমান থেকে এক আহবানকারী বলবেন 'আমার বান্দা সত্য বলেছে, ওর জন্য জান্নাতের একটি আসন বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশতের পোষাক পরিয়ে দাও আর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও, যাতে জান্নাতের হাওয়া ও সুগন্ধি তার কাছে আসতে থাকে। যতদূর দৃষ্টি যায়, সেই পর্যন্ত ওর
3 কবর প্রশস্ত করে দেয়া হবে। তাকে বলা হবে 'তুমি শয়ন কর, যে রকম বর শয়ন করে'। (মিশকাত ২৫ পৃঃ, তিরমিযী ১৭৩ পৃঃ)

এটা বিশেষ করে আল্লাহর খাস বান্দাদের জন্য, অবশ্য সাধারণের বেলায় তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দিতে পারেন। তবে কবরের প্রশস্ততা বান্দার পদমর্যাদা অনুযায়ী ভিন্নতর হবে। কারো জন্য কবর সত্তর হাত লম্বা ও সত্তর হাত প্রস্থ হবে। কারো জন্য পাপ অনুযায়ী শাস্তিও নির্ধারিত থাকবে। তবে তারা তাদের পীর, মযহাবের ইমাম বা অন্যান্য আওলিয়া কিরামের সুপারিশ বা কেবল আল্লাহর রহমতের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করলে মুক্তি পাবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, গুণাহগার মুমিনের শাস্তি শুক্রবারের রাত্রি আসা পর্যন্ত হবে, এর পর আর আযাবহবেনা।

হাদীছ শরীফ থেকে এটাও প্রমাণিত আছে যে, যে মুসলমান জুমার রাত বা দিন বা রমাযান মাসের যে কোন দিন মারা যায়, সে মুনকার নকিরের প্রশ্ন ও কবর আযাব থেকে রেহাই পাবে। (নিবরাস ৩১৬ পৃঃ)

ইতিপূর্বে বেহেশতের জানালা খুলে দেয়ার যে কথা বর্ণিত হয়েছে, তা এরকমই হবে- প্রথমে মৃতব্যক্তির বাম হাতের দিকে দোযখের জানালা খোলা হবে, যার থেকে অগ্নিশিখা, উত্তপ্ত হাওয়া ও ভীষণ দুর্গন্ধ আসবে কিন্তু সাথে সাথে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর ডান দিক থেকে জান্নাতের জানালা খুলে দেয়া হবে এবং ওকে বলা হবে- তুমি যদি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিতে, তাহলে তোমার জন্য ওটা নির্ধারিত ছিল। আর এ রকম করার কারণ হলো যেন স্বীয় প্রভুর নেয়ামতের কদর বুঝতে পারে যে কি ধরণের বড় আযাব থেকে রক্ষা করে বড় নিয়ামত দান করা হয়েছে। মুনাফিকের জন্য এর বিপরীত হবে অর্থাৎ প্রথমে জান্নাতের জানালা খোলা হবে এবং সে এর আরাম, শীতল পরশ ও সুগন্ধি অনুভব করবে। কিন্তু সাথে সাথে তা বন্ধ করে দিয়ে দোযখের জানালা খুলে দেয়া হবে, যেন এ বড় শাস্তির সাথে সাথে এ বড় অনুশোচনাটা হয় যে হুযূর আলাইহিস-সালামকে অমান্য করে এবং তাঁর শানে সামান্য বেআদবী করে কি অমূল্য নিয়ামত হারালো এবং কি জঘন্য শাস্তির সম্মুখীন হলো। মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হলে সকল প্রশ্নের উত্তরে বলবে- هاه هاه لا ادري (আফসোস, আমার কিছু জানা নেই।) كنت اسمع الناس يقولون شيئا فاقول (আমি লোকদেরকে যা বলতে শুনতাম তা নিজেও বলতাম) তখন আসমান থেকে এক আহবানকারী ডাক দিয়ে বলবে- সে মিথ্যুক, তার

জন্য আগুনের বিছানা পেতে দাও, আগুনের পোষাক পরিধান করাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি জানালা খুলে দাও যাতে সে অগ্নিশিখার তাপ অনুভব করতে পারে। আর তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অন্ধ-বধির দু'জন ফিরিশতা মোতায়েন করা হবে। ওদের হাতে লোহার মুগুর থাকবে, যার আঘাতে পাহাড় পর্যন্ত ধূলিস্যাত হয়ে যায়, সে মুগুর দ্বারা তাকে মারতে থাকবে। (মিশকাত ১৫ পৃঃ)

অধিকন্তু সাপ ও বিচ্ছুর দ্বারাও শাস্তি পেতে থাকবে। তার কৃতকর্ম কুকুর, বাঘ ও অন্যান্য হিংস্রপ্রাণীর আকৃতি ধারণ করে তাকে কষ্ট দিবে। কিন্তু নেক বান্দাদের আমল প্রিয় ও আপনজনের আকৃতি ধারণ করে শান্তি দান করবে।

৯নং আকীদা ঃ কবরের আযাব ও শান্তি উভয়টা সত্য। এবং উভয়টা শরীর ও রূহের উপর হয়ে থাকে। যেমন, উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যদিওবা শরীর পঁচে গলে বা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়; কিন্তু এর মূল অংশ কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে এবং সেটার উপর আযাব বা শান্তি বর্ষিত হবে। কিয়ামতের দিন সেই মূলের উপর ভিত্তি করে পুনরায় শরীর গঠিত হবে। সেই মূল অংশটা এত সূক্ষ্ম, যা মেরুদণ্ডের হাড়ে থাকে এবং যাকে عجب الذنب বলা হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও তা দেখা যাবেনা। একে আগুনেও জ্বালাতে পারেনা। আর মাটিও হজম করতে পারেনা। এটা শরীরের মূল। কিয়ামতের দিন সেই মূলেই রূহ ফিরিয়ে আনা হবে, অন্য কোন নতুন শরীরে নয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন পরিবর্ধনকে শরীর বদলানো বোঝায় না। যেমন শিশু কত ছোট আকারে জন্ম হয় অতঃপর কত বড় হয়ে যায় আবার শক্ত সামর্থ মোটা মোটা ব্যক্তি অসুখে শুকিয়ে কি ধরণের হালকা হয়ে যায় পুনরায় রক্ত-মাংস এসে আগের মত হয়ে যায়। এ পরিবর্তনকে কেউ মানুষ বদলে গেছে বলেনা। অনুরূপ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মাটি বা ছাই হয়ে যাওয়া মাংস ও হাড় একত্রিত করে মূলের সাথে সংযোজন করবেন এবং প্রত্যেক রূহকে সেই আগের শরীরে প্রেরণ করবেন। একেই বলে হাশর। কবরের আযাব ও কবরের শান্তিকে যে অস্বীকার করে, সে গোমরাহ।

১০নং আকীদা : মৃত ব্যক্তিকে যদি কবরে দাফন করা না হয়, তাহলে যেখানে পড়ে থাকবে বা নিক্ষিপ্ত হবে, ওখানেই সওয়াল-জবাব হবে এবং ওখানেই ছওয়াব বা আযাব পৌছাবে। এমনকি যদি কাউকে বাঘে খেয়ে ফেলে, তাহলে বাঘের পেটেই সওয়াল-জবাব হবে এবং ওখানেই ছওয়াব বা শাস্তি দেয়াহবে।

মাসআলা : আম্বিয়া কিরাম, আওলিয়া কিরাম, উলামায়েদ্বীন শোহদায়ে এজাম, বাআমল হাফিজে কুরআন, নিষ্পাপ ব্যক্তি ও সর্বক্ষণ দরূদ পাঠকারীর শরীরকে মাটি স্পর্শ করতে পারবেনা। যে ব্যক্তি নবীগণের শানে এ ধরণের অশোভনীয় কথা বলে যে নবীরা মরে মাটি হয়ে গেছে, সে গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহী।

পুনরুত্থান ও হাশরের বর্ণনা

আসমান-জমীন, জ্বীন-ইনসান, ফিরিশতা সবই একদিন ফানা হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বহাল থাকবেন। পৃথিবী ফানা হয়ে যাবার আগে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাবে। যেমন-

(১) তিন জায়গায় ভূমি ধ্বসে অনেক মানুষ তলিয়ে যাবে। এ তিন জায়গার একটি হবে পূর্বাঞ্চলে, অপরটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আর একটি হবে আরব দ্বীপপুঞ্জে। (মুসলিম ২য় খণ্ড ৩৯৩ পৃঃ,

(২) ইলম উঠে যাবে অর্থাৎ আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে। এর অর্থ হলো আলেমদের অন্তর থেকে ইলম বিদুরিত করা হবে। (বুখারী শরীফ ২০ পৃঃ, মুসলিম শরীফ ৩৯০ পৃঃ, মিশকাত শরীফ ৪৬৯ পৃঃ) .

(৩) অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে।

(৪) অবৈধ সংগম বৃদ্ধি পাবে। নির্লজ্জভাবে গরু-ছাগলের মত রাস্তাঘাটে অবৈধ সংগম করা হবে। বড়-ছোটের কোন মান-সম্মান থাকবেনা।

(৫) পুরুষ কম ও মহিলা বেশী হবে। একজন পুরুষের ভাগে পঞ্চাশজন মহিলা পড়বে।

(৬) বড় দাজ্জাল ব্যতীত আরও ত্রিশজন দাজ্জাল আবির্ভাব হবে। ওরা সবাই নবুয়াত দাবী করবে অথচ নবুয়াত খতম হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের আবির্ভাবও হয়েছে, যেমন মুসায়লামা কাজ্জাব, তলহা ইবনে খোয়েলিদ, আসওয়াদ আনসী, সাজাহ (অবশ্য সে পরে মুসলমান হয়েছিল), গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রমুখ আর যারা বাকী আছে তারা নিশ্চয় আবির্ভাব হবে।

(৭) ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ফোরাত নদী নিজের গুপ্ত ধন ভাণ্ডার খুলে দেবে, যার ফলে সোনার পাহাড় গড়ে উঠবে। (মিশকাত ৪৬৯ পৃঃ)

(৮) আরব দেশে ক্ষেত-বাগানের সমারোহ দেখা দেবে এবং মরুভূমির মধ্যে দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত হবে।

(৯) হাতের তালুতে জ্বলন্ত কয়লা রাখার মত ধর্মের উপর অটল থাকাটা খুবই কঠিন হবে। এমনকি মানুষ কবরস্থানে গিয়ে আরজ করবে, হায়! আমি যদি কবরবাসী হতাম (এ ফিতনা থেকে রক্ষা পেতাম)।

(১০) সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। বছরকে মাসের মত, মাসকে সপ্তাহের মত এবং সপ্তাহকে দিনের মত মনে হবে। আর দিনকে এমন মনে হবে যেমন কোন কিছুতে আগুন লাগছে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে জ্বলে পুড়ে খতম হয়ে গেছে অর্থাৎ খুবই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।

(১১) মানুষ যাকাত প্রদানের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে এবং এটাকে ক্ষতি মনেকরবে।

(১২) লোক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে কিন্তু ধর্মের জন্য নয়, দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে।

(১৩) পুরুষ স্বীয় স্ত্রীর বাধ্য হবে।

(১৪) সন্তান মা-বাপের নাফরমানী করবে।

(১৫) সন্তান বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মেতে থাকবে এবং মা-বাপকে অবজ্ঞা করবে।

(১৬) মসজিদে লোকেরা শোরগোল করবে।

(১৭) গান-বাজনা বৃদ্ধি পাবে।

(১৮) পরের লোকেরা আগের লোকদের ভর্ৎসনা ও সমালোচনা করবে। (মুসলিম ৩৯৪ পৃঃ, মিশকাত ৪৭০ পৃঃ)

(১৯) হিংস্র জন্তুরা মানুষের সাথে কথা বলবে, চাবুকের চামড়া, জুতার তলি কথা বলবে। বাজারে যাবার পর ঘরে যা কিছু ঘটেছে তা বলে দিবে এমনকি স্বয়ং মানুষের রান ওকে জানিয়ে দিবে। (মিশকাত ৪৭১ পৃঃ) (২০) নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাদের ভাগ্যে পরনের কাপড় ও পায়ের জুতা জুটতোনা তারা বড় বড় অট্টালিকার মালিক হয়ে অহংকার করবে। (মুসলিম ২০ পৃঃ)

(২১) দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে চল্লিশ দিনের মধ্যে মক্কা-মদীনা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। এ চল্লিশ দিনের প্রথম দিন এক বছরের সমতুল্য হবে, দ্বিতীয় দিন একমাসের মত, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের মত মনে হবে এবং অবশিষ্ট দিনগুলি চব্বিশ ঘন্টা হিসেবে হবে। সে খুব দ্রুত গতিতে পরিভ্রমণ করবে যেমন বাতাস মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এর ফিত্‌নাটা খুবই মারাত্মক হবে। একটি বাগান ও একটি অগ্নিকুণ্ড যথাক্রমে বেহেশত ও দোযখ নামে ওর সাথে থাকবে। কিন্তু বাহ্যিক ভাবে যেটা দেখতে বেহেশতের মত মনে হবে,

আসলে সেটা হবে অগ্নিকুণ্ড আর যেটা জাহান্নাম বলা হবে, সেটা হবে আরামের জায়গা। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। যে তার প্রতি ঈমান আনবে, তাকে তার সঙ্গে রক্ষিত কথিত বেহেশতে দেয়া হবে এবং যে অস্বীকার করবে তাকে কথিত জাহান্নামে দেয়া হবে। (মিশকাত ৪৭৩ পৃঃ)

সে মৃতকে জীবিত করবে, তার নির্দেশে জমীন থেকে শস্য উৎপন্ন হবে, আসমান থেকে পানি বর্ষিত হবে, মানুষের গৃহপালিত পশু হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী হয়ে যাবে। সে যখন অনাবাদী স্থান দিয়ে যাবে, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি মধু পোকার ঝাঁকের মত তার পেছন পেছন ছুটবে। এ রকম আরও অনেক কিছু দেখাবে। আসলে এসব যাদুরই কারসাজি এবং শয়তানের তামাশা; এর সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্যে সে চলে যাওয়ার পর মানুষের কাছে কোন নিদর্শন থাকবেনা। মক্কা-মদীনায় সে প্রবেশ করতে চাইবে। কিন্তু ফিরিশতা তার মুখ ফিরিয়ে দেবেন। (মিশকাত ৪৭৫ পৃঃ)

অবশ্য মদীনা শরীফে তিনবার ভূমিকম্প হবে এবং ওখানকার মুনাফিকরা দাজ্জালের উপর ঈমান আনবে এবং ভূমিকম্পের ভয়ে মদীনা শরীফের বাইরে চলে যাবে এবং দাজ্জালের সাথে যোগ দেবে। ইহুদীগণ দাজ্জালের ফৌজ হিসেবে থাকবে। দাজ্জালের কপালে আরবীতে লিখা থাকবে ك ف ر কাফ, ফে, রে অর্থাৎ কাফির। মুসলমানেরা এ লিখা পড়তে পারবে কিন্তু কাফিরেরা কিছু দেখবেনা।

যখন দাজ্জাল সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে সিরিয়ায় পৌছবে, এ সময় হযরত মসীহ (আঃ) আসমান থেকে দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারে অবতরণ করবেন। সেই সময় মসজিদে ফজরের জামাতের জন্য ইকামত বলা হবে; তিনি জামাতে শামিল হবেন এবং মুসাল্লীদের অনুরোধে তিনি নামায পড়াবেন; ঐ সময় সেই অভিশপ্ত দাজ্জাল হযরত ঈসা (আঃ) এর নিঃশ্বাসের সুগন্ধে পানিতে লবণ গলার মত গলতে থাকবে। যতদূর তাঁর দৃষ্টি যাবে, ততদূর নিঃশ্বাসের সুগন্ধ পৌছবে। দাজ্জাল তখন পালাতে চেষ্টা করবে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) তার পিছু নিবেন এবং তার পৃষ্ঠদেশে তীর নিক্ষেপ করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবেন। (মিশকাত ৪৭৩ পৃঃ, ইবনে মাজা ২৯৮ পৃঃ)

(২২) আসমান থেকে হযরত ঈসা (আঃ) এর অবতরণের ধরণটা উপরে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর যুগে মানুষের ধন সম্পদ খুব বেশী হবে।

এমনকি কেউ কাকে কিছু দিতে চাইলে, গ্রহণ করবেনা। তখন পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ একেবারে থাকবেনা। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন এবং শুকর হত্যা করবেন। সমস্ত আহলে কিতাব, যারা হত্যা থেকে রক্ষা পাবে, তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঈমান আনবে। (মিশকাত ৪৭৯ পৃঃ)

সারা বিশ্বে একমাত্র ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মযহাবে আহলে সুন্নাত ব্যতীত আর কোন মযহাব থাকবেনা। সাপ নেউলে একসাথে খেলবে, বাঘ ছাগল একসাথে আহার করবে। তিনি চল্লিশ বছরকাল রাজত্ব করবেন এর মধ্যে তিনি বিবাহ করবেন এবং ছেলে মেয়ে হবে। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁকে হুযূর আলাইহিস সালামের রওজা পাকের পার্শ্বে দাফন করা হবে। (মিশকাত ৪৮০ পৃঃ)

(২৩) হযরত ইমাম মাহ্দী (রাঃ) এর আবির্ভাব হওয়ার মোটামুটি ঘটনাটা হলো- যখন পৃথিবীর সব জায়গায় কাফির ক্ষমতাসীন হবে, তখন সমগ্র পৃথিবী হতে সমস্ত আবদাল, আওলিয়া কিরাম হেরমাইন শরীফাইনে হিজরত করবেন। শুধু সেখানেই ইসলাম থাকবে, বাকী সব জায়গা কুফর স্থানে পরিণত হবে। তখন রমাযান মাস হবে। আবদালগণ কাবা শরীফ তওয়াফ করতে থাকবেন; হযরত ইমাম মাহ্দী (রাঃ)ও তাঁদের সাথে থাকবেন। আওলিয়া কিরাম তাঁকে দেখে চিনে ফেলবেন। এবং তাঁর থেকে বাইয়াত হতে চাইবেন। কিন্তু তিনি ধরা দিবেন না। তখন গায়েব হতে আওয়াজ আসবে-

هٰذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا

(ইনি আল্লাহর খলিফা ইমাম মাহ্দী; তাঁর কথা শোন এবং তাঁর আদেশ পালন কর। তখন সবাই তাঁর পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। (মিশকাত ৪৭১ পৃঃ;

সেখান থেকে তিনি সকলকে সাথে নিয়ে সিরিয়ায় তশরীফ নেবেন। সে সময় হযরত ঈসা (আঃ) তথায় অবস্থান করবেন। দাজ্জালকে কতল করার পর তাঁর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হবে- মুসলমানদেরকে তুর পাহাড়ে নিয়ে যাও, কেননা কিছু সংখ্যক এমন লোক বের হবে, যাদের সাথে মুকাবেলা করার কারো ক্ষমতা থাকবেনা। (মুসলিম ২য় খন্ড ৪০১ পৃঃ)

(২৪) মুসলমানগণ তুর পাহাড়ে যাবার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। তাদের সংখ্যা এত অধিক হবে যে তাদের প্রথম দলটি বহিরায়ে তিবরিয়া নামক

হ্রদের (যার দৈর্ঘ্য দশ মাইল) পানি পান করে এমনভাবে শুকিয়ে ফেলবে যে পরবর্তী দল এসে কল্পনাও করতে পারবে না যে তথায় পানি ছিল। তারা পৃথিবীতে ঝগড়া বিবাদ, হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি থেকে যখন অবসর হবে, তখন বলবে পৃথিবীবাসীতো হত্যা করলাম, এবার আসমানবাসীকে হত্যা করতে হবে। এরপর তারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। খোদার কুদরতে তাদের তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে উপর থেকে ফিরে আসবে। তারা এ অবস্থায় থাকবে আর ঐদিকে তুর পাহাড়ে হযরত ঈসা (আঃ) সাথীদের পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকবেন। তাঁরা এমন অভাবে পতিত হবেন যে, তখন একটি গরুর মাথার মূল্য তাঁদের কাছে শত স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও অধিক মূল্যবান হবে। সেই সময় সাথীদেরকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রুপক্ষের গর্দানে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করবেন, যার ফলে সবাই একই সাথে মরে যাবে। ওদের মারা যাবার পর হযরত ঈসা (আঃ) পাহাড় থেকে অবতরণ করে দেখতে পাবেন সমগ্র যমীন তাদের লাশ ও দুর্গন্ধে ভরপুর, কোথাও কিঞ্চিত পরিমাণ জায়গা খালি নেই। হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় সাথীদের নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার পাখী পাঠাবেন। এ পাখীগুলো তাদের লাশগুলো অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে ফেলে দেবে। মুসলমানেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাত বছর জ্বালিয়ে শেষ করবে। এরপর বর্ষা আরম্ভ হবে এবং যমীনকে সমান করে ফেলবে অতঃপর যমীনকে নির্দেশ দেয়া হবে- 'অধিক ফসল ফলাও, আগের সেই বরকত ফিরিয়ে দাও'। আসমানকে নির্দেশ দেয়া হবে- পূর্ণ বরকত সহকারে বর্ষণ কর। তখন অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, একটি আনার অনেক লোকে খেয়ে শেষ করতে পারবেনা এবং এর খোলশের ছায়ায় দশজন লোক বসতে পারবে। দুধের মধ্যে এমন বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রির দুধ একদল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ বংশের সবাই পান করতে পারবে আর একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবার পরিতৃপ্তিসহকারে পান করতে পারবে। (মুসলিম ২য় খণ্ড ৪০২ পৃঃ, তিরমিযী ৩২৫পৃঃ)

(২৫) এক প্রকার ধোঁয়া বের হবে, যার ফলে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েযাবে।

(২৬) এ সময় দাব্বাতুল আরদ বের হবে। এটি এক প্রকার জন্তু বিশেষ। এর হাতে হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি ও হযরত সুলায়মান (আঃ) এর আংটি থাকবে। লাঠিদ্বারা প্রত্যেক মুসলমানের কপালে একটি নুরানী নিশান তৈরী করবে আর আংটিদ্বারা প্রত্যেক কাফিরের কপালে একটি জঘন্য কাল দাগ দিবে। ঐ সময় প্রত্যেক মুসলমান ও কাফিরকে প্রকাশ্যভাবে চেনা যাবে। এ চিহ্ন কখনও পরিবর্তন হবেনা। কাফির কখনও ঈমান আনবে না আর মুসলমান ঈমানের উপর অটল থাকবে। (ইবনে মাজা ১৯৫ পৃঃ)

(২৭) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। এ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় ইসলাম গ্রহণ করলে তা অগ্রাহ্য হবে। (মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড ৪০৪ পৃঃ, মিশকাত ৪৬৫ পৃঃ)

(২৮) হযরত ঈসা (আঃ) এর ইন্তেকালের পর যখন কিয়ামত হওয়ার বাকী আর মাত্র চল্লিশ বছর থাকবে, তখন এক প্রকার সুগন্ধময় ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত হবে, যা মানুষের বগলের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। এর দ্বারা মুসলমানের জান কবজ হয়ে যাবে। তখন শুধু কাফিরগণই বেঁচে থাকবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে।

কিয়ামতের এ কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করা হলো, এর মধ্যে কিছু প্রকাশ পেয়েছে এবং কিছু এখনও বাকী আছে। সব লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর ও সুগন্ধময় শীতল বাতাসে সকল মুসলমানের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে ঐ সময় কারো কোন ছেলে পিলে হবে না অর্থাৎ কিয়ামতের দিন চল্লিশ বছরের কম বয়সী কেউ থাকবেনা এবং সারা দুনিয়ায় শুধু কাফির আর কাফিরই থাকবে। আল্লাহর বিশ্বাসী বলতে তখন কেউ থাকবেনা। লোকেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে, কেউ পানাহারে, কেউ শায়িতাবস্থায় থাকবে। হঠাৎ একদিন হযরত ইস্রাফিল (আঃ) কে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার নির্দেশ হবে। প্রথমেই শিঙ্গার আওয়াজ খুবই ছোট হবে, ক্রমে বড় হতে থাকবে। লোকেরা মনোযোগ দিয়ে সেই আওয়াজ শুনবে। পরে বেহুশ হয়ে পড়ে মারা যাবে। (মিশকাত ৪৮০ পৃঃ) আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত এমনকি শিঙ্গা, হযরত ইস্রাফিল ও সকল ফিরিশতাও ফানা হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ঐ সময় আর কিছু থাকবেনা। সেই সময় তিনি বলবেন- لمن الملك اليوم আজ কার রাজত্ব? অহংকারী ও জুলুমবাজেরা আজ কোথায়?

জবাব দেওয়ার মত কেউ আছ কি? অতঃপর নিজেই বলবেন- لله الواحد القهار (সর্বশক্তিমান একমাত্র আল্লাহরই রাজত্ব বিরাজমান।) পুনরায় আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, হযরত ইস্রাফিলকে জীবিত করবেন এবং শিঙ্গা তৈরী করে দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দিবেন। ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে আগে-পরের সমস্ত ফিরিশতা, মানুষ, জ্বীন ও পশু মওজুদ হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম হুযূর আলাইহিস সালাম রওজা মুবারক থেকে বের হবেন। তাঁর ডানে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও বামে হযরত উমর ফারুক থাকবেন। অতঃপর মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা তৈয়্যেবার কবরস্থানসমূহে যতজন মুসলমানকে দাফন করা হয়েছিল, তাঁদের সবাইকে সাথে নিয়ে তিনি হাশরের ময়দানে তশরীফ রাখবেন।

<u>১নং আকীদা</u> ঃ কিয়ামত নিশ্চয় হবে। যে অস্বীকার করবে, সে কাফির।

<u>২নং আকীদা</u> ঃ হাশর কেবল রূহের উপর হবেনা, বরং রূহ ও শরীর উভয়ের উপরেই হবে। যে বলে- রূহ উঠবে, শরীর জীবিত হবেনা, সেও কাফির।

<u>৩নং আকীদা</u> ঃ দুনিয়াতে যে রূহ যে শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, সেই রূহের হাশর সেই শরীরে হবে। এমন নয় যে, কোন নতুন শরীর সৃষ্টি করে সেই রূহের সাথে সংযোজন করা হবে।

<u>৪নং আকীদা</u> ঃ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদিওবা মৃত্যুর পর বিভক্ত হয়ে যায় বা বিভিন্ন পশুর পেটে চলে যায়, আল্লাহ তা'আলা সেসব বিচ্ছিন্ন অংশকে একত্রিত করে কিয়ামতের দিন উঠাবেন। কিয়ামতের দিন লোক নিজ নিজ কবর থেকে উলঙ্গ, খালি পা ও খতনাবিহীন অবস্থায় উঠবেন। এবং কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বাহনযোগে একাকী কোনটায় দুজন কোনটায় তিনজন, কোনটায় চারজন, আবার কোনটায় দশজন আরোহন করে হাশরের ময়দানে গমন করবে। (মিশকাত ৪৮৩ পৃঃ)

কাফিরগণ মাথা নীচু করে হাশরের ময়দানের দিকে ধাবিত হবে। কাউকে ফিরিশতাগণ গলা ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাবে, আর কাউকে আগুনের কুণ্ডে একত্রিত করবে। এ হাশরের ময়দান সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন ভূমিকে এমন সমতল করা হবে যে, একপ্রান্তে একটি সরিষাদানা রাখলে, অপর প্রান্ত থেকে তা সুস্পষ্ট দেখা যাবে আর তখন ভূমিটা তামার তৈরী হবে। সূর্য এক মাইল দূরত্বের মধ্যে হবে। হাদীছ বর্ণনাকারী বলেছেন যে, 'মাইল' বলতে সত্যকার মাইলের দূরত্বকে

বোঝানো হয়েছে, না সুরমার শলাইয়ের পরিমাণকে বোঝানো হয়েছে, তা তাঁর জানা নেই। যাহোক, মাইলের দূরত্বে হয়ে থাকলেওবা আর কত দূর। বর্তমান সূর্যের দূরত্ব চার হাজার বছরের পথ আর এখন সূর্যের পিঠটাই পৃথিবীর দিকে আছে। তা সত্বেও সূর্যের তাপে দুপুরে ঘর থেকে বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। আর সেদিন সূর্যের দূরত্ব হবে মাত্র এক মাইল এবং মুখটাও হবে আমাদের দিকে, তখন সূর্যের তাপ ও গরম কি রকম হবে, তা বলাই বাহুল্য। বর্তমান জমীনটা হচ্ছে মাটির, তা সত্বেও গরমের সময় মাটিতে খালি পা রাখা যায় না। আর ঐদিন যখন যমীনটা হবে তামার এবং সূর্যটাও হবে মাত্র এক মাইল দূরত্বে, তখন কি ধরণের গরম হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আল্লাহ থেকে পানাহ চাই! এত বেশী করে ঘাম বের হবে যে, যমীনের সত্তর গজ নীচে পর্যন্ত ভিজে যাবে। এর পর যমীন যা চুষে নিতে পারবেনা, তা উপরে জমে থাকবে। ঐ ঘাম কারো পায়ের গিরা, কারো হাঁটু, কারো কোমর, কারো বুক ও কারো গলা পর্যন্ত হবে। এ ঘাম কাফিরের মুখ পর্যন্ত পৌছে লাগামের মত হবে এবং এর মধ্যে হাবুডুবু খাবে। তখন কি ধরণের পিপাসা লাগবে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কারো মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কারো কারো জিহবা মুখ থেকে বের হয়ে আসবে এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃত পাপ অনুযায়ী এ শাস্তি ভোগ করবে। যারা সোনা-চান্দির যাকাত দেননি, তাদেরকে সেসব অলংকার খুবই গরম করে পাছায়, কপালে, ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। যারা পশুর যাকাত দেয়নি, ঐদিন সেসব পশু খুব তর-তাজা হয়ে এসে তাদেরকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে ও শিং দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে। মানুষের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলবে। এভাবে অন্যান্য অপরাধের বেলায়ও শাস্তি দেয়া হবে। সকলে এত মসিবতে থাকবে যে কারো প্রতি কারোর তাকাবার অবকাশ থাকবেনা। ভাই থেকে ভাই পালিয়ে যাবে, মা-বাপ ছেলে-মেয়ে ফেলে চলে যাব আর স্বামী বৌ-বাচ্চা থেকে পৃথক হয়ে জান বাঁচাবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মসিবত নিয়ে অস্থির থাকবে। কারো সাহায্য কেউ করতে পারবেনা। আদম (আঃ) কে হুকুম করা হবে- হে আদম দোযখীদেরকে পৃথক কর। তিনি আরয করবেন, কতজন থেকে কত পৃথক করবো। আদেশ হবে- প্রতি হাজার থেকে নয় শত নিরানব্বই জন। তখন ছেলেরা দুশ্চিন্তায় বৃদ্ধের মত হয়ে যাবে, গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর লোকদেরকে

নেশাগ্রস্তের মত মনে হবে, অথচ ভয়েই এ রকম হবে। আল্লাহর আযাব সত্যিই বড় কঠিন। এ আযাবের কোন সীমা থাকবেনা। তখন সবার মুখে বাঁচাও বাঁচাও রব উঠবে এসব আযাব ২/৪ ঘন্টা, বা ২/৪ দিন বা ২/৪ মাসের জন্যে হবেনা বরং এর থেকে অনেক বেশী সময়ের জন্যে হবে। পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য হবে কিয়ামতের দিন। (বুখারী শরীফ ৬৪২ পৃঃ)

একই অবস্থায় প্রায় অর্ধদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হাশরবাসীরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবে- তাদের এ মসিবত থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন একজন সুপারিশকারীর আশ্রয় নেয়া যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত সবাই পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, হযরত আদম (আঃ) আমাদের সবার পিতা, আল্লাহর কুদরতী হাতেই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে বেহেশতে স্থান দিয়েছেন এবং নবুয়াতের পদমর্যাদা দ্বারা ভূষিত করেছেন। তাঁর খেদমতেই আমাদের উপস্থিত হওয়া উচিত, তিনি আমাদেরকে ঐ মসিবত থেকে উদ্ধার করবেন। অতপর অনেক কষ্ট করে লোকজন তাঁর সমীপে উপস্থিত হবেন এবং আরয করবেন- হে আমাদের আদিপিতা, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় কুদরতী হস্তে তৈরী করেছেন এবং তাঁর পসন্দনীয় রূহ আপনার শরীরে স্থাপন করেছেন। ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন, বেহেশতে থাকার জন্য আপনাকে স্থান দিয়েছেন। আপনাকে সমস্ত কিছুর নাম শিখিয়েছেন এবং আপনি সফিউল্লাহ খেতাব পেয়েছেন। তাই আপনি কি আমাদের প্রতি একটু সুনজর দিবেন না? মেহেরবানী করে আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ মসিবত থেকে মুক্তি দেন। হযরত আদম (আঃ) বলবেন- আমার এ অধিকার নেই। আমি নিজের চিন্তায় অস্থির। আল্লাহ তা'আলা আজকে এমন গজব দিয়েছেন, অতীতে কখনও এরকম গজব দেননি এবং ভবিষ্যতেও দেবেন না। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। লোকেরা আরয করবেন- আপনিই বলুন, আমারা কার কাছে যাব? তিনি বলবেন, নূহ (আঃ) এর কাছে যাও। সে হচ্ছে প্রথম রসূল, তাকে পৃথিবীতে জনগণকে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন লোকেরা হযরত নূহ (আঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হবে এবং তাঁর ফযীলত বর্ণনা করে বলবে- আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করুন, যাতে আমরা এ মসিবত থেকে রেহাই পাই। তিনি বলবেন- এর উপযোগী আমি নই। আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তোমরা অন্য

কারো কাছে যাও। লোকেরা আরয করবে- আপনিই বলুন, আমরা কার কাছে যাব? তিনি বলবেন, তোমরা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহর কাছে যেতে পার। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। লোকেরা তাঁর কাছে যাবে কিন্তু তিনিও একই উত্তর দিবেন- আমি এর উপযোগী নই। আমি আমারই জন্য সন্দিহান। ওরা তখন হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে যাবে। তিনিও একই উত্তর দিবেন। সেখান থেকে তারা ঈসা (আঃ) এর কাছে আসবে। হযরত ঈসা (আঃ) ও একই উত্তর দিবেন। তখন লোকেরা হতাশ হয়ে বলবে- তাহলে এখন আমরা আর কার কাছে যাব? হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন- তোমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমীপে যাও। তাঁর দ্বারা তোমরা কৃতকার্য হবে। তিনি আজ নির্ভয়ে আছেন তিনি হলেন সমস্ত আদম সন্তানের সরদার। তিনি তোমাদের সুপারিশ করবেন। তিনি ওখানে আছেন, তোমরা সেখানে যাও। লোকেরা অনেক কষ্টে হুযূর আলাইহিস সালামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করবে- ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ তা'আলা আপনারই হাতে আমাদের মুক্তির ক্ষমতা দিয়েছেন। আজ আপনি নিশ্চিন্ত।" আরও অনেক ফযীলত বর্ণনা করার পর তারা আরয করবে- আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমরা বড় কষ্টে আছি, আমাদের জন্য সুপারিশ করুন এবং আমাদেরকে এ মসিবত থেকে উদ্ধার করুন। এর উত্তরে তিনি ইরশাদ ফরমাবেন- انا لها (আমিইতো এ কাজের জন্য) (আমিইতো সেই ব্যক্তি, যাকে তোমরা নানা জায়গায় তালাশ করেছ) এ বলে হুযূর আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে সিজদায় পতিত হবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ হবেঃ

يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ٥

(হে মুহাম্মদ, মস্তক উত্তোলন করুন, যা বলার আছে বলুন, আপনার কথা গ্রহণ করা হবে, যা কিছু চাওয়ার আছে চান, দেয়া হবে এবং আপনি সুপারিশ করুন, তা মনজুর করা হবে। (অন্য রেওয়ায়েতে আছে- وقل تطع (যা বলার আছে বলুন, গ্রহণ করা হবে।) অতঃপর সুপারিশের কাজ শুরু হবে। যার অন্তরে সরিষাদানার থেকেও কম পরিমাণ ঈমান থাকবে, সেও সুপারিশ থেকে বাদ পড়বে না। তার জন্যও সুপারিশ করে জাহান্নাম থেকে তাকে বের করে আনবেন। এমনকি যে সৎ নিয়তে মুসলমান হয়েছে কিন্তু তার কোন নেক আমল

নেই, তাকেও দোযখ থেকে বের করে আনবেন। হুযূর আলাইহিস সালামের সুপারিশের পর অন্যান্য নবীগণ স্বীয় উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। আওলিয়া কিরাম, শহীদগণ, আলেমগণ, হাফেজগণ ও হাজীগণ এমনকি ধর্মীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করবেন। নাবালক সন্তানেরা, যারা শৈশবে মারা গিয়েছিল, নিজের মা-বাপের জন্য সুপারিশ করবে। হাদীছ শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, উলামায়ে কিরামের কাছে এসে কেউ আরয করবেন, আমি আপনার ওযুর জন্য অমুক সময় পানি দিয়েছিলাম, কেউ বলবে -আমি আপনাকে ইস্তেন্জার জন্য ঢিলা এনে দিয়াছিলাম। তখন উলামায়ে কিরাম তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। (বুখারী শরীফ ১১০৭ পৃঃ, মিশকাত ৪৮৯ পৃঃ)

৫নং আকীদা ঃ হিসাব-নিকাশ যে হবে, তা সত্য। মানুষের আমল সমূহের হিসাব করা হবে।

৬নং আকীদা ঃ হিসাবের অস্বীকারকারী কাফির। কাউকে গোপনীয়ভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে- "তুমি কি এই এই কাজ করেছো?" সে আরয করবে "হ্যাঁ, হে প্রভু আমি এই এই কাজ করেছি।" এভাবে এদিকে সে মনে মনে ভাববে যে তার বুঝি রক্ষা নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমাবেন- আমি দুনিয়াতে তোমার পাপ গোপন করেছি এবং এখন ক্ষমা করে দিলাম। কাউকে জিজ্ঞাসা করা হবে বজ্রকণ্ঠে। এভাবে যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাদের রক্ষা নেই। কোন কোন লোককে জিজ্ঞাসা করা হবে- "ওহে অমুক, তোমাকে কি আমি সম্মানিত করিনি? নেতৃত্ব দান করিনি? তোমার জন্য কি ঘোড়া, উট ইত্যাদির ব্যবস্থা করিনি? এসব ছাড়া প্রদত্ত আরো অনেক নিয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করা হবে। সব কিছুর কথা সে স্বীকার করবে। পুনরায় যখন জিজ্ঞাসা করবে- আমার সামনে যে উপস্থিত হতে হবে, এটা কি তোমার স্মরণ ছিল? উত্তরে বলবে- 'জ্বীনা'। তখন আল্লাহ বলবেন- "তুমি যেমন আমাকে স্মরণ করনি, আমিও তেমন তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেছি"। (মিশকাত ৪৮৫ পৃঃ)

কতেক কাফিরকে যখন তাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর কি কি হক তারা আদায় করেছে, জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তারা বলবে, "আমরা তোমার উপর, তোমার কিতাব ও রসূলগণের উপর ঈমান এনেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি ও সদকা দিয়েছি।" এসব ছাড়া যতটুকু পারে, অন্যান্য নেক কাজের কথাও তারা বলতে থাকবে। তখন ইরশাদ হবে-

'যথেষ্ট হয়েছে, আর বলতে হবেনা, চুপ থাক। এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য নেয়া হবে।' তারা মনে মনে ভাববে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার কেউ নেই। তখন তাদের মুখ সীল করে দেয়া হবে ও তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নির্দেশ দেয়া হবে সাক্ষ্য দেবার জন্য। নির্দেশ মোতাবেক রান, হাত, পা, মাংস, হাড়, চোখ, কান ইত্যাদি তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন- আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের ওসীলায় প্রত্যেকের সাথে সত্তর হাজার করে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সংগে আরও তিনটি দল পাঠাবেন। এর সংখ্যা তিনিই জানেন। যারা তাহাজ্জুদ নামায পড়ে, তারাও বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। এ উম্মতের মধ্যে ঐ রকম লোকও থাকবে, যার পাপের পরিমাণ হবে নিরানব্বই বালাম আর এক একটি বালাম হবে এক চোখের পথের সমান। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন- এ ব্যাপারে তোমার কোনকিছু বলার আছে কি বা আমার ফিরিশতা কেরামান কাতেবীন তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছে কি? সে আরয করবে 'জ্বী না'। আল্লাহ পুনরায় বলবেন- তোমার কোন আপত্তি আছে কি? সে না সূচক উত্তর দিবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন- তোমার একটি নেকী আমার কাছে জমা আছে এর জন্য তোমার উপর আজ কোন জুলুম হবে না। সেই সময় তার সামনে একটি চিরকুট বের করবে, যেথায় লিখা থাকবে اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله এবং সেটা ওজন করার জন্য বলবেন। সে বলবে- হে খোদা, এটা আর কতটুকু হবে। তখন ঐ সমস্ত বালামকে এক পাল্লায় এবং উক্ত চিরকুট অপর পাল্লায় দিয়ে ওজন করা হবে। ওজনে চিরকুটের পাল্লা ভারী হবে। (মিশকাত ৪৮৬ পৃঃ) মোট কথা হলো আল্লাহর রহমতের কোন সীমা নেই। যার প্রতি রহমত করবেন, তার জন্য অল্পই অনেক কিছু হবে।

৭নং আকীদা ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমল নামা দেয়া হবে। নেককারদেরকে ডান হাতে, বদকারদেরকে বাম হাতে এবং কাফিরদের বুক চিড়ে বাম হাত পিছন দিকে বের করে আমলনামা দেয়া হবে। (মিশকাত-৪৮৬ পৃঃ)

৮নং আকীদা ঃ নবী করীম আলাইহিস সালামকে যে হাউজে কাউছার দান করা হয়েছে, তা সত্য। এ হাউজের পরিধি এক মাসের রাস্তার বরাবর। এর চারি পাড়ে মুক্তার আলোকবর্তিকা রয়েছে এবং চার কোণায় চারটি মনোরম স্তম্ভ

আছে। এর মাটি মেশ্‌ক থেকেও অধিক পবিত্র এবং পানি বিতরণের পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির সংখ্যা থেকেও অধিক। যে এর পানি পান করবে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। বেহেশত হতে দু'টি পাইপের মাধ্যমে সবসময় হাউজে পানি পতিত হয়। পাইপ দু'টির মধ্যে একটি স্বর্ণের এবং অপরটি চান্দির তৈরী। (মিশকাত ৫৮৭ পৃঃ)

৯নং আকীদা ঃ মীযান বা কিয়ামতের দিন আমলনামা পরিমাপ করার জন্য যে নিক্তি কায়েম করা হবে, তা সত্য। এর দ্বারা মানুষের নেক আমল ও বদ আমল পরিমাপ করা হবে। উল্লেখ্য যে নেকীর পাল্লা ভারী হওয়া মানে উপর দিকে উঠে যাওয়া, দুনিয়াবী হিসেবমত নীচের দিকে ঝুঁকে পড়া নয়।

১০নং আকীদা ঃ আল্লাহ তা'আলা হুযূর আলাইহিস সালামকে 'মকামে মাহমুদ' দান করবেন। আগের পরের সবাই হুযূরের গুণকীর্তন করবেন।

১১নং আকীদা ঃ হুযূর আলাইহিস্ সালামকে 'লেওয়ায়িল হামদ' নামক একটি ঝাণ্ডা দান করা হবে। সকল মুমিন= অর্থাৎ আদম (আঃ) থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই এর নীচে জমায়েত হবেন। (মিশকাত ৪৯০ পৃঃ)

১২নং আকীদা ঃ পুলসিরাত সত্য। এটি দোযখের উপর বিস্তৃত, চুল থেকেও সুক্ষ্ম ও তলোয়ার থেকেও তীক্ষ্ম একটি পুল। বেহেশ্‌তে যাবার এইটি-ই একমাত্র পথ। সর্বপ্রথম হুযূর আলাইহিস সালাম এর উপর দিয়ে পার হবেন। অতঃপর অন্যান্য আম্বীয়া কিরাম, এরপর হুযূরের উম্মত, তৎপর অন্যান্য উম্মতগণ এর উপর দিয়ে যাবেন। আমলের তারতম্য অনুসারে লোকেরা নানাভাবে পুলসিরাত পার হবে। কেউ বিজলীর চমকের মত পার হয়ে যাবে, কেউ প্রবল বায়ুর মত, কেউ উড়ন্ত পাখীর মত, কেউ ঘোড়দৌড়ের মত, কেউ মানুষের দৌড়ের মত, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ পিপীলিকার মত পার হয়ে যাবে। পুলসিরাতের দু'পার্শ্বে দুটি বড় আকারের আঁকশি ঝুলানো থাকবে। যেই ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম হবে, সেই ব্যক্তিকে ধরে ফেলবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষত বিক্ষত হয়ে রেহাই পাবে এবং কতেককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এক দিকে সমস্ত হাশরবাসী পুলসিরাত পার হতে ব্যস্ত থাকবে। আর অপরদিকে গুনাগারদের সুপারিশকারী আমাদের প্রিয় নবী হুযূর আলাইহিস্ সালাম তাঁর গুনাহগার উম্মতের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দু'আ করতে থাকবেন- رب سلم سلم (হে খোদা, তাদেরকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন) শুধু এ সময় নয়, ঐ দিন তিনি সর্বক্ষণ এদিক সেদিক

দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবেন। কোন সময় তিনি মিযানের কাছে তশরীফ নিয়ে যাবেন। আবার সাথে সাথে দেখতে পাবেন, তিনি হাউজে কাউছারের পাড়ে তশরীফ নিয়ে গেছেন এবং তৃষ্ণার্তদেরকে পানি পান করাচ্ছেন। ওখান থেকে তিনি আবার পুলসিরাত আসবেন এবং পড়ে যাচ্ছে এমন লোককে রক্ষা করবেন। মোট কথা ঐদিন তিনি সব জায়গায় আনাগোনা করতে থাকবেন। যেদিকে যাবেন সেদিকে লোকেরা তাকে আহবান করবে। এবং তাঁর সাহায্য কামনা করবে। তাঁকে ছাড়া আর কাকেই বা ডাকবে, সবাই তো তখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। একমাত্র তিনিই নিশ্চিন্ত এবং সমগ্র জাহানের দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত।

اَللّٰهُمَّ نَجِّنَا مِنْ اَهْوَالِ الْمَحْشَرِ بِجَاهِ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ ٥

কিয়ামতের দিবসটা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য। সেদিন অগণিত মসিবত নাযিল হবে। তবে যারা আল্লাহর খাস বান্দা, তাঁদের জন্য ঐ দিনটা এত হাল্কা করে দেয়া হবে, মনে হবে যেন এক ওয়াক্তের ফরয নামায পড়ার সমান সময় লেগেছে। এমন কি অনেকের কাছে এর থেকে আরও কম সময় মনে হবে। কারো জন্য চোখের পলকের মধ্যে সারা দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে।

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ

ঐদিন মুসলমানদের জন্য সর্বচেয়ে বড় নিয়ামত হবে আল্লাহর দীদার। এর সমতুল্য নিয়ামত আর কিছু নেই। যার ভাগ্যে একবার খোদার দীদার নসীব হবে, সে সর্বক্ষণ সেই ধ্যানে ডুবে থাকবে, কখনও ভুলবে না। আমাদের নবী করীম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আল্লাহর দীদার লাভ করবেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত হাশরের ভয়ভীতি সমূহ ও বাড়ন অবস্থাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। এবার সেসব আনুষ্ঠানিকতার পর স্থায়ী নিবাসে যাবার পালা। কেউ লাভ করবে শান্তি নিবাস, যার আরামের সীমা নেই, একেই বলে বেহেশত, আর কেউ লাভ করবে শাস্তি নিবাস, যার কষ্টের কোন সীমা নেই, একেই বলা হয় জাহান্নাম।

<u>১৩নং আকীদা</u> ঃ হাজার হাজার বছর আগে বেহেশত দোযখ তৈরী করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা মওজুদ আছে। এ রকম নয় যে এখনও তৈরী করা হয়নি, কিয়ামতের দিন তৈরী করা হবে।

<u>১৪নং আকীদা</u> ঃ বেহেশত ও দোযখ সত্য। এর অস্বীকারকারী কাফির।

<u>১৫নং আকীদা</u> ঃ কিয়ামত, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব, ছওয়াব, আযাব, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির অর্থ তা-ই, যা মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। যে ব্যক্তি ওগুলোকে হক বলে স্বীকার করে কিন্তু ওসবের নতুন অর্থ করে যেমন ছওয়াব অর্থ নিজের নেক আমল সমূহ দেখে সন্তুষ্ট হওয়া এবং আযাব অর্থ নিজের বদ আমল দেখে পেরেশান হওয়া বা কেবল রূহের হাশর হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করা, সে আসলে ওসবের অস্বীকার কারী এবং এ ধরনের লোক নিঃসন্দেহে কাফির।

বেহেশতের বর্ণনা

জান্নাত এমন একটি বাসস্থান, যা আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের জন্য তৈরী করেছেন। ওখানে এমন সব নিয়ামত রয়েছে, যা মুষ্টিমেয় আল্লাহর খাস বান্দা বিশেষ করে আমাদের নবী করীম আলাইহিস সালাম ছাড়া কেউ কখনো দেখেনি, শোনেনি, এমনকি কল্পনাও করেনি। এর বর্ণনার জন্য যেসব উদাহরণ দেয়া হবে, তা কেবল বোঝানোর জন্য। নচেৎ দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট জিনিষও বেহেশতের কোন সাধারণ জিনিষের সাথেও তুলনা হয় না। সেখানকার কোন মহিলা যদি দুনিয়ার দিকে একটু উঁকি মেরে দেখে, তাহলে জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে, সমগ্র এলাকা সুগন্ধময় হয়ে যাবে। এবং চাঁদ-সূর্যের আলো নিস্প্রভ হয়ে যাবে। ওদের ওড়নার সাথে তুলনা করার মতও দুনিয়াতে কিছু নেই। (মিশকাত ৪৯৫ পৃঃ)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, যদি কোন হুর জমীন ও আসমানের মাঝখানে হাতটি বের করে, তাহলে এর সৌন্দর্যের মোহে দুনিয়ার সবাই মাতোয়ারা হয়ে যাবে, আর ওড়নাটা প্রদর্শন করলে এর রূপের সামনে সূর্য এমন হয়ে যাবে, যেমন সূর্যের সামনে চেরাগ। বেহেশতের নখ পরিমাণ কোন জিনিষও যদি দুনিয়াতে প্রকাশ করা হয়, তাহলে আসমান-জমীনের সবকিছু এর দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে। এবং বেহেশতের কোন মহিলার কঙ্কণ যদি দুনিয়াতে প্রদর্শিত হয়, তাহলে সূর্যের আলো এমনভাবে নিস্প্রভ হয়ে যাবে, যেমনি ভাবে সূর্যের দ্বারা তারকারাজির আলো বিলীন হয়ে যায়। (মিশকাত ৪৯৭ পৃঃ)

বেহেশতের একটি লাঠি রাখার পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া ও দুনিয়াবী সব কিছু থেকে উৎকৃষ্ট।

বেহেশতের আয়তন সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলই জানেন। তবে মোটামুটি ভাবে এতটুকু বর্ণিত আছে যে, এক একটি বেহেশতের একশটি দরজা হবে এবং প্রত্যেক দরজার আয়তন হবে আসমান-জমীনের দূরত্বের সমতুল্য। আর যে দরজার রেওয়ায়েত স্মরণ নেই, সেটার আয়তন কতটুকু, তা বলা মুস্কিল। তবে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীছের রেওয়ায়েত থেকে জানা

যায় যে, সমস্ত বিশ্বের জন্য একটি দরজাই যথেষ্ট। বেহেশতে এমন একটি গাছ আছে যার ছায়া কোন দ্রুতগামী ঘোড় সওয়ারী একশ বছরেও অতিক্রম করতে পারবেনা। বেহেশতের দরজা সমূহ এত প্রশস্ত হবে যে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার পক্ষে দরজার এক পার্শ্ব থেকে আর এক পার্শ্বে যেতে সত্তর বছর সময় লাগবে। তবুও প্রবেশকারীদের এত ভিড় হবে যে এদিক সেদিক ফেরার অবকাশ থাকবে না। বেহেশতের দরজা অতি ভিড়ের কারণে মরমর শব্দ করবে। ওখানে নানা প্রকারের মনিমুক্তা খচিত প্রাসাদ সমূহ রয়েছে। সেগুলো এমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে বাইর থেকে ভেতরের অংশ এবং ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায়। বেহেশতের দেয়ালগুলো সোনা-চাঁদির ইট ও মেশকের সিমেন্ট দ্বারা তৈরী। একটি স্বর্ণের ইটের পর একটি চাঁদির ইট এভাবে দেয়ালের গাঁথুনি হয়েছে। আর প্রাসাদের মেঝটা হচ্ছে জাফরান ও মণিমুক্তার পাথর দ্বারা তৈরী। (মিশকাত ৭৯৭ পৃঃ)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে আদন বেহেশতের দালানের একটি ইট শ্বেত বর্ণ মুক্তার, অপরটি লাল ইয়াকুত পাথরের, আর একটি জমরূদ বা পাতলা সবুজ পাথরের এবং এগুলোকে মেশক দ্বারা জোড়া লাগানো থাকবে। বেহেশতে ঘাসের পরিবর্তে জাফরানই থাকবে আর মাটিটা হবে মুক্তার কঙ্কর ও আম্বর দ্বারা তৈরী। বেহেশতে ষাট মাইল উচ্চতা বিশিষ্ট মুক্তা খচিত একটি তাঁবু থাকবে। (মিশকাত ৪৯৬ পৃঃ)

বেহেশতে যথাক্রমে পানি, দুধ, মধু ও শরাবের চারটি সাগর আছে। এসব সাগর থেকে ছোট-ছোট নদী উৎপত্তি হয়ে প্রতিটি প্রাসাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ওখানকার নদীনালা মাটি খনন করে প্রবাহিত হবে না বরং মাটির উপর দিয়েই প্রবাহিত হবে। এর এক পার্শ্ব হবে মুক্তার তৈরী এবং অপর পার্শ্ব হবে ইয়াকুত পাথরের তৈরী। আর মাটিটা খাঁটি মেশকের তৈরী। ওখানকার শরাব দুনিয়ার শরাবের মত নয়। দুনিয়ার শরাবে দুর্গন্ধ ও নেশা আছে; শরাবীগণ হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও রাস্তাঘাটে মাতলামী করে। এসব থেকে বেহেশতী শরাব মুক্ত ও পবিত্র। বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে সব রকমের মজাদার খাবার পাবে। যে টা খেতে ইচ্ছে করবে, সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে উপস্থিত হয়ে যাবে। কোন পাখী দেখে যদি এর মাংস খেতে ইচ্ছে হয়, তখনই ওটা ভুনা মাংস হয়ে সামনে এসে যাবে। পানি ইত্যাদি পান করার চাহিদা মোতাবেক পানি বা দুধ বা শরাব

অথবা মধু হবে। চাহিদার অতিরিক্ত এক ফোঁটাও হবেনা। পান করার পর নিজ থেকেই যেখান থেকে এসেছে, সেখানে চলে যাবে। বেহেশতে ময়লা-আবর্জনা, পায়খানা-প্রস্রাব, থুথু, নাক-কানের ময়লা কিছুই থাকবে না। (মিশকাত ৪৯৬ পৃঃ)

খাওয়ার পর এক প্রকার তৃপ্তিদায়ক ঢেকুর আসবে এবং সুগন্ধময় ঘাম বের হবে। তদ্বারা খাদ্য হজম হয়ে যাবে। ঢেকুর ও ঘাম থেকে মেশকের সুগন্ধি বের হবে। প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে একশ জন পুরুষের পানাহার ও সহবাসের শক্তি দেয়া হবে। (মিশকাত ৪৯৭ পৃঃ)

প্রত্যেক বেহেশতীর মুখ থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অনবরত তসবীহ ও তকবীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বের হতে থাকবে। প্রত্যেকের জন্য কমপক্ষে দশ হাজার খাদেম নিয়োজিত থাকবে এবং প্রতি খাদেমের এক হাতে চাঁদির আর এক হাতে সোনার পেয়ালা থাকবে। প্রতিটি পেয়ালায় নতুন নতুন রং বেরং এর সুস্বাদু খানা থাকবে। ওখান থেকে যতটুকু খান না কেন, স্বাদ কমবে না বরং আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি পেয়ালায় সত্তর রকম স্বাদের নাস্তা থাকবে এবং কোনটার সাথে কোনটার মিল থাকবে না। আবার কোনটার দ্বারা কোনটা অতৃপ্তিকরও মনে হবেনা। বেহেশতবাসীদের পোষাক পুরান হবেনা এবং তাদের যৌবনও ক্ষয় হবেনা। (মিশকাত ৪৯৬ পৃঃ)

প্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয় দলের চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত হবে। বেহেশতবাসীগণ সবাই একমতেই থাকবে, তাদের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবেনা। প্রত্যেকের জন্য হুরদের মধ্যে কমপক্ষে দু'জন স্ত্রী এরকম হবে, সত্তর জোড়া কাপড় পড়লেও বাইর থেকে তাদের হাড়ের মগজ পর্যন্ত দেখা যাবে, যেমন কাঁচের গ্লাসে লাল শরবত দেখা যায়। এ দৃষ্টান্তটা এ কারণেই দেখা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে ইয়াকুত পাথরের সাথে তুলনা করেছেন এবং ইয়াকুত পাথরে ছিদ্র করে যদি ডোরা প্রবেশ করানো হয়, তা বাইর থেকে দেখা যায়। মানুষ নিজের চেহারা হুরের কপালে আয়না থেকে পরিষ্কার দেখবে। তাদের পোষাকে সর্বনিকৃষ্ট যে মুক্তা হবে, তাও দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, যদি কোন পুরুষ স্বীয় হাত ওর কাঁধের মাঝখানে রাখে, তাহলে বুকের দিকটা কাপড়-চোপড়ের বাহির

থেকে সুস্পষ্ট দেখা যাবে। বেহেশতী কোন পোষাক যদি দুনিয়াতে পরা হয়, তাহলে যে দেখবে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কারণ পার্থিব মানুষের দৃষ্টি শক্তি তা সহ্য করতে পারবেনা। পুরুষ যতবারই সে হুরের কাছে যাবে, ততবারই ওকে কুমারী মনে হবে এবং এর জন্য কারো কোন কষ্ট হবে না। যদি কোন হুর সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে, তাহলে ওর থুথুর মধুরতায় সমুদ্রের সব পানি মিষ্ট হয়ে যাবে। অন্য আর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, যদি বেহেশতের কোন মহিলা সাত সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে, তাহলে সমুদয় পানি মধু থেকেও মিষ্ট হয়ে যাবে। যখন কোন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন তার শিয়রে ও পদপার্শ্বে দু'জন হুর একান্ত মধুর স্বরে গজল পরিবেশন করবে। কিন্তু ওদের গান বর্তমান প্রচলিত শয়তানী গানবাদ্যের মত হবেনা। বরং আল্লাহ তা'আলার গুণকীর্তনই হবে ওদের গানের বিষয়বস্তু। ওদের কণ্ঠস্বর এত মধুর হবে যে সেইরকম কণ্ঠস্বর দুনিয়াতে কখনও শোনা যায়নি। তাদের গানের কিয়দাংশ নিম্নরূপঃ- আমরা চিরস্থায়ী, চির অমর, আমরা কখনও দুঃখী নই; সদা আরামদায়ক। আমরা চির সন্তুষ্ট, কখনও অসন্তুষ্ট হবোনা। আমরা যাদের এবং যারা আমাদের, তাদের প্রতি ধন্যবাদ। (মিশকাত ৫০০ পৃঃ) বেহেশতবাসীগণের মাথার চুল, চোখের ভ্রু ও পালক ব্যতীত শরীরের আর কোন জায়গায় লোম থাকবেনা। তাদের চোখ দু'টি হবে কাজল মাখা। তাদেরকে কখনও ত্রিশ বছরের অধিক বয়স্ক মনে হবেনা। (মিশকাত ৪৯৮ পৃঃ)

সর্বনিকৃষ্ট বেহেশতবাসীর আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন বিবি হবে এবং ওদেরকে মুক্তাখচিত এমন মুকুট প্রদান করা হবে, যার নিম্নমানের মুক্তা সারা দুনিয়া আলোকিত করে দেবে। কোন মুসলমান সন্তান কামনা করলে, সাথে সাথেই গর্ভধারণ, প্রসব এবং পূর্ণবয়স্ক সন্তান পেয়ে যাবে। (মিশকাত ৫০০ পৃঃ)

বেহেশতের মধ্যে কোন ঘুম নেই। কেননা এটা এক প্রকার মৃত্যু! বেহেশতে কোন মৃত্যু নেই। বেহেশতের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী মর্যাদা পাবে। আল্লাহর মেহেরবানীর কোন সীমা নেই। এক সপ্তাহ বিশ্রামের পর আল্লাহর দীদারের অনুমতি দেয়া হবে; আল্লাহর আরশ প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের একটি বাগানে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করবেন। বেহেশতবাসীগণের জন্য নূর, মুক্তা, ইয়াকুত, জমরুদ ও সোনা-চাঁদির তৈরী বিভিন্ন আসন স্থাপন করা হবে। সর্ব নিকৃষ্ট বেহেশতবাসীগণ মেশ্‌ক ও কাফুরের

তৈরী আসনে উপবেশন করবে। তবে কারো মনে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টের ধারণা সৃষ্টি হবে না। আল্লাহর দীদারটা এমন স্পষ্ট হবে, যেমন সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদকে প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে দেখতে পায়। আর দেখার বেলায় কারো দ্বারা কারোর অসুবিধা হবে না। আল্লাহ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, হে অমুকের ছেলে অমুক, তোমার কি স্মরণ আছে যে তুমি দুনিয়াতে এ রকম এ রকম গুণাহ করেছিলে? তখন বান্দা আরয করবে- হ্যাঁ, তবে হে খোদা, আপনি কি আমাকে মাফ করে দেন নি? আল্লাহ তখন বলবেন, হ্যাঁ, মাফ করার ফলেইতো তুমি আজ এ মর্যাদা লাভ করেছ। এ শুভ সাক্ষাৎকারটা এমন পরিবেশে হবে যে উপরে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এবং এমন সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে, যা লোকেরা কখনো পায়নি। সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হবার পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা ওদিকে যাও, আমি তোমাদের মান-সম্মান অনুসারে ওখানে একটা বাজার তৈরী করেছি। তখন লোকেরা সেই বাজারের দিকে যাবে। বাজারটি ফিরিশ্‌তা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। সেই বাজারে এমন সব জিনিষ থাকবে, যা কখনও কেউ চোখে দেখেনি, কানেও শুনেনি, এমনকি কারো কল্পনাতেও আসেনি। কোন বেচা-কেনা হবেনা, যা ইচ্ছা তা পেয়ে যাবে। বেহেশ্‌তবাসীরা সেই বাজারে পরস্পর মিলিত হবে। নিম্নমর্যাদাশালী উচ্চ মর্যাদাশালীর সাক্ষাৎ পাবে এবং ওদের পোষাক পরিচ্ছদ মনঃপুত হবে কিন্তু পরক্ষণেই নিজের পোষাক নিজের কাছেই খুবই ভাল লাগবে। কেননা বেহেশতে আফসোস করার কিছু থাকবেনা। অতঃপর তারা নিজ নিজ প্রাসাদে ফিরে আসবে। তাদের বিবিগণ অভ্যর্থনা জানাবে এবং মুবারকবাদ দিয়ে বলবে 'আপনার সৌন্দর্য আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে'। উত্তরে সে বলবে- "আল্লাহর দরবারে আমার বসার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাই এ রকম হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল'। (মিশকাত ৪৯৯ পৃঃ)

বেহেশতবাসী একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে, একের আসন অপরের কাছে চলে যাবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ওদের কাছে উন্নতমানের বাহন বা ঘোড়া হাজির করা হবে। এবং এদের উপর আরোহণ করে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবে। নিম্নশ্রেণীর বেহেশত বাসী যারা, তাদের বাগান, বিবি, নেয়ামত, খাদেম ও আসন ইত্যাদি হাজার বছর দূরত্বের এলাকা জুড়ে

থাকবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান বেহেশ্‌তবাসী হলেন তাঁরা, যাঁরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর দীদার লাভ করবেন। যখন বেহেশতবাসী বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমাদের আরও কিছু চাওয়ার আছে? আরয করবে- 'আপনি আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়ে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ঐ সময় মানুষের সামনের পর্দা উঠে যাবে এবং আল্লাহর দীদার নসীব হবে। এর থেকেও বড় নিয়ামত আর কিছু হবেনা।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ بِجَاهِ حَبِيْبِكَ الرَّؤُفِ الرَّحِيْمِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اٰمِيْنَ ٥

দোযখের বর্ণনা

আল্লাহর কহর ও গজবের চূড়ান্ত প্রকাশস্থল হচ্ছে দোযখ। আল্লাহর রহমত ও নিয়ামতের যেমন শেষ নেই, তেমনি তাঁর কহরও গজবেরও শেষ নেই। এ আযাব সম্পর্কে মানুষ যা চিন্তা-ভাবনা করে, তা হচ্ছে প্রকৃত আযাবের এক বিন্দু মাত্র। কুরআন হাদীছে দোযখের শাস্তি সম্পর্কে যে ভয়াল বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এর মোটামুটি একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। যাতে মুসলমানেরা অনুধাবন করে এর থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং ওসব কার্যাবলী থেকে বিরত থাকে, যার পরিণাম জাহান্নাম। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, বান্দা যখন দোযখ থেকে পানা চায়, তখন দোযখ আল্লাহকে বলে- হে আল্লাহ। এতো আমার থেকে পানা চাচ্ছে, তুমি তাকে পানা দাও। কুরআন শরীফে অনেকবার বর্ণিত হয়েছে- 'জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক, দোযখকে ভয় কর'। আমাদের আকা মওলা হযূর আলাইহিস সালাম আমাদেরকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এর থেকে পরিত্রাণের জন্য বেশী করে প্রার্থনা করতেন।

জাহান্নামের অগ্নিশিখা,সুউচ্চ অট্টালিকার সম পর্যায়ে উঠবে। দূর থেকে মনে হবে যেন পাণ্ডু রং এর উটের পাল আসতেছে। মানুষ আর পাথরই হবে দোযখের ইন্ধন। (মিশকাত ৫০৬ পৃঃ)

তাপমাত্রার দিক দিয়ে দুনিয়ার আগুন হচ্ছে দোযখের আগুনের এক সত্তরাংশ। যার সর্বনিম্ন আযাব হবে, তাকে এক প্রকার আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, যার ফলে তার মাথার মগজ ডেক্‌সিতে ফুটন্ত পানির মত টগ্‌বগ্‌ করবে। তার মনে হবে যে তার উপরই সবচেয়ে বেশী আযাব হচ্ছে, অথচ তার আযাবটা খুবই নগণ্য। (মিশকাত ৬০২ পৃঃ)

যার প্রতি সবচেয়ে নগণ্য আযাব হবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন- আচ্ছা যদি সমস্ত দুনিয়া তোমার হয়ে যায়, তা কি তুমি এ আযাব থেকে রেহাই পাবার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে? সে আরয করবে- 'হাঁ নিশ্চয়'। আল্লাহ বলবেন- তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, আমি তোমাকে

এর জন্য অনেক সহজ কাজের নির্দেশ দিয়েছিলাম অর্থাৎ কুফরী না করার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তা শোননি। (মিশকাত ৫০৬ পৃঃ)

দোযখের আগুন হাজার বছর জ্বালানোর পর একেবারে লাল হয়ে গিয়েছিল, আবার হাজার বছর জ্বালানোর পর সাদা হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় হাজার বছর জ্বালানোর পর একেবারে কালো হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান সেই কালো অবস্থায় আছে; কোন আলোর নামগন্ধ নেই। (মিশকাত ৫০৩ পৃঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমাদের নবী করীম আলাইহিস্‌ সালামের কাছে কসম করে বর্ণনা করেছেন যে, যদি দোযখ থেকে সূঁচের মাথা বরাবর কিছু অংশ পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়, তাহলে সমস্ত পৃথিবীবাসী এর গরমে মারা যাবে। কসম করে আরো বলেছেন যে, জাহান্নামের দারোগা যদি দুনিয়াবাসীদের সামনে উপস্থিত হয়, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত বাসিন্দা এর ভয়ে মারা যাবে। তিনি কসম করে আরও বলেছেন যে, যদি দোযখ বাসীদের শিকলের একটি আংটা পৃথিবীতে পাহাড় সমূহের উপর রাখা হয়, তাহলে পাহাড় সমূহ কাঁপতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাহাড় জমিনের নীচে ধ্বসে যাবে। এ পৃথিবীর আগুনও (যার গরম ও উষ্ণতা সম্পর্কে কেবা অবগত নয় যে, গ্রীষ্মকালে এর কাছে যেতেও ভয় লাগে) খোদার কাছে প্রার্থনা করে যেন একে দোযখে ফিরিয়ে না নেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মানুষ জাহান্নামে যাবার কাজ করতেছে এবং সেই আগুনকে ভয় করছে না, যাকে দুনিয়ার আগুনও ভয় করে এবং এর থেকে পানাহ চায়।

দোযখের গভীরতা কতটুকু, তা আল্লাহই জানেন। তবে হাদীছ শরীফে এতটুকু বর্ণিত আছে যে, যদি বড় আকারের পাথর জাহান্নামের কিনারা থেকে তথায় নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সত্তর বছরেও তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু যদি মানুষের মাথার বরাবর একটি সীসার গোলা আসমান থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সন্ধ্যা হবার আগেই পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে। (মিশকাত)

অথচ এটা পাঁচশ বছরের পথ। আর ওখানে বিভিন্নস্তর, ভয়াল বনাঞ্চল ও কুয়া থাকবে। কতেক ভয়াল বনাঞ্চল এমন যে জাহান্নামও প্রতিদিন সত্তরবার থেকে অধিক এর থেকে পানা চায়। এটা কেবল দোযখের আকৃতি বর্ণিত হলো। এর মধ্যে অন্য আযাব না হলেও চলতো। কিন্তু কাফিরদের শাস্তির জন্য নানা রকম আযাবের ব্যবস্থা আছে। লোহার এমন ভারী মুগুর (গদা) দিয়ে

ফিরিশতাগণ ওদেরকে মারবে, সেই গদা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জ্বীন একত্রিত হয়েও উঠাতে পারবে না। বুখতি নামক বড় আকারের উটের গলার সমান এক একটি বিচ্ছু হবে আর সাপ যে কত বড় ও কি ধরণের বিষাক্ত হবে, আল্লাহই জানেন। একবার কামড় দিলে এর বিষক্রিয়া ও ব্যথা হাজার বছর পর্যন্ত থাকবে। (মিশকাত ৫০৩ পৃঃ)

পোড়া তেলের তলানীর মত ভীষণ উষ্ণ-ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে। এ পানি মুখের কাছে নিতেই এর গরমে মুখের চামড়া ঝলসে যাবে। তদুপরি মাথার উপর গরম পানি ঢালা হবে। দোযখবাসীদের শরীর থেকে পূঁজ বের হবে, তা তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে এবং কাঁটা ওয়ালা এক প্রকার গাছ তাদেরকে খেতে দেয়া হবে। ঐ গাছটা এ রকম হবে যে, এর যৎসামান্য দুনিয়াতে পতিত হলে দুনিয়ার সমস্ত খাদ্য দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত হয়ে যাবে। এ খাদ্য তাদের গলায় আটকে যাবে। তারা একে অপসারিত করার জন্য পানি চাইবে। তখন তাদেরকে সেই ফুটন্ত পানি দেয়া হবে, যা মুখের কাছে নিতেই মুখের চামড়া গলে সেই পানিতে পতিত হবে। আর পেটের মধ্যে যা ঢুকবে, তা নাড়িভুঁড়িকে টুকরা টুকরা করে দেবে এবং সুরুয়ার মত রান বেয়ে পতিত হবে। এ ধরণের পানির প্রতিও তারা পিপাসাকাতর উটের পালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতঃপর কাফিরেরা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পরস্পর শলা পরামর্শ করে দোযখের ফিরিশতা মালেক (আঃ) কে আহবান করে বলবে- 'আপনার খোদাকে বলুন, আমাদেরকে মেরে ফেলুক। তিনি এক হাজার বছর নিশ্চুপ থাকার পর বলবেন, আমাকে বলে লাভ কি, যার নাফরমানি করেছ, তাকেই বল। তখন তারা আল্লাহর বিভিন্ন গুণের প্রশংসা করে এক হাজার বছর পর্যন্ত ডাকতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ কোন উত্তর দেবেন না। এক হাজার বছর পর আল্লাহ যে উত্তরটা দেবেন, তা হলো- 'দূর হও, জাহান্নামে পড়ে থাক, আমার সঙ্গে কথা বল না'। তখন তারা সমস্ত আশা ভরসা থেকে নিরাশ হয়ে গাধার আওয়াজের মত চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করবে। প্রথম প্রথম চোখের পানি বের হবে। পানি শেষ হলে রক্ত বের হবে। কাঁদতে কাঁদতে চেহারায় গুহার মত গর্ত হয়ে যাবে। চোখের পানি, রক্ত ও পূঁজ এত অধিক হবে যে, এর উপর দিয়ে নৌকা চলাচল করতে পারবে। দোযখবাসীদের আকৃতি এমন বিভৎস হবে যে, যদি দুনিয়াতে সেই আকৃতির কোন জাহান্নামীকে আনা হয়, তাহলে দুনিয়ার

সমস্ত লোক তার বিকৃত চেহারা ও দুর্গন্ধের কারণে মৃত্যুবরণ করবে। ওদের শরীরকে এত বড় করে দেয়া হবে যে তাদের এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধের বিস্তৃতি হবে দ্রুত ঘোড়সওয়ারীর তিন দিনের পথ। এক একটি দাঁত ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য হবে। আর গায়ের চামড়ার পুরুত্ব হবে বিয়াল্লিশ হাত। ওদের জিহবা তিন-চার মাইল লম্বা হবে, যা মাটিতে হেঁচড়াতে থাকবে এবং অন্যরা পদদলিত করবে। মক্কা মদীনার দূরত্বের সমপরিমাণ হবে তাদের বসার জায়গা। (মিশকাত ৫০৩ পৃঃ)

তাদের মুখমণ্ডল হবে কুৎসিত, উপরের ঠোঁট অর্ধ মাথা পর্যন্ত উলটে থাকবে আর নীচের ঠোঁট নাভীর নীচে লটকে থাকবে।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নামে কাফিরদের শরীরে মানুষের আকৃতি থাকবে না। কেননা মানুষের আকৃতিটা হচ্ছে মনোরম এবং তা আল্লাহর পসন্দনীয়, বিশেষ করে তাঁর মাহবুবের চেহারা মুবারকটা হচ্ছে মানুষের আকৃতির। সুতরাং জাহান্নামীদের আকৃতি তা-ই হবে, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ রকম শাস্তির পরও তাদের নিস্তার নেই। পরিশেষে তাদেরকে তাদের পরিমাপ মত আগুনের বাক্সে বন্ধ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে এবং আগুনের তালা লাগানো হবে। পুনরায় সেই বাক্সকে আগুনের আর একটি বাক্সে রাখা হবে এবং উভয় বাক্সের মাঝখানে আগুন জ্বালানো হবে এবং তাতেও আগুনের তালা লাগানো হবে। এরপর অনুরূপ আর একটি বাক্সে রাখা হবে এবং তালা লাগানো হবে। তখন প্রত্যেক জাহান্নামী মনে করবে যে সে ব্যতীত আর কেউ দোযখে নেই। এটা হচ্ছে আযাবের উপর আযাব। এ রকম অবস্থায় সে সব সময় থাকবে। যখন সকল বেহেশতবাসী বেহেশতে চলে যাবে এবং দোযখে কেবল তারাই থাকবে যাদেরকে চিরদিন থাকতে হবে, তখন বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে ভেড়ার আকৃতিতে মৃত্যুকে এনে দাঁড় করানো হবে এবং বেহেশতবাসীদেরকে ডাকা হবে। বেহেশতবাসীরা তাড়াহুড়া করে উঁকি মেরে দেখবে এবং বেহেশত থেকে আবার বের হবার কোন নির্দেশ হলো কিনা, চিন্তা করবে। অতঃপর জাহান্নামীদেরকে ডাকা হবে। তারাও খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি উঁকি মেরে দেখবে এবং এ আযাব থেকে রেহাই পাবে বলে আশা

করবে। কিন্তু আসলে তা নয়। সকলকে জিজ্ঞাসা করা হবে ওটাকে চিনে কিনা। সবাই বলবে হ্যাঁ; এটা মৃত্যু। অতঃপর সেটিকে জবেহ করে দেয়া হবে এবং বেহেশতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে-তোমরা সব সময় বেহেশতে থাকবে, কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। দোযখবাসীদের লক্ষ্য করে বলবে-তোমরা সদা দোযখে থাকবে, কোন মৃত্যু নেই। ঐ সময় বেহেশতবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে আর দোযখবাসীরা হবে দুঃখে ভারাক্রান্ত।

نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

আমাদের উচিৎ দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও সাহায্য কামনা করা।

ঈমান ও কুফরের বর্ণনা

ঈমান হচ্ছে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা আর এর যে কোন একটার অস্বীকারকে কুফর বলা হয়, যদিওবা বাকী সবগুলো স্বীকার করে। (ফতওয়ায়ে শামী ৩য় খণ্ড ৩৯১ পৃঃ)

দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সেসব মাসায়েলকে বলা হয়, যা আলেম-আওয়াম প্রত্যেকে জানে। যেমন আল্লাহর একত্ব, নবীদের নবুয়্যত, জান্নাত, দোযখ, হাশর, নশর ইত্যাদি। হুযূর আলাইহিস্ সালামকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করাটাও ঈমানের অঙ্গ। আওয়াম বলতে সেসব মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে, যারা আলেম নয়, কিন্তু আলেমগণের সংস্রবে অনেক কিছু জানে এবং ধর্মীয় বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান রাখে। তবে যারা জংগলে বা পাহাড়ে থাকে এবং যারা কলেমাটাও শুদ্ধরূপে পাঠ করতে পারে না, তাদের এ অজ্ঞতার জন্য দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসায়েলকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলা যাবে না। অবশ্য তাদের মুসলমান হওয়ার জন্য এতটুকুই প্রয়োজন যে তারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহকে অস্বীকার করে না এবং ইসলামে যা কিছু আছে, সবকিছুকে হক মনে করে ও সমস্ত বিষয়ের উপর মোটামুটি ঈমান রাখে। (শামী-৩য় খণ্ড-৩৯১ পৃঃ)

১নং আকীদা ঃ মনে প্রাণে বিশ্বাস করাটাই হচ্ছে আসল ঈমান। দৈহিক আমল মূলতঃ ঈমানের অংশ নয়। ঈমান আনার পর কেউ যদি প্রকাশ করার সুযোগ পেল না, সে আল্লাহর কাছে মুমিন হিসেবে গণ্য। যদি প্রকাশ করার সুযোগ পেল, কিন্তু জানতে চাইলে অস্বীকার করলো, তা হলে সে কাফির। আর যদি কেউ জানতেও চাইলো না এবং সে প্রকাশও করলো না, তাহলে পার্থিব আহকাম অনুসারে কাফির মনে করা হবে। তার জানাযাও পড়া হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মুমিন হিসেবে গণ্য, যদি না তার থেকে ইসলাম বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পায়। (শামী-৩য় খণ্ড-৩৯২ পৃঃ)

২নং আকীদা ঃ মুসলমান হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে মুখে এমন একটি বিষয়ও অস্বীকার না করা, যা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যদিওবা

বাকী সবগুলো স্বীকার করে বা এ রকম বলে যে, কেবল মৌখিকভাবে অস্বীকার করা হয়েছে, আন্তরিকভাবে নয়। (ফতওয়ায়ে আলমগীরী-৩৬২ পৃঃ)

কেননা অজুহাতে কোন মুসলমানের মুখে কুফরী বাক্য প্রকাশ পেতে পারে না। সেই ব্যক্তিই এ ধরণের কথা বলতে পারে, যেই ব্যক্তির মনে যখন ইচ্ছা তখন অস্বীকার করার খেয়াল রয়েছে। কিন্তু ঈমান হচ্ছে এমন বিশ্বাস, যার বিপরীত কোন মনোভাব পোষণ করার অবকাশ নেই।

মাসআলা (১) ঃ যদি, খোদা না করুন, কুফরী বাক্য উচ্চারণ করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় অর্থাৎ হত্যা করা বা পঙ্গু করার বাস্তব হুমকী দেয়া হয় এবং হুমকীদানকারীকে এ ব্যাপারে যথার্থ মনে হয়, তাহলে এমন অবস্থায় কুফরী বাক্য বলা যেতে পারে। (শামী-৩য় খণ্ড ৩৯৪ পৃঃ)

কিন্তু শর্ত হলো যে অন্তরে আগের মত সেই ঈমানী শক্তি থাকতে হবে। তবে এ ধরণের না করে অর্থাৎ কুফরী কলেমা উচ্চারণ না করে মৃত্যুবরণ করাটা শ্রেয়।

মাসআলা (২) ঃ শারীরিক আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য এমন কতকগুলো আমস, যা সুস্পষ্টভাবে ঈমানের বিপরীত, সেগুলোর সমর্থনকারীকে কাফির বলা হবে, যেমন মূর্তি বা চাঁদ-সূর্যকে সিজদা করা, নবীকে হত্যা বা নবীর শানে বেআদবী করা, কুরআন শরীফ বা কাবা শরীফের বেইজ্জতী করা, কোন সুন্নাতকে হালকা মনে করা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে কুফরী। (শামী-৩য় খণ্ড ৩৯২ পৃঃ)

অনুরূপ কুফরীর আলামত হিসেবে চাহ্নিত কতেক কাজ যেমন পৈতা পরা, মাথায় টিকি রাখা, কপালে সিঁদুর দেওয়া ইত্যাদির অনুকরণকারীকে ফকীহগণ কাফির বলেছেন। কাজেই যারা উপরোক্ত কাজ করবে, তাদেরকে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণের এবং নিজ স্ত্রীর সাথে পুনরায় আক্‌দের নির্দেশ দিতে হবে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী-২৭২ পৃঃ)

৩নং আকীদা ঃ **সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত হালালকে হারাম বলা আর হারামকে হালাল বলা কুফরী। তবে শর্ত হলো যে, এ বলাটা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত হতে হবে এবং অস্বীকারকারীকে এ সুস্পষ্ট দলীল সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।**

মাসআলা (৩) ঃ **মূল আকীদার ক্ষেত্রে তকলীদ** (আনুগত্য) জায়েয নেই। কেননা এগুলো **সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা স্বীকৃত**, এতে কোন প্রকারের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। **অবশ্য কোন কোন** গৌণ আকাইদের ক্ষেত্রে তকলীদ (আনুগত্য) করা যেতে পারে। এ ভিত্তিতে স্বয়ং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে দুটি দল সৃষ্টি হয়েছে। একটি **হচ্ছে** হযরত আবুল মনসুর মাতুরিদি (রহঃ) এর অনুসারী মাতুরিদিয়া, অপরটি **হচ্ছে** হযরত ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী (রাঃ) এর অনুসারী আশয়ারী দল। উভয় দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী এবং উভয়টা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল কতেক খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে মাত্র। তাঁদের মতভেদ হানাফী শাফেয়ীর মত। কারো নিন্দা বা সমালোচনা করা যাবে না।

মাসআলা (৪) ঃ **ঈমান কম বেশী** হতে পারে না, কারণ কম-বেশী ঐ জিনিষে হতে পারে, যার দৈর্ঘ, প্রস্থ, বেড় বা সংখ্যা আছে। কিন্তু ঈমান হলো মনের বিশ্বাস অর্থাৎ মনের এক প্রকার সিদ্ধান্ত। কতেক আয়াতে যে ঈমান বেশী হওয়ার কথা উল্লেখিত আছে, এর দ্বারা সে ধরণের ঈমানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি উভয়টা রয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার যুগে ঈমানের কোন নির্ধারিত মাপকাঠি ছিল না, যখনই যেই হুকুম নাযিল হতো, সেটার উপর ঈমান আনতে হতো। এর দ্বারা মূল ঈমানের কোন পরিবর্তন হতো না। অবশ্য মন মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান মজবুত ও দুর্বল হতে পারে। যেমন হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর ঈমান সকল উম্মতের সমষ্টিগত ঈমান থেকেও মজবুত।

৪নং আকীদা ঃ ঈমান ও কুফরীর মধ্যে কোন আপোষ নেই, অর্থাৎ মানুষ হয়তো মুসলমান হবে অথবা কাফির। কাফিরও নয়, মুসলমানও নয়- এরকম কোন তৃতীয় শ্রেণী নেই।

মাসআলা (৫) ঃ কপটতা অর্থাৎ মুখে ইসলামের দাবী করা আর অন্তরে ইসলামকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কুফরী। এ ধরণের মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তর নির্ধারিত। হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে কিছু লোক এ ধরণের আচরণের জন্য মুনাফিক নামে চিহ্নিত হয়েছিল। ওদের গোপনীয় কুফরী মনোভাব কুরআন প্রকাশ করে দিয়েছিল। অধিকন্তু নবী করীম আলাইহিস সালাম স্বীয় অগাধ জ্ঞানের বদৌলতে প্রত্যেককে সনাক্ত করে ছিলেন এবং বলেছিলেন

এরা মুনাফিক। কিন্তু বর্তমান যুগে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে মুনাফিক বলা যায় না। আমাদের সামনে যে কেউ ইসলামের দাবী করলে তাকে মুসলমান হিসেবে মনে করতে হবে, যতক্ষণ না তার কথায় বা কাজে ঈমানের বিপরীত কোন কিছু প্রকাশ পায়। অবশ্য মুনাফিকীর কিছু লক্ষণ বর্তমান যুগের বদমযহাবীদের মধ্যে পাওয়া যায়। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে তারা ইসলাম দাবীর সাথে সাথে ধর্মের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়কে অস্বীকার করে।

৫নং আকীদা ঃ শিরক অর্থ খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে খোদা বা উপাস্য মনে করা। অর্থাৎ খোদার খোদায়িত্বে অন্য কাউকে অংশীদার করা। (শরহে আকাইদ-৫৭ পৃঃ)

এ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতর কুফরী। এটি ছাড়া অন্য যে কোন জঘন্য কুফরীর কাজ শিরক নয়। এ কারণে সম্মানিত ফকীহগণ কিতাবী কাফিরদের সম্পর্কিত অনেক আহকাম মুশরিকদের আহকাম থেকে ভিন্নতর বর্ণনা করেছেন। যেমন কিতাবীদের যবেহকৃত পশু হালাল কিন্তু মুশরিকদের যবেহকৃত হারাম, কিতাবীদের মেয়ে বিয়ে করা জায়েয। কিন্তু মুশরিকদের মেয়ে বিয়ে করা জায়েয নয়। কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে- اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ الاية ইমাম শাফেয়ীর মতে কিতাবীদের থেকে জিযিয়া কর নেয়া যাবে কিন্তু মুশরিকদের থেকে নেয়া যাবেনা। কোন সময় শিরক বলে সাধারণ কুফরীকে বোঝানো হয়। কুরআন শরীফে যে বর্ণিত আছে- শিরক মাফ হবেনা, আসলে এর অর্থ হচ্ছে কোন কুফরী মাফ হবেনা। অন্যান্য সমস্ত গুণাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। (শরহে আকাইদ ৭৭-৭৮ পৃঃ)

৬নং আকীদা ঃ কবীরা গুণাহকারী মুসলমান এবং সে বেহেশতে যাবে। হয়তো ওকে আল্লাহ স্বীয় মেহেরবানীতে মাফ করে দেবেন অথবা হুযূর আলাইহিস সালামের সুপারিশের পর বা স্বীয় গুণাহের শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে যাবে।

মাসআলা (৬) ঃ যদি কোন কাফিরের মৃত্যুর পর কেউ তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে বা কোন মৃত ধর্মত্যাগীকে মরহুম বা মগফুর বলে অথবা কোন মৃত হিন্দুকে স্বর্গবাসী বলে, সে কাফির।

৭নং আকীদা ঃ মুসলমানকে মুসলমান এবং কাফিরকে কাফির মনে করা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের অর্ন্তভুক্ত। যদিওবা এটা কারো সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, সেকি ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো, নাকি কাফির হয়ে মরলো। তবে এর অর্থ কোন কট্টর কাফিরের কুফরী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা নয় বরং সন্দেহকারীও কাফির হয়ে যায়। পরিসমাপ্তিটা কি ঈমানের উপর হলো, নাকি কুফরীর উপর, তা কিয়ামতের দিন জানা যাবে কিন্তু শরীয়তের হুকুম বাহ্যিক আচরণ অনুযায়ী হবে। মনে করুন, কোন কাফির যেমন, ইহুদী, খৃষ্টান বা মূর্তি পূজারী মারা গেল। তবে সে যে কুফরীর উপর অটল রয়ে মারা গেল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়না, কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ হচ্ছে তাকে কাফিরই মনে করতে হবে এবং তার জিন্দেগীতে ও মৃত্যুর পর তার সাথে সেরূপ আচরণই করতে হবে, যা করার নির্দেশ রয়েছে, যেমন মেলামেশা, বিয়ে-শাদী, জানাযার নামায, কাফন ও দাফন কাফিরদের জন্য নিষেধ। যখন কেউ কুফরী কাজ করলো, তখন আমাদের উপর ফরয যে, তাকে কাফির মনে করা। তার পরিসমাপ্তিটা কিসের উপর হলো, তা আমাদের বিবেচ্য নয়; তা আল্লাহই জানেন। যেমন কেউ মৌখিকভাবে ইসলাম কবুল করলো এবং কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে ঈমানের বিরোধীতা করলোনা, তাকে মুসলমান মনে করা আমাদের জন্য ফরয, যদিওবা তার জিন্দেগীর পরিসমাপ্তি কিসের উপর, আমাদের জানা নেই। আজকাল তথাকথিত কতেক উপদেশ বিশারদ ব্যক্তি বলে- কাউকে 'কাফির কাফির' না বলে 'আল্লাহ আল্লাহ' করলে এতে অনেক ছওয়াব নিহিত রয়েছে।' কিন্তু আমরাতো কাউকে কাফির কাফির যিক্র করতে বলিনা, কাফিরকে কাফির মনে করতে বলি। তাদের কথামত কি কাফিরকে কাফির না বলে কুফরীকে ধামাচাপা দিতে হবে?

বিশেষ সতর্কবাণী

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ ثَلٰثًا وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

(এ উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। এর মধ্যে একটি ফেরকা ছাড়া বাকী সব জাহান্নামী হবে।) সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ইয়া রসূলাল্লাহ, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা কারা?) তিনি ইরশাদ ফরমান– مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ

(যারা আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসারী অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসারী)। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে অর্থাৎ তাঁরাই হচ্ছেন মুসলমানদের বড় জামাত যাকে ছওয়াদে আযম বলা হয়। আরও ইরশাদ করা হয়েছে যে, যারা এ জামাত থেকে পৃথক হয়ে যাবে, তারা জাহান্নামী হবে। এ জন্য সেই নাজাত প্রাপ্ত ফেরকাটির নামকরণ "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত"– করা হয়েছে। বাতিল ফেরকা সমূহের মধ্যে অনেকগুলো সৃষ্টি হয়ে বিলীন হয়ে গেছে। আবার অনেকগুলোর অস্তিত্ব এ উপমহাদেশে নেই, সেগুলোর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাই এ উপমহাদেশে যেসব বাতিল ফেরকা বিরাজমান, তাদের বাতিল আকীদা সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। যাতে আমাদের সরল প্রাণ সাধারণ মুসলমানগণ তাদের ধোঁকা থেকে রক্ষা পায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ ٥

অর্থাৎ তোমরা তাদের থেকে দূরে সরে থাক এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখ, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে এবং ফিত্‌নার মধ্যে ফেলতে না পারে।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হলো কাদিয়ানী ফেরকার জন্মদাতা। সে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছিল এবং আম্বিয়া কিরামের শানে জঘন্য বেআদবী করেছিল, বিশেষ করে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর জননী হযরত মরিয়ম (আঃ) এর পবিত্র শানে এমন সব অশোভনীয় উক্তি করেছিল, যা শুনলে মুসলমানদের মন শিউরে উঠে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্যহয়ে মুসলমানদের অবগতির জন্য সেসব জঘন্য উক্তির কিয়দংশ নমুনা স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

কুরআনকে অগ্রাহ্য করে ও হুযূর আলাইহিস সালামকে শেষ নবী হিসেবে অস্বীকার করে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কাফির হওয়া ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার জন্য তার নবুয়াত দাবীটা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সে এতেও ক্ষান্ত হয়নি, নবীগণের শানে বেআদবী ও মিথ্যারোপের জিম্মাও সে নিজ কাঁধে নিয়েছিল, যা শত শত কুফরীর সমষ্টি বলা চলে। যে কোন একজন নবীর শানে মিথ্যারোপ করে অন্যান্য সকল নবীকে স্বীকার করলেও কুফরী থেকে রক্ষা নেই। যে কোন একজন নবীর নামে অপবাদ দেয়া মানে সবার নামে অপবাদ দেয়া, যেমন কুরআনে পাকে বর্ণিত আছে– كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ (হযরত নূহ (আঃ) এর কওম সমস্ত নবীগণের শানে মিথ্যারোপ করেছিল) গোলাম আহমদ অনেক নবীর শানে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল এবং নিজেকে নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল। তাই এ ধরণের লোক ও তার অনুসারীদের কাফির হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না বরং তার কুফরী উক্তিসমূহ সম্পর্কে অবহিত হয়ে কেউ যদি ওর কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে, সে নিজেই কাফির হয়ে যাবে। এবার তার উক্তি সমূহ শোনা যাক:

তার লিখিত 'এযালায়ে আওহাম' কিতাবের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে– "আল্লাহ তা'আলা বরাহিনে আহমদীয়া কিতাবে এ অধমের নাম 'উম্মতি' আবার 'নবী' ও রেখেছেন।" তার রচিত অপর কিতাব 'আনজামে আতহম' এর ৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে– "ওহে আহমদ, তোমার নাম আমার নামের আগে পূর্ণতা লাভ করবে।" একই কিতাবের ৫৫ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখিত আছে– "হে আহমদ, তোমাকে শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তুমি আমার কাম্য এবং আমার সাথেই আছ"। হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র শানে যেসব আয়াত অবতীর্ণ

হয়েছে, সেগুলো তার নামে নাযিল হয়েছে বলে দাবী করেছে, যেমন 'আনজম' কিতাবের ৭৮ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে- وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(ওহে গোলাম আহমদ) তোমাকে সারা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পাঠানো হলো।"

কুরআন শরীফের- وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ

এ আয়াতে আহমদ নামে নবী আগমনের যে শুভ সংবাদ রয়েছে, এর দ্বারা তাকেই বোঝানো হয়েছে বলে সে দাবী করে; 'দাফেউল বলা' নামে কিতাবের ৬ পৃষ্ঠায় সে উল্লেখ করেছে- আমাকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِىْ اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ

অর্থাৎ ওহে গোলাম আহমদ! তুমি আমার পুত্রতুল্য, তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে। এযালায়ে আওহামের ৬৮৮ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে- হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনেক এলহাম ও ওহী ভুল প্রমাণিত হয়েছে।" একই কিতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছে- "হযরত মুসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীও তাঁর আশানুরূপ হয়নি।------হযরত মসীহ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও অনেক ভুল-ত্রুটি পাওয়া গেছে।" এযালায়ে আওহামের ৭৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- "সূরা বাকারার মধ্যে যে একটা হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা আছে অর্থাৎ গরুর মাংসের টুকরা দিয়ে লাশের উপর আঘাত করার ফলে সেই হত্যাকৃত ব্যক্তি জীবিত হয়েছিল এবং স্বীয় হত্যাকারীর নাম ঠিকানা বলেছিল, এসব হযরত মুসা (আঃ) এর ধমক ছিল মাত্র এবং তাঁর সম্মোহনী শক্তিরই কারসাজি ছিল।" একই কিতাবের ৫৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে- 'হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের চার পাখীর যে অলৌকিক ঘটনার কথা কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে তাও সম্মোহন বিদ্যার কারসাজি ছিল। উক্ত কিতাবের ৬২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- কোন এক বাদশাহের যুগে চারশত নবী বাদশাহের জয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। বাদশাহ পরাজিত হয় বরং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়েছিলো। একই কিতাবের ২৬ ও ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছে- কুরআন শরীফে অকথ্য গালি-গালাজে ভরপুর এবং কুরআন শরীফে অতি কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তার রচিত 'বরাহিনে আহমদীয়া গ্রন্থ প্রসঙ্গে- 'এযালায়ে আওহাম' কিতাবের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে- 'বরাহিনে আহমদীয়া হচ্ছে খোদার কালাম।' ২নং আরবাইনের ১৩ পৃষ্ঠায় সে

লিখেছে- "কামিল মাহ্দী ঈসা, মুসা কেউ নয়।" কুরআন শরীফে অতি ধৈর্যশীল নবী বলে আখ্যায়িত নবীদেরকে পথ প্রদর্শকতো দূরের কথা পথপ্রাপ্ত বলেও স্বীকার করেনি। বিশেষ করে হযরত ঈসা (আঃ) এর শানে সে জঘন্যভাবে বেআদবী করেছে। এর যৎকিঞ্চিত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

তার রচিত 'মিয়ার' গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে- 'ওহে ঈসায়ীগণ তোমরা এখন থেকে আর (আমাদের প্রভু মসীহ) বলোনা। দেখ, এখন তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি বর্তমান আছেন, যিনি সেই মসীহ থেকে অনেক বড়।" সেই একই গ্রন্থের ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- 'আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় মসীহকে পাঠিয়েছেন' যিনি প্রথম মসীহ (ঈসা আঃ) থেকে শানমানে অনেক বড়। আল্লাহ তা'আলা এ দ্বিতীয় মসীহের নাম গোলাম আহমদ রেখেছেন। এর দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, ঈসায়ীদের মসীহ (ঈসা আঃ) কেমন খোদা, সে আহমদের নগণ্য গোলামের সাথেও মুকাবেলা করতে পারেনা। অর্থাৎ সে কেমন মসীহ যে নৈকট্য ও শাফায়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদের গোলাম থেকেও নিকৃষ্ট।" তার রচিত 'কিশ্‌তী' গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- "মুসার ব্যক্তি মুসা থেকে ও ইবনে মরিয়মের (ঈসা আঃ) সমতুল্য ব্যক্তি ইবনে মরিয়ম থেকে বড়।" উক্ত গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় আরও বলেছে- "আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন যে মসীহে মুহাম্মদী মসীহে মুসাবী থেকে আফযল।" তার রচিত 'দাফেউল বলা' গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- "আল্লাহ তা'আলা বলেন, দেখ, আমি ওর দ্বিতীয় সৃষ্টি করবো. যিনি ওর থেকেও ভাল হবে এবং যার নাম গোলাম আহমদ অর্থাৎ আহমদের গোলাম হবে।

ঈসা ইবনে মরিয়মের করনা গুণকীর্তন,
তারচে' ভাল গোলাম আহমদের অনুসরণ।

এ কথাগুলো নিছক কবিসুলভ নয় বরং বাস্তবিকই তা-ই। যদি বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে খোদার সহানুভূতি মসীহ ইবনে মরিয়ম থেকে আমার প্রতি বেশী না হয়, আমি মিথ্যাবাদী'। একই গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখিত আছে- "আল্লাহ তা'আলা যথাযথভাবে নিজের ওয়াদা অনুসারে প্রত্যেক কিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু এ রকম লোককে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে পাঠাতে পারেন না, যার পূর্ববর্তী ফিত্‌নার দ্বারা দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" আনজামে আতহামের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- "মরিয়মের বেটা কৌশল্যার বেটা (রাম)

থেকে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেনা।" 'কিশতী' গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় সে আরও লিখেছে- 'যার হাতে আমার প্রাণ, সেই জাতে পাকের কসম করে বলছি, যদি মসীহ ইবনে মরিয়ম আমার যুগে হতো, তাহলে আমি যেসব কথাবার্তা বলতে পারছি, তা সে কখনও বলতে পারতো না এবং যেসব নিদর্শন (অলৌকিক ঘটনা) আমার থেকে প্রকাশ পাচ্ছে, সে কখনও দেখাতে পারতো না।" 'এজাজে আহমদী' নামে অপর একটি গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় সে উল্লেখ করেছে- ইহুদীগণ হযরত ঈসার ব্যাপারে এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে এমন জোরালো আপত্তি উত্থাপন করে যে, যার উত্তর দিতে আমরা নিজেরাই হিমসিম খেয়ে যাই। কুরআন শরীফে তাকে যেহেতু নবী বলা হয়েছে, সেহেতু সে নিশ্চয়ই নবী। তার নবুয়াতের সমর্থনে অন্য কোন দলীল নেই অথচ নবী নয় বলে বেশ কয়েকটি দলীল আছে" এ উক্তিতে ইহুদীদের আপত্তিকে সঠিক বলেছে এবং সাথে সাথে কুরআন মজীদ প্রসঙ্গে এ আপত্তি তুলে ধরেছে যে কুরআন এমন শিক্ষা দেয়, যা ভুল বলে প্রমাণাদি পেশ করা যায়। একই গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- "ঈসায়ীগণ, তাদের খোদার (ঈসা) জন্য কাঁদতেছে অথচ এদিকে তার নবুয়াতেরও কোন প্রমাণ নেই"। একই গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- "কোন কোন সময় তার প্রতি শয়তানী ইলহামও হতো। মুসলমানগণ! তোমাদের কি জানা আছে- শয়তানী ইলহাম কার প্রতি হয়? কুরআন ইরশাদ ফরমান- تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ

বড় মিথ্যাবাদী ও জঘন্য পাপাচারীর প্রতি শয়তানী ইলহাম নাযিল হয়"। সেই একই পৃষ্ঠায় আরও লিখিত আছে- "তার (হযরত ঈসা) অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বানী ত্রুটিপূর্ণ। একই গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে- "দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, তার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ইহুদীদের জোরালো আপত্তি রয়েছে, যা আমরা কিছুতেই খণ্ডন করতে পারিনা।" ১৪ পৃষ্ঠায় আরও লিখেছে- "হায়রে, কার কাছে গিয়ে এ দুঃখ বোঝাবো যে হযরত ঈসা (আঃ) এর তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।" এসব উক্তি দ্বারা হযরত ঈসার নবুয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে। যেমন **স্বীয় গ্রন্থ কিশ্‌তীয়ে নূহের** ৫২ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে- "নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী এদিক সেদিক হওয়া অসম্ভব।" তার রচিত 'দাফেউল ওসাবেস' এর ৩য় পৃষ্ঠায় এবং 'আনজামে আতহাম' এর উপসংহারে ঈসা (আঃ) এর এ মিথ্যাভাষণকে সবচেয়ে বড় অবমাননাকর ও জিল্লতীপূর্ণ কাজ বলেছে। 'দাফেউল বলা' গ্রন্থের ভূমিকায় সে লিখেছে- "আমি মসীহকে

নিঃসন্দেহে একজন সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে জানি। তাঁর যুগের অধিকাংশ লোক থেকে তিনি অবশ্য ভাল ছিলেন। তবে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু তিনি সত্যিকার মুক্তিদাতা ছিলেন না, মুক্তিদাতা ছিলেন তিনি, যিনি হেজাযে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বর্তমানে আবার আবির্ভাব হয়েছেন পুনর্জন্ম হিসেবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে।" উক্ত ভূমিকায় আরও কিছু লিখার পর সত্যবাদী সম্পর্কে তার চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করে বলছে- "তাঁর প্রতি ভাল ধারণা আছে বলে আমার এ বর্ণনা, নচেৎ এটা অসম্ভব নয় যে ঈসার সময় কতেক লোক সত্যবাদীতার দিক থেকে ঈসার থেকেও বড় ছিল।" উক্ত ভূমিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় আরও বলেছে- মসীহের সত্যবাদীতা তাঁর যুগের অন্যান্যদের সত্যবাদীতা থেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয় না বরং ইয়াহিয়াকে তাঁর থেকে অধিক ফজিলতপ্রাপ্ত বলে মনে হয়, কেননা সে মদ পান করতো না এবং এ রকম কখনও শোনা যায়নি যে কোন পতিতা স্বীয় উপার্জনের পয়সা দিয়ে ওর মাথায় সুগন্ধি তৈল লাগিয়েছে বা হস্তদ্বয় ও মাথার চুল ওর শরীরকে স্পর্শ করেছে বা কোন বেগানা যুবতী মহিলা ওর সেবাযত্ন করছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইয়াহিয়ার নাম হছুর রেখেছেন কিন্তু মসীহ রাখেন নি। কেননা এ ধরণের কাহিনী সেই নামকরণের প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল।" 'আনজামে আতহাম' গ্রন্থের পরিশিষ্টের ৭ম পৃষ্ঠায় সে লিখেছে- "তাঁর (ঈসা) সাথে পতিতাদের সম্বন্ধ ছিল মনে হয়। এ কারণেই যে, তাঁর দাদী-নানীর প্রভাব তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। নাহয় কোন পরহেজগার লোক একজন কুমারী পতিতাকে এ সুযোগ দিতে পারেনা যে তার মাথায় ওর অপবিত্র হাত লাগাক এবং গণিকা বৃত্তির উপার্জিত পয়সায় ক্রয়কৃত অপবিত্র সুগন্ধি তাঁর মাথায় মালিশ করুক এবং পতিতার মাথার চুল তাঁর পায়ে লাগাক। জ্ঞানীরা চিন্তা করুন, এ রকম লোক কোন্ প্রকৃতির হতে পারে?" অধিকন্তু এ পুস্তিকার বিভিন্ন জায়গায় এ পবিত্র ও সম্মানিত রসূলের শানে অত্যন্ত অশোভনীয় শব্দ প্রয়োগ করেছে যেমন- অসৎ, ধোঁকাবাজ, মুর্খ, অকথ্যভাষী, মিথ্যুক, চোর, পাগল, দুর্ভাগা, চালবাজ, শয়তানের অনুসারী ইত্যাদি। তার রচিত 'হাদিয়া' গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখা আছে- তাঁর (ঈসা) খানদানও ভীষণ অপবিত্র ছিল। তাঁর তিনজন নানী-দাদী জেনাকারিনী ছিল এবং গণিকা বৃত্তি করে উপার্জন করতো। তাঁদের রক্ত দ্বারাই তিনি অস্তিত্ব লাভ করেন।" প্রত্যেকে জানে যে বাপের মাকে দাদী বলে। তাহলে

তার উক্তিতে হযরত ঈসা (আঃ) এর বাপ আছে বোঝা যায়, যা কুরআন শরীফের বিপরীত। সে অন্যত্র অর্থাৎ 'কিশতীয়ে নূহ' গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় এর বিশ্লেষণ করে দিয়েছে, সে তথায় লিখেছে-"ঈসা মসীহের চার ভাই ও দুই বোন ছিল। এরা সব মসীহের আপন ভাই-বোন ছিল অর্থাৎ সবাই ইউসুফ ও মরিয়মের সন্তান ছিল।" গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হযরত মসীহ (আঃ) এর মুজিযাকে একেবারে অস্বীকার করে। তার রচিত 'আন্‌জামে আতহামের' ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে- "সত্য কথা হলো তাঁর (ঈসা) কোন মুজিযা ছিলনা। উক্ত গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় সে লিখেছে- "সেই যুগে একটি পুকুর থেকে বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ পেত। তাঁর থেকে কোন মুজিযা প্রকাশ পেলেও, আসলে তা সেই পুকুরেরই ছিল। তাঁর কাছে ধোঁকা ও চালবাজি ছাড়া আর কিছু ছিলনা।"

এজালায়ে আওহামের ৪র্থ পৃষ্ঠায় আছে, এছাড়া যদি মসীহের আসল কাজগুলোকে সমস্ত পার্শ্বক্রিয়া থেকে পৃথক করে দেখা হয়, যা কেবল গালগল্প ও ভুল বুঝাবুঝিতে ভরপুর, তাহলে আশ্চর্যজনক কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয়না বরং মসীহের মুজিযা সম্বন্ধে যে পরিমাণ আপত্তি রয়েছে, আমার মনে হয়না যে, অন্য কোন নবীর মুজিযা সম্পর্কে এ রকম সন্দেহ করা হয়। পুকুরের কাহিনী কি মসীহের মুজিযার উজ্জ্বলতা দূরীভূত করে না?" হযরত মসীহের মুজিযাকে কোন সময় চালবাজি বলেছে। আবার কোন সময় যাদু আখ্যায়িত করে বলেছে- "যদি আমি এ ধরণের কাজকে অপসন্দ ও ঘৃণিত মনে না করতাম, তাহলে সে সব আশ্চর্যজনক বিষয় প্রদর্শনে আমি মরিয়মের বেটা থেকে কোন অংশে কম হতাম না।" যাদু বিদ্যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সে বলে "যে ব্যক্তি নিজেকে এ কাজে নিয়োজিত রাখে, সে রূহানী শক্তিতে দুর্বল ও অকেজো হয়ে যায় এবং কোন রূহানী রোগ সারাতে পারেনা। এ জন্য 'মসীহ' সেই আমলের দ্বারা মানুষের শারীরিক রোগ আরোগ্য করতো কিন্তু হেদায়েত, তওহীদ ও দ্বীনের অনুশাসন মানুষের মনে কায়েম করার ব্যাপারে তার স্থান এত নীচে যাকে অকৃতকার্য বলা চলে।

এ দজ্জাল কাদিয়ানীর ভন্ডামীর কথা আর কতটুকো লিখবো, সবকিছু লিখতে গেলে বিরাট বালামের প্রয়োজন। তবে উপরোক্ত আলোচনা থেকে মুসলমানগণ ভাল মতে বুঝতে পারবেন যে, এমন একজন পূতঃ পবিত্র নবী সম্পর্কে যাঁর ফযীলত কুরআনে বর্ণিত আছে, কেমন অশোভনীয় ও বিশ্রী উক্তি

করেছে। আশ্চর্য লাগে, সরলমনা লোকেরা কেমনে এ দজ্জালের অনুসারী হয় এবং তাকে মুসলমান মনে করে। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য লাগে সেসব লেখাপড়া জানা লোকদের কথা চিন্তা করলে, যারা জেনে শুনে কিভাবে তার সাথে জাহান্নামের গর্তে পতিত হচ্ছে। এ ধরণের ব্যক্তি কাফির, ধর্মদ্রোহী ও ধর্মহীন হওয়ার ব্যাপারে কোন মুসলমানের সন্দেহ হতে পারে কি?

حَاشَ لِلّٰهِ مَنْ شَكَّ فِىْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ فَقَدْ كَفَرَ

যে ব্যক্তি এসব কুকীর্তি সম্পর্কে অবগত হয়েও তার শাস্তি ও কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে নিজেই কাফির সাব্যস্ত হবে।

রাফেজী

রাফেজী ফের্‌কা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে 'তুহ্‌ফায়ে ইছনা আশারিয়া' নামক গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করুন। তবে আমি এখানে তাদের ভ্রান্ত আকীদার কিছু নমুনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি। এ ফের্‌কাটি সাহাবায়ে কিরামের শানে জঘন্য বেআদবী করেছে। এরা বিশেষ কয়েকজন সাহাবা বাদ দিয়ে বাকী সকলকে কাফির ও মুনাফিক মনে করে। প্রথম তিন খলিফার খেলাফতে রাশেদাকে খেলাফতে গাসেবা (জবরদস্তি খেলাফত) বলে। হযরত মওলা আলী (কঃ) যে প্রথম তিন খলিফার খেলাফত সমর্থন করেছেন এবং এদের প্রশংসা ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন, একে তার সংযমশীলতা ও কাপুরুষতা বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু মুনাফিক ও কাফিরদের হাতে বাইয়াত করা এবং সারা জীবন তাঁদের প্রশংসা করা ও তাঁদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা শেরে খোদা হযরত আলীর শান হতে পারে কি? সবচেয়ে বড় কথা হলো কুরআন শরীফে তাঁদের শানে বর্ণিত আছে- আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজী আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি রাজী আছেন। কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি কি এ ধরণের খোদায়ী সু-সংবাদ হতে পারে? আরও একটি লজ্জার বিষয় যে, হযরত আলী (কঃ) তাঁর কন্যাকে স্বেচ্ছায় হযরত উমরের কাছে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ বাতিল ফের্‌কা বলে যে, এ কাজটা তিনি ভয়ে করেছেন। জেনে শুনে কোন মুসলমানের মেয়ে কাফিরকে দিতে পারে কি? এ সম্মানিত ব্যক্তিগণ, যারা

ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন, যাঁরা সত্যবাদিতা ও সত্যানুসরণে لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ এ আয়াতের সঠিক প্রতিপাদক ছিলেন, স্বয়ং হুযুর আলাইহিস সালাম নিজের দু'কন্যাকে একের পর এক হযরত উছমান (রাঃ) এর কাছে বিয়ে দিয়ে ও নিজে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে যাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাঁদের শানে এ ধরণের কুফরী বাক্য প্রয়োগ করতে কোন সাধারণ ব্যক্তিও ক্ষণিকের জন্য জায়েয বলতে পারেনা।

এ ফের্কার একটি আকীদা হচ্ছে আল্লাহর জন্য সোলেহ ওয়াজিব অর্থাৎ যে কাজটা বান্দার জন্য উপকারী, তা করাটা আল্লাহর জন্য অবশ্য কর্তব্য। তাদের আরেকটি ভ্রান্ত আকীদা হচ্ছে যে, ইমামগণ নবীদের থেকে আফযল। অথচ এ ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী, কেননা গায়র নবীকে নবী থেকে আফযল বলা হয়েছে। ওরা মনে করে কুরআন মজিদ অক্ষুন্ন নয়। তাদের মতে মুমেনীন হযরত উছমান (রাঃ) বা অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম কুরআন শরীফের কিছু পারা বা সূরা বা আয়াত অথবা শব্দ বাদ দিয়েছেন। অথচ হযরত আলী (কঃ) ও একে অসম্পূর্ণ মনে করেননি। এ ধরণের আকীদাও সুস্পষ্ট কুফরী, কেননা এতে কুরআন শরীফকে অস্বীকার করা বুঝায়। ওদের আর একটি আকীদা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কোন হুকুম জারী করার পর যখন বুঝতে পারেন যে, এর বিপরীতটা যথার্থ ছিল, তখন অনুশোচনা করেন। এ আকীদাটাও নিঃসন্দেহে কুফরী। কেননা, এর দ্বারা খোদাকে অজ্ঞ বলা হয়েছে। তাদের অপর একটি আকীদা হচ্ছে নেক কাজের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ আর খারাপ কাজের সৃষ্টিকর্তা হলো বান্দা নিজেই। অগ্নি উপাসকরাও এ ধরণের দু'খোদায় বিশ্বাস করতো। তাদের এক খোদার নাম ছিল এজদান- ভাল কাজের সৃষ্টিকর্তা, অন্য খোদার নাম ছিল আহেরমন- মন্দকাজের সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তা অগণিত বলে তারা বিশ্বাসী।

ওহাবী ফেরকা

এ ওহাবী ফেরকাটা সৃষ্টি হয় ১২০৯ হিজরীতে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী। সে সমগ্র আরবে বিশেষ করে হেরমাইন

শরীফাইনে অনেক জঘন্য ফিত্নার সূচনা করেছিল। সে অনেক উলামায়ে কিরামকে হত্যা করেছিল, সাহাবায়ে কিরাম, ইমাম, উলামা ও শহীদগণের মাযারসমূহ উপড়ে ফেলেছিল। সে রওজায়ে পাককে (মায়াজাল্লা) 'সনমে আকবর' অর্থাৎ বড় মূর্তি বলেছিল। এরূপ সে নানা রকম অত্যাচার করেছিল। (শামী ৩য় খণ্ড ৪২৭ পৃঃ)

সহীহ হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে হুযূর আলাইহিস সালাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- নজদ থেকে ফিতনা শুরু হবে এবং ওখান থেকে শয়তানের দল বের হবে। বারশত বছর পর সেই শয়তানের দলের আবির্ভাব ঘটে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের নেতৃত্বে। আল্লাম শামী (রহঃ) একে খারেজী বলেছেন। সেই ইবনে আবদুল ওহাব 'কিতাবুত তওহীদ' নামে একটি কিতাব রচনা করে এবং মৌলভী ইসমাইল দেহলবী 'তকবিয়াতুল ঈমান' নাম দিয়ে সেই কিতাবটির উর্দু অনুবাদ করে। এর দ্বারাই ভারতবর্ষে ওহাবী ফিতনার সূচনা হয়।

ওহাবীদের প্রধান আকীদা হচ্ছে- যারা তাদের মযহাবের বিশ্বাসী নয়, তারা কাফির মুশরিক। এ কারণেই তারা কথায় কথায় কোন অজুহাত ছাড়াই মুসলমানদের উপর শিরক ও কুফরীর হুকুম জারী করে এবং দুনিয়ার সকলকে মুশরিক বলে। যেমন 'তকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবের ৪৫ পৃষ্ঠায় 'শেষ জামানায় আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত করে সমস্ত মুসলমানকে দুনিয়া থেকে উঠায়ে নেবেন-' এ হাদীছটি উল্লেখ করার পর পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, খোদার নবীর সেই বাণী অনুযায়ী কাজ হয়ে গেছে অর্থাৎ সেই বায়ু প্রবাহিত হয়ে গেছে এবং দুনিয়ার বুকে আর কোন মুসলমান নেই। কিন্তু এটা খেয়াল করেনি যে এ অবস্থায় তারা নিজেরাও কাফির হয়ে গেছে। এ মাযহাবের প্রধান মূলনীতি হলো খোদার কুৎসা রটনা ও খোদার প্রিয়জনদের নিন্দা করা। প্রত্যেক কাজে তারা এ নীতিই অনুসরণ করে।

এ মাযহাবের ইমামদের কিছু উক্তি উল্লেখ করাটা সমীচিন মনে করি, যাতে সাধারণ মুসলমান ভায়েরা তাদের মনের কুটিলতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, তাদের ধোঁকা থেকে রক্ষা পায় এবং তাদের আলিশান জুব্বা পাগড়ী দেখে যেন মোহিত না হয়। এটা জেনে রাখা দরকার যে মুসলমানদের জন্য ঈমান হচ্ছে খুবই মূল্যবান জিনিষ। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মহব্বত ও সম্মানের নামই হচ্ছে ঈমান। ঈমান সহকারে যার কাছে যতটুকু ফযীলত পাওয়া যাবে, সেই অনুসারে সে ফযীলত প্রাপ্ত। কিন্তু যার ঈমান নেই, মুসলমানদের কাছে তাঁর কোন মূল্য

নেই, যদিওবা সে বড় আলেম, যাহেদ, দুনিয়া ত্যাগী ইত্যাদি হোক না কেন। তাই, ওরা যেহেতু আল্লাহ ও রসূলের দুশমন, সেহেতু ওদের আলেম-ফাজেলকে যেন নিজেদের ইমাম মনে করা না হয়। ইহুদী খৃষ্টান এমনকি হিন্দুদের মধ্যে ওদের মাযহাবের বড় বড় আলেম ও দুনিয়া ত্যাগী হয়ে থাকে। তাই বলে কি ওদেরকে আমাদের ইমাম বা নেতা মনে করতে পারি? কখনই না। তদ্রূপ এ লা-মযহাবী ও বদ্‌মযহাবী কিছুতেই আমাদের ইমাম বা নেতা হতে পারে না। দেখুন, ওদের কিতাব 'ইজাহুল হক' এর ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

"تنزیہ او تعالیٰ از زمان ومکان وجہت واثبات رویت بلا جہت ومحاذات ہمہ از قبیل بدعات حقیقیہ است اگر صاحب آں اعتقادات مذکورہ را از جنس عقائد دینیہ می شمارد-

এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলাকে স্থান, কাল ও দিক থেকে পবিত্র মনে করা এবং আল্লাহর দীদারকে আকৃতিহীন বলে বিশ্বাস করা বিদ্‌আত ও গোমরাহী। অথচ তা হচ্ছে সমস্ত আহলে সুন্নাতের আকীদা। বাহারুর রায়েক, দুররুল মুখতার ও আলমগীরীতে উল্লেখিত আছে- আল্লাহর জন্য যে স্থান প্রমাণ করে, সে কাফির। 'তকবিয়াতুল ঈমান' এর ২০ পৃষ্ঠায়-

اَرَاَيْتَ لَوْمَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ

এ হাদীছটি উদ্ধৃতি করে এর অর্থ করেছে "আচ্ছা মনে কর, যদি তুমি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাও, তাহলে কি তুমি ওটাকে সিজদা করবে?" এর পর ف (অর্থাৎ বিঃ দ্রঃ) লিখে এ বক্তব্যটুকু উক্ত হাদীছের অর্থের সাথে জুড়ে দিল- "অর্থাৎ আমিও একদিন মরে মাটির সাথে মিশে যাব।" অথচ আমাদের নবী আলাইহিস সালাম কি বলেন শুনুন-

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীদের শরীর খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। অন্যত্র বর্ণিত আছে আল্লাহর নবী জীবিত ও খাবার পেয়ে থাকেন। এ 'তকবিয়াতুল ঈমান' এর ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে "আমাদের খালেক যখন আল্লাহ এবং তিনি যখন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন আমাদেরও উচিত

নিজেদের প্রত্যেক কাজে তাঁকেই আহবান করা, অন্য কারো কাছে কি জন্য যাব? যেমন যদি কেউ কোন বাদশার গোলাম হলো, সে তার প্রতিটি কাজের সম্পর্ক সেই বাদশাহের সাথেই রাখে; অন্য কোন বাদশার সাথে নয় এবং চামার ঝাড়ুদারের তো কথাই আসে না"।

আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আওলিয়ায়ে এজামের শানে এ ধরনের জঘন্য শব্দ প্রয়োগ কোন মুসলমানের পক্ষে শোভা পায় কি?

তার রচিত অপর কিতাব 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর ৯৫ পৃষ্ঠায় ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ এ আয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

از وسوسۂ زنا خیال مجامعت زوجۂ خود بہتر است وصرف ہمت بسوئے شیخ وامثال آں از معظمین گو جناب رسالتمآب باشند بچندیں مرتبہ بدتر از استغراق درصورت گاؤ وخر خود ست-

অর্থাৎ জেনার খেয়াল থেকে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসের খেয়াল উত্তম। এবং নামাযের মধ্যে নিজ পীর সাহেবের, এমন কি জনাব রসূলে করীমের খেয়াল থেকে গরু-গাধার খেয়াল অনেক উত্তম। মুসলমান ভাইগণ, হুযূর আলাইহিস সালামের শানে এ শয়তানী উক্তিটা হচ্ছে ওহাবীদের নেতার। যার অন্তরে সরিষা দানা বরাবরও ঈমান আছে, সেও নিশ্চয় বলবে যে, এ উক্তিকারী জঘন্য বেয়াদব।

'তকবিয়াতুল ঈমান' এর ১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে- "রোযী রোজগারে ফরাগত বা সংকীর্ণ করা, শরীর সুস্থ বা অসুস্থ করা, অগ্রগামী বা পশ্চাৎগামী করা, অভাবমুক্ত করা, বিপদ দূরীভূত করা, কষ্ট লাঘব করা ইত্যাদি সব আল্লাহরই ক্ষমতাধীন। কোন নবী, ওলী, ভূত পরীর এ ক্ষমতা নেই। যদি কেউ খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে এ ধরণের ক্ষমতার অধিকারী মনে করে এবং ওর থেকে উদ্দেশ্যাদি পূরণের প্রার্থনা করে এবং কোন বিপদের মুহূর্তে ওকে ডাকে, তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে। সে ওকে ওইসব কাজের স্বয়ং ক্ষমতাবান মনে করুক বা খোদা প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী মনে করুক, যে কোন অবস্থায় এটা শিরক।" কিন্তু কুরআন মজিদে বর্ণিত আছে- اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ (স্বীয় মেহেরবানীতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ওদেরকে ধনী করে দিয়েছেন।) দেখুন, কুরআন বলতেছেন যে, নবী আলাইহিস সালাম সম্পদশালী করে দিয়েছেন, কিন্তু এ ওহাবীরা বলে- যে অন্য কারো জন্য এ

ক্ষমতা প্রমাণ করে, সে মুশরিক। তাহলে তাদের মতে কুরআন শরীফ কি শিরকের শিক্ষা দেয়? কুরআন শরীফে আরও ইরশাদ করা হয়েছে- وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي (হে ঈসা, তুমি আমার হুকুমে জন্মান্ধ ও শ্বেত রোগীকে আরোগ্য করে থাক)। অন্যত্র ইরশাদ ফরমান- (হযরত ঈসা (আঃ) বলেন-

أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

আমি জন্মান্ধও শ্বেত রোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃত ব্যক্তিকে খোদার হুকুমে জীবিত করি।) দেখুন আলোচ্য আয়াতেও বর্ণিত আছে যে হযরত ঈসা (আঃ) আরোগ্য দান করেন। কিন্তু ওহাবীরা বলে আরোগ্য দান করা একমাত্র আল্লাহরই কাজ; যে এটা অন্য কারো জন্য প্রমাণ করে, সে মুশরিক। এখন ওহাবীরা বলুন, আল্লাহর বেলায় কি হুকুম জারী করবেন, যিনি ঈসা (আঃ) এর জন্য উপরোক্ত ক্ষমতা প্রমাণ করলেন? আরও মজার ব্যাপার হলো যে খোদা তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমতাবান করে দেওয়ার পরও যদি সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা শিরক হয়, তাহলে জানিনা তাদের কাছে কোন জিনিষটার নাম ইসলাম।

'তকবিয়াতুল ঈমান' এর ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- (হেরেম শরীফের) আশে-পাশের জঙ্গলের সম্মান করা অর্থাৎ ওখানে শিকার না করা, গাছ-পালা না কাটা, এ কাজটা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদতের জন্য ঠিক করেছেন। কিন্তু যদি কেউ কোন নবী বা ভূত পেত্নীর আস্তানার পারিপার্শ্বিক জঙ্গলের সম্মান করে, তাতে শিরক প্রমাণিত হবে। জঙ্গলটাকে সম্মানের উপযোগী মনে করা হোক বা এর সম্মানের দ্বারা আল্লাহ খুশী হবেন বলে ধারণা করা হোক- যে কোন অবস্থায় শিরক হবে।" অথচ বিভিন্ন সহীহ হাদীছে হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা শরীফকে হেরেম (নিষিদ্ধ স্থান) করেছেন এবং আমি মদীনা শরীফকে হেরেম করেছি। এখানকার বাবুল গাছ যেন কাটা না হয় এবং যেন কোন শিকার করা না হয়। মুসলমানগণ! একবার ঈমানের সাথে লক্ষ্য করুন, এ শিরক বেপারীর শিরক কোথায় গিয়ে পৌছেছে। এ বেআদব নবী আলাইহিস সালামের শানে কি হুকুম জারী করলো, তাতো দেখলেন। তকবীয়াতুল ঈমানের ৮ম পৃষ্ঠায় এ বেআদব আরো লিখেছে "রসূলে খোদার যুগেও কাফিরেরা তাদের মূর্তিসমূহকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করতো না বরং আল্লাহর সৃষ্ট ও তাঁর বান্দা মনে করতো এবং ওগুলোকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলে প্রমাণ করতো না। কিন্তু এগুলোকে বিপদের সময়

আহবান করা, এদের নামে মানত করা, নযর-নিয়ায করা এবং ওগুলোকে নিজেদের উকিল ও সুপারিশকারী মনে করাটা তাদের জন্য কুফর ও শিরক ছিল। সুতরাং যে কেউ অন্য কারো সাথে যদি এ ধরণের আচরণ করে তাকে আল্লাহর বান্দা ও মখলুক মনে করে সে আবু জেহেলের সম মুশরিক।" অর্থাৎ যে নবী করীম আলাইহিস সালামের শাফায়াত বিশ্বাস করে এবং তিনি আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন বলে মনে করে, তাহলে মায়াজাল্লাহ ওর মতে সে আবু জেহেলের সম মুশরিক। দেখুন, শাফায়াতের মাসআলাকে কেবল অস্বীকার করেনি, বরং ওটাকে শিরক প্রমাণ করেছে এবং সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ীন, ধর্মীয় ইমাম, নেক বান্দা সবাইকে মুশরিক ও আবু জেহেলের সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করেছে। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' এর ৫৮ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখিত আছে- "কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে- অমুক বৃক্ষে কত পাতা বা আসমানে কত তারা? এর উত্তরে যেন এ রকম বলা না হয় যে আল্লাহ ও রসূল তা জানে। কেননা গায়েবের কথা একমাত্র আল্লাহই জানেন, রসূল কিইবা জানে?" তাহলে মনে হয়, গাছের পাতার সংখ্যা জানার মধ্যে খোদায়ীত্ব নিহিত। উক্ত কিতাবের ৮ম পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে- আল্লাহ সাহেব দুনিয়াতে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কাউকে দেয়নি।" এ বাক্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের মুজিযা ও আওলিয়ায়ে এজামের কারামাতকে পরিষ্কার অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (কার্য পরিচালনাকারী ফিরিশতাদের কসম।) এতে বোঝা যায় উক্ত ইবারতে কুরআনকেও অস্বীকার করা হলো। সেই 'তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থের ৮ম পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখিত আছে- "যার নাম মুহাম্মদ বা আলী, সে কোন কিছুর ক্ষমতা রাখেনা।" আশ্চর্য্যের বিষয়। ওহাবী সাহেবতো নিজের ঘরের সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখে কিন্তু দোজাহানের ত্রাণকর্তা প্রিয় নবী আলাইহিস সালাম নাকি কোন কিছুর ক্ষমতা রাখেন না।

এ দলের আর একটি উল্লেখযোগ্য আকীদা হচ্ছে- 'আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে।" বরং ওদের জনৈক নেতা স্বীয় ফতওয়ায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে- "মিথ্যা বলার বক্তব্যটা সঠিক হয়েছে। যদি কেউ বলে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলেছে, তাহলে ওকে অবমাননা করা ও ফাসিক বলা থেকে বিরত থাকা চাই।" কি আশ্চর্য! আল্লাহকে মিথ্যুক বলার পরও ইসলাম, সুন্নিয়াত, সবকিছু অটল রইল। জানিনা ওরা কোন জিনিষটাকে খোদা বলে স্থির করেছে।

তাদের আর একটি আকীদা হচ্ছে- "নবী করীম আলাইহিস সালামকে

'খাতেমুন নবীয়ীন' বলতে শেষ নবী মনে করেনা।" এটি সুস্পষ্ট কুফরী। যেমন 'তাহযিরুন নাস' এর ২য় পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- "সাধারণ লোকের ধারণায়তো রসূলুল্লাহ (দঃ) শেষ নবী হওয়া মানে তাঁর যুগ বিগত নবীগণের পর এবং তিনি সবার শেষ নবী। কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে এটি সুস্পষ্ট যে আগে বা পরের মধ্যে মূলতঃ কোন ফযীলত নেই। এরপরও প্রশংসার স্থানে وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (তিনি আল্লাহর রসূল ও নবীগণের শেষ নবী) বলা এ অবস্থায় কিভাবে সঠিক হতে পারে? তবে হ্যাঁ, এ গুণাবলীকে যদি প্রশংসো স্বরূপ বলা না হয় এবং এ স্থানকে প্রশংসার স্থান হিসেবে গণ্য করা না হয়, তাহলে খাতেমিয়াত মানে শেষ জামানা সঠিক হতে পারে।" দেখুন, উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে 'খাতেমুন নবীয়ীন' বলতে সমস্ত নবীগণের শেষে মনে করাটাকে সাধারণ লোকের খেয়াল বলেছে এবং এটাও বলেছে যে জ্ঞানীদের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে এতে সহজাত কোন ফযীলত নেই। অথচ হুযূর আলাইহিস সালাম 'খাতেমুন নবীয়ীন' এর এ অর্থ অনেক হাদীছের মধ্যে ইরশাদ করেছেন। মায়াযাল্লা, উদ্ধৃত অংশের প্রবক্তা প্রথমে হুযূর আলাইহিস সালামকে সাধারণের পর্যায়ভুক্ত এবং জ্ঞানীদের বহির্ভূত করেছে। পরে শেষ যুগে আবির্ভাব হওয়ার মধ্যে সাধারণতঃ কোন ফযীলত নেই বলে দাবী করেছে। অথচ হুযূর আলাইহিস সালাম শেষ যুগটাকে প্রশংসার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত কিতাবের ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখেছে- "তিনি সহজাত নবুয়াতের গুণে গুণান্বিত।" ১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছে- "মনে করুন তাঁর (দঃ) যুগেও কোথাও কোন নবীর আগমন হলে তাঁর শেষ নবী হওয়াটা যথাযথ বজায় থাকে" উক্ত কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় আরও লিপিবদ্ধ আছে- "মনে করুন, নবুয়াতের যুগের পরও যদি কোন নবী জন্মগ্রহণ করে, তবুও খাতেমিয়াতে মুহাম্মদীর (হুযূরে পাকের শেষ নবী হওয়ার) বেলায় কোন তারতম্য হবে না, যদিওবা তাঁর সমসাময়িক যুগে অন্য কোথাও অন্য নবী আছে বলে ধরে নেয়া হয়।" মজার বিষয় হলো যে, উপরোক্ত উক্তিকারক উল্লেখিত সমস্ত বাজে কথার প্রবক্তা নিজে বলে স্বীকার করে নিয়েছে। যেমন সে উক্ত কিতাবের ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে- "যদি অমনোযোগিতার কারণে বড় জ্ঞানীদের চিন্তাধারায় কোন বিষয় বুঝে না আসে, তাতে তাঁর মান-সম্মানের কি ক্ষতি হতে পারে? আর কোন অবুঝ ছেলে যদি কোন ঠিকানায় কথা বলে দিল, এতেই কি সে বড় মর্যাদাবান হয়ে যাবে? কবি সুন্দর বলেছেন-

گاہ باشد کہ کودکِ ناداں ؞ بغلط بر ہدف زند تیرے

অর্থাৎ কোন সময় অবোধ ছেলে খামখেয়ালীমূলক তীর নিক্ষেপ করলে যথাস্থানে পৌছে যায়।) তবে হ্যাঁ, সত্য প্রকাশ পাবার পর যদি আমি এখন যে কথাটা বললাম, তা মেনে নেয়া না হয় এবং আগে যা বলা হয়েছে, সেই পুরানো কথা গাইতে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এ কথাটি নবী আলাইহিস সালামের প্রতি মহত্বের মাপকাঠি থেকে অনেক দূরে। এমনিভাবে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির সৌন্দর্যের উপর সাক্ষ্য দিতে হবে।" এর থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, সে 'খাতেম' এর যে অর্থ আবিষ্কার করেছে, তা আগে কখনও শোনা যায়নি এবং নবী আলাইহিস সালামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সবাই যা বুঝেছেন, তাকে সে সাধারণ ব্যক্তিদের ধারণা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তার এ ধরণের উক্তির জন্য পবিত্র মক্কা মদীনার আলেমগণ কি ফত্ওয়া দিয়েছেন, 'হুস্সামুল হেরেমাইন' কিতাবখানা অধ্যয়ন করলে বিস্তারিত জানতে পারবেন। সে নিজেও তার উক্ত কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠায় নিজেকে নামে মাত্র মুসলমান বলে স্বীকার করেছে ع مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری (লাখো দলীল থেকে তোমার নিজের স্বীকারোক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ) এ ধরণের নামে মাত্র মুসলমান থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

উক্ত কিতাবের ৫ম পৃষ্ঠায় সে লিখেছে- "নবীগণ স্বীয় উম্মত থেকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হয় কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় উম্মত বাহ্যতঃ সমকক্ষ, বরং অগ্রগামী হয়ে যায়"। ইতিপূর্বে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে এ উক্তিকারক হুযূর আলাইহিস সালামের নবুয়াতকে কদীম (স্থায়ী) ও অন্যান্য নবীগণের নবুয়াতকে হাদেছ (অস্থায়ী) বলেছে। মুসলমানদের মতে আল্লাহর স্বত্ত্বা ও গুণাবলী ব্যতীত অন্য কোন কিছু কদীম (স্থায়ী) হতে পারে কি? নবুয়াত হচ্ছে একটি গুণ এবং গুণের অস্তিত্ব গুণীবিহীন অসম্ভব। তাই হুযূর আলাইহিস সালামের নবুয়াত যেহেতু স্থায়ী, সেহেতু তিনিও স্থায়ী বলে গণ্য হবেন। কিন্তু আল্লাহ ও আল্লাহর গুণাবলী ভিন্ন অন্য কিছুকে যে স্থায়ী মনে করে, সে মুসলমানদের সর্বসম্মত অভিমতে কাফির। এ দলের এটা একটা সাধারণ অভ্যাস যে, যেইসব কাজে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ফযীলত প্রকাশ পায়, সেই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তা বাতিল করতে চায়। আর ওই ধরণের কাজ প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, যেথায় কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যেমন 'বারাহিনে কাতেয়া' কিতাবের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে- "দেওয়ালের

পিছনে কি আছে, সে জ্ঞানও নবী আলাইহিস সালামের নেই।" এবং এ উক্তিটাকে হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) এর বলে চালিয়ে দিয়েছে। একই পৃষ্ঠায় নবী করীম আলাইহিস সালামের জ্ঞানের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে এতটুকু পর্যন্ত লিখেছে- "মোটকথা চিন্তা করার বিষয় যে শয়তান ও মৃত্যুর ফিরিশতার জ্ঞানের অবস্থা দেখে সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত বিনা দলীলে কেবল ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে ফখরে আলম (দঃ) এর জ্ঞানের বিস্তৃতি প্রমাণ করা শিরক নয়তো কোন্ ঈমানের অংশ? শয়তান ও মৃত্যুর ফিরিশতার জ্ঞানের এ বিস্তৃতিতো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ফখরে আলমের (নবীজী) জ্ঞানের বিশালতা এমন কোন্ অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, যা সমস্ত দলীলকে রদ করে এ শিরককে প্রমাণ করে?" উক্ত ইবারতে শয়তানের জ্ঞানের যে প্রশস্ততা প্রমাণ করেছে এবং অকাট্য দলীলের কথা বর্ণনা করেছে, সেটা নবী করীম আলাইহিস সালামের জন্য শিরক বলেছে। তাহলে উক্তিকারক শয়তানকে খোদার অংশীদার মেনে নিয়েছে এবং একে কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বলে মনে করেছে। নিঃসন্দেহে এ শয়তানের বান্দা শয়তানকে স্বতন্ত্র খোদা না বললেও খোদার অংশীদার বলতে দ্বিধাবোধ করেনি। মুসলমানগণ নিজ নিজ ঈমানের চক্ষু দিয়ে দেখুন, এ উক্তিকারক অভিশপ্ত শয়তানের জ্ঞানকে নবী আলাইহিস সালামের জ্ঞান থেকে বেশী বলেছে কিনা? এবং শয়তানকে খোদার অংশীদার মনে করেছেন কিনা? এবং সেই শিরককে দলীল দ্বারা প্রমাণিত বলে দাবী করেছে। এ তিনটি কাজ সুস্পষ্ট কুফরী এবং উক্তিকারক নিঃসন্দেহে কাফির। এমন কোন মুসলমান থাকতে পারেনা, যিনি ওর কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেনা।

"হিফজুল ঈমান" কিতাবের ৭ম পৃষ্ঠায় হুযূর আলাইহিস সালামের জ্ঞান প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে- "তাঁর পবিত্র সত্ত্বার উপর ইলমে গায়েবের হুকুম আরোপিত করার ব্যাপারে যদি যায়েদের কথা সঠিক হয়, তাহলে একথা জানা দরকার যে, এ গায়েবের দ্বারা আংশিক গায়েবকে বোঝানো হয়েছে, নাকি পূর্ণ গায়েবকে বোঝানো হয়েছে। যদি আংশিক গায়েবকে বোঝানো হয়, তাহলে এতে হুযূরের কি বিশেষত্ব আছে? এ ধরণের গায়েবী ইলমতো যায়েদ আমর বরং প্রতিটি ছেলে, পাগল, এমনকি সমস্ত জীব জন্তুরও রয়েছে।" মুসলমানগণ ভেবে দেখুন, এ বেআদব, নবীর শানে কি ধরণের বেআদবী করেছে। হুযূরের যে জ্ঞান, তা নাকি যায়েদ, আমর, শিশু, পাগল এমনকি জীবজন্তুরও রয়েছে। কোন ঈমানদার

ব্যক্তিই এ ধরণের লোকের কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করতে পারেনা। এ দলের আর একটি সাধারণ নিয়ম হলো- যে জিনিষটা আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিষেধ করেননি বরং কুরআন হাদীছ থেকে প্রমাণিত আছে, সে জিনিষটা এরা শুধু না জায়েয বলে না বরং শিরক ও বিদআত বলে আখ্যায়িত করে। যেমন মিলাদ মাহফিল, কিয়াম, ঈসালে ছওয়াব, কবর যিয়ারত, হুযূর আলাইহিস সালামের রওজা পাকে উপস্থিত হওয়া, বুযর্গানে দ্বীনের উরস, ফাতিহা, কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদি নবী ও ওলীগণের রূহানী সাহায্য বিপদের সময় নবী ও ওলীগণকে ডাকা ইত্যাদি তাদের দৃষ্টিতে শিরক, বিদআত। 'বরাহিনুল কাতেয়া' গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায় মিলাদ শরীফ সম্পর্কে কি ধরণের জঘন্য শব্দ প্রয়োগ করেছে তা দেখুন- "প্রতিদিন মিলাদ মাহফিল করাটাতো হিন্দুদের অনুকরণ, যেমন ওরা প্রতিবছর হরিকৃষ্ণের জয়ন্তী পালন করে অথবা রাফেজীদের মত, যারা প্রতি বছর শাহাদতে আহলে বাইতকে নিয়ে মাতম করে থাকে (মায়াজাল্লা) নবীজির বেলাদতে পাককে রাধাকৃষ্ণের জয়ন্তীর সাথে তুলনা করেছে) এবং এ ধরণের আচরণ নিন্দনীয়, হারাম ও ফাসেকী কাজ। আর এ সমস্ত লোক ওই সম্প্রদায় থেকেও নিকৃষ্ট। ওরাতো নির্ধারিত দিনে করে থাকে, কিন্তু এদের কাছে নির্ধারিত কিছু নেই, যখন ইচ্ছা করে, তখন এসব মনগড়া কুসংস্কার পালন করে থাকে।"

লা—মযহাবী

লা-মযহাবীরা হচ্ছে ওহাবীদের একটি উপদল বিশেষ। আল্লাহ তা'আলা ও নবী করীম আলাইহিস সালামের শানে ওহাবীরা যে ধরণের বেআদবী করেছে, অবশ্য ওদের থেকে তা প্রমাণিত নেই। তবে অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের মিল রয়েছে। কট্টর ওহাবীদের কুফরী বক্তব্যসমূহের বেলায়ও ওরা একমত বলে মনে হয়, কারণ ওরা সেসব উক্তিকারকদেরকে কাফির মনে করেনা। অথচ শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে যে, ওদের কুফরীর ব্যাপারে যারা সন্দেহ করবে, তারাও কাফির বলে গণ্য হবে।

লা-মযহাবীদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- চারি মযহাবকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের থেকে আলাদা ওরা একটা নতুন রাস্তা আবিষ্কার করেছে। তারা তক্‌লীদ অর্থাৎ ইমামের অনুসরণকে হারাম ও বিদআত বলে এবং ধর্মীয়

ইমামদেরকে যা-তা বলে। কিন্তু আসলে তারা তক্লীদ থেকে মুক্ত নয়। ধর্মীয় ইমামদের অনুসারী না হলেও নিশ্চয়ই শয়তানের অনুসারী। এরা কিয়াসকে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে কিয়াসকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কুফরী।

<u>মাসআলাঃ</u> সাধারণ তক্লীদ ফরয এবং ব্যক্তি বিশেষের তক্লীদ ওয়াজিব।

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ</u> ওহাবীদের কাছে 'বিদআত' শব্দটা বহুল প্রচলিত। তারা যেকোন ব্যাপারে বিদআত বলে থাকে। তাই বিদআত কাকে বলে, তা নিয়ে কিছু আলোকপাত করা দরকার। যে বিদআত কোন সুন্নাতের বিপরীত ও প্রতিবন্ধক, সেটা মকরূহ অথবা হারাম। কিন্তু সাধারণ বিদআত হয়তো মুস্তাহাব অথবা সুন্নাত। এমনকি কোনটা ওয়াজিবও হয়ে থাকে। আমিরুল মুমেনীন হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) তারাবীহ নামায প্রসঙ্গে বলেছেন- نعمة البدعة هذه (এটা খুবই ভাল বিদআত)। অথচ তারাবীহ নামায হচ্ছে সুন্নাতে মুয়াক্কদা। যে কাজের মূল শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত, সেটা কখনও মন্দ বিদআত হতে পারে না। তা নাহলে স্বয়ং ওহাবীদের মাদ্রাসাসমূহ, তাদের ওয়াজের মাহফিল সমূহ সেই মাপকাঠিতে নিশ্চয় বিদআত বলে গণ্য হবে। কিন্তু কই, তারাতো এগুলোকে বিদআত বলেনা। তাদের নীতি হলো খোদার প্রিয় বান্দাদের মান-সমান সম্পর্কিত সমস্ত কাজ বিদআত কিন্তু যেসব কাজে তাদের স্বার্থ জড়িত, সেগুলো হালাল ও সুন্নাত- ولاحول ولاقوة الا بالله

ইমামতের বর্ণনা

ইমামত দু'প্রকার- সুগরা ও কুবরা। নামাযের ইমামতকে ইমামতে সুগরা বলা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ নামায শীর্ষক অধ্যায়ে করা হবে। হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের সমস্ত দুনিয়াবী ও দ্বীনি কাজে শরীয়ত মোতাবেক কর্তৃত্ব করার অধিকারকে ইমামতে কুবরা বলা হয়। পাপহীন কাজে এর আনুগত্য করা সমগ্র জাহানের মুসলমানের উপর ফরজ। এ ধরণের ইমামের জন্য মুসলমান, আজাদ, জ্ঞানী, প্রাপ্তবয়স্ক, সক্ষম ও কুরাইশী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু হাশেমী, আলভী, (আলীর বংশ) ও নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক নয়। এ শর্তগুলো রাফেজীরা আরোপ করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো- হযরত আবু বকর, হযরত উমর ফারুক ও হযরত উছমান গনী- এ তিন খলিফাকে খেলাফত থেকে বাদ দেয়া। অথচ ওনাদের খেলাফতের উপর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত রয়েছে। হযরত আলী (কঃ) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) তাঁদের খেলাফত মেনে নিয়েছেন। ওদের আলভী শর্তের দ্বারা হযরত আলীও খলিফা থেকে বাদ পড়ে যায়। কেননা হযরত আলী আলভী (আলীর বংশ) কিভাবে হতে পারে? আর নিষ্পাপ হওয়াটা হচ্ছে নবীগণ ও ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্য, যা আমরা আগে বর্ণনা করেছি। রাফেজীরাই ইমামদের নিষ্পাপ হওয়ার কথা বলে থাকে।

<u>১নং মাসআলা</u> ঃ শুধু ইমামতের উপযুক্ততা থাকা ইমাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়োজিত হওয়া বা সাবেক ইমাম কর্তৃক মনোনীত হওয়া প্রয়োজন। (শামী ৩য় খণ্ড ৪২৮ পৃঃ)

<u>২নং মাসআলা</u> ঃ ইমামের আনুগত্য শর্তহীনভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, যদি এর হুকুম শরীয়ত বিরোধী না হয়। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে কারো আনুগত্য করতে নেই। (শামী ৩য় খণ্ড ৪২৮ পৃঃ)

<u>৩নং মাসআলা</u> ঃ এমন ব্যক্তিকে ইমাম মনোনীত করতে হবে, যিনি আলেম ও সাহসী হবেন বা আলেমদের সাহায্যে কাজ পরিচালনা করবেন।

৪নং মাসআলা ঃ মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের ইমামত জায়েয় নেই। যদি পূর্ববর্তী ইমাম অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ইমাম মনোনীত করেন, তাহলে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত কার্য পরিচালনা করার জন্য একজন অভিভাবক মনোনীত করবে এবং এ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেটি নাম সর্বস্ব ইমাম হবে কিন্তু বাস্তবে অভিভাবকই তখন আসল ইমাম হবেন।

১নং আকীদা ঃ হুযূর আলাইহিস সালামের পর বরহক খলিফা ও ইমাম হলেন যথাক্রমে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উছমান গনী, হযরত মওলা আলী এবং ছয় মাসের জন্য ইমাম হাসান (রাঃ)। তাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদা এবং তাঁদের খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা বলা হয়। তাঁরা হুযূর আলাইহিস সালামের সঠিক প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ হক আদায় করেছেন। ফতওয়ায়ে আলমগীরীর ২৬৪ পৃষ্ঠায় খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকে অস্বীকার করাকে কুফরী বলা হয়েছে।

২নং আকীদা ঃ নবী ও রসূলগণের পর খোদার সমস্ত সৃষ্টিকুল, মানুষ, জ্বীন ও ফিরিশতা থেকে আফযল হলেন হযরত সিদ্দীক আকবর অতঃপর হযরত উমর ফারুক, এর পর হযরত উছমান গনী এবং তারপর হযরত মওলা আলী (রাঃ)। যে ব্যক্তি হযরত আলী (কঃ) কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক বা হযরত ফারুকে আযম থেকে আফযল মনে করে সে গোমরাহ ও বদ্‌মযহাবী হিসেবে গণ্য। (ফতওয়ায়ে আলমগীরী ২৬৪ পৃষ্ঠা)

৩নং আকীদা ঃ আফযল অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বেশী ইজ্জত ও মরতবাশালী হওয়া। একে অধিক পূণ্যবানও বলা যায়, কিন্তু অধিক প্রতিদান নয়। হাদীছ শরীফে সায়্যিদুনা ইমাম মাহদীর সঙ্গীদের প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের এক এক জনের জন্য পঞ্চাশ জনের প্রতিদান রয়েছে। জনৈক সাহাবা আরয করলেন- তাঁদের পঞ্চাশ জনের, না আমাদের পঞ্চাশ জনের প্রতিদান সমতুল্য? হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- তোমাদের প্রতিদান থেকে ওদের প্রতিদান বেশী। কিন্তু ফযীলতের দিক দিয়ে বেশীতো দূরের কথা, সমকক্ষও হতে পারেনা। কোথায় ইমাম মাহদীর সাথী আর কোথায় উভয় জাহানের সরদার হুযূর আলাইহিস সালামের সাথী- এর কোন তুলনাই হতে পারেনা। যেমন বাদশাহ কোন কাজে মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে পাঠালেন। কৃতকার্য হওয়ার পর বাদশাহ প্রত্যেক কর্মচারীকে লক্ষ টাকা করে বখশিশ দিলেন কিন্তু মন্ত্রীকে দিলেন কেবল একটি ধন্যবাদপত্র। ওরা বখশিশ বেশী

পেয়েছে বটে, কিন্তু কোথায় ওদের স্থান আর কোথায় মন্ত্রীর মর্যাদা।

৪নং আকীদা ঃ তাঁদের খেলাফত ফযীলতের ক্রমানুসারে হয়েছে অর্থাৎ যিনি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী ফযীলত প্রাপ্ত ও মর্যাদাশালী ছিলেন, তিনিই প্রথমে খেলাফত পেয়েছেন। খেলাফতের ক্রমানুসারে ফযীলত প্রাপ্ত হয়েছেন- তা নয়। যেমন সুন্নী বলে দাবীদার কতেক লোক তা-ই বলে থাকে। রাষ্ট্র শাসন ও পরিচালনায় দক্ষ ব্যক্তিকে আজকাল যেমন মর্যাদাশালী মনে করা হয়, তা যদি সঠিক হতো, তাহলে হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) সবচেয়ে আফযল বলে বিবেচিত হতেন। কেননা তাঁর খেলাফত সম্পর্কে বলা হয়েছে

لَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِيْ فَرْيَهٗ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

এবং হযরত সিদ্দীকে আকবরের খেলাফত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

فِيْ نَزْعِهٖ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهٗ ـ

৫নং আকীদা ঃ চার খলিফার পর আশারা মুবাশশরা (সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী) হযরত হাসান-হুসাইন, বদর যুদ্ধের সাহাবীগণ এবং বায়আতে রিদওয়ানের সাহাবীগণ অন্যান্যদের থেকে বেশী মর্যাদাবান। তাঁরা সবাই নিঃসন্দেহে বেহেশতী।

৬নং আকীদা ঃ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম সৎ ও ন্যায় পরায়ণ। যখনই তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা হবে, প্রশংসাসূচক হওয়াটাই একান্ত কর্তব্য।

৭নং আকীদা ঃ কোন সাহাবী সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা বদমযহাবী, গোমরাহী ও জাহান্নামী হওয়ার লক্ষণ, কেননা তা হচ্ছে হুযূর আলাইহিস সালামের সাথে শত্রুতাতুল্য। এ ধরণের লোককে রাফেজী বলা হয়, যদিওবা তারা চার খলিফাকে মান্য করে ও নিজেরা সুন্নী বলে দাবী করে। যেমন হযরত আমির মুয়াবিয়া, তাঁর পিতা হযরত আবু সুফিয়ান ও মাতা হযরত হিন্দা অনুরূপ সায়্যিদুনা উমর ইবনে আস্‌ হযরত মগিরা ইবনে শোবা, হযরত আবু মুসা আশয়ারী এমন কি হযরত ওহাশী (রাঃ) যিনি ইসলাম কবুল করার আগে শহীদগণের সরদার হযরত সায়্যিদুনা হামযা (রাঃ) কে শহীদ করেছিলেন এবং ইসলাম কবুল করার পর কুখ্যাত মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। তিনি নিজেই বলতেন "আমি সর্বোত্তম ও সর্বনিকৃষ্ট লোককে হত্যা করেছি।" তাঁদের মধ্যে কারো শানে বেআদবী করা জঘন্য পাপ যদিওবা তারা শেখাইন (হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ) এর শানে বেআদবী করেনা।

তাঁদের শানে বেআদবী এমনকি তাঁদের খেলাফত অস্বীকার করা ফকীহগণের মতে কুফরী।

৮নং আকীদা ঃ কোন ওলী যতই মর্যাদাশালী হোক না কেন, কোন সাহাবীর সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারেন না।

৫নং মাসআলা ঃ সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মধ্যে যেসব ঘটনাবলী ঘটেছে, সেসব নিয়ে মাথা ঘামানো হারাম, জঘন্য হারাম। মুসলমানদের এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁরা ছিলেন হুযূর আলাইহিস সালামের জন্য জান-কুরবান ও সত্যিকার খাদেম।

৯নং আকীদা ঃ বড় ছোট সকল সাহাবায়ে কিরাম বেহেশতবাসী হবেন। তাঁরা দোযখের কোন সাড়াশব্দ পাবেন না, আনন্দ উল্লাসের মধ্যে সদা ব্যস্ত থাকবেন। হাশরের সেই ভয়াবহ বিপদ তাঁদেরকে চিন্তাযুক্ত করবেনা। ফিরিশতাগণ তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন এবং বলবেন, এটা সেই দিন, যার সম্পর্কে আপনাদের সাথে ওয়াদা ছিল। কুরআন মজিদে এসব বর্ণিত আছে।

১০নং আকীদা ঃ সাহাবায়ে কিরাম নবী বা ফিরিশতা ছিলেন না যে তাদেরকে নিষ্পাপ বলা যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে কারো অবশ্য ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ে সমালোচনা করা আল্লাহ ও রসূলের আদেশের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদিদে, যেখানে মক্কা বিজয়ের আগে ও পরে ঈমান আনয়নকারী সাহাবায়ে কিরামের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে, ইরশাদ ফরমান- وكلا وعد الله الحسنى অর্থাৎ আল্লাহ সবার সাথে মঙ্গল করার ওয়াদা করেছেন। এরপর আরও ইরশাদ ফরমান- والله بما يعملون خبير অর্থাৎ তোমরা যা করবে, আল্লাহ তা সম্পর্কে ভাল মতে অবগত। আল্লাহ তা'আলা যখন ওদের সমস্ত আমলসূহ সম্পর্কে অবগত হয়ে বেহেশতের শুভ সংবাদ দিলেন, তখন অন্যদের কি অধিকার থাকতে পারে, তাঁদের ভর্ৎসনা করার? ভর্ৎসনাকারী কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজস্ব হুকুমত জারী করতে চায়?

১১নং আকীদা ঃ হযরত আমির মুয়াবিয়া (রাঃ) মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর মুজতাহিদ হওয়া সম্পর্কে বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। মুজতাহিদ থেকে ভুল-নির্ভুল উভয়টা প্রকাশ পায়। ভুল দু'প্রকার (১) ইচ্ছাকৃত ভুল ও (২) ইজতেহাদী ভুল। প্রথম প্রকার ভুল মুজতাহিদের হতে পারেনা। তবে দ্বিতীয় প্রকারের ভুল মুজতাহিদের হতে পারে এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবেনা। কিন্তু দুনিয়াবী

হুকুমাদির বেলায় এ ভুলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে- একটি হচ্ছে ধারণাগত ভুল; যেথায় ভুল ধারণা পোষাণকারীকে অগ্রাহ্য করা হবেনা। এ ধরণের ইজতেহাদী ভুলের দ্বারা ধর্মের মধ্যে কোন ফিতনা সৃষ্টি হয়না। যেমন আমাদের মযহাব মতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা না পড়া। অন্যটি হচ্ছে অগ্রাহ্যমূলক ভুল, যেথায় ভিন্ন ধারণা পোষণকারীকে অস্বীকার করা হয়. যদ্বারা ফিতনার সৃষ্টি হয়। হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার হযরত আলী (কঃ) এর বিরুদ্ধে এ রকম ভুল ছিল। এর মীমাংসা হুযূর আলাইহিস সালাম নিজেই করে দিয়েছেন অর্থাৎ হযরত মওলা আলীর পক্ষে রায় এবং হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার মাগফিরাত।

৬নং মাসআলা ঃ কতেক লোক যে বলে যখন হযরত মওলা আলী (কঃ) এর সাথে হযরত আমির মুয়াবিয়ার নাম নেয়া হয়, তখন যেন রাদিয়াল্লাহ আনহু বলা না হয়, এটা নিছক ভুল ধারণা ও ভিত্তিহীন। উলামায়ে কিরাম সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র নামের সাথে 'রাদিয়াল্লাহ আনহু' বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম মানে নতুন শরীয়ত প্রবর্তন।

১২নং আকীদা ঃ নবুয়াতের প্রতিনিধিত্ব মূলক সঠিক খেলাফত ৩০ বছর স্থায়ী ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান (রাঃ) এর ছয়মাস খেলাফতের পর তার সমাপ্তি ঘটে। পরে আমিরুল মুমেনীন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) এর খেলাফতও খেলাফতে রাশেদার অর্ন্তভুক্ত হয়েছে এবং শেষ যুগে হযরত ইমাম মাহদীর (রাঃ) খেলাফতও খেলাফতে রাশেদার অন্তর্ভূক্ত হবে। হযরত আমির মুয়াবিয়া (রাঃ) হলেন ইসলামের প্রথম বাদশাহ। এ প্রসঙ্গে তৌরাত কিতাবে ইঙ্গিত আছে। যেমন- مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهٗ طَيْبَةُ وَمُلْكُهٗ بِالشَّامِ অর্থাৎ সেই সর্বশেষ নবী আলাইহিস সালাম মক্কাতে জন্মগ্রহণ করবেন এবং মদীনাতে হিজরত করবেন। সিরিয়ায় তাঁর রাজত্ব কায়েম হবে। কাজেই আমিরে মুয়াবিয়ার শাসন রাজতন্ত্র হলেও তা হুযূর আলাইহিস সালামের রাজত্ব হিসেবে বিবেচ্য। সায়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) একটি নিবেদিত প্রাণ সৈন্যবাহিনীসহ যুদ্ধের ময়দানেই স্বেচ্ছায় অস্ত্র সংবরণ করেন এবং খেলাফতের দায়িত্ব হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার উপরে ছেড়ে দেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ সন্ধিটা হুযূর আলাইহিস সালামের পসন্দনীয় ছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যেমন তিনি ইমাম হাসানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

ان ابنی هذا سید لعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین

অর্থাৎ আমার এ পৌত্র সরদার হবেন। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বদৌলতে বিবাদমান দু'টি বড় ইসলামী দলের মধ্যে আপোষ করে দিবেন। তাহলে হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার প্রতি বিদ্রোহ ইত্যাদির অপবাদ দেয়া মানে মূলতঃ হযরত ইমাম হাসান তথা হুযূর আলাইহিস সালাম এমনকি আল্লাহর প্রতি অপবাদ দেয়া।

১৩নং আকীদা ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নিঃসন্দেহে জান্নাতী এবং পরকালেও তিনি হুযূর আলাইহিস সালামের প্রিয়জন হিসেবে থাকবেন। হযরত আয়েশাকে মনে কষ্ট দেয়া মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া। হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রাঃ) হলেন বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অর্ন্তভুক্ত। তাঁদের সাথে হযরত আলী (কঃ) এর ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। পরে অবশ্য তাঁরা ভুল স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শরীয়তের পরিভাষায় ন্যায় পরায়ণ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বগাওয়াত বলা হয়। কিন্তু তাঁরা ভুল স্বীকার করে নেয়ার কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপবাদ দেয়া যায়না। শরীয়তের পরিভাষায় হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার দলকে যদিওবা বাগী (বিদ্রোহী, বিশৃংখলাকারী) বলা হয়, কিন্তু কোন সাহাবার প্রতি এ ধরণের শব্দ প্রয়োগ জায়েয নেই।

১৪নং আকীদা ঃ খোদার হাবীবের প্রিয়া উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীকে আকবরের প্রতি অপবাদ দানকারী নিঃসন্দেহে কাফির, ধর্মদ্রোহী। (ফতওয়ায়ে আলমগীরী ২৬৪ পৃঃ)

১৫নং আকীদা ঃ হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) নিঃসন্দেহে শুহদায়ে কিরামের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাশালী। তাঁদের মধ্যে কারো শাহাদতকে অস্বীকারকারী গোমরাহ ও ধর্মদ্রোহি হিসেবে গণ্য।

১৬নং আকীদা ঃ ইয়াজিদ অপবিত্র, ফাসিক ও মহাপাপিষ্ট ছিল। এ পাপিষ্টের সাথে হুযূর আলাইহিস সালামের পৌত্র সায়্যিদুনা হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কোন তুলনাই হতে পারেনা। ইদানীং কতেক গোমরাহ বলে যে ওদের সম্পর্কে আমাদের মাথা ঘামানো উচিত নয়, কারণ উভয়ই শাহজাদা। এ ধরণের প্রচারণাকারী হলো মরদুদ, খারেজী, নাসেবী ও জাহান্নামী। অবশ্য এজিদকে কাফির বলা ও তার প্রতি লানত করা সম্পর্কে সুন্নী আলেমদের তিনটি অভিমত রয়েছে। আমাদের ইমাম আযমের অভিমত হচ্ছে এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা অর্থাৎ আমরা ওকে ফাসিক, ফাজির বলতে পারি কিন্তু কাফির বা মুসলমান বলতে পারিনা।

১৭নং আকীদা ঃ আহলে বাইত অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র বংশধরগণ আহলে সুন্নাতের অনুসারী। যারা তাদের সাথে মহব্বত রাখেনা, তারা মরদুদ, মলউন ও খারেজী বলে আখ্যায়িত।

১৮নং আকীদা ঃ উম্মুল মুমেনীন খদিজাতুল কুবরা, হযরত আয়েশা ও হযরত ফাতেমা জুহরা নিঃসন্দেহে জান্নাতী। তাঁরা ও হুযূরের অন্যান্য কন্যাগণ ও বিবিগণ সমস্ত মহিলা সাহাবীর উপর ফযীলত প্রাপ্ত।

১৯নং আকীদা ঃ তাঁদের পবিত্রতা সম্বন্ধে কুরআনে পাক সাক্ষ্য দিয়েছেন–

لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

বেলায়েতের বর্ণনা

বেলায়েত হচ্ছে এক বিশেষ নৈকট্য, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমত ও করুণার দ্বারা তাঁর পসন্দনীয় বান্দাদেরকে দান করেন।

১নং মাসআলা ঃ বেলায়েত হচ্ছে খোদায়ী দান। এমন নয় যে সাধনার দ্বারা এটা লাভ করা যায়। অবশ্য প্রায় সময় নেক আমলসমূহ এ খোদায়ী দান অর্জনের ওসীলা হয়ে থাকে। তবে অনেকেই শুরুতে পেয়ে যান।

২নং মাসআলা ঃ অজ্ঞলোকেরা বেলায়েত লাভ করতে পারেনা, হয়তো বাহ্যিকভাবে জ্ঞান অর্জন করে থাকবে অথবা ঐ পর্যায়ে পৌছার আগে আল্লাহ তা'আলা কশফের দ্বারা ওকে জ্ঞান দান করে থাকবে।

১নং আকীদা ঃ আগে পরের সমস্ত আওলিয়া কিরাম থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর আওলিয়া কিরাম আফযল এবং উম্মতে মুহাম্মদীর সমস্ত আওলিয়া কিরামের মধ্যে মারেফাত ও খোদার নৈকট্য লাভের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশালী হলেন চার খলিফা। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হলেন হযরত সিদ্দীক আকবর, ফারুকে আযম, তারপর হযরত উছমান অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)। তবে হুযূর আলাইহিস সালাম শেখাইনকে অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রাঃ) কে কামালাতে নবুয়াত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং হযরত মওলা আলী (কঃ) কে কামালাতে বেলায়েত দ্বারা ভূষিত করেছেন, তাঁর থেকেই বেলায়েতের সূচনা হয় এবং পরবর্তী সমস্ত আওলিয়া কিরাম তাঁরই বংশধর থেকে বেলায়েত প্রাপ্ত হয়েছেন ও হবেন।

২নং আকীদা ঃ তরীকত শরীয়তের বিপরীত নয়। এটা শরীয়তেরই বাতেনী অংশ। সূফী নামধারী কতেক মূর্খব্যক্তি বলে যে, শরীয়ত এক জিনিষ আর তরীকত এক জিনিষ। এ ধরণের ধারণা গোমরাহী মাত্র। এ ধরণের বাতিল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেকে শরীয়তের গণ্ডী থেকে মুক্ত মনে করাটা সুস্পষ্ট কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতা।

৩নং মাসআলা ঃ যত বড় ওলী হোন না কেন, শরীয়তের হুকুমাদির বন্ধন থেকে রেহাই পেতে পারেননা' কতেক জঘন্য জাহেল বুলি আওড়ায় 'শরীয়ত হচ্ছে রাস্তা আর রাস্তার প্রয়োজন হয় তাদের যারা মঞ্জিলে মকছুদ পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। আমরাতো পৌছে গেছি।' হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাঃ) তাদের সম্পর্কে বলেছেন- صَدَقُوْا لَقَدْ وَصَلُوْا وَلٰكِنْ اِلٰى اَيْنَ اِلَى النَّارِ

(তারা ঠিকই বলেছে যে, তারা পৌছে গেছে। তবে কোথায় পৌছে গেছে জানেন, জাহান্নামে)। অবশ্য মজযূবের বেলায় শরীয়তের প্রতিবন্ধকতা থাকেনা; যেমন সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির উপর শরীয়তের দায়-দায়িত্ব থাকেনা। তবে এটাও বুঝতে হবে যে যারা এ রকম হবে, তাদের মুখে এ ধরণের শরীয়ত বিরোধী কথা কখনও বের হবেনা।

৪নং মাসআলা ঃ আওলিয়া কিরামকে আল্লাহ তা'আলা অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দান করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জনসেবী, তাঁদেরকে অনেক কিছু হস্তক্ষেপ করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। তাঁরাই হুযূর আলাইহিস সালামের সঠিক নায়েব। তাঁদের ইখতিয়ার ও কর্তৃত্ব হুযূর আলাইহিস সালামের ওসীলায় লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের কাছে ইলমে গায়েব প্রকাশ পায়। তাঁদের অনেকেই আগে-পরের ঘটনা ও লওহে মাহফুজ সম্পর্কে অবহিত হয়। কিন্তু এসব কিছু তাঁরা একমাত্র হুযূর আলাইহিস সালামের মাধ্যম ও বদান্যতায় লাভ করেন। রসূলের মাধ্যম ব্যতীত নবী ভিন্ন অন্য কেউ গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হতে পারেনা।

৩নং আকীদা ঃ ওলীগণের কারামাত হক; এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।

৫নং মাসআলা ঃ মৃতব্যক্তিকে জীবিত করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান, দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত এক মুহূর্তে পরিভ্রমণ করা, মোটকথা অনেক অসাধ্য কাজ আওলিয়া কিরাম দ্বারা সম্ভব। তবে যেগুলো অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো কখনও সম্ভব নয়- যেমন কুরআন মজিদের সূরার মত কোন সূরা প্রকাশ করা বা পৃথিবীতে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর দিদার বা কথা বলার সুযোগ লাভ করা। যে এ অসম্ভব বিষয়গুলো নিজের জন্য বা অন্য কোন নবীর জন্য দাবী করে, সে কাফির।

৬নং মাসআলা ঃ আওলিয়া কিরামের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা তাঁদের পসন্দনীয়। তাঁরা সাহায্য প্রার্থনাকারীদের সাহায্য করে থাকেন। তবে বৈধভাবে প্রার্থনা করতে হবে। তাঁদেরকে স্বতন্ত্র ক্ষমতাশালী মনে করা হয় বলে যে প্রচারণা করা হয়, তা ওহাবীদের ধোঁকা মাত্র। কোন মুসলমান কোন সময় এ রকম ধারণা করেনা। মুসলমানদের কাজকে অনর্থক বক্র দৃষ্টিতে দেখা, ওহাবীদের একটা অভ্যাস।

৭নং মাসআলা ঃ আওলিয়া কিরামের মাযার যিয়ারত করা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময়।

৮নং মাসআলা ঃ তাঁদেরকে দূর বা কাছ থেকে ডাকা আগের যুগের নেক বান্দাদের অনুসৃত নীতি।

৯নং মাসআলা ঃ আওলিয়া কিরাম স্বীয় মাযারসমূহে স্থায়ী জীবন সহকারে জীবিত আছেন। তাঁদের জ্ঞান, উপলব্ধি ও দেখা-শোনার ক্ষমতা আগের চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

১০নং মাসআলা ঃ তাঁদের জন্য ঈসালে ছওয়াব করা একান্ত বরকতময় ও মুস্তাহাব। একে প্রচলিত অর্থে সম্মানস্বরূপ অনেকে নজর নিয়াজ বলে যেমন বাদশাহকে নজরানা দেয়া হয়। কিন্তু এ নজর শরয়ী নজর নয়। এসব ঈসালে ছওয়াবের মধ্যে গিয়ারভী শরীফের ফাতিহা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কাজ।

১১নং মাসআলা ঃ আওলিয়া কিরামের উরসে কুরআনখানি, ফাতিহা খানি, না'ত খানি, ওয়াজ, ঈসালে ছওয়াব ইত্যাদি খুবই উত্তম কাজ। শরীয়ত বিরোধী কাজ যে কোন অবস্থায় নিন্দনীয়। পবিত্র মাযারসমূহের আশে পাশে তা অধিক নিন্দনীয়।

সাবধান ঃ যেহেতু প্রায় মুসলমানেরাই আওলিয়া কিরাম থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে, পীরগণের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং তাঁদের হাতে বাইয়াত গ্রহণকে নিজের জন্য উভয় জাহানে মঙ্গলময় মনে করে, সেহেতু আজকালকার ওহাবীরা জনগণকে গোমরাহ করার জন্য তারাও পীরগীরী শুরু করে দিয়েছে, অথচ তারা ওলীগণকে অস্বীকার করে। তাই যদি মুরিদ হতে চান, ভালভাবে যাচাই করে পীর গ্রহণ করবেন, নতুবা বদমযহাবীর খপ্পরে পড়ে ঈমানহারা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

পীরগীরীর জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। বাইয়াত গ্রহণ করার আগে তা যাচাই করে দেখা একান্ত প্রয়োজন। এ শর্তগুলো হচ্ছে- এক, সঠিক সুন্নী আকীদার অনুসারী হওয়া চায়, দুই, কিতাব থেকে প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ বের করার মত জ্ঞান থাকা চায়, তিন, ফাসিক না হওয়া চায় এবং চার, নবী করীম আলাইহিস সালামের সাথে সিলসিলার সম্পর্ক থাকা চায়।

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

[১ম খণ্ড সমাপ্ত]

বাহারে শরীয়ত
২য় ও ৩য় খণ্ড

মূল

সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

-ঃ প্রকাশক ঃ-
মোঃ সাঈদুর রাহামান আশরাফী
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক (নিউ মার্কেট) রুম নং-৫০
জেলা মালদহ (পঃবঃ) ৭৩২২০১
ফোন ঃ ০৩৫১২-২৪৪১৪৮
মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

প্রকাশক ঃ মৌঃ মোঃ সাঈদুর রহমান

সাঈদ বুক ডিপো

নিউ মার্কেট, রুম নং-৫০

কালিয়াচক, মালদহ।

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ লেখকের

تقریظ

امام اہلسنت مجدد مائۃ حاضرہ مؤید ملت طاہرہ اعلیحضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لاسیما علی الشارع المصطفی ومقتفیہ فی المشارع اولی الطہارۃ والصفا

فقیر غفرلہ المولی القدیر نے یہ مبارک رسالہ بہار شریعت حصہ دوم وسوم تصنیف لطیف اخی فی اللہ ذی المجد والجاہ والطبع السلیم والفکر القویم والفضل والعلی مولنا ابو العلی مولوی حکیم محمد امجد علی قادری برکاتی اعظمی بالمذہب والمشرب والسکنی رزقہ اللہ تعالی فی الدارین الحسنی مطالعہ کیا، الحمد للہ مسائل صحیحہ رجیحہ محققہ منقحہ پر مشتمل پایا آجکل ایسے کتاب کی ضرورت تھی کہ عوام بھائی سلیس اردو میں صحیح مسئلے پائیں اور گمراہی واغلاط کے مصنوع وملمع زیوروں کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں مولی عزوجل مصنف کی عمر وعلم وفیض میں برکت دے اور ہر باب میں اس کتاب کے اور حصص کافی و شافی ووافی وصافی تالیف کرنے کی توفیق بخشے اور انہیں اہلسنت میں شائع ومعمول اور دنیا وآخرت میں نافع ومقبول فرمائے، آمین

والحمد للہ رب العلمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ومولنا محمد وآلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ اجمعین آمین، ۱۳ر شعبان المعظم سنہ ۱۳۳۶ ہجریۃ علی صاحبہا وآلہ الکرام افضل الصلوۃ والتحیۃ، آمین،

کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا
عفی عنہ بمحمد ن المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم

মোজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)এর

অভিমত

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অসংখ্য সালাম তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি, বিশেষতঃ শরীয়তের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি, পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার ধারক শরয়ী বিধানে তাঁর পদাঙ্ক অনুসারীদের প্রতি। নগণ্য এ বান্দা (সর্বশক্তিমান মাওলা ক্ষমা করুন) এর বরকতময় গ্রন্থ 'বাহারে শরীয়ত' দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড (কৃতঃ মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আমজাদ আলী কাদেরী বরকাতী আজমী আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উভয় জাহানে সফলতা দান করুন) আমি পাঠ করেছি। আল-হামদুলিল্লাহ! মাসয়ালা সমূহ বিশুদ্ধ, বিশ্লেষণধর্মী এবং চমৎকার পেয়েছি। বর্তমানে এমন কিতাবের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা ছিলো। যেন সর্বসাধারণ ভাইয়েরা বিশুদ্ধ উর্দুতে বিশুদ্ধ মাসয়ালা সমূহ পায় এবং ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ, ভুল, মনগড়া এবং বাহ্যিক চাকচক্যময় মাসয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে। মহান আল্লাহ তায়ালা রচয়িতার আয়ু, জ্ঞান এবং ফয়জে বরকত দান করুন। এ কিতাবের প্রতিটি পরিচ্ছেদে বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ, ত্রুটিহীন, পবিত্র এবং সত্য মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করার তাওফীক দান করুন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে এ কিতাবের ব্যাপক প্রচার – প্রসার হোক এবং তা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী এবং মকবুল করুন। আমীন।

"ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, ওয়াসাল্লাল্লাহু আ'লা সৈয়্যাদানা ওয়ামাওলানা মুহাম্মদ, ওয়াআলিহি ওয়াছহাবিহি ওয়াইবনিহি ওয়াহিযবিহি আজমায়ীন।"

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিত ছাহাবীদের প্রতি উত্তমতর সা'লাত ও সালাম বর্ষিত হউক। আমীন।

১২ই শা'বান, ১৩৩৭ হিজরী

আহমদ রেযা

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা সৈয়্যাদিনা মাওলানা মুহাম্মদিন

ওয়ালিহি ওয়াসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম্

পরম করুণাময় মহান আল্লাহর দরবারে অফুরন্ত শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি যার অসীম করুণায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের খেদমতে কিতাবটির চতুর্থ সংস্করণ পেশ করার সুযোগ হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, তাহারাত বা পবিত্রতা ও নানাবিধ বিধান সম্পর্কে মুসলিম সমাজের অনেকেই অবগত নন। এ শূন্যতাকে বিদূরিত করতে যুগের এক নাজুক সন্ধিক্ষণে এগিয়ে এসেছিলেন পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মুফাসসির সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী (রহঃ)। প্রণয়ন করেন, বাহারে শরীয়ত ২০ খণ্ডে বিভক্ত ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রের এক বিশাল গ্রন্থ। জনাব অধ্যাপক লুৎফুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনুদিত হয়ে কিতাবটির প্রথম খণ্ড ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রকাশিত খণ্ডগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য সম্মানিত পাঠক সমাজের চাহিদা ও বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ কিতাবটির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড অনুবাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করি। রেযা ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, অনূদিত খণ্ড গুলো পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আলহাজ্ব খায়রুল বশর ছাহেব (রহঃ)'র তনয় স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ'র আর্থিক বদান্যতায় কিতাবখানি সুলভ মূল্যে পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে উভয় জাহানের কামিয়াবী দান করুন।

যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। বিগত সংস্করণের কিছু সংখ্যক মুদ্রণ প্রমাদ দূরীকরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। হিতাকাংখীদের পরামর্শকেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও গঠনমূলক পরামর্শ গ্রন্থের মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। গ্রন্থখানি পাঠ করে মুসলিম ভাই বোনেরা যদি সামান্যটুকুও উপকৃত হন এ অধমের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা স্বার্থক মনে করবো।

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওসিলায় এ ক্ষুদ্র খিদমত কবুল করুন। এর দ্বারা আমাদের মাতা-পিতা ও পীর মুর্শিদের হায়াত দারাজ করতঃ ইহ ও পরলৌকিক কামিয়াবী নসীব করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। পারিবারিক, সামাজিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক সব সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন। কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী বিধানের উৎস। জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে অসংখ্য জিজ্ঞাসার জবাব, বিভিন্ন বিধি বিধান সম্পর্কে আমাদের মনে প্রতিনিয়ত জাগ্রত হয় অজস্র প্রশ্ন, এসব বিষয়ের বাস্তব সমাধান বের করতে ফিকহ শাস্ত্রের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এজন্যই ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইলমে ফিক্হ নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উত্তীর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী ইসলামী জ্ঞানভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ, অনূদিত গ্রন্থটি ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রের জগতে এক অনন্য সম্পদ, বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অনুবাদে ব্রতী হয়েছেন বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মুহতারম আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী ছাহেব, এর জন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবি করুন। প্রকাশনার কাজে নিজকে সম্পৃক্ত করতে পেরে পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র খিদমত কবুল করুন। -আমীন।

বিনীত
আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

বাহারে শরীয়ত
২য় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
* মূল লিখকের ভূমিকা	১১
* পবিত্রতা পর্ব	১৪
* এতেক্বাদী ফরজ, আমলী ফরজ, এতেক্বাদী ওয়াজিব, আমলী ওয়াজিব, সুন্নতে মুআক্কাদাহ, সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ, মুস্তাহাব, মুবাহ, কতয়ী হারাম, মাকরুহ তাহরীমি, এছায়াত, মাকরূহ তানযীহ, খেলাফে আওলা এর সংজ্ঞা সমূহ	১৫
* অযুর বিবরণ ও ফজিলত সমূহ	১৭
* ফকিহী আহকাম বা অযুর ফরজ সমূহ	২০
* অযুর সুন্নত সমূহ	২৪
* অযুর মুস্তাহাব সমূহ	২৭
* অযুর মাকরূহ সমূহ	৩০
* অযুর বিবিধ মাসায়েল	৩১
* অযু ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ	৩২
* বিবিধ মাসায়েল	৩৭
* গোসলের বর্ণনা	৩৮
* গোসলের মাসায়েল ও ফরজ সমূহের বর্ণনা	৪২
* গোসলের সুন্নত সমূহ	৪৪
* গোসল ফরজ হওয়ার কারণ সমূহ	৪৬
* পানির বিবরণ	৫২
* কোন প্রকারের পানি দ্বারা অযু জায়েজ, কোন প্রকারের পানি দ্বারা জায়েজ নয়	৫৩
* কূপের বর্ণনা	৫৮
* মানুষ এবং প্রাণীর এঁটোর বর্ণনা	৬৩
* তায়াম্মুমের মাসায়েল	৬৭
* তায়াম্মুমের ফরজ	৭৩
* তায়াম্মুমের সুন্নত সমূহ	৭৫
* কোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ এবং জায়েজ নয়	৭৬
* তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ সমূহ	৭৮
* মোজার উপর মাছেহ করার বর্ণনা	৭৯
* মাছেহ করার পদ্ধতি, মোজার উপর মাছেহ করার মাসায়েল, অযুর অঙ্গ সমূহে মাছেহ করার বর্ণনা	৮২
* মাছেহ ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমূহ	৮৩

* হায়েজের বর্ণনা ৮৪
* হায়েজের মাসায়েল ৮৬
* নিফাসের বর্ণনা ৮৯
* হায়েজ-নিফাস সম্পর্কিত বিধানাবলী ৯১
* এস্তেহাযার বর্ণনা ৯২
* মাযুরের বিধান ৯৪
* অপবিত্র বস্ত্র পবিত্র করার নিয়ম ৯৯
* শৌচকার্যের বর্ণনা ১০৫
* শৌচকার্য সম্পর্কিত মাসায়েল ১০৭
* সংযোজন ১১১-১২১

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

বাহারে শরীয়ত ৩য় খণ্ড

* নামায পর্ব-নামাযের বর্ণনা ১২২
* মুস্তাহাব ওয়াক্ত সমূহ ১৩০
* মাকরূহ ওয়াক্ত সমূহ ১৩১
* নফল নামায পড়ার নিষিদ্ধ সময় সমূহ ১৩২
* আযানের বর্ণনা ১৩৪
* আযানের ফজীলত ও আযানের জওয়াব দেওয়ার ফজীলত ১৩৪
* আযানের মাসায়েল-ফকিহী মাসায়েল ১৩৭
* ইক্বামতের মাসায়েল ১৪০
* আযানের জওয়াব ১৪২
* তাসবীব ও আযানের বিবিধ মাসায়েল ১৪৩
* নামাযের শর্ত সমূহের বর্ণনা ১৪৪
* প্রথম শর্তঃ তাহারাত বা পবিত্রতা ১৪৪
* দ্বিতীয় শর্তঃ সতর ঢাকা ১৪৬
* তৃতীয় শর্তঃ ক্বিবলামুখী হওয়া ১৫১
* চতুর্থ শর্তের মাসায়েল ১৫২
* চতুর্থ শর্তঃ ওয়াক্ত হওয়া ১৫৬
* পঞ্চম শর্ত ঃ নিয়্যত করা ১৫৬
* ষষ্ঠ শর্তঃ তাকবীর তাহরীমা ১৬২
* নামায পড়ার নিয়ম ১৬৭
* নামাযের ফরজ সমূহ ১৬৮
* প্রথমঃ তাকবীর তাহরীমা ১৬৮
* দ্বিতীয়ঃ দাঁড়ানো – ও নামাযের ফজিলত ১৭০
* তৃতীয়ঃ ক্বেরাত ১৭১
* চতুর্থ ঃ রুকু ১৭২
* পঞ্চমঃ সিজদা ১৭২
* ষষ্ঠঃ শেষ বৈঠক ১৭৩
* সপ্তমঃ কর্মদ্বারা নামায হতে বের হওয়া ১৭৪
* নামাযের ওয়াজিব সমূহ ১৭৫
* নামাযের সুন্নত সমূহ ১৭৮
* দরুদ শরীফের ফাজায়েল ও মাসায়েল ১৮৬
* নামাযের মুস্তাহাব সমূহ ১৯২
* নামাযের পর জিকর ও দু'আ' ১৯২
* কুরআন মজীদ পড়ার বর্ণনা ১৯৭
* ক্বেরাতের মাসায়েল ১৯৮
* ক্বেরাতে ভুল হওয়ার বর্ণনা ২০৫
* ইমামতের বর্ণনা ২১০
* ইমামতের শর্তাবলী ২১২
* নামাজে এক্তেদার শর্তাবলী ২১৩
* ইমাম হওয়ার অধিক যোগ্য কে? ২১৭
* জামাতের বর্ণনা, জামাতের ফজিলত, জামা'ত বর্জনের মন্দ পরিণতি, প্রথম সারির ফজিলত, কাতার সোজা করা ও কাঁধ মিলায়ে দাঁড়ানো, নামায বর্জনের শাস্তি হাদীসের আলোকে ২২৪
* জামা'তের মাসায়েল ২৩২
* জামা'ত ত্যাগের ওজর সমূহ ২৩৩
* মুক্তাদি কোথায় দাঁড়াবে ২৩৩
* মহিলার বরাবর দাঁড়ালে পুরুষের নামায ফাসেদ হওয়ার শর্তাবলী ২৩৫
* মুক্তাদির প্রকারভেদ ও বিধানাবলী ২৩৭
* মুক্তাদি কখন ইমামের অনুসরণ করবে, কখন করবে না ২৪১
* নামাযে অযূহীন হওয়ার বর্ণনা ২৪৩
* নামায ভিত্তির শর্ত সমূহ ২৪৩
* খলীফা করার বর্ণনা ২৪৬
* নামায ভঙ্গকারী বিষয়ের বর্ণনা ২৪৯
* লোকমা দেওয়ার বর্ণনা ২৫২
* নামাযীর আগে গমন করার নিষিদ্ধতা ২৫৮
* নামাযের মাকরূহ সমূহের বর্ণনা ২৬০
* নামাযের ৪৩টি মাকরূহ তাহরীমী সমূহ ২৬৫
* ছবির বিধান ২৬৮
* মাকরূহ তানযীহ সমূহ ২৭০
* নামায ভঙ্গের ওজর সমূহ ২৭৫
* মসজিদের বিধানাবলীর বিবরণ ২৭৬-২৮৫

[তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

بہار شریعت

حصہ دوم و حصہ سوم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد فی ذاته وصفاته
فلا مثل له ولا ضد له ولم یکن له کفوا احد، والصلوٰة
والسلام الاتمان الاکملان علی رسوله وحبیبه سید الانس
والجان الذی انزل علیه القراٰن هدی للناس وبینات من
الهدی والفرقان وعلی اٰله وصحبه ماتعاقب الملوان وعلی
من تبعهم باحسان الی یوم الدین، لاسیما الائمة المجتهدین
خصوصا علی افضلهم واعلمهم الامام الاعظم والهمام الافخم
الذی سبق فی مضمار الاجتهاد کل فارس وصدق علیه
لوکان العلم عند الثریا لناله رجل من ابناء فارس سیدنا
ابی حنیفة النعمان بن ثابت ثبتنا الله به بالقول الثابت۔
فی الحیاة الدنیا وفی الاخرة واعطانا الحسنی وزیادة فاخرة
وعلینا لهم وبهم یا ارحم الراحمین والحمد لله رب العلمین

بسم الله الرحمن الرحيم

মূল লিখকের ভূমিকা

এমন এক যুগ ছিল, যখন প্রত্যেক মুসলমান এতটুকু জ্ঞান রাখতো যা তার প্রয়োজনের যথেষ্ট হতো। মহান আল্লাহর করুণায় অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম মওজুদ ছিলেন, লোকেরা যা জানতো না তা সহজভাবে তাদের থেকে জিজ্ঞেস করতো। এমনকি হযরত ফারুকে আজম ওমর (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমাদের বাজারে তাঁরাই বেচাকেনা করবে, যাঁরা দ্বীনি বিষয়ে প্রজ্ঞাবান। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আ-লা বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াকুব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। অতঃপর নবুয়তের যুগ যতই অতিক্রম করছিল ইলম ততই হ্রাস পাচ্ছিল, ফলে এমন এক যুগ এসে পড়লো, সাধারণ জনগণ তো আছেই অসংখ্য এমন লোক রয়েছে যারা নিজেদের আলেম দাবী করছে অথচ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় শাখা প্রশাখা মূলক মাসআলা এমনকি ফরজ, ওয়াজিব সম্পর্কেও অবগত নন। যতটুকু জ্ঞান রাখেন ততটুকু সম্পর্কেও বিমুখ। যদ্বারা সাধারণ জনগণ তাদেরকে দেখে কিছু শিক্ষা লাভ করা এবং আমল করার সুযোগ লাভ করতো, এহেন্ জ্ঞানের স্বল্পতা ও উদাসীনতার ফলশ্রুতি। এমন অসংখ্য মাসায়েল, যে বিষয়ে অবগতি নেই তা অস্বীকার করে বসে। অথচ না নিজে জ্ঞান রাখেন, যদ্বারা জানবে, না শিখতে আগ্রহী, যদ্বারা জ্ঞানীদের থেকে জিজ্ঞেস করবে, না আলেমদের শরণাপন্ন হবে। তাঁদের সান্নিধ্য, বরকতময় এবং মাসায়েল শিক্ষা লাভের মাধ্যমও বটে। উর্দু ভাষায় আজ পর্যন্ত সর্বসাধারণের বোধগম্য নির্ভরযোগ্য সহজ সরল এমন কোন কিতাব প্রকাশিত হয়নি, কতেক কিতাব সামান্য মাসআলা সম্বলিত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও এতে যথেষ্টরূপে আলোকপাত হয়নি। কতেক কিতাব অমার্জনীয় ভুল ভ্রান্তিতে ভরপুর। এহেন পরিস্থিতিতে এমন এক কিতাব রচনা তীব্রভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়লো, যদ্বারা সাধারণ শ্রেণীর পাশাপাশি শিক্ষিতরাও উপকৃত হবে। সুতরাং অধম মুসলমানদের শুভ কল্যাণ কামনার্থে الدين النصح لكل مسلم অর্থাৎ 'দ্বীন হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা।' অত্র হাদীস এর দাবী অনুসারে মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এ মহান গুরুত্বপূর্ণ কার্যে মনোনিবেশ করলাম। অথচ আমি ভালভাবেই জানি যে, এ পদমর্যাদা ও এ কাজের যোগ্যতা আমার নেই। এতটুকু সময় সুযোগও নেই যে, পূর্ণ সময় ব্যয় করে এ কাজ আঞ্জাম দিব।

وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

(১) এ কিতাবের ভাষা একান্ত সহজ করার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যেন বুঝার ক্ষেত্রে জটিল কঠিন না হয়। স্বল্পজ্ঞানী, মহিলারা এবং ছোট-ছেলেরাও যেন এর দ্বারা উপকার অর্জন করতে পারে, তারপরও ইলম বহু কঠিন জিনিস।

ইসলামী জটিলতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব নহে। অবশ্য এমন অনেক স্থান রয়েছে, যা জ্ঞানীদের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার প্রয়োজন হবে। কমপক্ষে এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, এর বর্ণনা তাকে সজাগ করবে এবং যারা বুঝবে না তারা জ্ঞানীদের সান্নিধ্যে মনোনিবেশ করবে।

(২) এ কিতাবের মাসআলা সমূহের প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করা হবে না। এক তো, প্রমানাদি বুঝা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ দলীলাদির কারণে অধিকাংশ লোকেরা এত বেশী জঠিলতায় পড়বে, যদ্বারা মূল মাসয়ালা বুঝা কষ্টকর হবে, বিধায় মাসয়ালার বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন হুকুমটি বর্ণনা করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণাদি গ্রহণে আগ্রহী হন, তিনি যেন "ফতওয়ায়ে রিজভীয়া" শরীফ অধ্যায়ন করে নেন।

উক্ত কিতাবে প্রত্যেক মাসয়ালার এমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে বিরল এবং এতে এমন সহস্র মাসয়ালার সন্ধান মিলবে, যে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ও অবগত নন।

(৩) এ কিতাবে যথাসাধ্য বিরোধমূলক মাসয়ালার বর্ণনা করা হয়নি। যেহেতু সাধারণ মানুষের সামনে যখন পরস্পর বিরোধী দুটি বক্তব্য পেশ করা হয়, আমল কোনটির উপর করবে এ ব্যাপারে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং এমন অনেক সুবিধা ভোগী বান্দা রয়েছে যেটার মধ্যে নিজের ফায়েদা দেখবে সেটা গ্রহণ করে নেয়, সত্য বুঝে নহে। বরঞ্চ নিজের উদ্দেশ্য অর্জন হওয়াটা খেয়াল করে অতঃপর যখন অন্যটির মধ্যে নিজের উপকার দেখবে তখন সেটা গ্রহণ করবে। এরূপ নাজায়েয। এটা শরীয়তের অনুসরণ নহে বরং নফসে অনুসরণমাত্র। বিধায় প্রত্যেক মাসয়ালায়, যেটির উপর ফতওয়া বিশুদ্ধ, সর্বাধিক শুদ্ধ, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উক্তিটিই বর্ণনা করা হবে। যেন, বিনা কষ্টে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমল করার তৌফিক দান করেন এবং তদ্বারা মুসলমানদের উপকার সাধন করতে পারে এবং এ অমূল্য প্রচেষ্টা যেন কবুল করেন।

وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وما خلقت الجن والانس الاليعبدون.

অর্থঃ মানব ও জ্বীনকে আমি আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। প্রত্যেক স্বল্প জ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, যে বস্তু যে কাজের জন্য সৃষ্ট সে কাজ না হলে তা অর্থহীন। সুতরাং যে মানব নিজের স্রষ্টা ও মালিককে চিনবে না এবং তাঁর ইবাদত বন্দেগী করবে না সে অকেজো মানুষ, প্রকৃত মানুষ নহে, বরং একটি অযথা সৃষ্টি।

প্রতীয়মান হলো যে, ইবাদতের কারণেই মানুষ মানুষ নামে স্বার্থক। এতেই ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি। এ জন্যই প্রত্যেক মানুষকে ইবাদতের প্রকারভেদ, আরকান, শর্তাবলী ও আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অতীব জরুরী। ইলম ছাড়া অমল করা অসম্ভব। এ কারণে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। ইবাদতের মূল হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া ইবাদত মূল্যহীন। শিকড়ই না থাকলে ফল কোথেকে আসবে। বৃক্ষ তখন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়, যদি তার শিকড়ের অস্তিত্ব থাকে। শিকড় পৃথক হলে তা আগুনের খোরাকে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে কাফের লক্ষ ইবাদত করলেও তার সম্পূর্ণ জীবনের সাধনা - আয়োজন বৃথা যাবে, ধ্বংশ হবে এবং জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন–

وقد منا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.

অর্থঃ আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো। অতঃপর সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো। (পারা-১৯, সূরা-ফুরকান)

মুসলিম হিসেবে মানুষের জিন্মায় দু'প্রকার ইবাদত ফরজ। এক প্রকার যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় হলো, যা অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় প্রকারের আহকাম ও প্রকারভেদ যা ইলমে সুলুক তথা তরীক্বত বিষয়ক জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত এবং প্রথম প্রকার সম্পর্কে ফিকাহ্ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। আমি এ কিতাবে কার্যতঃ প্রথম প্রকার সম্পর্কেই বর্ণনা করতে চাই। অতঃপর যে ইবাদত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা দেহের বাহ্যিক অংশের সাথে সম্পর্কিত তা দু'প্রকার এ বিষয়টি বান্দা এবং তার প্রভুর মধ্যে নির্দিষ্ট। পারস্পরিক কোন কাজ ভাঙ্গা বা গড়া বান্দার কাজ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় কাজ সম্পাদনে স্বাধীন। যেমন পঞ্জেগানা নামায ও রোজা, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য জনের শরীক ছাড়া তা আদায় করতে পারে। যদি অন্যকে শরীক করা প্রয়োজন হয়। যেমন জামাত সহকারে নামায, জুমা, দুই ঈদের নামায, জামাত ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু এর দ্বারা সকলের উদ্দেশ্য হলো একমাত্র স্রষ্টার ইবাদত করা। পারস্পরিক কোন কাজ আঞ্জাম দেয়া নয়।

দ্বিতীয় প্রকার হলো যে, বান্দার পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধনই এ ক্ষেত্রে লক্ষনীয়। যেমন, বিবাহ বা ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। প্রথম প্রকারকে ইবাদত, দ্বিতীয় প্রকারকে মোয়ামেলাত বলা হয়। প্রথম প্রকারে যদিও বা কোন দুনিয়াবী উপকারিতা বাহ্যতঃ দৃশ্যমান না হয়, মোয়ামেলাতে অবশ্যই পার্থিব উপকারিতা দৃশ্যমান। বরং এ দিকটাই প্রাধান্যযোগ্য। কিন্তু উভয়টি ইবাদত। যদি মোয়ামেলাত আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশানুসারে হয় তখন পূণ্যের যোগ্য

অন্যথায় গুনাহ এবং শাস্তির কারণ। প্রথম প্রকার অর্থাৎ ইবাদত চারটিঃ নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান হচ্ছে নামায। এটি আল্লাহর নিকট অত্যাধিক প্রিয় ইবাদত। বিধায় আমাদেরকে সর্বাগ্রে এর বর্ণনা দেয়া সমীচিন। কিন্তু নামায পড়ার পূর্বে নামাযীকে পবিত্র হওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। পবিত্রতা নামাযের চাবিকাঠি। সুতরাং প্রথমে পবিত্রতার মাসায়েল বর্ণনা করা হবে। এরপর নামাযের মাসায়েল বর্ণনা করা হবে।

كتاب الطهارة

পবিত্রতা পর্ব

নামাযের জন্য পবিত্রতা এরূপ অপরিহার্য জিনিস যে, এতদ্ব্যতীত নামাযই হবে না। বরং জেনে বুঝে অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করাকে ওলামায়ে কেরাম কুফরী লিখেছেন এবং কেনই হবে না যে, অযুহীন এবং গোসলহীন নামায আদায়কারী ইবাদতের প্রতি বেআদবী প্রদর্শন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অবমাননা করল। নবী করিম করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নামায জান্নাতের চাবিকাঠি এবং পবিত্রতা নামাজের চাবিকাঠি।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। একদিন নবী করিম করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে সূরা রুম পড়তেছিলেন এবং এলোমেলো হয়ে গেল, নামাযের পর এরশাদ করেন যে, কি হলো! তাঁদের যাঁরা আমাদের সাথে নামায পড়ছে এবং ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না, এদের কারণে ক্বেরাতে ইমামের সন্দেহ হয়। এ হাদীসটি নাসায়ী শবীব বিন আবি রওহ থেকে, তিনি এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, পূর্ণ পবিত্রতা ব্যতিরেকে নামায পড়লে যদি এ অবস্থা হয় তাহলে পবিত্রতা বিহীন নামায পড়ার পরিণতি কি হবে?

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে-"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" এ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাছন। তাহারাত বা পবিত্রতা দু'প্রকার (১) ছোগরা বা ছোট পবিত্রতা (২) কুবরা বা বড় পবিত্রতা। তাহারাতে ছোগরা হচ্ছে অযু, কুবরা হচ্ছে গোসল। যেসব কারণে শুধু অযু অপরিহার্য হয় একে হাদছে আছগর বলা হয়। যেসব কারণে গোসল ফরজ হয় একে হাদছে আকবর বলা হয়। এসব বিষয়ে এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে। কতিপয় প্রয়োজনীয় পরিভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা নিতান্ত অপরিহার্য। যা প্রত্যেক স্থানে কাজে আসবে।

ফরজে এতেক্বাদী, বা বিশ্বাসমূলক ফরজঃ

ফরজে এ'তেক্বাদী : যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ এমন দলীল দ্বারা যে দলীলে কোন সন্দেহ নেই। যার অস্বীকারকারী হানফী ইমামদের মতে কাফির। যদি তার ফরজিয়ত দ্বীন ইসলামের নির্দিষ্ট ও ব্যাপক বিষয়ের সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল মাসয়ালা হয়, তখন তার অস্বীকারকারীর কুফরীর উপর অকাট্য ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে যে ব্যক্তি অস্বীকারকারীর কুফরীর উপর সন্দেহ করবে, সে নিজেও কাফির হবে। এবং সর্বাবস্থায় যে কোন ফরজে এতেক্বাদী সঠিক শরয়ী ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত একবারও ছেড়ে দিলে ফাসেক মুরতাকাবে কবীরা এবং জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হবে। যেমন- নামায, রুকু, সিজদা।

ফরজে আমলী, বা কার্যগত ফরজঃ

ফরজে আমলী হলো, যে ফরজের দলীল এমন অকাট্য নয়, কিন্তু মুজতাহিদ গবেষকদের দৃষ্টিতে শরীয়তের প্রমাণাদির নির্দেশের দৃঢ়তা রয়েছে। যা করা ছাড়া মানুষ দায়িত্বমুক্ত হবেনা। এমন কি তা যদি কোন ইবাদতের মধ্যে ফরজ হয় তখন ঐ ইবাদত তা আদায় ব্যতিরেকে বাতিল হবে। বিনা কারণে অস্বীকার ফাসেকী ও গোমরাহী, হ্যাঁ কোন ব্যক্তি যদি শরীয়তের দলিলাদির পর্যালোচনার যোগ্যতা রাখে, দলীলে শরয়ীর ভিত্তিতে অস্বীকার করলে করা যাবে যেমন, মুজতাহিদ ইমামদের পারস্পরিক মতবিরোধ, মতানৈক্য। একজনের নিকট কোন একটি বিধান ফরজ বলেছেন, অন্যজন বলেননি, যেমন হানাফীদের মতে মাথার চতুর্থাংশ মুছেহ অযুর মধ্যে ফরজ। শাফেয়ীর মতে একটি চুল, মালেকীদের মতে পূর্ণ মাথা, হানফীদের মতে অযুর মধ্যে বিছমিল্লাহ বলা এবং নিয়্যত করা সুন্নত। হাম্বলী ও শাফেয়ীদের মতে ফরজ। এছাড়া আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ফরজে আমলী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে হবে। যিনি যে ইমামের মুকাল্লিদ বা অনুসারী। নিজ ইমামের বিপরীত শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া অন্যের অনুসরণ জায়েজ নেই।

ওয়াজিবে এতেক্বাদী, বা বিশ্বাসমূলক ওয়াজিবঃ যার আবশ্যকতা দলীলে জন্নী বা ধারণীয় দলীল দ্বারা প্রমাণিত। ফরজে আমলী এবং ওয়াজিবে আমলী এর দুটি প্রকার এবং তা এ দু'প্রকারে সীমাবদ্ধ।

ওয়াজিবে আমলী, বা কার্যগত ওয়াজিবঃ ওয়াজিবে, আমলী বা ওয়াজিবে এতেক্বাদী, করা ছাড়াও দায়িত্বমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এর প্রয়োজনের উপর ধারণা প্রবল হতে হবে। কোন ইবাদতে তা প্রণয়ন করা প্রয়োজন পড়লে তা ব্যতিরেকে ইবাদত অসম্পূর্ণ থাকবে। আদায় করলেই

ইবাদত পূর্ণতা লাভ করবে। মুজতাহিদ দলীলে শরয়ীর আলোকে ওয়াজিব অস্বীকার করতে পারে। কোন ওয়াজিব একবারও ইচ্ছাকৃত ছাড়লে গুনাহে ছগীরা হবে। কয়েকবার ত্যাগ করলে কবীরা হবে।

সুন্নতে মুআক্কাদাহঃ সুন্নতে মুআক্কাদাহ যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করতেন, অবশ্য "বয়ানে জওয়াজ" বা জায়েজ প্রমাণের জন্য কোন কোন সময় ত্যাগ করতেন বা যে সুন্নত পালনে অধিক তাগিদ করেছেন কিন্তু ছাড়ার দিক সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করেননি। তা পরিত্যাগ করা খারাপ, করাটা ছওয়াব, একেবারে বর্জন ক্রোধ, অসন্তোষ এবং অভ্যস্থ হলে শাস্তির যোগ্য হবে।

সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ ঃ সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ হলো, যা শরয়ী দৃষ্টিতে এমনভাবে তলব করা হয়েছে যে, যা পরিত্যাগ করাটা অপছন্দনীয়, কিন্তু এতটুকু নয় যে, তা পরিত্যাগে শাস্তি দেয়া হবে। উপরন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা কখনও করতেন, কখনও করতেন না। তা করা ছওয়াব। না করলে যদিও খা অভ্যাসগত হয় ক্রোধের কারণ নয়।

মুস্তাহাব ঃ মুস্তাহাব হচ্ছে যা শরয়ী দৃষ্টিতে পছন্দনীয়, কিন্তু পরিত্যাগ অপছন্দনীয় নহে। যদিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তা করেছেন, বা উৎসাহিত করেছেন বা ওলামায়ে কেরাম তা পছন্দ করেছেন। যদিও বা হাদীস শরীফে তা উল্লেখ করা হয়নি, তা করলে ছওয়াব, আর না করলে সাধারণতঃ কিছু হবে না।

মুবাহ ঃ মুবাহ হচ্ছে, যা করা বা না করা সমান।

কতয়ী হারামঃ বা অকাট্য হারাম ঃ হারামে কতয়ী হচ্ছে, ফরজের বিপরীত, একবারও তা ইচ্ছাকৃত করা কবীরা গুনাহ ও ফাসেকী এবং বেচে থাকা ফরজ ও ছওয়াব।

মাকরূহ তাহরীমি ঃ মাকরূহ তাহরীমি হচ্ছে ওয়াজিবের বিপরীত তা করলে ইবাদত অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হবে, গুনাহগার হবে। যদিও বা করার গুনাহ হারামের থেকে কম হয়, কয়েকবার করলে কবীরা গুনাহ হবে।

এছাআত ঃ যা করাটা অন্যায় ও খারাপ, মাঝে মধ্যে করাটা অসন্তোষ বা ক্রোধের যোগ্য এবং ক্রিয়ার বাধ্যবাধকতা করণে শাস্তির যোগ্য হবে। এটি সুন্নতে মুআক্কাদাহ এর বিপরীত।

মাকরূহ তানযিহী ঃ যা শরয়ী দৃষ্টিতে করাটা অপছন্দনীয়, কিন্তু এতটুকু নয় যে, তার উপর শাস্তি আরোপিত হবে। এটি সুন্নতে মুআক্কাদাহ এর বিপরীত।

খেলাফে আওলাঃ যা না করাটা উত্তম ছিল। করে ফেললে কোন ক্ষতি, শাস্তি বা ক্রোধ নেই। এটি মুস্তাহাবের বিপরীত, এসবের বর্ণনায় বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা পাওয়া যাবে, কিন্তু এটাই বিশ্লেষণের সারকথা।

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى ‎،

অযুর বিবরণ

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ .... اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۝

অর্থঃ হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, এবং তোমাদের মাথায় মুছেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে। সুরা মায়িদা-পারা-৬

অযুর ফজীলত সংক্রান্ত কতিপয় হাদিছ উল্লেখ করাটা সমীচীন মনে করছি, অতঃপর এ সম্পর্কে ফিক্হী বিধানাবলী বর্ণনা করা হবে।

হাদীসঃ (১) বোখারী, মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমার উম্মতদেরকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে, যে তাদের মুখমন্ডল এবং হাত, পা অযুর চিহ্নের কারণে উজ্জল ধবধবে হবে, তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা সে যেন তার উজ্জলতা বৃদ্ধি করে।

হাদীসঃ (২) হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে বললেন আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর সংবাদ দিবনা? যদ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন, মর্যাদা উন্নত করবেন। আরজ করলেন, হ্যাঁ এয়ারাসুলাল্লাহ! কষ্টের সময় পূর্নরূপে অযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পা চলা, এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকা, এর ছওয়াব এরকম, যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে কাফেরদের সীমান্তে ঘোড়া বেঁধে পাহারা দেয়া।

হাদীসঃ (৩) হযরত আবদুল্লাহ্ সুনাবেহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কোন ঈমানদার বান্দা অযু করতে আরম্ভ করে এবং কুল্লি করে, তখন তার মুখ হতে যাবতীয় গুনাহ্ বের হয়ে যায়। আর যখন নাকে পানি দেয় তখন তার নাক হতে যাবতীয় গুনাহ্ বের হয়ে যায়। যখন মুখমন্ডল ধৌত করে তখন মুখমন্ডল হতে যাবতীয় গুনাহ্ দুর হয়ে যায়। এমনকি তার চক্ষুদ্বয়ের পাতার নীচ হতেও গুনাহ্ সমূহ দূর হয়ে যায়। যখন সে তার হস্তদ্বয়

ধৌত করে তখন তার হস্তদ্বয় হতে গুনাহ্ সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার হাতের নখের নীচ হতেও। যখন সে মাথা মুছেহ্ করে তখন তার মাথা হতে যাবতীয় গুনাহ্ দূর হয়ে যায় এমনকি তার কর্ণদ্বয় হতেও। যখন তার পদদ্বয় ধৌত করে তখন তার পদদ্বয় হতে গুনাহ্ সমূহ দূর হয়ে যায়। এমনকি তার পায়ের আঙ্গুলীর নীচের গুনাহ্ পর্যন্ত। অতঃপর তার মসজিদের প্রতি গমন ও নামায পড়া তার জন্য অতিরিক্ত কাজ (ইমাম মালেক ও নাসায়ী)

হাদীসঃ (৪) বাজ্জাজ (রাঃ) হাসনসূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ওসমান (রাঃ) স্বীয় ক্রীতদাস হামরান থেকে অযুর জন্য পানি চাইলেন এবং শীতের রাত্রিতে বাইরে যেতে ইচ্ছে করলে, হামরান বলেন, আমি পানি নিয়ে আসতাম। তিনি মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ধুয়ে নিতেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে অভাবমুক্ত করুক, রাত্রিতো অধিক ঠান্ডা। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে বান্দা পূর্ণরূপে অযু করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার পূর্বাপর গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

হাদীসঃ (৫) "তিবরানী" আওসাতে, হযরত আমিরুল মুমিনীন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রচন্ড শীতে পূর্ণরূপে অজু করবে তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে।

হাদীসঃ (৬) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আনস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একবার অযু করল, এটা অবশ্য করনীয়। যে ব্যক্তি দু'বার করবে, সে দ্বিগুন ছওয়াব পাবে। আর যেব্যক্তি তিনবার তিনবার ধৌত করবে, সেটা আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের অযু।

হাদীস (৭) ইমাম মুসলিম ওকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মুসলমান অযু করবে এবং উত্তমরূপে করবে। অতঃপর দাঁড়াবে এবং জাহের বাতেন সহকারে মনোনিবেশ করে দুরাকাত নামায পড়বে। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।

হাদীসঃ (৮) মুসলিম শরীফে হযরত আমিরুল মুমিনীন ফারুকে আজম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে অযু করবে সে যেন পূর্ণরূপে অযু করে। অতঃপর পড়বে, اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।

হাদীসঃ (৯) তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযুর পর অযু করবে তার জন্য দশটি নেকী লিখা হবে।

হাদীসঃ (১০) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন বোরায়দা (রাঃ) নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদিন ভোরে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ) কে ডাকলেন এবং বললেন, ওহে বেলাল, কোন আমলের কারণে তুমি আমার আগে আগে জান্নাতে বিচরণ করছো? আমি রাত্রি জান্নাতে গিয়েছি আমার পায়ের আগে তোমার পদদ্বয়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রাঃ) আরজ করলেন, এয়ারাসুলাল্লাহ্! আমি আজান দিতাম আজানের পর দু রাকাত নামায পড়তাম যখন আমার অযু ভেঙ্গে যেত, অযু করে নিতাম। হুযুর এরশাদ করেন, এ কারনেই তোমার এ মর্যাদা।

হাদীসঃ (১১) তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে বিছমিল্লাহ্ পড়লনা, তার অযু হয়নি, অর্থাৎ অযু পূর্ণ হয়নি।

হাদীসঃ (১২) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)(হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে বিছমিল্লাহ্ বলে অযু করল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার আপাদ মস্তক শরীর পবিত্র হয়ে গেল। আর যে বিছমিল্লাহ্ ছাড়া অযু করল, তার এতটুকু শরীর পবিত্র হবে যতটুকুতে পানি অতিক্রম করেছে (দারেকুত্নী, বায়হাকী)

হাদীসঃ (১৩) বোখারী, মুসলিম শরীফে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কেউ স্বপ্ন হতে জাগ্রত হবে, তখন অযু করবে, এবং তিনবার নাক পরিষ্কার করবে, শয়তান তার নাসিকার অগ্রভাগে রাত অতিক্রম করে।

হাদীসঃ (১৪) তিবরানী হাসন সূত্রে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন হুযুর করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক অযুর সাথে মিসওয়াক করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিতাম। (অর্থাৎ ফরজ করে দিতাম) কতেক বর্ণনায় ফরজ শব্দও এসেছে।

হাদীসঃ (১৫) তিবরানী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক না করা পর্যন্ত কোন নামাযের জন্য তশরীফ নিতেন না।

হাদীসঃ (১৬) মুসলিম শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন বাহির থেকে ঘরে আসতেন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।

হাদীসঃ (১৭) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন মিসওয়াক আবশ্যক ভাবে কর। তা হলো, মুখমণ্ডলের পরিচ্ছন্নতা ও আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির উপায়। (ইমাম আহমদ)

হাদীসঃ (১৮) আবু নাঈম, জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন মিসওয়াক করে দুরাকাত নামায পড়া। মিসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত পড়ার চেয়ে উত্তম।

হাদীসঃ (১৯) এক রেওয়ায়াতে আছে যে, মিসওয়াক করে যে নামায পড়া হয় তা মিসওয়াক বিহীন পড়ার চেয়ে সত্তর গুন উত্তম।

হাদীসঃ (২০) মিশকাত শরীফে আছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে দশটি বিষয় সনাতন স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ তার বিধান প্রত্যেক শরীয়তে ছিল) (১) গোঁফ খাট করা (২) দাঁড়ি লম্বা করা (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা (৫) নখ কাটা (৬) আঙ্গুলির গিরা মসৃহ ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়ায়ে ফেলা (৮) গুপ্তস্থানের লোম কাটা(৯) শৌচকর্ম করা (১০) কুল্লি করা।

হাদীসঃ (২১) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বান্দা যখন মিসওয়াক কার্য সমাধা করে অতঃপর নামাযে দণ্ডায়মান হয়। তখন ফেরেস্তা তাঁর পিছনে দাড়ায়ে ক্বেরাত শ্রবণ করেন, তার নিকটবর্তী হয়। এমনকি তার মুখ নামাযীর মুখের উপর রাখেন, মাশায়েখ কেরাম বলেন, যে মিসওয়াকে অভ্যস্থ, মৃত্যুর সময় তার কলেমা নসীব হবে। আর যে আফীম ভক্ষন করে মৃত্যুকালে তার কলেমা নসীব হবে না।

ফকিহী আহকামঃ

উপরে বর্ণিত আয়াত দ্বারা প্রমানিত, অযুর ফরজ চারটি। (১) মুখমন্ডল ধৌত করা, (২) দু হাতের কনুইসহ ধৌত করা (৩) মাথা মুছেহ করা (৪) দু পায়ের টাখনুসহ ধৌত করা। কোন অঙ্গ ধোয়ার অর্থ হলো, এ অঙ্গের প্রত্যেক অংশে যেন কমপক্ষে দু ফোটা পানি প্রবাহিত হয়। ভিজালে বা তৈলের ন্যায় ছিটকালে বা এক ফোটা, অর্ধ ফোটা পানি গড়ায়ে দিলেই ধৌতকরা বলা যাবে না এবং এরদ্বারা অযু গোসলও আদায় হবে না। এ বিষয়টি সর্তক দৃষ্টিতে দেখা বাঞ্ছনীয়। শরীরের কতেক স্থান এমন রয়েছে

যতক্ষণ এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে না, এবং পানি প্রবাহিত হবে না, অযুই হবে না। যার বিস্তারিত বিবরণ প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনায় আসবে। কোন হাদছের স্থানে আর্দ্রতা পৌছানোকেই মুছেহ বলে।

কপালের শুরু থেকে মুখমন্ডল ধৌতকরা অর্থাৎ যেখান থেকে চুল উঠার সমাপ্তি। দৈর্ঘ্য প্রস্থে চিবুক পর্যন্ত, এক কান হতে দ্বিতীয় কান পর্যন্ত, মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। এ সীমানার মধ্যে চামড়ার প্রত্যেক অংশে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ যার মাথার অগ্রভাগের চুল পড়ে গেছে বা উঠেনি তার ততদুর পর্যন্ত মুখ ধোয়া ফরজ। আর যদি স্বাভাবিক ভাবে যতদূর পর্যন্ত চুল থাকে এর নীচে পর্যন্ত কারো চুল জমাঠ হলে তখন অতিরিক্ত চুলের গোড়া পর্যন্ত ধৌত করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ গোঁফ বা চোখের ভ্রু, বা ছোট ছেলের চুল ঘন হলে চামড়া মোটেই দেখা যাচ্ছেনা। তখন চামড়া ধৌত করা ফরজ নহে, চুল ধৌত করা ফরজ। আর যদি এ স্থানের চুল ঘন না হয় তখন চামড়া ধৌত করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ গোঁফ লম্বা হয়ে যদি ঠোঁঠকে ও ঢেকে ফেলে যদিও বা ঘন হয় গোঁফ সরায়ে ঠোঁঠ ধৌত করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ দাড়ি যদি ঘন না হয়, চামড়া ধৌত করা ফরজ। ঘন হলে, তখন গলার ভিতর দিকে যতটুকু চেহারার আশপাশ আছে তা ধৌত করা ফরজ। গোড়া ধৌত করা ফরজ নহে এবং কণ্ঠনালীর নীচের অংশও ধৌত করা জরুরী নহে। কিছু অংশ ঘন কিছু অংশ পাতলা হলে ঘন অংশে লোম ধোয়া এবং পাতলা অংশে চামড়া ধৌত করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ ঠোঁঠের যে অংশ স্বাভাবিক বন্ধ করার পরও প্রকাশ পায় তা ধৌত করা ফরজ। কেউ খুব জোরে ঠোঁঠ বন্ধ করলে, যে অংশ ভিতরে প্রবেশ করেছে এতে পানিও পৌছেনি, ধোয়াও হয়নি কুলির পানিও পৌছেনি, তখন অজু হবে না। হ্যাঁ ঐ অংশ যা স্বাভাবিক মুখ বন্ধ করলে দেখা যায় না, তা ধৌত করা ফরজ নহে।

মাসয়ালাঃ মুখমন্ডল এবং কানের মাঝখানে যে স্থান আছে তা ধৌত করা ফরজ। হ্যাঁ ঐ অংশের যতটুকু স্থানে, দাড়ির ঘন লোম থাকে সেখানে লোমের অংশ ধৌত করবে। যেখানে দাড়ির অংশ থাকবে না বা ঘনও হবে না তখন চামড়া ধৌত করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ নাকের ছিদ্র যদি বন্ধ না হয়, তার মধ্যে পানি প্রবাহিত করা ফরজ। যদি সঙ্কীর্ণ হয় পানি প্রবেশের সময় নাক নাড়া দেবে। অন্যথায় জরুরী নহে।

মাসয়ালাঃ চোখের খোলা অংশ এবং ভিতরাংশে ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই বরং উচিৎ নহে, তা ক্ষতিকর।

মাসয়ালাঃ মুখ ধোয়ার সময় চক্ষু জোরে বন্ধ রাখতে গিয়ে পলক সংযুক্ত ক্ষুদ্র মণিতে পানি প্রবাহিত হয়নি এবং তা স্বাভাবিক বন্ধ রাখলে দেখা যায়, তখন অযু হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ করা সমীচীন নয়। আর যদি বেশী অংশ ধৌত করা না হয় অযু হবে না।

মাসয়ালাঃ চোখের কুঠরীতে পানি প্রবাহিত করা ফরজ। সুরমার আকৃতি চক্ষুর কোণে বা পলকে বাকী রেখে অযু করে নিল, জানাও ছিল না। নামায পড়ে নিলে ক্ষতি নেই, নামায হয়ে যাবে। জানতে পরলে পানি ছিটকায়ে প্রবাহিত করা জরুরী।

মাসয়ালাঃ চক্ষুর পলকের প্রত্যেক লোম সম্পূর্ণরূপে ধৌত করা ফরজ। যদি এতে কাদা বা শক্ত কোন বস্তু জমে যায়, তখন পানি ছিটকানো ফরজ।

হাত ধৌত করাঃ (কনুইসহ এর অন্তর্ভুক্ত)

মাসয়ালাঃ যদি কনুই থেকে নখ পর্যন্ত কোন স্থান বিন্দুমাত্র ধোয়া থেকে বাদ পড়ে অযু হবে না।

মাসয়ালাঃ প্রত্যেক প্রকারের জায়েজ নাজায়েজ ঘুন, ছাল, আংটি, স্বর্ণনির্মিত পেছানো বলয়, কাঁচের চুড়ি, রেশমের গুচ্ছ ইত্যাদি যদি এতটুকু সঙ্কীর্ণ হয় যে নীচে পানি গড়িয়ে যাচ্ছে না, তখন খুলে ফেলে ধৌত করা ফরজ। শুধুমাত্র নাড়া দিলে ধোয়ার পানি যদি গড়িয়ে যায় তখন নাড়া দেয়া জরুরী। আর যদি ঢিলা হয় নাড়া দেয়া ছাড়াইও নীচে পানি গড়িয়ে যাবে তখন কিছু জরুরী হবে না।

মাসয়ালাঃ হাতের আঙ্গুলের আটটি ফাঁক, আঙ্গুলের পার্শ্বে নখের ভিতর যে খালি জায়গা আছে এবং হাতের কব্জির প্রত্যেক লোম গোড়া থেকে প্রান্ত পর্যন্ত সবস্থানে পানি গড়িয়ে যাওয়া জরুরী। সামান্যও যদি বাদ পড়ে বা লোমের গোড়ায় পানি পৌঁছেছে কোন এক লোমের প্রান্তে পানি পৌঁছেনি অযু হবে না, কিন্তু নখের ভিতরের ময়লা ক্ষমা যোগ্য।

মাসয়ালাঃ পাঁচটির স্থলে ছয়টি আঙ্গুল আছে সবগুলো ধৌত করা ফরজ।

মাথা মাছেহ করাঃ মাথার এক চতুর্থাংশ মাছেহ করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ মাছেহ করার জন্য হাত আদ্র হওয়া সমীচীন । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করারপর হাত আদ্র হউক বা নতুন পানি দ্বারা হাত ভিজায়ে নেয়া হোক।

মাসয়ালাঃ কোন অঙ্গ মাছেহ করার পর হাতে যে আদ্রতা বাকী থাকে অন্য অঙ্গ মাছেহ করার জন্য যথেষ্ট হবে না।

মাসয়ালাঃ মাথায় চুল না থাকলে তখন চামড়ার চতুর্থাংশে, আর চুল থাকলে নির্দ্দিষ্ট মাথার চুলের চতুর্থাংশ মাছেহ করা ফরজ। এটাকে মাথা মাছেহ বলা হয়।

মাসয়ালাঃ পাগড়ী, টুপি, চাদর, ওড়নার উপর মাছেহ যথেষ্ট নহে। হ্যাঁ টুপি, চাদর,

দুপাট্টা যদি এতটুকু পাতলা হয় যে, আদ্রতা টপকে মাথার চতুর্থাংশ ভিজে যাবে তখন মাছেহ হবে।

মাসয়ালাঃ মাথার যে চুলগুলো লটকানো আছে তার উপর মাছেহ করলে মাছেহ হবে না।

চতুর্থ ফরজঃ উভয় পায়ের টাখনু সহ একবার ধৌতকরা।

মাসয়ালাঃ ছাল এবং পায়ের ঘুনের ঐ হুকুম যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

মাসয়ালাঃ কতেক লোক কোন রোগের কারনে পায়ের আঙ্গুল সমুহে এমনভাবে সুতা বাঁধে যেখানে পানি গড়ানো তো দুরে থাক, সুতার নীচে ভিজা পর্যন্ত হয় না। এর থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য, এ অবস্থায় অযু হবে না।

মাসয়ালাঃ আঙ্গুলের ফাঁক সমূহ এবং আঙ্গুলের পার্শ্বের নীচে গোড়ালীর নীচে সবটুকু ধৌত করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ যে সব অঙ্গ ধৌত করা ফরজ এর উপর পানি গড়িয়ে যাওয়া শর্ত। ইচ্ছাকৃতভাবে পানি গড়িয়ে দেয়াটা জরুরী নহে। অনিচ্ছাকৃতভাবেও তার উপর পানি গড়িয়ে গেলে হবে। যেমন বৃষ্টিপাতের পানি অযুর প্রত্যেক অঙ্গের. প্রতি অঙ্গে দু ফোঁটা দু ফোঁটা পানি গড়িয়ে গিয়ে অযুর অঙ্গ ধুয়ে গেল এবং মাথার চতুর্থাংশ অতিক্রম করল, বা কোন পুকুরে পতিত হল এবং অজুর অঙ্গের উপর পানি অতিক্রম করলো, অযু হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ যে বস্তু সাধারণতঃ বা বিশেষতঃ মানুষের প্রয়োজন পড়ে, এবং তার রক্ষনাবেক্ষন ও সতর্কতার মধ্যে অসুবিধা হয়। যেমন, নখের ভিতর বা উপর বা অন্য কোন ধোয়ার স্থানে তা লেগে থাকলে, যদিও অপরাধ জনিত হয়, যদিও বা তার নীচে পানি না পৌঁছে যদিও শক্ত জিনিস হয়, অযু হয়ে যাবে। যেমন, রান্না করা বা আটা রং করার জন্য রন্ধকদের আটা ঠাসার চিহ্ন থাকে, মহিলাদের মেহেন্দীর চিহ্ন, লেখকদের কালির চিহ্ন, শ্রমিকের কাদা মাটি, সাধারণ মানুষের পলকের মধ্যে সুরমার চিহ্ন। এভাবে শরীরের ময়লা, মাটি, বালি, মাছি, মশার মল ইত্যাদি ধোয়ার পর তা লেগে থাকলেও অযু হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কোন স্থানে কাঠের চোকলা ছিল তা শুকায়ে গেল কিন্তু তার চামড়া পৃথক হলনা। তখন চামড়া পৃথক করে পানি গড়িয়ে দেয়া জরুরী নহে, বরং কাঠের চোকলার চামড়ার উপর পানি প্রবাহিত করাই যথেষ্ট। অতঃপর পৃথক করে নিল, তখনও তার উপর পানি গড়িয়ে দেয়া জরুরী নহে।

মাসয়ালাঃ মাছের চর্বি অযুর অঙ্গের উপর ঢেকে থাকলে অজু হবে না, তার নীচে পানি পৌঁছেনি।

অযুর সুন্নত সমূহঃ

মাসয়ালাঃ অযুর ছওয়াব অর্জনের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে অযুর নিয়্যত করা জরুরী। অন্যথায় অযু হবে কিন্তু ছওয়াব পাবে না।
মাসয়ালাঃ শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়া সুন্নত, অযুর পূর্বে যদি ইস্তেঞ্জা করে ইস্তেঞ্জার পূর্বেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কিন্তু পায়খানায় গমনকালে কাপড় খোলার পূর্বে বলবে। অপবিত্র স্থানে এবং সতর খোলার পর মুখে আল্লাহর জিকির করা নিষিদ্ধ।
মাসয়ালাঃ দু হাতের কব্জি সহ তিনবার ধোয়া সুন্নত।
মাসয়ালাঃ পানি যদি বড় পাত্রে হয়, আর কোন ছোট পাত্রও নেই, যদ্বারা উপুড় করে হাত ধুয়ে নেবে, তখন তার উচিৎ হবে বাম হাতের আঙ্গুলি একত্রে করে শুধু ওসব আঙ্গুল পানিতে রাখবে হাতের কোন অংশ যেন পানিতে না পড়ে এবং পানি বের করে ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর ডান হাত যতটুকু ধৌত করেছে তা বিনা কষ্টে পানিতে রাখবে এবং এরদ্বারা বাম হাত ধৌত করবে।
মাসয়ালাঃ হাতে যখন কোন নাপাকী না থাকে তখন হাত পানিতে রাখা যাবে। অন্যথায় কোনভাবে হাত পানিতে রাখা জায়েজ হবে না। হাত পানিতে রাখলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।
মাসয়ালাঃ যদি ছোট পাত্রে পানি থাকে, বা পানি বড় পাত্রে আছে কিন্তু সেখানে ছোট পাত্রও মওজুদ আছে। সে না ধুয়ে হাত পানিতে রাখল বা সম্পূর্ণ আঙ্গুল বা নখ পানিতে ডুবাল তখন সব পানি অযুর অযোগ্য হয়ে পড়লো এবং ব্যবহৃত পানি হয়ে গেল। এ মাসয়ালাটি বিরোধ পূর্ণ মাসয়ালা, বিশুদ্ধ মতটিই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হেদায়া, ফতহুল কদীর, তবীয়ীন , ফতওয়ায়ে কাযীখান, কাফী, খোলাছা, গুনিয়া, হুলিয়া। আবু হানিফার কিতাবুল হাসন ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কিতাব সমূহ অন্যান্য ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাব সমূহে সুস্পষ্টরূপে আলোকপাত হয়েছে। যারা পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ জানতে ইচ্ছুক তারা যেন

النميقة الانقى فى الفرق بين الملاقى والملقى

নামক মুবারক রিসালাটি অধ্যায়ন করেন।
মাসয়ালাঃ এ হুকুম তখন হবে যখন হাত পানিতে প্রবেশের পর তার কোন অংশ ধৌত হয়নি। অন্যথায় যদি প্রথমে হাত ধুয়ে ফেলে এবং এরপর হাদছ না হয়। তখন যে অংশ ধৌত হয়েছে তা পানিতে রাখলে পানি ব্যবহৃত পানি হবে না। যদিও বা কনুই পর্যন্ত হয়, বরং অপবিত্র নয় এমন ব্যক্তি যদি কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে ফেলার পর, বগল পর্যন্ত পানিতে রাখতে পারবে। এখন তার হাতে কোন হাদছ বাকী নেই। হ্যাঁ অপবিত্র

ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ শরীর হাদছ হওয়ার কারণে, কনুই থেকে উপরের এতটুকু অংশ পানিতে রাখতে পারবে, যতটুকু ধৌত করেছে।
মাসয়ালাঃ যখন ঘুম থেকে উঠবে প্রথমে হাত ধৌত করবে, ইস্তেঞ্জার পূর্বে এবং পরেও ;
মাসয়ালাঃ কমপক্ষে তিনবার ডানে, বামে, উপর, নীচে, দাঁত মিসওয়াক করবে। প্রত্যেকবার মিসওয়াক ধুয়ে ফেলবে। মিসওয়াক এমন হতে হবে, অধিক শক্তও নয় নরমও নয়। জয়তুন বা নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের লাকড়ীর হতে হবে। ফল জাতীয় বৃক্ষ বা সুগন্ধিময় ফুলের বৃক্ষের যেন না হয়। কনিষ্টাঙ্গুলি বরাবর মোটা হবে। বেশীর বেশী এক বিঘত লম্বা হবে এত বেশী ছোট নয় যাতে মিসওয়াক করতে কষ্ট হয়। যে মিসওয়াক এক বিঘতের চেয়ে বড় হয় এর উপর শয়তান সওয়ার হয়। মিসওয়াক ব্যবহার যোগ্য না হলে দাফন করে ফেলবে বা সতর্কতার সাথে কোন স্থানে রেখে দেবে। যেন কোন নাপাক স্থানে না হয়। এক তো সুন্নত আদায়ের উপকরণ। তার সম্মান করা উচিৎ। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের মুখের পানি নাপাক স্থানে রাখা থেকে স্বয়ং সংরক্ষণ করতে হবে। এ জন্য পায়খানায় থু থু নিক্ষেপ করাকে ওলামায়ে কেরাম অনুচিৎ বলেছেন।
মাসয়ালাঃ মিসওয়াক ডান হাত দ্বারা করবে। হাতে এমনভাবে নিবে যে, কনিষ্ট আঙ্গুলি মিসওয়াকের নীচে এবং মাঝখানের তিন আঙ্গুল উপর থাকবে বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা নীচে রাখবে এবং মুষ্টিবদ্ধ করবেনা।
মাসয়ালাঃ দাতের প্রস্ত দিকে মিসওয়াক করবে দৈর্ঘ্যাকারে করবে না, চিৎ হয়ে শুয়ে মিসওয়াক করবেনা। প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত ঘষবে। অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত, তারপর ডান দিকের নীচের দাঁত, অতঃপর বাম দিকের নীচের দাঁত।
মাসয়ালাঃ মিসওয়াক করার সময় তা ধুয়ে নিবে। অনুরূপ ভাবে মিসওয়াক সমাপ্তির পর ধুয়ে নেবে এবং জমিনের উপর পরিত্যক্ত রাখবে না। উচু করে রাখবে এবং ঘর্ষনের দিকটা উপর দিকে রাখবে।
মাসয়ালাঃ যদি মিসওয়াক না থাকে তখন আঙ্গুলি বা শক্ত কাপড় দ্বারা দাঁত ঘষে নেবে। যদি দাঁত না থাকে তখন আঙ্গুল বা কাপড় মোচড়ায়ে দাঁতের উপর ফিরাবে।
মাসয়ালাঃ মিসওয়াক নামাযের জন্য সুন্নত নহে বরং অযুর জন্য সুন্নত। যে ব্যক্তি এক অযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়ে তার জন্য প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে হবে না। যতক্ষন না গন্ধ বিকৃত হয়, অন্যথায় তা দূরীভূত করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সুন্নত। অবশ্য অযুর সময় মিসওয়াক না করলে তখন নামাযের সময়

করবে।

মাসয়ালাঃ তিন অঞ্জলী পানি দিয়ে তিনবার কুল্লি করবে। প্রত্যেকবার মুখের বহিঃভাগে পানি গড়িয়ে দেবে। রোযাদার না হলে গড়গড়া করবে।

মাসয়ালাঃ তিন বার তিন অঞ্জলী নাকে পানি দেবে যতদুর নরম মাংস আছে প্রত্যেকবার তার উপর পানি গড়িয়ে দেবে। রোজাদার না হলে নাকের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে। এ দুটি কাজ ডান হাত দ্বারা করবে। অতঃপর বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে।

মাসয়ালাঃ মুখ ধোয়ার সময় দাড়ি খিলাল করবে। শর্ত হলো এহরাম না বাঁধলে। আঙ্গুল সমূহ গর্দানের দিকে প্রবেশ করে সামনে দিয়ে বের করবে।

মাসয়ালাঃ হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে। বাম হাতের কনিষ্টাঙ্গুল দ্বারা পদদ্বয়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে। এভাবে ডান পায়ের কানিষ্টাঙ্গুল দ্বারা শুরু করবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে শেষ করবে এবং বাম পদদ্বয়ে বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা শুরু করবে এবং কনিষ্টাঙ্গুলি দ্বারা শেষ করবে। খিলাল ছাড়া পানি যদি আঙ্গুলির ভিতরাংশে গড়িয়ে না যায়, তখন খিলাল করা ফরজ। যদিও বা খিলাল বিহীন পানি পৌঁছানো যায়। যেমন, আঙ্গুল সমূহের ফাঁক খুলে উপর থেকে পানি ঢাললে বা পদদ্বয় কুপে প্রবেশের পরও পানি ফাঁকে না পৌঁছলে, তখন খিলাল করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ যে সব অঙ্গ ধৌত করার আছে তা তিন-তিনবার ধৌত করবে। প্রত্যেকবার এমনভাবে ধৌত করবে যেন কোন অঙ্গ বাদ না পড়ে। অন্যথায় সুন্নত আদায় হবেনা।

মাসয়ালাঃ যদি এমন হয় যে, প্রথমবার কিছু ধৌত করল, দ্বিতীয়বার কিছু, তৃতীয়বার কিছু ধুয়ে নিল। তিনবারে মিলে সম্পূর্ণ অঙ্গ ধৌত হল। তখন এটা একবারই ধৌত করা হল এবং অযু হয়ে যাবে। কিন্তু সুন্নতের বিপরীত হবে। এতে অঞ্জলীর গননা হবে না। বরং পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করাটাই গন্য হবে। তিনবার ধৌত হওয়াটা যত অঞ্জলীতেই হউক না কেন!

☐ সম্পূর্ণ মাথা একবার মুছেহ করা সুন্নত।

☐ উভয় কান মুছেহ করা সুন্নত।

তারতীবঃ

☐ তারতীব বা ধারাবাহিক ধৌত করবে, প্রথমে মুখমন্ডল অতঃপর হস্তদ্বয়, তারপর মাথা মুছেহ অতঃপর পদদ্বয় ধৌত করবে। যদি তারতীবের খেলাফ অযু করলো বা অন্য কোন সুন্নত বাদ পড়লো, অযু হয়ে যাবে। কিন্তু এক আধটুকু এরূপ করা

দোষনীয় এবং সুন্নতে মুআক্কাদাহ পরিত্যাগে অভ্যস্ত হলে তখন গুনাহগার হবে।

☐ দাড়ির যে লোম মুখের পরিধির নীচে রয়েছে তা মুছেহ করা সুন্নত। ধৌত করা মুস্তাহাব।

☐ অঙ্গ সমূহ এমনভাবে ধৌত করবে, যেন প্রথম অঙ্গ শুকিয়ে না যায়।

অযুর মুস্তাহাব সমূহঃ

প্রাসঙ্গিক ভাবে বহু মুস্তাহাব উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো।

মাসয়ালাঃ ডান দিক থেকে অযু শুরু করবে, কিন্তু মুখমন্ডলের উভয় দিক সঙ্গে সঙ্গে ধৌত করবে এবং কর্ণদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে মুছেহ করবে। হ্যাঁ কারো যদি মাত্র একটি হাত থাকে তখন মুখ ধোয়া এবং মুছেহ করার ক্ষেত্রেও ডান দিকে আগে করবে।

★ আঙ্গুলির পিট দ্বারা গর্দান মুছেহ করা মুস্তাহাব।

★ ক্বিবলা মুখী হয়ে অযু করা।

★ উচু স্থানে বসে অযু করা।

★ অযুর পানি পবিত্র স্থানে ফেলা।

★ পানি প্রবাহের সময় অঙ্গের উপর হাত ফিরানো, বিশেষতঃ শীতকালে তৈলের ন্যায় পানি ছিটকানো। বিশেষতঃ শীতকালে স্বীয় হাত দ্বারা পানি ভর্তি করা

★ অন্য ওয়াক্তের জন্য পানি ভর্তি করে রাখা।

★ অযুর সময় বিনা প্রয়োজনে কারো কাছে সাহায্য না চাওয়া।

★ আঙ্গুল সমূহ নাড়া দেয়া যদি তার নীচে পানি দেখা যায়, অন্যথায় ফরজ হবে।

★ ওজর ওয়ালা না হলে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে অযু করা।

★ধীর স্থিরতার সাথে অযু করা, জনগণের যেটি প্রসিদ্ধ উক্তি– অযু যুবকের ন্যায়, নামায বৃদ্ধের ন্যায় অর্থাৎ অযু দ্রুত করা, এমন দ্রুত সমীচীন নয় যদ্বারা কোন সুন্নত বা মুস্তাহাব বর্জিত হয়।

★ কাপড়কে পানির ফোঁটা থেকে রক্ষা করা।

★ উভয় কান মুছেহ এর সময় ভিজা কনিষ্টাঙ্গুলি কানের ছিদ্রে প্রবেশ করা।

★ অযু পূর্ণরূপে করবে, কোন জায়গা যেন বাদ না পড়ে।

★কনুই, টাখনু, গোড়ালীর নিম্নভাগ, আঙ্গুলির ফাঁক, হাটুদ্বয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা মুস্তাহাব। অধিকাংশ দেখা যায় এসব স্থান শুকনো থেকে যায়। এটা তাদের উদাসীনতার ফলশ্রুতি। এমন উদাসীনতা হারাম এবং লক্ষ্য করা ফরজ।

★ অযুর পাত্র মাটির হওয়া, তামা ইত্যাদির হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু চুন করা হতে

হবে। অজুর পাত্র যদি লোটা বা ক্ষুদ্র জল পাত্রের ন্যায় হয়, তখন বাম দিকে রাখবে। আর যদি থালার ন্যায় হয়, তখন ডান দিকে রাখবে।

★ হাত নলের উপর রাখবে, মুখের উপর নয়।

★ ডান হাত দ্বারা কুল্লি করা।

★ পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।

★ বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করা।

★ বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি নাকে প্রবেশ করা।

★ পদদ্বয় বাম হাত দ্বারা ধৌত করা।

★ মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় মাথার অগ্রভাগেও এমনভাবে পানি ঢালবে, যেন উপরের কিছু অংশও ধৌত হয়ে যায়।

সতর্কতাঃ এমন বহু লোক আছে যারা, নাক বা চক্ষু বা ভ্রু এর উপর এক অঞ্জলী পানি নিয়ে সমস্ত হাত ও মুখের উপর ফিরায়ে নেয়। মনে করে মুখ ধোয়া হয়েছে, অথচ উপরে পানি দেয়ার কোন অর্থ নেই। এভাবে ধৌত করলে মুখ ধোয়া হবে না। অযুও হবে না।

★ উভয় হাত দ্বারা মুখ ধোয়া, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধোয়ার ক্ষেত্রে আঙ্গুল থেকে শুরু করা।

★ চেহারা এবং হাত পায়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ যত জায়গায় পানি দেয়া ফরজ। তার পার্শ্বে কিছু বৃদ্ধি করা, যেমন, অর্ধ বাহু ও পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধৌত করা।

★ মাথা মুছেহ-এর মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো, বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং শাহাদাৎ আঙ্গুলি ছাড়া এক হাতের বাকী তিন আঙ্গুলির মাথা এবং দ্বিতীয় হাতের তিন আঙ্গুলের মাথা একত্র করে কপালের চুল বা চামড়ার উপর রেখে গ্রীবা পর্যন্ত এমনভাবে আনবে হাতের তালু যেন মাথা থেকে পৃথক থাকে। ওখান থেকে হাতের তালুদ্বারা মুছেহ করে ফিরায়ে আনবে।

★শাহাদাৎ আঙ্গুলির পেট দিয়ে কানের ভিতরাংশ মুছেহ করবে।

★ বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা কানের বাহির অংশ মুছেহ করবে এবং আঙ্গুলের পিট দ্বারা গর্দান মুছেহ করবে। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করে তার উপর হাত ফিরানো সমীচীন। ফোটা যাতে শরীর বা কাপড়ের উপর না পড়ে। বিশেষতঃ মসজিদে গেলে পানির ফোটা মসজিদে ফেলা মাকরূহ তাহরীমি।

★ অধিক ভারী পাত্র দ্বারা অযু করবে না। বিশেষভাবে দুর্বলব্যক্তি, পানি অসাবধানতা বশতঃ পড়ে যাবে।

★ মুখে বলবে আমি অযু করছি।

★ প্রত্যেক অঙ্গ ধৌতকালে বা মুছেহ করার সময় নিয়্যত হাজির থাকা।

★ বিছমিল্লাহ বলা। ★ দরুদ শরীফ পড়া।

এবং

أَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

বলা।

★ কুল্লি করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

★ নাকে পানি দেয়ার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِيْ رَائِحَةَ النَّارِ

★ মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে –

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

★ ডান হাত ধৌত করার সময় পড়বে –

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

★ বাম হাত ধৌত করার সময় পড়বে –

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِيْ

★ এবং মাথা মাছেহ করার সময় পড়বে –

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

★ কান মুছেহ করার সময় বলবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

★ গর্দান মুছেহ করার সময় বলবে–

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ

★ ডান পা ধৌত করার সময় পড়বে –

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

★ বাম পা ধৌত করার সময় পড়বে –

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِيْ لَنْ تَبُوْرَ

বা সবস্থানে দরুদ শরীফ পড়বে এটিই উত্তম।

★ অযু শেষ করার সাথে সাথেই পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

★ বেচে যাওয়া পানি দাড়িয়ে সামান্য পান করে নেবে। এটা রোগ ব্যাধির শেফা এবং আকাশের দিকে মুখ করে পড়বে- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔

এবং কলেমা শাহাদাৎ ও ইন্না আনজালনা পড়বে।

★ অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনা প্রয়োজনে মুছবেনা। মুছে নিলে অপ্রয়োজনে শুকায়ে নেবে না। নীম পরিমাণ বাকী রাখবে, কিয়ামতের দিবসে নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। এবং হাত ঝাড়বে না। তা শয়তানের পাখা বিশেষ। অযুর পর পাজামার দু'পায়ের মধ্যস্থ বস্ত্র খন্ডের উপর পানি ছিটকাবে। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। এ নামাযকে "তাহায়্যাতুল অযু" বলা হয়।

অযুর মাকরূহ সমূহঃ

(১) মহিলার গোসল বা অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অযু করা।
(২) অযুর জন্য নাপাক স্থানে বসা।
(৩) নাপাক স্থানে অযুর পানি ফেলা।
(৪) মসজিদের ভিতর অজু করা।
(৫) অজুর অঙ্গ থেকে জল পাত্রে ফোটা টপকে পড়া।
(৬) রিটা (বা সাবানের মত এক প্রকার বস্ত্র পরিষ্কারক পদার্থ) পানিতে ফেলা।
(৭) ক্বিবলার দিকে থুথু বা গলাপরিষ্কার করে বর্জ ফেলা, কুল্লি করা।
(৮) অপ্রয়োজনে দুনিয়াবী কথা বলা।
(৯) অতিরিক্ত পানি ব্যয় করা।
(১০) পানি এত কম খরচ করা যদ্বারা সুন্নত আদায় না হওয়া।
(১১) মুখের উপর পানি নিক্ষেপ করা।
(১২) মুখের উপর পানি ঢালতে ফুঁক দেয়া।
(১৩) এক হাত দ্বারা মুখ ধোয়া।
(১৪) গলা মুছেহ করা।
(১৫) বাম হাত দ্বারা কুল্লি করা বা নাকে পানি দেয়া।
(১৬) ডান হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করা।
(১৭) নিজের জন্য কোন জল পাত্র নির্দ্দিষ্ট করে নেয়া।
(১৮) তিনবার নতুন পানি দিয়ে তিনবার মাথা মুছেহ করা।
(১৯) যে কাপড়ে ইস্তেঞ্জার পানি শুকানো হয়েছে। ঐ কাপড় দ্বারা অযুর অঙ্গ সমূহ মুছে নেয়া।

(২০) রোদ্রের গরম পানি দ্বারা অযু করা।
(২১) ঠোঁট বা চক্ষু স্বজোরে বন্ধ করা। যদি সামান্য শুকনা থেকে যায় অযুই হবে না।
(২২) প্রত্যেক সুন্নত পরিত্যাগ করা মাকরূহ। এভাবে প্রত্যেক মাকরূহ ছেড়ে দেয়া সুন্নত।

অযুর বিবিধ মাসায়েলঃ

যদি অযু না থাকে, তখন নামায এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত, জানাযার নামায, কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য অযু করা ফরজ।

অযু করার মুস্তাহাব সময় সমূহঃ

মাসয়ালাঃ জানাবাতের পূর্বে ★ অপবিত্র ব্যক্তি পানাহারের পূর্বে ★ নিদ্রার পূবে ★ আজান ★ ইকামত ★ জুমার খোত্বা ★ দু'ঈদের খোৎবা ★ হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারতের জন্য ★ আরাফাতে অবস্থান এবং সাফা মারওয়া পাহাড় দ্বয়ে দৌড়ার জন্য অজু করে নেয়াটা সুন্নত।

মাসয়ালাঃ নিদ্রার জন্য, নিদ্রার পর, মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর, বা উঠাবার পর, সহবাসের পূর্বে, ক্রোধের সময়, মৌখিক কোরআন পড়ার জন্য, হাদীস এবং দ্বীনি ইলম পড়া এবং পড়ানোর জন্য, জুমা এবং দুঈদের খোৎবা ছাড়া বাকী সব খোৎবার জন্য, ধর্মীয় কিতাবাদি স্পর্শের জন্য, সতর ঢাকার পর নাপাক স্পর্শ করলে, মিথ্যা বললে, গালি দিলে, অশ্লীল শব্দ মুখে বের করলে, কাফেরদের সাথে দেহ স্পর্শ হলে, গির্জা বা প্রতীমা স্পর্শ হলে, কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করলে, বগল কুচলানো যদি এর মধ্যে দুর্গন্ধ হয়, গীবত করলে, অট্টহাসি দিলে, অনর্থক বেহুদা জিনিষ পড়লে, উটের মাংস ভক্ষন করলে, কোন মহিলার দেহের সাথে পর্দা বিহীন নিজের শরীর স্পর্শ হলে, অযুসম্পন্ন ব্যক্তিকে নামায পড়ার জন্য উপরোক্ত অবস্থায় অযু করা মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ অযু চলে গেলে অযু করে নেয়াটা মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের উপর অযু ফরজ নহে। কিন্তু অযু করানো উচিৎ, যেন অভ্যস্ত হয় এবং অযু করতে চলে আসে এ অযুর মাসায়েল সম্পর্কে ধারনা হয়।

মাসয়ালাঃ লোটা বা জল পাত্রের নল এতবেশী সঙ্কীর্ণ না হওয়া, যাতে পানি পড়তে অসুবিধা হয়, এতটুকু প্রশস্তও হবে না, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পড়ে। বরং মধ্যম শ্রেণীর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাসয়ালাঃ হাতের অঞ্জলীতে পানি নেয়ার সময় পানি যেন পড়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবে। এতে পানি অপচয় হবে। এভাবে যে কাজের জন্য অঞ্জলীতে পানি নেয়া দরকার সে পরিমাণ পানি নেবে, প্রয়োজনের বেশী নেবে না। যেমন নাকে পানি

দেয়ার জন্য অর্ধ অঞ্জলী যথেষ্ট হলে পূর্ণ অঞ্জলী নেবে না। এতে অপচয় হবে।

মাসয়ালাঃ হাত, পা, সীনা ও পিটের উপর লোম থাকলে, হরিতল ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করে নেবে। বা ব্রাশ না থাকলে পানি অধিক ব্যয় হবে।

ফায়েদাঃ দুলহান একজন শয়তানের নাম। যে অজুর সময় প্ররোচনা দেয়। তার প্ররোচনা হতে রক্ষা পাওয়ার উৎকৃষ্ট আমল নিম্নরূপ।

(১) আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবে। (২) আউযুবিল্লাহ্ (৩) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (৪) সূরা নাস, (৫) এবং اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (৬) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

এবং (৭) سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

পড়বে। শয়তানের প্ররোচনা নির্মূল হয়ে যাবে। (৮) এবং ওয়াসওয়াসার খেয়াল বিন্দুমাত্র করবেনা বরং তার বিপরীত করাটাও প্ররোচনা প্রতিরোধের শামিল।

অযুভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বর্ণনাঃ

(১-২) মলমুত্র ত্যাগ করলে, (৩) অদি অর্থাৎ যৌন উত্তেজক রস (৪) বীর্যপাতের পর নির্গত রস মজি বের হলে, (৫) বীর্যপাত হলে, (৬) ক্রিমি বের হলে, (৭) পাথর বের হলে, পুরুষ বা মহিলার সামনের বা পিছনের রাস্তা দিয়ে এসব বের হলে অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ যদি পুরুষের খৎনা করা না হয়, এবং ছিদ্র থেকে কোন বস্তু বের হল। কিন্তু এখনো চামড়ার ভিতেরই আছে, তখন অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ এভাবে মহিলার যৌনদ্বারের ছিদ্র হতে বের হল, এখনো লজ্জাস্থানের উপরের চামড়ার ভিতরেই রয়েছে তখনও অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ মহিলার সামনে দিয়ে বিশুদ্ধ আদ্র মিশ্র রক্ত বের হলে তা অযু ভঙ্গ করে না। যদি কাপড়ে লাগে, কাপড় পাক থাকবে।

মাসয়ালাঃ পুরুষ বা মহিলার সামনে দিয়ে বায়ু বের হলে, বা পেটের মধ্যে জখম হয়েছে যে, তলপেট পর্যন্ত পৌছেছে এর দ্বারা বায়ু বের হলে অযু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ মহিলার পর্দার উভয় স্থান ফেটে এক হয়ে গেল, বায়ু বের হলে, সাবধানতার নিরিখে অজু করবে যদিও বা আশঙ্কা হয় যে, আগে বের হয়েছে।

মাসয়ালাঃ পুরুষ প্রস্রাবের ছিদ্রে যদি কোন বস্তু লাগায়, অতঃপর তা যদি পড়ে যায় তখন অযু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ সিংগা লাগাল, ঔষধ বাইরে চলে আসল, বা পায়খানার জায়গায় কোন বস্তু লাগাল, তা বের হয়ে আসল, অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি পুরুষাঙ্গের ছিদ্রে তুলা দিল উপরের দিকে শুকনা ছিল। যখন বের করলো, ভিজা বের হলো, তখন বের করা মাত্র অযু ভেঙ্গে গেল। এভাবে মহিলা কাপড় রাখল এবং গুপ্তাঙ্গের বাইরে কাপড়ের উপর কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু যখন বের করলো, তখন রক্ত বা অন্য কোন নাপাকী দ্বারা ভিজা বের হলো তখন অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ রক্ত, পুজ বা হলুদ পানি কোথাও হতে বের হয়ে গড়ায়ে পড়ল, গড়ায়ে এমনস্থানে পৌঁছল, যে স্থানটি অযু বা গোসলে ধৌত করা ফরজ। তখন অযু ভঙ্গ হবে। আর যদি উথলিয়ে উঠে, কিন্তু গড়ায়ে পড়েনি। যেমন, সুঁচের মাথা, বা ছুরির কিনারা লাগলে রক্ত উথলে উঠে বা খিলাল করল বা মিসওয়াক করল বা আঙ্গুল দ্বারা দাঁত ঘষে নিল বা দাঁত দ্বারা কোন কিছু কাটল এর দ্বারা রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল বা নাকে আঙ্গুল ঢুকাল,এতে রক্তের লালবর্ণ দেখা গেল এবং রক্ত যদি গড়ায়ে পড়ার মত না হয়, তখন অযু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ গড়িয়ে পড়লো কিন্তু গড়িয়ে এমন স্থান পর্যন্ত আসেনি যে স্থান ধৌত করা ফরজ। তখন অযু ভঙ্গ হবে না। যেমন চোখে কনা ছিল, এবং তা ভেঙ্গে চক্ষুর ভিতরই ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে আসেনি বা কানের ভিতর কনা ভেঙ্গেছে এবং কানের পানি ছিদ্রের বাইরে আসছেনা এমতাবস্থায় অযু বাকী থাকবে।

মাসয়ালাঃ ক্ষতস্থান গর্ত হয়ে গেল, এবং এতে আদ্রতা তেজালো হয়েছে কিন্তু প্রবাহিত হয়নি, তখন অযু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ জখম বা ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত সমূহ বেরুচ্ছে এবং তা বারংবার মুছতে আছে, গড়িয়ে পড়ার সুযোগ হচ্ছেনা। তখন গভীরভাবে দেখবে, না মুছলে গড়িয়ে পড়ে কি না? যদি গড়ায়ে পড়ে অজু ভঙ্গ হবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি মাটি বা ভষ্ম ছাই লাগায়ে শুকাতে থাকে তখনও একই হুকুম।

মাসয়ালাঃ ফোঁড়া নিংড়ালে যদি রক্ত গড়িয়ে পড়ে, যদিও বা এরকম হয় যে, না নিংড়ালে গড়িয়ে পড়তো না, তখনও অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ চক্ষু, কান, স্তনের বোঁটার মধ্যে কনা পড়লে, বা কোন রোগ হলে এবং এ কারনে যে অশ্রু বা পানি গড়াবে, তা দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ ক্ষতস্থান, নাক, কান, বা মুখ হতে ক্রিমি বের হলে, বা ক্ষতস্থান হতে কোন মাংসের টুকরা (যার মধ্যে কোন রক্ত, পুজ বা কোন নাপাক আদ্রতা প্রবাহ যোগ্য ছিল না) বা কঙ্কর পতিত হলে অযু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ কানের মধ্যে তৈল দিয়েছিল। একদিন পর কান বা নাক থেকে বের করলো অজু ভঙ্গ হবে না। এভাবে মুখ থেকেও বের করলে অজু ভঙ্গ হবে না। হ্যাঁ যদি জানতে পারে যে, মস্তিষ্ক থেকে পেটে পৌঁছেছে এবং পেট হতে বের হয়েছে। অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ মুখ থেকে রক্ত বের হলো, থুথুর চেয়ে প্রবল হলে অযু ভঙ্গ হবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না।

ফায়েদাঃ প্রবলতার চিহ্ন হলো, থুথুর রং যদি লাল হয়ে যায়, রক্ত প্রবল হয়েছে মনে করবে, আর যদি হলদে হয় তখন প্রবল নহে।

মাসয়ালাঃ জোঁক বা ছোট কুলকুচা রক্ত চুষল, এতটুকু পান করল, যা এমনি বের হলে গড়িয়ে পড়তো, তখন অজু ভঙ্গ হবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ যদি ছোট কুলকুচা, বা উকুন, ছারপোকা, মাছি, মশা, বিচ্ছু রক্ত চুষন করলে অযু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ নাক পরিষ্কার করতে গিয়ে জমাট রক্ত বের করলে অযু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ অন্ধের চক্ষু হতে রোগের কারণে যে আদ্রতা বের হয়, তা দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ মুখ ভর্তি বমি খেয়ে ফেললে বা বমির সাথে পানি বা পিত্তরস পান করলে অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ কফ বা শ্লেষ্মার বমি দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না, তা যতই হউক।

মাসয়ালাঃ রক্ত বমি গড়িয়ে পড়লে অযু ভঙ্গ হবে। যদি থুথু প্রবল না হয় এবং রক্ত জমে থাকলে অযু ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ না মুখ ভর্তি হয়।

মাসয়ালাঃ পানি পান করল এবং পেটে অবতরণ করল, এখন ঐ পানি স্বচ্ছ পরিষ্কার বমি হয়ে বেরিয়ে আসল, যদি মুখ ভর্তি হয় অযু ভঙ্গ হবে এবং ঐ পানি অপবিত্র হয়ে গেল আর যদি বক্ষ পর্যন্ত আটকে পড়ে এবং বেরিয়ে আসে, তখন তা নাপাকও হবে না, অযুও ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ যদি অল্প অল্প করে কয়েকবার বমি হয়, যা একত্রে মুখভর্তি পরিমাণ হবে, যদি একই ঘা হতে অযু ভঙ্গ হবে। আর যদি বমির ভাব চলে যায় এবং তার কোন চিহ্ন বাকী না থাকে, অতপর নতুনভাবে বমির ভাব শুরু হল এবং বমি আসল। উভয় বারে পৃথক পৃথক মুখভর্তি আসেনি। কিন্তু উভয় বমি একত্র করলে মুখভর্তি হবে। তখন অযু ভঙ্গকারী হবে। যদি একই মজলিসে হয়- অযু করে নেয়াটা উত্তম।

মাসয়ালাঃ বমির মধ্যে শুধুমাত্র ক্রিমি বা সাপ বের হলে অযু ভঙ্গ হবে না। তার সাথে যদি সামান্য আদ্রতা থাকে দেখবে, মুখভর্তি কি না যদি মুখভর্তি হয় অযু ভঙ্গ হবে, অন্যথায় হবে না।

মাসয়ালাঃ নিদ্রা গেলে অযু ভঙ্গ হবে। উভয় নিতম্ব ভালভাবে স্থাপিত না হওয়া শর্ত। এমনভাবেও নিদ্রা যায়নি যা অলস অবস্থায় নিদ্রা আসার অন্তরায়। যেমন, মোড় বাঁকা করে বসে নিদ্রা গেল বা মুখ উপর করে বা অর্গল বা পার্শ্ব কাৎ করে বা কনুই এর উপর বালিশ লাগায়ে নিদ্রা গেল। কিন্তু এক পার্শ্ব ঝুঁকে আছে যদ্বারা এক বা দু নিতম্ব উচু হয়ে আছে বা খালি পিঠে আরোহণ করেছে এবং প্রাণী ঢালু জায়গায় অবতরণ করছে বা দু হাটু গেড়ে বসছে এবং পেট উরুর উপর রাখল, যেন দু নিতম্ব স্থির না থাকে বা চারজানু হয়ে বসেছে, এবং মাথা উরুর উপর বা পায়ের গোড়ালীর উপর বা যেভাবে মহিলারা সিজদা করে একই প্রকৃতির উপর নিদ্রা গেল। এসব অবস্থায় অযু ভঙ্গ হবে। আর নামাযে এসব অবস্থায় ইচ্ছাকৃত নিদ্রা যায়, অযুও গেল, নামাযও গেল। অযু করে শুরু থেকে নিয়্যত করবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃত নিদ্রা যায় অযু ভঙ্গ হবে। নামায ভঙ্গ হবে না। অযু করার পর যে রুকনে নিদ্রা এসেছে সেখান থেকে আদায় করবে, তবে নতুনভাবে শুরু হতে পড়া উত্তম।

মাসয়ালাঃ দুই নিতম্ব, জমিন, চেয়ার বা বেঞ্চের উপর হলে এবং পদদ্বয় এক দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে অথবা দুই নিতম্বের উপর বসেছে এবং হাটুদ্বয় খাড়া রয়েছে। হাত গোড়ালীর সাথে বেষ্টিত থাকলে, জমীনের উপর দু হাটু সোজা বসা থাকলে, অথবা চারজানু হয়ে বসলে, বা গদির উপর সওয়ার হলে বা খালি পিঠের উপর সওয়ার হয়েছে কিন্তু প্রাণী চূড়ার উপর বা সমতল রাস্তায় চলছে বা দাড়ানো অবস্থায় নিদ্রা গেল বা রুকুর অবস্থায় বা পুরুষরা সুন্নত সম্মত সিজদার আকৃতিতে ঘুমালে- এসব অবস্থায় অযু ভঙ্গ হবে না। নামাযে এসব অবস্থার সম্মুখীন হলে অযুও যাবে না, নামাযও ভঙ্গ হবে না। হ্যাঁ পূর্ণ রুকন যদি ঘুমেই আদায় করে তখন পুনরায় পড়া জরুরি। যদি জাগ্রত অবস্থায় শুরু করল অতঃপর নিদ্রা এসে গেল, তখন প্রয়োজন পরিমাণ জাগ্রত অবস্থায় আদায় করে থাকলে ওটাই যথেষ্ট অন্যথায় পূর্ণ করে নেবে।

মাসয়ালাঃ এমনভাবে শুয়ে পড়ল, যে অবস্থা অযু যাবার নয়। নিদ্রা অবস্থায় এমন প্রকৃতির সৃষ্টি হল যদ্বারা অযু ভঙ্গ হবে। যদি তৎক্ষণাৎ বিরতিহীন জেগে উঠে অযু যাবে না। অন্যথায় অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ গরম চুল্লীর পার্শ্বে পা ঝুলায়ে বসে শুয়ে পড়লো, তখন অযু করে নেয়াটা সমীচিন।

মাসয়ালাঃ রুগ্ন ব্যক্তি শুয়ে নামায পড়তেছিল, এমন সময় ঘুম এসে গেল, অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ বসে বসে তন্দ্রায় ঝুকিয়ে পড়লে অযু যাবেনা।

মাসয়ালাঃ সঞ্চালন করে নীচে পড়ে তাৎক্ষণিক চোখ খুলে গেল, অযু ভঙ্গ হয়নি।

মাসয়ালাঃ নামায, ইত্যাদির অপেক্ষায় অনেক সময় নিদ্রা প্রবল হয় ইহা দূর করতে চাইলে অনেক সময় এমন অলস হয়ে পড়ে যে, সে সময় যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁর মোটেই অবগতি থাকে না। বরং দু তিনবার আওয়াজ করার পর চোখ

খুলে নিজ ধারণায় মনে করে থাকে যে, সে নিদ্রায় ছিলনা, তার ধারণা পরিগণিত হবে না। যদি কোন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্তব্যক্তি বলে যে, তুমি বেখবর ছিলে, তোমাকে ডাকা হয়েছে জবাব পাওয়া যায়নি। বা কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারবে না, তখন তার উপর অযু অপরিহার্য।

ফায়েদাঃ আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের নিদ্রা অযু ভঙ্গকারী নহে। তাদের চক্ষু নিদ্রিত , অন্তর জাগ্রত, নিদ্রা ছাড়া অন্যান্য অযুভঙ্গকারী কারণ পাওয়া গেলে আম্বিয়া কেরামদের অযু যাবে কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে বিশুদ্ধ মত হলো অযু ভঙ্গ হবে। তাদের সমুন্নত মর্যাদার কারণে, অপবিত্রতার কারণে নহে।

তাদের সব উচ্ছিষ্ট, অতিরিক্ত ব্যবহৃত বস্তুমোবারক উত্তম এবং পবিত্র। যা খাওয়া বা পান করা আমাদের জন্য হালাল এবং বরকতের উপায়।

মাসয়ালাঃ সংজ্ঞাহীনতা, মাতলামী, অচৈতন্য, এবং এমন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি পথ চলনে যার পদদ্বয় টলমল করে, এসব অযুভঙ্গের কারণ।

মাসয়ালাঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির অট্টহাসি, এমনভাবে হাসি আসলো যা আশপাশের লোকেরা শুনতে পায়। জাগ্রত অবস্থায় রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে হলে অযু ভঙ্গ হবে এবং নামায ফাসেদ হবে।

মাসয়ালাঃ শয়নে নামাযের মধ্যে, বা জানাযার নামায, অথবা তিলাওয়াতে সিজদায় অট্টহাসি দিলে অযু যাবেনা। নামায ও সিজদা ফাসেদ হবে।

মাসয়ালাঃ এমনভাবে আওয়াজ করে হাসলে, যা নিজে শুনতে পায়। পার্শ্ববর্তীরা শুনতে না পায়। তখন অযু যাবে না, নামায ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ দাঁত বের করে মুচকি হাঁসলে, যদি মোটেই শব্দ না হয়। তাহলে নামাযও যাবে না অযুও যাবেনা।

মাসয়ালাঃ অশ্লীল যৌনসঙ্গম, অর্থাৎ পুরুষ নিজ পুরুষাঙ্গকে উত্তেজিত অবস্থায় মহিলার লজ্জাস্থান বা কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের সাথে একত্র করলে অথবা মহিলা–মহিলা পরস্পর একত্র করলে কোন কিছু অন্তরাল না থাকলে, অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ পুরুষ যদি স্বীয় যৌনাঙ্গ দ্বারা মহিলার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে এবং পুরুষাঙ্গের উত্তেজনা ছিলনা, মহিলার অযু তখনও ভঙ্গ হবে। যদিওবা পুরুষের অজু ভঙ্গ না হয়।

মাসয়ালাঃ ঢিলার দ্বারা শৌচকর্ম করার পর অজু করল। পরে স্মরণ হল, পানিদ্বারা শৌচকার্য সমাধা করেনি। পানি দ্বারা যদি সুন্নত তরীকায় পা বিছায়ে নিশ্বাসের জোর নীচু করে করলে অযু যাবে, স্বাভাবিকভাবে করলে অযু যাবে না। কিন্তু অযু করে নেয়াটা সমীচিন।

মাসয়ালাঃ ফোঁড়া একেবারে সুস্থ হয়ে গেল, তার মৃত বাকল বা খোসা বাকী রয়েছে। যার উপরের মুখ এবং ভিতরে খোলা, যদি এর মধ্যে পানি ভর্তি হয়ে যায় অতঃপর চাপ দিয়ে পানি বের করে নিলে অযুও যাবেনা, পানিও নাপাক হবে না। হ্যাঁ তার মধ্যে যদি সামান্য রক্তের আদ্রতা বাকী থাকে, তখন অযুও ভঙ্গ হবে, পানিও অপবিত্র হবে।

মাসয়ালাঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, হাঁটু বা সতর খুললে, নিজের বা অপরের সতর দেখলে অযু ভঙ্গ হবে। এটা নিছক ভিত্তিহীন কথা। হ্যাঁ নাভী হতে হাঁটুর নীচু পর্যন্ত সব সতর ঢেকে রাখা অযুর আদবের অন্তর্ভুক্ত। রবঞ্চ শৌচকর্ম সমাধার সাথে সাথেই ঢেকে নেয়া সমীচিন। অপ্রয়োজনে সতর খোলা রাখা নিষেধ এবং অন্যজনের সামনে সতর খোলা হারাম।

বিবিধ মাসায়েলঃ

মানুষের শরীর থেকে যে আদ্রতা বের হয়, তা অযু ভঙ্গ করেনা। তা নাপাক নয়। যেমন, রক্ত গড়ায়ে বের হয়নি বা অল্প বমি, মুখভর্তি না হলে তা পবিত্র।

মাসয়ালাঃ খস পাঁচড়া বা ফোঁড়ার মধ্যে যদি প্রবাহমান আদ্রতা না থাকে বরং সংশ্লিষ্ট কাপড় দ্বারা বারংবার স্পর্শ করলে, যদিও বা যতবারই জড় হোক তা পবিত্র।

মাসয়ালাঃ ঘুমের মধ্যে মুখ দিয়ে যে লালা আসে, যদিওবা পেট থেকে আসে, যদিও দুর্গন্ধযুক্ত হোক তা পবিত্র।

মাসয়ালাঃ মৃতব্যক্তির মুখদিয়ে যে পানি গড়িয়ে পড়ে তা নাপাক।

মাসয়ালাঃ চক্ষুর আঘাতে বা ব্যথা বেদনায় যে অশ্রু প্রবাহিত হয় তা নাপাক এবং অযু ভঙ্গকারী। এর থেকে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি।

মাসয়ালাঃ দুগ্ধপোষ্য শিশু যদি দুধ ফেলে দেয় এবং তা মুখ ভর্তি হয় তখন নাপাক। এক দিরহাম পরিমাণ বেশির স্থানে লাগলে ঐ স্থান নাপাক হবে। দুধ যদি পেট থেকে বেরিয়ে না আসে, বরং বক্ষ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে তখন পাক।

মাসয়ালাঃ অযুর মাঝখানে যদি বায়ু নির্গত হয়, বা এমন কোন কথা হয় যদ্বারা অযু যাবে তখন নতুনভাবে শুরু থেকে অযু করবে প্রথম ধৌত করা অঙ্গ ধৌতহীন হয়ে পড়েছে।

মাসয়ালাঃ অঞ্জলীর মধ্যে পানি নেয়ার পর হাদছ হলে ঐ পানি বেকার হয়ে যাবে। কোন অঙ্গ ধৌত করার কাজে আসবেনা।

মাসয়ালাঃ মুখ হতে এত পরিমাণ রক্ত বের হলো, যে থু থু লাল হয়ে গেল, জলপাত্র বা ক্ষুদ্র পাত্র মুখে লাগিয়ে কুল্লির পানি নিলে, তখন জল পাত্র বা ক্ষুদ্র পাত্র এবং সম্পূর্ণ পানি নাপাক হয়ে যাবে। অঞ্জলী দ্বারা পানি নিয়ে কুল্লি করবে। অতঃপর হাত ধুয়ে কুল্লির জন্য পানি নেবে।

মাসয়ালাঃ অযুর মাঝখানে যদি কোন অঙ্গ ধোয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং এটাই জীবনে প্রথমবার হয় তখন তা ধুয়ে নেবে। আর যদি বেশি সন্দেহ হয়, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেনা, অনুরূপভাবে যদি অযুর পর সন্দেহ হয়, তখন তা খেয়াল করবেনা।

মাসয়ালাঃ যার অযু ছিল, এখন সন্দীহান হল যে, অযু আছে কিনা? তখন অযু করা তার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ করে নেয়াটা উত্তম। যখন এই সন্দেহ প্ররোচণার ভিত্তিতে না হয়। আর যদি ওয়াছওয়াছা বা প্ররোচণার দ্বারা হয় তা কখনো মানবে না। এ অবস্থায় সাবধানতা বশতঃ অযু করাটা সাবধানতা অবলম্বন করা নয়। বরং অভিশপ্ত শয়তানের আনুগত্যের নামান্তর।

মাসয়ালাঃ অযুহীন ছিল এখন তার সন্দেহ হলো যে, আমি অযু করেছি কিনা? তখন অযুহীন সাব্যস্ত হবে। অযু করা অপরিহার্য।

মাসয়ালাঃ এটা স্মরণ ছিল যে, পায়খানা, প্রস্রাবের জন্য বসেছিল, কিন্তু এখন বসেছে কিনা? তা স্মরণ নেই তখন তার উপর অযু ফরজ।

মাসয়ালাঃ স্মরণ হল যে, কোন অঙ্গ ধোয়া হতে বাদ পড়েছে, কিন্তু কোন্ অঙ্গ তা স্মরণ নেই। তখন বাম পা ধুয়ে নেবে।

মাসয়ালাঃ মধ্যস্থানে আদ্রতা দেখল, কিন্তু জানতে পারছেনা পানি না - প্রস্রাব, এ অবস্থা যদি জীবনের প্রথমবার হয় অযু করবে, এবং ঐ স্থান ধুয়ে নেবে। আর যদি বারংবার এ ধরনের সন্দেহে পতিত হয়, তখন সে দিকে মনোনিবেশ করবে না। এটা শয়তানের প্ররোচণা মাত্র।

গোসলের বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

অর্থ যদি তোমরা অপবিত্র থাক, বিশেষভাবে পবিত্র হবে। অর্থাৎ গোসল করবে।

আরো এরশাদ করেন,

যতক্ষণ না ঋতুবর্তী মহিলারা উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যায়। আরো এরশাদ করেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

অর্থঃ হে ঈমানদার গণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেওনা) ফরজ গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু সফরের অবস্থায় পানি না পেলে গোসলের স্থলে তায়াম্মুম আছে।

হাদীস (১)ঃ সহীহ, বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকীর গোসল করতে মনস্থ করতেন, প্রথম দুহাত ধুয়ে নিতেন। অতঃপর নামাযের অযুর মত অযু করতেন, অতঃপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবাতেন, এবং (ভিজা হাত দ্বারা) চুলের গোড়া খিলাল করতেন, এবং দুহাতের অঞ্জলীভরে তিনবার মাথার উপর পানি ঢালতেন, অতঃপর শরীরের সম্পূর্ণ চামড়ায় পানি প্রবাহিত করতেন।

হাদীস (২) বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মুল মুমেনীন মায়মুনা (রাঃ) বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। অতঃপর একটি কাপড় দ্বারা তাঁকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে নিজের দুহাতের উপর পানি ঢাললেন এবং (কব্জি পর্যন্ত) তা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর (কিছু)

পানি ঢাললেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিলেন, তৎপর হাত মাটিতে মারলেন, এবং তা মুছে নিলেন, পুনঃ (নিয়মিত) হাত ধুয়ে নিলেন, কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন, এবং মুখমন্ডল ও হাত (কনুই পর্যন্ত) ধুয়ে নিলেন অতঃপর মাথার উপর পানি ঢাললেন, এবং সমস্ত অঙ্গে পানি প্রবাহিত করলেন। এরপর তিনি (পূর্বস্থান) হতে কিছুদূর সরে গিয়ে দু'পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি (পানি মুছে ফেলার জন্য) তাঁকে কাপড় দিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। হস্তদ্বয় ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।

হাদীস (৩)ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারীদের এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ঋতুস্রাবের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বলে দিলেন। অতঃপর বলেন, মিশকের সুগন্ধিযুক্ত এক খণ্ড কাপড় নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। আনসারী মহিলা বললেন, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা লাভ করব? হুযুর বললেন, তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। আনসারী মহিলা পুনরায় বললেন, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা লাভ করব? হুযুর বললেন, সুবহানাল্লাহ (বুদ্ধি খাটায়ে) তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, হুযুরের পুনরুক্তি শুনলাম এবং সে মহিলাকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং তাঁকে বললাম (রক্তস্রাব শেষ হলে) তা দ্বারা (যৌনাঙ্গের ভিতরটা) মুছে রক্তের দাগ দূরীভূত করবে।

হাদীস (৪)ঃ মুসলিম শরীফে, হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলাম এয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার চুলের বেনী শক্ত করে বাঁধি নাপাকীর গোসলের সময় কি তা খুলে ফেলব? হুযুর বললেন, না, তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলী পানি ঢালবে, অতঃপর তোমার সম্পূর্ণ শরীরে পানি প্রবাহিত করবে, এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। অর্থাৎ যখন চুলের গোড়া ভিজে যাবে, আর যদি এত বেশী শক্ত হয় গোড়ায় পানি না পৌঁছে তখন খুলে ফেলা ফরজ।

হাদীস (৫)ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, প্রত্যেক চুলের নীচেই নাপাক রয়েছে সুতরাং চুলগুলো ভালভাবে ধুইবে। এবং শরীরের চামড়াকে উত্তমরূপে মর্দন করে পরিষ্কার করবে।

হাদীস (৬)ঃ আবু দাউদ শরীফে, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি একটি চুল পরিমাণ স্থানও নাপাকীর গোসলে ছেড়ে দিয়েছে; তা ধৌত করেনি। এ জন্য তাকে দোজখের আগুনে এরূপ এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, (রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ শুনে) সে সময় হতেই আমার মাথার সাথে

শত্রুতা করেছি। সেই সময় হতেই আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি, তিনবার বললেন। অর্থাৎ মাথার চুল মুণ্ডাবে, যেন চুলের কারণে কোন স্থান শুকনা না থাকে।

হাদীস (৭)ঃ সুনানে আরবা শরীফে হযরত উম্মুলমুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গোসল করার পর অযু করতেন না।

হাদীস (৮)ঃ আবু দাউদ শরীফে, হযরত ইয়ালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে খোলা ময়দানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরের উপর উঠলেন এবং প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও অন্তরালকারী। তিনি লজ্জা কর়া ও অন্তরাল থাকাকে ভালবাসেন। সুতরাং তোমাদের যদি কেহ খোলা ময়দানে গোসল করে সে যেন নিজকে অন্তরালে রাখে। অর্থাৎ পর্দা করা তার উপর অপরিহার্য।

হাদীস (৯)ঃ বহু কিতাবে অসংখ্য ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন লুঙ্গি বিহীন গোসল খানায় গমন না করে, এবং যে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন নিজ স্ত্রীকে স্নানাগারে না পাঠায়।

হাদীস (১০)ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্নানাগারে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন মহিলাদের জন্য স্নানাগারে কল্যাণ নেই। আরজ করলেন, তহবন্দ বেঁধে গেলে? বললেন, যদিওবা তহবন্দ, কুর্তা এবং ওড়না সহ গমন করে।

হাদীস (১১)ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে, উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা উম্মে সুলাইম বললেন, এয়া রসুলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। (অতএব আমিও বলতে লজ্জাবোধ করতে চাইনা) স্বপ্নদোষ হলে কি? স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হয়? হুযুর বললেন, অবশ্যই। যখন সে জেগে বীর্য দেখতে পায়, এতে উম্মে সালমা লজ্জায় মুখ ঢাকলেন, এবং বললেন, এয়া রাসুলাল্লাহ! মহিলাদের কি স্বপ্ন দোষ হয়? হুযুর বললেন, হ্যাঁ তা না হলে তার সন্তান তার সাদৃশ্য হয় কিরূপে?

ফায়েদাঃ উম্মেহাতুল মুমেনীনদেরকে আল্লাহ তায়ালা নবীর খেদমতে হাজির হওয়ার পূর্বেও স্বপ্নদোষ হতে সংরক্ষণ করেছেন। যেহেতু স্বপ্নদোষে শয়তানের প্রবিষ্ঠতা আছে আল্লাহর নবীর রমনীগণ, শয়তানী প্ররোচণা ও প্রবিষ্ঠতা হতে মুক্ত পবিত্র। এ কারণেই হযরত উম্মে সুলাইম এ প্রশ্নে আশ্চার্যান্বিত হলেন।

হাদীস (১২)ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফে, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন পুরুষ জাগ্রত হয়ে শুক্রের আদ্রতা পেয়েছে অথব স্বপ্ন দোষের কথা তার স্মরণ পড়ছেনা, সে কি করবে? তিনি বললেন, সে গোসল করবে, অপর পক্ষে কোন পুরুষের স্মরণ হচ্ছে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে অথচ কোথাও শুক্রের আদ্রতা পাচ্ছেনা। সে কি করবে? তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরজ নহে। এ সময় উম্মে সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন হুযুর! যে স্ত্রীলোক সে রূপ দেখবে তার উপরও কি গোসল ফরজ হবে। হুযুর বললেন, হ্যাঁ। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই ন্যায়।

হাদীস (১৩)ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন (পুরুষের) খতনার অঙ্গ স্ত্রী লোকের খতনার অঙ্গে অতিক্রম করে, তখন গোসল ফরজ হবে।

হাদীস (১৪)ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (আমার পিতা) ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বললেন যে, তিনি রাত্রে নাপাক হয়ে যান, (তখন তিনি কি, করবেন)? তখন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, তখন তুমি অযু করবে, তোমার পুরুষাঙ্গকে ধৌত করবে। অতঃপর ঘুমাবে।

হাদীস (১৫)ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাক অবস্থায় হতেন, এবং কিছু খেতে ইচ্ছে করতেন বা ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন, তখন অযু করতেন, নামাযের অযুর মত।

হাদীস (১৬)ঃ মুসলিম শরীফে, হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর আবারও করতে চায়, সে যেন উভয় সহবাসের মাঝখানে একবার অযু করে।

হাদীস (১৭)ঃ তিরমিযী শরীফে, ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঋতুবর্তী মহিলা বা নাপাক ব্যক্তি, কোরআন হতে কিছুই পড়বেনা।

হাদীস (১৮)ঃ আবু দাউদ শরীফে, উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের এ সমস্ত ঘরগুলোর দরজা মসজিদের দিক থেকে অন্য দিকে ফিরায়ে দাও। কারণ, আমি ঋতুবর্তী মহিলাকে এবং নাপাক ব্যক্তিকে মসজিদে আসা হালাল মনে করিনা।

হাদীস (১৯)ঃ আবু দাউদ শরীফে, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, সে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না। যে ঘরে কোন ছবি, অথবা কুকুর বা নাপাক ব্যক্তি রয়েছে।

হাদীস (২০)ঃ আবু দাউদ শরীফে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির কাছে

রহমতের ফেরেস্তা যান না, (১) কাফেরের মৃত শরীর, (২) খালুকের সুগন্ধি ব্যবহারকারী ব্যক্তি, (৩) নাপাক ব্যক্তি যতক্ষণ না অযু করে।

হাদীস (২১)ঃ ইমাম মালেক (রা) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে পত্র আমর বিন হাযম -এর নিকট লিখেছেন এর মধ্যে ছিল, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবেনা।

হাদীস (২২)ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি জুমাতে যাবে, সে যেন গোসল করে।

গোসলের মাসায়েল

গোসল ফরজ হওয়ার কারণ পরে লিখা হবে। প্রথমে গোসলের হাক্বীকত বর্ণনা করা হবে। গোসলের তিনটি অংশ, তার একটিও কম হলে গোসল হবে না। এরূপও বলা যায়, যে, গোসলের ফরজ তিনটি।

কুল্লি করাঃ মুখের প্রত্যেক অংশের কোণা, ঠোঁঠ থেকে কণ্ঠনালীর গোড়া পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় যেন পানি পৌঁছে যায়। আধিকাংশ লোক মনে করে যে, সামান্য পানি মুখে নিয়ে নিক্ষেপ করলেই কুল্লি হয়। যদিও মুখের গোড়া এবং কণ্ঠনালীর কিনারা পর্যন্ত পানি না পৌঁছে, এমনভাবে গোসল হবে না। এরকমভাবে গোসল করার পর নামায জায়েয হবে না। বরং মাড়ি, দাঁত, দাঁতের ফাঁক জিহ্বার উভয় পার্শ্বে গলার কিনারা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ দাঁতের গোঁড়া, বা মাড়িতে এমন কোন বস্তু আটকে থাকলে যা পানি প্রবাহিত করতে বাধা সৃষ্টি করে, তা ছুড়ায়ে ফেলা জরুরি। যদি ছুটাতে ক্ষতি বা অসুবিধা না হয়, যেমন চাউলের দানা, বা মাংসের টুকরা। আর যদি ছুটাতে ক্ষতি বা অসুবিধা হয় যেমন অনেকে বেশী বেশী পান খাওয়ার ফলে দাঁতের গোড়ার ফাঁকে চুন জমে যায়, বা মহিলাদের দাঁতে, মাজনের উপকরণ, যা ঘষে নিলে দাতের বা মাড়ির ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকলে তা মাফ।

মাসয়ালাঃ সংযুক্ত দাঁত তার দ্বারা বা উপড়ে ফেলা দাঁত কোন উপকরণ দিয়ে বাঁধায়ে নিল, এবং পানি তার বা উপকরণের নীচ দিয়ে পৌঁছাতেছেনা, তখন মাফ। খাদ্য বা পান এর চিল্‌কা দাঁতে আটকে আছে, যা বের করে পৃথক করা এবং মুখ ধুয়ে নেয়া জরুরি, যদি পানি পৌঁছতে অন্তরায় না হয়।

মাসয়ালাঃ (২) নাকে পানি দেয়াঃ অর্থাৎ নাকের উভয় ছিদ্রে যতদূর নরম জায়গা আছে, ওই পর্যন্ত ধৌত করা। এবং পানি নাক দ্বারা টেনে উপরে নিয়ে যাওয়া, যেন চুল বরাবর কোন অংশও বাকী না থাকে, অন্যথায় গোসল হবে না। নাকের ভিতর শ্লেষ্মা শুকায়ে থাকলে তা পরিষ্কার করাও ফরজ। উপরন্ত নাকের পশম ধৌত করাও ফরজ।

মাসয়ালাঃ নাকের অগ্রভাগে ব্যবহৃত অলঙ্কার বিশেষের ছিদ্র যদি বন্ধ না থাকে, তার মধ্যে পানি পৌঁছানো জরুরী, সঙ্কীর্ণ হলে নাড়া দেয়া জরুরী, অন্যথায় নহে।

(৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করাঃ অর্থাৎ মাথার চুল থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত শরীরের প্রত্যেক অংশে শুকনা স্থানে পানি প্রবাহিত করা, অনেক সাধারণ মানুষ এমন কি কতেক শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত, মাথার উপর পানি ঢেলে শরীরের উপর হাত ফিরায়ে নেয়, এবং মনে করে যে, গোসল হয়ে গেছে অথচ এমন অনেক অঙ্গ রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশেষভাবে তা ধৌত করা না হবে, গোসলই হবে না। বিধায় বিস্তারিত' বিবরণ দেয়া হচ্ছে, অযুর অঙ্গ সমূহে যে সব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে প্রত্যেক অঙ্গের আলোচনায় তার বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো, এখানেও লক্ষ্য রাখা জরুরি। তাছাড়া গোসলে নিম্নোক্ত কাজগুলো বিশেষভাবে অপরিহার্য।

গোসলের অপরিহার্য বিষয়াদি

মাথার চুল জটযুক্ত না হলে প্রত্যেক চুলের গোড়া থেকে প্রান্ত পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করা, জড়যুক্ত হলে বা অপবিত্র হলে পুরুষের জন্য গোড়া থেকে কিনারা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করা ফরজ। মহিলার জন্য শুধু গোড়া ভিজায়ে নেয়া জরুরি। খুলে ফেলা জরুরি নয়। হ্যাঁ চুলের খোপা যদি এতবেশি ময়লা যুক্ত হয়, বা জট হয়, না খুললে গোড়া ভিজা হবে না তখন খুলে ফেলা জরুরি। কানে, নাকে, দুল বা অলংকারাদির ছিদ্র থাকলে সেখানেও পানি পৌঁছে দেয়ার একই হুকুম। নাকের নাকফুলের ছিদ্রের যে হুকুম অযুর বর্ণনায় আলোকপাত হয়েছে, একই হুকুম, অর্থাৎ নড়াছড়া করে পানি পৌঁছার ব্যবস্থা করবে। ভ্রু, গোঁফ এবং দাঁড়ির পশমের গোড়া থেকে কিনারা পর্যন্ত এবং তার নীচের চামড়া ধৌত করা। কানের প্রত্যেক অংশ, এবং কানের ছিদ্রের মুখ ধৌত করা, কানের পিছনের পশম সরায়ে পানি প্রবাহিত করা। চিবুক এবং গলার জোড়া মুখ উঠানো ব্যতিরেকে ধৌত করবেনা। বগল সমূহ হাত উঠানো ছাড়া ধুইবে না। বাহুর প্রত্যেক দিক, পিঠের প্রত্যেক অংশ, পেটের বেল্ট উঠায়ে ধৌত করবে, নাভীর মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করে ধুইবে, পানি গড়িয়ে পড়তে যদি সন্দেহ হয়। শরীরের প্রত্যেক সুক্ষ্ম লোম গোড়া থেকে কিনারা পর্যন্ত উরু এবং পাকস্থলীর জোড়া, উরু এবং গোড়ালীর জোড়া যখন বসে গোসল করবে তখন ধৌত করবে। দু'নিতম্বের মিলনস্থল, বিশেষভাবে যখন দাঁড়ায়ে গোসল করা হয়। উরুর গোলাকৃতি, গোড়ালীর পার্শ্বসমূহ, পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষের মিলনস্থল পৃথক না করে ধুইবে না। অণ্ডকোষের নীচের সমতল স্থল গোড়া পর্যন্ত ধৌত করবে। যার খৎনা হয়নি, চামড়ার উপর ধৌত করা গেলে, চামড়ার উপর পানি প্রবাহিত করবে, এবং গুপ্তাঙ্গের ভিতরও পানি প্রবাহিত করবে। মহিলাদের জন্য এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্কতা অপরিহার্য।

মন্থর হয়ে পড়া স্তন উঠায়ে ধৌত করাঃ স্তন ও পেটের সংযুক্ত রেখা ধুইবে। লজ্জাস্থানের বাহিরের প্রত্যেক দিকে এবং প্রত্যেক অংশের নীচে উপরের ন্যায় ধুয়ে নেবে। হ্যাঁ লজ্জাস্থানের ভিতরে আঙ্গুল প্রবেশ করে ধৌত করা ওয়াজিব নহে, বরং মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে হায়েজ নেফাস বা ঋতুবর্তী মহিলা ঋতু সম্পন্নের পর গোসল করলে একটি পুরাতন কাপড় দ্বারা লজ্জাস্থানের ভিতরের রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করে নেয়া মুস্তাহাব। নববধুর কপালে যদি সুক্ষ্ম চুর্ণ বিশেষ সজ্জা স্বরূপ লাগানো থাকে তখন তা ছুটায়ে ফেলা জরুরি।

মাসয়ালাঃ চুলে যদি গিরা পড়ে, খুলে তার মধ্যে পানি প্রবাহিত করা জরুরি নহে।

মাসয়ালাঃ কোন ক্ষতস্থানে পাট্টি বাঁধল যা খুললে ক্ষতি বা অসুবিধা হবে। কোন স্থানে রোগ বা ব্যথার কারণে পানি প্রবাহিত করা ক্ষতিকর হলে তখন সে পূর্ণ অঙ্গ মছেহ করে নেবে, আর করতে না পারলে, তখন পাট্টির উপর মুছেহ করা যথেষ্ট। প্রয়োজনীয় স্থানের বেশী পাট্টি রাখবেনা। অন্যথায় মুছেহ যথেষ্ট হবে না। আর পাট্টি প্রয়োজনীয় স্থানেই বাঁধল, যেমন বাহুর একদিকে জখম হয়েছে পাট্টি বাঁধলে বাহুর এতটুকু গোলাকৃতি হওয়া জরুরী যাতে তার নীচে শরীরের ঐ অংশটাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেখানে পানি পৌঁছা ক্ষতিকর নয়। খুলে নেয়া সম্ভব হলে, খুলে ঐ অংশ ধুয়ে নেয়া ফরজ। আর যদি সম্ভব না হয়, যদি খুলতে পারা যায়। কিন্তু খোলার পর সেভাবে বাঁধতে পারবেনা এবং এতে ক্ষতির আশঙ্কা হলে, তখন সম্পূর্ণ পাট্টির উপর মুছেহ করলে যথেষ্ট হবে। শরীরের সুস্থ অংশটাও ধোয়া হতে মাফ হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কফ, শ্লেষ্মা বা চক্ষু রোগ হলে এবং মাথা ধৌত করলে রোগ বৃদ্ধি পাবে, বা রোগ সৃষ্টি হবে মর্মে ধারণা হলে, তখন কুল্লি করবে, নাকে পানি ঢালবে, আর যদি গর্দান ধৌত করা হয় এবং মাথার প্রত্যেক অংশে ভিজা হাত ফিরানো হয়, গোসল হয়ে যাবে। সুস্থ হওয়ার পর মাথা ধুয়ে নিবে। বাকী অংশ পুনঃ ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ খাবার রান্না প্রস্তুতকারীর নখে আটা, বা লিখকের হাতে কালির দাগ, সাধারণ মানুষের হাতে মশা মাছির মল লাগলে গোসল হয়ে যাবে, হ্যাঁ জানার পর পৃথক করা এবং এ স্থান ধৌত করে নেয়া জরুরি প্রথমে যে নামায পড়েছে তা হয়ে গেল।

গোসলের সুন্নত সমূহঃ

✪ গোসলের নিয়্যত করে প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা, অতঃপর ইস্তেঞ্জার জায়গা ধৌত করা, অপবিত্র হোক বা না হোক।

✪ শরীরের যে স্থানে নাপাকী রয়েছে তা দূর করা। অতঃপর নামাযের ন্যায় অযু করা, কিন্তু পা ধৌত করবে না। হ্যাঁ যদি চকি, আসন, বা পাথরের উপর গোসল করলে তখন পদদ্বয়ও ধৌত করবে। অতঃপর শরীরের উপুর তেলের ন্যায় পানি ছিটকাবে, বিশেষতঃ শীতকালে। অতঃপর তিনবার ডান কাঁধের উপর পানি প্রবাহিত করবে। অতঃপর তিনবার বাম কাঁধের উপর।

✪ মাথার উপর এবং সমস্ত শরীরের উপর তিনবার পানি প্রবাহিত করবে। অতঃপর গোসলের স্থান থেকে কিছুদূর সরে গিয়ে অযুর সময় পদদ্বয় না ধুলে পদদ্বয় ধৌত করে নেবে। গোসলের সময় ক্বিবলামুখী হবে না।

✪ সমস্ত শরীরে হাত ফিরাবে। এবং মালিশ করবে।

✪ এমন স্থানে ধৌত করবে, যেন কেউ না দেখে। এমনস্থান না হলে, তখন নাভী থেকে গোড়ালী পর্যন্ত অঙ্গ সমূহের সতর বা পর্দা করা অপরিহার্য। এতটুকু ও সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করবে। কিন্তু এরূপ সম্ভাবনা দুর্লভ।

✪ কোন প্রকার কথা বলবে না।

✪ কোন প্রকার দোয়া পড়বে না।

✪ গোসলের পর রুমাল দ্বারা শরীর মুছলে কোন ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ গোসল খানার যদি ছাদ না থাকে, বা অনাবৃত দেহে গোসল করলে, সতর্কতামূলক স্থানে হলে তখন কোন ক্ষতি নেই। হ্যাঁ মহিলাদেরকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। এবং মহিলারা বসে গোসল করাটা উত্তম। গোসলের পর দ্রুত কাপড় পরিধান করে নেবে। অযুর সুন্নত ও মুস্তাহাব সমূহ গোসলেরও সুন্নত এবং মুস্তাহাব। কিন্তু সতর খোলা থাকলে ক্বিবলামুখী হওয়া সমীচিন নহে। তহবন্দ বা লূঙ্গি বাঁধলে ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ যদি প্রবাহমান পানি, যেমন সমুদ্র, বা নদীর পানিতে গোসল করল। তখন কিছুক্ষণ পানিতে অবস্থান করলে, তিনবার ধৌত করা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং অযুর এসব সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। অঙ্গসমূহকে তিনবার নাড়া দেয়ারও প্রয়োজন নেই। পুকুর ইত্যাদির বদ্ধ পানিতে গোসল করলে, অঙ্গ সমূহ তিন বার ধৌত করা এবং জায়গা পরিবর্তন করে তিনবার ধৌত করার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। বৃষ্টির পানিতে দাড়াল, এটা প্রবাহিত পানিতে দাঁড়ানোর হুকুমের অন্তুর্ভক্ত হয়ে গেল, প্রবাহিত পানিতে অযু করল, তখন কিছুক্ষণ সময় এতে অঙ্গসমূহ রাখা এবং বদ্ধ পানিতে নাড়া দেয়া তিনবার ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত।

মাসয়ালাঃ সকলের জন্য গোসল বা অযুর মধ্যে পানির একই পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। যেমন ধারণা জনসাধারণ্যে প্রচলিত, তা নিতান্ত ভুল। একজন দীর্ঘাকৃতি, অন্যজন হালকা পাতলা দুর্বল, একজনের সম্পূর্ণ অঙ্গে পশম, অন্যজনের শরীর পশম মুক্ত, একজনের ঘন দাঁড়ি, অন্য জনের দাঁড়ি শ্মশ্রু, একজনের মাথায় বড় বড় চুল, অন্যজনের মাথা মুন্ডানো, এ অনুমানের ভিত্তিতে সকলের জন্য একই পরিমাণ পানি কিভাবে সম্ভব হবে?

মাসয়ালাঃ মহিলা স্নানাগারে যাওয়া মাকরূহ, পুরুষ যেতে পারবে। কিন্তু সতরের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। মানুষের সামনে সতর খুলে গোসল করা হারাম।

মাসয়ালাঃ অপ্রয়োজনে ভোরে তাড়া করে স্নানাগারে যাবেনা। এতে একটি গোপন বিষয় মানুষের সামনে প্রকাশ পায়।

গোসল ফরয হওয়ার কারণ সমূহ

(১) বীর্য স্বীয়স্থান হতে কামভাবের সাথে পৃথকভাবে অঙ্গ থেকে বের হওয়া গোসল ফরজ হওয়ার কারণ।

মাসয়ালাঃ কামভাবের সহিত যদি স্বীয় স্থান হতে পৃথক না হয়, বরং বোঝা বহনে বা উঁচুস্থান থেকে নামার কারণে বের হলো, তখন গোসল ওয়াজিব হবে না, হ্যাঁ অযু ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ বীর্য যদি স্বীয় পাত্র থেকে কামভাবের সহিত পৃথক হয়। কিন্তু সে ব্যক্তি, স্বীয় পুরুষাঙ্গকে স্বজোরো চেপে ধরেছে, যেন বের হতে না পারে, অতঃপর কামভাব চলে গেলে ছেড়ে দেয়, এবং বীর্য বের হয়, তখন বাহির হওয়াটা যদিও বা কামভাবের সাথে না হয় কিন্তু স্বীয় স্থান থেকে যেহেতু কামভাবের সাথে পৃথক হয়েছে এজন্য গোসল ওয়াজিব হবে। এরই উপর আমল করবে।

মাসয়ালাঃ যদি সামান্য বীর্য বের হয়, অতঃপর প্রস্রাবের পূর্বে বা নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বা চল্লিশ কদম চলার পূর্বে গোসল করে নিল এবং নামায পড়ল, এখন অবশিষ্ট বীর্য বের হলো, তখন আবার গোসল করবে, যেহেতু এটা সে বীর্যের অংশ, যা স্বীয় স্থান থেকে কামভাবের সাথে পৃথক হয়েছিল, ইতোপূর্বে যে নামায পড়েছে, তা হয়ে যাবে। তা পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

আর যদি চল্লিশ কদম চলার বা প্রস্রাব করার বা ঘুমাবার পর গোসল করে, অতঃপর কামভাব বিহীন বীর্য বের হলো, তখন গোসল জরুরী নহে এবং এ বীর্যকে পূর্বের বীর্যের অবশিষ্ট বীর্য বলা যাবে না।

মাসয়ালাঃ যদি পাতলা বীর্য বের হয় বা প্রস্রাবের সময় অনুরূপ সামান্য ফোঁটা বের হলো, তখন গোসল ওয়াজিব হবে না। অবশ্য অযু ভঙ্গ হবে।

(২) স্বপ্ন দোষ হওয়াঃ অর্থাৎ ঘুম হতে উঠল শরীর বা কাপড়ে আদ্রতা দেখতে পেল, এবং এ আদ্রতা বীর্য বা মযি (কামভাব উত্তেজক রস) হওয়ার বিশ্বাস বা ধারণা সৃষ্টি হয় তখন গোসল ওয়াযিব হবে। যদিও স্বপ্নের কথা স্মরণ না হয়, আর যদি বিশ্বাস হয় যে -তা বীর্য বা মযি নয়। বরং ঘাম বা প্রস্রাব বা ওদী বা অন্য কিছু তখন যদিও বা স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হয় এবং বীর্যপাতের প্রশান্তি স্মরণ হয় গোসল ওয়াযিব হবে না। আর যদি বীর্য না হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস হয় এবং মযি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তখন নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নদোষ হওয়ার কথা স্মরণ না হলে, গোসল ওয়াযিব নহে, অন্যথায় ওয়াযিব।

মাসয়ালাঃ স্বপ্নদোষ হওয়ার কথা যদি স্মরণ হয় কিন্তু কাপড়ে যদি তার কোন চিহ্ন পাওয়া না যায়, তখন গোসল ওয়াযিব হবে না।

মাসয়ালাঃ ঘুমাবার পূর্বে কামভাব ছিল এবং পুরুষাঙ্গ খাড়া ছিল, জাগ্রত হওয়ার পর এর চিহ্ন পেল, মযি হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় এবং স্বপ্ন দোষ হওয়ার কথা

স্মরণ না হয় তখন গোসল ওয়াযিব হবে না। যতক্ষণ না বীর্য হওয়ার প্রবল ধারণা হয়, ঘুমাবার পুর্বে কামভাবই ছিলনা, বা ছিল, কিন্তু নিদ্রা আসার পূর্বে শিথিল হয়ে পড়েছে এবং যা বের হয়েছিল, পরিষ্কার করেছে তখন বীর্য হওয়ার ধারণা করার প্রয়োজন নেই। বরং বীর্য হওয়ার ধারণা হলেই গোসল ওয়াযিব হবে -এ মাসয়ালা অধিক সংগঠিত হয়। লোকেরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এদিকে লক্ষ্য রাখা অতীব প্রয়োজন।

মাসয়ালাঃ রোগের কারণে মূর্ছা গেলে বা নেশা অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হলে, সংজ্ঞা ফিরে আসার পর কাপড় বা শরীরের উপর মযি দেখলে অযু ওয়াযিব হবে, গোসল ওয়াযিব হবে না। ঘুমাবার পর এ রকম দেখলে, তখন গোসল ওয়াযিব হবে। কিন্তু ঘুমাবার পূর্বে কামভাব ছিল না এ শর্তে।

মাসয়ালাঃ কেউ স্বপ্ন দেখল, এবং বীর্য বের হয়নি। চক্ষু খুলে গেছে পুরুষাঙ্গ আকড়ে ধরল, যেন বীর্যপাত না হয়, অতঃপর নিস্তেজ হলে ছেড়ে দিল, এবং বীর্য বের হলো, তখন গোসল ওয়াযিব হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ নামাযে উত্তেজনা ছিল, এবং বীর্যপাত হয়েছে মনে হচ্ছে, কিন্তু এখনো বের হয়নি, নামায পূর্ণ করে নিল, এখন বের হলো, তখন গোসল ওয়াযিব হবে। কিন্তু নামায হয়ে গেল।

মাসয়ালাঃ দাড়া, বসা, বা চলন্ত অবস্থায় ঘুম আসল, চক্ষু খোলে মযি দেখতে পেল, তখন গোসল ওয়াযিব।

মাসয়ালাঃ রাত্রে স্বপ্নদোষ হল, জেগে উঠার পর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না, অযু করে নামায পড়ে নিল, এর পর বীর্য বের হলে, গোসল এখন ওয়াযিব হল, ঐ নামায হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ মহিলার স্বপ্ন দোষ হল, যতক্ষণ বীর্য লজ্জাস্থান থেকে বের হবে না গোসল ওয়াযিব হবে না।

মাসয়ালাঃ নারী, পুরুষ একসাথে একটি খাটে ঘুমাল, জাগ্রত হওয়ার পর বিছানায় বীর্য পেল, এদের প্রত্যেকে স্বপ্ন দোষ হওয়াকে অস্বীকার করছে, তখন দুজনই গোসল করা অধিক উত্তম ও সতর্কতার পরিচায়ক, এটিই বিশুদ্ধ।

মাসয়ালাঃ ছেলে স্বপ্নদোষের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক হল, তখন তার উপর গোসল ওয়াযিব।

✪ খাশফা-অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের মাথা মহিলার সামনে বা পিছনে বা পুরুষের পিছন রাস্তায় প্রবেশ করলে, উভয়ের উপর গোসল ওয়াযিব। কামভাব সহকারে হোক বা কামভাব ছাড়া হোক, বীর্যপাত হোক বা না হোক, কিন্তু উভয়ে মুকাল্লিফ (অর্থাৎ শরীয়তের বিধান আরোপ যোগ্য) হওয়া শর্ত। যদি একজন বালেগ হয়, বালেগের উপর গোসল ফরজ। কিন্তু নাবালেগের উপর যদিওবা গোসল ফরজ নহে, কিন্তু

গোসল করার নির্দেশ দেয়া যাবে। যেমন-পুরুষ বালেগ, মেয়ে নাবালেগা তখন পুরুষের উপর ফরজ এবং নাবালেগা কন্যাকেও গোসলের হুকুম রয়েছে, আর যদি ছেলে নাবালেগ হয়, কন্যা বালেগা হয়, তখন কন্যার উপর ফরজ এবং ছেলেকেও গোসলের হুকুম দেয়া যাবে।

মাসয়ালাঃ পুরুষাঙ্গের মাথা যদি কর্তিত হয়, পুরুষাঙ্গের অবশিষ্ট অঙ্গ যদি পুরুষাঙ্গের কর্তিত অংশ পরিমাণ প্রবেশ করে তখনও একই হুকুম যা পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশের হুকুম।

মাসয়ালাঃ যদি চতুষ্পদ জন্তু বা মৃত ব্যক্তি বা এমন ছোট ছেলে, যে ধরনের ছেলের সাথে সঙ্গম করা যায় না, সঙ্গম করলে যতক্ষণ না বীর্যপাত হবে, গোসল ওয়াযিব হবে না।

মাসয়ালাঃ মহিলার উরুর মধ্যে সহবাস করল, বীর্যপাতের পর বীর্য যৌনাঙ্গে প্রবেশ করল, বা কুমারীর সাথে সঙ্গম করল, এবং বীর্যপাতও হল, কিন্তু কুমারীত্ব দূর হয়নি তখন মহিলার উপর গোসল ওয়াযিব হবে না, হ্যাঁ যদি মহিলার গর্ভে প্রবেশ করে, তখন গোসল ওয়াযিব হওয়ার হুকুম দেয়া হবে এবং সহবাসের পর থেকে যতক্ষণ গোসল করেনি, সবগুলো নামায পুনরায় পড়ে দিতে হবে।

মাসয়ালাঃ মহিলা স্বীয় যৌনাঙ্গের মধ্যে আঙ্গুল বা প্রাণী অথবা মৃত ব্যক্তির পুরুষাঙ্গ বা অন্য কোন বস্তু, রোবট বা মাটি ইত্যাদির আকৃতি সাদৃশ্য পুরুষাঙ্গ বানায়ে যৌনাঙ্গে প্রবেশ করল, তখন যতক্ষণ না বীর্যপাত হবে, গোসল ওয়াযিব হবে না। জ্বীন, মানুষের আকৃতি ধারণ করে এসে মহিলার সাথে সহবাস করল, তখন যৌনাঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই গোসল ওয়াযিব হবে। মানুষের আকৃতিতে না হলে, যতক্ষণ মহিলার বীর্যপাত না হবে, গোসল ওয়াযিব হবে না। অনুরূপভাবে পুরুষ, জ্বীন পরীর সাথে সঙ্গম করল, এমন সময় মানুষের আকৃতিতে ছিলনা। বীর্যপাত ছাড়া গোসল ওয়াযিব হবে না। মানবাকৃতিতে হলে যৌনাঙ্গ অদৃশ্য হওয়া মাত্রই ওয়াযিব হবে।

মাসয়ালাঃ সঙ্গমের গোসলের পর, মহিলার শরীর থেকে পুরুষের অবশিষ্ট বীর্য বের হলো, তখন এর দ্বারা গোসল ওয়াযিব হবে না। অবশ্য অযু ভঙ্গ হবে।

ফায়েদাঃ উপরোক্ত তিন কারণে যার উপর গোসল করা ফরজ হয়েছে, তাকে যুনুব বা অপবিত্র এবং কারণসমূহকে জানাবত বা অপবিত্রতা বলা হয়।

(৪) হায়েয বন্ধ হলে (৫) নেফাস শেষ হলে (অর্থাৎ শিশুজন্মের পর মহিলার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে রক্তক্ষরণ হয়, সেটা বন্ধ হলে গোসল ফরজ হবে)।

মাসয়ালাঃ শিশু জন্ম হল, রক্ত মোটেই বের হলনা, বিশুদ্ধ মতানুসারে গোসল ওয়াযিব হবে। হায়েয ও নেফাসের বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ হায়েযের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

মাসয়ালাঃ কাফির পুরুষ বা মহিলা যুনুব বা অপবিত্র অথবা হায়েয নেফাস সম্পন্না কাফের মহিলা মুসলমান হলো, যদিও বা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হায়েয নেফাস বন্ধ হয়, বিশুদ্ধ মতানুসারে তাদের উপর গোসল ওয়াযিব। হ্যাঁ, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করে থাকলে বা যে কোন ভাবে শরীরের উপর পানি প্রবাহিত হলে, তখন শুধুমাত্র নাকের নরম বাঁশি পর্যন্ত পানি ছড়ানো যথেষ্ট। ওটা এমনস্থান যা কাফিররা আদায় করে না। পানির বড় বড় ঢোক বা চুমুক গিললে কুল্লির ফরজ আদায় হবে। আর যদি এটাও বাকী থাকে, তাও আদায় করে নেবে। মূলতঃ অঙ্গ ধৌত করা গোসলের মধ্যে ফরজ। সঙ্গম ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক কাজের পর তা যদি কুফরী অবস্থায় ধুয়ে থাকে, তখন ইসলাম গ্রহণের পর তা পুনরায় ধৌত করা জরুরি নহে। নতুবা যতটুকু বাকী ছিল, ততটুকু ধুয়ে নেয়া ফরজ। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর পূর্ণরূপে গোসল করা মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ মুসলমান মৃত ব্যক্তিদেরকে গোসল দেয়া মুসলমানদের উপর ফরজে কেফায়া, একজন লোকে গোসল দিলে, সকলে দায়িত্ব মুক্ত হল, কেউ না দিলে সকলেই গুনাহগার হবে।

মাসয়ালাঃ পানির মধ্যে মুসলমানের মৃত লাশ পাওয়া গেলে তাকেও গোসল দেয়া ফরজ। পানি থেকে বের করার সময় গোসলের নিয়্যতে তাকে নিমজ্জিত করলে। গোসল হয়ে যাবে, অন্যথায় গোসল দিবে।

মাসয়ালাঃ জুমা, রমজানের ঈদ, কুরবানীর ঈদ, আরাফাতের দিবস এবং ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করা সুন্নত।

☐ আরাফাতে অবস্থান ☐ মোযদালাফায় অবস্থান, হেরেম শরীফে উপস্থিতির সময় ☐ হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিতির সময়, ☐ জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের তিনদিন ☐ তাওয়াফ কালে ☐ মিনায় প্রবেশ কালে, ☐ শবেবরাতে ☐ শবেকদরে ☐ আরাফার রাত্রি ☐ মিলাদ শরীফের মজলিসে উপস্থিতির জন্য ☐ অন্যান্য উত্তম মজলিসে উপস্থিতির জন্য ☐ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর, ☐ পাগলের পাগলামী দূর হওয়ার পর, ☐ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সংজ্ঞা ফিরে আসার পর ☐ নেশাগ্রস্তের নেশা দূরীভূত হওয়ার পর ☐ গুনাহ থেকে তওবা করার জন্য ☐ নতুন কাপড় পরিধানের জন্য ☐ সফর হতে আগন্তুকের সাক্ষাতের জন্য ☐ এস্তেহাযার রক্ত বন্ধ হওয়ার পর, ☐ চন্দ্রগ্রহণ ☐ সূর্যগ্রহণ এবং বৃষ্টি প্রার্থনার নামায ☐ ভয়ের নামায ☐ অন্ধকারের জন্য এবং অধিক অন্ধত্বের জন্য ☐ শরীরে নাপাকী লাগলে, এবং জানা-নেই যে কোন্ স্থানে নাপাকী রয়েছে. উপরোক্ত সবগুলোর জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ হজ্ব আদায়কারীর জন্য জিলহজ্বের দশম তারিখে পাঁচটি গোসল রয়েছে। (১) মোযদালাফায় অবস্থানের সময় (২) মিনায় প্রবেশ কালে (৩) জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ কালে (৪) মক্কায় প্রবেশ কালে (৫) তাওয়াফের জন্য।

যদি পরে উল্লেখিত তিনটি কাজও দশম তারিখে করে এবং সে দিন জুমার দিন হলে, জুমার গোসলও করবে। অনুরূপভাবে আরাফাতের দিন বা ঈদের দিন যদি জুমার দিনে পড়ে তখন তাদের জন্য দুটি গোসল।

মাসয়ালাঃ যার উপর কয়েকটি গোসল একত্র হয়েছে, সবগুলোর নিয়্যত করে একবার গোসল করলে সব আদায় হবে এবং সবগুলোর ছওয়াব পাওয়া যাবে।

মাসয়ালাঃ মহিলা অপবিত্র হয়েছে এখনও গোসল করেনি, হায়েয শুরু হয়ে গেল, যদি চাই তখন গোসল করুক, অথবা হায়েয শেষ হবার পর করুক।

মাসয়ালাঃ যুনুব বা অপবিত্র ব্যক্তি জুমা বা ঈদের দিন জানাবতের গোসল করল, জুমা এবং ঈদ ইত্যাদির নিয়্যতও করে ফেলল, সব আদায় হবে। এ গোসল দ্বারা জুমা এবং ঈদের নামায আদায় করলে তাও আদায় হবে।

মাসয়ালাঃ মহিলার গোসলের জন্য বা অযুর জন্য পানি কিনতে হচ্ছে, তখন এর মূল্য স্বামীকে দিতে হবে। শর্ত হলো, গোসল এবং অযু ওয়াযিব হলে অথবা শরীর থেকে ময়লা অপরিষ্কার দূর করার জন্য গোসল করলে।

মাসয়ালাঃ যার উপর গোসল ওয়াযিব, তার উচিৎ গোসল করতে দেরি না করা। হাদীস শরীফে আছে যে, যে ঘরে অপবিত্র ব্যক্তি আছে, সে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না। যদি এতটুকু দেরী করে যে, নামাযের শেষ ওয়াক্ত এসে গেল, তখন দ্রুত গোসল করা ফরজ। তখন দেরী করলে গুনাহগার হবে। খাবার খেতে চাইলে বা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে চাইলে তখন অযু করবে বা হাত, মুখ ধুয়ে নেবে, কুল্লি করবে। আর যদি এমনিতেই পানাহার করে ফেলে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, গোসল ছাড়া স্ত্রীর নিকট যাওয়া তার জন্য সমীচিন নহে।

মাসয়ালাঃ রমজানের রাতে যদি অপবিত্র হয়, ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে গোসল করে নেয়াটা উত্তম। যেন রোজার প্রতিটি অংশ জানাবাত থেকে মুক্ত হয়। আর যদি গোসল না করে তখনও রোজার মধ্যে কোন ক্ষতি হবেনা। কিন্তু গড়গড়া করা এবং নাকের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো উচিৎ। এ দুটি কাজ ফজর উদিত হবার পূর্বে করে নেবে। যেন রোজার অংশে না পড়ে। আর যদি গোসল করতে এতটুকু বিলম্ব করে যে, দিন প্রবেশ করল, নামায ক্বাযা করে দিল, তখন এরকম হলে অন্য দিনের মধ্যেও গুনাহ হবে। রমজানে আরো অধিক গুনাহ হবে।

মাসয়ালাঃ যার উপর গোসল করা জরুরিঃ- (১) মসজিদে প্রবেশ করা, (২) তাওয়াফ করা, (৩) কুরআন মজীদ স্পর্শ করা, যদি ও বা এর অলিখিত অংশ বা জিল্দ হোক না কেন, (৪) স্পর্শ না করে দেখে বা মুখে পড়া (৫) কোন আয়াত লিখা, (৬) অথবা আয়াতের তাবীজ লিখা, (৭) বা এমন তাবীজ স্পর্শকরা (৮) অথবা এমন আংটি স্পর্শ করা বা পরিধান করা। যেটার মধ্যে কুরআনের হরফে মুকাত্তেয়াত সম্বলিত বর্ণ থাকে, তার উপর হারাম।

মাসয়ালাঃ কুরআন শরীফ, যদি জুযদানের মধ্যে থাকে, জুযদানের উপর হাত লাগালে কোন ক্ষতি নেই। এভাবে রুমাল ইত্যাদি কোন কাপড় দ্বারা স্পর্শ করা, যেটা নিজের বা কুরআন মজীদের সংশ্লিষ্ট নয়, তখন জায়েজ। জামার হাতা, চাদরের আঁচল, এমনকি চাদরের এক কোণা তার কাঁধের উপর অপর কোণা দ্বারা স্পর্শ করা হারাম।

মাসয়ালাঃ কুরআনের আয়াত যদি দোয়ার নিয়্যতে, বা বরকতের জন্য, যেমন বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, বা শুকরিয়া আদায়ের জন্য হাঁছির পর "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" পড়লো, বা দুঃখ মুসীবতের সময় "ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন" পড়লো, বা ছানার নিয়্যতে পূর্ণ সূরা ফাতেহা বা আয়াতুল কুরসী বা সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত– هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লো, এসব অবস্থায় কুরআন পাঠের নিয়্যত না হলে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে তিন "কুল" শব্দ ছাড়া ছানার নিয়্যতে পড়া যাবে। কুল শব্দ যোগে পড়া যাবে না, যদিও বা ছানার নিয়্যতে হোক। এমন অবস্থায় তা কুরআন হওয়াটা নির্দিষ্ট হল, নিয়্যতের কোন অন্তর্ভুক্তি নেই।

মাসয়ালাঃ অযুহীন অবস্থায় কুরআন মজীদ বা কুরআনের কোন আয়াত স্পর্শ করা হারাম, স্পর্শ না করে চোখে দেখে পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ মুদ্রার উপর আয়াত লিখলে, তখন অযুহীন, অপবিত্র এবং হায়েজ নেফাস সম্পন্না মহিলা তা স্পর্শ করা হারাম। হ্যাঁ যদি থলির মধ্যে থাকে থলি বহন করা, উঠা জায়েজ আছে। অনুরূপ, যে পাত্র বা গ্লাসের উপর সূরা বা আয়াত লিখিত আছে তা স্পর্শ করা তাদের জন্য হারাম। তা ব্যবহার করা সবার জন্য মাকরূহ। কিন্তু যখন বিশেষভাবে শেফার নিয়্যতে হয় তখন জায়েজ।

মাসয়ালাঃ কুরআন মজীদের অনুবাদ, ফার্সী বা উর্দু বা যে কোন ভাষায় হোক তা স্পর্শ করা এবং পড়া কুরআনের হুকুমের অনুরূপ।

মাসয়ালাঃ কুরআন মজীদের দিকে তাকালে এদের (অপবিত্র মহিলা) জন্য কোন ক্ষতি নেই। যদিও বা হরফ বা বর্ণের উপর দৃষ্টি পড়ে, এবং শব্দ সমূহ বোধগম্য হয় এবং মনে পড়ে যায়।

মাসয়ালাঃ উল্লেখিত অপবিত্র লোকেরা ফিক্হ তাফসীর, হাদীসের কিতাব সমূহ স্পর্শ করা মাকরূহ। যদি কোন কাপড় দ্বারা স্পর্শ করে যদিও বা তা পরিধানের হোক বা ঝুলন্ত হোক তখন কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আয়াতের স্থান সমূহে ওসব কিতাবের উপরেও হাত রাখা হারাম।

মাসয়ালাঃ উপরোক্ত অপবিত্র লোকেরা, তাওরীত, যবুর, ইঞ্জিল পড়া স্পর্শ করা হারাম।

মাসয়ালাঃ দরুদ শরীফ এবং দোয়া সমূহ পড়তে তাদের জন্য ক্ষতি নেই। কিন্তু উত্তম হলো অযু বা কুল্লি করে পড়া।

মাসয়ালাঃ আজানের জবাব দেয়া তাদের জন্য জায়েজ।
মাসয়ালাঃ কুরআন শরীফ যদি এরকম হয়ে পড়ে, যা পড়া যাচ্ছে না তখন তা কাফন পড়ায়ে এমন স্থানে দাফন করবে, যেখানে পা পড়ার সম্ভাবনা না থাকে।
মাসয়ালাঃ কাফেরকে কুরআন স্পর্শ করতে দেয়া যাবে না, বরঞ্চ সাধারণ বর্ণ সমূহ ও তাদের থেকে মুক্ত রাখবে।
মাসয়ালাঃ কুরআন সব কিতাবের উপরে রাখবে, তারপর তাফসীর, এর পর হাদীস, তারপর অবশিষ্ট ধর্মীয় কিতাব সমূহ স্তর অনুসারে রাখবে।
মাসয়ালাঃ কিতাবের উপর অন্য জিনিস রাখবেনা। এমনকি দোয়াত, কলম পর্যন্ত। যে সিন্দুকে কিতাব রাখা হয় তার মধ্যেও কোন বস্তু রাখবেনা।
মাসয়ালাঃ মাসায়েল বা ধর্মীয় পুস্তকের পাতা সমূহ দ্বারা পুস্তকের মলাট বাঁধা, যে দস্তর খানায় কবিতা ইত্যাদি লিখিত রয়েছে তা কাজে ব্যবহার করা, বিছানার উপর কিছু লিখা থাকলে তা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

পানির বিবরণ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

অর্থঃ আমি আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করি।
(১৯ পারা, সূরা ফুরক্বান)
আরো এরশাদ হয়েছে-

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ

অর্থঃ এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারিধারা বর্ষণ করেন, যদ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। এবং তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রনা অপসারণ করার জন্য (১৯ পারা- সুরা ফুরক্বান)
হাদীস (১) মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ অপবিত্র অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল করবেনা। (অর্থাৎ অল্প পানির মধ্যে যা দৈর্ঘ্য প্রস্থে একশত বর্গহাত বিশিষ্ট না হয়) একশত বর্গহাত বিশিষ্ট হলে প্রবাহিত পানির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা বললো, হে আবু হুরায়রা! তখন কি করবে? বললেন, তা থেকে নিয়ে নেবে।
হাদীস (২) সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ শরীফে হেকম বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহিলার ব্যবহৃত পানি দ্বারা পুরুষকে অযু করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীস (৩) ইমাম মালেক, আবু দাউদ, তিরমিযী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমরা সমুদ্রে সফর করে থাকি এবং নিজেদের সাথে সামান্য পানি রাখি, তা দ্বারা যদি অযু করি পিপাসার্ত থেকে যাব, আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা অযু করতে পারব? বললেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল। অর্থাৎ মাছ।
হাদীস (৪) আমিরুল মুমেনীন হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) এরশাদ করেন যে, রৌদ্রের গরম পানি দ্বারা গোসল করো না। তা কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে।

☐ **কোন্ প্রকারের পানি দ্বারা অযু জায়েজ এবং কোন্ প্রকারের পানি দ্বারা জায়েজ নয়ঃ**
সতর্কবাণীঃ যে পানি দ্বারা অযু জায়েজ, তা দ্বারা গোসল করাও জায়েজ এবং যা দ্বারা অযু নাজায়েজ তা দ্বারা গোসলও জায়েজ নহে।
মাসয়ালাঃ বৃষ্টি, নদী, নালা, ঝর্ণা, সমুদ্র, খাল, কূপ, এবং বরফ গলিত পানি দ্বারা অযু জায়েজ।
মাসয়ালাঃ যে পানির সাথে কোন বস্তু মিশ্রিত হল, যে কারণে একে পানি বলা হচ্ছেনা, এর অন্য কোন নাম ধারণ করল। যেমন, শরবত, বা পানির মধ্যে এমন কোন বস্তু ঢেলে রান্না করল, যদ্বারা ময়লা দূর করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন-শূরবা, চা, গোলাফ বা ঘর্মাক্ত। এর দ্বারা অযু গোসল জায়েজ হবে না।
মাসয়ালাঃ যদি পানির মধ্যে এমন বস্তু মিশ্রিত করে বা মিশ্রিত করে গরম করে, যদ্বারা উদ্দেশ্য হলো ময়লা অপরিস্কার দূর করা যেমন- সাবান বা বরই পাতা, তখন তা দ্বারা অযু জায়েজ। যতক্ষণ না, তার তরলতা দূর করবে। ছাতুর ন্যায় যদি গাঢ় হয়ে যায়, তখন অযু জায়েজ হবে না।
মাসয়ালাঃ যদি কোন পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়, যদ্বারা রং ঘ্রাণ, স্বাদে পার্থক্য সৃষ্টি হল, কিন্তু তার সুক্ষ্মতা দূরীভূত হয়নি। যেমন- বালি, চুনা, বা সামান্য জাফরান, তখন অযু জায়েজ হবে। জাফরানের রং যদি এতটুকু হয়, যদ্বারা কাপড় রঙ্গিন করা যাবে, তখন তা দ্বারা অযু জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে পুটনীর রং এবং এতটুকু পরিমাণ দুধ মিশ্রিত হল যে, দুধের রং প্রবল হলো না, তখন অযু জায়েজ, অন্যথায় নহে। প্রবল হওয়া না হওয়ার পরিচয় হচ্ছে, যতক্ষণ বলবে, এটি পানি, যার মধ্যে কিছু দুধ মিশ্রিত হয়েছে, তা দ্বারা অযু জায়েজ। আর যখন একে লাচ্ছি বলা হবে, তখন অযু জায়েজ হবে না। পানি যদি পাতা পতিত হওয়া বা পুরাতন হবার কারণে পরিবর্তন হয়, কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু পাতা যদি ঘুটে দেয়, তখন জায়েজ হবে না।
মাসয়ালাঃ যে পানি খড়কুটো ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা হচ্ছে চলমান পানি। এ ধরনের পানি পবিত্র এবং পবিত্রকারী। এ ধরনের পানিতে নাপাকী পড়লে নাপাক হবে না। যতক্ষণ না নাপাকী বস্তু পানির রং ঘ্রাণ এবং স্বাদ পরিবর্তন করে দেয়। পরিবর্তন করে

দিলে অপবিত্র হয়ে যাবে। এ নাপাক পানি তখন পাক হবে। যখন নাপাক বস্তু পানিতে বসে যায় এবং পানির গুণাবলী ঠিক হয়ে যায়, বা এতটুকু পবিত্র পানি সংমিশ্রন ঘটলো, যা নাপাককে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যদ্বারা পানির রং ঘ্রাণ ও স্বাদ ঠিক হয়ে যাবে, পবিত্র কোন বস্তুর সংমিশ্রনে যদি পানির রং ঘ্রাণ স্বাদ পরিবর্তন করে ফেলে, তখন সেটা দিয়ে অযু ও গোসল করা জায়েজ হবে, যতক্ষণ-না অন্য জিনিসে পরিবর্তিত হয়।

মাসয়ালাঃ মৃত প্রাণী, নদীর প্রস্থ দিকে পতিত হল, এর উপর পানি প্রবাহিত হচ্ছে, এখন সাধারণ যতটুকু পানি এর সংমিশ্রনে প্রবাহিত হচ্ছে তা উপরে প্রবাহিত পানির চেয়ে কম , বা বেশী বা সমান হলে, সাধারণতঃ প্রত্যেক জায়গা হতে অযু জায়েজ। এমনকি নাপাক স্থান থেকেও যতক্ষণ না নাপাকীর কারণে পানির গুণাগুণে পরিবর্তন আনে। এটি নির্ভরযোগ্য এবং বিশুদ্ধ মত।

মাসয়ালাঃ ছাদের নালা দিয়ে যে বৃষ্টি পানি পতিত হয়, তা পাক। যদি ও বা ছাদের বিভিন্ন স্থানে নাপাক পড়ে থাকে এবং নালার মুখে নাপাক থাকে। যদিওবা নাপাকের সংমিশ্রণে যে পানি পতিত হচ্ছে তা অর্ধেকের কম, বা বরাবর বা বেশী হয়। যতক্ষণ না, নাপাকীর কারণে পানির তিনটি গুণাবলীর মধ্যে পরিবর্তন আসে। এটিই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। যদি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, এবং পানির চলাচল স্থগিত হয়ে গেল। এখন বদ্ধ পানি এবং যা ছাদ থেকে উপচে পড়ছে তা নাপাক।

মাসয়ালাঃ নালা দিয়ে প্রবাহিত বৃষ্টির পানি পবিত্র। যতক্ষণ নাপাকের রং ঘ্রাণ ও স্বাদ, এতে প্রকাশ না পায়, অন্যথায় তা দিয়ে অযু করা যাবে না। পানিতে দৃশ্যমান নাপাকের অংশ যদি এমনভাবে প্রবাহিত হয় যে, অঞ্জলী দ্বারা পানি নেয়া হলে, তার মধ্যে এক আধটুকু অবশ্যই নাপাকী থাকবে। তখন তা হাতে নেয়া মাত্রই নাপাক হয়ে গেল। তা দিয়ে অযু হারাম এবং জায়েজ নেই, এর থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

মাসয়ালাঃ নালার পানি যদি বৃষ্টির পর স্থির হয়ে যায়। এতে যদি নাপাকীর অংশ অনুভব বা নাপাকী রং ঘ্রাণ অনুভব হয় তখন পানি নাপাক, অন্যথায় পাক।

মাসয়ালাঃ দশ হাত দৈর্ঘ্য, দশ হাত প্রস্থের, হাউজকে বড় হাউজ বা পুকুর বলা হয়। অনুরূপভাবে বিশ হাত দৈর্ঘ্য পাঁচ হাত প্রস্থ বা পঁচিশ হাত দৈর্ঘ্য চার হাত প্রস্থ সর্বোপরি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিলে যদি একশ হাত হয়, এবং যদি গোল হয় এবং গোলাকারে আনুমানিক সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাত হয়, এবং একশ হাত লম্বা না হলে, তখন ছোট হাউজ এবং এর পানিকে সামান্য পানি বলা হবে। যদিও বা যতই গভীর হোক।

সতর্কবাণীঃ হাউজ বড়, ছোট হওয়ার মধ্যে এর পরিমাপ গণ্য নহে, বরং এর মধ্যে যে পানি রয়েছে এর উচ্চতার দিক দেখতে হবে। হাউজ বড়, কিন্তু পানি কমে গিয়ে একশত বর্গহাত না হলে, এমতাবস্থায় এ হাউজকে বড় হাউজ বলা যাবে না।

উপরন্তু মসজিদে, ঈদগাহে যে হাউজ তৈয়ার করা হয়, একেও হাউজ বলা যাবে না। বরং ওসব গর্ত, যার পরিমাপ একশত বর্গহাত, তা -বড় হাউজ। এর চেয়ে কম হলে ছোট হাউজ।

মাসয়ালাঃ একশ বর্গ হাত বিশিষ্ট হাউজের এতটুকু গভীরতা বা ঘনত্ব দরকার, যতটুকু হাউজের বর্গক্ষেত্র আছে। এর কোথাও যেন খালি না থাকে, বহু কিতাবে উল্লেখ হয়েছে যে, ঠেঁাঠ বা অঞ্জলী দ্বারা পানি নেয়াতে জমীন বা মাটি দেখা না গেলে তা বড় হাউজ। এটি হচ্ছে অধিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, ব্যবহারের সময় পানি উঠানো হলে সে সময় তো পানি একশ বর্গহাত পরিমাপ থাকবে না। এমন হাউজের পানি প্রবাহিত পানির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এমন পানিতে নাপাকী পড়লে নাপাক হবে না। যতক্ষণ না নাপাকী দ্বারা রং ঘ্রাণ, স্বাদ, পরিবর্তন হবে। এরকম হাউজে যদিও নাপাকী পড়ার দরুণ অপবিত্র না হয়, তথাপি ইচ্ছাকৃতভাবে এর মধ্যে নাপাকী ফেলা নিষিদ্ধ।

মাসয়ালাঃ বড় হাউজ বা পুকুর নাপাক না হওয়ার শর্ত হলো যে, এর পানি যদি নিকটবর্তী হয়, এমন হাউজে যদি লাঠি, ছোট্ট খুঁটি, গেঁথে দেয়া হয়, তখন লাঠি, ছোট্ট খুঁটি সমূহ ছাড়া অবশিষ্ট জায়গা যদি একশ হাতের অধিক হয় তখন বড় পুকুর, অন্যথায় নহে। অবশ্য পাতলা জিনিস যেমন,ঘাস, বাঁশক্ষেত, এর নিকটবর্তী হলে তা বড় হাউজের অন্তরায় নহে।

মাসয়ালাঃ বড় হাউজ বা পুকুরে এমন নাপাক পতিত হল, যা দৃশ্যমান নয়, যেমন শরাব, প্রস্রাব, তখন এর প্রত্যেক দিক থেকে অযু করা জায়েজ। আর যদি দৃশ্যমান হয় পায়খানা, বা কোন মৃত প্রাণী, তখন যে প্রান্তে নাপাক থাকে সে প্রান্তে অযু না করা উত্তম, অন্য দিকে অযু করবে।

সতর্কঃ যে নাপাক দৃশ্যমান একে "মরিয়া" এবং দৃশ্যমান না হলে একে "গায়রে মরিয়া" বলা হয়।

মাসয়ালাঃ এমন হাউজে অনেক লোক একত্র হয়ে অযু করলেও কোন ক্ষতি নেই। যদি ও বা অযুর পানি এতে পতিত হচ্ছে। হ্যাঁ, এমন হাউজে চুন ফেলা, হুক্কার নলের পানি বা নাকের ময়লা ফেলা সমীচিন নয়, তা পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী।

মাসয়ালাঃ পুকুর বা বড় হাউজ যদি উপরিভাগে জমাট হয়ে যায়, কিন্তু বরফের নীচে পানির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মিলিতভাবে একশত বর্গ হাত থাকে, এবং ছিদ্র করে তা থেকে যদি অযু করে, অযু জায়েজ হবে। যদিও এতে নাপাক পতিত হয়। আর মিলিতভাবে যদি একশ বর্গহাত না হয়, এবং এর মধ্যে নাপাক পতিত হয়। তখন তা নাপাক হবে। পুনরায় নাপাক পতিত হবার পূর্বে ছিদ্র করে দিলে এবং ছিদ্র দিয়ে পানি ফুলে উঠে বা উথলে উঠে এবং তা একশ বর্গহাত পরিমাণ বিস্তৃতি ঘটে, তখন নাপাকী পতিত হলেও পবিত্র থাকবে। এক্ষেত্রে ঘনত্বের হুকুম উপরে বর্ণিত হুকুমের অনুরূপ।

মাসয়ালাঃ শুষ্ক পুকুরে নাপাক পতিত হল এবং বৃষ্টিপাত হল, এতে প্রবাহিত পানি এ পরিমাণ আসল যে, বদ্ধ পানির আগে একশবর্গ হাত হয়ে গেল, তখন এ পানি

পাক। যদি এক বারের বৃষ্টিপাতে একশবর্গ হাতের কম হয় এবং দ্বিতীয়বার বৃষ্টিপাতে একশবর্গ হাত হয়ে যায়, তখন সম্পূর্ণ পানি নাপাক। হ্যাঁ, যদি পুকুর ভর্তি হয়ে ভাসিয়ে যায়, তখন পাক। যদিও বা হাত দু হাত হয়।

মাসয়ালাঃ একশ বর্গহাত পানিতে নাপাকী পতিত হল, অতঃপর পুকুরের থেকে কমে গেল, তখন পবিত্র থাকবে। হ্যাঁ নাপাক যদি এখন বাকী থাকে এবং দেখা যায়, তখন নাপাক হবে। যতক্ষণ ভর্তি হয়ে ভেসে না যাবে পবিত্র হবে না।

মাসয়ালাঃ ছোট হাউজ বা পুকুর নাপাক হয়ে গেল এবং এর পানি বিস্তৃত হয়ে একশ বর্গহাত ছড়িয়ে পড়ল, তখনও নাপাক। পবিত্র পানি যদি এর উপর প্রবাহিত হয়, তখন পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কোন হাউজ উপরে সংকীর্ণ, নীচে প্রশস্ত, অর্থাৎ উপরে একশ বর্গহাত নয়, নীচে একশ বর্গহাত বা এর চেয়ে বেশি, এমন হাউজে নাপাক পতিত হলে তখন নাপাক হবে। অতঃপর এর পানি কমে গিয়ে একশ বর্গহাত হলে তখন পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ হুক্কার পানি পাক। যদিও বা এর রং ঘ্রাণ ও স্বাদে পরিবর্তন হয়, এর পানি থেকে অযু জায়েজ, প্রয়োজন পরিমাণে এ পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ অযু বা গোসলের সময় শরীর থেকে পতিত পানি পাক। কিন্তু এর দ্বারা অযু, গোসল জায়েজ নেই। অনুরূপভাবে, অযুহীন ব্যক্তির হাত বা আঙ্গুল বা পূর্ণ নখ বা শরীরের কোন অংগ যা অযুতে ধৌত করা হয়, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে একশ বর্গ হাতের কম পানিতে ধোয়া বিহীন পতিত হলে, তখন এ পানি অযু গোসলের যোগ্য থাকে না। এভাবে যার উপর গোসল ফরজ হয়েছে, তার শরীরের ধৌতহীন কোন অংশ পানিতে ডুবালে তখন এ পানি অযু গোসলের কাজে আসেনা, আর যদি ধৌত করা হাত বা শরীরের কোন অংশ পতিত হয়, তখন ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ হাত ধোয়া আছে, পুনরায় ধোয়ার নিয়্যতে রাখলে, এ ধোয়া পূণ্যের কাজ হবে। যেমন খাবারের জন্য, অযুর জন্য, তবে এ পানি ব্যবহৃত হয়ে গেল, তা অযুর কাজে আসবেনা এবং তা পান করা মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ যদি প্রয়োজন অনুসারে হাত পানিতে রাখে, যেমন- বড় পাত্রে, যা নীচু করা যাচ্ছেনা, কোন ছোট পাত্রও নেই, যা থেকে পানি নেবে, এমন অবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ হাত পানিতে রেখে পানি বের করবে, বা কূপের মধ্যে বালতির রশি পড়ে গেল, প্রবেশ করা ছাড়া বের করা যাচ্ছেনা এবং পানিও নেই, যদ্বারা হাত পা ধুয়ে প্রবেশ করবে, তখন এ অবস্থায় পা ফেলে বালতির রশি বের করলে কূপ ব্যবহৃত হবে না। এ মাসয়ালা সম্পর্কে অনেক লোক অবগত নয়, এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

মাসয়ালাঃ ব্যবহৃত পানি যদি ভাল পানির সাথে সংমিশ্রণ ঘটে, যেমন- অযু গোসল করার সময় পানির ফোটা যদি লোটা বা কলসির মধ্যে ছিটকে পড়ে, তখন ভাল পানি অধিক হলে তখন তা অযু গোসলের কাজে ব্যবহার করা যাবে। অন্যথায় সব নষ্ট হবে।

মাসয়ালাঃ পানিতে হাত পড়ে গেল এবং কোনভাবে ব্যবহৃত হয়ে গেল, তখন চাইলে কাজ হওয়ার পর আরো অধিক ভাল পানি এর সাথে মিশায়ে পাক করতে পারবে। অনুরূপভাবে এ পদ্ধতিও অবলম্বন করা যাবে যে, এ পানির একদিকে পানি ঢালবে এবং অন্যদিকে ভাসিয়ে প্রবাহিত করবে। তখন সকলের কাজে আসবে। এভাবে নাপাক পানিকেও পাক করা যাবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ভাসমান বস্তু একই জাতীয় বা পানি গড়ায়ে দিলে পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কোন বৃক্ষ বা ফলের নিংড়ানো পানি দ্বারা অযু জায়েজ হবে না। যেমন, কলা গাছের পানি, আনার, আঙ্গুর, তরমুজের পানি এবং ইক্ষুর রস।

মাসয়ালাঃ যে পানি গরমের দেশে গীষ্মকালে স্বর্ণ রৌপ্যে ছাড়া অন্যকোন ধাতব পাত্রে রোদ্রের তাপে গরম হয়ে গেল। যতক্ষণ গরম থাকবে এর থেকে অযু গোসল করা উচিৎ নয় এবং পান করাও সমীচিন নহে। বরং শরীরের কোনস্থানে পৌছানো উচিৎ হবে না। এমনকি এ পানিতে কাপড় ভিজালে ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত নেবে না। এবং তা পরিধান করা থেকে বেচে থাকবে। এ পানি ব্যবহারে কুষ্ঠরোগের আশঙ্কা আছে, তারপরও অযু গোসল করে নিলে হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ ছোট ছোট গর্তে পানি আছে, এর মধ্যে নাপাকী পতিত হওয়াটা জানা নেই, তা দ্বারা অযু জায়েজ।

মাসয়ালাঃ কাফের সংবাদ দিল, এ পানি পাক বা নাপাক। এক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। উভয় অবস্থায় পাক। এটাই পানির প্রকৃত মূল অবস্থা।

মাসয়ালাঃ নাবালেগ ছেলের ভর্তি করা পানি, শরয়ীভাবে তার মালিকানাধীন হয়ে যাবে, তা পান করা বা অযু গোসল করা কোন কাজে ব্যবহার করা, তার মাতা পিতা বা তার মুনীব ব্যতীত অন্য কারো জন্য জায়েজ নেই। যদিও বা সে অনুমতি দেয়। যদি অযু করে ফেলে, তখন অযু হয়ে যাবে, তবে গুনাহগার হবে। এখান থেকে শিক্ষকদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। তারা অধিকাংশ নাবালেগ ছেলেদের দ্বারা পানি ভর্তি করায়ে কাজে ব্যবহার করে। এভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের ভর্তি করা পানিও অনুমতি বিহীন খরচ করা হারাম।

মাসয়ালাঃ নাপাক দ্বারা যদি পানির রং ঘ্রাণ, স্বাদ পরিবর্তন হয়, তখন তা নিজ ব্যবহারের জন্যও নাজায়েজ এবং প্রাণীকে পান করানো নাজায়েজ। ঘরের চুন কালির কাজে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এ ধরনের পানি দ্বারা প্রস্তুতকৃত কাদা মাটি, চুন কালি, মসজিদের দেওয়াল ইত্যাদি স্থানে ব্যবহার করা জায়েজ নেই।

কূপের বর্ণনা

মাসয়ালাঃ কূপের মধ্যে মানুষ বা কোন জীব জন্তুর পস্রাব, প্রবাহিত রক্ত, তালের রস, খেজুরের রস বা কোন প্রকারের মদ জাতীয় পানীয় দ্রব্যের ফোঁটা, নাপাক লাকড়ি, নাপাক কাপড়, বা অন্য কোন নাপাক বস্তু কূপে পতিত হলে, কূপের সম্পূর্ণ পানি বাহির করে ফেলতে হবে।

মাসয়ালাঃ যে সব চতুস্পদ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা যায় না, সেসব প্রাণীর পায়খানা প্রস্রাব পড়লে কূপের পানি নাপাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মুরগী এবং হাঁসের বিষ্ঠা দ্বারাও নাপাক হয়ে যাবে। এসব অবস্থায় সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসয়ালাঃ উট, ছাগল, ভেড়া, মূষিক প্রভৃতির বিষ্ঠা গোবর এবং ঘোড়া, গাধার বিষ্ঠা যদিও বা নাপাক কিন্তু কূপের মধ্যে পতিত হলে, প্রয়োজনের কারণে তার সামান্য মাফ করা হয়েছে। পানি নাপাক হওয়ার হুকুম দেয়া যাবে না এবং উড়ন্ত হালাল প্রাণী, কবুতর, চড়ুই পাখির বিষ্ঠা, বা শিকারী পাখি, চিল, বাজ পাখির বিষ্ঠা পতিত হলে পানি নাপাক হবে না। এভাবে ইঁদুর বানর এর প্রস্রাবেও নাপাক হবে না।

মাসয়ালাঃ প্রস্রাবের খুবই ক্ষুদ্র ছিটকা, যা সুচের মাথার মত পানিতে পড়লে নাপাক হবে না। এবং নাপাক ধুলাবালি পতিত হলেও নাপাক হবে না।

মাসয়ালাঃ যে কূপের পানি নাপাক হয়েছে, এর এক ফোটাও পাক কূপে পতিত হলে, তখন তাও নাপাক হয়ে যাবে। সে পানির যে হুকুম এ পানিরও অনুরূপ হুকুম। এভাবে বালতির রশি বাঁধল, যে রশিতে নাপাক কূপের পানি লেগেছে,তা-পাক কূপে পতিত হলে, পাক কূপও নাপাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কূপে মানুষ, ছাগল বা কুকুর বা কোন রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী এর সমান বা এর চেয়ে বড় প্রাণী পড়ে মারা গেলে, তখন সম্পূর্ণ পানি বের করতে হবে।

মাসয়ালাঃ মোরগ, মুরগী, বিড়াল, ইঁদুর, টিকটিকি বা অন্য কোন রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী (যে প্রাণীতে প্রবাহিত রক্ত আছে) কূপে পড়ে মরে ফুলে যায় বা ফেটে যায় তখন সম্পূর্ণ পানি ফেলে দিতে হবে।

মাসয়ালাঃ উপরোক্ত প্রাণী সমূহ কূপের বাইরে মরার পর কূপে পতিত হলে, তখনও একই হুকুম।

মাসয়ালাঃ টিকটিকি বা ইঁদুরের লেজ কর্তিত হয়ে কূপে পতিত হল, যদিওবা ফুলে ফেটে না যায় পানি বের করে ফেলতে হবে। কিন্তু এর গোড়ায় যদি মোম লাগানো হয়, তখন বিশ বালতি বের করতে হবে।

মাসয়ালাঃ বিড়াল, ইঁদুরকে ধাওয়া করল, এবং আহত করল। অতঃপর এর থেকে ছুটে কূপে পতিত হল, তখন সম্পূর্ণ পানি বের করতে হবে।

মাসয়ালাঃ ইঁদুর, গন্ধমূষিক, চড়ুই পাখি, টিকটিকি, গিরগিটি (টিকটিকির চাইতে বড় এক প্রকার বিষাক্ত প্রাণী) বা এর সমান বা এর চেয়ে ছোট কোন রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী কূপে পতিত হয়ে মারা গেলে, তখন বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসয়ালাঃ কবুতর, মুরগী, বিড়াল, পতিত হয়ে মারা গেলে তখন চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পর্যন্ত পানি ফেলে দিতে হবে।

মাসয়ালাঃ মানুষের শিশু সন্তান জীবিত জন্ম হলে মানুষের হুকুমের অনুরূপ। বকরীর ছোট বাচ্চা বকরীর হুকুমের অনুরূপ।

মাসয়ালাঃ যে প্রাণী কবুতর হতে ছোট তা ইঁদুরের হুকুমের পর্যায়ভুক্ত এবং যে প্রাণী বকরীর চেয়ে ছোট সেটা মুরগীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

মাসয়ালাঃ দুটি ইঁদুর কূপে পড়ে মারা গেলে, তখন বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পর্যন্ত পানি ফেলতে হবে। যদি তিন, চার বা পাঁচটি হলে, তখন চল্লিশ থেকে ষাট বালতি এবং ছয়টি হলে সম্পূর্ণ পানি ফেলে দিতে হবে।

মাসয়ালাঃ দুটি বিড়াল কূপে মারা গেল, তখন সম্পূর্ণ পানি বের করতে হবে।

মাসয়ালাঃ মুসলমান মৃত ব্যক্তি গোসলের পর কূপে পড়ে গেলে, তখন মূলতঃ পানি বের করার প্রয়োজন নেই। আর যদি শহীদ কূপে পতিত হয় এবং শরীরে রক্ত লেগে না থাকে তখনও পানি বের করার প্রয়োজন নেই। আর যদি রক্ত লেগে থাকে এবং প্রবাহিত হওয়ার মত নয়, তখনও পানি বের করার প্রয়োজন নেই। যদিও রক্ত তার দেহ থেকে ধুয়ে পানির সাথে মিলে যায়। আর যদি প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত তার দেহে লেগে থাকে এবং শুকিয়ে যায় এবং শহীদের রক্ত দেহ থেকে পৃথক হয়ে পানিতে মিলিত হয়নি, তখন পানি পাক থাকবে। শহীদের রক্ত যতক্ষণ তার দেহে থাকবে যতই হোক পবিত্র। হ্যাঁ রক্ত তার শরীর থেকে পৃথক হয়ে পানির সাথে মিশ্রিত হলে। তখন নাপাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কাফের মুর্দা যদিও বা শতবার ধৌত করা হয়, কূপে পতিত হলে বা তার আঙ্গুল বা নখ পানিতে স্পর্শ হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসয়ালাঃ অপরিপূর্ণ শিশু বা যে শিশু মৃত জন্ম গ্রহণ করেছে কূপে পতিত হলে, সব পানি বের করে ফেলতে হবে। যদিও পতিত হওয়ার পূর্বে গোসল দেয়া হয়।

মাসয়ালাঃ অযুহীন বা যার উপর গোসল ফরজ হয়েছে অপ্রয়োজনে যদি কূপে অবতরণ করে এবং তার শরীরে নাপাকী না থাকে, তথাপি বিশ বালতি পানি বের করে ফেলতে হবে। যদি বালতি বের করার জন্য অবতরণ করে, তখন কোন পানি বের করে ফেলতে হবে না।

মাসয়ালাঃ শূকর যদি কূপে পতিত হয়, যদিও মারা না যায় পানি নাপাক হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে।

মাসয়ালাঃ শূকর ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী কূপে পতিত হলো এবং জীবিত বের হয়ে আসলো এবং এর দেহে নাপাকী লেগে থাকাটা নিশ্চিত না হলে এবং পানিতে এর মুখও পড়লোনা, তখন পানি পাক। এর ব্যবহার জায়েজ। কিন্তু সতর্কতামূলক বিশ বালতি পানি বের করে ফেলা উত্তম হবে। আর যদি এর শরীরে নাপাকী থাকাটা নিঃসন্দেহে জানা যায়, তখন সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে। আর যদি এর মুখ পানিতে লাগে তখন এর লালা এবং এঁটো এর যে হুকুম, এ পানিরও একই হুকুম। যদি এমন প্রাণী হয় যার এঁটো নাপাক বা সন্দেহযুক্ত, তখন সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে। এঁটো যদি মাকরূহ হয়, তখন ইঁদুর ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ বালতি, মুরগীর এঁটোর ক্ষেত্রে চল্লিশ এবং যে সব প্রাণীর এঁটো পাক সেগুলোতেও বিশ বালতি পানি বের করা উত্তম। যেমন ছাগল পতিত হলো এবং জীবিত বের হয়ে আসলো, তখন বিশ বালতি পানি বের করে ফেলবে।

মাসয়ালাঃ কূপে এমন প্রাণী পতিত হলো, যে প্রাণীর এঁটো পাক বা মাকরূহ, এবং পানি বের করলোনা, অযু করে নিলো, অযু হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ জুতা বা বল, কূপে পতিত হলো, এবং নাপাকযুক্ত হওয়াটা নিশ্চিত হলো, তখন সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলতে হবে। অন্যথায় বিশ বালতি। নিছক নাপাক হওয়ার ধারণা করা গণ্য হবে না।

মাসয়ালাঃ যে সব প্রাণী পানিতে জন্ম হয়, পানির প্রাণী যদি কূপে মারা যায় বা মরার পর পতিত হলো তখন পানি নাপাক হবে না। যদিও বা ফুলে ফেটে যায়, কিন্তু ফেটে ক্ষুদ্রাংশগুলো যদি পানির সাথে মিশে যায়, তখন এ পানি পান করা হারাম।

মাসয়ালাঃ স্থল ও জলজ ব্যাঙের একই হুকুম। অর্থাৎ পানিতে মারা গেলে, বরং ছিড়ে ছিন্নভিন্ন হলেও পানি নাপাক হবে না। কিন্তু জঙ্গল বা বনের বড় ব্যাঙ যেগুলোতে প্রবাহমান রক্ত থাকে, সেটার হুকুম ইঁদুরের হুকুমের মত। জলজ ব্যাঙের আঙ্গুলের মাঝখানে ঝুলি বা পাতলা চামড়া থাকে এবং স্থল ব্যাঙের থাকে না।

মাসয়ালাঃ যার জন্ম পানিতে নয়, কিন্তু পানিতে থাকে, যেমন হাঁস সেটা পানিতে মারা গেলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ ছোট শিশু বা কাফির পানিতে হাত দিল, হাত নাপাক ছিল জানা গেলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। অন্যথায় নাপাক হবে না। কিন্তু অন্য পানি দ্বারা অযু করা উত্তম।

মাসয়ালাঃ যে সব প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত থাকেনা যেমন মশা, মাছি ইত্যাদি এসব প্রাণী কূপে মারা গেলে পানি নাপাক হবে না।

ফায়দাঃ মাছি তরকারী ইত্যাদি বস্তুতে পতিত হয়, তখন সেটা তরকারীর ভিতর ডুবায়ে ফেলে দেবে এবং তরকারী খেয়ে নেবে।

মাসয়ালাঃ মৃত প্রাণীর হাঁড় যেখানে মাংস বা চর্বি লেগে থাকে, পানিতে পতিত হলে সে পানি অপবিত্র হবে। সম্পূর্ণ পানি বের করে ফেলবে, আর যদি মাংস বা চর্বি লেগে না থাকে তখন পাক। শূকুরের হাড় পতিত হলে সর্বাবস্থায় নাপাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ যে কূপের পানি নাপাক হয়েছে এর যতটুকু পরিমাণ পানি বের করা শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে ততটুকু পানি বের করার পর, যে রশি বা বালতি দিয়ে পানি বের করা হলো, সবগুলো পাক হয়ে গেছে, ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ সম্পূর্ণ পানি বের করার অর্থ হলো, এতটুকু পানি বের করা, যেন পুনরায় বালতি ফেললে বালতির অর্ধেকও পূর্ণ না হয়। এর মাটি বের করার প্রয়োজন নেই। দেওয়াল ধৌত করাও প্রয়োজন নেই। সব পাক হয়ে গেছে।

মাসয়ালাঃ উপরে যে হুকুম বর্ণিত হয়েছে যে, এতটুকু এতটুকু পরিমাণ পানি বের করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, ঐ বস্তু যা কূপে পতিত হয়েছে, তা বের করে ফেলতে হবে। অতঃপর নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি বের করে ফেলতে হবে। আর যদি নাপাক বস্তু, কূপে রেখে দিয়ে পানি যতই বের করা হোক, সব অর্থহীন অর্থাৎ পানি পাক হবে না।

মাসয়ালাঃ যদি ঢিল ছুড়ে কাঁদা করা হয়, বা বস্তুটি স্বয়ং নাপাক ছিলনা বরং কোন নাপাক বস্তুর সাথে লেগে নাপাক হয়েছে। যেমন– নাপাক কাপড়, এবং তা বের করা যদি কঠিন হয়, তখন শুধুমাত্র পানি বের করলে পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ যে কূপের বালতি নির্দিষ্ট, তখন নির্দিষ্ট বালতির সমপরিমাণ গন্য হবে, তা ছোট বড় হওয়াটা গণ্য করা হবে না। আর যদি কোন নির্দিষ্ট বালতি না থাকে, তখন বালতি এমন হতে হবে যেন, এক সা, বা পৌনে চার সের পরিমাণ পানি ভর্তি করা যায়।

মাসয়ালাঃ বালতি পূর্ণ করে পানি বের করার প্রয়োজন নেই। সামান্য পরিমাণ পানি যদি ছিটকে পড়ে যায়, বা উপড়ে পড়ে কিন্তু যতটুকু রয়েছে তা যদি অর্ধেকেরও বেশী হয়, তখন পূর্ণ বালতি হিসেবে গণ্য করা হবে।

মাসয়ালাঃ নির্দিষ্ট বালতি আছে, কিন্তু যে বালতি দ্বারা পানি উঠানো হয়েছে তা যদি এর চেয়ে ছোট বা বড় হয়, অথবা বালতি নির্দিষ্ট না থাকে এবং যে বালতি দ্বারা পানি উঠানো হলো, তা এক সা বা পৌনে চার কেজির চেয়ে কম বেশী হয়। ওসব অবস্থায় নির্দিষ্ট বালতির সমপরিমাণ বা এক 'সা' পরিমাণ হিসাব অনুসারে সমানভাবে বের করবে।

মাসয়ালাঃ কুপ থেকে মরা প্রাণী বের করলো, কখন পড়ে মারা গেছে তা যদি জানা থাকে, তাহলে সে সময় থেকে পানি নাপাক ধর্তব্য হবে। এরপর কেউ সেখান থেকে অযু বা গোসল করলে, অযুও হবে না গোসলও হবে না। সেখান হতে অযু গোসল করে যত নামায পড়েছে সব নামায পুনরায় আদায় করা ফরজ। আর যদি নাপাক পতিত হওয়ার সময় জানা না থাকে, তাহলে যখন থেকে দেখেছে সে সময় হতে নাপাক ধর্তব্য হবে। যদিও ফুলে ফেঁটে যায়। এর আগে পানি নাপাক হবে না। এবং পূর্বে যে অযু গোসল করেছে বা কাপড় ধৌত করেছে এতে কোন ক্ষতি হবে না। সহজতর ভাবে এটার উপর আমল করবে।

মাসয়ালাঃ কুপ যদি এমন হয় যে কুপের পানি কমে না, যত পানি উঠানো হোক, এবং নাপাকী পড়লো, বা এমন কোন প্রাণী পড়ে মারা গেল যার জন্য সম্পূর্ণ বের করে ফেলার হুকুম রয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় হুকুম হলো, প্রথমে কি পরিমাণ পানি আছে তা জেনে নেবে। সবগুলো পানি বের করে ফেলবে, বের করার সময় যতই বেশী বের হোক তা ধরা হবে না এবং এটাও জেনে নেবে যে, সে সময় কতটুকু পানি ছিল, তা জানার তরীকা বা নিয়ম হচ্ছে দুজন খোদাভীরু মুসলমান যাদের কাছে পানির দৈর্ঘ্য প্রস্ত দেখে কতটুকু পানি ফেলতে হবে তা বলার অভিজ্ঞতা আছে। তারা যতটুকু পানি ফেলতে বলবে, ততটুকু পরিমাণ পানি বের করে ফেলবে। দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে পানির গভীরতা কোন বাঁশ বা রশি দিয়ে সঠিক ভাবে মেপে নিবে, এবং কয়েক ব্যক্তি দ্রুতভাবে একশত বালতি পানি বের করে ফেলবে। এরপর পানি মেপে দেখবে, যতটুকু পানি কমবে, সে হিসেবে পানি বের করে ফেলবে। কুপ পাক হয়ে যাবে। যেমন দেখুন প্রথমবারে মাপার সময় পানি দশ হাত ছিল, একশত বালতি বের করার পর মেপে দেখবে নয় হাত বাকী থাকবে। বুঝা গেল একশত বালতিতে এক হাত কমে গেল, তাহলে দশ হাতে দশ শত অর্থাৎ এক হাজার বালতি পানি বের করলে হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কুপ যদি এমন হয় যেটার পানি কমে যায়, কিন্তু সেটায় কোন কিছু ফেটে যাওয়া বা ক্ষতিকর কিছুর আশঙ্কা হলে, তাহলে সে সময় যতটুকু পানি ছিল, ততটুকু পানি বের করে ফেলবে। সম্পূর্ণ পানি ফেলার প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ কুপ থেকে যে পানি বের করবে তা একসাথেও করতে পারবে বা অল্প অল্প করে বের করতে পারবে, উভয়টির এখতিয়ার আছে, কুপ পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ মুরগীর তাজা ডিম, যে ডিমের আদ্রতা এখনও বিদ্যমান আছে। তা পানিতে পতিত হলে পানি নাপাক হবে না। এভাবে ছাগল ছানা জন্ম হওয়া মাত্র পানিতে পতিত হলে এবং মারা না যায় তখনও পানি অপবিত্র হবে না।

মানুষ এবং প্রাণীর এটো-এর বর্ণনা

মাসয়ালাঃ মানুষ, অপবিত্র হোক বা হায়েজ নেফাস সম্পন্না মহিলা হোক এর উচ্ছিষ্ট বা এঁটো পাক। কাফেরের উচ্ছিষ্টও পাক। তথাপি এর থেকে বেচে থাকা উচিৎ। যেমন থুথু, নাকটি, কফ, পাক তবুও মানুষ এসবকে ঘৃনা করে, কাফেরের উচ্ছিষ্ট বা এটোকে এর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট মনে করা উচিৎ।

মাসয়ালাঃ কারো মুখ থেকে এতটুকু রক্ত বের হলো যে, থু থু লাল হয়ে গেল । এর পর দ্রুত পানি পান করলো, তখন পানির এটো নাপাক। লাল বর্ণ দুর হওয়ার পর কুল্লি করে মুখ পাক করা তার উপর অপরিহার্য। আর যদি কুল্লি না করে এবং কয়েকবার নাপাক স্থান দিয়ে অতিক্রম করল, যদিও বা থুথু নিক্ষেপ কালে নাপাকীর চিহ্ন না থাকে পাক হয়ে যাবে এবং এরপর পানি পান করলে পাক থাকবে। যদিও এ অবস্থায় থু থু উদগম করা নাপাক কাজ এবং গুনাহ্।

মাসয়ালাঃ মায়াজাল্লাহ্! মদ্য পানের সাথে সাথেই পানি পান করল, নাপাক হয়ে গেছে। যদি এতটুকু দেরী করে যে, মদের উপকরণ থুথুর সাথে মিশে কন্ঠনালীর নীচে চলে গেল, তখন নাপাক নয়। তবে মদ্যপায়ী এবং তার এঁটো থেকে বেঁচে থাকা চাই।

মাসয়ালাঃ মদ্যপায়ীর গোঁফ যদি বড় হয়, মদ যদি গোঁফে লাগে যতক্ষঈ তা পরিষ্কার করবেনা, যে পানি পান করবে এবং যে পাত্রে করবে উভয়টি নাপাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ পুরুষ বেগানা মহিলার, মহিলা বেগানা পুরুষের এঁটো খাওয়া মাকরুহ্। যদি জানতে পারে অমুক মহিলা বা অমুক পুরুষের তখন আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত পানাহার মাকরুহ্। আর যদি কোন লোকের এটো তা জানা না থাকে বা স্বাদ উপভোগ বা আনন্দ সহকারে পানাহার করল তখন কোন ক্ষতি নেই। বরং অনেক সময় উত্তমও বটে। যেমন, শরীয়তের আলেম, দ্বীনদার ব্যক্তি বা পীরের এটো তাবাররুক মনে করে লোকেরা পানাহার করে থাকে।

মাসয়ালাঃ যে সব প্রাণীর মাংস ভক্ষনীয়, চতুস্পদ জন্তু হোক বা পাখী হোক এসবের এটো পাক, যদিও নর হয়। গরু, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, কবুতর, তিতির ইত্যাদির এটো পাক।

মাসয়ালাঃ যে মুরগী উম্মুক্ত বিচরণ করে এবং নাপাকীতে মুখ দেয়, ওটার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ, আর যদি আবদ্ধ থাকে পাক।

মাসয়ালাঃ অনুরূপভাবে, যেসব গরু ময়লা আবর্জনা ভক্ষনে অভ্যস্ত সে গুলোর এটো মাকরূহ্ এবং এখনই নাপাক ভক্ষন করলো, এর পর এমন কোন কারণ পাওয়া যায়নি. যদ্বারা এর মুখ পাক হবে, (যেমন, চলমান পানিতে পানি পান করা বা বদ্ধ পানিতে তিনস্থান থেকে পানি পান করা) এমন অবস্থায় পানিতে মুখ দিলে, পানি নাপাক হবে। এভাবে গরু, মহিষ, ছাগলের নর জাতীয় প্রাণী সমূহ মাদ্দা বা নারী জাতীয় প্রাণীর প্রস্রাবের ঘ্রাণ গ্রহন করলে, এগুলোর মুখ নাপাক হবে এবং দৃষ্টির অন্তরালও হয়নি,

এতটুকু সময়ও দেরী করলোনা। যতটুকুতে পবিত্র হওয়া যায়। এমন অবস্থায় মুখ দিলে এগুলোর এটো নাপাক। চারদিকের পানিতে মুখ দিলে প্রথম তিনটি নাপাক, চতুর্থটি পাক হবে।

মাসয়ালাঃ ঘোড়ার এটো পাক।

মাসয়ালাঃ শূকর, কুকুর, বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, হাতী শৃগাল এবং অন্যান্য প্রাণীর এটো বা উচ্ছিষ্ট নাপাক।

মাসয়ালাঃ কুকুর পাত্রে মুখ দিল, পাত্র যদি চিনির বা ধাতব নির্মিত হয় বা তৈলাক্ত মাটির বা ব্যবহৃত মসৃন এর। তখন তিনবার ধুয়ে নিলে পাক হয়ে যাবে। অন্যথায় প্রত্যেকবার ধুয়ে শুকাতে হবে। হ্যাঁ চিনির পাত্রে কারুকার্য বিশিষ্ট হলে, বা পাত্রে খাদ থাকলে তখন তিনবার শুকালে পাক হবে। শুধুমাত্র ধুয়ে নিলে পাক হবে না।

মাসয়ালাঃ পানির ড্রাম বা মটকার উপরে কুকুরে চাটলে ওটার ভিতরের পানি নাপাক হবে না।

মাসয়ালাঃ উড়ন্ত শিকারী প্রাণী, যেমন বাজপাখি বা সামুদ্রিক চিল, এর এটো মাকরুহ্। কাকেরও একই হুকুম আর এগুলোকে পালন করে যদি শিকারের কাজে নিয়োজিত করে, এবং এগুলোর ঠোঁঠে নাপাকী না লাগে তখন এসব প্রাণীর এটো পাক।

মাসয়ালাঃ ঘরে অবস্থানকারী প্রাণী সমূহ যেমন বিড়াল, ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি এগুলোর এটো মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ বিড়াল কারো হাত লেহন করা শুরু করে, তখন তাৎক্ষনিক হাত গুটিয়ে নেবে। লেহনের জন্য ছেড়ে দেয়া মাকরূহ এবং হাত ধুয়ে নেয়া উচিৎ। ধৌতহীন নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে, তবে খেলাফে আউলা বা উত্তমের বিপরীত।

মাসয়ালাঃ বিড়াল, ইঁদুর ভক্ষন করল, তৎক্ষনাৎ পাত্রে মুখ দিল, পাত্র নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি জিহ্বা দ্বারা মুখ লেহন করে নিল, রক্তের চিহ্ন রইলো না তখন নাপাক হবে না।

মাসয়ালাঃ পানিতে অবস্থানকারী প্রাণীর এটো পাক। ওদের জন্ম পানিতে হোক বা না-হোক।

মাসয়ালাঃ গাধা, খচ্চরের এটো সন্দেহযুক্ত। এগুলোর এটো পানি দ্বারা অযুতে সন্দেহ আছে সুতরাং ওসব পানি দ্বারা অযু হতে পারে না। নিশ্চিত অপবিত্রতা সন্দেহযুক্ত পবিত্রতা দ্বারা দূর হয়না।

মাসয়ালাঃ যে এটো পানি পাক, এর দ্বারা অযু ও গোসল জায়েজ। তবে কোন নাপাক ব্যক্তি যদি কুল্লি ছাড়া পানি পান করে, তখন তার এটো পানি দ্বারা অযু জায়েজ নহে। তা ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়েছে।

মাসয়ালাঃ ভাল পানি মওজুদ থাকা অবস্থায় মাকরূহ পানি দ্বারা অযু গোসল করা মাকরূহ। ভাল পানি মওজুদ না থাকলে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে মাকরূহ এটো পানাহার করা ধনীদের জন্য মাকরুহ। তবে গরীব অভাবগ্রস্তদের জন্য বিনা মাকরূহে জায়েজ।

মাসয়ালাঃ ভাল পানি মওজুদ থাকা অবস্থায়, সন্দেহ যুক্ত পানি দ্বারা অযু গোসল করা জায়েজ নেই। যদি ভাল পানি মওজুদ না থাকে তখন সে পানি দ্বারা অযু গোসলও করবে তায়াম্মুমও করবে। তবে প্রথমে অযু করা উত্তম। যদি বিপরীত করে, অর্থাৎ প্রথমে তায়াম্মুম করল, এরপর অযু করল তখনও ক্ষতি নেই। এ অবস্থায় অযু গোসলের নিয়্যত করাটা জরুরী। আর যদি অযু করল, তায়াম্মুম করলনা, বা তায়াম্মুম করল, অযু করল না, তখন নামায হবে না।

মাসয়ালাঃ সন্দেহযুক্ত এটো পানাহার না করা উচিৎ।

মাসয়ালাঃ মাশকুক বা সন্দেহ যুক্ত পানি যদি ভাল পানির সাথে মিশে যায়। যদি ভাল পানি বেশী হয় তা দ্বারা অযু হবে, অন্যথায় হবে না।

মাসয়ালাঃ যে সব মানুষ বা প্রাণীর এটো নাপাক, সে সবের ঘাম এবং লালাও নাপাক এবং যেটার এটো পাক সেটার ঘাম এবং লালাও পাক, যেটার এটো মাকরূহ, সেটার লালা এবং ঘামও মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ যদি গাধা ও খচ্চরের ঘাম কাপড়ে লাগে কাপড় পাক, যত বেশী হউক না কেন।

আলকুরআনে তায়াম্মুমের বিধান

তায়াম্মুমের বিধান সম্বন্ধে মহান আল্লাহপাক এরশাদ করেন وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ وَجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ

অর্থঃ এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে কিংবা স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর, পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও অর্থাৎ স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল।

হাদীসের বর্ণনাঃ

(১) সহীহ বোখারী শরীফে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (দঃ) এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হই। বাইদা অথবা যাতুল-যাইশ নামক স্থানে এসে আমার গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হারের তালাশে অবস্থান করলেন। লোকেরাও তার সঙ্গে রয়ে গেল। সেখানে পানি ছিল না, লোকেরা আবু বকর (রাঃ) এর কাছে এসে বলল আয়েশা (রাঃ) কি করছেন আপনি কি দেখছেন না? তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ) ও লোকদেরকে এমন এক জায়গায় আটকে দিয়েছেন যেখানে পানি নেই এবং লোকদের সঙ্গেও পানি নেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার উরুতে মাথা (মোবারক) রেখে ঘুমিয়েছিলেন। এমন সময় সেখানে আবু বকর (রাঃ) আসলেন এবং বললেন তুমি

রসুলুল্লাহ (দঃ) ও লোকদেরকে এমন এক জায়গায় আটকে রেখেছ যেখানে পানি নেই এবং লোকদের সঙ্গেও পানি নেই, আয়েশা বলেন -আবু বকর আমাকে তিরস্কার করলেন এবং সবকিছু বললেন যা আল্লাহ চান, এমনকি তাঁর হাত দ্বারা আমার কোমরে খোঁচা মারতে লাগলেন। কিন্তু আমার উরুর উপর রসুলুল্লাহ (দঃ) এর মাথা (মোবারক) থাকায় আমি সরতে পারলাম না। রসুলুল্লাহ (দঃ) পানি না থাকা অবস্থায় যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন মহীয়ান স্রষ্টা আল্লাহ পাক তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। সবাই তায়াম্মুম করল। উসাইদ ইবনে হুযাইর বললেন, হে আবু বকরের পরিবার! এটিই কি তোমাদের প্রথম বরকত নয়? অতঃপর আমি যে উটের উপর ছিলাম সেটি উঠে দাঁড়ালে তার নীচে হারটি পেলাম।

(২) সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত হুজাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিনিটি বিষয়ে আমাদেরকে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছেঃ

(এক) আমাদের নামাজের সারিকে ফেরেস্তাদের সারির মত করা হয়েছে (দুই) সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমাদের জন্য নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। (তিন) পৃথিবীর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে, যখন আমরা পানি না পাই।

(৩) হযরত আবু যর গিফারী (রঃ) থেকে বর্নিত রাসুলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেন, পাক মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বৎসর যাবৎ পানি না পায়, যখন পানি পাবে তখনই সে যেন শরীরে পানি লাগায় (গোসল ও অজু করে) (কেননা তার জন্য) এটাই উত্তম। (এই হাদীস ইমাম আহমদ আবু দাউদ ও তিরমিজী বর্ণনা করেছেন।)

(৪) ইমাম আবু দাউদ ও দারেমী হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) বলেন একবার দুই ব্যক্তি সফরে বের হলো। নামাযের সময় উপস্থিত হল। অথচ তাদের সাথে পানি ছিল না। তখন তারা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করল এবং উভয়ে নামায পড়ল। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত থাকতেই পানি পেল। তাদের একজন পানি দ্বারা অজু করে নামায পুনরায় পড়ল। অপর জন পুনরায় পড়লনা। অতঃপর তারা উভয়ে রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হাজির হল এবং বিষয়টি তাঁকে বলল, তখন হুজুর পুরনূর (দঃ) যে ব্যক্তি নামায পুনঃপড়ে নাই তাকে বলল তুমি সঠিক রীতিতে কাজ করেছ (অর্থাৎ সুন্নাত পালন করেছ) এবং তোমার নামায পূর্ণ হয়েছে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় অজু করল এবং নামায পড়ল তাকে বললেন, তোমাকে দ্বিগুন ছওয়াব দেয়া হবে।

(৫) সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযতর ইমরান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন -একবার আমরা সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। হুজুর (দঃ) নামায পড়ালেন। যখন তিনি নামায হতে অবসর হলেন দেখলেন এক ব্যক্তি পৃথকভাবে সরে রয়েছে সে লোকদের সাথে নামায পড়ে নাই। তখন হুজুর

(দঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন হে অমুক! লোকদের সাথে (জামাতে) নামায পড়তে কিসে তোমাকে বারণ করল? লোকটি বলল, হুজুর আমি নাপাক হয়েছি, অথচ পবিত্র হওয়ার জন্য পানি নেই। হুজুর (দঃ) বললেন তোমার উচিৎ মাটির দ্বারা পবিত্র হওয়া। কারণ এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

(৬) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু জুহাইম ইবনে হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা নবী করীম (দঃ) বি'রে জামাল নামক কুয়ার দিক হতে আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করল। কিন্তু নবী করীম (দঃ) তার সালামের জবাব দিলেন না। যতক্ষন না তিনি একটি দেয়ালের নিকট আসলেন। এবং নিজের মুখমন্ডল ও দুই হাত মাসেহ করলেন (অর্থাৎ তায়াম্মুম করলেন) অতঃপর তার সালামের জবাব দিলেন।

তায়াম্মুমের মাসায়েল

মাসয়ালাঃ যার অজু নেই অথবা গোসলের প্রয়োজন অথচ পানি ব্যবহারে সক্ষম নয় এমতাবস্থায় অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। পানি ব্যবহারে সক্ষম না হওয়ার কতিপয় কারণ হতে পারে। যা নিম্নরূপঃ

(১) যে ব্যক্তি এমন রুগ্ন যে, অজু অথবা গোসল করলে রোগবৃদ্ধির আশংকা রয়েছে বা বিলম্বে সুস্থ হওয়ার আশংকা হয় অথবা এরূপ হতে পারে যে, সে পরীক্ষা করেছে যখনই অজু কিংবা গোসল করে তখনই তার রোগ বৃদ্ধি পায়, অথবা কোন অভিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসক (যিনি প্রকাশ্যে ফাসিক নয়) তার জন্য পানি ক্ষতিকর বললে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ।

মাসয়ালাঃ নিছক ধারণানির্ভর রোগ বৃদ্ধি পাবে এ ভয়ে তায়াম্মুম বৈধ হবে না। এমনিভাবে অমুসলিম, কাফির, ফাসিক অথবা অনভিজ্ঞ সাধারণ ডাক্তারের মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

মাসয়ালাঃ পানি যদি রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ না হয় কিন্তু অজু কিংবা গোসলের ক্ষেত্রে নড়াচড়া ক্ষতির কারণ হয় অথবা নিজে অজু করতে সক্ষম হয় এবং এমন কেউ নেই যিনি অজু করিয়ে দিবেন এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করবে। এরূপভাবে যদি কারো হাড় ভেঙ্গে যায় নিজে অজু করতে অক্ষম এবং এমন কেউ নেই যে অজু করায়ে দেবে এমতাবস্থায়ও তায়াম্মুম করবে।

মাসয়ালাঃ অজু বিহীন লোকের অজুর অধিকাংশ স্থানে বা অপবিত্র লোকের দেহের অধিকাংশ যদি আক্রান্ত কিংবা আহত হয় বা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় তখন তায়াম্মুম করবে। অন্যথায় অজু বা শরীরের যে অংশ সুস্থ হয় সে অংশ ধৌত করবে এবং ক্ষতস্থানে মাসেহ করবে। ক্ষতির সময় ক্ষতস্থানের আশে পাশে মাসেহ করবে। মাসেহ করাও যদি ক্ষতিকর হয় তখন ঐ অঙ্গের উপর কাপড় দিয়ে মাসেহ করবে।

মাসয়ালাঃ ঠাণ্ডা পানি যদি অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হয় আর গরম পানি যদি ক্ষতিকর না হয় তখন গরম পানি দ্বারা অজু এবং গোসল করা আবশ্যক, তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। হ্যাঁ গরম পানি যদি পাওয়া না যায় তখন তায়াম্মুম করবে। এমনিভাবে যদি ঠাণ্ডার সময় অজু বা গোসল করা ক্ষতিকর হয় গ্রীষ্মের সময় নয়। তখন ঠাণ্ডার সময় বা শীতকালে তায়াম্মুম করবে। অতঃপর যখন গ্রীষ্মকাল আসে তখন পরবর্তী নামাযের জন্য অযু করে নেয়া উচিৎ যে নামায তায়াম্মুমের দ্বারা পড়েছে তা পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ মাথার উপর পানি ঢালা যদি ক্ষতিকর হয়, তখন গলায় প্রবাহিত করবে এবং পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে।

(২) যেখানে চতুর্দিকে এক এক মাইল পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়।

মাসয়ালাঃ যদি ধারণা হয় যে, একমাইলের ভিতরে পানি আছে তখন পানি অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অনুসন্ধান বিহীন তায়াম্মুম করা যায়েজ হবে না, অতঃপর পানি তালাশ করা বিহীন যদি তায়াম্মুমের দ্বারা নামায আদায় করে নেয় এবং তালাশের পর যদি পানি পাওয়া যায় তখন অজু করে নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক। আর যদি পানি পাওয়া না যায় তায়াম্মুম দ্বারা হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ যদি প্রবল ধারণা হয় যে, এক মাইলের ভিতর পানি নেই তখন তালাশের প্রয়োজন নেই। অতঃপর তায়াম্মুম দ্বারা যদি নামায পড়ে নেয় এবং পানি তালাশ করেনি বা এমন কাউকে পায়নি যাকে জিজ্ঞেস করবে, পরে জানতে পেরেছে নিকটেই পানি রয়েছে তখন নামায পুনরায় পড়তে হবে না। কিন্তু এ তায়াম্মুম তখন ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি জিজ্ঞেস করার মত কেউ সেখানে ছিল কিন্তু সে জিজ্ঞেস করেনি পরে অবগত হয়েছে যে নিকটে পানি আছে তখন অজু করে নামায পুনরায় পড়তে হবে।

মাসয়ালাঃ নিকটে পানি থাকা না থাকার ব্যাপারে যদি কারো ধারণা না থাকে তখন অনুসন্ধান করে নেয়া মুস্তাহাব, তবে পানি তালাশ বিহীন তায়াম্মুম দ্বারা যদি নামায পড়ে নেয় নামায হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ সাথে যমযম কুপের পানি আছে যা মানুষের জন্য বরকত স্বরূপ আনা হয় অথবা রুগ্ন ব্যক্তিকে পান করানোর জন্য এবং এ পরিমাণ আছে যাদ্বারা অজু হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ আর যদি যমযম শরীফের পানি দ্বারা অযু না করতে চায় এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম জায়েজ হবার পদ্ধতি এই যে এমন কোন ব্যক্তিকে ঐ পানি হেবা বা দান করে দিবে যার থেকে পুনরায় ফেরৎ পাবার আশা করা যায় এবং কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে। তখন তায়াম্মুম জায়েজ হবে।

মাসয়ালাঃ যে লোকালয়ে নয় কিংবা লোকালয়ের নিকটেও নয়। তার সঙ্গীর নিকট পানি আছে কিন্তু তার স্মরণ ছিল না তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়ে নিলে, নামায হয়ে যাবে। আর যদি লোকালয় কিংবা লোকালয়ের নিকটবর্তী বসতি হয় তখন নামায

পুনরায় আদায় করবে।

মাসয়ালাঃ যদি নিজ সঙ্গীর নিকট পানি থাকে এবং চাইলে পাবার ধারণা থাকে তখন চাওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না। অতঃপর তলববিহীন তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিল এবং নামাযের পর তলব করে তলবের পর যদি সে দিয়ে দেয় অথবা তলববিহীন সে নিজে স্বেচ্ছায় দেয় তখন অজু করে নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক। আর যদি তলব করে পাওয়া না যায় তখন নামায হয়ে যাবে আর যদি পরেও তলব না করে যাদ্বারা দেওয়া না দেওয়ার অবস্থা প্রকাশ হত এবং সে স্বেচ্ছায়ও দেয়নি তখন নামায হয়ে যাবে। আর যদি দেওয়ার ধারণা প্রবল না হয় এবং তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়ে নেয় তখনও এরূপ হতে পারে যে, পরে পানি দিল তখন অজু করে নামায পুনরায় পড়বে, অন্যথায় হবে না।

মাসয়ালাঃ নামাজরত অবস্থায় কারো নিকট যদি পানি দেখা যায়, দিবে এ ধারণা যদি প্রবল হয় তখন নামায ভঙ্গ করা উচিৎ এবং তার নিকট পানি তলব করবে, আর যদি পানি তলব না করে নামায পূর্ণ করে নেয় অতঃপর সে নিজে পানি দেয় অথবা পানি চাইবার পর দেয় তখন নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক। আর যদি পানি না দেয় তখন নামায হয়ে যাবে। আর যদি পানি দেওয়ার ধারণা না থাকে নামাযের পর যদি সে নিজে দিয়ে দেয় অথবা চাইবার কারণে দেয় তখনও পুনরায় পড়বে। আর যদি সে নিজেও না দেয় এবং তলবও করা না হয় যাদ্বারা অবস্থা জানা যেত তখন নামায হয়ে যাবে। আর যদি নামায পড়া অবস্থায় অপর ব্যক্তি বলল পানি নিন, অযু করুন পানি দাতা যদি মুসলমান হয় নামায ভঙ্গ করা ফরজ আর যদি কাফির হয় নামায ভঙ্গ করবেনা অতঃপর নামাযের পর যদি পানি প্রদান করে তখন অজু করে নামায পুনরায় পড়বে।

মাসয়ালাঃ যদি এ ধারণা হয় যে, এক মাইলের ভিতরে কোন পানি নেই। কিন্তু এক মাইলের কিছু বেশীর ব্যবধানে পানি পাওয়া যাবে তখন নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব অর্থাৎ আছর, মাগরীব, এশার মধ্যে এতটুকু বিলম্ব করবেনা যা মাকরূহ এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। আর যদি মুস্তাহাব সময় পর্যন্ত বিলম্ব না করে তায়াম্মুম করে পড়ে নেয় নামায হয়ে যাবে।

(৩) শীত এত বেশী যে গোসল করলে মৃত্যু বা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে এবং লেপ তোষক জাতীয় এমন কোন কিছু নেই যদ্বারা গোসলের পর উষ্ণতা লাভ করবে এবং শীতের তীব্রতা থেকে পরিত্রাণ পাবে। কিংবা না কোন আগুন আছে যাদ্বারা তাপ নিবে তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ।

(৪) শত্রু দেখলে হত্যা করবে কিংবা মাল সম্পদ ছিনিয়ে নিবে অথবা দরিদ্র কিংবা নিঃস্ব ব্যক্তিকে কর্জের কারণে আটকে রাখার আশংকা হলে অথবা সেখানে সর্প কর্তৃক দংশনের আশংকা হলে অথবা হিংস্র প্রাণী আক্রমনের আশংকা হলে অথবা কোন অসৎ প্রকৃতির লোক প্রকৃত অসুবিধা সৃষ্টির আশংকা হলে। অথবা এ পুরুষ বা নারী তাঁর মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার আশংকা হলে তখন তায়াম্মুম জায়েজ হবে।

মাসয়ালাঃ যদি এমন শত্রু হয় যে, সে এমন কিছু বলেনি কিন্তু যদি এ কথা বলে যে, যদি অজুর জন্য পানি নাও হত্যা করব। অথবা বন্দী করে রাখবো। এমতাবস্থায় হুকুম হল তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে। যখন সুযোগ পাওয়া যাবে অজু করে নামায পুনরায় পড়বে।

মাসয়ালাঃ জেলখানার আসামীকে যদি কর্তৃপক্ষ অজু করতে না দেয় তখন তায়াম্মুম করে নামায পড়বে পরে পানি পেলে পুনরায় পড়বে আর যদি শত্রু কিংবা জেলখানা কর্তৃপক্ষ নামাযও পড়তে না দেয় তখন ইশারায় নামায পড়বে অতঃপর পুনরায় আদায় করবে।

(৫) বনভূমি বা জঙ্গলে পানি ভর্তির জন্য যদি বালতি না থাকে তায়াম্মুম জায়েজ।

মাসয়ালাঃ যদি সাথীর নিকট বালতি, রশি থাকে এবং বলে, অপেক্ষা কর, পানি ভর্তি সম্পন্ন করে তোমাকে দিব তখন অপেক্ষা করা মুস্তাহাব আর যদি অপেক্ষা না করে তায়াম্মুম করে পড়ে নেয় হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ বালতির রশি যদি ছোট হয় বা পানি পর্যন্ত, পৌঁছানো যাচ্ছে না কিন্তু সাথে যদি কোন কাপড় (রুমাল পাগড়ী, দুপাট্টা ইত্যাদি) থাকে যা রশির সাথে জোড়া দিলে পানি পর্যন্ত পৌঁছবে এবং পানি পাওয়া যাবে তখন তায়াম্মুম জায়েজ হবে না।

(৬) পিপাসার আশংকা হলে অর্থাৎ তাঁর নিকট পানি আছে কিন্তু অজু কিংবা গোসলে যদি এ পানি খরচ করে ফেলে তখন সে নিজে অথবা অন্য কোন মুসলমান বা নিজ অপর মুসলমানের জীবজন্তু যদিও কুফর হয় যার প্রতিপালন বৈধ এমন প্রাণী যদি পিপাসার্ত থেকে যায় এবং নিজের বা তাদের কেউ বর্তমানে পিপাসার্ত হউক কিংবা ভবিষ্যতে পিপাসার্ত হওয়ার আশংকা হয় পথের দুরত্বও এমন হয় যেখানে পানি দুর্লভ তখন তায়াম্মুম জায়েজ।

মাসয়ালাঃ পানি মওজুদ আছে কিন্তু আটা পিষার প্রয়োজন রয়েছে তখনও তায়াম্মুম জায়েজ। শুরুয়া বা স্যুপ বানানোর প্রয়োজনে পানি রেখে তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়।

মাসয়ালাঃ শরীর কিংবা কাপড় এতটুকু পরিমাণ অপবিত্র যে অপবিত্রতা নামায বৈধ হবার অন্তরায় এবং পানিও এত স্বল্প পরিমাণ আছে যে, হয়তঃ অজু করা যাবে অথবা কাপড় পবিত্র করা যাবে দুইটা কাজ করা যাবে না তখন পানি দ্বারা কাপড় পবিত্র করে নিবে। অতঃপর তায়াম্মুম করবে। আর যদি প্রথমে তায়াম্মুম করে নেয়, অতঃপর কাপড় পবিত্র করে, তখন পুনরায় তায়াম্মুম করবে। প্রথম তায়াম্মুম আদায় হয়নি।

মাসয়ালাঃ মুসাফির যদি পথিমধ্যে কারো রাখা পানি পেয়ে যায় যদি সেখানে কেউ থাকে পানি সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে। যদি সে বলে এ পানি শুধু পান করার জন্য তখন তায়াম্মুম করবে অজু জায়েজ হবে না। পানির পরিমাণ যতই হউক না কেন। আর যদি বলে এ পানি পান করার জন্য ও অজুর জন্য তখন তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। যদি এমন কেউ না থাকে যাকে জিজ্ঞেস করবে এবং পানিও যদি কম হয় তখন তায়াম্মুম করবে আর যদি পানি বেশী হয় তখন অজু করবে।

(৭) পানি অধিক মূল্য হওয়াঃ অর্থাৎ সেখানকার হিসাবানুপাতে যতটুকু মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল তার দ্বিগুণ চতুর্গুন দাবী করছে তখন তায়াম্মুম জায়েজ আর যদি মূল্যের মধ্যে তত বেশী পার্থক্য না থাকে তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ মূল্যের বিনিময়ে পানি পাওয়া যায়, এমতাবস্থায় মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূল্যে যদি না থাকে তখন তায়াম্মুম জায়েজ।

(৮) পানির তালাশে যদি কাফেলা দৃষ্টির অন্তরালে হওয়ার আশংকা হয় অথবা রেলগাড়ী যদি চলে যায় অথবা অজু গোসলে লিপ্ত হলে দুই ঈদের নামায চলে যাওয়ার আশংকা হয় অথবা ইমাম নামায সমাপ্ত করে নেয় কিংবা সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ে এ দুই অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ।

মাসয়ালাঃ অযু করে দুই ঈদের নামায পড়তে ছিল। নাযরত অবস্থায় অযু চলে গেল, আবার অযু করতে গেলে নামাযের সময় চলে যাবে অথবা জামাত হয়ে যাবে তখন তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে।

মাসয়ালাঃ চন্দ্রগ্রহন ও সূর্যগ্রহণের নামাযের জন্যও তায়াম্মুম করা জায়েজ। যদি অযু করতে গেলে গ্রহণ খুলে যাওয়া কিংবা জামাত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়।

মাসয়ালাঃ অযুতে লিপ্ত হওয়ার কারণে যদি জোহর, মাগরীব বা এশার কিংবা জুমার পরবর্তী সুন্নাত সমূহ অথবা চাশতের নামাযের সময় যদি অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে।

(৯) গায়রে অলীর জন্য জানাজা নামায যদি শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তখন তায়াম্মুম জায়েজ তবে অলী নিজ অভিভাবকের জন্য জায়েজ নয়। লোকেরা তার জন্য অপেক্ষা করবে, লোকেরা তার অনুমতি বিহীন যদি পড়েও নেয় তথাপি সে দ্বিতীয়বার পড়তে পারবে।

মাসয়ালাঃ ওলী বা অভিভাবক যাকে নামায পড়াবার অনুমতি দিয়েছে তার জন্য তায়াম্মুম জায়েজ নেই। আর এ পর্যায়ে ওলীর যদি নামায ফওত হওয়ার আশংকা হয় তখন তায়াম্মুম জায়েজ হবে। এমনিভাবে যদি দ্বিতীয় ওলী যে তার চেয়ে বড়, উপস্থিত হয়, তখন তার জন্য তায়াম্মুম জায়েজ। জানাজা ফওত হওয়ার অর্থ এটাই যে, চার তকবীর চলে যাওয়ার আশংকা হওয়া আর যদি এক তকবীর পাওয়ার ব্যাপারেও ধারণা রাখা যায় তখন তায়াম্মুম জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ এক জানাজার জন্য তায়াম্মুম করল এবং নামায পড়ল অতঃপর দ্বিতীয় জানাযা উপস্থিত হল, যদি মধ্যখানে এতটুকু সময় মিলে যতটুকু সময়ে অযু করার ইচ্ছে করলে অযু করা যেত কিন্তু অযু করেনি, এখন যদি অযু করতে যায় নামায চলে যাবে, তখন সে দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করবে। আর যদি এতটুকু সুযোগ পাওয়া না যায় সে অজু করবে তখন প্রথম তায়াম্মুমই যথেষ্ঠ।

মাসয়ালাঃ সালামের উত্তর দেয়া, দরুদ শরীফ ইত্যাদি অজীফা পড়া ঘুম থেকে উঠা ব্যক্তি অজুবিহীন মসজিদে গমনকারী অথবা মৌখিক কুরআন পাঠকারীর জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ, যদিও পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়।

মাসয়ালাঃ যার উপর গোসল করা ফরজ তার জন্য বিনা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করার লক্ষ্যে তায়াম্মুম জায়েজ নেই। হ্যাঁ যদি প্রবেশ করতে বাধ্য হয় যেমন রশি বালতি মসজিদে রয়েছে বের করে আনার জন্য যদি দ্বিতীয় কেউ না থাকে, তখন তায়াম্মুম করে প্রবেশ করবে এবং দ্রুত বের হয়ে আসবে।

মাসয়ালাঃ কেউ মসজিদে ঘুমাল এবং পবিত্রতা অবলম্বন আবশ্যক হয়ে পড়ল, তখন চোখ খোলামাত্রই যেখানে ঘুমিয়েছিল সেখান হতে দ্রুত তায়াম্মুমের জন্য বের হয়ে পড়বে। বিলম্ব করা হারাম।

মাসয়ালাঃ কুরআন মজীদ স্পর্শের জন্য অথবা তিলাওয়াতে সিজদা ও সিজদায়ে শুকর বা কৃতজ্ঞতার সিজদার জন্য তায়াম্মুম জায়েজ নহে যদি পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়।

মাসয়ালাঃ সময় এত বেশী সংকীর্ণ যে, অজু বা গোসল করতে গেলে নামায কাযা হয়ে যাবে তখন ইচ্ছে করলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে। অতপর অজু অথবা গোসল করে পুনরায় পড়ে নেয়া আবশ্যক।

মাসয়ালাঃ মহিলারা যদি হায়েজ নেফাছ হতে পবিত্র হয় কিন্তু পানি ব্যবহারে সক্ষম নয় তখন তায়াম্মুম জায়েজ।

মাসয়ালাঃ মৃত ব্যক্তিকে যদি গোসল দেয়া না হয় পানি না থাকার কারণে অথবা এ কারণে যে মৃত ব্যক্তির শরীরে হাত লাগানো জায়েজ নেই যেমন অপরিচিত মহিলা অথবা নিজ স্ত্রী মৃত্যুর পর যাকে স্পর্শ করা যায় না। তখন তাকে তায়াম্মুম করিয়া দিবে। অমুহরিমকে যদিও স্বামী হয় স্ত্রীকে তায়াম্মুম করানোর সময় কাপড় অন্তরায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাসয়ালাঃ অপবিত্র, ঋতুবর্তী মহিলা, মৃতব্যক্তি এবং অজুহীন সকলে যদি একস্থানে একত্রিত হয়, এমন সময় কেউ যদি এতটুকু পরিমাণ পানি নিয়ে বলে (যতটুকু পানি গোসলের জন্য যথেষ্ঠ) যার ইচ্ছে খরচ করুক, তখন উত্তম হল অপবিত্র ব্যক্তি গোসল করে নিবে এবং মৃত ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করিয়ে দেবে এবং অন্যরাও তায়াম্মুম করবে। আর যদি বলে এ পানিতে তোমাদের সকলের অংশ আছে এবং প্রত্যেকে এতে ততটুকু অংশ পেল যা তার কাজের জন্য পরিপূর্ণ নয়। তখন উচিৎ মৃত ব্যক্তির গোসলের জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ দিয়ে দিবে এবং সকলে তায়াম্মুম করবে।

মাসয়ালাঃ দু ব্যক্তি যারা পিতা-পুত্রের সম্পর্কিত কেউ এতটুকু পরিমাণ পানি দিল যা দ্বারা একজনের অজু সম্পন্ন করা যাবে তখন ঐ পানি পিতাকে দেয়া উচিত।

মাসয়ালাঃ এমন কোন স্থানে, যেখানে পানি নেই তায়াম্মুম করার জন্য পবিত্র মাটিও নেই, তখন তার উচিৎ নামাযের সময়ে নামাযের প্রকৃতি ধারণ করা অর্থাৎ নিয়তবিহীন নামাযের নড়া চড়া সম্পন্ন করবে।

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তির অজু করার সময় প্রস্রাবের ফোটা নির্গত হয় কিন্তু তায়াম্মুমের সময় হয়না তার জন্য তায়াম্মুম করা আবশ্যক।

মাসয়ালাঃ যদি এতটুকু পরিমাণ পানি পাওয়া যায়। যাদ্বারা অজু করা যাবে এবং তার গোসলের প্রয়োজনও আছে। তখন ঐ পানি দ্বারা অজু করে নেওয়া উচিৎ, গোসলের জন্য তায়াম্মুম করবে।

মাসয়ালাঃ তায়াম্মুমের পদ্ধতি এটাই যে, উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ উম্মুক্ত করে হাত জমিনের উপর বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর মারবে। হাতে অতিরিক্ত মাটি লাগলে ঝেড়ে ফেলবে। প্রথমবার সমস্ত মুখমন্ডল মুছেহ করবে, অতঃপর দ্বিতীয়বার এইভাবে হাত মেরে দুই হাত নখ থেকে কনুইসহ মুছেহ করবে।

মাসয়ালাঃ অজু এবং গোসল উভয়ের তায়াম্মুমের পদ্ধতি একই ধরনের।

মাসয়ালাঃ তায়াম্মুমের ফরজ তিনটিঃ

(১) তায়াম্মুমের নিয়ত করা (২) মুখমণ্ডল মুছেহ করা (৩) উভয় হাত কনুই সহ মুছেহ করা। যে ব্যক্তি নিয়াত করেনি তার তায়াম্মুম হবে না।

মাসয়ালাঃ কোন কাফের ইসলাম গ্রহণের জন্য তায়াম্মুম করল তা দ্বারা নামায জায়েজ হবে না। যেহেতু সে সময়, সে নিয়তের যোগ্য ছিল না বরং পানি ব্যবহারে যদি সক্ষম না হয় তখন শুরু থেকেই তায়াম্মুম করবে।

মাসয়ালাঃ যে তায়াম্মুম-পবিত্র হওয়ার নিয়তে অথবা এমন কোন এবাদতে মকসুদা আদায় করার জন্য করা হয়েছে যেসব ইবাদত অপবিত্র অবস্থায় করা জায়েজ নয় কেবল মাত্র তায়াম্মুম দ্বারা সেসবই জায়েজ হবে।

মসজিদে গমণ করা, বাহির হওয়া, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, আজান ও একামত দেওয়া এসবগুলো ইবাদতে মকসুদা নয় অথবা সালাম করা সালামের উত্তর দেয়া, কবর জেয়ারত করা, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বেঅজু হওয়া কুরআন পাঠের জন্য যদি তায়াম্মুম করা হয় তা দ্বারা নামায জায়েজ হবে না বরং যে ইবাদতের জন্য তায়াম্মুম করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য ইবাদত করা জয়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ যার উপর গোসল ওয়াজিব এমনকি অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন পাঠের জন্য তায়াম্মুম করল, সে তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া যাবে। কোন ব্যক্তি সিজদায়ে শুকরের নিয়তে তায়াম্মুম করল, তা দ্বারা নামায আদায় করা যাবে না।

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি কাউকে তায়াম্মুমের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য তায়াম্মুম করল, তা দ্বারা নামায জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ জানাযার নামায, দুই ঈদের নামায, অথবা সুন্নাত নামাযের জন্য এই উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করল যে, যদি অজু করতে যায়, তবে নামায ফওত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঐ তায়াম্মুম দ্বারা ফরজ নামায সহ অন্যান্য সকল ইবাদত জায়েজ হবে।

মাসয়ালাঃ গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য গোসল ও অজু উভয়টির জন্য দুই বার তায়াম্মুম করা জরুরী নয় বরং একই তায়াম্মুমে উভয়টির নিয়াত করলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে। আর যদি শুধুমাত্র গোসল অথবা অজুর নিয়াত করে তা-ও-যথেষ্ট হবে।

মাসয়ালাঃ হাত পা বিকলাঙ্গ রুগ্ন ব্যক্তি নিজে তায়াম্মুম করতে না পারলে অন্য জন তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দেবে। যিনি তায়াম্মুম করিয়ে দেবেন তার নিয়্যতের প্রয়োজন নেই। বরং যাকে করিয়ে দিচ্ছে তার নিয়ত প্রয়োজন। সমস্ত মুখমন্ডলে হাত মুছেহ করবে যাতে কোন অংশ বাকী না থাকে। যদি চুল পরিমাণ স্থানও বাকী থাকে তায়াম্মুম হবে না।

মাসয়ালাঃ দাঁড়ি, গোফ এবং ভ্রু এর চুলের উপর হাত মুছেহ করা আবশ্যক। মুখ মন্ডলের পরিধি কতটুকু পর্যন্ত তা অজুর বর্ণনায় আলোকপাত করা হয়েছে। ভ্রু এর নীচে এবং চক্ষুর উপরিভাগে যে স্থান রয়েছে এবং নাকের নিম্নভাগে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যদি খেয়াল রাখা না হয় এবং তার উপর হাত মুছেহ করা হলনা তাতে তায়াম্মুমও হলনা।

মাসয়ালাঃ মহিলারা যদি নাকফুল পরিধান করে তা খুলে নিবে। নতুবা নাকফুলের স্থান বাকী থেকে যাবে। আর যদি নাকে কোন প্রকার অলঙ্কার পরিধান করে সে ক্ষেত্রে নাকে পরিধেয় অলংকারের কারণে স্থান যাতে বাকী না থাকে সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

মাসয়ালাঃ নাকের ছিদ্রের অভ্যন্তরে মুছেহ করার কোন প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ ঠোঁটের ঐ অংশ যা সাধারণতঃ মুখ বন্ধ করার অবস্থায় দেখা যায় তার উপরও মুছেহ করা জরুরী। যদি কেউ হাত ফিরানোর সময় ঠোঁটকে জোরে দাবিয়ে রাখে যা দ্বারা কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়, তখন তায়াম্মুম হবে না। এমনকি যদি জোরে চক্ষু বন্ধ করে রাখে তখনও তায়াম্মুম হবে না।

মাসয়ালাঃ গোঁফের চুল লম্বা হয়ে যদি ঠোঁট ঢেকে ফেলে, তখন গোঁফের চুল উঠিয়ে ঠোঁটের উপর হাত ফিরাবে। গোঁফের চুলে হাত ফিরালে যথেষ্ট হবে না। উভয় হাত কনুইসহ মুছেহ করার সময় যাতে বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। নতুবা তায়াম্মুম হবে না।

মাসয়ালাঃ আঙ্গুলে পরিধেয় আংটি খুলে তার নীচে মুছেহ করা ফরজ। মহিলাদের জন্য এক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। চুড়ি, বালা সহ হাতে পরিধেয় সর্বপ্রকার অলঙ্কার খুলে ফেলবে এবং চামড়ার প্রত্যেক অংশে হাত পৌঁছাবে, এক্ষেত্রে অযুর চেয়ে অধিক সতর্কতা প্রয়োজন।

মাসয়ালাঃ তায়াম্মুমে মাথা এবং পা মুছেহ করার নিয়ম নেই।

মাসয়ালাঃ একবার মাটিতে হাত মেরে মুখমন্ডল এবং হাত মুছেহ করলে তায়াম্মুম হবে না। হ্যাঁ, প্রথমবারে একহাতে সমস্ত মুখমন্ডল মুছেহ করল, দ্বিতীয় বারে একহাত মুছেহ করল অতঃপর দ্বিতীয় হাতের মুছেহ করার জন্য আবার মাটিতে হাত মারল এবং তার উপর মুছেহ করল মুছেহ হয়ে গেল, তবে কাজটি সুন্নতের বিপরীত হল।

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তির হাতের দুই কব্জি বা বাহু অথবা একটি কব্জি বা বাহু কেটে গেল তখন কনুই পর্যন্ত যতটুকু বাকী আছে তার উপর মছেহ করবে। আর যদি কনুই থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত কেটে যায়, তখন অবশিষ্ট হাতের উপর মুছেহ করা প্রয়োজন নেই। তবুও যদি কর্তিত স্থানে মুছেহ করে তা হবে উত্তম।

মাসয়ালাঃ কোন পঙ্গু ব্যক্তি অথবা যার দু'হাত কাটা দ্বিতীয় এমন কেউ নেই যে তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে, এমতাবস্থায় সে নিজ হাত ও মুখমন্ডল যতটুকু সম্ভব জমিন বা দেওয়ালে স্পর্শ করবে এবং নামায পড়বে। কিন্তু এমতাবস্থায় সে ইমামতি করতে পারবে না। তবে তার মত অন্য কেউ পঙ্গু থাকলে তিনি ইমামতি করতে পারবে।

মাসয়ালাঃ তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে যদি ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, মুখমন্ডল এবং হাতের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অংশে মাটি স্পর্শ হয় তায়াম্মুম হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। এমতাবস্থায় মুখমন্ডল এবং হাতের উপর হাত মুছেহ করা উচিৎ।

তায়াম্মুমের সুন্নত সমূহ

(১) বিছমিল্লাহ বলা (২) উভয় হাত জমিতে মারা। (৩) আঙ্গুল সমূহ প্রশস্ত রাখা। (৪) উভয় হাত ঝেড়ে ফেলা অর্থাৎ একহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির তালু অপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গলির তালুর উপর এমনভাবে মারবে যাতে তালুর আওয়াজ বের হয়। (৫) জমিনের উপর হাত মেরে টেনে আনা। (৬) প্রথমে মুখমন্ডল অতঃপর হাত মুছেহ করা। (৭) উভয় হাত পর পর মুছেহ করা। (৮) প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত মুছেহ করা। (৯) দাঁড়ি খিলাল করা। (১০) আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা। যদি বালি লেগে থাকে।

আর যদি বালি বা মাটি না লাগে যেমন পাথর জাতীয় বস্তুর উপর হাত মেরেছে যার উপর বালি নেই তখন খিলাল করা ফরজ। হাত মুছেহ করার উত্তম পদ্ধতি এই যে, বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ছাড়া চার আঙ্গুলের পেট বা নিম্নভাগ ডান হাতের পিট বা উপরিভাগে রাখবে এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ হতে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অতঃপর যেখান হতে বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পিট স্পর্শ করে গিরা পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির তালু দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিট মুছেহ করবে। এভাবে ডান হাত দ্বারা বাম হাত মুছেহ করবে। এক মুহূর্তে যদি পূর্ণ তালু এবং আঙ্গুল মুছেহ করে তায়াম্মুম হয়ে যাবে। কনুই থেকে আঙ্গুলির দিকে টেনে নেয়া হোক অথবা আঙ্গুলি থেকে কনুই বা উরুর দিকে নেয়া হউক তায়াম্মুম হয়ে যাবে। তবে প্রথমাবস্থায় খেলাপে সুন্নাত বা সুন্নাতের পরিপন্থী হবে।

মাসয়ালাঃ মুছেহ করার সময় যদি শুধুমাত্র তিন আঙ্গুল কাজে লাগায় তখনও হয়ে যাবে আর যদি এক বা দুই আঙ্গুল দ্বারা মুছেহ করে তায়াম্মুম হবে না। যদিও বা সমস্ত অঙ্গে আঙ্গুল ফিরানো হয়।

মাসয়ালাঃ তায়াম্মুম করার পরপর দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করবেনা।

মাসয়ালাঃ খিলালের জন্য মাটিতে হাত মারার প্রয়োজন নেই।

যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ এবং জায়েজ নয়ঃ

মাসয়ালাঃ যে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে তা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ তার উপর নাজাছাতের চিহ্ন না থাকা। নিছক শুকিয়ে যাবার কারণে নাজাছাতের চিহ্ন দূরীভূত হওয়া নয়।

মাসয়ালাঃ কোন বস্তুর উপর নাজাছাত বা অপবিত্র বস্তু পতিত হয়ে তা যদি শুকিয়ে যায় তা দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে না। যদি ও নাজাছাতের চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে। অবশ্য তার উপর নামায পড়া যাবে।

মাসয়ালাঃ কোন সময় অপবিত্র হয়েছিল এমন ধারণা গ্রহণ যোগ্য নয়।

মাসয়ালাঃ যে বস্তু আগুনে জ্বলে অঙ্গারে পরিণত হয়। বিগলিত হয়না বা নরম হয়না এবং তা মাটি জাতীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। বালি, চুনা, সুরমা, হরিতাল, গন্ধক, মৃত পাথর, পরশ পাথর, জবরজদ, ফিরোজ, আকীক, জমরদ, ইত্যাদি মুক্তা পাথর দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ যদি তার উপর মাটি না থাকে।

মাসয়ালাঃ পাকা ইট, চিনা অথবা মাটির পাত্র যা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা রঞ্জিত, যেমন গেরুয়া রং, খড়গ মাটি অথবা যে সব বস্তুর রং মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা করা হয়নি এবং পাত্রের উপর তার প্রভাবও পড়েনি এমতাবস্থায় তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ, আর যদি মাটি জাতীয় বস্তু না হয় এবং তার প্রভাব পাত্রে পতিত হয় তখন জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ ক্ষীর যা পানিতে ঢেলে পরিষ্কার করা হয়নি তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নতুবা জায়েজ নয়।

মাসয়ালাঃ যে লবন পানি থেকে তৈরী হয় তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নেই। যে লবন খনি থেকে নির্গত, যেমন সৈন্ধব লবন দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ।

মাসয়ালাঃ যে বস্তু আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে যায় যেমন লাকড়ী, ঘাস ইত্যাদি, অথবা বিগলিত হয় বা নরম হয়ে যায় যেমন-রৌপ্য, স্বর্ণ, তাম্র, পিতল, লৌহ, ইত্যাদি ধাতব পদার্থ যা মাটি জাতীয় নয় তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। তবে এত সব ধাতব পদার্থ যদি খনি থেকে বের করার পর গলিত করা না হয় এবং এখনও তার উপর মাটির প্রভাব অবশিষ্ট রয়েছে তখন তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হবে। আর যদি গলিয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং তার উপর এতটুকু ধুলি মাটি রয়েছে যে, হাত লাগলে ধুলি বালি বা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ, অন্যথায় জায়েজ নয়।

মাসয়ালাঃ শষ্য, ধান্য, গম, যব ইত্যাদি এবং লাকড়ী, ঘাস ও আয়না বা কাঁচের উপর যদি ধুলাবালি থাকে তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ যদি তা হাতে লাগার পরিমাণ হয়, অন্যথায় জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ মেশক, সুগন্ধি, কাফুর, লোবান বাতি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ মুক্তা, আপেল এবং আঙ্গুর দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নেই যদিও পিষা হয়। এসব বস্তুর সাথে স্পর্শকৃত বস্তুর দ্বারাও তায়াম্মুম জায়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ ভষ্ম ছাই, স্বর্ণ রৌপ্য এবং ইস্পাত দ্বারা নির্মিত পাত্রে তায়াম্মুম জয়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ মাটি বা পাথর যদি জ্বলে কালো হয়ে যায়, তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। এমনি ভাবে পাথর জ্বলে যদি ভষ্ম ছাই হয়ে যায় তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ।

মাসয়ালাঃ মাটির সাথে যদি অধিক পরিমাণ ভষ্ম ছাই মিশ্রিত হয় তখনও তায়াম্মুম জায়েজ, অন্যথায় জায়েজ নয়।

মাসয়ালাঃ নীল, লাল, সবুজ এবং কালো রঙের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। কিন্তু রং ছুটে যদি হাত মুখকে রঙিন করে দেয় তখন অধিক প্রয়োজন ছাড়া তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই, যদি করে নেয় তায়াম্মুম হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ আর্দ্রমাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ যখন আর্দ্র মাটির পরিমাণ প্রচুর হয়।

মাসয়ালাঃ মুসাফির যদি এমনস্থান অতিক্রম করে যেখানে সর্বত্র কাদা মাটির সমাহার, অজু বা গোসলের জন্য কোন পানি পাওয়া যাচ্ছেনা এবং কাপড়ের মধ্যে বালিও নেই তখন তার উচিৎ হবে কাপড় কাদার মধ্যে গলিয়ে শুকিয়ে নিবে এবং তা হতে তায়াম্মুম করবে, আর যদি সময় চলে যায় বাধ্য হয়ে কাদা দ্বারা তায়াম্মুম করবে যখন মাটি অধিক হবে।

মাসয়ালাঃ গদী, শতরঞ্জি, সুতী কার্পেট ইত্যাদির উপর যদি ধুলাবালি থাকে তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ যদিও বা সেখানে মাটি মওজুত থাকে। এতে বালির পরিমাণ যখন এতটুকু হবে যাতে হাত টানলে আঙ্গুলের চিহ্ন বসে যায়।

মাসয়ালাঃ ঘর নির্মাণ অথবা ঘর ভাঙ্গার সময় অথবা অন্য কোন উপায়ে মুখ এবং হাতের উপর যদি মাটি পতিত হয় তখন তায়াম্মুমের নিয়্যতে উক্ত মাটি দ্বারা যদি মুখ ও হাত মুছেহ্ করে নেয় তায়াম্মুম হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ অপবিত্র কাপড়ে যদি মাটি থাকে তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নয় তবে কাপড় শুকিয়ে যাবার পর যদি মাটি লাগে তা দ্বারা জায়েজ হবে।

মাসয়ালাঃ চুনের আস্তর যুক্ত প্রাচীরের উপর তায়াম্মুম করা জায়েজ।

মাসয়ালাঃ প্রস্তুতকৃত মৃৎ পাথর দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ কলাই অথবা তার ভষ্ম ছাই দ্বারা তায়াম্মুম জয়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ যে স্থান হতে একজন তায়াম্মুম করেছে সে স্থান থেকে অন্যজনও তায়াম্মুম করতে পারবে। মসজিদের প্রাচীর অথবা জমিনে তায়াম্মুম করা না জায়েজ বা মাকরুহ বলে যে উক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা নিতান্ত ভুল।

মাসয়ালাঃ তায়াম্মুমের জন্য মাটির উপর হাত মারল এবং মুছেহ্ করার পূর্বে তায়াম্মুম ভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ পাওয়া গেল তখন সেখান থেকে তায়াম্মুম করা যাবে না।

তায়াম্মুম ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমূহ

মাসয়ালাঃ যে সব বস্তু দ্বার অজু ভঙ্গ হয় বা গোসল ওয়াজিব হয় সে সব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। তা ছাড়া পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়ার সাথে সাথেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

মাসয়ালাঃ অসুস্থ ব্যক্তি গোসলের তায়াম্মুম করেছিল, এখন এতটুকু সুস্থ হয়েছে যা দ্বারা গোসল করলে কোন ক্ষতি হবে না, তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কেউ গোসল অথবা অজু উভয়টির জন্য একটি মাত্র তায়াম্মুম করল, অতঃপর অজু ভঙ্গকারী কোন কারণ পাওয়া গেল অথবা এতটুকু পানি পেল যা দ্বারা শুধুমাত্র অযু করা যাবে অথবা অসুস্থ ছিল এখন সুস্থ হয়ে উঠলো যা দ্বারা অযু করলে ক্ষতি হবে না। কিন্তু গোসলে ক্ষতি হবে, এমতাবস্থায় অযুর ব্যাপারে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে, গোসলের ব্যাপারে তায়াম্মুম বলবৎ থাকবে।

মাসয়ালাঃ যে অবস্থায় তায়াম্মুম নাজায়েজ ছিল তা যদি তায়াম্মুমের পর পাওয়া যায় তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে, যেমন তায়াম্মুমকারী এমনস্থান অতিক্রম করল, যেখান থেকে এক মাইলের ভিতর পানি আছে, তখন তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে, এক্ষেত্রে একেবারে পানির নিকটে পৌঁছে যাওয়া আবশ্যক নয়।

মাসয়ালাঃ এতটুকু পানি পাওয়া গেল যা অযুর জন্য যথেষ্ট নয় অর্থাৎ একবার মুখমন্ডল এবং একবার উভয় হাত-পা ধৌত করা যাবে না তখন অজুর তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না, যদি একবার একবার ধৌত করা যায় তখন তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে, এমনভাবে গোসলের তায়াম্মুমকারীর জন্য এতটুকু পানি মিললো যদ্বারা গোসল সম্পন্ন করা যাবে না তখনও তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ এমন স্থান অতিক্রম করল যে স্থান হতে পানি নিকটে, কিন্তু পানির নিকটে বাঘ, সর্প, বা শত্রু থাকার কারণে মান-সম্মান ও প্রাণ সম্পদ বিনষ্ঠ হওয়ার আশংকা বিদ্যমান অথবা কাফেলা অপেক্ষা করবেনা বা হারিয়ে যাবে অথবা সওয়ারী থেকে অবতরণ করা যাচ্ছে না যেমন রেলগাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ী যা থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না অথবা ঘোড়া এমন যে আরোহীকে অবতরণ করতে দেবে কিন্তু উঠতে দেবে না অথবা ঘোড়া এত দুর্বল যে, পূনরায় আরোহন করা যাবে না। অথবা কুপের মধ্যে পানি আছে কিন্তু পাশে কোন বালতি রশি না থাকাতে পানি উঠানো সম্ভব নয় এসব অবস্থায় তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ ঘুমন্তাবস্থায় পানির এলাকা অতিক্রম করলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না, ভঙ্গ না হওয়াটা পানির এলাকা অতিক্রম করার কারণে নয় বরং ঘুমন্তাবস্থায় অতিক্রম করার কারণে। আর যদি তন্দ্রাজনিত অবস্থায় পানির এলাকা অতিক্রম করে এবং পানি সম্বন্ধে পূর্বেই অবগত হয় তখন তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে অন্যথায় ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ পানির এলাকা অতিক্রম করছিল কিন্তু তায়াম্মুমের কথা স্মরণ ছিল না তখনও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ নামাযের অবস্থায় গাধা বা খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি দেখা গেল তখন নামায পূর্ণ করবে অতঃপর তা দ্বারা পূনরায় পড়বে।

মাসয়ালাঃ তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়ছিল এমতাবস্থায় দুর থেকে বালুকা চমকাচ্ছিলো, পানি মনে করে এক কদম সম্মুখ পানে অগ্রসরও হল অতঃপর অবগত হল তা পানি নয় বরং বালুকা, নামায ফাছেদ হয়ে যাবে, কিন্তু তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ কতিপয় ব্যক্তি তায়াম্মুম রত অবস্থায় ছিল কেউ তাদের নিকট এক অজু পরিমাণ পানি এনে বলল, যার ইচ্ছে এখান থেকে অজু করে নিন, তখন সকলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সকলে নামাযরত থাকে সকলের নামায ফাছেদ হয়ে যাবে, আর যদি একথা বলে, যে তোমরা সকলে এখান থেকে অজু করে নাও তখন কারো তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি একথা বলে আমি তোমাদের সকলকে এই পানির মালিক করেছি, তখনও তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ কেউ গোসল করল, কিন্তু দেহের কিছু অংশ শুকনা রয়ে গেল অর্থাৎ তার উপর পানি প্রবাহিত হয়নি এবং তা ধৌত করার জন্য পানিও নেই এমতাবস্থায় গোসলের তায়াম্মুম করল। এরপর পুনরায় অজু ভেঙ্গে গেল, অতএব আবার অজুর তায়াম্মুম করল অতঃপর এতটুকু পানি পেল যদ্বারা অজুও করা যাবে শুকনা জায়গাও ধৌত করা যাবে। তখন অজু এবং গোসল উভয়ের তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। আর যদি এতটুকু পানি না পায় যদ্বারা অজু করা যাবে এবং শুকনা জায়গা ধৌত করা যাবে তখন উভয় তায়াম্মুমই বলবৎ থাকবে এবং ঐ পানি শুকনা অংশ ধৌত করতে ব্যয় করবে। আর যদি এতটুকু পানি পায় যদ্বারা কেবল অজু হবে; শুকনা স্থানের জন্য যথেষ্ঠ হবে না, তখন অজুর তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ পানি দ্বারা অজু করবে। আর যদি শুধুমাত্র শুকনা অংশকে ধৌত করা যায়, অজু করা না যায় তখন গোসলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং অজুর তায়াম্মুম বলবৎ থাকবে। ঐ পানি গোসলের ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। আর যদি পানি দ্বারা কোন একটি করা যায় তখন ইচ্ছে করলে অজু করবে অথবা গোসল করে নেবে, তখন গোসলের তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে, পানি দ্বারা তা ধৌত করে নেবে, আর অজুর তায়াম্মুম বলবৎ থাকবে।

মোজার উপর মুছেহের বর্ণনা

হাদীস (১)ঃ ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মুছেহ করেছেন। আমি আরজ করলাম, এয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনি (পা ধুইতে) ভুলে গেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তুমিই ভুলে গোছে, আমার প্রভু মহীয়ান স্রষ্টা আমাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন।

হাদীস (২)ঃ দারে কুতনী হযরত আবু বাকরাহ্ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বাকরাহ্ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেনঃ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত্রি এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত্রি মোজার উপর মুছেহ করার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন যদি সে অজু করে মোজা পরিধান করে।

হাদীস (৩)ঃ ইমাম তিরমিজী, নাসাঈ, হযরত সাফওয়ান ইবনে আমসাল (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ যখন আমরা সফরে গমণ করতাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম করতেন আমরা যেন আমাদের মোজা সমূহ তিনদিন তিনরাত্রি যাবৎ পা হতে না খুলি কেবলমাত্র নাপাকীর গোসল ব্যতীত। এমনকি পায়খানা প্রস্রাব ও নিদ্রা হতে উঠে অজু করতেও না।

হাদীস (৪)ঃ আবু দাউদ বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রঃ) বলেনঃ যদি দ্বীন মানুষের বুদ্ধি বিবেক অনুযায়ী হত তাহলে (যুক্তির নিরিখে) হত। অথচ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরের দিক মুছেহ করতে দেখেছি।

হাদীস (৫)ঃ ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মুছেহ করতে দেখেছি।

মোজার উপর মুছেহ করার মাসায়েল

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি মোজা পরিহিত, আছে তার জন্য অজুর সময় পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার উপর মুছেহ করা জায়েজ আছে। মুছেহ জায়েজ মনে করার শর্তে পা ধোয়া উত্তম। মোজার উপর মুছেহ বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলো সংখ্যাধিক্য বর্ণনাকারীর কারণে মুতওয়াতির পর্যায়ের কাছাকাছি। এজন্য ইমাম কারখী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মোজার উপর মছেহ জায়েজ মনে করবেনা সে কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ইমাম শায়খুল ইসলাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মোজার উপর মুছেহ করা জায়েজ মনে করবেনা সে পথভ্রষ্ট। আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) কে আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জুবাবে বলেন-

تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَحُبُّ الْخَتَنَيْنِ وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ

যে -'হযরত আমীরুল মুমেনীন আবূ বকর ছিদ্দিক (রঃ) ও আমিরুল মুমেনীন ফারুকে আজম (রঃ) কে সকল সাহাবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং আমিরুল মুমেনীন ওসমান গনী (রঃ) ও আমিরুল মুমেনীন আলী (রঃ) এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা, এবং মোজার উপর মুছেহ করা।।

এ তিনটি বিষয়কে এ জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন, যেহেতু হযরত ইমাম আজম (রঃ) কুপায় অবস্থান করতেন যেখানে রাফেজীদের সংখ্যাধিক্য ছিল।

এ কারণে সে সব নিদর্শনাদির কথা উল্লেখ করেন যেগুলো তাদের আক্বিদার পরিপন্থী ছিল। তাদের আক্বিদার খন্ডনে তিনি উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। এই বর্ণনার এ অর্থ নয় যে, কেবল এ তিনটি বিষয় পাওয়া গেলে সুন্নী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। বস্তুর মধ্যে নিদর্শন পাওয়া যায়, বস্তু নিদর্শনের জন্য শর্ত নয়। যেমন বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে ওহাবী সম্প্রদায়ের নিদর্শন সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে - سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ

অর্থাৎ "তাদের নিদর্শন মস্তক মুন্ডানো"। এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, মাথা মুন্ডানই ওহাবী হবার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন যে, আমার অন্তরে এ সম্পর্কিত কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু এ বিষয়ে চল্লিশজন ছাহাবীর বর্ণিত হাদীস আমার নিকট পৌছেছে।

মাসয়ালাঃ যার উপর গোসল ফরজ সে মোজার উপর মুছেহ করতে পারবে না।

মাসয়ালাঃ মহিলারাও মুছেহ করতে পারবে। মুছেহ করার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছেঃ (১) মোজা এমন হতে হবে যেন পায়ের গিরা ঢেকে যায়। এর থেকে লম্বা হওয়ার প্রয়োজন নেই বরং এক আঙ্গুল কম হলেও মুছেহ করা শুদ্ধ হবে তবে গোড়ালী যেন খোলা না থাকে। (২) মোজা যেন পায়ের সাথে লেপটে থাকে, মোজা পরিধান করে যাতে সহজভাবে চলাফেরা করা যায়। (৩) মোজা চামড়ার হতে হবে বা কেবল তলাটা চামড়ার হবে এবং বাকী অংশটা অন্য কোন শক্ত জিনিষের হবে।

মাসয়ালাঃ ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সুতা বা উলের যে মোজা পরিধান করা হয়, তার উপর মুছেহ জায়েজ নেই, সেটা খুলে পা ধৌত করা ফরজ।

অজু সহকারে মোজা পরিধান করা বাঞ্চনীয়, অজু বিহীন অবস্থায় মোজা পরিধান করলে মুছেহ শুদ্ধ হবে না।

মাসয়ালাঃ তায়াম্মুম করে মোজা পরিধান করলে মুছেহ জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ মাজুর বা অপারগ ব্যক্তির পক্ষে কেবলমাত্র ঐ সময়ে মুছেহ জায়েজ যে সময়ে মোজা পরিধান করেছে। যদি পরিধানের পর এবং অপবিত্র হওয়ার পূর্বে ওজর বা অপারগতা দূর হয়ে যায় তখন তার সময়সীমা সুস্থ ব্যক্তির সময় সীমার অনুরূপ।

মাসয়ালাঃ অপবিত্র ব্যক্তি অপবিত্রতায় তায়াম্মুম করলো এবং অজু করে মোজা পরিধান করলো তখন মুছেহ করা যাবে কিন্তু 'জানাবতের' তায়াম্মুমের সময়সীমা চলে যাওয়ার পর মুছেহ জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ অপবিত্র ব্যক্তি গোসল করল, কিন্তু শরীরের কিছু অংশ শুকনা রয়ে গেল এবং মোজা পরিধান করল এবং অজু ভঙ্গের পূর্বে ঐ স্থানটি ধৌত করে নিল, তখন মুছেহ জায়েজ হবে, কিন্তু ঐ স্থানটি অজুর অঙ্গ সমূহ ধোয়া হতে যদি বাদ পড়ে যায় এবং ধৌত করার পূর্বে যদি 'হাদছ' বা অপবিত্র হয় তখন মুছেহ জায়েজ হবে না। তায়াম্মুম সময়সীমার ভিতরে হওয়া চাই। অর্থাৎ মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত।

মাসয়ালাঃ মোজা পরিধানের পর প্রথমবার অজু ভঙ্গের পর সময় গণনা হবে, যেমন ফজরে অজু করে মোজা পরিধান করলো, জোহরের সময় প্রথমবার অজু ভঙ্গ হলো তাহলে মুকীম দ্বিতীয় দিন যোহর পর্যন্ত মুছেহ করতে পারবে, এবং মুসাফির চতুর্থ দিনের জোহর পর্যন্ত মুছেহ করতে পারবে।
মাসয়াল্যঃ মুকীমের একদিন একরাত পূর্ণ হয়নি, সফর আরম্ভ করল, তখন অজু ভঙ্গের পর থেকে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মুছেহ করতে পারবে।
মাসয়ালাঃ মোজা ছিঁড়ে গেল বা সেলাই খুলে গেল আর এমতাবস্থায় পরিধান করলে পায়ের তিন আঙ্গুল দেখা যায় না, কিন্তু চলার সময় তিন আঙ্গুল দেখা যায়, তখন মুছেহ জায়েজ হবেনা।
মাসয়ালাঃ এতটুকু স্থান ছিঁড়ে গেলে বা সেলাই খুলে গেল যে, আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে তখন ছোট ছিঁড়ে বা বড় ছিঁড়ে নয় বরং তিন আঙ্গুল দেখা গেলেই মুছেহ নাজায়েজ।
মাসয়ালাঃ গোড়ালীর উপরে মোজা যতই ছিঁড়ে যাক তা বিবেচ্য নয়। মুছেহ করা জায়েজ।

মুছেহ করার পদ্ধতি

মুছেহের পদ্ধতি হচ্ছে, ডান হাতের তিন আঙ্গুল ডান পায়ের মোজার পিঠের অগ্রভাগে রেখে পায়ের গোড়ালীর দিকে কমপক্ষে তিন আঙ্গুল পরিমাণ টানবে। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত টানা সুন্নত।
মাসয়ালাঃ আঙ্গুল সমূহ ভিজা হওয়া আবশ্যক। হাত ধৌত করার পর যে তরলতা অবশিষ্ট রয়েছে তা দ্বারা মুছেহ জায়েজ, মাথা মুছেহ করাতে হাতে যে সামান্য ভিজা রয়েছে তা দ্বারা যথেষ্ট নয় বরং নতুন ভাবে পানিতে হাত ভিজিয়ে নেবে।
মাসয়ালাঃ মুছেহের ফরজ দুটি (১) প্রতিটি মৌজার মুছেহ হাতের তিনটা কনিষ্টাঙ্গুলের সমান হওয়া । (২) মৌজার পিঠের উপর মুছেহ করা।
মাসয়ালাঃ এক পা দুই আঙ্গুল পরিমান মুছেহ করল, দ্বিতীয় পা চার আঙ্গুল পরিমান করল, মুছেহ হয়নি।
মাসয়ালাঃ মুছেহের সুন্নত তিনটি। যথাঃ (১) হাতের পূর্ণ তিন আঙ্গুলের পেট দ্বারা মুছেহ করা। (২) আঙ্গুল সমূহ টেনে পায়ের গোছা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। (৩) মুছেহ করার সময় আঙ্গুল সমূহ খুলে রাখা।
মাসয়ালাঃ যদি একটি মাত্র আঙ্গুল দ্বারা তিনবার নতুন পানিতে প্রত্যেকবার হাত ভিজায়ে তিন জায়গায় মুছেহ করল, মুছেহ আদায় হবে তবে সুন্নত আদায় হবে না। অথবা একইস্থানে বারংবার মুছেহ করেছে প্রতিবার হাত ভিজায়নি, মুছেহ আদায় হল না।

মাসয়ালাঃ মুছেহের ব্যাপারে নিয়ত জরুরী নয়। তিনবার করাও সুন্নাত নয়। একবার করলেই যথেষ্ট।
মাসয়ালাঃ ইংলিশ বুট জুতার উপর মুছেহ করা জায়েজ, যদি এর দ্বারা পায়ের গোড়ালী ঢেকে থাকে।
মাসয়ালাঃ পাগড়ী, বোরকা, পর্দা এবং হাত মোজার উপর মুছেহ করা জায়েজ নেই।

মুছেহ ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমূহ

মাসয়ালাঃ (১) যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয়ে যায় সে সব কারণে মুছেহও ভঙ্গ হয়ে যায়। (২) মুছেহের সময়সীমা পূর্ণ হওয়া মাত্রই মুছেহ ভঙ্গ হয়ে যায়। এ অবস্থায় কেবলমাত্র পা ধৌত করলে যথেষ্ট। পূর্ণরূপে অজু করার প্রয়োজন নেই তবে পূর্ণ অজু করাটাই উত্তম।
মাসয়ালাঃ মুছেহের সময়সীমা পূর্ণ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় মোজা খুলে ফেললে ঠান্ডার কারনে পায়ের ক্ষতি হওয়ার যদি প্রবল আশঙ্কা হয় তখন মোজা খুলবেনা এবং গোড়ালী পর্যন্ত মোজার নিম্নভাগও উপরিভাগ মুছেহ করবে যাতে কোন অংশ বাকী না থাকে।
মাসয়ালাঃ মোজা খুলে নেয়া মাত্র মুছেহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও মোজা একটি খুলে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে এক পায়ের অর্ধেকের ও বেশী যদি মোজার বাহিরে চলে আসে, মুছেহ ভঙ্গ হয়ে যাবে।
মাসয়ালাঃ মোজা পরিধান করে পানিতে চলল, এবং এক পায়ের অর্ধেকেরও বেশী অংশ ধৌত হয়ে গেল, অথবা যে কোন ভাবে মোজার ভিতরে পানি প্রবেশ করলো এবং পায়ের অর্ধেকেরও বেশী অংশে ধৌত হয়ে গেল তখন মুছেহ ভঙ্গ হয়ে যাবে।
মাসয়ালাঃ অজুর অঙ্গসমূহ যদি ফেটে যায় অথবা তাতে যদি ফোঁড়া হয়, বা অন্য কোন রোগ হয়, তার উপর পানি দেয়াটা ক্ষতির কারণ হয় বা অধিক কষ্টের কারণ হয় তখন ভিজা হাত বুলিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট।
এটাও যদি ক্ষতির কারণ হয়, তখন ওটার উপর কাপড় রেখে মুছেহ করবে। এতেও যদি কষ্টকর হয় তখন মাফযোগ্য। যদি তার উপর কোন ঔষধ লাগানো হয় তা পরিষ্কার করে নেয়ার প্রয়োজন নেই। ওটার উপর পানি দিলে যথেষ্ট হবে।
মাসয়ালাঃ ব্যান্ডেজ অথবা পাট্টি খুলে গেলে পুনরায় বাঁধা যদি প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়বার মুছেহ করার প্রয়োজন নেই। প্রথমবারের মুছেহই যথেষ্ট। আর যদি ব্যান্ডেজ পুনরায় বাঁধা প্রয়োজন না হয় মুছেহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন ঐ স্থান যদি ধৌত করা যায় ধৌত করে নেবে, আর যদি ধৌত করা না যায় মুছেহ করে নেবে।

হায়েযের বর্ণনা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেনঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى
الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْ
هُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

অর্থঃ [হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, রক্তঃ স্রাবের হুকুম সম্পর্কে। আপনি বলুন, সেটা অশুচিতা। সুতরাং তোমরা স্ত্রীদের নিকট থেকে পৃথক থাকো, রক্ত স্রাবের দিনগুলোতে এবং তাদের নিকটে যেওনা যতক্ষণ না পবিত্র হয়ে যায়। অতঃপর যখন পবিত্র হয়ে যায় তখন তাদের নিকট যাও। যেখান থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন অধিক তওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বন কারীদেরকে'। (সুরা বাক্বারা আয়াত-২২২)

হায়েযের বর্ণনা সম্পর্কিত হাদীস

হাদীস (১)ঃ হযরত আনাস (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোন স্ত্রীলোক ঋতুবর্তী হতো, তখন তারা তাদের সাথে একত্রে আহার-ভক্ষন করতনা, এবং তাদেরকে এক সাথে ঘরে রাখতনা। একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম – এর সাহাবীগন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন, 'আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে "শেষ পর্যন্ত'। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাদের সাথে সবকিছু করতে পার সঙ্গম ব্যতীত। একথা ইহুদীদের নিকট পৌছলে তারা বললো এই ব্যক্তি আমাদের কোন বিষয়েরই বিরুদ্ধাচরণ না করে ছাড়তে চাহেন না। অতঃপর উসাইদ ইবনে হুজাইর ও আব্বাস ইবনে বিশর আসলেন এবং বললেন –এয়া রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! ইহুদীরা এরূপ বলে। তবে কি আমরা স্ত্রী লোকদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারিনা। (এতে ইহুদীদের পুরোপুরি বিরুদ্ধাচরণ হবে) এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলে তাতে আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাদের উপর রাগ করেছে। অতঃপর তারা বের হয়ে গেল তারপরই তাদের সম্মুখ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু দুধের হাদিয়া আসলো। অতঃপর

তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন এবং তাদেরকে তা পান করালেন। এতে তারা বুঝতে পারলো-তিনি তাদের উপর রাগ করেননি (মুসলিম শরীফ)

হাদীস (২)ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন আমরা (সাবাই মদীনা থেকে) একমাত্র হজ্ব করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। সায়েফ নামক স্থানে আমার মাসিক হল, আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছ? মাসিক স্রাব হয়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ, তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আদমের (আঃ) মেয়েদের জন্য এটা নির্ধারিত করেছে, তুমি কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া অন্যান্য হাজীদের মত হজ্বব্রত পালন করতে থাক। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তরফ থেকে গাভী কুরবানী করেছিলেন।

হাদীস (৩)ঃ সহীহ বোখারী শরীফে আছে, হযরত ওরওয়া থেকে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, ঋতুবর্তী মহিলা আমার খেদমত করতে পারবে। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রঃ) আমাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি মাসিক ঋতু স্রাব অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর চুল আঁছড়ে দিতেন। এমন অবস্থায় যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এ'তেকাফ করতেন। তিনি তাঁর মাথা মোবারক হযরত আয়েশার (র ঃ) দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং আয়েশা (র ঃ) ঋতুবর্তী অবস্থায় নিজের ঘর থেকে তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন।

হাদীস (৪)ঃ হযরত আয়েশা (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় পানি পান করতাম। অতঃপর তা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দিতাম, তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রাখতেন এবং পানি পান করতেন। আর কখনও আমি ঋতুবর্তী অবস্থায় ঐ হাড্ডি চোষন করতাম অতঃপর হাড্ডি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দিতাম।

তখন তিনি আমার মুখ রাখা স্থানে মুক মোবারক রাখতেন এবং চোষন করতেন। (মুসলিম)

হাদীস (৫)ঃ হযরত আয়েশা (রঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন।

হাদীস (৬)ঃ হযরত আয়েশা (রঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, মসজিদ হতে ছোট মাদুরটা আমাকে দাও। তখন আমি বললাম আমি ঋতুস্রাব গ্রস্থ, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ঋতুস্রাব তোমার হাতে নহে। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস (৭)ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত মায়মুনা (রঃ) বলেন, "রসুলুল্লাহ (ঃ) একটি চাদরে নামায পড়তেন কিছু অংশ আমার গায়ের উপর থাকত আর অপর অংশ তাঁর গায়ের উপর থাকত। অথচ তখন আমি ঋতুবর্তী থাকতাম। (বোখারী মুসলিম)

হাদীস (৮)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) বলেন-রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে-ব্যক্তি ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে অথবা কোন গনকের কাছে গমন করেছে সে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআনকে) অস্বীকার করেছে। (তিরমিযী ইবনে মাযাহ)

হাদীস (৯)ঃ রযীন (রঃ) থেকে বর্ণিত, মুয়ায বিন জাবাল (রঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমার স্ত্রী যখন ঋতুবর্তী হবে তখন তার কতটুকু হালাল! এরশাদ করলেন, নাভী থেকে উপরিভাগ, তা থেকেও বিরত থাকা উত্তম।

হাদীস (১০)ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ঋতুবর্তী অবস্থায় সঙ্গম করবে তখন অর্ধ দিনার সদকা আদায় করবে। তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন লাল হবে তখন এক দিনার আর যখন নীল হবে তখন অর্ধ দিনার সদকা দিবে। (সুনানে আরবা)

হায়েযের হিকমত

প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার দেহে সৃষ্টিগতভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু রক্ত. সৃষ্টি হয়। যাতে গর্ভাবস্থায় ঐ রক্ত শিশুর খাদ্য হিসেবে কাজে আসে এবং শিশুর দুধপান কালে ঐ রক্ত দুধে পরিণত হয়। এরূপ না হলে গর্ভকালীন কিংবা দুধপান করানোর প্রথম দিকে এ রক্ত বের হয়না। গর্ভবিহীন বা দুধবর্তী হওয়া ব্যতিরেকে শরীর থেকে যদি রক্ত বের না হয় তখন বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

হায়েযের মাসায়েল

প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার যৌনাঙ্গ পথে স্বভাবগতভাবে যে রক্ত বের হয় যা কোন রোগ ব্যাধি কিংবা শিশু সন্তান জন্ম হওয়ার কারণে হয় না সেটাকে 'হায়েয' বলে। কোন রোগের কারণে যদি রক্ত বের হয় সেটাকে 'এস্তেহাযা' বলে। সন্তান সন্ততি প্রসবের পর যে রক্ত বের হয় সেটাকে 'নিফাস' বলা হয়।

মাসয়ালাঃ হায়েযের সময়সীমা সর্বনিম্ন তিনদিন তিনরাত্রি, অর্থাৎ পূর্ণ বাহাত্তর ঘন্টার চেয়ে এক মিনিটও যদি কম হয় সেটা হায়েয নয়। হায়েযের অধিক সময়সীমা হল দশদিন দশরাত।

মাসয়ালাঃ বাহাত্তর ঘন্টার সামান্য আগেও যদি বন্ধ হয়ে যায় সেটা হায়েয নয়, বরং এস্তেহাযা। তবে সকালে সুর্য উদিত হওযার সাথে সাথে যদি শুরু হয় এবং তিনদিন

তিনরাত পূর্ণ হওয়ার পর সুর্য উদিত হওয়া মাত্রই বন্ধ হয়ে যায় তখন হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। এবং এ অবস্থায় বাহত্তর ঘন্টা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য অন্য কোন সময় শুরু হলে ঘন্টা হিসেবে গন্য করা হবে এবং চব্বিশ ঘন্টা একদিন একরাত ধরা হবে।

মাসয়ালাঃ দশদিন দশরাত থেকে কিছু অধিক সময় রক্ত বের হলো, এবং এ ধরনের যদি প্রথমবার হয়ে থাকে তাহলে দশদিন পর্যন্ত হায়েয গণ্য হবে। এবং পরেরটা এস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। যদি তার প্রথমে হায়েয এসে থাকে এবং নিয়ম যদি দশদিনের কম হয় তখন নিয়মের অতিরিক্ত যতটুকু হবে তা এস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আগে পাঁচদিনের নিয়ম ছিল পরে দশদিন হল তখন সম্পূর্ণ কালটাই হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। অথবা বারদিন হল, তখন প্রথম পাঁচদিন হায়েযের অন্তর্ভুক্ত বাকী সাতদিন এস্তেহাযার অন্তর্ভুক্ত। আর যদি এক অবস্থায় স্থির না থাকে কখনো চারদিন কখনো পাঁচদিন তখন পরবর্তী যতদিন হয় তা হায়েয হিসেবে গণ্য বাকী দিনগুলো এস্তেহাযা।

মাসয়ালাঃ সময়সীমার মধ্যে সবসময় ঋতুস্রাব জারী হওয়াটা আবশ্যক নয় যদি কোন কোন সময় হয় তাও হায়েয হিসেবে গন্য।

মাসয়ালাঃ কমপক্ষে নয় বৎসর বয়সে হায়েয শুরু হয় এবং সর্বশেষ সময়সীমা পঞ্চান্ন বছর। এ বয়সের মহিলাকে "আয়েসা" বলা হয় এবং এ বয়স কালকে "সন্নেআয়াস বলা হয়।

মাসয়ালাঃ নয় বছরের আগে এবং পঞ্চন্ন বছরের পর যে রক্ত বের হয় সেটা এস্তেহাযা হিসেবে গণ্য। অবশ্য পঞ্চান্ন বছরের পর যদি হায়েযের মত রক্ত বের হয় এবং রং যদি আগের মতই হয়ে থাকে তাহলে সেটা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

মাসয়ালাঃ গর্ভবর্তী মহিলার যে রক্ত বের হয় সেটা এস্তেহাযা। অনুরূপ শিশু জন্মাবার সময় যে রক্ত বের হয় এবং শিশু অর্ধেকের বেশী এখনো বের হয়নি, এমতাবস্থায় সেটা এস্তেহাযা হিসেবে গণ্য।

মাসয়ালাঃ দু হায়েযের মাঝখানে কমপক্ষে পনেরদিন ব্যবধান প্রয়োজন। অনুরূপভাবে নিফাস ও হায়েযের মাঝখানেও পনের দিনের ব্যবধান প্রয়োজন। তবে নিফাস শেষ হওয়ার পর, পনের দিন পূর্ণ হয়নি তখন যে রক্ত বের হয় সেটা এস্তেহাযা।

মাসয়ালাঃ মহিলার লজ্জাস্থান থেকে বের হওয়ার পরই হায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

মাসয়ালাঃ হায়েয সেই সময় থেকে গণ্য করা হবে যখন রক্ত অঙ্গ থেকে বের হয়ে আসে। যদি কোন কাপড় লাগিয়ে রাখায় যার কারণে রক্ত অঙ্গ থেকে বের হতে না পারে ভিতেরই আটকে থাকে তাহলে যতক্ষন পর্যন্ত কাপড় বের হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েযওয়ালী হিসেবে গণ্য হবে না বরং নামায পড়বে রোযা রাখবে।

মাসয়ালাঃ হায়েযের রং ছয়টি। যথাঃ কালো, লাল, সবুজ খয়েরী, কাদা ও মাটিয়ালী রং। সাদা রং এর যে লালা বের হয় সেটা হায়েয নয়।

মাসয়ালাঃ লালা বের হওয়াকালীন দশদিনের মধ্যে যদি সামান্য মলিনতা দেখা দেয় তখন সেটা হায়েয হিসেবে পরিগণিত হবে। দশদিন পরও যদি লালার মলিনতা অবশিষ্ট থাকে তাহলে নিয়মিত হায়েয ওয়ালীর জন্য নিয়মিত হায়েযের দিনগুলো হায়েয। এবং নিয়মের অতিরিক্ত দিনগুলোকে এস্তেহাযা মনে করতে হবে আর যদি হায়েয অনিয়মিত হয় অর্থাৎ কোন সময় তিনদিন কোন সময় চারদিন কোন সময় পাঁচদিন হয় তাহলে দশদিন পর্যন্ত হায়েয ধরে নিতে হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো এস্তেহাযা হিসেবে পরিগণিত হবে।

মাসয়ালাঃ যে মহিলার সারাজীবন রক্ত বের হয়নি বা বের হয়েছে কিন্তু তিনদিন থেকে কম, তাহলে সারাজীবন পবিত্রই রইলো এবং যদি একবার তিনদিন তিনরাত মাত্র রক্ত বের হলো এরপর আর কখনো বের হয়নি, তাহলে সে মাত্র তিনদিন তিনরাত্রির জন্য হায়েযওয়ালী হিসেবে গণ্য হবে বাকী সব সময়ের জন্য পবিত্র।

মাসয়ালাঃ যে মহিলার দশদিন রক্ত বের হলো, এরপর সারাবৎসর পবিত্র রইলো পুনরায় সমানভাবে রক্ত বের হওয়া জারী হইলো তখন সে সময় কালে নামায রোযার জন্য প্রতিমাসের দশদিন হায়েয মনে করবে এবং বিশদিন এস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করবে।

মাসয়ালাঃ কোন মহিলার একবার হায়েয হলো এরপর কমপক্ষে পনেরদিন পবিত্র রইলো এবং পুনরায় রক্ত সমানভাবে জারী হল আর একথাও স্মরণ নেই যে, প্রথম কয় দিন হায়েয ছিল কতদিন পবিত্র ছিল, কিন্তু একথা স্মরণ আছে যে, মাসে মাত্র একবারই হায়েয হয়েছে, এইবার যখন থেকে রক্ত শুরু হয়েছে তখন থেকে তিনদিন নামায ছেড়ে দেবে অতঃপর সাতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করবে এবং নামায পড়বে। এবং এই দশদিন স্বামীর নিকট গমন করবেনা। অতঃপর বিশদিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের সময় নতুনরূপে অজু করে নামায পড়বে। এবং ঐ উনিশ অথবা বিশ দিনের মধ্যে স্বামী তার নিকট গমন করতে পারবে এবং যার এটা স্মরণ নেই যে, রক্ত মাসে একবার বের হলো না দুবার তখন প্রথম তিনদিন নামায পড়বেনা। অতঃপর সাতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করে নামায পড়বে। অতঃপর আটদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে অজু করে নামায পড়বে, এবং শুধুমাত্র এই আটদিন পরও তিনদিন পর্যন্ত প্রতেক ওয়াক্তে অজু করে নামায পড়বে। অতঃপর সাতদিন পর্যন্ত গোসল করে নামায পড়বে। এবং আটদিন পর্যন্ত অজু করে নামায পড়বে। এ ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে। আর যদি পবিত্রতার দিন স্মরণ থাকে যেমন পনেরদিন পবিত্র ছিল এবং বাকী কোন কথা স্মরণ নেই তখন প্রথম তিনদিন নামায পড়বেনা। অতঃপর সাতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করে নামায

পড়বে অতঃপর আটদিন পর্যন্ত অজু করে নামায পড়বে এর পর পুনরায় তিনদিন অজু করে নামায পড়বে। অতঃপর চৌদ্দদিন পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করে নামায পড়বে অতঃপর একদিন প্রতিওয়াক্তে অজু করবে। এবং নামায পড়বে। অতঃপর যখন রক্ত বের হবে প্রতিওয়াক্তে গোসল করবে। যদি হায়েযের দিন স্মরণ থাকে যেমন তিনদিন হায়েয ছিল আর পবিত্রতার দিন স্মরণ না থাকে তখন পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্তে অজু করে নামায পড়বে। এর মধ্যে প্রথম পনের দিনে-তো পবিত্রতার দিন এবং পরবর্তী তিনদিন সন্দেহযুক্ত। অতঃপর সর্বদা প্রতি ওয়াক্তে গোসল করে নামায পড়বে।

মাসয়ালাঃ যে মহিলার হায়েযের প্রথম দিন স্মরণ ছিলনা। অথবা কোন তারিখ হায়েয হয়েছিল তা-ও স্মরণ ছিলনা, এমতাবস্থায় তিনদিন বা ততোধিক দিন রক্ত এসে বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর পবিত্রতার পনেরদিন পূর্ন হলনা। পুনরায় রক্ত জারী হয়ে গেল এবং সর্বদা চলতে লাগল এর হুকুম সেই মহিলার অনুরূপ যার প্রথমবার রক্ত বের হয়ে সর্বদা জারী ছিল। ঐ মহিলা দশদিন হায়েযের মধ্যে গণ্য করবে বাকী বিশদিন পবিত্রতার মধ্যে।

মাসয়ালাঃ যে মহিলার নির্ধারিত সময়সীমা নেই যেমন কখনো ছয়দিন হায়েয হয়ে থাকে কখনো সাত দিন এবং যে রক্ত বের হয় তা বন্ধই হয় না। তখন তার জন্য নামায রোযার ব্যাপারে কম সময় অর্থাৎ ছয়দিন হায়েয ধার্য করবে এবং সপ্তম দিবসে গোসল করে নামায পড়বে এবং রোযা রাখবে। কিন্তু সাতদিন পূর্ণ হওয়ার পর পুনরায় গোসল করার হুকুম বলবৎ থাকবে এবং সপ্তম দিবসে যদি ফরয রোজা রাখে তা কাযা করবে এবং ঈদ্দত অতিক্রম করা অথবা স্বামীর কাছে গমনের ব্যাপারে অধিক সময়সীমা গণ্য হবে এবং সাতদিন হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে এবং সপ্তম দিবসে স্বামীর সাথে নৈকট্য জায়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ তিনদিন তিনরাত্রি কম যদি রক্ত বের হয় অতঃপর পনেরদিন পবিত্র ছিল, পুনরায় তিনদিন তিন রাত্রির কম রক্ত বের হলো, তখন প্রথম বার ও দ্বিতীয়বার উভয়টিই হায়েযের মধ্যে গণ্য নয়। বরং উভয়টিই এস্তেহাযা হিসেবে গণ্য।

নিফাসের বর্ণনা

নিফাসের নিম্নতম সময়সীমা নির্ধারিত নেই। শিশু অর্দ্ধাংশ থেকে বেশী বের হওয়ার পর সামান্য রক্তও যদি আসে সেটা নিফাস হিসেবে গণ্য। নিফাসের উর্দ্ধতম সময়সীমা হচ্ছে চল্লিশ দিন। নিফাসের গণনা ঐ সময় থেকে শুরু হবে যখন নবজাত শিশু অর্দ্ধাংশ থেকে অধিক বের হয়ে আসে। এ বর্ণনায় যেখানে শিশুজন্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়। এর ভাবার্থ অর্দ্ধাংশ থেকে অধিক বের হওয়াটা বুঝাবে।

মাসয়ালাঃ কারো চল্লিশ দিন থেকে অধিক রক্ত বের হলো এবং যদি এর আগেও সন্তান প্রসব করেছিল এবং এটা স্মরণ নেই যে, প্রথম বার সন্তান প্রসবের সময় কতদিন রক্ত বের হয়েছিল তখন চল্লিশদিন চল্লিশ রাত্রি নিফাস হিসেবে গণ্য হবে। বাকী গুলো এস্তেহাযা। আর যার নিকট প্রথম প্রসবের পর নিফাসের মেয়াদ জানা আছে সে মেয়াদ পরিমাণ দিনকে নিফাস ধরবে। অতিরিক্ত দিনগুলো এস্তেহাযা হিসাবে গণ্য করবে। যেমন প্রথমবারের মেয়াদ ছিল ত্রিশদিন এবার হলো পয়তাল্লিশ দিন। তাহলে ত্রিশদিন নিফাস বাকী পনের দিন এস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

মাসয়ালাঃ শিশু সন্তান প্রসবের আগে যে রক্ত বের হয় সেটা নিফাস নয়, বরং এস্তেহাযা। যদিও বা শিশু সন্তান অর্ধেক বের হয়ে আসলো।

মাসয়ালাঃ পেট থেকে সন্তান কেটে বের করা হলো, অর্ধেকেরও বেশী হওয়ার পর যে রক্ত বের হয় তা নিফাস।

মাসয়ালাঃ গর্ভপাত হওয়ার আগে এবং পরে কিছু রক্ত বের হলো, এমতাবস্থায় আগের রক্তকে এস্তেহাযা পরের রক্তকে নিফাস ধরা হবে। এটা তখন বিবেচিত হবে যখন কোন অংগ গঠিত হয়। নতুবা আগেরটা হায়েয হতে পারে, তা না হলে এস্তেহাযা।

মাসয়ালাঃ গর্ভপাত হলো এবং এটা জানা নেই যে, অংগ গঠিত হল কি হলনা, এটাও জানা নেই যে, গর্ভ কতদিনের যা দ্বারা অংগ গঠিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয় জানা যাবে। অর্থাৎ একশত বিশদিন পূর্ণহলে অংগ গঠিত হওয়াটা সাব্যস্ত হয় এবং গর্ভপাতের পর রক্ত সবসময় জারী রইলো তখন তা হায়েযের হুকুমের মধ্যে গণ্য হবে। হায়েযের যে সাধারণ নিয়ম তা অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করে নামায শুরু করবে এবং নিয়ম জানা না থাকলে নয় দশদিন পর গোসল করে নামায শুরু করবে।

মাসয়ালাঃ যে মহিলার দু'জন সন্তান জময জন্ম হল। অর্থাৎ দুজনের মাঝখানের ছয় মাসের কম সময়ের ব্যবধান রয়েছে, তখন প্রথম সন্তান প্রসবের পর থেকেই নেফাস ধর্তব্য হবে। আর যদি দ্বিতীয় সন্তান চল্লিশ দিনের ভিতরে হয় এবং রক্ত আসে তাহলে প্রথম থেকে চল্লিশদিন পর্যন্ত নেফাসের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর এস্তেহাযা বা রোগ বিশেষ আর যদি চল্লিশদিন পর প্রসব হয়, তখন পরের যে রক্ত বের হয়েছে তা এস্তেহাযা, নিফাস নয়। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পরেই গোসলের বিধান আরোপিত হবে।

মাসয়ালাঃ যে মহিলার তিনজন সন্তান জন্ম হল, প্রথম এবং দ্বিতীয় সন্তানের মধ্যে ছয়মাসের কম ব্যবধান, অনুরূপভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সন্তানের মধ্যে। যদিও বা প্রথম এবং তৃতীয় সন্তানের মাঝে ছয়মাসের ব্যবধান হয়, তখনও নিফাস প্রথম থেকে ধর্তব্য। অতঃপর যদি চল্লিশ দিনের মধ্যেই এ দু'জন প্রসব করে তাহলে প্রথমটির পর থেকেই বেশীর বেশী চল্লিশদিন পর্যন্ত নিফাস, আর যদি চল্লিশ দিন পর হয় তাহলে এর পর যে রক্ত বের হয় তা এস্তেহাযা বা রোগ বিশেষ। কিন্তু এরপরও গোসলের বিধান রয়েছে।

মাসয়ালাঃ আর দু'জনের মধ্যে যদি ছয়মাস বা এর চেয়ে বেশীর ব্যবধান হয়, তাহলে দ্বিতীয়টির পরও নেফাস হিসেবে ধর্তব্য হবে।

মাসয়ালাঃ চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন সময় রক্ত বের হলোনা, তবুও সবই নিফাসের অন্তর্ভূক্ত গন্য করা হবে। যদিও বা পনের দিনের ব্যবধান হয়।

মাসয়ালাঃ হায়েযের ব্যাপারে যে হুকুম, নিফাসের রং এর ব্যাপারে ও একই হুকুম।

হায়েজ ও নিফাস সম্পর্কিত বিধানাবলী

মাসয়ালাঃ হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করা- দেখে হোক অথবা মৌখিকভাবে হোক এবং কুরআন স্পর্শ করা যদিও বা দ্রুত স্পর্শ করে অথবা আঙ্গুলের অগ্রভাগ বা শরীরের কোন অংশ দ্বারা কুরআন স্পর্শ করে এমতাবস্থায় এ স্পর্শ হারাম।

মাসয়ালাঃ কাগজের পাতায় লিখিত কোন সুরা অথবা আয়াত স্পর্শ করাও হারাম।

মাসয়ালাঃ জুযদান এর ভিতর কুরআন মজীদ থাকলে জুযদান স্পর্শ করাতে কোন ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ শিক্ষিকার যদি হায়েয নিফায হয় এক এক শব্দ নিঃশ্বাস ভেঙ্গে পড়াবে, বানান করে পড়ালে কোন অসুবিধা নেই।

মাসয়ালাঃ দোয়া কুনুত পাঠ করা এমতাবস্থায় মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ সে সময় কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্যান্য যিকির, কলেমা শরীফ, দরুদ শরীফ ইত্যাদি পড়া মাকরূহ বিহীনভাবে জায়েজ বরং মুস্তাহাব এবং অজু বা কুলি করে পড়া উত্তম এবং এমনি পড়লেও কোন ক্ষতি নেই ঐগুলোকে স্পর্শ করলেও কোন দোষ নেই।

মাসয়ালাঃ এমন মহিলার আজানের জবাব দেওয়া জায়েজ।

মাসয়ালাঃ এ ধরনের মহিলা মসজিদে গমন করা হারাম। তবে হাত বাড়িয়ে কোন বস্তু মসজিদ থেকে নেয়া জায়েজ।

মাসয়ালাঃ এমতাবস্থায় ঈদগাহের দিকে গমনে ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ খানায়ে ক্বাবায় গমন ও তাওয়াফ করা, যদিওবা হেরেমের বাইরের দিক থেকে হয় তাদের জন্য হারাম।

মাসয়ালাঃ এমতাবস্থায় রোজা রাখা এবং নামায পড়া হারাম।

মাসয়ালাঃ ঐ দু'অবস্থায় নামায মাফ। কোন ক্বাযারও প্রয়োজন নেই। অবশ্য রোজার ক্বাযা অন্য সময় আদায় করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ নামাযরত অবস্থায় হায়েয এসে গেল, অথবা সন্তান প্রসব করল, তখন ঐ নামায মাফ। অবশ্য যদি নফল নামায হয় তবে ক্বাযা করা ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ নামাযের সময় অজু করে যেন এতটুকু সময় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির দরুদ শরীফ ও অন্যান্য ওযীফায় নিয়োজিত থাকে যতটুকু সময় পর্যন্ত নামায পড়ে থাকে যেন অভ্যাসটা বজায় থাকে।

মাসয়ালাঃ ঋতুবর্তী মহিলারা তিনদিনের কম রক্ত এসে বন্ধ হয়ে গেল। তখন রোজা রাখবে এবং অজু করে নামায পড়বে। গোসলের প্রয়োজন নেই। অতঃপর যদি পনের দিনের ভিতর রক্ত আসে তখন গোসল করবে এবং নিয়মিত দিন বাদ দিয়ে বাকী দিনগুলোর নামায ক্বাযা পড়বে। আর যার রক্ত বের হওয়ার কোন নিয়ম নেই সে দশদিনের পরবর্তী নামাযগুলো ক্বাযা করবে।

মাসয়ালাঃ যে মহিলার ঋতু তিনদিন তিনরাত পর বন্ধ হয়ে গেল, নিয়মিত দিন এখনো পূর্ণ হয়নি অথবা নিফাসের রক্ত নিয়ম পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বন্দ হয়ে গেল, তখন বন্ধ হওয়ার পরই গোসল করে নামায পড়া আরম্ভ করবে। নিয়মিত দিনের অপেক্ষা করবে না।

মাসয়ালাঃ রোযার অবস্থায় হায়েয বা নিফাস শুরু হল, তখন ঐ রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, ফরজ রোজা হলে ক্বাযা করা ফরজ। নফল রোযা হলে ক্বাযা করা ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ হায়েয-নিফাস অবস্থায় সিজদায়ে শোকর ও তিলাওয়াতে সিজদা হারাম। সিজদার আয়াত শুনলে তার উপর সিজদা ওয়াজিব নয়।

মাসয়ালাঃ নিদ্রার পূর্বে পবিত্র ছিল সকালে উঠে হায়েযের চিহ্ন দেখতে পেল তখন সে সময় থেকে হায়েযের হুকুম প্রয়োগ হবে। এশার নামায না পড়ে থাকলে পবিত্র হওয়ার পর ক্বাযা ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ হায়েয নিফাসের সময় সহবাস হারাম। অবশ্য স্বামীর সাথে একসাথে বসা, শোয়া, পানাহার করা ও চুম্বন দেওয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ হায়েয থেকে পবিত্র হয়েছে তবে গোসল করার জন্য পানি ব্যবহারে সক্ষম নয়, গোসলের তায়াম্মুম করল ঐ তায়াম্মুম দ্বারা সহবাস জায়েজ হবে না। যতক্ষন না ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়বে নামায পড়ার পর পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া সত্বেও গোসল করল না, সহবাস জায়েজ হবে।

মাসয়ালাঃ সন্তান এখানো অর্ধেকের বেশী বের হয়নি নামাযের সময় চলে যাচ্ছে এবং ধারণা হচ্ছে যে, অর্ধেকের বেশী বের হওয়ার পূর্বে সময় শেষ হয়ে যাবে তখন সে সময়ের নামায যেভাবে সম্ভব পড়বে যদি দাঁড়ালো, রুকু করা, সিজদা করা, সম্ভব না হয় ইশারায় নামায পড়বে। অজু করা না গেলে তায়াম্মুম দ্বারা পড়বে যদি না পড়ে গুনাহগান হবে। তাওবা করবে এবং পবিত্র হওয়ার পর ক্বাযা পড়বে।

ইস্তেহাযার বর্ণনা

হাদীস-উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা) বলেন, হযরত ফাতেমা আবু হুবাইশ (রাঃ), রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং আরজ করলেন, এয়া রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমি এক রজঃস্রাবের রোগিনী মহিলা। আমি রজঃস্রাব হতে পবিত্র হইনা। আমি কি নামায

ছেড়ে দিব? উত্তরে হুযুর এরশাদ করলেন না, এটা একটি রগ বা শিরার রক্ত। ঋতুস্রাবের রক্ত নয়। যখন তোমার ঋতুস্রাব দেখা দেবে তুমি নামায ত্যাগ করবে, যখন স্রাবের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবে তখন তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে অতঃপর নামায পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস- হযরত ওরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ফাতেমা সর্বদা ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হতেন, অতএব তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন যদি তা কালো রক্ত হয় যা সহজে চেনা যায়, যখন এরূপ রক্ত হবে নামায হতে বিরত থাকবে যখন অন্যরূপ রক্ত হবে তখন (প্রত্যেক ওয়াক্তে) অজু করে নামায পড়তে থাকবে কেননা এটা রোগ বিশেষের রক্ত। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

হাদীস- হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসুলাল্লাহ (দঃ) এর যামানায় এক মহিলার (ইস্তেহাযার কারণে) রক্ত ঝরত। তখন উক্ত মহিলার জন্য উম্মে সালামা নবী করীম (দঃ) এর কাছে ফতোয়া তলব করলেন। জবাবে তিনি বললেন, তার এই ব্যাধি হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মাসে তার যে কয়দিন ঋতুস্রাব হতো সেদিন ও রাতগুলোর সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করবে। এবং প্রত্যেক মাসের ততদিন পরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে আর যখন সেই পরিমাণ দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন সে যেন গোসল করে এবং কাপড় খন্ড দ্বারা লেংটি বাঁধে তৎপর নামায পড়ে। (মালেক আবু দাউদ, দারেমী)

ইস্তেহাযার আহকাম

মাসয়ালাঃ ইস্তেহাযার সময় নামায রোজা কোনটাই মাফ নয় এবং এ প্রকার মহিলার সাথে সহবাস করাও হারাম নয়।

মাসয়ালাঃ ইস্তেহাযা যদি এ রকম পর্যায়ে পৌঁছে যাতে এতটুকু অবকাশ পাওয়া যায় না যে, অজু করে ফরজ নামায আদায় করবে তাহলে নামাযের পূর্ণ একটি ওয়াক্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরকম অবস্থায় অতিবাহিত হলে তাকে মাযুর বা অপারগ বলা হবে। সে সময় এক অজু দ্বারা যত নামাজ ইচ্ছে পড়তে পারবে রক্ত আসার দ্বারা এ পূর্ণ এক ওয়াক্তের মধ্যে অজু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ যদি কাপড় ইত্যাদি দ্বারা অজু করে নামায আদায় করে নেয়া পর্যন্ত-রক্ত প্রতিরোধ করা যায় তখন ওজর প্রমাণিত হবে না।

মাসয়ালাঃ প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যার এমন কোন রোগ থাকে যে, নামাযের পূর্ণ একটি ওয়াক্ত এভাবে অতিবাহিত হলো যে, অজু করে ফরজ নামায আদায় করতে পারলো না। সে 'মাযুর' অর্থাৎ পূর্ণ ওয়াক্তে এতটুকু সময়ও রোগ মুক্ত হলো না যে, অজু করে ফরজ নামায আদায় করবে। মাযুরের ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে যে, ওয়াক্তের মধ্যে অজু করে নিবে এবং শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত যত নামায ইচ্ছে সেই অজুতে-পড়তে পারবে।

সেই রোগের দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে না, যেমন ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করা, বাতাস বের হওয়া বা আঘাত প্রাপ্ত চোখ থেকে পানি পড়া, ফোঁড়া বা ক্ষত থেকে অনবরত লালা বের হওয়া, বা কান, নাভী বা স্তন থেকে পানি বের হওয়া। এসব রোগ অজু ভঙ্গ কারী, এসব রোগে যদি পূর্ণ ওয়াক্তটা এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, কয়েকবার চেষ্টা করেও পবিত্রতা সহকারে নামায পড়া গেল না তাহলে ওজর প্রমাণিত হয়ে গেল।

মাসয়ালাঃ যখন ওজর প্রমাণিত হল, তখন যতদিন পর্যন্ত প্রতি নামাযের ওয়াক্তে একবারও যদি সেই অজুহাতটা পাওয়া যায় তাহলে মাযুর বা অপারগ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কোন মহিলার নামাযের একটি ওয়াক্ত এমনভাবে অতিবাহিত হলো যে, ইস্তেহাযার কারণে তার এতটুকু সময়ের অবকাশ মিললনা যাতে পবিত্রতা অর্জন করে ফরজ নামায পড়ে নেয়। আর পরবর্তী ওয়াক্তে অজু করে নামায পড়ে নেয়ার মত অবকাশ পেল কিন্তু এ পরবর্তী নামাযের সময়ও এক আধবার রক্ত দেখা গেল তখনও সে মাযুর হিসেবে গণ্য হবে।

মাসয়ালাঃ নামাযের কিছু সময় এমন অবস্থায় অতিবাহিত হল, যে সময় ওজর ছিল না এবং নামায পড়লনা, এখন পড়ার ইচ্ছে করলো তখন ইস্তেহাযা বা রোগের কারণে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় অজু করল, অজুর পর রক্ত বন্ধ হল, ঐ অজু দ্বারা নামায পড়ল এবং ঐ ওয়াক্তের পর দ্বিতীয় যে ওয়াক্ত আসল সে সময়টাও পূর্ণ অতিবাহিত হয়ে গেল রক্ত বের হলনা, তখন প্রথম নামায পুনরায় পড়বে। এমনিভাবে যদি নামায বন্ধ হয় এবং এরপর দ্বিতীয় নামায পর্যন্ত মোটেও বের হলনা, তখনও পুনরায় নামায পড়ে নিবে।

মাসয়ালাঃ ফরজ নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মাযুরের অজু ভঙ্গ হয়ে যায় যেমন কোন মাযুর আছরের সময় অজু করেছিল সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তার অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ সূর্য উঠার পর অজু করলো তাহলে জোহরের ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা তখন পর্যন্ত কোন ফরজ নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়নি। মাযুর -এর বিধান

মাসয়ালাঃ অজু করার সময় মাযুর হওয়ার মত কোন কারণ পাওয়া গেল না এবং অজুর পরও পাওয়া গেল না এমনকি সম্পূর্ণ সময়টা ওজর শুন্য ছিল, তখন সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অজু ভঙ্গ হয়নি। এভাবে যদি অজুর পূর্বে পাওয়া যায়, কিন্তু অজুর পর বাকী সময়ে পাওয়া যায়নি এরপর দ্বিতীয় ওয়াক্তেও পাওয়া যায়নি তখন সময় অতিবাহিত হলে অজু ভঙ্গ হবে না।

মাসয়ালাঃ যদি সে সময় অজুর পূর্বে এবং অজুর পরবর্তী সময়েও এমনসব কারণ পাওয়া গেল, অথবা অজুর সময় পাওয়া গেল এবং অজুর পর সে সময় পাওয়া গেল না, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পাওয়া গেল তখন নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে যদিও হাদছ পাওয়া না যায়।

মাসয়ালাঃ মাযুর হওয়ার কারণে মাযুরের অজু ভঙ্গ হবে না। তবে অজু ভঙ্গের অন্য কোন কারণ যদি পাওয়া যায় তখন অজু ভঙ্গ হবে। যেমন ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বের হওয়া বাতাস বের হওয়া ইত্যাদি।

মাসয়ালাঃ মাযুর হাদছ বা অপবিত্র হওয়ার পর অজু করলো অজু করার সময় মাযুর হওয়ার কোন বস্তু পাওয়া যায়নি অজুর পর পাওয়া গেল তখন অজু ভঙ্গ হবে। যেমন ইস্তেহাযা ওয়ালী মহিলা পায়খানা প্রস্রাবের পর অজু করল এবং অজু করার সময় রক্ত বন্ধ ছিল অজুর পর বের হল তখন অজু ভেঙ্গে যাবে।

মাসয়ালাঃ ইস্তেহাযা ওয়ালী মহিলা যদি গোসল করে জোহরের নামায শেষ ওয়াক্তে এবং এশার অজু করে প্রথম ওয়াক্তে পড়ে এবং ফজরের নামাযও গোসল করে পড়া উত্তম হবে। বরঞ্চ তা হবে হাদিছে নির্দেশিত বর্ণনার প্রতি আদব বা সম্মানের নামান্তর। তার সতর্কতার বরকতে তার রোগ মুক্তির ব্যাপারে উপকারিতা পৌঁছবে।

মাসয়ালাঃ কোন আঘাত বা ক্ষতের কারণে যদি আদ্রতা বা পানি বের হয় যা প্রবাহিত নয় তার কারণে না অজু ভঙ্গ হবে। না মাযুর হবে, না ঐ আদ্রতা নাপাক হবে।

অপবিত্রতার বর্ণনা

হাদীস (১)ঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, একদিন এক মহিলা রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলো, এয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! বলুন আমাদের মধ্যে কোন মহিলার কাপড়ে যদি ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে তবে সে কি করবে? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমাদের কারো কাপড়ে স্রাবের রক্ত লাগে (আর তা শুকিয়ে যায়) প্রথমে হাতের আঙ্গুল দ্বারা চটকাবে, অতঃপর পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর তা দ্বারা নামায পড়বে- ভিজা হোক কিংবা শুকনা হোক।(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস (২)ঃ হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়ামার (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশার কাছে কাপড়ে যে বীর্য লেগে থাকে, তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাবে বললেন, আমি এটা রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় হতে ধুইতাম, অতঃপর তিনি নামাযে বের হতেন, অথচ ধোয়ার চিহ্ন কাপড়ে থাকত। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীস (৩)ঃ হযরত আসওয়াদ ও হাম্মাম (তাবেয়ী দ্বয়) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় হতে শুক্র রগড়ে ফেলতাম (মুসলিম)

হাদীস (৪)ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন যখন কাঁচা চামড়া দাবাগত করা হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম)

হাদীস (৫)ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হতে আদেশ করেছেন। যখন তা দাবাগত করা হয় (মালেক ও আবু দাউদ)

হাদীস (৬)ঃ হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারব (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করতে এবং এর উপর আরোহন করতে বা চড়তে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

হাদীস (৭)ঃ হযরত আবুল মালীহ ইবনে উমামাহ তার পিতার কাছ হতে এবং তাঁর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (আহমদ আবুদাউদ ও নাসায়ী) আর তিরমিযী ও দারেমী বৃদ্ধি করেছেন আন্‌তুফরাশা বা বিছাইতে। (অর্থাৎ বিছানারূপে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।)

নাপাকী সম্পর্কিত বিধান

নাপাক দু'প্রকার। প্রথম প্রকার যার হুকুম কঠোর তাকে 'নাজাসাতে গলীজা' বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো, যার হুকুম হালকা, তাকে 'নাজাসাতে খফীফা' বলা হয়।

মাসয়ালাঃ নাজাসতে গালীজার হুকুম এইযে, যদি কাপড়ে বা শরীরে এক দিরহামের অধিক পরিমাণ নাপাক লেগে যায় তখন তা পবিত্র করে নেয়া ফরজ। পাক করা ব্যতীত নামায পড়ে নিলে নামায হবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে নেয় গুনাহগার হবে আর যদি হালকা জেনে, গুরুত্বহীন মনে করে কুফরী হবে।

নাপাক যদি দিরহামের বরাবর হয় তখন পাক করা ওয়াজিব, পাক করা বিহীন নামায পড়লে মাকরূহ তাহরিমী হবে। এরূপ নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব ইচ্ছাকৃত হলে গুনাহগার হবে। আর যদি এক দিরহামের চেয়ে কম পরিমাণ হয় তখন পাক করা সুন্নত। পাক বিহীন নামায হবে কিন্তু সুন্নাতের খেলাফ হবে এবং তা পুনরায় পড়া উত্তম।

মাসয়ালাঃ অপবিত্র তৈল কাপড়ে পতিত হলো, তখন দিরহাম পরিমাণ ছিলনা অতঃপর সম্প্রসারিত হয়ে দিরহাম পরিমাণ হয়ে গেল। এ নিয়ে ওলামাদের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে পাক করা ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ নাজাসাতে খফীফার হুকুম হলো এই যে, কাপড়ের যে অংশে অথবা শরীরের যে অঙ্গে লাগল, তা যদি চতুর্থাংশের কম হয় মার্জনীয় তা দ্বারা নামায হয়ে যাবে। আর যদি পূর্ন চতুর্থাংশ হয় ধৌত করা ছাড়া নামায হবে না।

মাসয়ালাঃ মানুষের শরীর থেকেএমন বস্তু বের হলো, যা দ্বারা গোসল বা অজু ওয়াজিব তাকে নাজাসাতে খফীফা বলে। যেমন পায়খানা, প্রস্রাব, প্রবাহমান রক্ত, পূঁজ, মুখভরে বমি হওয়া, হায়েজ, নিফাস, ইস্তেহাযার রক্ত, মনী, মজী, অদী।

মাসয়ালাঃ আঘাত প্রাপ্ত চক্ষু থেকে নির্গত পানি নাজাসাতে গলীজা, অনুরূপভাবে নাভী অথবা স্তন থেকে ব্যাথার সাথে নির্গত পানি নাজাসাতে গলীজার অন্তর্ভুক্ত।

মাসয়ালাঃ কফের আদ্র পানি নাক অথবা মুখ থেকে নির্গত হলে নাপাক হবে না যদিও অসুস্থতার কারণে হয়।

মাসয়ালাঃ দুগ্ধ পানকারী ছেলে মেয়ের প্রস্রাব নাজাসাতে গলীজা। দুগ্ধ পানকারী ছেলে মেয়ের প্রস্রাব পাক বলে যে উক্তি সর্ব সাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ তা একেবারেই ভূল।

মাসয়ালাঃ দুগ্ধ (পোষ্য) শিশু যদি মুখ ভরে দুধ ফেলে দেয় তা নাজাসাতে গলীজা।

মাসয়ালাঃ স্থলচর প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত, মৃত প্রাণীর মাংস এবং চর্বি যদি শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় জবেহ করা ছাড়া মারা যায় তবে তা মৃত প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। যদিও বা জবেহ করা হয়। যেমন অগ্নিপুজক, প্রতীমা পুজক,বা ধর্মত্যাগীর জবেহকৃত পশু যদিও তা হালাল প্রাণী গরু, ছাগল ইত্যাদি, জবেহ করলে তার হাড়, মাংস সব নাপাক। হারাম প্রাণী যদি শরীয়া পন্থায় জবেহ করে তার মাংস পবিত্র, যদিও ভক্ষন করা হারাম।

মাসয়ালাঃ হাতীর শুঁড়ের লালা, এবং বাঘ, কুকুর, চিতা, ও অন্যান্য চতুস্পদ প্রাণীর লালা নাজাসাতে গলীজা।

মাসয়ালাঃ মাংস, তিলি, কলিজায় যে রক্ত অবশিষ্ঠ থাকে তা পাক। প্রবাহমান রক্তে যদি মিশে যায় নাপাক। ধৌত করা বিহীন পাক হবে না।

মাসয়ালাঃ যে শিশু মৃত জন্ম নিল, তাকে কোলে নিয়ে নামায পড়লো, যদিও তাকে গোসল দিয়ে নিল, নামায হবে না। যদি জীবিত জন্ম হয়ে মারা যায়, গোসল ছাড়া কোলে নিয়ে নামায পড়লো, তখনও নামায হবে না। হ্যাঁ যদি গোসল দিয়ে কোলে নেয় নামায হবে কিন্তু খেলাফে মুস্তাহাব হবে। এ বিধান তখন প্রযোজ্য যখন মুসলমানের শিশু সন্তান হয়, যদি কাফির ব্যক্তির মৃত শিশুসন্তান হয়, তখন কোন অবস্থায় নামায হবে না। গোসল দিয়ে হউক কিংবা গোসল ছাড়া হউক।

মাসয়ালাঃ মাছ এবং পানির অন্যান্য প্রাণীরা, ছারপোকা ও মাছির রক্ত আর খচ্চর ও গাধার লালা এবং ঘাম পবিত্র।

মাসয়ালাঃ নামায পড়ে নিল, পকেটে কাঁচের শিশী ছিল শিশির মধ্যে প্রস্রাব বা রক্ত অথবা মদ জাতীয় বস্তু ছিল এ অবস্থায় নামায হবে না। আর যদি পকেটে ডিম তাকে তা যদি নীলবর্ণও ধারণ করে নামায হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কটনের কাপড়ের ভিতর যদি ইঁদুর প্রবেশ করে শুকায়ে কাপড়ের সাথে মিশে যায় এবং তাতে যদি ছিদ্র হয়, এমন কাপড় দ্বারা নামায পড়ে থাকলে তিনদিন তিনরাতের নামায পুনরায় পড়বে, যদি ছিদ্র না হয় তখন যত নামায ঐ কাপড় দ্বারা পড়েছে ঐ সব নামায পুনরায় পড়বে।

মাসয়ালাঃ কোন কাপড় বা শরীরের কয়েক স্থানে যদি নাজাসাতে গলীজা বা শক্ত নাপাক লাগে কিন্তু কোন স্থানে দিরহাম পরিমাণ নয় কিন্তু সব মিলিয়ে দিরহাম পরিমাণ হবে। তখন তা দিরহাম পরিমাণ মনে করে হুকুম প্রয়োগ করবে।

মাসয়ালাঃ হারাম প্রাণী সমূহের দুর্ব অপবিত্র, অবশ্য ঘোড়ার দুর্ব পবিত্র কিন্তু পান করা জায়েজ নয়।

মাসয়ালাঃ ভিজানো পা নাপাক ভুমিতে কিংবা বিছানার উপর রাখলে নাপাক হবে না। যদিও পায়ের অদ্রতা মাটির উপর দাবিয়ে স্পর্শ হয়। তবে ভুমি বা বিছানা যদি এতটুকু ভিজা হয় যার অদ্রতা পায়ে পৌঁছলো তখন পা নাপাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ ভিজানো নাপাক ভুমি বা নাপাক বিছানার উপর শুকনা পা রাখলো, এবং পায়ে অদ্রতা পৌঁছল পা নাপাক হয়ে যাবে। তবে যদি বন্যা হয় এ হুকুম প্রাযোজ্য নয়।

মাসয়ালাঃ অপবিত্র কাপড় পরিধান করে অথবা নাপাক বিছানার উপর নিদ্রাগেল এবং ঘাম আসলো নির্গত ঘাম দ্বারা যদি অপবিত্র স্থান ভিজে যায় অতঃপর তা হতে শরীর ভিজে গেল, তখন নাপাক হয়ে যাবে নতুবা হবেনা।

মাসয়ালাঃ রাস্তার আবর্জনা পাক, যতক্ষণ না অপবিত্র হওয়াটা অবগত হওয়া না যায়, যদি পায়ে অথবা কাপড়ে লাগে এবং ধৌত করা ছাড়া নামায পড়ে, নামায হয়ে যাবে। কিন্তু ধৌত করা উত্তম।

মাসয়ালাঃ পায়খানা প্রস্রাবের পর ঢিলা দ্বার ইস্তিঞ্জা করলো, অতঃপর সেফ্‌ন থেকে ঘাম রেব হয়ে কাপড় বা শরীরে লাগলো তখন শরীর বা কাপড় নাপাক হবে না।

মাসয়ালাঃ পবিত্র মাটিতে নাপাক পানি মিশ্রিত করলে অপবিত্র হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ শরীর বা কাপড়ে যদি কুকুরের স্পর্শ হয়, যদিও বা, কুকুরের শরীর ভিজা হয়। শরীর বা কাপড় পবিত্র থাকবে। তবে কুকুরের শরীরে যদি নাপাক থাকে তখন অন্য কথা, অথবা যদি তার লালা লাগে, তখন নাপাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ মহিলার প্রস্রাবের স্থান থেকে যে অদ্রতা বের হয় তা পাক। কাপড় বা শরীরে লাগলে ধৌত করা জরুরী নয়, তবে ধৌত করা উত্তম।

মাসয়ালাঃ সড়কে পানি ছিটকানো হচ্ছে, ছিঠকানো পানি যদি কাপড়ে এসে পড়ে কাপড় অপবিত্র হবে না। তবে ধুয়ে নেয়া উত্তম।

অপবিত্র বস্তু পবিত্র করার নিয়ম

মাসয়ালাঃ এমন সব বস্তু সমূহ, যেগুলো স্বয়ং নাপাক যাকে নাজাসত বলা হয়, যেমন মদ অথবা এমন সব গাড় বস্তু যেগুলো যতক্ষন পর্যন্ত স্বীয় আসলরূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে অন্য কিছু হয়ে না যাবে ততক্ষন পর্যন্ত পবিত্র হবে না। মদ যতক্ষণ পর্যন্ত মদ হিসাবে থাকবে ততক্ষন নাপাকই থাকবে। তবে যদি সিরকা হয়ে যায় তখন পাক।

মাসয়ালাঃ মদ ক্রয় করা বিক্রয় করা বহন করা সংরেক্ষণ করা সবই হারাম। যদিও সিরকা করার নিয়্যতে হয়।

মাসয়ালাঃ যে সব বস্তু স্বয়ং অপবিত্র নয় বরং কোন অপবিত্র বস্তুর সাথে স্পর্শ হওয়ায় অপবিত্র হয়েছে তা পাক করার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। পানি এবং প্রত্যেক স্বচ্ছ প্রবাহমান বস্তুর দ্বারা যা দ্বারা নাপাক দুরীভূত হয়ে যায়, তা দিয়ে ধৌত করে নাপাক বস্তু পাক করা যায়। যেমন সিরকা এবং গোলাপ দ্বারা নাজাসাত দুর করা যায়। সুতরাং শরীর বা কাপড় তা দিয়ে ধৌত করে পাক করা যায়। বিনা প্রয়োজনে সিরকা এবং গোলাপ দ্বারা পবিত্র করা নাজায়েজ।

মাসয়ালাঃ ব্যবহৃত পানি এবং চা দ্বারা ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়।

মাসয়ালাঃ মদের মধ্যে ইঁদুর পতিত হবার পর এবং ফুলে ফেটে গেলে সিরকা হওয়ার পরও পাক হবেনা। পতিত হওয়ার পর যদি ফুলে ফেটে না যায় তখন সিরকা হবার পূর্বে বাহির করে ফেলে দিলে তারপর সিরকা হলে তখন পাক হবে আর যদি সিরকা হবার পর বের করে ফেলে দেয় তখন সিরকাও নাপাক হবে।

মাসয়ালাঃ মদের মধ্যে প্রস্রাবের ফোটা পতিত হলে অথবা কুকুর মুখ দিলে অথবা হঠাৎ সিরা মিশ্রিত করে দিলে সিরকা হবার পরও হারাম ও অপবিত্র হবে।

মাসয়ালাঃ অপবিত্রতা যদি আকৃতি সম্পন্ন হয় যেমন, পায়খানা, গোবর, রক্ত ইত্যাদি তখন ধৌত করার ক্ষেত্রে গণনা করা শর্ত নয়, বরং তা দূর করাই জরুরী। যদি একবারে দুর হয় তখন একবার ধৌত করলেই পাক হয়ে যাবে। যদি চারবারে দূর হয়, তখন চার পাঁচবার ধৌত করতে হবে। তবে তিনবারের কমে যদি নাজাসত দুর হয়ে যায়, তথাপি তিনবার পূর্ণ করা মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ যদি নাজাসত দূর হয়ে যায়, কিন্তু তার চিহ্ন রং বা গন্ধ যদি বাকী থাকে তাও দুর করা আবশ্যক। নাপাকের চিহ্ন দূর করা যদি কষ্টকর হয় তখন নাপাকীর চিহ্ন দূর করা জরুরী নয়। তিনবার ধৌত করে নিলে পবিত্র হয়ে যাবে। সাবান, গরম পানি ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করারা প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ কাপড় অথবা হাতে অপবিত্র রং লেগেছে নাপাক মেহেদী দিয়েছে এমন হলে তখন এত পরিমাণ ধৌত করবে, যতক্ষন না হাত হতে পরিষ্কার পানি পতিত হয়, তখন পাক হয়ে যাবে যদিও কাপড়ের বা হাতে রং বাকী থাকে।

মাসয়ালাঃ থুথুর দ্বারা যদি নাজাসত দুরীভূত হয়, তা দ্বারাও পাক হয়ে যায় যেমন দুগ্ধ পোষ্য শিশু দুধ পান করে স্তনে বমি করলো, পুনরায় কয়েক বার দুধ পান করার দ্বারা বমির নিশানা চিহ্ন রইলো না, তাহলে স্তন পাক হয়ে গেল।

মাসয়ালাঃ জাফরান বা অন্য কোন রং কাপড় রঙীন করার জন্য পানি মিশানো হলো, এমতাবস্থায় পানিতে কোন শিশু প্রস্রাব করে দিল বা অন্য কোন নাজাসত পতিত হলো তাহলে যে পানি দিয়ে কাপড় রঙানো হলে তিনবার ধুইয়ে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কাপড় বা শরীরে নাপাক তৈল লেগে থাকলে তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যাবে, যদিও বা তৈলের তৈলাক্ততা বাকী থাকে। সাবান বা গরম পানি দ্বারা ধোয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মৃতের চর্বি লাগলে এর তৈলাক্ততা দুরীভূত না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র হবে না।

মাসয়ালাঃ নাজাসত যদি পাতলা হয়, তাহলে তিনবার ধৌত করলে এবং তিনবার ভালভাবে মোচড়ালে পবিত্র হয়ে যাবে, ভালমতে মোচড়ানোর অর্থ হলো প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে এমনভাবে মোচড়াবে যেন পুনরায় মোচড়ালে কোন পানির ফোটা পতিত না হয়। যদি কাপড়ের দিকে তাকিয়ে ভালমতে না মোচড়ায় পবিত্র হবে না।

মাসয়ালাঃ ধৌতকারী ভালভাবে মোচাড়ানোর পরও এমন রয়ে গেল যে, যদি তার চেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি মোচড়ালে এক দু ফোটা বের হতে পারে, তখন প্রথম ব্যক্তির বেলায় পাক, দ্বিতীয় ব্যক্তির বেলায় নাপাক, দ্বিতীয় জনের শক্তিপ্রথম জনের বেলায় প্রযোজ্য নয়। অবশ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি ধৌতকালে প্রথম ব্যক্তির ন্যায় মোচড়ালে পবিত্র হবে না।

মাসয়ালাঃ প্রথম ও দ্বিতীয়বার মোচাড়ানোর পর হাত পবিত্র করে নেয়া উত্তম এবং তৃতীয়বার মোচড়ালোর দ্বারা কাপড় ও হাত উভয়টা পবিত্র হয়ে গেল। তবে যে কাপড় এতটুকু ভিজা রয়ে গেল সে মোচড়ালে এক আধ ফোটা বের হয়, তাহলে কাপড় ও হাত উভয়টা নাপাক।

মাসয়ালাঃ প্রথম বার ও দ্বিতীয়বার হাত পাক করলো না, এবং এর ভিজা থেকে কাপড়ের পাক অংশটা ভিজে গেল, তখন সেটাও নাপাক হয়ে যাবে। পুনরায় প্রথমবার মোচড়ানোর পরে যদি ভিজে যায় তখন সেটাকে দুবার ধুয়ে নেবে। যদি দ্বিতীয়বার মোচড়ানেরা পর হাতের ভিজা থেকে ভিজে যায় তখন একবার ধুয়ে নেবে। অনুরূপ ভাবে যদি একবার মোচড়ানো কাপড়ের ভিজা দ্বারা কোন পবিত্র কাপড় ভিজে যায় তখন সেটা দুবার ধৌত করতে হবে। আর যদি দ্বিতীয়বার মোছড়ানো নাপাক কাপড়ের ভিজা দ্বারা পাক কাপড় ভিজে যায় তখন একবার ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার হাত পাক করলোনা এবং এর ভিজা থেকে কাপড়ের পাক অংশটা ভিজে গেল, তখন সেটাও নাপাক হয়ে যাবে। পুনরায় প্রথমবার মোচড়ানোর পর যদি ভিজে যায় তখন সেটাকে দুবার ধুয়ে নেবে। দ্বিতীয়বার মোচড়ানোর পর হাতের ভিজা থেকে ভিজে যায় তখস একবার ধুয়ে নেবে। অনুরূপভাবে যদি একবার মোচড়ানো কাপড়ের ভিজা দ্বারা কোন পবিত্র কাপড় ভিজে যায় তখন সেটা দুবার ধৌত করতে হবে। আর যদি দ্বিতীয়বার মোছড়ানো নাপাক কাপড়ের ভিজা দ্বারা পাক কাপড় ভিজে যায় তখন একবার ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ কাপড় তিনবার ধৌত করার পর প্রত্যেকবার ভালভাবে মোচড়ানো হয়েছে এবং এরপর মোছড়ানোর দ্বারা কোন পানি নির্গত হয়নি, কিন্তু পরে যখন কাপড় টাঙিয়ে দেয়া হলো, তখন পানি ফোটা ফোটা নির্গত হতে লাগলো, তখন সে পানি পাক। আর যদি কাপড় ভালমতে মোচড়ানো না হয়, তখন সেই পানি নাপাক বা অপবিত্র।

মাসয়ালাঃ দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান ও কন্যা সন্তানদের একই হুকুম, তাদের প্রস্রাব যদি কাপড়ে কিংবা শরীরে লাগে, কাপড় বা শরীর তিনবার ধৌত করতে হবে। তিনবার ধৌত করলো ও মোচড়ালো পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ যে বস্তু মোচড়ানোর উপযোগী নয়, যেমন মাদুর ও বরতন ইত্যাদি তা ধুয়ে রেখে দিন। যাতে পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যায়, এভাবে আরো দুবার ধুইবেন। তৃতীয়বার যখন পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যাবে তখন তা পাক হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রতিবারের পর শুকানো জরুরী নয়। এমনিভাবে পাতলার কারনে যে কাপড় মোচড়ানোর উপযোগী নয়, সেই কাপড়কেও এভাবে পাক করে নেবে।

মাসয়ালাঃ যদি এমন জিনিসপত্র হয়, যেগুলো নাজাসত চোষন করতে পারে না, যেমন কাঁচের বরতন বা পাত্র, মাটির ব্যবহৃত পুরানো পাত্র, লৌহা, তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতব নির্মিত জিনিষ-এ সব জিনিষকে পবিত্র করার জন্য তিনবার ধুয়ে নিলেই যথেষ্ঠ। এবং পানি টপকানো বন্দ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করারও কোন প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ নাপাক বরতন, মাটি দ্বারা মেঝে নেয়া উত্তম।

মাসয়ালাঃ পরিশোধিত চামড়া নাপাক হয়ে গেল তখন মোচড়ানো গেলে ধৌত করার পর মোচড়াবে, অন্যথায় তিনবার ধৌত করবে, এবং প্রত্যেকবার পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময় অপেক্ষা করবে।

মাসয়ালাঃ কাপড়ের কোন অংশ নাপাক হয়ে গেলো এবং কোন অংশ নাপাক হলো না, তা যদি জানা না থাকে সম্পূর্ণটাই ধুয়ে নেবে, আর যদি জানা থাকে, যেমন আস্তীন অথবা কলারে নাপাক লেগেছে, কিন্তু এটা জানা নেই যে, কোন অংশে নাপাকী লেগেছে তখন আস্তীন বা কলার ধৌত করাই সম্পূর্ণ কাপড় ধৌত করা। আর যদি

অনুমান করে তার কোন অংশ ধুয়ে নেয় তখনও পাক হয়ে যাবে। আর যে চিন্তাবিহীন কোন অংশ ধুয়ে নিল তখনও পাক হবে। কিন্তু এমতাবস্থায় যদি কয়েক রাকাত নামায আদায় করার পর অবগত হলো অপবিত্র অংশ ধোয়া হলনা তখন পুনরায় ধুয়ে নেবে, এবং নামায সমূহ পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ লোহার জিনিষ যেমন চুরি, চাকু, তলোয়ার ইত্যাদি যেগুলোতে কোন মরিচা থাকেনা, কোন কারুকার্য থাকেনা, যদি নাপাক হয়ে যায়, তাহলে ভালমতে মুছে ফেললে পাক হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে নাপাকী গাঢ় হোক কিংবা পাতলা হোক তাতে পার্থক্য নেই, অনুরূপ চান্দি, সোনা, পিতল, গিল্টি, আর সব রকমের ধাতব দ্রব্যাদি মুছে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে। তবে কারুকার্য না হওয়া শর্ত। যদি কারুকার্য করা হয়, বা লোহায় মরিচা আসে তখন ধৌত করা প্রয়োজন মোছার দ্বারা পবিত্র হবে না।

মাসয়ালাঃ আয়না এবং গ্লাস জাতীয় সকল সামগ্রী চিনির বরতন, মাটির তৈলাক্ত বরতন, অথবা পালিশ করা কাট। মোট কথা ঐ সব বস্তু সমূহ যাতে কোন খুঁত নেই, কাপড় অথবা পাতা দ্বারা লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ বীর্য কাপড়ে লেগে শুকায়ে গেলো, তখন ঘসে ঝাড়া দিলে এবং পরিষ্কার করে নিলে কাপড় পাক হয়ে যাবে। যদিও ঘষার পর তার লক্ষণ কাপড়ে বাকী থাকে। অত্র মাসয়ালায় নরনারী, মানুষ, প্রাণী, সুস্থ, অসুস্থ বহুমুত্র রোগী, সকলের বীর্যের একই হুকুম।

মাসয়ালাঃ শরীরেও যদি বীর্য লেগে থাকে, উপরোক্ত পদ্ধতিতে পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ প্রস্রাব করে পবিত্রতা অর্জন করলোনা, না পানি দিয়ে, না ঢিলা দিয়ে এবং বীর্য এমন স্থান দিয়ে অতিক্রম করলো যেখানে প্রস্রাব লেগেছে তখন তা ঘষে নিলে পাক হবে না, বরং ধৌত করা জরুরী।

মাসয়ালাঃ বীর্য কাপড়ে লেগেছে এখনো আদ্র। ধৌত করলে পাক হবে, ঘষে নিয়ে যথেষ্ঠ হবে না।

মাসয়ালাঃ পাথর যদি এরূপ হয় যা জমিন থেকে পৃথক করা যায় না, তাতে যদি নাপাক লাগে, শুকানোর দ্বারা পাক হয়ে যাবে, ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ নাপাক জমিন যদি শুকিয়ে যায় নাপাকীর লক্ষণ যথা রং গন্ধ যদি দূর হয়ে যায় পাক হয়ে যাবে। বাতাসের দ্বারা শুকনা হোক কিংবা রৌদ্রের তাপে বা আগুনের দ্বারা হোক অবশ্যই তা থেকে তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। কিন্তু তার উপর নামায পড়া যাবে।

মাসয়ালাঃ যে বস্তু জমিনের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং নাপাক হয়ে গিয়েছিল, শুকানোর পর যখন পৃথক করা হয় তখন পবিত্র হবে।

মাসয়ালাঃ নাপাক মাটি দ্বারা পাত্র নির্মাণ করল, যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁচা থাকবে ততক্ষন নাপাক থাকবে। আগুনে পোড়ানো বা শুকানোর পর পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ যে বস্তু শুকানো দ্বারা বা ঘষার দ্বারা পাক হয়ে গেছে ঐ বস্তু যদি পুনরায় ভিজে যায় নাপাক হবে না।

মাসয়ালাঃ শুকর ব্যতীত প্রত্যেক প্রাণী হালাল হোক কিংবা হারাম হোক জবেহ করার উপযোগী হয়ে থাকলে এবং বিছমিল্লাহ বলে জবেহ করা হলে এর মাংস ও চামড়া পাক। নামাজীর কাছে যদি সেই মাংস থাকে বা সেই চামড়ার উপর যদি নামায পড়ে তাহলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম ও পশু জবেহ করার কারনে হালাল হবেনা বরং হারাম হারামই থাকবে।

শুকর ব্যতীত প্রত্যেক মৃত প্রাণীর চামড়া শুকানোর দ্বারা পাক হয়ে যাবে, তা কোন ঔষধ কিংবা লবণ দ্বারা শুকানো কিংবা শুধুমাত্র রৌদ্রের তাপ বা বাতাসে শুকানো হোক তার সকল আর্দ্রতা দুরীভূত হয়ে যদি দুর্গন্ধ চলে যায় তখন তা পবিত্র হয়ে যাবে। এবং এর উপর নামায পড়া শুদ্ধ হবে।

মাসয়ালাঃ হিংস্র প্রাণীর চামড়া যদিও পাকানো হয় তথাপি এর উপর বসা কিংবা নামায পড়া উচিৎ নয় এর দ্বারা স্বভাবে কঠোরতা ও অহংকার সৃষ্টি হয়। ছাগল এবং ভেড়ার চামড়ার উপর বসলে এবং তা পরিধান করলে স্বভাবে কোমলতা ও বিনয় ভাব সৃষ্টি হয়। কুকুরের চামড়া যদিও সিক্ত করা হয় কিংবা জবেহ করে চামড়া নেয়া হয়, তথাপি তা ব্যবহার না করা উত্তম, কারণ ইমামদের মতের ভিন্নতা এবং সর্বসাধারণের ঘৃনা হতে বেঁচে থাকা উত্তম।

মাসয়ালাঃ রং, সীসা গলানোর দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়।

মাসয়ালাঃ জমে যাওয়া ঘি এবং ভিতরে ইঁদুর পতিত হয়ে মারা গেলে তখন ইঁদুরের আশে পাশের ঘি বের করে নিলে বাকী ঘি পবিত্র হয়ে যাবে এবং ভক্ষণ করা যাবে। যদি পাতলা হয়, তখন সবগুলো নাপাক হয়ে যাবে। তা খাওয়া জায়েজ হবে না। তবে সেসব ক্ষেত্রে অপবিত্রতা ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, যে সব ক্ষেত্রে কাজে ব্যবহার করা যাবে। তেলের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য।

মাসয়ালাঃ মধু যদি নাপাক হয়ে যায়, তা পাক করার নিয়ম হচ্ছে, তাতে মধুর অধিক পরিমাণ পানি ঢেলে এতটুকু সিদ্ধ করবে, যেন সব পনি শুকিয়ে যায় এবং যে পরিমাণ মধু ছিল সে পরিমাণ থেকে যায় এভাবে তিনবার সিদ্ধ করলে পাক হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ নাপাক তেলও পাক করা যায়। তেল পাক করার নিয়ম হচ্ছে-যতটুকু তৈল থাকে ততটুকু পানি মিশ্রিত করে ভালবাবে নাড়বে অতঃপর উপর থেকে তৈল উঠিয়ে নিবে এবং পানিগুলো ফেলে দিবে এভাবে তিনবার করলে তৈল পাক হয়ে যায়।

মাসয়ালাঃ জায়নামাজে হাত-পা, কপাল এবং নাক রাখার স্থানে নামাজ পড়াবস্থায় পবিত্র হওয়া আবশ্যক। বাকী স্থান যদি নাপাক হয় নামাজের ক্ষতি হবে না। তবে নামাজে অপবিত্রতার নৈকট্য থেকে মুক্ত থাকা উচিৎ।

মাসয়ালাঃ কোন কাপড়ে অপবিত্রতা লাগলো এবং ঐ অপবিত্রতা একদিকে রইলো, অন্যদিকে তার প্রভাব পড়েনি, তখন তা উল্টিয়ে যে দিকে নাপাক লাগেনি, সেদিকে নামাজ পড়া যাবেনা। ওটা যতই মোটা হোক না কেন। কিন্তু যখন অপবিত্রতা সিজদার স্থান থেকে পৃথক হয়, তখন জায়েজ।

মাসয়ালাঃ যে কাপড় দু'ভাঁজ বিশিষ্ট হয়। যদি কাপড়ের একভাঁজ নাপাক হয়ে যায়। তখন উভয়টা যদি একত্রিত করে সেলাইকৃত হয়। তাহলে অন্য ভাঁজের দ্বারা নামাজ পড়া নাজায়েজ। আর যদি একত্রিতভাবে সেলাইকৃত না হয় তখন জায়েজ।

কাঠের তক্তার একপিট অপবিত্র হয়ে গেল, প্রস্থে যদি এতটুকু চওড়া হয় যে, এর উপর দাঁড়ানো যায়, তখন উল্টিয়ে এর উপর নামাজ পড়া জায়েজ হবে। অন্যথা জায়েজ নয়।

মাসয়ালাঃ যে ভূমি গোবর দ্বারা লেপন করা হয়েছে সে ভূমি শুকিয়ে যাবার পর সেটার উপর নামাজ জায়েজ হবে না। অবশ্য যদি শুকিয়ে যায় এবং সেটার উপর মোটা কাপড় বিছানো হয় তখন সে কাপড়ের উপর নামাজ পড়া জয়েজ হবে, যদিও কাপড় ভিজা হয়; কিন্তু যাতে এতটুকু ভিজা না হয়, যাদ্বারা জায়গা ভিজে কাপড়ও ভিজে যাবে। এমতাবস্থায় এই কাপড় অপবিত্র হয়ে যাবে এবং নামায হবে না।

মাসয়ালাঃ চক্ষুর মধ্যে নাপাক সুরমা বা কাজল লাগলে এবং তা যদি চক্ষুর সর্বত্র ছড়িয়ে যায়, তাহলে ধৌত করা ওয়াজিব আর যদি চক্ষুর ভিতরেই থাকে বাহিরে বিস্তার না হয় তখন মাফ।

মাসয়ালাঃ অন্য কোন মুসলমানের কাপড়ের নাপাক দেখতে পেল এবং প্রবল ধারণা হচ্ছে তাকে অবগত করালে যে পবিত্র করে নেবে তখন তাকে অবগত করানো ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ ফাসেকদের ব্যবহৃত কাপড় যেসব কাপড় নাপাক হওয়ার ব্যাপারে জানা না থাকলে পাক মনে করবে। কিন্তু বেনামাযীর পায়জামা ইত্যদির ব্যাপারে সতর্কতা প্রয়োজন। রুমাল দিয়ে তা পরিষ্কার করে নেবে। অধিকাংশ বেনামাযী প্রস্রাব করেই এমনি পায়জামা বেঁধে নেয়। কাফেরদের সেসব কাপড় পাক করার ব্যাপারে আরো অধিক সতর্ক হওয়া চাই।

শৌচকার্যের বর্ণনা.

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন–

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

অর্থাৎ যেখানে রয়েছে এমন লোক (মসজিদে ক্বোবা শরীফে) যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। -১১ পারা।

হাদীস (১) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী তাবির ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারদের সম্পর্কে যখন উক্ত আয়াত নাজিল হয় অর্থাৎ তথায় (কুবা মসজিদে) এমন লোকেরা রয়েছেন যারা পবিত্রতা পছন্দ করেন, আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন"।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন! হে আনসার দল! এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমাদের পবিত্রতা কি বলতো? তাঁরা বললেন, আমরা নামাযের জন্য অজু করি। নাপাকী হতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করি। ইস্তেনজায় পানি দ্বারা শৌচকর্ম করি। হুজুর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর উপরই সর্বদা স্থির থাকবে। (ইবনে মাজাহ)

হাদীস (২) হযরত যায়েদ ইবনে আরকান (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এই পায়খানার স্থানসমূহ শয়তান ও জিনদের উপস্থিতির স্থান। সুতরাং তোমাদের কেহ পায়খানায় গমন করলে বলবে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জ্বিন শয়তানদের কবল হতে মুক্তি প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীস (৩) বোখারী ও মুসলিম শরীফে নিম্নোক্ত দোয়া রয়েছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে জিন-শয়তানদের কবল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাদীস (৪) হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করবে তখন জ্বিনের চক্ষু ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যকার অন্তরাল হল 'বিছমিল্লাহ্' (মনে মনে বলা)।

হাদীস (৫) উম্মুল মুমেনীন, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (দঃ) যখন পায়খানা করে বের হতেন বলতেন غُفْرَانَكَ "হে আল্লাহ তোমার ক্ষমা প্রত্যাশা করি। –তিরমিযী, ইবনে মাযাহ ও দারেমী"

হাদীস (৬) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হতে বের হতেন, তখন বলতেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আমার শরীর হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করলেন এবং আমাকে মুক্ত করলেন। (ইবনে মাজাহ),

হাদীস (৭) হিসনে হাসীনে নিম্নোক্ত দোয়া রয়েছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ

اَخْرَجَ مِنْ بَطْنِىْ مَا يَضُرُّنِىْ وَاَبْقٰى فِيْهِ مَا يَنْفَعُنِىْ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমার পেট থেকে যা ক্ষতিকর তা বের করে দিয়েছেন যা উপকারী তা অবশিষ্ট রেখেছেন।

হাদীস (৮) অসংখ্য সূত্রে ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যখন তোমরা পায়খানা করবে তখন ক্বিবলাকে সম্মুখে করবেনা, পিছনে ও রাখবেনা। পুরুষাঙ্গকে ডান হাতে স্পর্শ করতে এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তেনজা করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

হাদীস (৯) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় গমন করতেন, আংটি খুলে রাখতেন যাতে নাম মোবারক, খোঁদাই করা ছিল। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

হাদীস (১০) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন প্রশ্রাব বা পায়খানার ইচ্ছা করতেন, মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। (তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারমী)

হাদীস (১১) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানার উদ্দেশ্যে বাগানে যেতে মনস্থ করতেন এতটুকু দুরে চলে যেতেন যে, কেউ তাঁকে দেখতে পেতনা, (অর্থাঃ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেন)

হাদীস (১২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ করেছেন তোমরা গোবর হাড্ডি দ্বারা শৌচ কার্য সমাধা করবে না কারণ তা তোমাদের জ্বিন ভাইদের খাদ্য। আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় কয়লা দ্বারা করাও নিষেধ।

হাদীস (১৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন জিন গোসল খানায় অবশ্যই প্রশ্রাব না করে, কারণ এতে সন্দেহ বা দ্বিধাদ্বন্ধ সৃষ্টি হতে পারে।

হাদীস (১৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অবশ্যই গর্তের মধ্যে প্রশ্রাব না করে। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

হাদীস (১৫) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে তিনটি অভিসম্পাতের কারণ হতে বেচে থাকবে, তা হলো, জলের ঘাটে, রাস্তার উপরে এবং গাছের ছায়ায় পায়খানা প্রস্রাব করা। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীস (১৬) উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে প্রশ্রাব করতেন, তার কথা তোমরা বিশ্বাস করোনা, তিনি সর্বদা বসেই প্রস্রাব মোবারক করতেন। (আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

হাদীস (১৭) হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, দুইজন লোক একত্রে নিজেদের লজ্জাস্থান উম্মুক্ত করে একে অপরের সাথে কথা বলতে বলতে যেন পায়খানা না করে, কারণ আল্লাহ তায়ালা এধরনের কাজে গজব নাজিল করেন। (আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীস (১৮) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন বিরাট ব্যাপারে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, এদের একজন প্রস্রাবকালে আড়াল করতনা, মুসলিমের বর্ণনায় প্রস্রাব হতে উত্তম রূপে পবিত্রতা লাভ করতো না, আর অপরজন একজনের কথা অন্যজনকে লাগাত। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি তাজা খেজুর শাখা নিয়ে উহাকে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরূপ কেন করলেন? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতদিন পর্যন্ত ডানা দুটি না শুকাইবে, ততদিন তাদের শাস্তি লঘু করা হবে এই আশায়। (বোখারী ও মুসলিম)

শৌচকার্য সম্পর্কিত মাসায়েল

মাসয়ালাঃ যখন পায়খানা বা প্রস্রাব খানার দিকে গমন করিবে, তখন পায়খানার বাহিরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব,

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অতঃপর প্রথমে বাম পা প্রবেশ করাবে এবং বের হবার সময় প্রথমে ডান পা বের করবে। বের হয়ে এই দোয়া পাঠ করবে-

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ مَا يُؤْذِيْنِىْ وَاَ

মাসয়ালাঃ মলমূত্র ত্যাগ করার সময় বা শৌচকার্য সমাধা করার সময় কিবলার দিকে

যেন মুখ বা পিট কোনটা না হয়, এই হুকুম সার্বজনীন। ঘরে হোক কিংবা ময়দানে হোক যদি ভুলক্রমে ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিট করে বসে যায় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই যেন দিক পরিবর্তন করে নেয়। এতে মাগফেরাত পাওয়ার আশা করা যায়।

মাসয়ালাঃ ছোট শিশুকে পায়খানা প্রস্রাব করানোর সময় শিশুর মুখ ক্বিবলার দিকে করা হলে এ জন্য তাকে তত্ত্বাবধানকারী গুনাহগার হবে এবং এটা মাকরূহ হবে তার জন্যই।

মাসয়ালাঃ মলমূত্র বা প্রস্রাব ত্যাগের সময় চন্দ্র সূর্য কোনটার দিকে মুখ বা পিট করা যাবেনা, অনুরূপভাবে বাতাসের দিকে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ।

মাসয়ালাঃ কূপ, হাউজ, ঝর্ণার পার্শ্বে বা পানিতে যদিও প্রবাহমান হয়, জলঘাটে, ফলদার বৃক্ষের নিচে, ক্ষেতের ফসলে, ছায়াযুক্ত স্থানে যেখানে মানুষ আশ্রয় নেয়, মসজিদের আশে পাশে বা ঈদগাহের আশে পাশে, কবরস্থানে, রাস্তায়, মানুষের চলার পথে, মানুষের আরাম স্থলে, এসব স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা ও প্রস্রাব করা মাকরূহ। অনুরূপ যে স্থানে অজু গোসল করা হয়, সে স্থানে প্রস্রাব করা মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ নিচু স্থানে বসে ও উপরিস্থানে প্রস্রাব করা নিষেধ।

মাসয়ালাঃ এমন শক্ত ভূমিতে প্রস্রাব করা নিষেধ যেখান থেকে ছিঁটকা পড়ে আসে। এমন স্থানকে নরম করে নেবে। অথবা গর্ত খনন করে প্রস্রাব করবে।

মাসয়ালাঃ দাঁড়িয়ে, শুয়ে বা উলঙ্গ হয়ে প্রস্রাব করা মাকরূহ, অনুরূপভাবে খালি মাথায় পায়খানা বা প্রস্রাব খানায় যাওয়া নিষেধ বা যে সব জিনিষে কোন দোয়া আল্লাহ্ রসুল বা কোন বুজুর্গের নাম লিখা থাকে সে সব জিনিষ সাথে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। অনুরূপভাবে মলমূত্র বা প্রস্রাবকালে কথা বলা ও নিষেধ।

মাসয়ালাঃ যতক্ষন বসার নিকটবর্তী না হবে ততক্ষণ কাপড় শরীর থেকে সরাবে না। প্রয়োজনের অধিক শরীর উম্মুক্ত করবেনা। অতঃপর উভয় পা প্রশস্ত করে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং কোন দ্বীনী মাসয়ালা নিয়ে চিন্তা করবেনা এরূপ করা হতভাগার লক্ষণ। হাঁচি, সালাম অথবা আজানের জবাব মুখে দেবেনা। হাঁচি আসলে মুখে আলহামদুলিল্লাহ্ বলবেনা, মনে মনে বলবে। অপ্রয়োজনে নিজের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং নিজ শরীর থেকে নির্গত অপবিত্রতার দিকেও দৃষ্টিপাত করবেনা। বেশীক্ষন বসে থাকবেনা। এতে দুর্গন্ধ যুক্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে, প্রস্রাবে থুথু ফেলবেনা, নাক পরিস্কার করবেনা। বিনা প্রয়োজনে কাশি দেবেনা। বারংবার এদিক সেদিক দেখবেনা। অযথা অনর্থক শরীর স্পর্শ করবে না, আসমানের দিকে তাকাবেনা, বরং লজ্জার সাথে মস্তক অবনত করে রাখবে। যখন কাজ হয়ে যাবে তখন পুরুষ বাম হাতে স্বীয় লিঙ্গের গোড়ার দিক হতে মাথার দিকে মালিশ করবে, যেন কোন ফোঁটা রয়ে গেলে বের হয়ে আসে, অতঃপর ঢিলার সাহায্যে পরিস্কার করার পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং সোজা দাঁড়ানোর আগে শরীর ঢেকে

বের হয়ে আসবে। যখন ফোটা আসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন অন্য কোন স্থানে পবিত্রতার জন্য বসবে এবং প্রথমে তিনবার করে উভয় হাত ধৌত করে নেবে এবং তারপর এ দোয়াটি পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الخ

প্রথমে তিনবার হাত ধৌত করবে, অতঃপর বসে ডান হাতে পানি ঢালবে এবং বাম হাতে ধুইবে। পানির বদনা বা পাত্র একটু উপরে রাখবে, যেন ছিটকা না পড়ে। প্রথমে প্রস্রাবের জায়গা তারপর পায়খানার জায়গা ধৌত করবে ধোয়ার সময় নিশ্বাসের জোর নিচের দিকে দিয়ে পায়খার জায়গা খোলা রাখবে, যেন ভালমতে ধৌত করা যায় এবং ধৌত করার পর হাতের মধ্যে যেন কোন গন্ধ বাকী না থাকে। অতঃপর কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা মুছে ফেলবে, কাপড় যদি না থাকে তাহলে কয়েকবার হাত দ্বারা মুছে ফেলবে যেন নামমাত্র আর্দ্রতা বাকী থাকে, যদি অধিক সন্দেহ হয়, তখন কাপড়ের উপর পানি ছিটকা দেবে, অতঃপর সেস্থান থেকে বের হয়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَّالْاِسْلَامَ نُوْرًا وَّقَائِدًا وَّدَلِيْلًا اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى جَنّٰتِ الخ

মাসয়ালাঃ আগে পিছের রাস্তা দিয়ে নাপাকী বের হলে ঢিলা দ্বারা শৌচকার্য করা সুন্নাত, যদি কেবল পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয় তাও জায়েজ। তবে মুস্তাহাব হচ্ছে, ঢিলা নেয়ার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

মাসয়ালাঃ ঢিলার কোন নির্ধারিত সংখ্যা সুন্নত নয় বরং যতগুলো দ্বারা পরিস্কার হয়ে যায় সুন্নাত আদায় হয়ে গেল, কিন্তু তিনটি ঢিলা নিলো, পরিস্কার হলো না, তাহলে সুন্নত আদায় হলোনা এবং সংখ্যা বেজোড় হওয়াটা মুস্তাহাব, কমপক্ষে তিনটা হওয়া, তবে যদি একটি বা দুটি দ্বারা পরিস্কার হয়ে যায় তথাপি তিনটি দ্বারা পূর্ণ করবে, আর যদি চারটি দ্বারা পরিস্কার হয় তখন আর একটি নিয়ে বেজোড় করবে।

মাসয়ালাঃ ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা তখন যথেষ্ট হবে যদি নাপাকী বের হবার স্থানের আশে পাশে এক দিরহাম থেকে অধিক জায়গা পরিবেষ্টিত না করে, যদি এক দিরহাম থেকে অধিক জায়গায় লেগে যায় তখন ধৌত করা ফরজ। কিন্তু তখনও ঢিলা নেয়াটা সুন্নত হিসেবে বহাল থাকবে।

মাসয়ালাঃ কংকর, পাথর, ছেঁড়া কাপড় এসবগুলো ঢিলার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো দ্বারা পরিস্কার করা মাকরূহ বিহীন জায়েজ।

মাসয়ালাঃ হাড় খাদ্যজাতীয় বস্তু, গোবর, পাকা ইট, সীসা, কয়লা সহ এমন সব বস্তু যে গুলোর কিছু মুল্য আছে যদিও কম মুল্যের হোক এগুলো দ্বারা শৌচকার্য করা মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ কাগজ দ্বারা ইস্তেনজা করা নিষেধ, যদিও তার উপর কিছু লিখা না থাকে অথবা আবু জাহেলের মত কাফেরের নাম লিখা থাকলেও।

মাসয়ালাঃ ডান হাতে ইস্তেনজা করা মাকরূহ। যদি কারো বাম হাত অকেজো হয়ে যায়, তখন ডান হাত দ্বারা জায়েজ।

মাসয়ালাঃ পুরুষাঙ্গকে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করা অথবা ডান হাত দ্বারা ঢিলা নিয়ে তার উপর অতিক্রম করা মাকরূহ।
মাসয়ালাঃ যে ঢিলা দ্বারা একবার ইস্তেনজা করা হয়েছে তা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা মাকরূহ।
মাসয়ালাঃ পায়খানার পর পুরুষের ঢিলা ব্যবহারের মুস্তাহাব নিয়ম হচ্ছে গরমকালে প্রথম ঢিলাটা সামনের থেকে পিছনে নিয়ে যাবে, এবং দ্বিতীয় ঢিলাটা পিছন থেকে সামানের দিকে নিয়ে আসবে এবং তৃতীয় ঢিলাটা পুনরায় সামনের থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। আর শীতকালে প্রথম ঢিলাটা পিছন থেকে সামনের দিকে আনবে। দ্বিতীয় ঢিলাটা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, এবং তৃতীয় ঢিলাটা পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে।
মাসয়ালাঃ মহিলাগণ সব ঋতুতে প্রথম ঢিলা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, যেমন পুরুষরা গ্রীষ্মকালে করে।
মাসয়ালাঃ পবিত্র ঢিলা ডান দিকে রাখা, কাজ সমাধার পর বাম দিকে ফেলে দেয়া মুস্তাহাব।
মাসয়ালাঃ প্রস্রাবের পর যার এ ধারণা হয় যে, ফোটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে বা পুনরায় আসবে তার জন্য ইসতেবরা ওয়াজিব অর্থাৎ প্রস্রাবের পর এরকম কাজ করা যেন কোন ফোঁটা আটকে থাকলে বরে হয়ে আসে। হাটা হাটির দ্বারা ইস্তেবরা করা বা মাটির উপর জোরে পা মারা দ্বারা ইস্তেবরা করা যায় বা উচু স্থান থেকে নীচে নেমে আসা, অথবা নীচ থেকে উপরে উঠার দ্বারা ইস্তেবরা করা যায়, অথবা ডান-পা-কে বম পায়ের উপর বা বাম পা-কে ডান পায়ের উপর রেখে জোর দেয়ার মাধ্যমেও ইস্তেবরা করা যায় অথবা গলার আওয়াজ করে বা বাম কাত হয়ে ইস্তেবরা করা যায়, ইস্তেবরা ততক্ষন পর্যন্ত চাই, যতক্ষণ নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এখন আর প্রস্রাবের ফোঁটা বের হবে না। ইস্তেবরার হুকুম পুরুষের জন্য। মহিলারা কাজ শেষ করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, অতঃপর পরিষ্কার করে নেবে, ইস্তেবরার ক্ষেত্রে হাটাহাটির পরিমান কতিপয় ওলামায়ে কেরাম চল্লিশ কদম নির্ধারণ করেছেন তবে বিশুদ্ধ হল, যতক্ষন পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত।
মাসয়ালাঃ মহিলারা হাতের তালু দ্বারা ধৌত করবে এবং পুরুষদের তুলনায় অধিক প্রসস্ত করে নেবে।
মাসয়ালাঃ পবিত্রতা অর্জনের পর হাত পাক হয়ে গেল, কিন্তু তারপরও মাটি লাগিয়ে ধৌত করা মুস্তাহাব।
মাসয়ালাঃ পুরুষের হাত অকেজো হলে স্ত্রী শৌচকার্য করিয়ে দিবে, আর স্ত্রীর হাত অকেজো হলে স্বামী শৌচকার্য করিয়ে দিবে। কিন্তু অন্য কোন আত্মীয় ছেলে, মেয়ে, ভাইবোন, কেউ শৌচকার্য করাতে পারবে না। বরং এ ধরনের মাজুর বা অপারগ অবস্থায় মার্জনীয়।
মাসয়ালাঃ পবিত্রতা অর্জনের পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা যায়, এই পানি ফেলে দেয়া অনুচিত। কারণ এরূপ করা অপব্যয়ের শামিল।
মাসয়ালাঃ অজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা খেলাফে আউলা।

বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড
সংযোজন

বিছমিল্লাহির রাহমানির রহীম
"নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাসুলিহীল করীম"
বাহারে শরীয়ত দ্বিতীয় খন্ডে, মুতলাক ও মুকাইয়্যাদ পানির প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আমি অধম (লিখক) এ মাসয়ালাটিও উল্লেখ করেছি যে, হুক্কার পানি পাক, যদিও বা এর রং, ঘ্রাণ, ও স্বাদে পরিবর্তন আসে। এর দ্বারা অযু জায়েজ। হুক্কার পানি প্রয়োজন পরিমাণ থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ নেই। এ নিয়ে টুহয়াওয়ার জেলার বিভিন্ন স্থানে জনগণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং এ পর্যায়ে দলীল তলবের নিমিত্ত একটি পত্র প্রেরণ করতে চাই? দলীল পেশ করা প্রতিপক্ষের দায়িত্ব, আমাদের দায়িত্ব নয়। এজন্য যে, পানি মূলতঃ পবিত্র ও পবিত্রকারী। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, "ওয়ানযালনা মিনাচ্ছামায়ে মা আন তাহুরা" অর্থ আমি আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। আরো এরশাদ করেন, "য়ুনায্‌যিলু আলাইকুম মিনাচ্ছামায়ে লিয়ুত্তাহ্‌হিরাকুম"
অর্থঃ তিনি তোমাদের উপর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যদ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন, "রদ্দুল মোখতার" গ্রন্থে আছে,
ويستدل بالآية ايضا على طهارته اذ لامته بالنجس
.ফিক্‌হ শাস্ত্রের বর্ণনা, কোন পানি নাপাক হওয়া সম্পর্কে কাফির সংবাদ দিল, তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। এ পানি দ্বারা অযু জায়েজ হবে। নাপাকী হল আরিযী বা আকস্মিক, এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কাফিরের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বিধায় পানি নিজ পবিত্রতার উপর বিদ্যমান থাকবে। এটি আমাদের উক্তির যথেষ্ট সহায়ক। কিন্তু এসব কথা তো, তাদের জন্য যারা শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী কথা বলে বা বলতে চায়। বর্তমান যুগে এর সাথে সম্পর্ক খুবই কম। ইল্লামাশাআল্লাহ কিছু লোক ব্যাতিক্রম, যারা সর্বাবস্থায় সত্যের উপর অবিচল, বর্তমানে তো, এ ধরনের লোকের অভাব নেই যারা কোন একটি বলে জনগণের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে পারলেই হলো। শুদ্ধ হোক ভুল হোক তা উদ্দেশ্য নয়, বিভ্রান্তি ছড়ানোই মুখ্য। অভিযোগ কারীরা যেহেতু তা নাপাক মনে করে বিধায় শুধুমাত্র পবিত্রতার সনদ সূত্র বর্ণনা করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হতো। তথাপি আমরা উপকারার্থে উভয়টির বিধান প্রমান সাপেক্ষ উপস্থাপন করবো। পবিত্রতা সম্পর্কে এটাই যথেষ্ট যে, ইহা পানি, পানি স্বত্ত্বাগত নাপাক নয়। যতক্ষন না কোন নাপাকীর সংমিশ্রন ঘটে বা নাপাকীর স্পর্শ না হলে নাপাক হবে না, নাপাকের মিশ্রন যেমন মদ ও প্রস্রাব বা অন্যান্য নাপাক বস্তু এর সাথে মিশ্রিত হলে, তা যদি ও কম হয়। অর্থাৎ একশ বর্গহাতের কম হয় তখন পানি নাপাক হবে। আর

যদি একশ বর্গহাত হয়। তাহলে নাপাক সংমিশ্রন ঘটলেও সে সময় নাপাক হবে। যখন নাপাকে বস্তু পানির রং, ঘ্রান, স্বাদ পরিবর্তন করে দেয়, দুর্রুল মোখতারে, আছে

ينجس بتغير احد اوصافه من لون او طعم او ريح بنجس الكثير ولوجاريا اجماعًا القليل فينجس وان لم يتغير،

আলমগীরে ফত্ওয়া গ্রন্থে আছে

الماء الراكد اذا كان كثيرا فهو بمنزلة الجاري لايتنجس جميعه اهـ

স্পর্শ হওয়ার নিয়ম হচ্ছে, নাপাক বস্তু পানির সাথে লাগা, যদিও তার ক্ষুদ্রাংশ এতে সংমিশ্রন না হয়, কম পরিমান পানি নাপাক হবে। যেমন, শূকরের শরীরের কোন অংশ যদিও পশম হোক, পানিতে স্পর্শ হয়, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদিও বা তৎক্ষনাৎ তা পানি হতে পৃথক করা হয়। যদিও বা লালা ইত্যাদি কোন নাপাকী শূকরের দেহ থেকে পৃথক হয়ে পানির সাথে মিশে না যায়। হিন্দিয়া গ্রন্থে আছে-

وان كان نجس العين كالخنزير فانه يتنجس وان لم يدخل فاه

এতে আরো আছে-

اما الخنزير فجميع اجزاءه نجسه

রদ্দুল মোখতার কিতাবে আছে-

وظاهر الرواية ان شعره نجس وصححه فى البدائع ورجحه اهـ

এভাবে যদি কোন রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী পানিতে পড়ে মারা গেলে, বা মরার পর পানিতে পতিত হলে, পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদিও বা এর লালা ইত্যাদি পানির সাথে মিশে না যায়। শুধু মৃত প্রাণীর সাক্ষাতই স্বল্প পানিকে নাপাক করার জন্য যথেষ্ট। আর যদি জীবিত বের হয়ে আসে, যতক্ষণ এর মুখ পানিতে লাগাটা জানা না যাবে ততক্ষণ পানি নাপাক হবে না। ফতওয়া আলমগীরি কিতাবে আছে-

والصحيح ان الكلب ليس بنجس العين فلا يفسد الماء مالم يدخل فاه هكذا فى التبيين هكذا اسائر مالا يؤكل لحمه من اهـ

দুর্রুল মোখতারে আছে-

لواخرج حيا وليس بنجس العين ولا به حدث اوخبث لم ينزح اهـ

রদ্দুল মোখতারে আছে-

بخلاف ما اذا كان على الحيوان خبث اى نجاسة وعلم بها فانه نجس مطلقا قال فى البحر وقيدنا بالعلم لانهم قالوا فى البقر ونحوه، يخرج اهـ

রদ্দুল মোখতার এর বর্ণনা দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু নাপাক

হওয়াটা নিঃসন্দেহে নিশ্চিত হওয়া না যাবে ততক্ষন পর্যন্ত নাপাকের হুকুম দেয়া যাবে না। যদিও বা বাইরে নাপাক প্রকাশ হয়। সুতরাং হুক্কার পানি সম্পর্কে যতক্ষন পর্যন্ত নাপাক হওয়া নিশ্চিত না হবে নাপাক বলা যাবে না।

হুক্কার পানি সম্পর্কে নাপাক নিশ্চিত হওয়াতো দূরে থাক, নাপাকীর কল্পনাও করা যাবে না। তা নাপাক হওয়া তখন প্রমাণিত হবে, যদি তা নাপাকের সাথে লাগে বা নাপাকের সাথে সংমিশ্রিত হওয়াটা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়। উভয়টি পাওয়া না গেলে তখন স্বয়ং পবিত্রতার উপর বিদ্যমান থাকাটা প্রমাণিত হবে। এটিই উদ্দেশ্য। অতঃপর বলছি যে, একথা তো সকলে অবগত আছেন যে, হুক্কার পানি হচ্ছে, সে পানি, যা হুক্কায় ঢালার পূর্বে পবিত্র ও পবিত্রকারী ছিল। হ্যাঁ কেউ যদি নাপাক পানি দিয়ে হুক্কা তাজা করে, বা হুক্কার ভিতর নাপাক ছিল বা হুক্কার পানিতে পরে কোন নাপাক পতিত হয়েছে। হুক্কার ভিতরে হোক বা বের করার সময় হোক এসব অবস্থায় নিঃসন্দেহে নাপাক। এ পানি কোন্ ব্যক্তি পাক বলবে? হুক্কার স্থলে কলসি বা জলপাত্র নাপাক হলে তখন তো, পানি ও নাপাক হতো, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তো একথা বলতে পারে না, যে, মুতলাকভাবে কলসি, লোটা বা জলপাত্রের পানি নাপাক, নাপাক হওয়াটা তো, বিশেষ কারণের সাথে সম্পর্কিত। কলসি বা লোটা ক্ষুদ্র জলপাত্র কোন, নাপাকীর কারণ নয়। অনুরূপভাবে এখানেও নাপাক হওয়াটা বিশেষ অবস্থায়, পাত্র নাপাক হলে বা পাত্রের পানির সাথে নাপাকীর সংমিশ্রণ ঘটলে, তখন নাপাক হবে। হুক্কা, কোন নাপাক হওয়ার সবব বা কারণ নয়। এখন কথা হচ্ছে যে, হুক্কার ধোঁয়া পানির উপর অতিক্রম করলে পানি নাপাক হবে কি না। হুক্কার পানি যখন সে পানি, যেটা প্রথম থেকেই পাক ছিল, এখন ধোঁয়া অতিক্রম করার কারণে পানির গুণাবলীতে পরিবর্তন আসলো, গুণাবলী অর্থাৎ রং, ঘ্রাণ, স্বাদ পরিবর্তন হওয়াটা যদি নাপাক হওয়ার কারণ হয়, তখন তো শরবত, গোলাপ কেওড়ার জল, চা, শুরবা এবং সেসব পানি, যে পানিতে জাফরান বা পুষ্প নিংড়ানো লাল রং দেয়া হয়, বরং ওসব বস্তু সমূহ যেসব বস্তুতে পানির তিনটি গুণাবলী পরিবর্তন হয়ে যায়, সবগুলো নাপাক হওয়াটা অপরিহার্য হয়ে যাবে, এটা স্পষ্ট বাতিল কথা। সুতরাং প্রতীয়মান হলো, সাধারণতঃ যে কোন বস্তু মিশ্রিত হলেই পানি নাপাক হবে না। বরং নাপাক হওয়ার জন্য নাপাকীর মিশ্রণ জরুরী। বিধায় প্রথমে তামাক নাপাক হওয়াটা শরীয়তের আলোকে প্রমাণ করতে হবে। অতঃপর শরয়ী দৃষ্টিকোণে এর ধোঁয়াও নাপাক হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে। এরপর নাপাক বলতে পারেন। তামাক একটি বৃক্ষের পাতা, যেটার কিছু অংশ মিশ্রণ করে পানাহার করে ঘ্রাণ গ্রহণ করে। এটা তো স্পষ্ট কথা যে, গাছের পত্র তো নাপাক নয়। অন্যান্য অংশ যেমন কোন বস্তুর নির্যাস বা সুগন্ধির জন্য বা অন্য কোন উপকারের জন্য কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন, সুগন্ধযুক্ত দানা, জোঁলাপের জন্য ব্যবহৃত সোঁদাল, কাঠালের বীজ ইত্যাদি এসবের কোন একটি বস্তুও নাপাক নয়। সুতরাং তামাক পবিত্র। তামাক পানে যদি সংজ্ঞাহীনতার মত অবস্থা সৃষ্টি হলে,

বা বিষণ্নমোখতার কারণে এতটুকু পরিমাণ খাওয়া বা পান করা হারাম হবে। হাদীসে এরশাদ হয়েছে-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسلم و مفتر

তবে হারাম হওয়া এক বিষয়, নাপাক হওয়া অন্য বিষয়। এভাবে তো ক্ষতি পরিমাণ মাটি ভক্ষণ করাও হারাম। অথচ মাটি পবিত্র বরং পবিত্রকারী।
ফিকহ্‌র কিতাব সমূহে অসংখ্য উপাদান পাওয়া যাবে যে, অধিক ভক্ষণ করা হারাম এবং সাতু পাক। "তানভীরুল আবছার গ্রন্থে আছে"

و المسك طاهر حلال

রদ্দুল মোখতার গ্রন্থগ্যার এর উপর বৃদ্ধি করে বলেন-

زاد قوله حلال لانه لا يلزم من الطهارة الحل كما فى التراب منح
فان التراب طاهر ولا يحل اكله

তামাক যখন পাক প্রমাণিত হল, এর ধোঁয়া কিভাবে, নাপাক হতে পারে? পবিত্র বস্তু তো স্বয়ং পবিত্রই। নাপাক বস্তুর ধোঁয়া সম্পর্কে হানফী ফিকহ্‌র হুকুম হলো যে, যতক্ষণ তা হতে নাপাক বস্তুর চিহ্ন বা প্রভাব প্রকাশ না পাবে, পবিত্রতার হুকুম বিদ্যমান থাকবে। রদ্দুল মোখতার গ্রন্থে আছে-

اذا احرقت العذرة فى بيت فاصحاب ماء الطابق ثوب انسان الخ

ফত্ওয়ায়ে আলমগীরি গ্রন্থে আছে-

دخان النجاسة اذا اصاب الثوب او البدن الصحيح انه لا ينجسه الخ

নাপাক ধোঁয়া থেকে প্রস্তুতকৃত নওশাদর নামক এক প্রকার ঔষধ বিশেষ, ওলামায়ে কেরাম, তা পবিত্র বলেছেন।
রদ্দুল মোখতারে আছে-

اما النوشادر المستجمع من دخان النجاسة فهو طاهر

উপরোক্ত সুক্ষ্ম চিন্তাশীল, ফকীহ্গণের মতামতের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হলো যে, হুক্কার পানি পবিত্র। এখন রইলো মূর্খদের অবান্তর ধারণার নিরসন, তাদের মতে পাক হলে পান করা হয় না কেন? তাদের বলবো! নাস্‌কিও তো পাক কেন খাও না? থুথুও পাক তারপরও কেন পান কর না? আফিম এবং মাদকদ্রব্যও তো নাপাক নহে, তাই বলেকি পান করবে? পাক বস্তু যেখানে হারাম হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে স্বভাবগত মাকরূহ বা অপছন্দ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণাদি উপস্থাপিত হলো, এখন

সেসব নাপাক উক্তিকারীদেরকে বলবো যে; কুরআনের কোন্ আয়াত বা হাদীসের কোন্ সূত্র দ্বারা বা কোন্ কিতাব দ্বারা তোমরা তোমাদের দাবীর সমর্থনে দলীল পেশ করবে? যখন কোথাও থেকে দলীল পেশ করা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন শরীয়তের উপর মিথ্যা অপবাদের শামিল কি না?
শরীয়ত সম্পর্কে অপবাদ রটানো থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা চাই। আল্লাহ তাআলা হেদায়ত ও তাওফীক নসীব করুন। আমীন।
এখন রইল তা "পবিত্রকারী" হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা। এর ভিত্তি হলো মুতলাক পানির উপর, মুতলাক পানি দ্বারা অযু, গোসল জায়েয। মুকাইয়্যাদ দ্বারা নহে।
যা 'মুতুনে' বিস্তারিত আলোকপাত হয়েছে। সুতরাং প্রথমে আমরা মুতলাক এর সংজ্ঞা বর্ণনা করবো, যদ্দারা সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে, ওটা কি মুতলাক না মুকাইয়্যাদ।
মুতলাক বলা হয় সাধারণতঃ যা "আওসাফ" বা গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য না করে কেবল জাত বা সত্তাকে বুঝায়। মুকাইয়াদ হলো যা "আওসাফ" গুণাবলী বিশিষ্ট জাত বা সত্তাকে বুঝায় যা মুজাদ্দিদে দ্বীনোমিল্লাত ইমামে আহলে ছুন্নত আ-লা হযরত ক্বেবলা (রহঃ) প্রণীত "আনুনূর ওয়ান নওরক" নামক রিসালায় গ্রন্থাকার বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন, তিনি বলেন, মুতলাক এমন পানিকে বলা হয়, যা স্বীয় স্বভাবগত তরলতার উপর বাকী থাকবে এবং এর সাথে এমন কোন বস্তু মিশাবে না, যা পরিমাণে এর চেয়ে বেশী বা সমান। বা এমন কোন বস্তু এর সাথে মিশাবে না যাদ্দারা অন্য উদ্দেশ্যে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। যদ্দারা পানির নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়, যেমন শরবত, লাপ্সি, ফলমুলের কচলে রস, বা লিখিবার কালি ইত্যাদি বলা হয়। এর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা নিম্নোক্ত দুটি কবিতার ছত্রে একত্র করা হয়েছে-

مطلق آب است کہ بر رقت طبعی خود است — نہ درو مزج دگر چیز مساوی یا بیش
نہ بخلطے کہ بہ ترکیب شود چیز دگر — کہ بود ز آب جدا در لقب و مقصد خویش

অর্থঃ মুতলক এমন পানি, যা স্বীয় স্বভাবজাত তরলতায় বিদ্যমান থাকে। অন্য কোন সমান বা অধিক পরিমাণ বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয় না, অন্য এমন কোন বস্তুর সাথেও সংমিশ্রিত হয় না, যদ্দারা উদ্দেশ্যও পৃথক পানির নাম ধারণ করে। অধিক সান্ত্বনার নিমিত্ত সংজ্ঞার বিধিবদ্ধতা সম্পর্কে কতিপয় ভাষ্য বর্ণনা করা সমচীন মনে করি, যদ্দারা দাবী অনুধাবনে সহজতর হবে।
প্রথম শর্ত হলো, স্বাভাবিক তরলতা বাকী থাকা। শালবীয়া আলায়যায়িলী গ্রন্থে আছে-

الماء المطلق ما بقى على اصل خلقته من الرقة و السيلان الخ

ক্বাযীখানে আছে-

لو وقع الثلج فى الماء وصار ثخينا غليظا لا يجوز به التوضؤ الخ

অনুরূপ খানিয়া ও আলমগীরি, ফত্ওয়া গ্রন্থে আছে-

لو بل الخبز بالماء وبقى دقيقا جاز به الوضوء

খানিয়ায় আরো উল্লেখ আছে যে,

ماء صابون وحرض ان بقيت رقته ولطافته جاز التوضؤ به

সর্বজন স্বীকৃত ইমাম ইবনুল হুম্মাম, ফাত্হুল কদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

في الينابيع لونقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه اھ

"বদায়ে" কিতাবে আছে-

لوتغير الماء بالطين او بالتراب يجوز التوضؤ به،

মুনীয়া কিতাবে আছে-

يجوز الطهارة بماء خالطة شئ طاهر فغير احد اوصافه كماء اھ

ফত্ওয়া ইমাম গুজা তমরতাশি কিতাবে আছে,

ماء الصابون لوكان رقيقا يسيل على العضو يجوز الوضو به اھ

আলোচ্য মাসয়ালার হুকুম বা বিধানের অবগতির জন্য ফকীহ বা ইসলামী আইনজ্ঞদের উপরোক্ত মতামতগুলো দলীল হিসেবে যথেষ্ট। ফিক্হ শাস্ত্রের কিতাব সমূহে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পানির তরলতা ও প্রবাহ দূরীভূত হওয়ার পর তা অযু গোসলের যোগ্য থাকে না।

দ্বিতীয় শর্ত হলোঃ পানির সাথে এমন কোন বস্তুর সংমিশ্রণ না ঘটা, যা পরিমাণে অধিক বা সমান হবে। যেমন, ঘাম, কেওড়ার জল, গোলাপজল ইত্যাদি। যার মধ্যে না সুগন্ধি রয়েছে না স্বাদ উপভোগ করা যায়। এমন বস্তু যদি পানির সাথে মিশ্রণ হয়, তখন পানির পরিমাণ বেশী হলে অযু জায়েয, অন্যথায় নহে।

"বাহ্রুর রায়েক" কিতাবে আছে-

ان كان مائعا موافقا للماء في الاوصاف الثلثة كالماء الذى يؤخذ بالتقطير اھ

দুর্রুল মোখতারে আছে-

لو(كان المخالط) مائعا فلو مباينا لاوصافه فتغير اكثرها اوموافقا اھ

হিন্দিয়া কিতাবে আছে-

وان كان لايخالفه فيها تعتبر في الاجزاء وان استويا في الاجزاء اھ

তৃতীয় শর্ত হলো যে, এমন বস্তুর সাথে মিশ্রিত না হওয়া, যদ্দ্বারা অন্য উদ্দেশ্যের জন্য হয়ে যাবে এবং পানির নাম পরিবর্তন হয়ে অন্য নামে রূপান্তরিত হবে। কোন বস্তু এর সাথে মিশায়ে রান্না করুক যেমন শুরবা, যা রান্নার পর পানি থাকে না, মুখতাছার কুদুরী, হেদায়া, বেক্বায়া ইত্যাদি ফিক্হর কিতাবে আছে-"

لا يجوز بالمرق

"বাহ্রুর রায়েক" গ্রন্থে আছে-

لا يتوضؤ بماء تغير بالطبخ بما لا يقصد التنظيف كماء اھ

যদি রান্না করা না হয়, বরং মিশানো হয়েছে যেমন চিনি, মিশ্রী, মধুর শরবত, তা পাক

"হেদায়া" ইত্যাদি কিতাবে আছে - لا يجوز بالاشربة

এর উপর এনায়া, কেফায়া, বেনায়া, গায়া, কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

إن اراد بالاشربة الحلو المخلوط بالماء كالدبس والشهد اھ

মজমাউল আনহার কিতাবে আছে-

قال صاحب الفرائد المراد من الاشربة الحلو المخلوط بالماء اھ

যদি এমন বস্তু মিশানো হয়, যদ্দ্বারা পরিস্কার করা বা ময়লা দূর করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে যতক্ষণ পানির তরলতা ও প্রবাহ দূর না হবে ততক্ষণ অযু করা যাবে। এ সম্পর্কে ফত্হুল কদীর, ফতওয়া খানিয়া, ফতওয়া ইমাম শায়খুল ইসলাম গুজা তমরতাশি প্রমুখের প্রমাণাদি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। "বাহারে" আছে-

اما لوكانت النظافة تقصد به كالسدر والاشنان والصابون اھ

হিন্দিয়া কিতাবে আছে-

وان طبخ في الماء ما يقصد به المبالغة في النظافة كالاشنان اھ

অনুরূপভাবে যদি পানির মধ্যে জাফরান বা পুটি এতটুকু মিশায় যদ্দ্বারা কাপড় রঙিন হওয়ার পরিমাণ হবে, তখন তদ্দ্বারা অযু জায়েয হবে না। যদিও বা তরলতা বা প্রবাহ বিদ্যমান থাকে। এখন আর পানি বলা যাবে না। রং বলা যাবে।

রদ্দুল মোখতার কিতাবে আছে-

ومثله الزعفران اذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به فليس اھ

আর পানি যদি রং করার যোগ্য না হয়, তখন অযু জায়েয হবে। ছগীরি কিতাবে আছে-

القليل من الزعفران بغير الاوصاف الثلثة مع كونه اھ

"হিন্দিয়া", কিতাবে আছে-

التوضى بماء الزعفران والزردج والعصفور يجوز ان كان رقيقا والماء اھ

অনুরূপভাবে পানিতে পিট্কিরী বা কালি এতটুকু ঢাললে যদ্দ্বারা লিখা যাবে, তখন এ পানি দ্বারা অযু জায়েয হবে না। এখন তা পানি নেই। লিখার কালিতে পরিণত হল, অন্য জাতীয় বস্তুতে রূপান্তর হল।

বাহ্রুর রায়েক, হিন্দিয়া, রদ্দুল মোখতার কিতাবে আছে-

وكذا اذا طرح فيه زاج او عفص وصار ينقش به لزوال اسم الماء عنه

আর মিশানোর পর পানি যদি লিখার যোগ্য না হয়, তখন তদ্দ্বারা অযু করা জায়েয হবে। যদিওবা রং কালো হয়ে যায়। এখনো নাম পরিবর্তিত হয়নি।

"হিন্দিয়া" কিতাবে আছে-

اذا طرح الزاج او العفص في الماء جاز الوضوء به ان كان لا ينقش اھ

ফতওয়া খানিয়া কিতাবে আছে-

اذا طرح الزاج في الماء حتى اسود لكن لم تذهب رقته جاز اھ

অনুরূপভাবে পানিতে চনাবুট, শষ্যধান ভিজাল, বা কাঁদাযুক্ত মাটি বাঁ চনা মিশে গেল,

যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তরলতা বাকী থাকবে অযু জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না। এসব মাসায়েল সমূহের ব্যাপক আলোচনা মযহাবের বিভিন্ন কিতাবে বিস্তারিত আলোকপাত হয়েছেঃ

"বদায়ে" কিতাবে আছে–

تغير الماء المطلق بالطين اوبالتراب او بالجص اوبالنورة اوالخ

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে মুতলাক পানির সংজ্ঞাও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল, শুধুমাত্র গুণাবলীর পরিবর্তন আসলে পানি মুকাইয়্যাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ না পানির নাম পরিবর্তন হবে।

যে পানিতে চনা ভিজাল বা জাফরানের সামান্য পরিমাণ গুল বা কালি ইত্যাদি এতটুকু মিশাল, যতটুকু তে লিখার যোগ্য হয়নি বা ফিক্হ এর কিতাব সমূহে উল্লেখিত অযু জায়েয হওয়ার কোন পন্থা অবলম্বন করল।

শুধুমাত্র পানির তিনটি গুণাবলী রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ পরিবর্তনের দ্বারা যদি পানি মুকাইয়্যাদ হয়ে যেতো, তখনতো তা হতে অযু করার কোন পন্থা ছিল না। এখন আরো কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা বর্ণনা করবো। যেমন, তিনটি গুণাবলী পরিবর্তন হয়ে গেল, তবুও অযু জায়েয। কুপের মধ্যে যদি রশি লটকানো থাকে, যদ্দারা পানির রং, ঘ্রাণ, স্বাদ তিনটি গুণাবলীর পরিবর্তন আসলে সেটা দ্বারা অযু জায়েয যেমন ফত্ওয়া ইমাম শায়খুল ইসলাম তমরতাশি কিতাবে আছে–

سئل عن الوضوء والاغتسال بماء تغير لونه وطعمه وريحه الخ

হেমন্তকালে বৃক্ষ থেকে অধিক পত্র পল্লব পুকুরের পানিতে পতিত হয় এবং পানির তিনটি গুণাবলী পরিবর্তন করে দেয়, যদিও বা রং এতটুকু গাঢ় হয়ে যায়, হাতে নেয়ার পর অনুভব হয়, যদি তরলতা বাকী থাকে বিশুদ্ধ মযহাব অনুসারে অযু জায়েয হবে। ছিরাজ, ওয়াহ্হাজ, ফত্ওয়া আলমগীরি, জওহরা, নায়রা, ফত্ওয়া ইমাম শুজা তমরতাশি কিতাবে আছে–

فان تغيرت اوصافه الثلثة بوقوع اوراق الاشجار فيها الخ

ফত্ওয়া ইমাম শুজা কিতাবে, মুজতবা শরহে কুদুরী থেকে বর্ণনা করেন–

لوغير الاوصاف الثلثة بالاوراق ولم يسلب اسم الماء عنه الخ

এনায়া, হুলিয়া, বাহার, নাহার, মিসকীন, রদ্দুল মোখতার কিতাবে আছে–

المنقول عن الاساتذة انه يجوز حتى لو ان اوراق الاشجار الخ

দুর্রুল মোখতার কিতাবে আছে–

وان غير كل اوصافه فى الاصح وان بقيت رقته اى واسمه

রদ্দুল মোখতারে নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ মতানুসারে উল্লেখ হয়েছে–

مقابلة ماقيل انه ان ظهر لون الاوراق فى

পানির মধ্যে খেজুর রাখার কারণে পানিতে নির্যাস এসে গেল, কিন্তু খেজুর রসের সীমায় পৌছেনি। তখন সর্বসম্মতভাবে তা দ্বারা অযু জায়েয।

হুলিয়া, তবীয়ীন ও হিন্দিয়া কিতাবে আছে–

الماء الذى القى فيه تميرات فصار حلوا ولم يزل عنه اسم الخ

উপরোক্ত মহা মনিষীবৃন্দ ও মহান ইসলামী আইনজ্ঞ ইমমাবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের মতামতের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলো, শুধুমাত্র গুণাবলীর পরিবর্তন অযু হওয়ার অন্তরায় নয়। যতক্ষণ না অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে অন্য উদ্দেশ্যে নাম পরিবর্তিত হয়।

এখন আলোচ্য মাসয়ালায় চলে আসি, যদি হুক্কা, ব্যবহৃত পানি বা এমন বস্তু দ্বারা তাজা করল, যা অযুর যোগ্য ছিল না। যেমন গোলাপ বা শরীর বা মুখের ঘাম বা জঙ্গলে শ্রমের ঘাম, এসব গুলো তো প্রথম থেকেই অযুর অযোগ্য ছিল, এতে হুক্কার কি অপরাধ? আমরা তো এসব বস্তু দ্বারা অযুও জায়েয বলিনি, বা এ নিয়ে আমাদের আলোচনাও নহে। হুক্কার কারণে যদিও বা পানি পরিবর্তিত হয়, তবুও পূর্বের হুকুম বহাল থাকবে। তাজা করার পর হুক্কা এক চিলম পান করল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি এ রকম হয় যে, গুণাবলীর পরিবর্তন মোটেই অনুভব করা যায় না। তখন অযু জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন কথা নেই। আর যদি সব গুণাবলীর পরিবর্তন হয়, তখনও তরলতা ও পানির প্রবাহ বাকী থাকলে দলীলের আলোকে আইম্মায়ে কেরাম এবং হানাফী মযহাবের কোন আলেমের বিতর্ক না করা চাই।

মুতলাক পানির সংজ্ঞা এমন পানির উপর আরোপযোগ্য, যার তরলতা বাকী আছে এবং এমন বস্তুর মিশ্রণও হয়নি, যা পরিমাণে বেশী। বা অন্য কোন উদ্দেশ্যও নয় যদ্দারা নাম রূপান্তরিত হয়ে পানি পরিবর্তিত হয়ে যায়, প্রত্যেকে একে পানি বলে অভিযোগকারীরাও এর সংজ্ঞার আলোকে মুতলাক পানি ইহাকেই বলে, জানা গেল, হুক্কার পানি পাক।

তানভীরুল আবছার ও দুর্রুল মোখতার কিতাবে আছে–

(يجوز بماء خالطه طاهر جامد) مطلقا (كفاكهة وورق شجرة) الخ

'নুরুল ইযা' কিতাবে আছে–

لا يضر تغير اوصافه كلها بجامد كزعفران

এখন রইলো, এযাফত বা সম্বন্ধের বিষয়টি, শাব্দিক উচ্চারণে একে হুক্কার প্রতি সম্বন্ধ করা হয় এর দ্বারা এ পানি মুকাইয়্যাদ পানি হওয়া অপরিহার্য হয় না, যেমন কলসির পানি, ডেকের পানি, পাত্রের পানি, এ সম্বন্ধ হচ্ছে (এযাফতে তারিফী) পরিচিতি মূলক সম্বন্ধ। এর দ্বারা মুকাইয়্যাদ করা যাবে না। যেমন কুপের পানি, সমুদ্রের পানি, জাফরানের পানি।

তবয়ীন কিতাবে আছে–

اضافته الى الزعفران ونحوه للتعريف كاضافته الى البئر،

অনুরূপ শলবীয়া আলায়্যালী কিতাবে আছে–

اضافته الى الوادى والعين اضافة تعريف لا تقيد لانه

যদি এ ধারণা করা হয় যে, হুক্কার পানিতে দুর্গন্ধ হয়, এ কারণে নাজায়েয, তাহলে

প্রথমতঃ বলবো, হুক্কার পানির মধ্যে দুর্গন্ধ এটি ভুল। দ্বিতীয় পানির ভিত্তি। মুতলাক এবং মুকাইয়্যাদের উপর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের এতে কি দখল রয়েছে, জাফরান যদি পানির সাথে এতটুকু মিশায়, যদ্দারা রঙীন করার যোগ্য হয়ে পড়ে তখন এমন পানি দ্বারা অযু জায়েয নহে। যদিও সুগন্ধযুক্ত হয়। কিন্তু অধিকাংশ মযহাবের কিতাব সমূহে আছে, গোলাপের পানি দ্বারা অযু নাজায়েয।

হেদোয়া, খানিয়া, হিন্দিয়া কিতাবে আছে لا بماء الورد

মুনীয়া, গুনীয়া কিতাবে আছে- لا يجوز الطهارة الحكمية بماء الورد اه বৃক্ষের পাতা পানিতে পড়ল পানির তিনটি গুণাবলীতে পরিবর্তন আসলো, তখন কি পানি গুর্গন্ধ হবে না? অথচ মযহাবের প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা অযু জায়েয।

কুপের মধ্যে রশি লটকিয়ে আছে, পানির তিনটি গুণাবলী রং, ঘ্রাণ, স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেল এবং রশির অংশ বিশেষ জড় হয়ে গেছে, ইমাম শায়খুল ইসলাম গুজা তমরতাশি বলেন, এমন কুপের পানি দ্বারা অযু জায়েয। আলকাত্‌রা পানিতে পড়ল, যদ্দারা তীব্র দুর্গন্ধ বের হলো, যদি গাঢ় না হয় অযু জায়েয।

ফত্ওয়া যয়নীয়া কিতাবে আছে-

سئل عن الماء المتغير ريحه بالقطران يجوز الوضوء منه اه

অসংখ্য কিতাবের উদ্ধৃতির আলোকে প্রতীয়মান হলো যে, শুধুমাত্র তিনটি গুণাবলী নামায জায়েয হওয়ার অন্তরায় নয়। কেউ পানি সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ হওয়ার শর্ত যুক্ত করেননি, বিধায় হুকুম মুতাবিক আমল বাকী থাকবে। আল্লাহর শুকরিয়া যখন এসব উজ্জ্বল প্রমাণাদির আলোকে সাব্যস্ত হলো যে, হুক্কার পানি পবিত্র ও পবিত্রকারী। যেমন,কেউ হাত মুখ ধুয়ে নিল, পা বাকী রয়েছে পানি শেষ হয়ে গেছে, সেখানে অন্য কোন পানি নেই, যদ্দারা অযু পূর্ণ করবে, তার নিকট হুক্কার মধ্যে এতটুকু পানি মওজুদ আছে, যদ্দারা পা ধোয়া যথেষ্ট হলে ধুয়ে নেবে। আর যদি তার নিকট মোটেই না থাকে, হুক্কার পানি অযুর অঙ্গ সমূহ ধৌত করলে যথেষ্ট হবে, অন্য পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুমের নির্দেশ রয়েছে। এক্ষেত্রে তায়াম্মুমের নির্দেশ বা হুকুম কখনও দেয়া যাবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ،

অর্থঃ তোমরা পানি না পেলে তখন পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এখন তার কাছে তো, পানি মওজুদ আছে, যদিও হুক্কার পানি এখন অভিযোগকারীরাই বলুক, তারা পানি থাকা সত্ত্বেও তা দ্বারা অযু পূর্ণ না করে এবং তায়াম্মুম করে, তারা আল্লাহর নির্দেশের বিরোধীতা করল কি না? নিঃসন্দেহে তাদের তায়াম্মুম বাতিল হবে।

অবশ্য সময় শেষ হতে যদি দীর্ঘ অবকাশ থাকে এবং পানিও যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয় তখন এতটুকু বিরতি প্রয়োজন হবে, যেন গন্ধ চলে যায়, নামায অবস্থায় অঙ্গ সমূহ থেকে গন্ধ বের হওয়া মাকরূহ এবং এ অবস্থায় মসজিদে যাবার অনুমতি হবে না। দুর্গন্ধ সহকারে মসজিদে গমন করা হারাম। কাঁচা রসুণ সম্পর্কে হাদীসে এরশাদ হয়েছে,

من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فان الملئكة تتاذى مما يتاذى به الانس

যে এ দুর্গন্ধবৃক্ষ হতে ভক্ষণ করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে, যদ্দারা মানুষরা কষ্ট পায় তা দ্বারা ফেরেস্তারাও কষ্ট পায়। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যেন, মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে গমন না করে।

দুর্রুল মোখতারে আছে, واكل نحو ثوم

এ বিষয়ে রদ্দুল মোখতারেও বর্ণিত হয়েছে,

كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان اكل الثوم والبصل،

একারণেই মাটির তৈল এবং এমন দিয়াশলাই যা জ্বালাবার সময় দুর্গন্ধ বের হয়, মসজিদে জ্বালানো হারাম।

রদ্দুল মোখতারে আছে,

قال الامام العينى فى شرحه على صحيح البخارى قلت علة النهى اذى الملئكة واذى المسلمين ولا يختص بمسجده عليه اه

২য় খন্ড সমাপ্ত

══ ঃ ══

বাহারে শরীয়ত

তৃতীয় খণ্ড

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
"নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাসূলিহিল করীম"

كِتَابُ الصَّلٰوة

নামাযপর্ব

ঈমানের পর নামায ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অসংখ্য স্থানে সালাতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সালাত আদায়ের প্রতি কঠোর তাকীদ আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারীর শাস্তি ও পরিণাম তথা পরকালীন ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে এতদসম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত ও পবিত্র হাদীস সমূহ বর্ণিত হলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ, তাতে হেদায়ত রয়েছে খোদাভীতি সম্পন্নদের জন্য, তারাই যারা না দেখে ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে। (সূরা বাক্বারা)

আরো এরশাদ হয়েছে-

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

অর্থাৎ, আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়। (সুরা বাক্বারা)

আরো এরশাদ হয়েছে- وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় নামায অবশ্যই ভারী কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা আন্তরিকভাবে আমার প্রতি বিনীত হয়। (সুরা বাক্বারা আয়াত- ৪৫)

শরয়ী ওজর ব্যতীত নামাযের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন মারাত্মক অপরাধের শামিল। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে কঠোর হুশিয়ারী করা হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

অর্থাৎ, অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর। (সূরা মাউন আয়াত- ৪)

সালাত সম্বন্ধে উদাসীন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছে-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الخ

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ, পরবর্তীরা যারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। সালাত অনাদায়ী, পরিত্যাগকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নি শিখায় দগ্ধ করা হবে। যার প্রচণ্ডতা ও উত্তপ্ততা তীব্র হবে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا

অর্থাৎ, আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (পারা ১৫- বনী ঈসরাইল)

উপরোক্ত আয়াত সমূহের আলোকে নামায আদায়ের গুরুত্ব ও সালাত বর্জনকারী বা সালাতের প্রতি উদাসীন ব্যক্তির পরিণতি ও পরকালীন কঠিন আযাব ও মর্মান্তিক শাস্তির কথা প্রমাণিত হল।

সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কিত পবিত্র হাদীস সমূহ

হাদীসঃ (১) প্রসিদ্ধ ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় রাসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্ব করা, রমজান শরীফের রোজা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হাদীসঃ (২) হযরত মায়াজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল! এমন এক আমলের নির্দেশ দিন যা জান্নাতে নিয়ে যাবে, জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেবে। প্রিয়নবী এরশাদ করেন, আল্লাহর ইবাদত কর, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমজানের রোজা রাখ, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব কর। (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

হাদীসে এটাও উল্লেখ হয়েছে- ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামায।

হাদীসঃ (৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমার নামাজ হতে অপর জুমার নামায ও এক রমজানের রোযা হতে অপর রমজানের রোযা

কাফ্ফারা হয় সেই সকল গুনাহের জন্য যা এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়, যদি কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে। (মুসলিম শরীফ)

হাদীসঃ (৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আচ্ছা বলতো যদি তোমাদের কারো দরজার কাছে একটি পানির ফোয়ারা থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করবে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকবে। তারা বললেন না- তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ নামাযের উদাহরণ এইরূপই। এর বিনিময়ে আল্লাহ নামাযীর অপরাধ সমূহ মুছে দেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হাদীসঃ (৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন করল অতঃপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার খবর জানালে, তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন-

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ

অর্থাৎ, দিনের দুই অংশে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম কর, তখন লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল এটা কি আমার জন্য? তিনি বললেন আমার সকল উম্মতের জন্যই। অপর এক বর্ণনায় আছে আমার উম্মতের যে কেউই এরূপ আমল করবে। অর্থাৎ কোন পাপ কাজ করে ফেলার পর পূণ্য কাজ করবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হাদীসঃ (৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল কোনটি? এরশাদ করেন সময় মত নামায পড়া, আমি বললাম তারপর কি? এরশাদ ফরমালেন পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ করা। আবার বললাম তারপর কি? এরশাদ করেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

হাদীসঃ (৭) হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল (দঃ) ইসলামে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ কোনটি? এরশাদ করেন সময় মত নামায পড়া। যে নামায ত্যাগ করলেন তার কোন ধর্ম নেই, নামায দ্বীনের স্তম্ভ।

হাদীসঃ (৮) হযরত আমর বিন শোয়াইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী এরশাদ করেন তোমাদের সন্তান যখন সাত বৎসরে উপনীত হবে তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দাও। যখন দশ বৎসরে উপনীত হবে তখন প্রয়োজনে প্রহার কর। (আবু দাউদ শরীফ)

হাদীসঃ (৯) হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা শীত কালে বের হলেন, তখন গাছের পাতা ঝড়ছিল, তখন তিনি একটি গাছ হতে দুটি ডালা ভেঙ্গে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন সব পাতা আরো অধিক ঝরতে লাগল, আবুজর (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে ডাকলেন, হে আবুজর! আমি উত্তর করলাম হে আল্লাহর রাসূল (দঃ) আমি হাজির আছি। হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নিশ্চয়ই মুসলমান বান্দা যখন নামায পড়ে এবং তা দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান ইচ্ছা করে তখন হতে তার গুনাহ সমূহ ঝরতে থাকে যেভাবে এই গাছ হতে পাতা সমূহ ঝরছে। (আহমদ)

হাদীসঃ (১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি নিজ ঘরে অযু গোসল সেরে ফরজ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করে তার এক কদমে একটি গুনাহ মিটে যায়। দ্বিতীয় কদমে একটি দরজা বুলন্দ হয়। (মুসলিম শরীফ)

হাদীসঃ (১১) হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) বলেন রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামায পড়েছে আর তাতে ভুল করে নাই আল্লাহ তার (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন যা ইতোপূর্বে হয়েছে। (আহমদ)

হাদীসঃ (১২) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ফজরের নামায়ে এবং এশার নামায জামাত সহকারে আদায় করবে আল্লাহ তাকে দুটি মুক্তি দেবেন, এক প্রকারঃ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি (দুই) নিফাক থেকে মুক্তি।

হাদীসঃ (১৩) তিবরানী আওসাত কিতাবে ও যিয়া (রাঃ) আনস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সর্বপ্রথম কিয়ামতের দিবসে বান্দার নিকট নামাযের হিসেব নেয়া হবে, এটা যদি ঠিক হয় বাকী সব আমল ঠিক হবে, এটি অশুদ্ধ হলে সবগুলো অশুদ্ধ। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, সে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হাদীসঃ (১৪) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ (রাঃ) শরীফে, তামীম দারী (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, যদি নামায পূর্ণ করা হয় সম্পূর্ণ লিখা হবে। আর যদি পূর্ণ করা না হয় অর্থাৎ ত্রুটি থাকে, তখন ফেরেস্তাদেরকে বলবে, আমার বান্দাদের নফল দেখো? নফল দ্বারা তাদের ফরজ পূর্ণ করে দাও। অতঃপর যাকাতের হিসেব হবে। এভাবে অবশিষ্ট আমলের হিসেব হবে।

হাদীসঃ (১৫) আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ শরীফে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মুসলমান জাহান্নামে যাবে তার সম্পূর্ণ শরীর আগুনে ভক্ষণ করবে, সিজদার স্থান ব্যতীত, আল্লাহ তায়ালা তা ভক্ষণ করা আগুনের উপর হারাম করে দিয়েছেন।

হাদীসঃ (১৬) তিবরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন বান্দাকে সিজদারত অবস্থায় দেখা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। যে নিজের মুখ মাটিতে ঘষছে।

হাদীসঃ (১৭) তিবরানী শরীফে, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এমন কোন সকাল সন্ধ্যা নেই,

জমীনের এক অংশ অন্য অংশকে ডাক দিয়ে বলে, আজকে তোমার উপর কোন পূন্যবান বান্দা অতিক্রম করেছে, যে তোমার উপর নামায পড়েছে বা আল্লাহর জিকর করেছে। যদি জমীন হ্যাঁ বলে, তখন এ কারণে এক জমীন অন্য জমীনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে।

হাদীসঃ (১৮) মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন নামায বেহেস্তের চাবিকাঠি, আর পবিত্রতা নামাযের চাবিকাঠি।

হাদীসঃ (১৯) আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে অযু করে ফরজ নামাযের জন্য ঘর হতে বের হলো, তার প্রতিদান এমন, যেরূপ হজ্ব পালনকারী মুহরিম। আর যে চাশ্‌তের নামাযের জন্য বের হলো, তার বিনিময় ওমরা আদায়কারীর সমতুল্য। আর এক নামায হতে অপর নামায পর্যন্ত দুয়ের মাঝখানে যদি কোন অনর্থক কথা না বলে, তার আমলনামা ইল্লীয়ীন এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। অর্থাৎ কবুলের স্তরে পৌছবে।

হাদীসঃ (২০-২১) ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবু আয়ূব আনসারী ও ওকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে অযু করল, যেরূপ হুকুম করা হয়েছে এবং নামায পড়ল যেরূপ হুকুম করা হয়েছে তাহলে যা কিছু পূর্বে করেছে সব ক্ষমা হয়ে যাবে।

হাদীসঃ (২২) ইমাম আহমদ, আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে। তার জন্য একটি নেকী লিখা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ হয়; এবং একটি মর্যাদা বুলন্দ হয়।

হাদীসঃ (২৩) কানযুল উম্মাল শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নির্জনতায় দু'রাকাত নামায পড়ল, আল্লাহ এবং ফেরেস্তা ব্যতীত কেউ দেখেনি, তার জন্য জাহান্নামের মুক্তি লিপিবদ্ধ হবে।

হাদীসঃ (২৪) মুনীয়াতুল মুসল্লা কিতাবে এরশাদ হয়েছে, প্রত্যেক বস্তুর একটি নিদর্শন আছে। ঈমানের নিদর্শন হলো নামায।

হাদীসঃ (২৫) মুনীয়াতুল মুসল্লা শরীফে এরশাদ হয়েছে নামায দ্বীনের স্তম্ভ। যে তা কায়েম করল সে দ্বীনকে কায়েম করল। যে ত্যাগ করল, সে দ্বীনকে ধ্বংস করল।

হাদীসঃ (২৬) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, উবাদা বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন। আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায বান্দার উপর ফরজ করেছেন, যে উত্তমরূপে অযু করল, এবং সময় মত নামাজ পড়ল, এবং রুকু সিজদা বিনয় সহকারে করল, আল্লাহ তায়ালা তার জিম্মাদারীর অঙ্গীকার করেছেন, তাকে ক্ষমা করবেন। যে পড়লনা, তার জন্য অঙ্গীকার নেই। ইচ্ছা করলে, ক্ষমা করবেন, ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন।

হাদীসঃ (২৭) হাকেম স্বীয় 'তারিখে' উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি সময়মত নামায কায়েম করে, তাহলে আমার বান্দার জিম্মা আমার অঙ্গীকারে আছে। তাকে আযাব দিবনা এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

হাদীসঃ (২৮) দায়লামী, আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা এমন কোন বস্তু ফরজ করেননি, যা তাওহীদ এবং নামায হতে শ্রেষ্ঠ। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস যদি হতো তা ফেরেস্তাদের উপর ফরজ করতেন, তাদের কেউ রুকুতে-কেউ সিজদায়।

হাদীসঃ (২৯) আবু দাউদ তাবরানী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, বান্দা নামায পড়ে এ স্থানে যতক্ষণ বসা থাকে ফেরেস্তা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অযুহীন হওয়া বা দাড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত, তার জন্য ফেরেস্তার এস্তেগফার নিম্নরূপঃ

اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ○

ফকিহী বিধান

মাসয়ালাঃ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানী মুসলমান নরনারীর উপর নামায ফরজে আইন, এর অস্বীকারকারী কাফির। যে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেবে যদিও এক ওয়াক্ত হয় সে কাফির।

মাসয়ালাঃ সন্তান সন্ততি যখন সাত বৎসরে পৌছবে তাদেরকে নামাযের নিয়ম শিক্ষা দেবে, অভ্যস্ত করাবে, যখন দশ বৎসরে উপনীত হবে প্রহার করে শিখাতে হবে।

মাসয়ালাঃ নামায শারীরিক ইবাদত এতে 'নিয়াবত' বা প্রতিনিধিত্ব করা যাবে না অর্থাৎ একজনের পক্ষ থেকে অন্যজন আদায় করা যাবে না।

মাসয়ালাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে সময় থাকতে নামায পড়ে নিল, নামাযের শেষ সময়ে যদি বালেগ হয়ে যায় তার জন্য নামায পুনরায় পড়া ফরজ। অনুরূপ, কেউ মুরতাদ হয়ে গেল তারপর শেষ সময়ে ইসলাম গ্রহণ করল, তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামাজ পড়া ফরজ। যদিও প্রথম ওয়াক্তে মুরতাদ হওয়ার পূর্বে নামায পড়ে থাকে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ধারণা ছিল, এখনও সময় হয়নি, নামায পড়ে নিল, নামাযের পর অবগত হল, ওয়াক্ত হয়েছে। তাহলে নামায হয়নি পুনরায় পড়তে হবে।

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি সময়ের প্রথম ভাগে নামায পড়েনি সময়ের শেষভাগে এমন ওজর সৃষ্টি হল যা দ্বারা নামায রহিত হয়ে যায়, যেমন হায়েয-নিফাস সম্পন্ন হল, অথবা পাগল বা জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লো তার জন্য সে ওয়াক্তের নামায মাফ হয়ে গেল তার উপর কাযা দেয়াও ওয়াজিব হবে না।

নামাযের সময়সীমার বর্ণনা

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

অর্থাৎ নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে(সূরা নিসা ৫ পারা আয়াত -১০৩)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

অর্থাৎ ঃ অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা।

হাদীস (১) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ফজর দুইটি, এক, যে অংশে খাদ্য খাওয়া হারাম (অর্থাৎ রোযাদারের জন্য) নামায হালাল, দুই- যার মধ্যে নামায (ফজর) হারাম এবং খাবার হালাল।

হাদীস (২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত পেল সে নামায পেল, আর যে ব্যক্তি সূর্য অস্তের পূর্বে আছরের এক রাকাত পেল সে নামায পেল অর্থাৎ তার নামায হয়ে গেল।

হাদীস (৩) হযরত রাফে বিন খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ফজরের নামায আলো বিকশিত অবস্থায় পড়, এতে বেশী পূণ্য রয়েছে। (তিরমিযী)

হাদীস (৪) দায়লামী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আকাশ আলোকিত অবস্থায় ফজর পড়লে তোমাদের জন্য মাগফেরাত রয়েছে, অপর বর্ণনায় আছে যে ফজর আলোকরশ্মিতে পড়বে আল্লাহ্ তায়ালা তার কবর এবং অন্তর আলোকিত করবেন এবং তার নামায কবুল করবেন।

মাসয়ালাঃ ফজরের ওয়াক্তঃ

ফজরের ওয়াক্ত হবে সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যের আলোক রশ্মি চমকানো পর্যন্ত। সুবহে সাদেক এমন এক প্রকার আলোকে বলা হয় যা সূর্য উদিত হওয়ার আগে সূর্যের উপরে আসমানের পূর্ণ কিনারায় প্রকাশ পায় এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত আসমানে ছড়িয়ে পড়ে এবং চতুর্দিকে উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে যায়। এ আলো প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায় এবং ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। এ আলোর আগে আসমানের মাঝখানে একটি লম্বা সাদা রেখা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বিকশিত হতে দেখা যায়, যার নীচে সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার থাকে। সে লম্বা রেখা সুবহে সাদেকের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায় এ লম্বা সাদা রেখাকে সুবহে কাযেব বলা হয়। তখন ফজরের ওয়াক্ত হয় না। যারা বলে সুবহে কাযেবের সাদা রেখা অদৃশ্য হওয়ার পর অন্ধকার হয়ে যায় তা নিতান্ত ভুল। আমরা যা বলেছি তাই বিশুদ্ধ।

আছরের ওয়াক্তঃ যোহরের ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে অর্থাৎ কোন বস্তুর ছায়া আছলী ব্যতীত দ্বিগুণ হবার পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত আসরের সময় বাকী থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ আসরের সময় কমপক্ষে ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট এবং বেশী হলে দুই ঘন্টা ছয় মিনিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট থাকে, তারপর ১লা নভেম্বর থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ পৌনে চার মাস ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট পর্যন্ত থাকে, বৎসরের মধ্যে এটাই আসরের জন্য সবচেয়ে কম সময়। এপ্রিল, মে মাসে প্রায় পৌনে দু' ঘন্টা সময় থাকে, মে মাসের শেষের দিকে এবং জুন মাসে প্রায় দু'ঘন্টা সময় থাকে, আবার আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে পৌনে দু'ঘন্টা সময় থাকে আর অক্টোবরের শেষের দিকে ১ ঘন্টা ৩৭ মিনিটের কাছাকাছি সময় থাকে।

মাগরিবের ওয়াক্তঃ মাগরিবের ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সাদা আভা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

মাসয়ালাঃ আমাদের মযহাব মতে শফক্ব হচ্ছে সেই সাদা আভা যা পশ্চিম প্রান্তে লালিমা বিলুপ্ত হবার পর উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে সুবহে সাদেকের ন্যায় বিস্তার লাভ করে, এ সময়টা কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১৮ মিনিট, বেশী হলে ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট হয়ে থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ প্রতিদিনের ফজর এবং মাগরিব দুইটির ওয়াক্ত বরাবর হয়ে থাকে।

এশা ও বিতিরের ওয়াক্তঃ মাগরিব সমাপ্তির পর উল্লেখিত সাদা আভা ডুবার পর থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত এশার সময়।

মাসয়ালাঃ যদিও এশা এবং বিতিরের ওয়াক্ত একটি তথাপি উভয় নামাযে তারতীব রক্ষা করা ফরজ। কেউ এশার পূর্বে বিতির পড়ে নিয়ে হবেই না। অবশ্য ভুলক্রমে বিতির যদি প্রথমে পড়ে নেয় পরে জানতে পারল যে, এশার নামায ওজু বিহীন পড়েছে, বিতির অযুর সঙ্গে পড়েছে তখন বিতির হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ যে সব শহরে এশার সময়ই হয় না বা আসেনা, যেমন আকাশের সাদা আভা ডুবার সাথে সাথে ফজর উদয় হয়ে যায় যেমন বলগার এবং লন্ডনের সে সব শহরে যেখানে প্রত্যেক বৎসরের চল্লিশ রাত এরূপই হয়ে থাকে, যেখানে এশার ওয়াক্ত হয়না, সাথে সাথে ফজর হয়ে যায়। কোন সময় কয়েক মিনিটের জন্যে আসে, তখন সেখানকার বাসিন্দাদের উচিৎ সে দিনগুলোর এশা ও বিতিরের নামায কাজা পড়বে।

মুস্তাহাব ওয়াক্ত সমূহঃ

ফজরে দেরী করা মুস্তাহাব অর্থাৎ আকাশ উজ্জ্বল হলে পড়া মুস্তাহাব, তবে এমন ওয়াক্তে হওয়া মুস্তাহাব যেন চল্লিশ থেকে ষাট আয়াত পর্যন্ত পড়া যায়। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর এতটুকু সময় থাকা বাঞ্ছনীয় যেটুকু সময়ে কোন কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলে দ্বিতীয় বার চল্লিশ থেকে ষাট আয়াত পর্যন্ত পড়তে পারে। এতটুকু দেরী করা মাকরুহ, যেন সূর্য উদয় হওয়ার সন্দেহ না হয়।

মাসয়ালাঃ হাজীদের জন্য মুযদালাফায় ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ফজর পড়াঃ মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ মহিলাদের জন্য ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্তে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব। নারীদের বেলায় অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে উত্তম এটা যে তারা পুরুষদের জামাত হয়ে গেলে পড়বে।

মাসয়ালাঃ শীতকালে জোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব, গ্রীষ্মকালে দেরী করা মুস্তাহাব, একা পড়ুক বা জামাত সহকারে পড়ুক।

মাসয়ালাঃ জুমার মুস্তাহাব ওয়াক্ত সেটাই, যেটা যোহরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত।

মাসয়ালাঃ আছরের নামায সর্বদা দেরী করা মুস্তাহাব তবে এতটুকু দেরী নয় যেটুকু সময়ে সূর্যের পাণ্ডুবর্ণ এসে যায়।

মাসয়ালাঃ অভিজ্ঞতায় জানা গেছে সূর্যের গোলকে পাণ্ডুবর্ণ সেই সময় আসে যখন ডুবার সময় বিশ মিনিট বাকী থাকে। এতটুকু পরিমাণ সময় মাকরূহ সময়। অনুরূপ সূর্য উদয়ের বিশ মিনিট পর নামায পড়া জায়েজ হয়ে যায়।

মাসয়ালাঃ দেরী, দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুস্তাহাব সময়কে দু'ভাগ করে, দ্বিতীয় ভাগে আদায় করবে।

মাসয়ালাঃ আছরের নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তে শুরু করেছিল, কিন্তু এতটুকু দীর্ঘ করেছে মাকরূহ ওয়াক্ত এসে গেল, তখন এতে মাকরূহ হবে না।

মাসয়ালাঃ উত্তম হচ্ছে কোন বস্তুর ছায়া আছলী ব্যতীত একগুণ হওয়ার পর জোহরের নামায এবং দ্বিগুণ হওয়ার পর আছরের নামায পড়া।

মাসয়ালাঃ মেঘলা দিন ব্যতীত সব সময় মাগরীবের নামায অনতিবিলম্বে পড়া মুস্তাহাব এবং দু'রাকাত নামায পড়ার মত সময় থেকে অধিক দেরী করা মাকরূহ তানযীহ এবং সফর, অসুস্থতা ইত্যাদির অজুহাত ব্যতীত তারকা সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত দেরী করা মাকরূহ তাহরীমি।

মাসয়ালাঃ এশার নামায এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা মুবাহ, অর্থাৎ অর্ধরাত হওয়ার আগেই ফরজ পড়ে নেয়া মুবাহ এবং অর্ধরাত থেকে অধিক বিলম্বিত করা মাকরূহ। কারণ জামাত ছোট হয়ে যায়।

মাসয়ালাঃ এশার নামায পড়ার আগে শোয়া মাকরূহ। এশার নামাযের পর দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা, গল্প গুজব করা বা শুনা মাকরূহ। অবশ্যই জরুরি কথাবার্তা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, জিকির করা, দ্বীনি মাসায়েল বর্ণনা করা, বুযুর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন কাহিনী বর্ণনা করা ও মেহমানদের সাথে কথাবার্তা বলার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপ ভাবে সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত জিকরে এলাহী ব্যাতীত যাবতীয় কথাবার্তা বলা মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস রাখে তার জন্য শেষ রাত্রে বিতির পড়া মুস্তাহাব। অন্যাথায় নিদ্রার পূর্বে পড়ে নেয়া চাই, এর পর যদি শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলে তাহাজ্জুদ পড়ে নেবে; বিতির দ্বিতীয়বার পড়া জায়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ মেঘলা দিনে আসর ও এশার নামায বিলম্ব না করা মুস্তাহাব এবং বাকী নামায সমূহের বেলায় বিলম্ব করা মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ সফর ইত্যাদি ওজরের কারণে দুই ওয়াক্তের নামাযকে একত্রিত করা হারাম, তবে আরাফাত, মুযদালাফার হুকুম অত্র হুকুমের বহির্ভূত, আরাফায় জোহর এবং আছর জোহরের সময় পড়ে নিবে। মুযদালাফায় মাগরিব এবং এশা, এশার সময় পড়ে নিবে।

নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত সমুহ

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহর, এ তিন সময়ে কোন প্রকার নামায পড়া জায়েজ নেই, ফরজ, ওয়াজিব নফল, কাযা, তিলাওয়াতে সিজদা, সিজদায়ে সহ কোনটিই এ সময়ে জায়েজ নেই, অবশ্য যদি সে দিনের আছরের নামায না পড়ে থাকে তাহলে সূর্যাস্তের সময় পড়ে নিবে, কিন্তু এতটুকু বিলম্ব করা হারাম।. হাদীস শরীফে এ সময়ের

নামাযকে মুনাফিকের নামায বলা হয়েছে, সূর্যোদয় বলতে সূর্যের কোণা দেখা যাওয়ার থেকে শুরু করে পূর্ণ বের হয়ে আসার পর ঐ সময় পর্যন্ত, যখন এটার উপর চোখ ঝলসে যায়। এ সময়টার পরিমাণ বিশ মিনিট। দ্বিপ্রহর বলতে শরয়ী অর্ধ দিবস থেকে শুরু করে হাকিকী অর্ধ দিবস অর্থাৎ সূর্য ঝুকে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়টাকে বুঝায়।

মাসয়ালাঃ জানাযা যদি নিষিদ্ধ ওয়াক্ত সমূহে নিয়ে আসা হয়, পড়ে নিলে মাকরূহ হবে না। মাকরূহ সে সময় হবে, যদি পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিল কিন্তু দেরী করল যার কারণে মাকরূহ ওয়াক্ত এসে গেল, তাতে মাকরূহ হবে।

মাসয়ালাঃ নিষিদ্ধ ওয়াক্ত সমূহে আয়াতে সিজদা পাঠ করলে উত্তম হবে। সিজদাকে বিলম্ব করা যেন মাকরূহ ওয়াক্ত চলে না যায় এবং যদি মাকরূহ ওয়াক্তেও করে নেয় তবুও জায়েজ হবে। মাকরূহ বিহীন ওয়াক্তে তিলাওয়াত করে মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদা করলে মাকরূহে তাহরীমি হবে।

মাসয়ালাঃ নিষিদ্ধ ওয়াক্তে ক্বাযা নামায পড়া জায়েজ হবেনা। কাযা নামায শুরু করে দিলে ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব এবং মাকরূহ বিহীন ওয়াক্তে পড়ে নিবে। যদি না ভেঙে পড়ে নিল, তখন ফরজ রহিত হয়ে যাবে এবং গুনাহগার হবে।

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট ভাবে এ সময়ে নামায পড়ার মান্নত করল অথবা সাধারণ নামায পড়ার মান্নত করল, উভয় অবস্থায় মান্নত পূর্ণ করা জায়েজ হবে না বরং পূর্ণ ওয়াক্তের মান্নত আদায় করবে।

মাসয়ালাঃ নিষিদ্ধ ওয়াক্তে নফল নামায শুরু করল, ঐ নামায ওয়াজিব হয়ে গেল, কিন্তু সে সময়ে পড়া জায়েজ হবে না। নামায ভেঙ্গে ফেলবে এবং পূর্ণ ওয়াক্তে ক্বাযা করবে, যদি পূর্ণ করে ফেলে গুনাহগার হবে, তখন ক্বাযা করা ওয়াজিব হবে না।

মাসয়ালাঃ যেসব নামায মুবাহ বা মাকরূহ ওয়াক্তে শুরু করে ভেঙ্গে দিল, সে সকল নামাযও ঐ সময়ে পড়া জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ উপরোক্ত সময়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা উত্তম নয়, তবে জিকির ও দরুদ শরীফে নিয়োজিত থাকাই উত্তম।

নফল নামায পড়ার নিষিদ্ধ সময় সমূহ

মাসয়ালাঃ বারটি সময়ে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ তন্মধ্যে ৬, ১২ নম্বর ওয়াক্তে ফরজ, ওয়াজিব, জানাযা নামায, সিজদায়ে তিলাওয়াত ও নিষিদ্ধ ওয়াক্ত সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) ফজর উদয় থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ ফজর উদয়ের পূর্বে কোন ব্যক্তি নফল নামায পড়ছিল এক রাকাত পড়তেই ফজর উদয় হল, তখন দ্বিতীয় রাকাত পড়ে পূর্ণ করে নিবে। এই দু'রাকাত

ফজরের সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হবে না, যদি চার রাকাতের নিয়্যত করে থাকে এক রাকাতের পর ফজর উদয় হল, তখন চার রাকাত পূর্ণ করে নেবে, তখন পরের দুই রাকাত, ফজরের সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হবে।

মাসয়ালাঃ ফজরের নামাযের পর হতে সূর্য্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যদি প্রচুর সময় বাকী থাকে যদিও ফজরের সুন্নাত ফরজের পূর্বে পড়েনি এখন পড়তে চাইলে জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ ফরজের পূর্বে ফজরের সুন্নাত আরম্ভ করার পর ভঙ্গ হয়ে গেল, এখন ফরজের পর তা কাযা পড়তে চাইলে তাও জায়েজ হবে না।

মাসয়ালাঃ (২) নিজ মযহাবের জামাতের একামত শুরু হল, একামত হতে জামায়াত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নফল, সুন্নত পড়া মাকরূহে তাহরিমী। অবশ্য ফজরের নামাজ কায়েম হল ধারণা হচ্ছে সুন্নত পড়ে নিয়ে তখনও জামায়াত পাওয়া যাবে, যদিও শেষ দিকে শরীক হয়। তখন জামায়াত থেকে একটু দূরে সরে সুন্নত পড়ার পর জামাতে শরীক হবে, সুন্নত পড়তে গিয়ে জামাত চলে যাওয়ার উপক্রম হলে তখন সুন্নতের খেয়ালে জামাত বর্জন করা নাজায়েজ ও গুণাহ।

(৩) আছরের নামাযের পর হতে সূর্য নীল বর্ণ হওয়া পর্যন্ত নফল নামায নিষিদ্ধ, নফল নামায শুরু করার পর ভেঙ্গে গেলে তা এ সময়ে কাযা পড়াও নিষিদ্ধ, যদি পড়ে তা যথেষ্ট হবে না কাযা দায়িত্ব থেকে রহিত হবে না।

(৪) সুর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের ফরজ পর্যন্ত সর্ব প্রকার নফল নিষিদ্ধ।

(৫) যে সময় ইমাম স্বীয় স্থান থেকে জুমার খোতবার জন্য দন্ডায়মান হবে সে সময় হতে জুমার ফরজ শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল ও সুন্নত সমূহ মাকরূহ।

(৬) খোৎবার সময় ১ম খোৎবা হউক দ্বিতীয় খোৎবা হোক, জুমার হোক বা দু'ঈদের খোৎবা বা, সূর্য গ্রহণের নামাযের খোৎবা হোক, বৃষ্টি প্রার্থনার খোৎবা হোক, হজ্ব বা বিবাহের খোৎবা হোক, খোৎবা পাঠ কালে সর্বপ্রকার নফল জায়েজ নহে, এমনকি কাযা নামাযও নাজায়েজ।

মাসয়ালাঃ জুমার সুন্নত শুরু করল এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব খোৎবা পাঠের জন্য দাড়াল তখন চার রাকাত পূর্ণ করে নিবে।

(৭) দুই ঈদের নামযের পূর্বে নফল মাকরূহ, ঘর, ঈদগাহ বা মসজিদে যেখানেই হোক।

(৮) দুই ঈদের নামাযের পর নফল মাকরূহ, যদি ঈদগাহে বা মসজিদে হয়, তবে ঘরের মধ্যে পড়া মাকরূহ নহে।

(৯) আরাফাতের যেখানে জোহর আছর একত্রে পড়া হয় তার মধ্যে বা তারপর সর্ব প্রকার সুন্নত নফল মাকরূহ।

(১০) মুযদালাফা যেখানে মাগরিব এশা একত্রে পড়া হয় তার মাঝখানে সুন্নাত ও নফল পড়া মাকরূহ, পরে পড়া মাকরূহ নহে।

(১১) ফরজের সময় যদি নিতান্ত সংকীর্ণ হয় সর্ব প্রকার নামাজ এমনকি ফজরের সুন্নত, জোহরের সুন্নতও মাকরূহ।

(১২) মানবিক প্রয়োজন দূর না করে নামায পড়া মাকরূহ যেমন পায়খানা প্রস্রাবের হাজত বা বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে তা সেরে নেবে তবে সময় চলে গেলে নামায পড়ে নেবে। অনুরূপভাবে খাবার সামনে আসল, তার আসক্তিও রয়েছে অথবা এমন কাজ উপস্থিত হল যা না করলে নামাযে একাগ্রতা থাকবেনা এমতাবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ।

আজানের বর্ণনা

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন– وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

অর্থঃ "তার চেয়ে অধিক সত্য কথা কার হতে পারে? যে আল্লাহর প্রতি আহবান করে এবং সৎকার্য করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত"। আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবাদেরকে আজান স্বপ্নযোগে শিক্ষা দেয়া হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ইহা সত্য স্বপ্ন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন যাও বেলাল (রাঃ) কে শিক্ষা দাও, তিনি আজান দেবেন সে তোমার চেয়ে অধিক উচ্চস্বরের অধিকারী এ হাদীস ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, দারেমী প্রমুখ বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাঃ) কে হুকুম দিলেন আজানের সময় আঙ্গুল সমূহ কর্ণের ভিতরে প্রবিষ্ট করবে তাদ্বারা আওয়াজ উচ্চ হয়। এ হাদীস ইবনে মাজাহ, আবদুল রহমান বিন সাদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন আজানের অসংখ্য ফজিলত রয়েছে হাদীস শরীফে যা উল্লেখিত হয়েছে। কতিপয় ফজিলত, হাদীসের আলোকে নিম্নে বর্ণিত হলঃ

আযানের ফজিলত সংক্রান্ত হাদীস সমূহ

হাদীসঃ (১) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিবসে মুয়াযযিনদের ঘাড় অন্যান্য মানুষের তুলনায় লম্বা হবে। (ইমাম মুসলিম, আহমদ, ইবনে মাজাহ)

হাদীসঃ (২) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যতদুর মুয়াযযিনের আওয়াজ পৌঁছবে ততদূর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, তাকে ক্ষমা করা হয়, জল স্থলে যা কিছু তার আওয়াজ

শুনবে তাকে সত্যায়ন করবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে জলস্থালে যা কিছু তার আওয়অজ শুনবে তার জন্য স্বাক্ষী হবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে প্রত্যেক টিলা এবং পাথর তার পক্ষে স্বাক্ষী দেবে।

হাদীসঃ (৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আজান দাতা ছোয়াবের প্রত্যাশী হলে সে শহীদের সমতুল্য হবে। যার দেহ রক্তে রঞ্জিত মৃত্যু বরণ করলে যার দেহ বিকৃত হবে না।

হাদীসঃ (৪) ইমাম বোখারী স্বীয় তারিখগ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মুয়াযযিন যখন আজান দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরতী হস্ত মোবারক তার মাথার উপর রাখেন, আজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকে এবং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় যতদুর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছবে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়। আজান সমাপ্তির পর আল্লাহ পাক বলেন আমার বান্দা সত্য বলেছে এবং তুমি সত্য সাক্ষ্য দিয়েছ সুতরাং তোমার জন্য শুভ সংবাদ।

হাদীসঃ (৫) তিবরানী ছগীর গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মহল্লায় আজান দেওয়া হয় আল্লাহ তায়ালা ঐ দিন স্বীয় শাস্তি বা আযাব থেকে এলাকাবাসীকে মুক্তি বা নিরাপত্তা দান করেন।

হাদীসঃ (৬) মাকাল বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে গোত্রের সকাল বেলা আজান হল তাদের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা বিধান রয়েছে, যে গোত্রে সন্ধ্যা বেলা আজান হলো তাদের জন্য সকাল পর্যন্ত আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি বা নিরাপত্তা রয়েছে (তিবরানী)

হাদীসঃ (৭) উবাই (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, এতে মনিমুক্তার গম্বুদ দেখলাম, যার মাটি ছিল মেশকের। জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রাইল (আঃ) ইহা কার জন্য নির্মিত? বললেন হুজুর আপনার উম্মতের ঈমাম ও মুয়াযযিনদের জন্য।

হাদীসঃ (৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যখন নামাযের জন্য আযান দেয়অ হয় তখন শয়তান পিছনের দিকে পালাতে থাকে, পশ্চাৎ বায়ু ত্যাগ করতে থাকে যাতে সে আজানের ধ্বনি শুনতে না পায়। অতঃপর আজান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন একামত বলা হয় তখন সে পিছনে ফিরে পালাতে থাকে, একামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে এবং মানুষও তার অন্তরের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ টেঁলে দেয়, সে বলে

এই বিষয় স্মরণ কর ঐ বিষয় স্মরণ কর যা এতক্ষন তার স্মরণে ছিল না মানুষ শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে, সে বলতে পারে না যে, কত রাকাত নামায পড়েছে? (বুখারী মুসলিম)

হাদীসঃ (৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমরা মুয়াযযিনের আজান শুনবে তখন সে যা বলে তার অনুরূপ বলবে, অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, কারণ যে, আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার শান্তি বর্ষণ করেন, তার পর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে আর তা হল বেহেস্তে একটি সম্মানিত স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ব্যতীত অন্য কারো জন্য যোগ্য নয় আমি আশা করি সে বান্দা আমিই হব। যে আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে। (মুসলিম)

হাদীসঃ (১০) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আযান শুনে যে ব্যক্তি বলবে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ

مُحَمَّدَ اِلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ الَّذِىْ

অর্থ হে আল্লাহ এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই নামাযের তুমিই প্রভু। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান কর সুমহান মর্যাদা ও বেহেস্তেরর শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। কিয়ামত দিবসে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে। (বুখারী)

হাদীসঃ (১১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি শুধু মাত্র ছোয়াবের উদ্দেশ্যে সাত বৎসর যাবৎ আজান দেন তার জন্য দোজখের আগুন হতে মুক্তি লিখা হয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হাদীসঃ (১২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন মুয়াযযিনকে ক্ষমা করে দেয়া হবে তার স্বরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং তার জন্য প্রত্যেক সজীব এবং নির্জীব সাক্ষ্য প্রদান করবে, আর যে নামাযে উপস্থিত হয় তার জন্য পঁচিশ রাকাত নামাজের ছোয়াব লিখা হবে এবং তার উভয় নামাযের মধ্যকার ছোট খাট গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হাদীসঃ (১৩) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন "আযান ও এক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া আল্লাহর দরবার হতে ফিরায়ে দেয়া হয় না, (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হাদীসঃ (১৪) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি শয়তান যখন মানুষের ডাক অর্থাৎ আযান শুনে তখন রাওহা পর্যন্ত পলাইয়া যায়, বর্ণণাকারী বলেন, রাওহা মদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। (মুসলিম)

হাদীসঃ (১৫) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে বার বৎসর যাবৎ আজান দেয় আর তার জন্য তার আজানের বিনিময়ে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ওয়াক্তে ষাট নেকী এবং এক্বামতে ত্রিশ নেকী লেখা হয়। (ইবনে মাজাহ)

হাদীসঃ (১৬) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে কোন মানুষ, জ্বিন বা অন্য কোন কিছু মুয়াযযিনের স্বরের শেষ আওয়াজ টুকু শুনবে সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে স্বাক্ষ্য দিবে। (বুখারী)

হাদীসঃ (১৭) তিবরানীর বর্ণনায় আছে- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত وَجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে আমাদেরকে তাঁর শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত কর। কথাটিও আছে।

হাদীসঃ (১৮) সহীহ মুসলিম শরীফে, আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ এরশাদ করেন, যখন মুয়াযযিন আযান বলবে, তখন যে ব্যক্তি অনুরূপ বলবে, যখন حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে

তখন, لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ বলবে

সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ফকিহী মাসায়েলঃ

শরীয়তের পরিভাষায় আজান বিশেষ এক প্রকার ঘোষণার নাম। যার জন্য নির্দিষ্ট শব্দাবলী রয়েছে। আযানের শব্দ সমূহ নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰـهَ

اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ

মাসয়ালাঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য ও জুমার জন্য যখন মসজিদে জামাত সহকারে আদায় করা হবে, তখন আজান দেয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, যদি আজান দেয়া না হয় সেখানকার সকল লোক গুনাহগার হবে, এমনকি ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) বলেন, যদি কোন শহরের সকল লোক আজান পরিত্যাগ করে আমি তাদের হত্যা করব, আর যদি এক ব্যক্তি ত্যাগ করে তাকে প্রহার করবো এবং বন্দী করবো।

মাসয়ালাঃ মসজিদে আজান ও এক্বামত বিহীন জামাত পড়া মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ ক্বাযা নামায মসজিদে পড়লে আজান দেবে না যদি কোন ব্যক্তি শহরে কিংবা গৃহে নামায পড়ে এবং আজান না দেয় মাকরূহ হবে না সেখানের মসজিদের আজান তার জন্য যথেষ্ট হবে, তবে দেয়াটা মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ যদি শহরের বাহিরে গ্রামে, বাগানে বা ক্ষেতে থাকে তখন গ্রাম বা শহরের আজান যথেষ্ট হবে। তারপরও আজান বলা উত্তম। আর যারা মসজিদের নিকটবর্তী নয় তাদের জন্য যথেষ্ট নয় । নিকটবর্তী হওয়ার সীমা হচ্ছে সেখানকার আজানের আওয়াজ ঐ পর্যন্ত পৌঁছা।

মাসয়ালাঃ ওয়াক্ত হওয়ার পর আজান দিবে, ওয়াক্তের পূর্বে বা ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে শুরু করা হয়েছে আজানের প্রাক্কালে ওয়াক্ত হল আজান পুনরায় দিতে হবে।

মাসয়ালাঃ আজানের মুস্তাহাব সময়, উহা-যা নামাযের মুস্তাহাব সময় যদি প্রথম ওয়াক্তে আজান দেয়া হয় এবং শেষ ওয়াক্তে নামায আদায় করা হয় তখনও আজানের সুন্নত আদায় হবে।

মাসয়ালাঃ ফরজ ব্যতীত অবশিষ্ট নামাযের যেমন বিত্তির, জানাযা, দুই ঈদের নামায, মান্নতের নামায, সুন্নাত নামায, তারাবীহ, বৃষ্টি প্রার্থনার নামায, দ্বিপ্রহরের নামায, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের নামায এবং সর্ব প্রকার নফল নামাযের জন্য আজান নেই।

মাসয়ালাঃ মহিলা আজান –এক্বামত দেয়া মাকরূহ তাহরীমি গুনাহগার হবে এবং পুনরায় দিতে হবে।

মাসয়ালাঃ মহিলা আদায় নামায পড়ুক বা কাযা নামায হোক তাদের জন্য আজান এক্বামত মাকরূহ, যদিও জামাত সহকারে পড়ে।

মাসয়ালাঃ খুনছা, ফাসিক, যদিও আলিম হয়, নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি, পাগল অজ্ঞান শিশু অপবিত্র ব্যক্তির আজান মাকরূহ, তাদের সকলের আজান পুনরায় দিতে হবে।

মাসয়ালাঃ বুদ্ধিমান শিশু, ক্রীতদাস, অন্ধ, জারজ সন্তান, অজুবিহীন ব্যক্তির আজান শুদ্ধ। কিন্তু অজু বিহীন আজান দেয়াটা মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ জুমার দিন শহরে জোহরের নামাযের জন্য আজান দেয়া নাজায়েজ। যদিও জোহর আদায়কারী ব্যক্তি মাজুর বা অপারগ, যার উপর জুমা ফরজ নয়।

মাসয়ালাঃ যে নামাযের সঠিক সময় নির্ণয়ে সক্ষম সে আজান দেওয়ার যোগ্য।

মাসয়ালাঃ যিনি মুয়াযযিন হবেন তিনি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, সৎ, খোদাভীরু, শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানী, সম্মানিত ও মর্যাদাবান লোকদের সম্মানের ব্যাপারে সচেতন, এবং জামাত ত্যাগকারীদের ব্যাপারে কঠোর, এমন ব্যক্তি হওয়া মুস্তাহাব। নিয়মিত আজান দান করা এবং ছোয়াবের জন্য আজান দানে ইচ্ছুক, বিনিময়ের প্রতি লোভী নয়, এমন লোক মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করা মুস্তাহাব। যদি অন্ধ হয়, সময় নির্দেশকারী এমনকোন ব্যক্তি যদি থাকে, যিনি সঠিক সময় বলে দেন তখন ঐ ব্যক্তি এবং অন্ধ ব্যক্তির আজান একই সমান। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মুয়াজ্জিন যদি ইমামও হন তাও উত্তম। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এক ব্যক্তি একই সময়ে দুই মসজিদে আজান দেয়া মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ আজানের মাঝখানে মুয়াজ্জিন মারা গেল, অথবা তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল অথবা শব্দ আটকে গেল, বলে দেবার মতও কেউ নেই অথবা তার অযু ভেঙ্গে গেলো এবং অযু করতে চলে গেল অথবা বেহুঁশ হয়ে গেল এসব অবস্থায় আজান শুরু থেকে দিতে হবে সেই নিজে হোক অথবা অন্য কেউ হোক পুনরায় আজান দিবে।

মাসয়ালাঃ আজানের পর (মায়াযাল্লাহ) মুরতাদ হয়ে গেল, তখন পুণরায় আজানের প্রয়োজন নেই। তবে পুনরায় দেয়া উত্তম। আজান দেবার সময় মুরতাদ হয়ে গেলে দ্বিতীয় ব্যক্তি শুরু থেকে আজান বলা উত্তম অথবা ঐ আজান যদি পূর্ণ করে তাও জায়েজ।

মাসয়ালাঃ বসে আজান দেয়া মাকরূহ, দেয়া হলে পুনরায় দেবে, কিন্তু মুসাফির যদি বাহনের উপর আজান দেয় তখন মাকরূহ হবে না। কিন্তু ঈকামত বাহন থেকে আবতরণ করে দেবে, যদি বাহন থেকে অবতরণ না করে বাহনের উপরই দিয়ে দিল তখনও হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ ক্বিবলামুখী হয়ে আজান বলবে, তার বিপরীত করা মাকরূহ এবং তা পুনরায় দেবে। কিন্তু মুসাফির যখন বাহনের উপর আজান বলবে এবং তার মুখ ক্বিবলার দিকে না থাকে কোন ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ আজান বলা অবস্থায় বিনাওজরে গলা খাঁক দেয়া মাকরূহ। গলা যদি ভেঙ্গে পড়ে, আওয়াজ পরিষ্কারের জন্য গলা খাঁক দিলে কোন অসুবিধা নেই।

মাসয়ালাঃ চলন্ত অবস্থায় আজান দেয়া মাকরূহ। কেউ যদি চলতে থাকে এবং চলাবস্থায় আজান দিতে থাকে, তখন আজান পুনরায় দিবে।

মাসয়ালাঃ আজানের মাঝখানে কথাবার্তা বলা নিষেধ, যদি কথা বলে পুনরায় আজান দিবে।

মাসয়ালাঃ উচুঁ স্থানে আজান দেয়া সুন্নাত, যেন মহল্লাবাসী ভালভাবে আজান শুনতে পায় এবং আজান উচ্চ আওয়াজে দেবে।

মাসয়ালাঃ শক্তির অধিক আওয়াজ উচ্চ করা মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ আজানের শব্দাবলী ধীরে ধীরে বলবে আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর দুইটি মিলে এক শব্দ দুইটির পর বিরতি করবে, মাঝখানে বিরতি করবে না। সিকতা বা বিরতির পরিমাণ হলো জাবাব দান কারী যেন জবাব দিতে পারে। সিকতা বর্জন করা মাকরূহ, এরূপ আজান পুনরায় দেয়া মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ যদি আজান বা একামতের শব্দাবলী কোথাও আগে পরে হয়ে যায়, তাহলে তখনই শুদ্ধ করে নেবে, শুরু থেকে আজান দেয়ার প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ না করে নামায পড়ে নিল, তখন নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ "হাইয়া আলাচ্ছালাত " ডান দিকে মুখ করে বলবে, এবং "হাইয়াআলালফালাহ্" বাম দিকে মুখ করে বলবে।

মাসয়ালাঃ ফজরের আজানে "হাইয়াআলাল ফালাহ" এর পর "আস্সালাতু খাইরুম মিনান্নাওম" (অর্থাৎ ঘুম হতে নামায উত্তম) বলা মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ আজান বলার সময় কানের ছিদ্রের ভিতর আঙ্গুল প্রবেশ করা মুস্তাহাব, যদি উভয় হাত কানের উপর রাখে তাও উত্তম।

মাসয়ালাঃ আজানে সুর হারাম অর্থাৎ গানের মত আজান দেয়া বা আল্লাহর প্রথম অক্ষরকে টেনে আয়াল্লাহ বা আকবরের প্রথম অক্ষর আলিফকে টেনে আয়াকবর বলা বা আকবরের বা কে টেনে আকবাআর বলা হারাম।

মাসয়ালাঃ ঈকামত আজানের অনুরূপ, শুধুমাত্র পার্থক্য এতটুকু যে ইকামতে "হাইয়া আলাল ফালাহ" এর পর 'কদ্‌কামাতিস সালাত দু'বার বলবে এবং এতে আওয়াজ উচু করবে, তবে আজানের মত উচু করবেনা, বরং এতটুকু উচু করবে যেন উপস্থিত মুসল্লীগণ সকলেই শুনতে পায়। ইকামতের শব্দাবলী তাড়াতাড়ি বলবে, মাঝখানে বিরতি করবেনা, কানের মধ্যে হাত রাখবেনা এবং কানের ভিতর আঙ্গুল ও প্রবেশ করাবেনা। ফজরের ঈকামতে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলবেনা। ইকামত উচু স্থানে কিংবা মসজিদের বাহিরে হওয়া সুন্নত নয়। ঈকামতে যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলা হবে সামনে অগ্রসর হয়ে মসল্লার উপর চলে যাবে।

মাসয়ালাঃ ঈকামতের সময়ও حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর সময় ডানে বামে মুখ ফিরাবে।

মাসয়ালাঃ যিনি আজান দিয়েছেন তিনি যদি উপস্থিত না থাকে, যে কেউ ইচ্ছে ইকামত দিতে পারবে। ইমাম এবং মুয়াজ্জিনের উপস্থিতিতে তাদের অনুমতিক্রমে অন্য কেউ বলতে পারবে। যেহেতু এটা তারই অধিকার। যদি বিনা অনুমতিতে কেউ বলে তা যদি মুয়াজ্জিনের অপছন্দ হয় তখন মাকরূহ হবে।

মাসয়ালাঃ অপবিত্র ও অজুবিহীন ইকামত বলা মাকরূহ কিন্তু পুনরায় বলবেনা। আজানের বিপরীত অপবিত্র ব্যক্তি আজান দিলে দ্বিতীয়বার আজান দিতে হবে। যেহেতু আজান পুনরায় দেওয়া শরীয়ত সম্মত, ইকামত বারংবার বলা শরীয়ত সম্মত নয়।

মাসয়ালাঃ ইকামতের সময় কোন ব্যক্তি সামনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরূহ, বরং বসে যাবে। যখন "হায়্যা আলাল ফালাহ" বলবে তখন দাড়িয়ে যাবে। অনুরূপ যে সব লোক আগে থেকে মসজিদে উপস্থিত থাকে তারাও বসে থাকবেন, যখন মুকাব্বির "হায়্যা আলাল ফালাহ্" বলবেন তখন দাঁড়াবেন। ইমামের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য। আজকাল এটা প্রায় জায়গায় রেওয়াজ হয়ে গেছে যে, ইকামতের সময় সব লোক দাঁড়িয়ে থাকে। বরং অনেক জায়গায় ইমাম জায়নামাযের উপর দাঁড়ালে ঈকামত দেয়া হয় না। এটা সুন্নতের বিপরীত।

মাসয়ালাঃ মহল্লার মসজিদ অর্থাৎ যে মসজিদে ইমাম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত আছে, এমন মসজিদে নিয়মানুসারে প্রথম জামাত আদায় করা হয়েছে, তখন দ্বিতীয় বার আজান বলা মাকরূহ। আজান ব্যতীত যদি দ্বিতীয় জামাত কায়েম করা হয়, তখন ইমাম ছাহেব মেহেরাবে দাড়াবেনা, বরং ডানে বা বামে সরে দাড়াবে। যেন প্রথম জামাতের সাথে পার্থক্য বুঝায়। দ্বিতীয় জামাতে ইমাম মেহরাবে দাড়ানো মাকরূহ, যদি মহল্লার মসজিদ না হয় যেমন সড়ক, বাজার বা ষ্টেশনের মসজিদ হয় যেখানে কিছু মানুষ আসে নামায পড়ে চলে যায়, পুনরায় কিছু আসে নামায পড়ে চল যায়, এমন সব মসজিদে একাধিকবার আজান মাকরূহ নহে, বরং উত্তম এটাই যে, প্রত্যেক নতুন দল যারা আসবে আজান ও ঈকামত সহকারে জামাত পড়বে। এমন সব মসজিদে ইমাম মেহরাবে দাঁড়াতে পারবে।

মাসয়ালাঃ মহল্লার মসজিদে কতিপয় মহল্লাবাসী নিজ জামাত পড়ে নিল এরপর ইমাম এবং অপরাপর লোকেরা আসলো তখন তাদের জামাতই প্রথম জামাত হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রথম আদায় কারীরা যদি মহল্লাবাসী না হয়ে তাকে এর পর মহল্লার লোকেরা আসলো তখন এটাই হবে প্রথম জামাত এবং ইমাম নিজস্থানে দাঁড়াবে।

মাসয়ালাঃ যদি আজান আস্তে নিম্নস্বরে হয় পুনরায় আজান দেবে। প্রথমে পঠিত জামাত প্রথম জামাত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

মাসয়ালাঃ ঈকামতের মাঝখানে মুয়াজ্জিনের জন্য কথা বলা জায়েজ নহে, যেমনি ভাবে আজানে না জায়েজ। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ আজান বা ঈকামতের মাঝখানে কেউ তাকে সালাম দিলে, সালামের জবাব দেবে না। আজান বা ঈকামত সমাপ্তির পরও জবাব দেয়া ওয়াজিব নহে।

মাসয়ালাঃ যখন আজান শুনবে জবাব দানের নির্দেশ রয়েছে অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যে শব্দ বলবে শ্রোতা ও একই শব্দ বলবে কিন্তু "হাইয়া আলাসসালাতে, হাইয়া আলাল ফালাহ্" এর উত্তরে লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহে" বলবে। বরং এটাও বলা উত্তম যে- مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ

মাসয়ালাঃ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এর উত্তরে "সাদ্দাকথা ওয়া বাররতা ওয়া বিল হাক্কে নাতকাতা" বলবে।

মাসয়ালাঃ অপবিত্র ব্যক্তিও আজানের উত্তর দেবে। ঋতুবর্তী মহিলা, খোতবা শ্রবনকারী ব্যক্তি, জানাযা আদায় কারী সহবাসে লিপ্তব্যক্তি অথবা পায়খানা প্রস্রাবে নিয়োজিত ব্যক্তি আজানের জবাব দেবেনা।

মাসয়ালাঃ যখন আজান হয় ততক্ষন পর্যন্ত সালাম কালাম, সালামের উত্তর দান অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ রাখবে। এমনকি কুরআন শরীফ পাঠকালে আজানের আওয়াজ পৌঁছলে তখন তেলাওয়াত স্থগিত রাখবে এবং মনোযোগ দিয়ে আজান শুনবে এবং আজানের উত্তর দেবে। অনুরূপ ঈকামতে ও। যে ব্যক্তি আজানের সময় কথা বার্তায় লিপ্ত থাকে মায়াজাল্লা তার শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মাসয়ালাঃ রাস্তায় চলাচল অবস্থায় আজানের আওয়াজ কানে পৌছলে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে এবং শুনবে ও জবাব দেবে।

মাসয়ালাঃ ঈকামতের জবাব দান মুস্তাহাব তার জবাব ও অনুরূপ, পার্থক্য এতটুকু যে, قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর উত্তরে أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ বলবে।

মাসয়ালাঃ কয়েকটি আজান শুনতে পেল, এমতাবস্থায় প্রথম আজানের উত্তর দেবে। তবে সবগুলো আজানের জবাব দেয়াটা উত্তম।

মাসয়ালাঃ আজানের সময় জবাব দিলনা, যদি বেশী দেরী না হয়ে থাকে জবাব দিয়ে দেবে।

মাসয়ালাঃ খোৎবার আজানের জবাব মুখে দেয়া মুক্তাদিদের জন্য জয়েজ নহে।

মাসয়ালাঃ যখন আজান সমাপ্ত হবে তখন মুয়াজ্জিন ও শ্রোতাগণ দরুদ শরীফ পড়বে, এর পর এই দোয়া পড়বে اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ اِلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ اِلَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْعَلْنَا فِيْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

অর্থঃ হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই নামাযের তুমিই প্রভু আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ও সুমহান মর্যাদা এবং বেহেস্তের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাকে অধিষ্ঠিত কর। যার প্রতিশ্রুতি তুমিই তাঁকে দিয়েছো। কিয়ামত দিবসে আমাদের তাঁর শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত কর। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করনা অঙ্গীকার।

মাসয়ালাঃ যখন মুয়াজ্জিন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলবে তখন শ্রোতা দরুদ শরীফ পড়বেএবং মুস্তাহাব হলো অঙ্গুলী চুম্বন করে চক্ষুতে লাগাবে। এবং বলবে, قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ۔

(রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামায়ের আজান ব্যতীত অন্যান্য আজানেরও জবাব দেয়া যাবে। যেমন সন্তান ভুমিষ্ট কালে দেওয়া আজান। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি ভূল আজান দেয়া হয়। যেমন গানের সুর সহকারে আজান দিল, তখন তার জবাব দেবে না বরং এ ধরনের আজান শুনা ও যাবে না।

মাসয়ালাঃ মোতায়াখেরীন বা পরবর্তীযুগের ইমাম গণ তছবীব উত্তম বলেছেন অর্থাৎ আজানের পর নামাযের জন্য দ্বিতীয়বার ঘোষণা দেয়া এর জন্য শরীয়ত বিশেষ কোন শব্দ নিষিদ্ধ করেনি এবং যেখানে যেরূপ প্রচলিত যেমন, قَامَتْ قَامَتْ অথবা اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ অথবা اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাগরীবের আজানের পর তাছবীবের বিধান নেই, দ্বিতীয়বার ঘোষণা করলেও ক্ষতি নেই। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ আজান ও ঈকামতের মাঝখানে বিরতি দেয়া সুন্নত, আজান বলা মাত্র ঈকামত বলাটা মাকরূহ, কিন্তু মাগরীবে ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পরিমাণ সময় বিরতি দেবে। অবশিষ্ট নামাযে আজান ও ঈকামতের মাঝখানে এতটুকু পরিমান সময় দেবে, যাতে নিয়মিত নামাযের পাবন্দ লোকেরা এসে পড়ে। কিন্তু এতটুকু অপেক্ষা করা যাবে না যেটুকু সময়ে মাকরূহ সময় চলে আসে।

মাসয়ালাঃ যেসব নামাযের পূর্বে সুন্নত বা নফল রয়েছে সে ক্ষেত্রে উত্তম এটাই যে, মুয়াজ্জিন আজানের সুন্নত বা নফল পড়বে নতুবা বসে থাকবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মহল্লার সর্দার তার কর্তৃত্ব বা প্রভাবের কারণে অপেক্ষা করা মাকরূহ। তবে সে যদি দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে, নামাযের সময় ও রয়েছে তখন অপেক্ষা করতে পারবে।

মাসয়ালাঃ পূর্ববর্তী ইমামগণ আজানের উপর বিনিময় গ্রহণ করা হারাম বলেছেন, কিন্তু পরবর্তী ইমামগণ যখন এ ব্যাপারে জন সাধারণের উদাসীনতা ও অবহেলা লক্ষ্য করলেন তখন বিনিময় গ্রহনের অনুমতি দিয়েছেন, এখন এটার উপর ফতোয়া বলবৎ রয়েছে কিন্তু হাদীস শরীফে আজান দেয়ার যে ছোয়াবের কথা বলা হয়েছে তা হলো যারা বিনিময়গ্রহন করে না তাদের জন্য, একান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত যারা এ খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। লোকেরা মুয়াজ্জিনকে অভাবী মনে করে স্বেচ্ছায় যদি দেয় তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ বরং উত্তম এবং এটা বিনিময় নহে।

নামাযের শর্ত সমূহের বর্ণনা

নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত ছয়টি (১) শরীরের পাক বা পবিত্রতা অর্জন (২) কাপড় পাক (৩) ছতর ঢাকা, (৪) কিবলা মুখী হওয়া (৫) ওয়াক্ত হওয়া (৬) নিয়্যত করা এবং তাকবীরে তাহরীমা বলা।

তাহারাত বা পবিত্রতাঃ নামাযীর শরীর বড় নাপাকী ও ছোট নাপাকী ও নাজাছাতে হাকিকী, নিষিদ্ধ পরিমাণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া, উপরও নামাযীর কাপড় নামাযের স্থান, প্রকৃত নাপাকী অর্থাৎ নিষিদ্ধ পরিমাণ হতে পবিত্র হওয়া শর্ত। হাদছে আকবর তথা বড় নাপাকী বলতে গোসল ওয়াজিবকারী নাপাকী বুঝায়, হাদছে আছগর তথা ছোট নাপাকী দ্বারা অযু ভঙ্গকারী নাপাকী বুঝায়। এসব থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা গোসল এবং অজুর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে নাজাছাতে হাকীকী হতে পবিত্র হওয়ার বিধান 'বাবুল আনজাছ' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। নামাযের শর্ত হলো উক্ত পরিমাণ নাপাকী হতে পাক হতে হবে, পবিত্র হওয়া ব্যতিরেকে নামাযই হবে না। যেমন গাঢ় বা শক্ত নাপাকী দিরহাম পরিমাণের বেশী হওয়া পাতলা নাপাকী শরীর বা কাপড়ের কোন অংশের চুতুর্থাংশের বেশী যেখানে লাগে তার নাম নিষিদ্ধ পরিমাণ। অর্থাৎ যে পরিমাণে নাপাকীর কারণে নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম রয়েছে। যদি এর চেয়ে কম হয় তা দূর করা সুন্নত। এই বিষয়গুলোও অপবিত্রতার অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি নিজকে অজুবিহীন ধারণা করলো, এমতাবস্থায় নামায পড়ে নিল পরে জানতে পারলো অজু বিহীন ছিলনা তার নামায হয়নি।

মাসয়ালাঃ নামাযী যদি এমন সব বস্তু বহন করে বা নড়াচড়ায় নিজেও নড়াচড়া করছে তাতে যদি নিষিদ্ধ পরিমাণ নাপাকী থাকে নামায জায়েজ হবে না। কোলে ছোট শিশু নিয়ে কেউ নামায পড়লো শিশু নিজ শক্তিতে কোল হতে নেমে পড়াতে সক্ষম নয় বরঞ্চ তাকে সরালে সে থেমে যায় এমতাবস্থায় নামাযীর শরীরে বা কাপড়ে নামায নিষিদ্ধ হওয়ার পরিমাণ নাপাক রয়েছে, নামায হবে না।

মাসয়ালাঃ নাপাকী যদি নিষিদ্ধ পরিমাণের চেয়ে কম হয় তখনও মাকরূহ হবে। গাঢ় বা শক্ত নাপাকী যদি দিরহাম পরিমাণ হয় তখন মাকরূহ তাহরীমি হবে। এর চেয়ে কম হলে খেলাফে সুন্নত।

মাসয়ালাঃ খড়ের ছাওনীযুক্ত ছাদ যদি নাপাক হয় দাঁড়াবার সময় মুসল্লীর মাথা যদি তাতে স্পর্শ হয় তখন নামায হবে না।

মাসয়ালাঃ নামাযীর কাপড় বা শরীর নামায আদায়ের প্রাক্কালে নিষিদ্ধ পরিমাণ নাপাক হলো এবং তিন তছবীহ পরিমাণ সময় রত ছিল, নামায হয়নি, নামায শুরু করার সময় কাপড় অপবিত্র ছিল অথবা, কোন নাপাক বস্তু বহন করেছিল এবং আল্লাহু আকবর বলার পর নাপাকী পৃথক করলো তাহলে নামায হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মুসল্লীর শরীর যদি কোন অপবিত্র বা ঋতুগ্রস্ত মহিলার শরীরের সাথে লাগলো অথবা মুসল্লী তাদের কোলে নিজ মাথা রাখলো নামায হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মুসল্লীর দেহের উপর যদি অপবিত্র কবুতর বসে নামায আদায় হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ যে স্থানে নামায পড়া হয় তা পবিত্র হওয়ার অর্থ সিজদা ও পা রাখার স্থান পবিত্র হওয়া। যে যে বস্তুর উপর নামায পড়া হয় তার সম্পূর্ণ অংশ পবিত্র হওয়া নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মুসল্লীর এক পায়ের নীচে দিরহাম পরিমাণ হতে বেশী নাপাকী থাকলে নামায হবে না। অনুরূপ ভাবে যদি উভয় পায়ের নীচে অল্প অল্প নাপাকী থাকে যা একত্রিত করলে এক দিরহাম পরিমাণ হবে এবং যদি এক পা এর স্থান পবিত্র, দ্বিতীয় পা-এর স্থান অপবিত্র তখন সে ঐ পা-কে উঠিয়ে নামায আদায় করবে। তবে বিনা প্রয়োজনে এক পায়ের উপর খাড়া হয়ে নামায পড়া মাকরূহ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কপাল পবিত্র স্থান আর নাক অপবিত্র স্থানে এমতাবস্থায় নামায হয়ে যাবে। যদি নাক দিরহাম এর চেয়ে কম পরিমাণ নাপাক স্থানে লাগে তবে বিনা প্রয়োজনে এটাও মাকরূহ (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সিজদার সময় হাত সরে গিয়ে নাপাক স্থানে লাগলে বিশুদ্ধ মাজহাব অনুসারে নামায হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

যদি হাত অপবিত্র স্থানে হয় এবং হাতের উপর সিজদা করে তাহলে সর্বসম্মতভাবে নামায হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তির আস্তিন বা জামার হাতা এর নীচে নাপাকী রয়েছে এবং সে আস্তিনের উপর সিজদা করলো, তাহলে নামায হবে না। (রদ্দুল মোখতার) যদি ও নাপাকী হাতের নীচে না হয় বরং ছোট আস্তিনের খালি অংশের নীচে হয় অর্থাৎ আস্তিন যদি পৃথক মনে না হয়। যদিও আস্তিন মোটা হয় এবং তা শরীরের অনুকূলে হয়। তবে অন্যান্য মোটা কাপড়ের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। যেখানে নাপাকী ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা রং বা গন্ধ অনুভব না হয় তখন নামায হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে কাপড় নাপাক এবং মুসল্লীর মাঝখানে ব্যবধানকারী বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে ছোট আস্তিনের খালি অংশ সিজদার সময় নাপক স্থানে পড়লো এবং সেখানে হাতও নেই কপালও নেই নামায হয়ে যাবে, যদিও জামার হাতা পাতলা হয়, কারণ তখন মুসল্লীর শরীরের সাথে নাপাকীর কোন সম্পর্ক নেই।

মাসয়ালাঃ সিজদার সময় যদি আঁচল অপবিত্র ভূমির উপর পড়ে কোন ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি নাপাক স্থানে এত পাতলা কাপড় বিছায়ে নামায পড়লো যা পর্দার কাজ দিচ্ছে না অর্থাৎ তার নীচের বস্তু উজ্জল রূপে প্রকাশ পাচ্ছে নামায হবে না। যদি কাঁচের উপর নামায পড়া হয় এবং তার নীচে নাপাকী থাকে যদিও তা দৃশ্যমান হয় নামায হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় শর্ত ছতর ঢাকাঃ অর্থাৎ দেহের ঐ অংশ যা ঢেকে রাখা ফরজ তা ঢেকে রাখার জন্য আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে-

خُذُوْ زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

অর্থাৎ প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

অর্থাৎ মুমিন নারীরা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে।

হাদীসঃ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা যখন নামায পড় লুঙ্গি বেঁধে নাও এবং চাদর ঢাকবে। ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য করবে না, হযরত আয়েশা (রঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছে। প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার নামায দুপাট্টা ছাড়া আল্লাহ্ কবুল করবেন না। আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন লুঙ্গি ব্যতীত দুপাট্টা সহকারে মহিলারা কি নামায পড়তে পারবে, এরশাদ করলেন যদি পূর্ণ জামা হয় পায়ের পিট ঢেকে রাখবে তখন জায়েজ হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন নাভী হতে হাটু পর্যন্ত সতরের অন্তর্ভুক্ত।

মাসয়ালাঃ সতর ঢাকা সর্বাবস্থায় ওয়াজিব, নামাযে হউক বা বাইরে হোক -একাকী হউক বা কারো সামনে। কোন সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া পৃথকভাবে খোলাও জায়েজ হবে না। মানুষের সামনে অথবা নামাযে সতর ঢাকা তো, সর্বসম্মত ভাবে ফরজ এমনকি যদি অন্ধকার স্থানে নামায পড়ে যদিও সেখানে কেউ না থাকে এবং তার কাছে এতটুকু পবিত্র কাপড় মওজুত আছে যা সতর ঢাকার কাজ দেবে এমতাবস্থায় উলঙ্গ পড়লে সর্বসম্মতভাবে নামায হবে না। কিন্তু মহিলাদের জন্য নির্জনে , যখন নামায হবে না সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয় বরং শুধুমাত্র নাভী থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত এবং মুহরিমের সামনে সামনে পেট ও পিট ঢেকে রাখাও ওয়াজিব। মুহরিম নয় এমন কারণে সামনে এবং নামাযের জন্য যদিও অন্ধকার কামরায় হয় তখন পাঁচ অঙ্গ ব্যতীত সমস্ত ঢেকে রাখা ফরজ যার বর্ণনা সামনে আসবে, বরং যুবতীদেরকে মুহরিম ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে মুখ খোলাও নিষিদ্ধ। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এতটুকু পাতলা কাপড় যা দ্বারা শরীর প্রকাশ পাচ্ছে তা, পর্দার জন্য যথেষ্ট নয় তা নিয়ে যদি নামায পড়ে নামায হবে না। (আলমগীরি) অনুরূপভাবে এসব চাদর দ্বারা যদি মহিলার কালো চুল শোভা পায় নামায হবে না।

কিছু লোক পাতলা শাড়ী ও লুঙ্গী পরিধান করে নামায পড়ে থাকে যা দ্বারা উরু দেখা যায় তাদের নামায হবে না এবং এরূপ কাপড় পরিধান করা যা দ্বারা সতর ঢাকা হয় না তা নামায ছাড়াও পরিধান করা হারাম।

মাসয়ালাঃ মোটা কাপড় যা দ্বারা শরীরের রং উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না কিন্তু শরীর এরূপভাবে দেখা যাচ্ছে যা দেখলে শারীরিক অঙ্গের প্রকৃতি জানা যাবে এরূপ কাপড় দ্বারা নামায হবে কিন্তু তার অঙ্গের দিকে অন্য কেউ দৃষ্টি দেয়া জায়েজ নেই (রদ্দুল মোখতার)

এবং এরূপ কাপড় মানুষের সামনে পরিধান করাও নিষিদ্ধ, মহিলাদের জন্য তো আরো বেশি নিষিদ্ধ। যেসব মহিলা বেশি শক্ত পায়জামা পরিধান করে তাদের এখান থেকে শিক্ষা নেয়া উচিৎ।

মাসয়ালাঃ নামাযে সতর ঢাকার জন্য পবিত্র কাপড় হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ এরূপ অপবিত্র যেন না হয় যা দ্বারা নামায হবে না। পবিত্র কাপড় পরিধানে সক্ষম হলে নাপাক কাপড় পরিধান করে নামায পড়লে নামায হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযীর জানা ছিল কাপড় নাপাক এবং তাদ্বারা নামায পড়ে নিল অতঃপর অবগত হল পাক ছিল নামায হয়নি। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ পাক কাপড় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নামাযের বাহিরে নাপাক কাপড় পড়লে কোন ক্ষতি নেই। দ্বিতীয় যার কাছে নেই তাকে পরিধান করানো ওয়াজিব (রদ্দুল মোখতার, দুর্রুল মোখতার)

এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে যখন নাপাক শুকনা হবে যা ছুটে গিয়ে শরীরে না লাগে, নতুবা পবিত্র কাপড় থাকাবস্থায় এরূপ কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ কেননা তা বিনা কারণে শরীর অপবিত্র করার শামিল।

মাসয়ালাঃ পুরুষের জন্য নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর। এতটুকু সতর ঢাকা ফরজ। নাভী সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

বর্তমান যুগে অনেক ভদ্রলোক এরূপ আছে যারা লুঙ্গি পায়জামা এরূপ ভাবে পড়ে যাতে পায়ে কোন অংশ খোলা থাকে, জামা কাপড় যদি এভাবে ঢেকে থাকে যাতে চামড়ার রং প্রকাশ নাপায় তা হলে তো ভাল, নতুবা হারাম এবং নামাযের মধ্যে যদি এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত সতর খোলা থাকে নামায হবে না। অনেক অসচেতন লোক এমন আছে যারা মানুষের সামনে হাটু বরং উরু পর্যন্ত খোলা রাখে এটাও হারাম। এরূপ করায় যদি অভ্যস্ত হয় তখন ফাসিকে পরিণত হবে।

মাসয়ালাঃ স্বাধীন মহিলা এবং খুনছার সমস্ত শরীর সতর। মুখের অবয়ব হাত এবং পায়ের তালু ব্যতীত। মাথার ঝুলন্ত চুল, গলা এবং গাড়ও সতরের অন্তর্ভুক্ত, তা ঢেকে নেয়া ফরজ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ বাঁদীর জন্য সমস্ত পেট ও পিট এবং উভয় পার্শ্ব এবং নাভী থেকে হাটুর নীচু পর্যন্ত সতরের অন্তর্ভুক্ত। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ বাঁদী মাথা খুলে নামায পড়ছে নামাযরত অবস্থায় মালিক তাকে আজাদ করে দিল, তাৎক্ষণিকভাবে সে যদি আমলে কলিল তথা এক হাত দ্বারা স্বীয় মাথা ঢেকে নিল নামায হয়ে যাবে নতুবা হবে না। আজাদ হওয়ার ব্যাপারে সে জ্ঞাত হউক বা না হউক, হ্যাঁ তার নিকট যদি এমন কোন বস্তু না থাকে যা দ্বারা মাথা ঢেকে নেবে, তখন হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যে সব অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরজ সে সবের কোন অঙ্গ যদি এক চতুর্থাংশের কম খুলে যায় এবং দ্রুত ঢেকে নিলে, তখন ও হয়ে যাবে, যদি এক রুকন পরিমাণ অর্থাৎ তিনবার সুবহানাল্লাহ্ বলা পরিমাণ সময় পর্যন্ত যদি খোলা থাকে বা কোন উদ্দেশ্য খুলছে যদি দ্রুত ঢেকে নেয় নামায হয়ে যাবে।
(আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামায শুরু করার সময় অঙ্গের চতুর্থাংশ খোলা ছিল অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় আল্লাহু আকবর বললো নামায শুদ্ধ হয়নি। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ গাঢ় সতর অর্থাৎ সম্মুখদিক ও পশ্চাৎদিক এবং চতুর্পার্শ্বের জায়গা। উপরোক্ত জায়গা ছাড়া অপরাপর অঙ্গ সমূহ হালকা সতরের অন্তর্ভুক্ত। গাঢ় হউক লঘু হউক সবগুলো হুকুমের দিক দিয়ে সমান, গাঢ় হওয়া লঘু হওয়া দৃষ্টিপাত হারাম হওয়ার অনুপাতে হয়ে থাকে, যেমন গাঢ় সতরের দিকে তাকালে অধিক গুনাহ। কেউ যদি অবনত দৃষ্টিতে খুলে দেখে সরলভাবে তাকে নিষেধ করবে। বিরত না হলে তার সাথে ঝগড়া বাঁধাবে না, যদি উরু খোলা থাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করবে। বিরত না হলে প্রহার করবে না। যদি সতর খুলে তখন যিনি প্রহার করতে সক্ষম, যেমন পিতা বা শাসক তিনি প্রহার করবেন। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সতর ঢাকার ক্ষেত্রে স্বীয় দৃষ্টি ঐ সব অঙ্গে না পড়া জরুরি নয়। কেউ লম্বা জামা পরিধান করে এবং জামার কলার বা বুকের দিকের অংশ উম্মুক্ত থাকে এবং তা দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অঙ্গ যদি প্রত্যক্ষ করে নামায হয়ে যাবে। যদিও বা ইচ্ছাকৃত ভাবে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা মাকরূহ তাহরিমী (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ অন্যদের থেকে সতর ঢাকা অর্থ হলো এদিক সেদিক দেখবেনা (মায়াজাল্লাহ্) কোন অসৎ দুষ্ট প্রকৃতির লোক নীচে ঝুঁকে অঙ্গ দেখে নিলে নামায হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ পুরুষের সতরের অঙ্গ ৯টি। আল্লামা ইব্রাহীম হালবী, আল্লামা শফী, আল্লামা তাহতাবী প্রমুখ ৮টি উল্লেখ করেছেন, পুরুষাঙ্গ, দুই ডিম্বকোষ, এ দু'টি একত্রে এক অঙ্গ। এ দু'টির মাত্র একটির চতুর্থাংশ খুললে নামায ভঙ্গ হবে না। গুহ্যদ্বারা অর্থাৎ পায়খানার স্থান প্রতিটি নিতম্ব পৃথক সতর, প্রতিটি উরু পৃথক সতর, দুই হাঁটুও এর অন্তর্ভুক্ত, উভয় হাঁটু যদি সম্পূর্ণরূপে খুলে যায় নামায হয়ে যাবে। উভয়টি একত্র করেও একটি উরুর এক চতুর্থাংশ হয় না, নাভীর নীচ থেকে পুরুষাঙ্গের মূল পর্যন্ত এবং তার বরাবর পিঠ ও ও দুই পাশ মিলে একত্রে সতরের অন্তর্ভুক্ত। আলা হযরত (রহঃ) এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে গুহ্যদ্বার ও ডিম্বকোষের মাঝখানের স্থানটিও একটি স্বতন্ত্র সতর, অঙ্গ সমূহের সংখ্যা এবং বিস্তারিত আহকাম তিনি নিম্নোক্ত চারটি পংক্তিতে একত্র করেছেন।

ستر عورت بمرد نه عضو است + از ته ناف تا ته زانو
هرچه ربعش بقدر رکن کشود + یاکشوری دمے نماز مجو
ذکر وانثیین وخلقه پس + دوسرین هر فخذ به زانوئے او
طاهر افضل انثیین ودبر + باقی زیر ناف از هرسو

অর্থাৎ পুরুষের সতর হচ্ছে নয়টি, নাভীর নীচ থেকে উরুর নীচ পর্যন্ত। প্রতি রুকন যদি এক চতুর্থাংশ পরিমাণ খুলে যায় বা খুলে রক্ত বের হয় নামায হবে না। পুরুষাঙ্গ দুই ডিম্বকোষ ও বৃত্ত, দুই নিতম্ব ও প্রত্যেক উরু গুহ্যদ্বার ও নিতম্ব দু'টি এবং নাভীর নীচ হতে প্রত্যেকটি পবিত্র করা উত্তম।

মাসয়ালাঃ স্বাধীন মহিলাদের জন্য উপরে বর্ণিত পাঁচটি অঙ্গ ব্যতীত সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো সর্বমোট ৩০টি অঙ্গ। উহার যে কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খুলে গেলে নামাযের হুকুম উল্লেখিত হুকুমের অনুরূপ। মাথা অর্থাৎ কপালের উপরিভাগ হতে ঘাড়ের শুরু পর্যন্ত এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত সাধারণতঃ যতটুকু স্থানের উপর চুল জন্মে থাকে। চুল যা ঝুলে থাকে। দুই কান ঘাড় গলা ও এর অন্তর্ভুক্ত। দুই কানের লতি, দুই বাহু কনুই সহ এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ কনুই এর পর থেকে গিড়ার নীচ পর্যন্ত অর্থাৎ গলার দুই স্তনের সীমানার নীচ পর্যন্ত দুই হাতের তালু দুই স্তন যখন ভালভাবে প্রকাশ পায়, যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হয় বা সবেমাত্র প্রকাশ পাচ্ছে এখনও সীনা হতে পৃথক অঙ্গের আকৃতি ধারণ করেনি তখন তা সীনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পৃথক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে না প্রথম অবস্থায় ও মাঝখানের স্থানটি সীনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পৃথক অঙ্গ হবে না। পেট অর্থাৎ সীনার উপরোক্ত সীমানা হতে নাভীর নীচের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত অর্থাৎ নাভী ও পেটের মধ্যে গণ্য হবে। পিট, অর্থাৎ সিনা বরাবর পিছন দিক হতে কোমর পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানটি বগলের নীচে সীনার নীচ সীমানা পর্যন্ত দুই পার্শ্বে যে স্থান রয়েছে তার আগের অংশ সীনার অন্তর্ভুক্ত, পিছনের অংশ পিঠের অন্তর্ভুক্ত। দুই নিতম্ব লজ্জাস্থান ও গুহ্যদ্বার দুই উরু গিড়াসহ এর অন্তর্ভুক্ত নাভীর নীচে সংশ্লিষ্ট স্থান তার বরাবর পিঠের দিকে সব মিলে একটি সতর, দুই পায়ের গোড়ালী গিটসহ দুই পায়ের তালু, কোন কোন ওলামাগণ হাতের পিঠ ও তালুকে সতরের ভিতর গণ্য করেননি।

মাসয়ালাঃ মহিলাদের চেহারা যদিও সতর নয়, তথাপি বিপর্যয়ের কারণে গায়রে মুহরিমের সামনে মুখ খোলা নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে গায়রে মুহরিমের জন্যও তার দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়জ নেই। স্পর্শ করাতো আরো অধিক নিষিদ্ধ। (দুর্রুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ যদি কোন পুরুষের নিকট সতর ঢাকার জন্য বৈধ কাপড় না থাকে রেশমী কাপড় আছে তখন তা দ্বারা সতর ঢাকা ফরজ এবং তা দ্বারা নামায পড়বে। অবশ্য অন্য কাপড় থাকাবস্থায় পুরুষের জন্য রেশমীকাপড় পরিধান করা হারাম এবং তা দ্বারা নামায মাকরূহ তাহরিমী (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি অনাবৃত দেহে মাথাসহ পূর্ণ দেহ কোন একটি কাপড় ঢেকে যদি নামায পড়ে নামায হবে না। মাথা যদি তার বাইরে রাখে নামায হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ কারো নিকট যদি বিন্দুমাত্র কাপড় না থাকে তখন বসে নামায পড়বে, দিনে হোক, রাতে হোক, ঘরে হউক, ময়দানে হউক, নামাযে যেরূপ বসে সেরূপ বসবে। অর্থাৎ পুরুষ পুরুষের মত, মহিলা মহিলার মত বসবে। অথবা পা বিছায়ে মহিলা লজ্জাস্থানের উপর হাত রাখবে, তবে রুকু সিজদা ইশারায় করা উত্তম। এক্ষেত্রে বসে পড়াটা দাড়িয়ে পড়া হতে উত্তম। দাড়াবার সময় রুকু সিজদার জন্য ইশারা করুক অথবা রুকু সিজদা করুক (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ অনাবৃত দেহে কোন ব্যক্তি নামায পড়তেছিল কেউ তাকে কাপড় ধার দিল, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কাপড় পরিধান করে শুরু থেকে নামাক পড়ে নিবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ কেউ কাপড় দেওয়ার ওয়াদা করল, তখন নামাযের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যদি নামাযের সময় চলে যায় অনাবৃত দেহে পড়ে নিবে। (রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ অপর ব্যক্তির নিকট কাপড় আছে প্রবল ধারণা হচ্ছে, চাইলে দিবে তখন তলব করাটা ওয়াজিব। (রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ মূল্যের বিনিময়ে যদি কাপড় পাওয়া যায় এবং তার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকাও রয়েছে এতটুকু মূল্য দাবী করছে যা অনুমানকারীদের ধারণার বাইরে নয় তখন ক্রয় করাটা ওয়াজিব। (রদ্দুল মোখতার)
এমতাবস্থায় ধার দিতে যদি সম্মত হয় তথাপি খরিদ করা ওয়াজিব।
মাসয়ালাঃ যদি এমন কাপড় থাকে যা সম্পূর্ণ অপবিত্র, তখন নামাযে তা পরিধান করবে না, যদি এক চতুর্থাংশ পবিত্র হয় তা পরিধান করে নামায পড়া ওয়াজিব। উলঙ্গ নামায পড়া জায়েজ হবে না। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন এমন কোন বস্তু নেই, যদ্বারা কাপড় পবিত্র করবে। অথবা কাপড়ের অপবিত্রতা নিষিদ্ধ পরিমাণের চেয়ে কম করা যায়, নতুবা পাক করে নেয়াটা ওয়াজিব। অথবা নাপাকী কমিয়ে নেবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কয়েকজন যদি উলঙ্গ হয়ে থাকে তখন পৃথক পৃথকভাবে দূরত্ব বজায় রেখে নামায পড়বে, যদি জামাতে পড়া হয় ইমাম মাঝখানে দাঁড়াবে। (আলমগীরি)
মাসয়ালাঃ যদি কোন বিবস্ত্র লোকের জন্য ছাটাই মাদুরা বা বিছানা মিলে যায় তদ্বারা সতর ঢেকে নিবে, উলঙ্গ পড়বে না, এমনি ভাবে ঘাস অথবা পত্র পল্লব দ্বারা সতর ঢাকা গেলে তদ্বারা ঢেকে নিবে। (আলমগীরি)
মাসয়ালাঃ পূর্ণ সতর ঢাকার কাপড় নেই, এতটুকু আছে যতটুকুতে কিছু অঙ্গের সতর ঢাকা যাবে তখন তদ্বারা সতর ঢাকা ওয়াজিব এবং এ কাপড় দ্বারা মহিলারা লজ্জাস্থান অর্থাৎ সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ ঢেকে নেবে, যদি মাত্র একটি ঢাকা যায় একটি ঢেকে নিবে। (দুর্রুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে অনাবৃত দেহে নামায পড়ল নামাযের পর কাপড় পেলে পুনরায় নামায না পড়লেও নামায হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ সতর ঢাকার কাপড় ও পবিত্র করতে না পারাটা যদি বান্দার পক্ষ থেকে হয়, নামায পড়ে নিবে, পরে পুনরায় আদায় করে দিবে। (দুর্রুল মোখতার)

তৃতীয় শর্ত ক্বিবলা মুখী হওয়াঃ

নামাযে ক্বিবলা তথা ক্বাবার দিকে মুখ করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

অর্থঃ মানুষের মধ্যে নির্বোধগণ অচিরেই বলবে যে, কিসে তাদেরকে সে ক্বিবলা হতে প্রত্যাবর্তিত করল, যার দিকে তারা ছিল? আপনি বলুন! পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহর জন্য তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা বাকারা)
হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়েছিলেন, কিন্তু ক্বাবা ক্বিবলা হওয়াটাই হুযুরের আকাঙ্খা ছিল। তখন নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়. সহীহ বোখারী শরীফ ও সীহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ

অর্থঃ ইতোপূর্বে আপনি যে ক্বিবলামুখী ছিলেন তা আমি শুধু এজন্য নিরূপণ করলাম যেন আমি জানতে পারি যে, পশ্চাদপদ অনুসরণ কারীদের থেকে কে রসুলের অনুসরণ করে। আর আল্লাহ যাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন তারা ব্যতীত অপরের জন্য তা অবশ্যই কষ্টকর, আর আল্লাহ এরূপ নহেন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও করুণাময়। আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি, সুতরাং আপনাকে এমন ক্বিবলার দিকে ফিরায়ে দিচ্ছি যা আপনি পছন্দ করেন, অতএব আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান। তোমরা যেদিকেই থাকনা কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য, তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন।

মাসয়ালাঃ নামায আল্লাহর জন্যই পড়া হয় এবং সিজদা তাঁরই জন্য, ক্বাবার জন্য নয়। যদি কেউ (মায়াজাল্লাহ) ক্বাবার জন্য সিজদা করল হারাম ও গুনাহে কবীরা করল, যদি ইবাদত ক্বাবার নিয়তে করে পরিষ্কার কাফের, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কুফরী।

মাসয়ালাঃ ক্বিবলামুখী হওয়ার বিধান সার্বজনীন, যেন মূল ক্বাবা মোয়াজ্জামার দিকে মুখ হয়, যেমন মক্কাবাসীদের জন্য এবং অন্যদের জন্য ক্বাবার দিকে মুখ করা বাঞ্ছনীয়। (দুর্রুল মোখতার)

অর্থাৎ বিশ্লেষণ এটাই যে, মূল ক্বাবার দিক নির্ণয় করতে সক্ষম, যদিও ক্বাবার অন্তরালে হয়, যেমন মক্কার স্থানসমূহে যখন ছাদের উপর থেকে যদি ক্বাবা দেখতে পায় তখন মূল ক্বাবার দিকে মুখ করা ফরজ। যার পক্ষে এটা নির্ণয় করা অসম্ভব তার জন্য মক্কার দিকে মুখ করাটাই যথেষ্ট।

মাসয়ালাঃ ক্বাবার ভিতর নামায পড়লে যেদিকে ইচ্ছ পড়া যাবে, ক্বাবার ছা'দের উপর নামায হয়ে যাবে, তবে ক্বাবার ছা'দের, উপর আরোহন করাটা নিষিদ্ধ। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ যদি শুধুমাত্র হাতীমের দিকে মুখ করল, ক্বাবা সামনা সামনি হল না, নামায হবে না। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ ক্বাবার দিকে মুখ হওয়ার অর্থ এটাই যে, মুখের সম্মুখভাগের যে কোন অংশ ক্বাবার দিকে হওয়া, যদি ক্বিবলা হতে কিছু বিমুখ হয়, কিন্তু মুখের কোন অংশ ক্বাবার মুখোমুখি রয়েছে নামায হয়ে যাবে। মনে করুন তার আয়তণ ৪৫ স্থির করা হল। যদি ৪৫ হতে বেড়ে যায় ক্বিবলামুখী হল না, নামাযও হলনা, যেমন– বা-বর্ণটি একটি রেখা তার উপর হা-জীম বর্ণদুইটি লম্ব, এখন মনে করুন ক্বাবা মোয়াজ্জামা জীম বিন্দুর বরাবর, দুইদিকে

সমান্তরালভাবে রেখা টানুন, আলিফ হা-জীম, এবং জীম –হা-বা–বর্ণের দুটিকে অধিক করে – দাল, হা, জীম রেখা টানুন, তখন এই কোণা ৪৫ + ৪৫ হয়ে ৯০ হবে, এখন যে ব্যক্তি হা-এর স্থানে দণ্ডায়মান যদি হা বিন্দুর দিকে মুখ করে, তখন মূল ক্বাবার দিকে মুখ করল, আর যদি ডানে বামে হা–এর দিকে ঝুকে সে সময় যতক্ষণ পর্যন্ত হা-এর ভিতর থাকবে ক্বাবার দিকে রইলো, এবং 'দাল' বর্ণ অতিক্রম করে -'আলিফ' অথবা 'হা'- অতিক্রম করে 'বা'- বর্ণের কিছু নিকটবর্তী হল, ক্বিবলার দিক হতে বের হয়ে গেল, নামায হলনা। (দুর্রুল মোখতার)

নকশা নিম্নরূপঃ

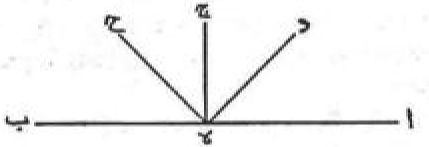

মাসয়ালাঃ ক্বাবার ভিত্তির নাম ক্বিবলা নয়, বরং ঐ শূন্যমণ্ডলকে বুঝায়, যা সপ্ত জমিন থেকে আরশ পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত, ক্বাবা ঘর যদি সেখান থেকে সরায়ে অন্যত্র রাখা হয় এবং সেদিকে মুখ করে নামায পড়লে নামায হবে না, অথবা ক্বাবা মোয়াজ্জামা কোন অলীর যিয়ারতে গেল, তখন ঐ শূন্য মণ্ডলের দিকে নামায পড়লে হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে উঁচু পাহাড়ের উপর অথবা কূপের ভিতর নামায পড়ল এবং ক্বিবলার দিকে মুখ করল, নামায হয়ে গেল, যদিও ক্বাবা ঘরের দিকে মনোনিবেশ না হয়ে শূন্যের দিকে হয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি ক্বিবলামুখী হতে অক্ষম, যেমন রুগ্ন অসুস্থ ব্যক্তি তার মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই যে, ক্বিবলার দিকে ফিরবে, সেখানে এমন কেউ নেই যে তাকে ফিরাবে, অথবা তার কাছে নিজের বা অন্যের মাল আমানত রয়েছে যা চুরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, অথবা জাহাজ বা নৌকার তক্তার উপর চড়ে যাচ্ছে, ক্বিবলামুখী হলে ডুবে যাওয়ার আশংকা রয়েছে, অথবা দুষ্ট প্রাণীর উপর আরোহণ করেছে নামতে দিচ্ছেনা, অথবা নামা যাবে কিন্তু সাহায্যকারী ব্যতীত উঠা যাবে না, অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তি স্বয়ং আরোহণ করতে পারে না, এমন কেউ নেই যে আরোহণ করাবে, উপরোক্ত অবস্থায় যেদিকে নামায পড়া যায় সেদিকে নামায পড়ে নিবে এবং পুনরায় পড়ে দিতে হবে। তবে বাহন থামাতে যদি সক্ষম হন থামিয়ে পড়বে, সম্ভবহলে ক্বিবলামুখী হবে, নতুবা যেদিকেই হোক পড়ে নিবে, বাহন থামাতে গিয়ে যদি কাফেলা দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে পড়ে তখন বাহন থামানো জরুরি নয়, চলন্ত অবস্থায় পড়ে নিবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ চলন্ত জাহাজে নামায পড়লে তাকবীরে তাহরীমার সময় ক্বিবলামুখী হবে, জাহাজ যেদিকে ঘুরবে সেও ক্বিবলার দিকে ফিরতে থাকবে, যদিও নফল নামায হয়। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ নামাযীর নিকট মাল আছে, ক্বিবলামুখী হলে চুরি হওয়ার আশঙ্কা আছে এমতাবস্থায় এমন কাউকে পাওয়া গেল যে মাল হেফাজত করবে, যদি মূল্যের বিনিময়ে হয় ক্বিবলামুখী হওয়া ফরজ। (রদ্দূল মোখতার)

তার নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত বিনিময় মূল্য থাকে অথবা হেফাজতকারী পরবর্তীতে গ্রহণে যদি সম্মত হয়, অথবা যদি নগদ তলব করে এবং তার নিকট না থাকে অথবা আছে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেই, অথবা আছে কিন্তু বিনিময় নিয়মের অধিক তলব করছে তখন সংরক্ষক নিযুক্ত করা জরুরি নয়, এমনি পড়ে নিবে।

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি বন্দি রয়েছে, বন্দীত্ব ক্বিবলামুখী হওয়ার অন্তরায় হয়েছে তখন যেদিকেই হোক নামায পড়ে নিবে, পরে যখন সুযোগ মিলবে সময়মত হোক অথবা পরে হোক পুনরায় পড়ে নিবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন স্থানে ক্বিবলার পরিচয় জানতে না পারে, এমন কোন মুসলমানও নেই যে তাকে বলে দেবে, মসজিদ মেহরাবও নেই, চন্দ্র সূর্যও উদিত হয়নি, অথবা উদিত হয়েছে কিন্তু সে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারছে না, এমতাবস্থায় সে চিন্তা করবে ক্বিবলার ব্যাপারে অন্তর যেদিকে স্বাক্ষ্য দিবে সেদিকে মুখ করবে, তার জন্য সেটাই ক্বিবলা।

মাসয়ালাঃ চিন্তা করে নামায পড়ল, পরে জানতে পারলো ক্বিবলার দিকে নামাজ পড়েনি, নামায হয়ে যাবে, নামাজ পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। (তানভীরুল আবচার)

মাসয়ালাঃ এমন ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা ছাড়া কোন দিকে মুখ করে নামায পড়ে নিলে নামায হবে না। যদিও প্রকৃতপক্ষে ক্বাবার দিকে মুখ হয়, তবে ক্বিবলামুখী হওয়াটা যদি নামাযের পর দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানা যায়- হয়ে যাবে। নামাযের পর ক্বিবলার দিকে হওয়াটা যদি ধারণা হয়, দৃঢ় বিশ্বাস না হয় অথবা নামাযের মধ্যে ক্বিবলা জানা গেল যদি দৃঢ়তার সাথে হয়, নামায হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ চিন্তাভাবনার পর অন্তরে কোন একদিকে ক্বিবলা হওয়াটা প্রতিষ্ঠিত হল যদি তার বিপরীত অন্য দিকে পড়ে, নামায হবে না। যদিও বাস্তবিক পক্ষে তা ক্বিবলা ছিল। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ক্বিবলা সম্পর্কে জ্ঞাত কোন ব্যক্তি উপস্থিত আছে তার নিকট জিজ্ঞেস না করে নিজে চিন্তা করে কোন একদিকে নামায পড়ে নিল যদি ক্বিবলার দিকে মুখ হয়ে থাকে নামায হবে, নতুবা হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ জ্ঞাত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেস করল, সে বলল না, চিন্তাভাবনা করে নামায পড়ে নিল, নামাযের পর সে বলল, নামায হয়ে গেল, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ মসজিদ, মেহরাব সেখানে রয়েছে সেগুলোর বিবেচনা করেনি, নিজের রায় অনুযায়ী একদিকে ফিরে গেল, নামায পড়ে নিল, উভয় অবস্থায় নামায হয়নি। যদি বিপরীত দিকে পড়ে থাকে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ একব্যক্তি চিন্তাভাবনা করে একদিকে নামায পড়ছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য তার অনুসরণ জায়েজ নেই, বরং সে নিজেও চিন্তাভাবনা করবে, যদি সে চিন্তাভাবনা– না করে পূর্ব ব্যক্তির অনুসরণ করল, তার নামায হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ চিন্তাভাবনা করে নামায পড়ছে, নামাযের মধ্যে যদি সিজদায়ে সাহুর মধ্যে হউক মত পরিবর্তন হয়ে গেল, অথবা ভুল মনে হল, তাৎক্ষণিক ফিরে যাওয়াটা ফরজ। প্রথমে যা পড়েছে তা বিনষ্ট হবে না, এভাবে চার রাকাত চারদিকে পড়লেও জায়েজ হবে। কিন্তু যদি তাৎক্ষণিক ফিরে না যায় এবং তিন তাছবীহ অর্থাৎ "সুবহানাল্লাহ" পরিমাণ দাড়িয়ে থাকে, নামায হবে না, (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ অন্ধব্যক্তি ক্বিবলামুখী হয়ে নামায পড়ছে, কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এসে তাকে সোজা করে তার পিছনে এক্তেদা করল, সেখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিল, যার নিকট ক্বিবলা সম্পর্কে অন্ধব্যক্তি জানতে পারতো কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি, উভয়ের নামায হবে না। যদি এমন কেউ না থাকে, তখন অন্ধব্যক্তির নামায হয়ে যাবে, মুক্তাদির নামায হবে না। (হানিয়া, হিন্দিয়া, গুণীয়া, রদ্দূল মোখতার)

মাসয়ালাঃ চিন্তাভাবনা না করে ক্বিবলা ছাড়া অন্যদিকে নামায পড়তেছিল পরে তার সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হল এবং ক্বিবলার দিকে ফিরে গেল, তখন যে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট প্রথম অবস্থা প্রকাশ হল, এ ব্যক্তিও যদি ঐ প্রকারের হয়ে থাকে, যে প্রথমে পড়ছিল একই ব্যক্তির মত তখন তার নিকটও ভুল ধরা পড়ল, এমতাবস্থায় তার এক্তেদা করা যাবে, নতুবা যাবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম যদি চিন্তাভাবনার পর সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করে প্রথম থেকেই পড়ছে, এমতাবস্থায় মুক্তাদী যদিও বা চিন্তাভাবনা-না করে ইমামের পিছনে এক্তেদা করতে পারবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম ও মুক্তাদি চিন্তাভাবনার পর একই দিকে নামায পড়ছে, ইমাম নামায পূর্ণ করল এবং সালাম ফিরালো এখন মাছবুকও লাহেক এর মত পরিবর্তন হয়ে গেল তখন 'মছবুক' ফিরে যাবে, 'লাহেক' শুরু থেকে নামায পড়বে।

মাসয়ালাঃ প্রথমে নিজ রায়ানুসারে নামায শুরু করেছিল, অতঃপর অন্যদিকে রায় পরিবর্তন হয়ে গেল, অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থবার রায় সেদিকে সাব্যস্ত হল যা প্রথমবারে ছিল, তখন সেদিকেই ফিরে যাবে। শুরু থেকে পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। (দুর্রুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ চিন্তা-ভাবনার পর এক রাকাত পড়ল দ্বিতীয় রাকাতে মত পরিবর্তন হয়ে গেল, এখন স্মরণ হল যে, প্রথম রাকাতে একটি সিজদা দেয়া হয়নি। তখন নামায পুনরায় শুরু থেকে পড়বে। (দুর্রুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ অন্ধকার রাত্রি কয়েক ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনার পর বিভিন্ন দিকে নামায পড়ল, কিন্তু নামাযের মধ্যে অবগত হল না যে, তার দিক ইমামের দিকের বিপরীত, না মুক্তাদির দিকের বিপরীত ইমামের পূর্বে হলে নামায হয়ে যাবে, আর যদি নামাযের পর হয় যে, তার দিক ইমামের দিকের বিপরীত ছিল কোন অসুবিধা নেই। আর ইমামের আগে হওয়াটা যদি অবগত হয় নামাযের মধ্যে বা নামাযের পর তাহলে নামায হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ মুসল্লী ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে ক্বিবলা হতে সীনা ফিরিয়ে নিল, যদি তাৎক্ষণিক ক্বিবলার দিকে ফিরে যায় নামায ফাছেদ হয়ে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ফিরে যায় এবং তিন তাসবীহ পরিমাণ দাঁড়িয়ে না থাকে নামায হয়ে যাবে। আর যদি ক্বিবলার দিকে হতে শুধু মুখ ফিরে যায় তবে তাৎক্ষণিক ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটা তার উপর ওয়াজিব। নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ওজর ব্যতীত মাকরূহ। (গুনীয়া)
চতুর্থ শর্ত হচ্ছে -ওয়াক্তঃ- এ বিষয়ের মাসায়েল উপরে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।
পঞ্চম শর্ত হচ্ছে নিয়্যতঃ-
আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

অর্থঃ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত; হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

অর্থাৎঃ সমস্ত কাজ-কর্মই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের তা-ই- রয়েছে যা সে নিয়্যত করেছে।
এই হাদীস বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আমিরুল মু'মেনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।
মাসয়ালাঃ নিয়্যত অন্তরের দৃঢ় সংকল্পকে বুঝানো হয়, নিছক জানার নাম নিয়্যত নয় যতক্ষণ না সংকল্প হয়। (তানভীরুল আবছার)
মাসয়ালাঃ নিয়্যতে মৌখিক উচ্চারণ মুখ্য নয় যেমন কেউ যদি অন্তরে জোহরের নামাযের সংকল্প করে মুখে আছর শব্দ বের হয়ে গেল। জোহরের নামায হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার,

রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ নিয়্যতের চূড়ান্ত কথা এটাই যে, যদি সেসময় কেউ জিজ্ঞেস করে কোন্ নামায পড়ছেন? তখন চিন্তা-ভাবনা ছাড়া তাৎক্ষণিক বলতে হবে, যদি চিন্তা-ভাবনা করে, বলতে হয় নামায হবে না। (দুর্রুলমোখতার)
মাসয়ালাঃ নিয়্যত মুখে বলাটা মুস্তাহাব। আরবীতে হওয়া নির্দিষ্ট নয়, ফার্সী ও অন্যান্য ভাষায় হতে পারে। উচ্চারণে অতীতকালীন ক্রিয়ার শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (দুর্রুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ আল্লাহু আকবর বলার সময় নিয়্যত হাজির হওয়া উত্তম।
মাসয়ালাঃ তাকবীরের পূর্বে নিয়্যত করল, নামাযের শুরু এবং নিয়্যতের মাঝখানে কোন বাহ্যিক কাজ যেমন পানাহার, কথা-বার্তা এবং ওসব কাজ যা নামাযের সাথে সম্পর্কিত নয় তা দ্বারা যদি পৃথকতা সৃষ্টি না হয় নামায হয়ে যাবে। যদিও তাকবীরে তাহ্রীমার সময় নিয়্যত হাজির না হয়। (দুর্রুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ অযুর পূর্বে নিয়্যত করল তখন অযু করাটা বাহ্যিক ব্যবধানকারী নয় নামায হয়ে যাবে।
এমনিভাবে অযুর পর নিয়্যত করল এরপর নামাযের জন্য গমন করল। নামায হয়ে যাবে। এ গমণ করাটা বাহ্যিক ব্যবধানকারী নয়।
মাসয়ালাঃ নামায শুরু করার পর নিয়্যত পাওয়া গেল তা গণ্য হবে না, এমনকি তাহ্রীমার মধ্যে আল্লাহু বলার পর আকবরের পূর্বে নিয়্যত করল নামায হবে না। (দুর্রুলমোখতার, রদ্দুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ নফল সুন্নাত ও তারাবীহ নামাযের মধ্যে সাধারণ নিয়্যতই যথেষ্ট এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু উত্তম হলো, তারাবীহ এর জন্য তারাবীহর নিয়্যত অথবা সুন্নাতের নিয়্যত এছাড়া সুন্নাতের মধ্যে সুন্নতের বা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নিয়্যত করবে। যেহেতু অনেক মাশায়েখে কেরাম এর মধ্যে সাধারণ নিয়্যত করা যথেষ্ট বলেছেন।
মাসয়ালাঃ নফল নামাযের জন্য সাধারণ নামাযের নিয়্যতই যথেষ্ট। যদিও নফল নিয়্যতে না থাকে। (দুর্রুল মোখতার)
মাসয়ালাঃ ফরজ নামাযের মধ্যে ফরজের নিয়্যত করাও আবশ্যক সাধারণ নামায বা নফল ইত্যাদির নিয়্যত যথেষ্ট নয়। আর যদি নামাযের ফরজিয়্যত সম্পর্কেই না জানে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছে কিন্তু ফরজিয়্যত সম্পর্কে জ্ঞান নেই নামায হবে না এবং তার উপর এসব নামায ক্বাযা করা ফরজ। কিন্তু যদি ইমামের পিছনে হয় এবং এভাবে নিয়্যত করে যে, ইমাম যে নামায পড়ছে আমিও সে নামায পড়ছি। তখন নামায হয়ে যাবে। আর যদি জ্ঞাত থাকে কিন্তু ফরজকে গায়রে ফরজ থেকে পৃথক করেনি তখন দুটি হুকুম। যদি সমস্ত নামাযে ফরজেরই নিয়্যত করে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু যেসব ফরজের পূর্বে সুন্নত রয়েছে যদি সুন্নত পড়ে থাকে তখন ইমামতি করা যাবে না, সুন্নত সমূহ ফরজের নিয়্যতে পড়ার কারণে তার ফরজ রহিত হয়ে গেল। যেমন জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ফরজের নিয়্যতে পড়ল

তখন সে ফরজ নামাযের ইমামতি করতে পারবে না। যেহেতু সে ফরজ পড়েছে। দ্বিতীয় হুকুম হল, ফরজের নিয়্যত, কোন রাকাতে করল না তখন ফরজ নামায আদায় হল না। -(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ফরজের মধ্যে এটাও আবশ্যক যে, সে নির্দিষ্ট নামাযের যেমন জোহর বা আসরের নিয়্যত করবে অথবা যেমন আজকের জোহর বা ফরজ ওয়াক্তের নিয়্যত ওয়াক্তের ভিতরে করবে। কিন্তু জুমার মধ্যে ফরজ ওয়াক্তের নিয়্যত যথেষ্ট নয়। নির্দিষ্ট জুমার নিয়্যত করা জরুরী। -(তানভীরুল আবচার)।

মাসয়ালাঃ নামাযের সময় শেষ হয়ে গেল এবং এর জন্য ফরজ ওয়াক্তের নিয়্যত করল। ফরজ ওয়াক্তের নিয়্যত হলনা সময় চলে যাওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হউক বা না হউক। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ফরজ নামাযে এই নিয়্যত করল যে, আজকের ফরজ পড়ছি যথেষ্ট হবেনা। যতক্ষণ কোন নামাযকে নির্দিষ্ট না করে। যেমন আজকের জোহর বা আজকের এশা পড়ছি। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ এই নিয়্যত করাটাই উত্তম যে, আজকে অমুক নামায পড়ছি যদিও ওয়াক্ত বের হয়ে যায় নামায হয়ে যাবে। বিশেষতঃ তার জন্য, যার ওয়াক্ত চলে যাওয়া সম্পর্কে সন্দেহ হয়। -(দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ যদি কেউ একদিনকে অন্য দিন মনে করে যেমন সোমবারকে মঙ্গলবার ধারনা করে, মঙ্গলবারের জোহরের নিয়্যত করল পরে জানতে পারল দিনটি ছিল সোমবার, নামায হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আজকের দিন যখন নিয়্যতে রয়েছে। নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এর পর সোমবার বা মঙ্গলবার নির্দ্দিষ্ট করাটা অর্থহীন। এ বিভ্রান্তি ক্ষতিকর নয়। যদি শুধুমাত্র দিনের নামেই নিয়্যত করল আজকের দিনের সংকল্প করেনি যেমন মঙ্গলবারের জোহর পড়ছি নামায হবে না। যদিও দিবসটি মঙ্গলবার হয় কেননা মঙ্গলবার অনেক রয়েছে।

মাসয়ালাঃ নিয়্যতে রাকাতের সংখ্যা আবশ্যক নয় তবে বলাটা উত্তম। রাকাতের সংখ্যার ক্ষেত্রে যদি ভুল হয়ে যায় যেমন তিন রাকাত জোহর বা চার রাকাত মাগরবির নিয়্যত করল নামায হয়ে যাবে। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ যদি কারো জিম্মায় এক ওয়াক্তের নামায ক্বাযা হল। তখন দিন নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যেমন আমার জিম্মায় অমুক নামায রয়েছে তা যথেষ্ট হবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ যদি কারো জিম্মায় অনেক নামায ক্বাযা রয়েছে। দিন তারিখ ও যদি স্বরণ না থাকে তার নিয়্যতের জন্য সহজ পদ্ধতি এটাই যে, সমস্ত নামাযের প্রথম এবং সমস্ত নামাযের শেষ যা আমার জিম্মায় যা রয়েছে আদায় করছি। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ কারো জিম্মায় রবিবারের নামায রয়েছে কিন্তু যদি তার ধারনা হল এক সপ্তাহের

নামায এবং এ নিয়্যতে নামায পড়ল, পরে অবগত হল রবিবারের নামাযই ছিল। নামায আদায় হলনা। -(গুনীয়া)।

মাসয়ালাঃ ক্বাযা বা আদায় এর নিয়্যত করার কোন প্রয়োজন নেই। আদার নিয়্যতে ক্বাযা পড়ল অথবা ক্বাযার নিয়্যতে আদায় পড়ল নামায হয়ে যাবে। যেমন জোহরের ওয়াক্ত আছে সে ধারনা করল ওয়াক্ত চলে গেছে এবং ঐ দিনের জোহরের নামায ক্বাযার নিয়্যতে পড়ল অথবা ওয়াক্ত চলে গেছে সে ধারনা করল ওয়াক্ত এখনো রয়েছে এবং আদায় এর নিয়্যতে পড়ল, নামায হয়ে গেল আর যদি এরূপ না করে বরং ওয়াক্ত রয়েছে কিন্তু সে জোহর ক্বাযা পড়ল, তবে ঐদিনের জোহরের নিয়্যত করেনি। নামায হলনা। অনুরূপভাবে তার জিম্মায় অন্য কোন দিনের জোহরের নামায ছিল আদার নিয়্যতে পড়ে নিল, নামায হলনা। (-দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদীর জন্য এক্তেদার নিয়্যতকরা আবশ্যক, মুক্তাদীর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমামের জন্য ইমামতির নিয়্যত জরুরী নয়। এমনকি ইমাম সংকল্প করলে যে, আমি অমুকের ইমাম নই যে তার এক্তেদা করল নামায হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম, ইমামতির নিয়্যত না করলে জামাতের ছওয়াব পাবেনা। এবং জামাতের ছওয়াবের অর্জনের জন্য মুক্তাদি অংশ গ্রহনের পূর্বে নিয়্যত করে নেয়াটা জরুরী নয়। বরং মুক্তাদী শরীক হওয়ার সময় নিয়্যত করা যায়। -(আলমগীরি,দুর্রুলমোখতার)।

মাসয়ালাঃ এক অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে ইমামকে ইমামতির নিয়্যত করা আবশ্যক। যদি মহিলা মুক্তাদি হয় এবং কোন পুরুষের বরাবর দাড়ায় এবং নামায যদি জানাযার নামায না হয় এই অবস্থায় ইমাম যদি মহিলার ইমামতির নিয়্যত না করে তখন ঐ মহিলার নামায হবে না। -(দুর্রুলমোখতার)।

ইমামের এই নামায শুরুর প্রাক্কালে জরুরী, পরে নিয়্যত যদিও করে নেয়, মহিলার এক্তেদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ জানাযার মধ্যে সর্বাবস্থায় পুরুষের বরাবর হউক না হউক মহিলার ইমামতির নিয়্যত সর্বসম্মতভাবে জরুরী নয়। বিশুদ্ধমত হল জুমা এবং দু'ঈদের মধ্যে ও প্রয়োজন নেই অবশিষ্ট নামাযের মধ্যে যদি পুরুষের বরাবর না দাড়ায় মহিলার নামায হয়ে যাবে। যদি ইমাম সাহেব মহিলার ইমামতির নিয়্যত না করে। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদী যদি শুধুমাত্র ইমামের নামায বা ইমামের ফরজের নিয়ত করল, এক্তেদার সংকল্প করলনা, নামায হবেনা। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদী এক্তেদার নিয়্যতে এই নিয়্যত করল যে, ইমামের যে নামায আমার ও সে নামায তখন জায়েজ হবে। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি এরূপ নিয়্যত করল যে, ঐ নামায শুরু করছি যা ইমামের নামায। যদি ইমাম নামায শুরু করে দিল। তখনতো প্রকাশ্য তারই নিয়্যতে এক্তেদা শুদ্ধ। ইমাম যদি নামায শুরু করে না থাকে তখন দু অবস্থা প্রথমতঃ যদি মুক্তাদি জ্ঞাত হয় যে, ইমাম এখনো

নামায শুরু করেনি এখন শুরু করার পর প্রথম নিয়্যতেই যথেষ্ট। আর যদি ধারনা হয় শুরু করেছে বাস্তবে শুরু করেনি তখন ঐ নিয়্যত যথেষ্ট হবেনা। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি এক্তেদার নিয়্যত করল কিন্তু ফরজ সমুহের মধ্যে ফরজ নির্ধারন করেনি তখন ফরজ আদা হল না। -(গুনীয়া)।

অর্থাৎ যতক্ষন না এ নিয়্যত করে যে, ইমামের নামাযে তারু মুক্তাদি হলাম।

মাসয়ালাঃ জুমার মধ্যে এক্তেদার নিয়্যতে ইমামের নামাযের নিয়্যত করল জোহর বা জুমার নিয়্যত করলনা, নামায হয়ে গেল। ইমাম জুমা আদা করুক বা জোহর।

যদি এক্তেদার নিয়্যতে জোহরের নিয়্যত করে এবং ইমামের নামায জুমার নামায ছিল তখন জুমাও হয়নি জোহরও হয়নি। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি ইমামকে বৈঠকে পেল তবে তার জানা নেই এটা কি প্রথম বৈঠক না শেষ বৈঠক এবং এ নিয়্যতে এক্তেদা করল যে, যদি এটা প্রথম বৈঠক হয়ে থাকে তাহলে আমি এক্তেদা করলাম। অন্যথায় নয়। যদিও প্রথম বৈঠক হয়ে থাকে এক্তেদা শুদ্ধ হয়নি। যদি এ নিয়্যতে এক্তেদা করে যে যদি প্রথম বৈঠক হয়ে থাকে আমি ফরজে এক্তেদা করলাম। নতুবা নফলে করলাম। তাহলে এ এক্তেদায় ফরজ আদায় হবেনা। যদিও প্রথম বৈঠক হয়। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ ইমামকে নামাযে পেল, কিন্তু মুক্তাদির জানা নেই যে, সে কি এশা পড়ছে না তারাবীহ এবং এ মনে এক্তেদা করল যে, যদি ফরজ হয় এক্তেদা করলাম। তারাবীহ হলে নয়। এখন এশা হউক তারাবীহ হউক এক্তেদা শুদ্ধ হবেনা। -(আলমগীরি)।

তাঁর উচিৎ হবে ফরজের নিয়্যত করা যদি ফরজের জামাত হয়ে ফরজ হল, অন্যথায় নফল। হয়ে যাবে। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ইমাম ইমামতিতে যখনি যাক সে সময় মুক্তাদি এক্তেদার নিয়্যত করবে তাকবীরের সময় নিয়্যত হাজির না হলে এক্তেদা শুদ্ধ হবে। তবে শর্ত হলো মাঝখানে নামায ভঙ্গকারী কোন কাজ পাওয়া না যাওয়া। -(গুনীয়া)।

মাসয়ালাঃ এক্তেদার নিয়্যতে ইমামকে তা জানা জরুরী নয়। যায়েদ হোক আমর হোক, যদি এ নিয়্যত করে যে, ইমামের পিছনে তার জ্ঞানে রয়েছে সে যায়েদ, পরে জানতে পারলো আমর এক্তেদা শুদ্ধ হবে। আর যদি ব্যক্তির নিয়্যত না করে বরঞ্চ করল যায়েদের এক্তেদা করছি পরে জানা গেল আমর, এক্তেদা শুদ্ধ হয়নি। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ বৃহৎ জামাত হলে মুক্তাদির উচিৎ এক্তেদার নিয়্যতে ইমামকে নির্ধারিত না করা। অনুরূপভাবে জানাযায় এরূপ নিয়্যত করবেনা যে অমুক ময়্যতের নামায পড়ছি। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ জানাযার নিয়্যত এটাই যে, নামায আল্লাহ্র জন্য এবং দোয়া এ মৃতব্যক্তির জন্য। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদির যদি সন্দেহ হয় ময়্যত পুরুষ না মহিলা তখন এটা বলবে যে, ইমাম যার

নামায পড়ছে আমিও ইমামের সাথে তার নামায পড়ছি। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ যদি পুরুষের নিয়্যত করার পর জানতে পারল মহিলা অথবা বিপরীত জায়েজ হবেনা। শর্ত হলো উপস্থিত জানাযার দিকে ইঙ্গিত না হলে এমনিভবে যদি যায়েদের নিয়্যতের পর জানা গেল যে ওমর জায়েজ হলনা। যদি এরূপ নিয়্যত করে যে এই জানাযার তার জানা মতে ময়্যত হল যায়েদ পরে জানা গেল সে আমর তখন হয়ে যাবে। -(দুর্রুল মোখতার রদ্দুল মোখতার)।

এমনিভাবে তার জ্ঞানে যদি সে পুরুষ হয় পরে জানা গেল মহিলা বা বিপরীত নামায হয়ে যাবে। যখন এ ময়্যতের উপর নামাযের নিয়্যত থাকে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ কয়েকটি জানাযা এক সাথে পড়লে তার সংখ্যা জানা জরুরী নয়। যদি সে সংখ্যা নির্ধারণ করে এবং তার চেয়ে বেশী হয়। তখন কারো জানাযা হয়নি। -(দুর্রুলমোখতার)।

অর্থাৎ নিয়্যতে যদি ইঙ্গিত না হয় শুধু এতটুকু করল দশজন ময়্যতের নামায এবং তা ছিল এগার জ:।, তখন কারো উপর আদায় হয়নি।

যদি নিয়্যতের মধ্যে ইঙ্গিত থাকে যেমন এ দশজন ময়্যতের নামায এবং সেখানে হল বিশজন তখন সকলের আদায় হল। এটা হল জানাযার ইমামের বিধান। মুক্তাদিরও। যদি মুক্তাদি এই নিয়্যত না করে যে, ইমাম যাদের জানাযা পড়ছে আমি ও তাদের জানাযা পড়ছি এ অবস্থায় সে যদি তাদেরকে দশজন মনে করে এবং তা বেশী হয় তখন সকলের উপর তার নামায হয়ে যাবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ওয়াজিব নামাযে, ওয়াজিবের নিয়্যত করবে। এবং তা নির্ধারনও করবে। যেমন, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, নযর, তাওয়াফের নামায অথবা এমন নফল যেটা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করেছে। তার কাযা দেয়াও ওয়াজিব হয়ে পড়বে। এমনিভাবে তিলাওয়াতে সিজদায় নিয়্যত নির্দিষ্ট করা জরুরী। তবে নামাযের মধ্যে তা শুরু করতে হবে। সিজদায়ে শুকর যদিও নফল কিন্তু তার মধ্যে নিয়্যত জরুরী। অর্থাৎ এ নিয়্যত করা যে শুকরের সিজদা করছি। সিজদা সহুর ব্যাপারে দুররে মোখতারে লিখিত রয়েছে যে এতে নিয়্যত নির্ধারণ জরুরী নয়। তবে নাহরুল ফায়েকে জরুরী বলেছে। এবং এটাই স্পষ্ট অভিমত। -(রদ্দুল মোখতার)।

যদি বিভিন্ন ধরনের মান্নত হয়। প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নির্ধারন জরুরী। বিতরের মধ্যে বিতরের নিয়াতই যথেষ্ট যদিও তার সাথে নিয়্যত ওয়াজিব না হয় তবে নিয়্যতে ওয়াজিব উত্তম। অবশ্য নিয়্যত ওজুবী না হলে প্রয়োজন নেই। -(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ এ নিয়্যত করা যে, আমার মুখ ক্বিবলার দিকে -শর্ত নয়। তবে জরুরী হল ক্বিবলা হতে বিমুখ হওয়ার নিয়্যত না থাকা। -(দুর্রুলমোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ফরজের নিয়্যতে নামায শুরু করল মাঝখানে ধারনা করল যে নফল এবং নফলের নিয়্যতে নামায পূর্ণ করল, এখন ফরজ আদায় হবে। আর যদি নফলের নিয়্যতে শুরু করে এবং মাঝখানে ফরজের ধারনা করল, এবং এ ধারনায় পূর্ণ করল, তখন নফল হবে। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ এক নামায শুরু করার পর দ্বিতীয় নামাযের নিয়্যত করল যদি নতুন তাকবীরের সাথে হয় প্রথমটি সমাপ্ত হল দ্বিতীয়টি শুরু হল। অন্যথায় এটিই হবে প্রথম। দুনোটি ফরজ হউক, অথবা প্রথমটি ফরজ এবং দ্বিতীয় নফল অথবা প্রথমটি নফল দ্বিতীয়টি ফরজ। -(আলমগীরি,গুনীয়া)।

এটা সে সময় প্রযোজ্য হবে যখন মুখে দ্বিতীয়বার নিয়্যত না করে নতুবা প্রথমটি অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যাবে। -(হিন্দিয়া)।

মাসয়ালাঃ জোহরের এক রাকাতের পর অতঃপর একই জোহরের নিয়্যতে তকবীর বলল, এটাও একই নামায প্রথম রাকাতও গন্য হবে। যদি শেষ বৈঠক করে হয়ে গেল নতুবা হবেনা। তবে মুখেও যদি নিয়্যত শব্দ উচ্চারণ করে তখন প্রথম রাকাত ভঙ্গ হয়ে যাবে রাকাতের মধ্যে গণ্য হবেনা। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ অন্তরে নামায ভঙ্গের নিয়্যত করল, কিন্তু মুখে কিছু বললনা, তখন সে নিয়মিত নামাযে রয়েছে যতক্ষণ না নামায ভঙ্গকারী কোন কাজ করে। -(দুর্‌রুলমোখতার)।

মাসয়ালাঃ দুই নামাযের নিয়্যত একসাথে করল এর কয়েকটি পদ্ধতি আছে, দুটির একটির করজে আইন দ্বিতীয়টি জানাযা এখন ফরজের নিয়ত হল। অথবা দুনোটি ফরজে আইন। একটি হল ওয়াক্তিয়া, দ্বিতীয়টির ওয়াক্ত এখনো হয়নি এখন ওয়াক্তিয়া আদায় হবে। অথবা একটি ওয়াক্তিয়া দ্বিতীয়টি ক্বাযা তবে ওয়াক্তে প্রশস্ততা নেই তখন কোনটি হয়নি। উভয়টি ক্বাযা হলে ছাহেবে তরতীবের জন্য প্রথমটি হবে ছাহেবে তারতীব না হলে উভয়টি বাতিল। একটি ফরজ দ্বিতীয়টি নফল হলে ফরজ আদায় হবে। উভয়টি নফল হলে, উভয়টি আদায় হবে। একটি নফল দ্বিতীয়টি নামাযে জানাযা এখন নফলের নিয়্যত বাকী থাকবে। -(দুর্‌রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার, গুনীয়া)।

মাসয়ালাঃ নামায একান্ত আল্লাহর উদ্দেশ্য শুরু করল অতঃপর (মায়াজাল্লাহ) তাতে রিয়া বা লৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটল। তখন শুরুটাকে গন্য করা হবে। -(দুর্‌রুল মোখতার, আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ পূর্ণ রিয়া হল এটা যে, মানুষের সামনে হলে ভালভাবে পড়ে অন্যথায় পড়েই না। আর যদি এরূপ হয় যে, একাকী হলে ভালমতে পড়েনা কিন্তু মানুষের সামনে হলে খুব ভালভাবে পড়ে সে মুল নামাযের ছওয়াব পাবে কিন্তু সুন্দর ও উত্তমরূপে পড়ার ছওয়াব পাবেনা। -(রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)।

রিয়া বা লৌকিকতা সর্বাবস্থায় শাস্তির উপযুক্ত।

মাসয়ালাঃ নামায একান্ত নিষ্ঠার সাথে পড়ে থাকে মানুষদের দেখে ধারনা করল রিয়া বা লৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটবে। বা শুরু করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু রিয়ার আশঙ্কা করছে এ কারনে নামায বর্জন করবেনা। নামায পড়ে নেবে এবং এস্তেগফার করবে। -(দুর্‌রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

ষষ্ঠ শর্ত তাকবীর তাহরীমাঃ-

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

অর্থাৎঃ এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ ও সালাত আদায় করে।

এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস এরশাদ হয়েছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লাম ,আল্লাহু আকবর, দ্বারা নামায শুরু করতেন।

মাসয়ালাঃ জানাযার নামাযে তাকবীর তাহরীমা হলো রুকন অন্যান্য নামাযে তা হল শর্ত।-(দুর্‌রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ জানাযা নামায ছাড়া অন্য নামায যদি কোন অপবিত্রতা সাথে নিয়ে তাহরীমা বাধে এবং আল্লাহ আকবর শেষ করার পূর্বে নিক্ষেপ করে দেয় নামায হয়ে যাবে। এভাবে তাকবীর তাহরীমা শুরু করার সময় সতর খোলা ছিল,বা ক্বিবলার দিকে ছিলনা, বা সুর্য দিবসের অর্ধভাগে স্থির ছিল তাকবীর সমাপ্ত করার পূর্বে আমলে কলিল দ্বারা সতর ঢেকে নিল, বা ক্বিবলামুখী হল। বা সুর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ল, নামায হয়ে যাবে। এমনিভাবে অযুহীন ব্যক্তি নদীতে পড়ে গেল এবং অযুর অঙ্গ সমুহে পানি পৌছার পূর্বে তাকবীর তাহরীমা শুরু করল। কিন্তু শেষ হওয়ার পূর্বে অঙ্গ সমুহ ধুয়ে গেল। নামায হয়ে যাবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ফরজের তাহরীমার উপর নফল নামাযের ভিত্তি করা যায়। যেমন এশার চাররাকাত পূর্ণ করে সালাম না ফিরিয়ে সুন্নতের জন্য দাড়িয়ে গেল কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। ইচ্ছাকৃত না হলে অসুবিধা নেই। যেমন জোহরের চার রাকাত পড়ে শেষ বৈঠক করল এখন আরো দু রাকাত পড়ার ইচ্ছা করল এবং পঞ্চম রাকাতের সিজদাও করল। তখন আর এক রাকাত পড়বে দুই রাকাত হবে। এতে মাকরূহ হওয়ার কিছু নেই। -(দুর্‌রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ এক নফলের উপর দ্বিতীয় নফলের ভিত্তি করা যায় এবং এক ফরজ দ্বিতীয় ফরজ বা নফলের উপর ভিত্তি করা যায় না। -(দুর্‌রুলমোখতর)।

নামায পড়ার নিয়মঃ

হযরত আবু হুরাইয়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। এবং নামায পড়ল। আর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে বসে ছিলেন। অতঃপর সে তাঁর নিকট আসল। এবং তাকে সালাম করল। তখন তিনি তাকে বললেন। ওয়ালাইকাস সালাম। যাও। আবার নামায পড়। তোমার নামায পড়া হয় নাই। সে পুনঃ গেল আবার নামায পড়ল। অতঃপর আসল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসল্লামকে সালাম করল। হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসল্লাম বললেন ওয়ালাইকাস্ সালাম। যাও। আবার পুনরায় নামায পড় তোমার নামায পড়া হয় নাই। অতঃপর তৃতীয়বার বা উহার পরের বার সে বলল এয়া রাসুলুল্লাহ্! আমাকে শিখায়ে দিন। তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসল্লাম বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াতে ইচ্ছে করবে, পূর্ণরূপে

অজু করবে, অতঃপর ক্বিবলার দিক হয়ে দাড়াবে, এবং তাকবীর বলবে। তৎপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে, অতঃপর রুকু করবে এবং স্থির থাকবে। রুকুতে তৎপর মাথা উঠাবে। এবং সোজা হয়ে দাড়াবে, অতঃপর সিজদা করবে। এবং স্থির থাকবে। সিজদাতে অতঃপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অপর বর্ণনায় আছে অতঃপর মাথা উঠাবে। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর তোমার সব নামায এরূপভাবে পড়বে। -(বোখারী মুসলিম)।

হাদীসঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ((রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করতেন তাকবীর সহকারে ক্বেরাত আরম্ভ করতেন আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন সহকারে যখন রুকু করতেন মাথা বেশী উঠাতেন না এবং বেশী নীচুও করতেন না। বরং মাঝামাঝি রাখতেন। যখন রুকু হতে মাথা উত্তোলন করতেন। সোজা হয়ে না দাঁড়ান পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না। এবং সিজদা হতে যখন মাথা উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত পুনরায় সিজদায় যেতেন না। এবং তিনি প্রতি দু রাকাতে আত্তাহিয়াতু পড়তেন। আর তিনি তার বাম পা বিছায়ে দিতেন। এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের মত নিতম্বের উপর বসতে (কুকুর বৈঠক) নিষেধ করতেন, এবং কোন ব্যক্তি নামাযে দু হাত হিংস্র জন্তুর মত করে দু হাতের কব্জি বিছানো হতে নিষেধ করেছেন, এবং সালামের সাথে নামায শেষ করতেন। -(মুসলিম)।

হাদীসঃ হযরত সাহল বিন সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, লোকদের কে নির্দেশ দেয়া হতো যেন, নামাযের মধ্যে পুরুষরা ডান হাত বাম কব্জির উপর রাখে। -(বোখারী)।

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন। পিছনের সারিতে এক ব্যক্তি ছিল যে নামাযে কিছু কম আদায় করেছে যখন সালাম ফিরালেন। তখন তাকে ডাক দিলেন। ওহে অমুক তুমি কি আল্লাহকে ভয় করছনা। তুমি কি দেখছনা কিভাবে নামায পড়ছ, তুমি ধারনা করছ যে তুমি যা করছ তা হতে কিছু আমার গোপন থেকে যায়। আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি পিছন থেকে এরূপ দেখে থাকি যেমনিভাবে সামনে দেখি। -(ইমাম আহমদ)।

হাদীসঃ আবু দাউদ থেকে বর্ণিত উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে হযরত ছামুরা বিন যুনদুব (রাঃ) দুই স্থানে রাসুলুল্লাহর বিরতি করাকে স্মরণ রেখেছেন। এক, যখন তাকবীর তাহরীমা বলতেন, দুই, যখন গায়রিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন পড়ে শেষ করতেন, উবাই বিন কাব (রাঃ) এটা সমর্থন করেছেন তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারমী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন অত্র হাদীস দ্বারা আমিন আস্তে বলা প্রমানিত হল।

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যখন ইমাম গায়রিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বলবে তোমরা আমিন বলবে। যার উক্তি ফেরেস্তার উক্তি সাদৃশ্য হবে তার পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসঃ হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন তোমরা যখন নামায পড়বে। কাতার সোজা করবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ইমামতি করবে তিনি যখন তাকবীর বলবেন তোমরাও তাকবীর বলবে যখন গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লিন বলবেন তোমরা আমিন বলবে। আল্লাহ তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন। তিনি যখন আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাবেন। তোমরাও রুকুতে যাবে ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকু হতে উঠবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন এটা তার বিনিময় হয়ে গেল। যখন তিনি ছামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ বলবেন তোমরা আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদে বলবে। আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। -(মুসলিম শরীফ)।

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যখন ইমাম কেরাত পাঠ করবেন তোমরা চুপ থাকবে। এ হাদিছ ও পূর্বের হাদিছ উভয়টি দ্বারা প্রমানিত যে, আমিন আস্তে বা ধীরে বলা যাবে, যদি আমিন উচ্চস্বরে বলা যায় তাহলে ইমাম যখন ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন বলবে। তোমরা আমিন বলবে। একথা বলার প্রয়োজনই বা কি ছিল। এ সম্পর্কে বহু রেওয়ায়েত রয়েছে। ইমাম তিরমিযী হযরত শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি আলকামা থেকে তিনি আবি ওয়ায়েল থেকে বর্ণনা করেন

فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهٗ

তিনি আমিন বললেন এবং আওয়াজ নীচু করেছেন। উপরন্তু হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও কাতাদাহ (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে ও প্রমানিত যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদি ক্বেরাত পাঠ করবেনা।

বরং চুপ থাকবে, এটা কুরআনে পাকেরও নির্দেশ। এরশাদ হয়েছে

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয় মনযোগে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক যেন তোমাদের উপর করুণা বর্ষীত হয়।

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইমাম তো এজন্যই নির্ধারিত হয়েছে, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়, তিনি যখন তাকবীর বলেন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন ক্বেরাত পাঠ করবে তোমরা চুপ থাকবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

হাদীসঃ হযরত আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) বলেন, তোমরা কিও নামায পড়াচ্ছ না যা রাসুলুল্লাহর নামায। অতঃপর নামায পড়লেন, হাত উঠালেন না, কিন্তু প্রথমবার তাকবীরে তাহরীমার সময়। অপর এক বর্ণনায় এরূপ এসেছে যে, প্রথমবারে হাত উঠাবে তারপর নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি হাছান। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হাদীসঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আঁমি রাসুলুল্লাহ

(সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি তারা নামায শুরু করার সময় ছাড়া হাত উঠাননি। (দারে কুতনী)

হাদীসঃ ইমাম আবু দাউদ, ইমাম আহমদ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নামাযের মধ্যে হাতের উপর হাত নাভীর নীচে রাখাটা সুন্নত।

এ সম্পর্কিত আরো অসংখ্য হাদীস রয়েছে, বরকত স্বরূপ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে নামাযের কার্য্যাদি হাদীসের দ্বারা প্রমাণ করাটা উদ্দেশ্য নয়, আমরা এর উপযুক্তও নয় এর প্রয়োজনও নেই। আইম্মায়ে কেরাম এ স্তর অতিক্রম করেছেন। তাদের নির্দেশনাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা শরীয়তের স্তম্ভ। তাঁরা তাই বলেন, যা হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এরশাদ থেকে উৎসারিত।

নামায পড়ার নিয়মাবলীঃ-

অজু সহকারে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল ফাঁক রেখে দাড়াবে, দু'হাত কান পর্যন্ত নিয়ে যাবে, আঙ্গুল দিয়ে কানের লতি স্পর্শ করবে, আঙ্গুল সমূহ খোলা ও উন্মুক্ত করে রাখবে না। বরং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে, হাতের তালু ক্বিবলামুখী করবে, নিয়্যত সহকারে আল্লাহু আকবর বলার পর হাত নীচে আনবে এবং নাভীর নীচে বাঁধবে ডান হাতের তালুর ভিতর ভাগ বাম হাতের কব্জির উপরিভাগে রাখবে, মাঝখানে তিন আঙ্গুল বাম কব্জির পিঠের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ট আঙ্গুলি কব্জির কাছাকাছি রাখবে এবং ছানা পড়বে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অতঃপর তাআউজ অর্থাৎ আউজুবিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাযীম বলবে। অতঃপর তাছমীয়া অর্থাৎ "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম "বলবে। অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়বে। ফাতেহা শেষে ধীরে "আমীন" বলবে। এরপর যে কোন সূরা বা তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান হবে। আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাবে এবং দু'হাটু হাত দ্বারা ধরবে। এভাবে যেন হাতের তালু হাটুর উপর হয় আঙ্গুল সমূহ ভালভাবে প্রশস্ত রাখবে। সব আঙ্গুল একদিকে করা নয়, এভাবেও নয় যে চার আঙ্গুল একদিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি একদিকে পিঠ নীচু করবে, মাথা পিঠ বরাবর করবে যেন উঁচু নিচু না হয়। কমপক্ষে তিনবার "ছুবহানা রাব্বিআল আজীম" বলবে। অতঃপর "ছামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে, একাকী নামায আদায়কারী হলে এরপর "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলবে, অতঃপর "আল্লাহু আকবর" বলে সিজদায় যাবে। প্রথমে হাঁটু জমীনের উপর রাখবে। অতঃপর দু'হাতের মাঝখানে মাথা রাখবে। শুধু কপাল স্পর্শ করবে না। কিংবা নাকের অগ্রভাগ লাগাবে না বরং কপাল ও নাকের হাঁড় যেন স্পর্শ হয়, বাহুকে পার্শ্ব, পেটকে উরু থেকে এবং উরুকে গোড়ালী থেকে পৃথক রাখবে। দু'পায়ের সব আঙ্গুলের পিঠ ক্বিবলার দিকে রাখবে। হাতের তালু নীচে রাখবে। আঙ্গুল সমূহ ক্বিবলামুখী করবে কমপক্ষে তিনবার "ছুবহানা রাব্বিআল আ'লা" বলবে। অতঃপর মাথা উঠাবে। অতঃপর হাত ও ডান পা খাড়া

করে এর আঙ্গুল সমূহ ক্বিবলার দিকে করবে। বাম পা বিছায়ে তার উপর ভালভাবে বসবে এবং হাতের তালু বিছায়ে উরুর উপর হাটুর নিকটে রাখবে। দু'হাতের আঙ্গুল সমূহ ক্বিবলার দিকে রাখবে। অতঃপর "আল্লাহু আকবর" বলে সিজদায় যাবে। পূর্বের ন্যায় সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠাবে, অতঃপর হাত হাটুর উপর রেখে জানুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন শুধু "বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম" পাঠ করে ক্বেরাত শুরু করবে। অতঃপর এভাবে রুকু, সিজদা সম্পন্ন করে ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছায়ে বসবে এবং

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

পড়বে। এতে কোন অক্ষর কমবেশী করবে না। ইহাকে 'তাশাহুদ' বলা হয়। যখন "লা" অক্ষরের নিকটে পৌছবে তখন ডান হাতের মাঝের আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুল গোলাকার করে কনিষ্ঠাঙ্গুল ও এর পাশের আঙ্গুল তালুর সাথে লাগাবে এবং "লা" বলার সাথে সাথে শাহাদত আঙ্গুল উঠাবে কিন্তু এদিক সেদিক নড়াচড়া করবে না এবং "ইল্লা" বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলবে এবং অন্যান্য আঙ্গুল সমূহ সোজা করে ফেলবে, এবার যদি দু'রাকাত থেকে বেশী পড়তে হয় তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং পূর্বের মত পড়বে। কিন্তু ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে পরবর্তী রাকাত সমূহে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়ার প্রয়োজন নেই। শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর নিম্নোক্ত দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অথবা হাদীসে বর্ণিত অন্য কোন দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ

অথবা এই দোয়া পড়বে। اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ

অথবা এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الخ

অথবা এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এই দোয়াটা আল্লাহুম্মা ছাড়া পড়বে না। এরপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলবে। অনুরূপ বামদিকে মুখ ফিরিয়েও বলবে। উপরোক্ত নিয়ম ইমাম বা একাকী নামায আদায়কারী পুরুষের জন্য। মুক্তাদির জন্য এর মধ্যে কিছু কাজ জায়েয নেই। যেমন ইমামের পিছনে ফাতেহা বা কোন সূরা পড়া। মহিলারাও কতিপয় ক্ষেত্রে এ হুকুমের বহির্ভুত। যেমন হাত বাঁধা, সিজদা অবস্থায় বৈঠকের পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভিন্নতর। যা আমি বর্ণনা করবো।

উল্লেখিত বিষয়ের মধ্যে কিছু রয়েছে ফরজ যা ছাড়া নামাযই হবে না। কতিপয় ওয়াজিব ইচ্ছাকৃত যা বর্জন করা গুনাহ্ এবং নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। ভুলবশতঃ হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। কতিপয় হচ্ছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ যা পরিত্যাগে অভ্যস্থ হওয়া গুনাহ। কতিপয় রয়েছে মুস্তাহাব যা করলে ছাওয়াব আছে না করলে গুনাহ নেই।

নামাযের ফরজ সমূহঃ-

নামাযে সাতটি ফরজ রয়েছে। (১) তাকবীরে তাহরীমা। (২) ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো। (৩) কেরাত পাঠ করা (৪) রুকু। (৫) সিজদা। (৬) শেষ বৈঠক। (৭) কর্ম দ্বারা নামায শেষ করা।

তাকবীরে তাহরীমা মূলতঃ নামাযের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। নামাযের কার্য্যাদির সাথে অধিক সম্পৃক্ততার কারণেই এখানে তাকে নামাযের ফরজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

মাসয়ালাঃ নামাযের শর্তসমূহ অর্থাৎ পবিত্র হওয়া, ক্বিবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা, তাকবীরে তাহরীমার সময় পাওয়া যাওয়া শর্ত। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা শেষ করার পূর্বে এসব শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরী। আল্লাহ্ আকবর বলল, এদিকে কোন শর্তের বিলুপ্ত হল নামায হবে না। (দুর্রুল মোখতার/রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যেসব নামাযে দাঁড়ানো ফরজ সেসব নামাযে তাকবীরে তাহরীমার জন্য দাড়ানো ফরজ। যদি কেউ বসে আল্লাহ্ আকবর বলার পর দাড়াল, নামায শুরুই হয়নি। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমামকে রুকুতে পাওয়া গেল, তাকবীরে তাহরীমা বলে রুকুতে চলে গেল, অর্থাৎ তাকবীর এ সময় শেষ করল, হাত বাড়ালে হাটু পর্যন্ত চলে যাবে, নামায হবে না। (আলমগীরি/রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নফলের জন্য তাকবীরে তাহরীমা রুকুতে বলল, নামায হল না, বসার পর বললে নামায হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি আল্লাহ্ শব্দ ইমামের সাথে বলল, কিন্তু আকবর শব্দ ইমামের সাথে শেষ করল নামায হল না।

মাসয়ালাঃ ইমামকে রুকুতে পাওয়া গেল, দাড়িয়ে আল্লাহ্ আকবর বলল, কিন্তু এ তাকবীর দ্বারা রুকুর তাকবীরের নিয়ত্ব করেছে নামায হয়ে যাবে এবং এ নিয়্যত বেহুদা। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমামের আগে তাকবীরে তাহরীমা বলল, এক্তেদার নিয়্যত করলে নামাযের অন্তর্ভুক্ত হল না এবং শুরুও হল না এবং ইমামের নামাযে অন্তর্ভুক্ত হল না। বরং পৃথকভাবে হল। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমামের তাকবীরের অবস্থা জানা নেই যে, কখন বলল, যদি প্রবল ধারণা হয় যে ইমামের আগে নিজে বলেছে নামায হবে না। আর যদি প্রবল ধারণা হয় ইমামের আগে বলা হয়নি তখন হয়ে যাবে। যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না হয় তখন বন্ধ করাটাই উত্তম ও অধিক সতর্কতা এবং পুনরায় তাহ্রীমা বাঁধবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি তাকবীর উচ্চারণে সক্ষম নহে যেমন বোবা বা অন্যকোন কারণে মুখ বন্ধ হয়ে গেল তার উপর উচ্চারণও ওয়াজিব নয়। অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে আল্লাহ্ আকবর বলল, বা মুয়াজ্জিনের উত্তরে বলল, ঐ তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করে দিল, নামায হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ আল্লাহ্ আকবর এর পরিবর্তে অন্যকোন শব্দ যা আল্লাহর বিশেষ সম্মানের সাথে সম্পর্কিত যেমন, اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَعْظَمُ বা اَللّٰهُ اَجَلُّ বা اَللّٰهُ اَكْبَرُ বা اَللّٰهُ كَبِيْرٌ বা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা اَللّٰهُ اِلٰهٌ বা اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দ বললে তা দ্বারাও নামায শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এ পরিবর্তন মাকরূহে তাহরীমি। আর যদি প্রার্থনা বা উদ্দেশ্য অর্জনের শব্দ হয় যেমন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ ইত্যাদি প্রার্থনাসূচক শব্দ বললে নামায হবে না। আর যদি শুধুমাত্র আকবর বা আযল বলল তার সাথে আল্লাহ্ শব্দ যোগ করল না, তখনও হবে না। অনুরূপভাবে যদি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বা اَعُوْذُ بِاللّٰهِ বা لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ বা اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -বলল নামায হল না। অথবা শুধু اَللّٰهُ বা يَا اَللّٰهُ

বা اَللّٰهُمَّ বলল নামায হয়ে যাবে। (আলমগীরি/দুর্রুল মোখতার/রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ আল্লাহ্ শব্দ কে আয়াল্লাহ্ বা আকবর শব্দ আক্‌বার বা আকবাআর বললে নামায হবে না। বরঞ্চ এতে অর্থের অশুদ্ধি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃত পড়লে কাফের হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ প্রথম রাকাতের রুকু পাওয়া গেলে প্রথম তাকবীরের ফজীলত্ পাওয়া গেল। (আলমগীরি)

দাড়ানোঃ- দাড়ানোর কমসীমা এতটুকু যে, হাত বাড়ালে যেন হাটু পর্যন্ত না পৌছে। পূর্ণ ক্বিয়াম হল- সোজা হয়ে দাড়ানো। (দুর্রুল মোখতার/রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ক্বোরাত পড়তে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ দাড়াবে অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্বেরাত ফরজ যে পরিমাণ দাড়ানো ফরজ। যে পরিমাণ ক্বেরাত ওয়াজিব সে পরিমাণ দাড়ানো ওয়াজিব। যে পরিমাণ ক্বেরাত সুন্নত সে পরিমাণ দাড়ানো সুন্নাত। (দুর্রুল মোখতারা)। এই হুকুম প্রথম রাকাত ছাড়া অন্যান্য রাকাতের জন্য প্রথম রাকাতে ফরজ পরিমাণ দাড়ানোর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমাও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেয়ামে মসনুনের মধ্যে ছানা,তাআউজ, তাছমীয়া পরিমাণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মাসয়ালাঃ ক্বেয়াম ও ক্বেরাতে ওয়াজিব সুন্নত হওয়ার অর্থ এই যে, তা ত্যাগ করলে ওয়াজিব বা সুন্নত বর্জনের হুকুম দেয়া হবে। অন্যথায় আদায় করলে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বেয়াম ও ক্বেরাত পড়েছে সব ফরজ হলে ফরজের ছাওয়াব পাবে। (দুর্রুল মোখতার/রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ফরজ, বিতর, দুই ঈদের নামায, ফজরের সুন্নতে দাড়ানো ফরজ। সঠিক ওজর ছাড়া ওসব নামায বসে বড়লে হবে না। (দুর্রুল মোখতার/রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এক পা এর উপর খাড়া হওয়া অন্য পা জমীন হতে উঠাইয়া নেয়া মাকরূহে তাহরীমি। আর যদি ওজরের কারণে এরূপ করে ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ দাড়াতে সক্ষম কিন্তু সিজদা করতে পারছে না তখন তার জন্য ইশারায় বসে নামায পড়া উত্তম। দাড়িয়েও পড়তে পারবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি সিজদা করতে পারে কিন্তু সিজদা করলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনও ইশারায় বসে পড়া মুস্তাহাব। দাড়িয়ে ইশারায় পড়াও জায়েয। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি দাড়ালে রক্তের ফোটা আসে বা ক্ষতস্থান প্রবাহিত হয়, বসে পড়লে হয় না, তার জন্য বসে পড়া ফরজ। যদি অন্য কোন উপায়ে তা বন্ধ করতে না পারে দাড়ালেই চতুর্থাংশ সতর খুলে যায় বা মোটেই ক্বেরাত পড়তে পারছে না, তখন বসে পড়বে। আর যদি দাড়িয়েও কিছু পড়তে পারে তখন যতটুকু দাড়িয়ে পড়তে সক্ষম ততটুকু দাড়িয়ে পড়া ফরজ। বাকীটুকু বসে পড়বে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি এতটুকু দুর্বল হয় যে, মসজিদে জামাতের জন্য যাওয়ার পর দাড়িয়ে নামায পড়তে পারছে না, ঘরে পড়লে দাড়িয়ে পড়তে পারে তখন ঘরে পড়বে। জামাত সম্ভব হলে

জামাত পড়বে। নতুবা একাকী পড়বে। (দুর্রুল মোখতার/রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দাড়ানোর ক্ষেত্রে সামান্য কষ্ট হওয়াটাই ওজর নয়, বরং দাড়িয়ে একেবারে সিজদা করতে না পারাটাই হচ্ছে ওজর। বা দাড়িয়ে সিজদা করলে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে বা চতুর্থাংশ সতর খুলে যাচ্ছে বা ক্বেরাত পাঠে অক্ষম হয়ে পড়েছে এমনি দাড়াতে পারে কিন্তু এতে রোগ বেড়ে যায় বা দেরীতে সুস্থ হবে বা কষ্ট সহ্যের বাহির হয়ে পড়েছে এমতাবস্থায় বসে পড়বে। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ যদি লাঠি, খাদেম বা দেওয়ালের উপর ভর দিয়ে দাড়ানো যায় তখন দাড়িয়ে পড়া ফরজ। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ যদি কিছুক্ষণ মাত্র দাড়াতে পারে যদিও দাড়িয়ে আল্লাহ্ আকবর বলতে পারে তখন দাড়িয়ে এতটুকু বলাটা ফরজ। অতঃপর বসে যাবে। (গুনীয়া)

জরুরী সতর্কতাঃ- আজকাল সাধারণতঃ এটা দেখা যায় যে, সামান্য জ্বরাক্রান্ত বা কষ্ট অনুভূত হলেই বসে নামায পড়া শুরু করে দেয়, অথচ এসব লোকেরাই দশ পনের মিনিট বরঞ্চ তার চেয়ে বেশী পরিমাণ সময় দাড়িয়ে বিভিন্ন ধরণের কথা-বার্তায় ব্যস্ত থাকে, এসব মাসয়ালার ব্যাপারে তাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ এবং যতগুলো নামায দাড়ানোর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে আদায় করেছে তা পুনরায় পড়া ফরজ। অনুরূপভাবে এমনি যদি দাড়াতে না পারে কিন্তু লাঠি কিংবা দেওয়াল বা মানুষের সাহায্যে দাড়ানো সম্ভব ছিল তা করেনি, সে নামাযও হয়নি। তা পুনরায় পড়া ফরজ। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন।

মাসয়ালাঃ নৌকা বা জাহাযের উপর আরোহী চলন্ত অবস্থায় তার উপর বসে নামায পড়া যাবে (গুনীয়া)

ক্বেরাতঃ- ক্বেরাত হলো, হরফ বের হওয়ার নির্ধারিত স্থান থেকে যথার্থভাবে আদায় করার নাম। যেন প্রত্যেকটি অক্ষর অন্য আরেকটি থেকে সঠিকভাবে পৃথক করা যায় এবং ধীরে পড়ার ক্ষেত্রে এতটুকু জরুরী যে, যেন নিজে শুনতে পায়। আর যদি হরফ সঠিকভাবে আদায় করল কিন্তু এত বেশী পরিমাণ আস্তে পড়েছে নিজেও শুনতে পায়নি হট্টগোল বা শুনা না যাওয়ার কোন অন্তরায়ও সৃষ্টি হয়নি, তাহলে নামায হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ যে কোন স্থানে কিছু পড়ার বা বলার জন্য নির্ধারণ করলে এবং এটাই উদ্দেশ্য হলে কমপক্ষে এভাবে বলবে যেন নিজে শুনতে পায়। যেমন, তালাক দেয়া, আজাদ করা বা কোন জন্তু প্রাণী জবেহ্ করার সময়। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ সাধারণতঃ ফরজের দু'রাকাতে, বিতর ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর উপর এক আয়াত পড়া ফরজ। মুক্তাদির জন্য কোন নামাযে ক্বেরাত জায়েয নেই। ফাতেহাও না, আয়াতও না। ক্বেরাত ধীর সম্পন্ন নামাযে হউক বা স্পষ্ট ক্বেরাত সম্পন্ন নামাযে হউক, ইমামের ক্বেরাত মুক্তাদির জন্যও যথেষ্ট।

মাসয়ালাঃ ফরজের কোন রাকাতে ক্বেরাত পড়লনা অথবা শুধুমাত্র এক রাকাত ক্বেরাত পড়ল নামায ভঙ্গ হয়ে গেল। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ছোট আয়াত যার মধ্যে দুই বা ততোধিক শব্দ রয়েছে পড়লে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। যদি এক হরফের আয়াত হয় যেমন ق ن ص কোন কোন ক্বেরাতে এগুলোকে আয়াত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা পড়ার দ্বারা ফরজ আদায় হবে না। যদিও তা বারবার পড়া হয়। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মতবিরোধ রয়েছে একটি আয়াতে مُدْهَامَّتَانِ মতবিরোধটি থেকে বেচে থাকা উত্তম ও অধিক সতর্কতা।

মাসয়ালাঃ সূরার শুরুতে বিছমিল্লাহির রহমানির রাহীম একটি পূর্ণ আয়াত। কিন্তু শুধুমাত্র তা পড়লে ফরজ আদায় হবে না। (দুর্রুলমোখতার)

মাসয়ালাঃ ক্বেরাতে শাজ্জা দ্বারা ফরজ আদায় হবে না। অনুরূপভাবে ক্বেরাতের পরিবর্তে আয়াত বানান করে পড়লে নামায হবে না। (দুর্রুলমোখতার)

রুকুঃ- এতটুকু ঝুঁকে পড়া হাত বাড়ালে হাটু পর্যন্ত পৌছে যাবে, এটা রুকুর নিম্নস্তর। (দুর্রুলমোখতার)

পূর্ণ রুকু হলো পিঠ সোজা বিছায়ে দেয়া।

মাসয়ালাঃ মেরুদন্ড বাঁকা হয়ে রুকু সীমা পর্যন্ত পৌছলে রুকুর জন্য মাথা দ্বারা ইশারা করবে। (আলমগীরি)

সিজদাঃ- হাদীসে আছে আল্লাহর সাথে বান্দার সর্বাধিক নৈকট্য হলো সিজদায় থাকা। সুতরাং অধিক দোয়া করো। এ হাদীস ইমাম মুসলিম হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। কপাল জমীনের উপর স্থাপন করা সিজদার মূল কথা। সিজদার সময় পায়ের এক আঙ্গুলির পেট জমীনের সাথে লাগা শর্ত। সুতরাং কেউ এভাবে সিজদা করল যে, দুই পা জমীন থেকে উঠে গেল নামায হয়নি। বরঞ্চ শুধুমাত্র আঙ্গুলির অগ্রভাগ জমীনের সাথে লাগে তখনও হবে না। এ মাসয়ালার ব্যাপারে অনেক লোক উদাসীন। (দুর্রুলমোখতার/ফতোয়ায়ে রিজভীয়া)

মাসয়ালাঃ যদি কোন ওজরের কারণে কপাল জমীনের সাথে না লাগে তখন শুধু নাক দ্বারা সিজদা করবে, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র নাকের মাথা লাগলে যথেষ্ট হবে না; বরং নাকের শক্তভাগ জমীনের উপর লাগা আবশ্যক। (আলমগীরি/রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ চেহারা বা চিবুক জমীনের সাথে লাগালে সিজদা হবে না। ওজরের কারণে হউক বিনা ওজরে হউক। ওজর হলেতো ইশারায় পড়ার বিধান রয়েছে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ প্রত্যেক রাকাতে দু'বার সিজদা করা ফরজ।

মাসয়ালা কোন নরম বস্তু যেমন ঘাস বা কটন ইত্যাদির উপর সিজদা করল, কপাল যদি এভাবে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ এভাবে চাপচে আর দাবালে চাপবে না তখন জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না। (আলমগীরি)। অনেক মসজিদে ছাটাই বা গালিছা বিছানো থাকে সিজদার সময় এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বাঞ্চনীয়। কপাল যদি ভালভাবে না চাপে নামায হবে না এবং নাকের শক্ত অংশ যদি না চাপে মাকরূহে তাহরীমা পুনরায় পড়া ওয়াজিব। শোফার

গদিতে সিজদা করলে কপাল ভালভাবে চাপে না বিধায় নামায হবে না। রেলের অনেক বিভাগে এবং গাড়ীতে এ ধরণের গদি থাকে। এসব গদি হতে নেমে নামায পড়া উচিৎ।

মাসয়ালাঃ জোড়া ষাঁড় দ্বারা টানা দু'চাকা ওয়ালা গাড়ীর সিট যদি এমন শক্ত বস্তু দ্বারা নির্মিত হয় যা দাবালেও আর চাপবে না। এমন অবস্থায় নামায হবে অন্যথায় হবে না।

মাসয়ালাঃ যব ও ভুট্টা ইত্যাদি ছোট দানা যার উপর কপাল ভালমতে স্থির থাকে না তার উপর নামায হবে না আর ভুষি ইত্যাদির বস্তুর মধ্যে ভালভাবে কিছু ভর্তি করার পর কপাল স্থির থাকার অন্তরায় না হলে নামায হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ যদি কোন ওজরের কারণে যেমন ভীড়ের কারণে নিজের উরুর উপর সিজদা করলে জায়েয হবে, ওজর বিহীন বাতিল বলে গন্য হবে। হাটুর উপর ওজর অবস্থায় বা ওজরবিহীন কোন অবস্থায় জায়েয হবে না। (দুর্রুলমোখতার/আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ভীড়ের কারণে অন্যের টিটের উপর সিজদা করল সেও একই নামাযে শরীক তাহলে জায়েয। অন্যথায় জায়েয নেই। যদিও সে নামাযে না হউক। অথবা নামাযে রয়েছে কিন্তু তার সাথে শরীক নহে অর্থাৎ দু'জনই পৃথক পৃথকভাবে পড়ছে (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ জামার হাতের মাথা বা আস্তিন বা পাগড়ীর পেঁচ বা অন্য কোন কাপড় যা পরিধানে রয়েছে তার উপর সিজদা করল এবং তার নীচের ভাগ নাপাক সিজদা জায়েয হবে না। তবে এসব অবস্থায় পুনরায় পবিত্র স্থানে সিজদা করলে জায়েয হবে (গুনীয়া/দুর্রুলমোখতার)

মাসয়ালাঃ পাগড়ীর পেঁচের উপর সিজদা করল মস্তক ভালভাবে চাপলে সিজদা হবে আর যদি মস্তক ভালমতে না চাপে বরঞ্চ শুধু স্পর্শ করল, দাবালে আরো চাপবে বা মাথার কোন অংশ লাগাল সিজদা হল না (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এমন স্থানে সিজদা করল যা পা হতে বার আঙ্গুলের চেয়ে বেশী উঁচুতে হল সিজদা হল না। অন্যথায় হবে, (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন ছোট পাথরের উপর সিজদা করল সঠিক অংশাদি কপালের সাথে স্পর্শ হয় হবে অন্যথায় হবে না। (আলমগীরি)

শেষ বৈঠকঃ- নামাযের রাকাত পূর্ণ হওয়ার পর এত দেরী পরিমাণ বসা ফরজ যাতে "আত্তাহিয়্যাতু" রাসূলুল্লাহ্ পর্যন্ত পড়া যায়।

মাসয়ালাঃ চার রাকাত পড়ার পর বসল, অতঃপর তিন রাকাত ধারণা করে দাড়িয়ে গেল, আবার স্মরণ হল নামায চার রাকাত হয়েছে, বসে পুনরায় সালাম ফিরাল উভয়বার বসাটা যদি একত্রে তাশাহ্হুদ পরিমাণ হয়ে থাকলে ফরজ আদায় হয়ে গেল। অন্যথায় নয় (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ পূর্ণ শেষ বৈঠক নিদ্রায় অতিক্রম করল জাগ্রত হওয়ার পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসা ফরজ। অন্যথায় নামায হবে না। এমনিভাবে ক্বেরাত রুকু, সিজদা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিদ্রায় অতিক্রম করল তখন জাগ্রত হওয়ার পর তা পুনরায় পড়া ফরজ। অন্যথায় নামায হবে না এবং সহু সিজদাও করবে। লোকেরা এ ব্যাপারে উদাসীন বিশেষভাবে গরমের

তারাবীর সময়। (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ পূর্ণ রাকাত শয়নে পড়ে নিল, নামায ভঙ্গ হয়ে গেল। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজের চতুর্থ রাকাতের পর বৈঠক করল না, পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করা পর্যন্ত বসে যাবে অথবা পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নিল বা ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে বসল না, তৃতীয় রাকতের সিজদা করে নিল, বা মাগরীবে তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নিল বা মাগরীবে তৃতীয় রাকাতে বসল না চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে নিল, উপরোক্ত সব অবস্থায় ফরজ বাতিল হয়ে গেল। মাগরিব ছাড়া অন্যান্য নামাযে আর এক রাকত মিলাবে। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ তাশাহ্হুদ পরিমান বসার পর স্মরণ হল যে, তিলাওয়াত বা নামাযের কোন সিজদা করার আছে এবং করে নিল তখন ফরজ হবে সিজদার পর পুনরায় তাশাহ্হুদ পরিমান বসা, প্রথম বৈঠকের পর বৈঠক না করলে নামায হবেনা। -(গুনীয়া)।

মাসয়ালাঃ সাহু সিজদার দ্বারা প্রথম বৈঠক বাতিল হয়নি কিন্তু তাশাহ্হুদ ওয়াজিব অর্থাৎ সাহু সিজদা করার পর সালাম ফিরালে ফরজ আদায় হয়ে গেল। কিন্তু গুনাহগার হবে এবং পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে।-(রদ্দুল মোখতার)।

কর্ম দ্বারা নামায হতে বের হওয়াঃ-

অর্থাৎ শেষ বৈঠকের পর সালাম কালাম ইত্যাদি এমন কোন কাজ ইচ্ছাকৃত করা বা নামাযের অন্তরায়। কিন্তু সালাম ছাড়া ইচ্ছাকৃত অন্যকোন ভঙ্গকারী কাজ পাওয়া গেলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব এবং অনিচ্ছাকৃত কোন নামায পরিপন্থি কাজ পাওয়া গেলে নামায বাতিল। যেমন তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর তায়াম্মুম কারী পানি ব্যবহারে সক্ষম হল। বা মোজা এর উপর মুছেহ কারীর সময় সীমা পূর্ণ হয়ে গেল। বা আমলে কলিল সহকারে মোজা খুলে নিল। বা মোটেই পরিধান করেনি এবং কোন আয়াত কেউ পড়ানো ছাড়া শুধু শুনার দ্বারা স্মরণ হল বা কাপড় অনাবৃত ছিল। তখন সতর পরিমান পবিত্র কাপড় কেউ এনে দিল। যা দ্বারা নামায হবে অর্থাৎ নিষিদ্ধ পরিমান নাপাকী এতে নেই বা নিষিদ্ধ পরিমাণ নাপাকী আছে কিন্তু তার কাছে এমন কোন বস্তু আছে যা দ্বারা পবিত্র করা যাবে বা ইহাও নেই কিন্তু তার কাপড়ের চতুর্থাংশ, বা বেশীর ভাগ পবিত্র বা ইশারায় নামায পড়ছিল এখন রুকু সিজদায় সক্ষম হল বা ছাহেবে তারতীবের স্মরণ হল যে, সে পূর্বের নামায পড়েনি, যদি ছাহেবে তারতীব ইমাম হয়ে থাকে মুক্তাদির নামাযও গেল বা ইমামের হাদছ বা অজু ভঙ্গ হল উম্মীকে খলিফা নিযুক্ত করল এবং তাশাহ্হুদের পর খলিফা করল। নামায হয়ে যাবে। বা ফজরের নামাযে সূর্য উদয় হয়ে গেল বা জুমার নামাযে আসরের সময় চলে আসল

বা দুই ঈদের দিবসের অর্ধেক হয়ে গেল। বা পাট্টির উপর মুছেহ করেছিল, ক্ষতস্থান সুস্থ হওয়ায় তা পড়ে গেল বা ওজর ওয়ালা ছিল ওজর চলে গেল বা অপবিত্র কাপড় দ্বারা নামায পড়ছিল কোন বস্তু পেয়ে গেল যা দ্বারা পাক করবে বা ক্বাযা নামায পড়ছিল মাকরূহ ওয়াক্ত চলে আসল, বা বাদী মাথা খোলা রেখে নামায পড়ছিল, এমতাবস্থায় আজাদ হয়ে গেলে তাৎক্ষনিক মাথা ঢাকল না উপরোক্ত সব অবস্থায় নামায বাতিল হয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি উম্মী ছিল ইমাম ছিল ক্বারী নামাযে তার কোন আয়াত স্মরণ আসল, নামায বাতিল হবে না। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ কেয়াম, রুকু, সিজদা ও শেষ বৈঠকে তারতীব বা ধারাবাহিকতা ফরয। যদি কেয়ামের পূর্বে রুকু করে নিল পুনরায় তারপর কেয়াম করল। ঐ রুকু বাতিল হবে। যদি কেয়ামের পর পুনরায় রুকু করে নামায হয়ে যাবে। অন্যথায় হবে না। এভাবে রুকুর পূর্বে সিজদা করার পর পুনরায় রুকু তারপর সিজদা করলে নামায হয়ে যাবে অন্যথায় হবে না। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ যেসব কাজ ফরজ সে সবে ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদির উপর ফরজ। অর্থাৎ নামাযের কোন কাজ ইমামের আগে আদায় করল, এবং ইমামের সাথে বা ইমামের আদায় করার পর আদায় করলনা নামায হবে না।

যেমন ইমামের আগে রুকু বা সিজদা করে নিল। এখনো ইমাম রুকু বা সিজদায় যায়নি, সে মাথা তুলে নিল, এখন যদি ইমামের সাথে বা পরে আদায় করে নামায হবে, অন্যথায় হবে না। -(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদির জন্য এটাও ফরজ যে, ইমামের নামাযকে নিজ ধারনায় সঠিক জ্ঞান করতে হবে, নিজের নিকট ইমামের নামায বাতিল মনে করলে তার নামায হবে না, যদিও ইমামের নামায শুদ্ধ হয়। -(দুর্রুল মোখতার)।

নামাযের ওয়াজিব সমূহঃ

১। তাকবীরে তাহরীমায় আল্লাহু আকবর শব্দ বলা।

২। আলহামদু পড়া, অর্থাৎ এ সুরার সাত আয়াত প্রত্যেকটি আয়াত স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব তার মধ্যে একটি আয়াত এমনকি একটি শব্দও বর্জন করা ওয়াজিব, বর্জনের নামান্তর।

৩। আলহামদুর সাথে সুরা মিলানো, অর্থাৎ একটি ছোট সুরা, যেমন

إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

বা তিনটি ছোট আয়াত

ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

বা এক আয়াত অথবা দুই আয়াত যা ছোট তিনটির সমান পাঠ করা।

ফরজ নামাযের প্রথম দু রাকাতে কেরাত ওয়াজিব, ফরজের প্রথম দুই রাকাতে

আলহামদুর সাথে সুরা মিলানো, নফল ও বিতরের প্রত্যেক রাকাতে সুরা মিলানো ওয়াজিব।
আলহামদু সুরার আগে হওয়া, প্রত্যেক রাকাতে সুরার আগে একবার আলহামদু পড়া।
আলহামদু ও সুরার মাঝখানে কোন ব্যবধান বা পার্থক্য সৃষ্টি না করা। আমীন আলহামদু অধীন এবং বিছমিল্লাহ্ সুরার অধীন, এটা আযনবী ফাছেলা নয়। ক্বেরাতের পর রুকু করা, এক সিজদার পর দ্বিতীয় সিজদা করা, উভয় সিজদার মাঝখানে কোন রুকন দ্বারা পার্থক্য না করা। তাদীল আরকান, অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে রুকু, সিজদা, দাড়া, বসার মধ্যে কমপক্ষে একবার ছুবহানাল্লা বলা পরিমান অবস্থান করা। দাড়ানো অর্থাৎ রুকু হতে সোজা হয়ে দাড়া। জলসা বা বসা অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। প্রথম বৈঠক যদিও নফল নামায হয়। ফরজ, বিতর, সুন্নতের প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের মধ্যে কোন কিছু বৃদ্ধি না করা। উভয় বৈঠকে পূর্ণ তাশাহুদ পড়া এভাবে যতবার বৈঠক হয় প্রত্যেক বৈঠকে পূর্ণ তাশাহুদ ওয়াজিব। এক শব্দ ত্যাগ করলে ওয়াজিব বর্জন হবে। "আস্সালামু" শব্দ দুবার, "আলাইকুম" শব্দ ওয়াজিব নয়। বিতরে দোয়া কুনত পড়া। তাকবীরে কুনত পড়া। দুই ঈদের ছয় তাকবীর বলা। দুই ঈদের দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর বলা। ঐ তাকবীরের জন্য আল্লাহু আকবর শব্দ হওয়া। প্রত্যেক স্পষ্ট ক্বেরাত বিশিষ্ট নামাযে ইমাম ক্বেরাত স্পষ্ট করে পড়া। অস্পষ্ট স্থানে ধীরে পড়া। প্রত্যেক ওয়াজিব ফরজ নির্ধারিত স্থানে হওয়া। প্রত্যেক রাকাতে একবার রুকু করা। প্রত্যেক রাকাতে দুবার সিজদা করা। দ্বিতীয় রাকাতের আগে বৈঠক না বসা। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাকাতে বৈঠক না করা। আয়াতে সিজদা পাঠ কালে তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা। ভুল হলে সাহু সিজদা আদায় করা দু'রাকাত ফরজ বা দুরাকাত ওয়াজিব বা ওয়াজিব ও ফরজের মাঝখানে তিন তাসবীহ্ পরিমান বিরতি না করা। ইমামের কেরাত পাঠকালে উচু আওয়াজে হউক বা ধীরে হউক মুক্তাদি চুপ থাকা। কেরাত ছাড়া সকল ওয়াজিব সমুহে ইমামের অনুসরণ করা।
মাসয়ালাঃ কোন বৈঠকে তাশাহুদের কোন অংশ ভুলে গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব। -(দুর্রুল মোখতার)।
মাসয়ালাঃ আয়াতে সিজদা পাঠ করল, সিজদার মধ্যে ভুলক্রমে তিন আয়াত বা বেশী পরিমাণ সময় বিলম্ব করল তখন সাহু সিজদা করবে। -(গুনীয়া)।
মাসয়ালাঃ সুরা প্রথমে পাঠ করেছে এরপর আলহামদু অথবা আলহামদু ও সুরার মাঝখানে তিনবার সুবহানাল্লা বলা পরিমাণ সময় চুপ রয়েছে তখন সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ আলহামদুর একটি শব্দও বাকী থাকলে সাহু সিজদা করবে। -(দুর্রুল মোখতার)।
মাসয়ালাঃ যেসব বস্তু ফরজ ও ওয়াজিব রয়েছে মুক্তাদির উপর ওয়াজিব হল ইমামের সাথে তা আদায় করবে। শর্ত হলো কোন ওয়াজিব নিয়ে যেন দ্বন্দ্ব না হয়। দ্বন্দ্ব হলে তা বাদ দিবেনা বরং তা আদায় করে অনুসরণ করবে। যেমন, ইমাম তাশাহুদ পড়ে দাড়িয়ে গেল। মুক্তদির এখনো পূর্ণ পড়া হয়নি। তখন মুক্তাদির ওয়াজিব হল পূর্ণ করে দাড়ানো। সুন্নতের মধ্যে অনুসরণ সুন্নত। দ্বন্দ্ব না হওয়া শর্ত। দ্বন্দ্ব হলে তা বর্জন করবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে, যেমন রুকু বা সিজদার মধ্যে তিনবার তাসবীহ্ বলেনি, এমতাবস্থায় ইমাম মস্তক উঠিয়ে ফেললে মুক্তাদিও উঠাবে। -(রদ্দুল মোখতার)।
মাসয়ালাঃ কোন রাকাতের এক সিজদা ভুলে গেল, যখন স্মরণ হবে করে নিবে, যদিও সালামের পর হয়, তবে নামায ভঙ্গকারী কোন কাজ প্রকাশ না হওয়ার শর্তে এবং সাহু সিজদা করবে। -(দুর্রুলমোখতার)।
মাসয়ালাঃ এক রাকাতে তিন সিজদা করল, বা দুই রুকু বা প্রথম বৈঠক ভুলে গেল তখন সাহু সিজদা করবে। -(দুর্রুলমোখতার)।
মাসয়ালাঃ তাশাহুদের শব্দাবলী দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দেশ্য করবে যেন আল্লাহুর মহানত্বের প্রতি সম্মান নিবেদন করছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং নিজেদের উপর এবং অলিউল্লাহদের উপর সালাম প্রেরণ করবে। মেরাজের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা নয়। -(দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)।
মাসয়ালাঃ ফরজ, বিতর ও সুন্নত সমুহের মধ্যে প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর যদি এতটুকু বলেঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ বা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
যদি ভুলক্রমে হয় সাহু সিজদা করবে। ইচ্ছাকৃত হলে পুনরায় পড়া ওয়াজিব। -(রদ্দুল মোখতার)।
মাসয়ালাঃ মুক্তাদি প্রথম বৈঠকে ইমামের পূর্বে তাশাহুদ পড়ে নিলে চুপ থাকবে দরুদ বা দোয়া কিছু পড়বেনা, মাসবুকের উচিৎ শেষ বৈঠকে ধীরে ধীরে পড়বে যেন ইমামের সালামের আগে সমাপ্ত হয়। সালামের পূর্বে সমাপ্ত হলে কলেমায়ে শাহাদাত বার বার পড়বে। -(দুর্রুলমোখতার)।

নামাযের সুন্নত সমূহঃ

১। তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো।
২। হাতের আঙ্গুল সমূহ আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া, অর্থাৎ একেবারে মিলাবেনা বা প্রশস্তও রাখবেনা, বরঞ্চ নিজ গতিতে ছেড়ে দিবে।
৩। হাত ও আঙ্গুল সমূহের পেট ক্বিবলামুখী করা।
৪। তাকবীরের সময় মস্তক অবনত না করা।
৫। তাকবীরের পূর্বে হাত উঠানো।
৬। এভাবে তাকবীরে কুনুত এবং দুই ঈদের তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত নেওয়ার পর তাকবীর বলা। এছাড়া কোন স্থানে নামাযের মধ্যে হাত উঠানো সুন্নত নয়।
মাসয়ালাঃ তাকবীর বলা হলো হাত উঠান হয়নি। আল্লাহু আকবর পূর্ণ বলার পূর্বে স্মরণ হল। তখন উঠাবে। সুন্নত পর্যায়ে সম্ভব না হলে যতটুকু হয় উঠাবে। -(আলমগীরি)।
মাসয়ালাঃ মহিলাদের জন্য সুন্নত হলো, স্কন্ধ বা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো। -(রদ্দুল মোখতার)।
মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি এক হাত উঠাতে পারলে এক হাত উঠাবে (আলমগীরি) ইমাম উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর এবং

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

এবং সালাম বলবে যত আওয়াজ যতটুকু উঁচু করা প্রয়োজন হয়। বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ অধিক উঁচু করা মাকরূহ।
মাসয়ালাঃ ইমাম তাকবীর তাহরীমা এবং রুকন পরিবর্তনের সকল তাকবীর স্পষ্ট করে বলা সুন্নত। -(রদ্দুল মোখতার)।
মাসয়ালাঃ ইমামের তাকবীরের আওয়াজ যদি সকল মুক্তাদির নিকট না পৌছে তখন কোন মুক্তাদিও উঁচু আওয়াজে তাকবীর বলা উত্তম। নামায শুরু করা ও রুকন পরিবর্তনের অবস্থা যেন সকলে অবগত হয়। বিনা প্রয়োজনে করা মাকরূহ ও বিদয়াত। -(রদ্দুল মোখতার)।
মাসয়ালাঃ তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা যদি তাহরীমা উদ্দেশ্য না হয় বরং নিছক ঘোষনা উদ্দেশ্য হয় নামাযই হবেনা। তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা তাহরীমাই উদ্দেশ্য হতে হবে। প্রকাশ্য আওয়াজ ও করবে, যদি শুধুমাত্র আওয়াজ পৌছানোটাই উদ্দেশ্য করে তার নামাযও হল না এবং যে আওয়াজে তাহরীমা বাঁধল তা-ও-হলনা। তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য তাকবীরে ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ এর মধ্যে যদি শুধুমাত্র ঘোষনা উদ্দেশ্য নামায ভঙ্গ হবে না। অবশ্য সুন্নত বর্জিত হওয়ায় মাকরূহ হবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ মুকাব্বিরের উচিৎ হবে সেস্থান থেকে তাকবীর বলা যেখান থেকে মানুষের প্রয়োজন হয়, প্রথম বা দ্বিতীয় সারিতে যেখানে ইমামের আওয়াজ অনায়াসে পৌছে যায় সেখান থেকে তাকবীর বলার কি উপকারিতা আছে? উপরন্ত ইমামের আওয়াজের সাথে সাথে তাকবীর বলাটা জরুরী, ইমামের বলার পর তাকবীর বললে লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়বে। যদি মুকাব্বির তাকবীরে মদ বা টেনে পড়ল তখন ইমাম তাকবীর বলার পর তার তাকবীর শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবেনা, বরং তাশাহুদ ইত্যাদি পড়া আরম্ভ করবে। এমনকি ইমাম তাকবীর বলার পর তার অপেক্ষায় তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার সমান পরিমাণ চুপ থাকে এরপর তাশাহুদ শুরু করল তখন ওয়াজিব বর্জন হল নামায পূনরায় পড়া ওয়াজিব।
মাসয়ালাঃ মুক্তাদি একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রকাশ্য ক্বেরাত পড়া প্রয়োজন নেই এতটুকু জরুরী যেন নিজে শুনতে পায়। -(দুর্রুল মোখতার)।
(১২) তাকবীরের পর দ্রুত হাত বেঁধে নেয়া পুরুষ নাভীর নীচে ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির জোড়ার উপর রাখবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি কব্জির কাছাকাছি রাখবে। অন্যান্য আঙ্গুল সমুহ বাম কব্জির পিটের উপর বিছায়ে রাখবে মহিলাও উভয় লিঙ্গ খুনছা বাম তালু সিনার একটু নীচে রেখে তার পিটের উপর ডান হাতের তালু রাখবে। -(গুনীয়া)।
কিছু লোক তাকবীরের পর হাত সোজা ঝুলিয়ে রাখে অতঃপর বাঁধে এরূপ করা উচিৎ নয়। বরং নাভীর নীচে রেখে বাঁধবে।
মাসয়ালাঃ বসে বা শুয়ে নামায পড়লে তখনও এভাবে হাত বাঁধবে। -(রদ্দুল মোখতার)।
মাসয়ালাঃ যে ক্বেয়ামে সুন্নতের উল্লেখ রয়েছে তাতে হাত বাঁধা সুন্নত যেমন ছানা ও দোয়া কুনত পড়ার সময়, জানাযায় তাকবীর তাহরীমার পর চার তাকবীর পর্যন্ত হাত বাঁধবে, রুকু হতে দাঁড়াবার সময় এবং দু'ঈদের তাকবীর সমুহে হাত বাঁধবে না। -(রদ্দুল মোখতার)।
(১৩) ছানা, (১৪) তাআওজ, (১৫) তাসমিয়া এবং (১৭) আমিন বলা এসবগুলো ধীরে বলা (১৮) প্রথমে ছানা অতঃপর তাআওজ পড়া. (১৯) অতঃপর তাসমীয়া, প্রত্যেকটির পর দ্বিতীয়টি দ্রুত পড়া বিরতি করবেনা, তাহরীমার পর দ্রুত ছানা পড়বে। ছানার মধ্যে জানাযা ব্যাতীত وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ পড়বে না। অন্যান্য জিকর বা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে সবগুলো নফলের জন্য।
মাসয়ালাঃ ইমাম প্রকাশ্য কেরাত শুরু করে দিলে মুক্তাদি ছানা পড়বেনা। যদি দুর বা বধির হওয়ার কারনে ইমামের আওয়াজ শুনতে না পায় যেমন জুমা, দু ঈদের পিছন সারির মুক্তাদি দুর হওয়ার কারনে কেরাত শুনতে পায়না। -(আলমগীরি)।
ইমাম ক্বেরাত ধীরে পড়লে তখন ছানা পড়ে নেবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ইমামকে রুকুতে বা প্রথম সিজদায় পেল, ছানা পড়ে পাওয়ার যদি প্রবল ধারনা থাকে পড়ে নেবে। বৈঠক বা দ্বিতীয় সিজদায়ে পেল, তখন ছানা ছাড়া নামাযে শামিল হওয়া উত্তম। -(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ নামাযের মধ্যে আউজুবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ ক্বেরাতের অধীন, মুক্তাদির উপর যেহেতু কেরাত নেই সুতরাং তাআওজ, তাসমীয়া ও তাদের জন্য সুন্নত নয়। হ্যাঁ তবে কোন মুক্তাদির যদি কোন রাকাত বাদ পড়ে যখন বাকী রাকাত পড়বে সে সময় তাআওজ, তাসমিয়া পড়ে নেবে।-(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ তাআওজ শুধু প্রথম রাকাতে এবং তাসমীয়া প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়া সুন্নত। ফাতেহার পর প্রথম সুরা শুরু করল তখন সুরা পাঠকালে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। ক্বেরাত স্পষ্ট হউক অস্পষ্ট হউক। কিন্তু বিসমিল্লাহ সর্বাবস্থায় আস্তে পড়বে। -(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ছানা, তাআওজ, তাসমীয়া পড়তে ভুলে গেলে, এবং ক্বেরাত শুরু করে দিল, তখন পুনরায় পড়বেনা। যেহেতু তার স্থান চলে গেল। এভাবে যদি ছানা পড়তে ভুলে গেল, তাআওজ শুরু করে দিল, তখন ছানা পুনরায় পড়বেনা। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ মাসবুক অর্থাৎ এক বা দু রাকাত পর যুক্ত মুসল্লী শুরুতে ছানা পড়তে পারেনি যখন অবশিষ্ট রাকাত পড়বে ছানা পড়ে নেবে। -(গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ ফরজ সমুহে নিয়্যতের পর তাকবীরের পূর্বে বা পরেঃ إِنِّي وَجَّهْتُ পড়বেনা। পড়লে তার শেষেঃ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ এর জায়গায় وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ বলবে। -(গুনীয়া)।

মাসয়ালাঃ দু'ঈদে, তাকবীর তাহরীমার পরই ছানা পড়বে, এবং ছানা পাঠের সময় হাত বেঁধে নেবে এবং আউজু বিল্লাহ চতুর্থ তাকবীরের পর বলবে। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ আমিন তিনভাবে পড়া যায় মাদ সহকারে অর্থাৎ আলিফকে টেনে, কসর অর্থাৎ আলিফকে দীর্ঘ না করা এমালা অর্থাৎ মাদের ছুরতে আলিফ কে 'য়া, এর দিকে ঝুকে পড়া।-(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ যদি মাদ সহকারে মীমকে তাশদীদ পড়ে বা 'য়া, কে বাদ দেয়, তখনও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু সুন্নতের বিপরীত। মাদ সহকারে মীমকে তাশদীদ পড়ল, এবং 'য়া,কে বিলুপ্ত করল বা কছর সহকারে "তাশদীদে 'য়া, বা হযফে য়া, হলে এ তিন অবস্থায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ইমামের আওয়াজ তার নিকট পৌছেনি কিন্তু তার পাশাপাশি অন্য মুক্তাদি আমিন বলল। আমিনের আওয়াজ শুনতে পেল, যদিও আস্তে হয় সেও আমিন বলবে উদ্দেশ্য এই যে ইমাম وَلَا الضَّالِّينَ বলা অবগত হলে আমিন বলা সুন্নত হয়ে যাবে ইমামের আওয়াজ শুনুক বা অন্য মুক্তাদি আমিন বলা দ্বারা অবগত হউক। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ অপ্রকাশ্য ক্বেরাত বিশিষ্ট নামাযে ইমাম আমিন বলেছে মুক্তাদি তার নিকটে ছিল ইমামের আওয়াজ শুনেছে সেও আমিন বলবে। -(দুর্রুল মোখতার)।

(২৪) রুকুর মধ্যে তিনবারঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ বলা।

(২৫) হাটুদ্বয়কে হাত দ্বারা ধরা।

(২৬) আঙ্গুল সমুহ ভালভাবে খোলা রাখা (এ হুকুম পুরুষের জন্য) মহিলাদের জন্য হাটুর উপর হাত রাখা সুন্নত।

(২৭) আঙ্গুল সমুহ ফাঁক রাখবেনা, বর্তমানে অধিকাংশ পুরুষ রুকুর মধ্যে নিছক হাত রেখে আঙ্গুল সমুহ বিলায়ে রাখে এটা সুন্নতের বিপরীত।

(২৯) রুকুর অবস্থায় হাটু সোজা রাখা অনেক লোক কামানের মত বাকা করে রাখে এটা মাকরূহ।

(৩০) রুকুর জন্য আল্লাহু আকবর বলা।

মাসয়ালাঃ যদি ঃ ظ বর্ণ উচ্চারণ করতে না পারে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ এর জায়গায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْكَرِيمِ বলবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ রুকুর জন্য ঝুকে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাওয়া উত্তম, এবং রুকু শেষে তাকবীর শেষ করবে। -(আলমগীরি)।

এ দুরত্ব পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ শব্দের লাম বৃদ্ধি করা আকবর শব্দের 'বা, কে বৃদ্ধি না করা, বা অন্য কোন অক্ষর বৃদ্ধি না করা।

মাসয়ালাঃ প্রত্যেক তাকবীরে আল্লাহু আকবরের 'রা, কে যযম পড়বে।-(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ সুরার শেষে যদি আল্লাহর প্রশংসা বাক্য থাকে তখন ক্বেরাতকে তাকবীরর সাথে মিলানো উত্তম। যেমনঃ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللّٰهُ أَكْبَرُ

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللّٰهُ أَكْبَرُ

আরবী হা;বর্ণকে যের সহকারে পড়বে। আয়াতের শেষে যদি এমন শব্দ থাকে যা

মহান আল্লাহ্র নামের সাথে মিলানো.অপছন্দনীয় তখন নামিলানো উত্তম অর্থাৎ কেরাত শেষে বিরতি করবে অতঃপর আল্লাহু আকবর বলবে যেমনঃ

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

এর মধ্যে ওয়াকফ;এবং ফচল;করবে অতঃপর রুকুর জন্য আল্লাহু আকবর বলবে, যদি উভয়টি না হয়, মিলানো না মিলানো সমান। -(রদ্দুল মোখতার, ফতোয়ায়ে রিজভীয়া)।

মাসয়ালাঃ কোন আগন্তুকের কারণে রুকু বা ক্বেরাতে বিলম্ব করা মাকরূহ তাহরীমি, যখন তার ব্যাপারে বিলম্বটা দৃশ্যমান হয় অন্যথায় বিলম্ব উত্তম। পূণ্যের জন্য সাহায্য আছে কিন্তু এতটুকু দীর্ঘ করবেনা যাতে মুক্তাদিরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে।-(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি এখনো তিনবার তাসবীহ্ বলেনি ইমাম রুকু ও সিজদা হতে মাথা উঠায়ে নিল তখন মুক্তাদির উপর ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব। মুক্তাদি যদি ইমামের পূর্বে মস্তক উঠায়ে নেয় তখন নামাযকে ফিরাইয়া পড়া ওয়াজিব। না ফিরালে মাকরূহে তাহরীমার হবে এবং গুনাহ্গার হবে।-(দুর্রুলমোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ রুকুর মধ্যে পিট কে ভালভাবে বিছাবে এমনকি পিটের উপর যদি পানির পেয়ালাও রাখা হয় তা যেন স্থির থাকে। -(ফতহুল কদীর)।

মাসয়ালাঃ রুকুর মধ্যে মস্তক অবনত করবেনা, উচুঁও করবেনা। বরং পিটের সমান রাখবে। -(হেদায়া)

হাদীসে আছে ঐ ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয় অর্থাৎ পরিপূর্ণনয়। যে রুকু সিজদায় পিট সোজা রাখল না।

এ হাদিছটি ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ, দারমী, প্রমুহ আবু মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, রুকু সিজদা পূর্ণ কর আল্লাহ্র শপথ আমি তোমাদেরকে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছি। এ হাদীসটি ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

মাসয়ালাঃ মহিলারা রুকুতে সামান্য ঝুকবে অর্থাৎ শুধু এতটুকু পরিমান যেন হাত হাটু পর্যন্ত পৌছে পিট সোজা করবেনা এবং হাটুর উপর জোর দেবেনা। বরং শুধুমাত্র হাত রাখবে। এবং হাতের আঙ্গুল সমূহ খোলা রাখবে এবং পদযুগল ঝুকায়ে রাখবে, পুরুষের ন্যায় ভালভাবে সোজা করবেনা।-(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ তিনবার তাসবীহ্ বলা সর্বনিম্ন সীমা। এর কম হলে সুন্নত আদায় হবেনা। তিনের অতিরিক্ত বলাটা উত্তম। তবে সমাপ্তি যেন বেজোড় সংখ্যায় হয় তবে ইমাম হলে এবং মুক্তাদি ভীত হলে অধিক বলবে না। -(ফতহুল কদীর)।

মাসয়ালাঃ রুকু হতে যখন উঠবে হাত বাঁধবে না ঝুলন্ত ছেড়ে দিবে।

হুলীয়া নামক কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে ইমামের জন্য তাসবীহ পাঁচবার বলা মুস্তাহাব। হাদীছে আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যখন কেউ রুকু করবে এবং তিনবার

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

বলবে, তার রুকু পূর্ণ হল। এবং এটা নিম্ন সীমা। যখন সিজদা করবে এবং তিনবার

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

বলবে তার সিজদা পূর্ণ হল এটা নিম্নসীমা, এ হাদীস ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, প্রমুখ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন।

মাসয়ালাঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এর

হা; অক্ষরে ছাকিন পড়বে, তার উপর হরকত প্রকাশ করবেনা, 'দাল, বর্ণকে বৃদ্ধি করবেনা। -(আলমগীরি)।

রুকু হতে উঠার সময় ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে

এবং মুক্তাদি اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে।

একাকী নামায আদায়কারী উভয়টি বলা সুন্নত।

মাসয়ালাঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

এর দ্বারাও সুন্নত আদায় হয়ে যায় কিন্তু ওয়া; বর্ণ হওয়া উত্তম।আল্লাহুম্মা হওয়া অধিক উত্তম এবং সব জায়গায় উভয় টি হওয়া উত্তম। -(দুর্রুল মোখতার)।

হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যখন ইমাম

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

বলবে তোমরা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

বলে,যার উক্তি ফেরেস্তার উক্তির সাদৃশ্য হবে তার পূর্বের সব গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। এ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

মাসয়ালাঃ একাকী নামায আদায়কারী

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

বলে রুকু হতে উঠবে এবং সোজা হয়ে দাড়াবার পর

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

বলবে।-(দুর্রুল মোখতার)।

সিজদার জন্য এবং সিজদা হতে উঠার জন্য আল্লাহ্ আকবর বলবে। সিজদায় কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলবে। সিজদায় হাত জমীনের উপর রাখবে।

মাসয়ালাঃ সিজদায় গেলে প্রথমে জমীনের উপর হাটু রাখবে অতঃপর হাত তারপর নাক, তারপর কপাল এবং যখন সিজদা থেকে উঠবে তার বিপরীত করবে অর্থাৎ প্রথমে কপাল উঠাবে, অতঃপর নাক, তারপর হাত, তারপর হাটু উঠাবে। -(আলমগীরি)।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদায় যেতেন প্রথমে হাটু অতঃপর হাত রাখতেন যখন উঠতেন প্রথমে হাত উঠাতেন অতঃপর হাটু। (ছুনানে আরাবা এবং দারেমী এ হাদীসটি ওয়ায়েল বিন হজর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন)।

মাসয়ালাঃ পুরুষের জন্য সিজদায় সুন্নত হলো এই যে, বাহু পা হতে পৃথক রাখবে, পেট উরু থেকে দুরে রাখবে কব্জি সমুহ জমীনের উপর বিছাবেনা কিন্তু যখন সারিতে থাকবে তখন বাহু পার্শ্ব থেকে পৃথক করবেনা। -(হেদায়া, আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)।

হাদীসে আছে- বোখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন সিজদায় উত্তমভাবে বসবে কুকুরের ন্যায় কব্জি বিছাবে না। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত বারআ বিন আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমরা সিজদা করবে হাতের তালু জমীনের উপর রাখবে এবং কনুই উপরে রাখবে। আবু দাউদ শরীফে উম্মুল মুমেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সিজদা করতেন, দুহাত, বগলের পার্শ্ব থেকে এতটুকু দুরে রাখতেন এমনকি হাতের নীচ দিয়ে যদি বকরীর বাচ্চা অতিক্রম করতে চায় অতিক্রম করতে পারতো। মুসলিম শরীফে ও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে বোখারী ও মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ বিন মালেক বুহাইনা থেকে অনুরূপ-বর্ণিত আছে যে, হাত কে এমনভাবে প্রশস্ত রাখতেন এমনকি বগল মোবারকের শুভ্রতা প্রকাশ পেতো।

মাসয়ালাঃ মহিলা কুঞ্চিত হয়ে সিজদা করবে অর্থাৎ বাহু পার্শ্ব সাথে মিলাবে এবং পেট উরু কে উরু গোড়ালী থেকে এবং গোড়ালী জমীনের সাথে লেপটায়ে সিজদা করবে। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ দুই হাটু একসাথে জমীনের উপর রাখবে কোন ওজরের কারনে একসাথে রাখতে না পারলে প্রথমে ডান হাটু অতঃপর বাম হাটু রাখবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ কোন কাপড় বিছায়ে তার উপর সিজদা করলে কোন ক্ষতি নেই পরিধেয় কাপড়ের কোনা বিছায়ে তার উপর সিজদা করল, বা হাতের উপর সিজদা করল, ওজর ছাড়া এরূপ করলে মাকরূহ হবে। যদি সেখানে কংকর থাকে বা জমীন প্রচন্ড গরম বা প্রচন্ড ঠান্ডা তখন মাকরূহ হবে না।

সেখানে যদি ধুল বালি থাকে পাগড়ীকে ময়লা থেকে রক্ষার জন্য পরিধেয় কাপড়ের উপর সিজদা করল কোন ক্ষতি নেই। চেহারাকে মাটি থেকে রক্ষার জন্য তা করলে মাকরূহ হবে। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ লম্বা জামা বা শেরওয়ানী বিছায়ে নামায পড়লে তার উপরিংশ পায়ের নিচে রাখবে এবং আঁচলের উপর সিজদা করবে। -(দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ সিজদায় এক পা আলগা করে রাখা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। -(দুর্রুল মোখতার)। দুই সিজদার মাঝখানে তাশাহুদের মত বসা, অর্থাৎ বাম পা বিছায়ে ডান পা খাড়া রাখবে। এবং হাত উরুর উপর রাখা সিজদায় আঙ্গুল সমুহ ক্বিবলার দিকে থাকা। হাতের আঙ্গুল সমুহ খোলা রাখা বাঞ্চনীয়।

মাসয়ালাঃ সিজদার মধ্যে দুই পায়ের দশ আঙ্গুলের পেট জমীনের উপর লাগা সুন্নত এবং প্রত্যেক পায়ের তিনটি করে আঙ্গুলের পেট জমীনের উপর লাগা ওয়াজিব। দশটি আঙ্গুল ক্বেবলার দিকে থাকা সুন্নত। -(ফতওয়ায়ে রিজভীয়া)।

মাসয়ালাঃ দুই সিজদা করার পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য হাতের পাঞ্জার শক্তি দিয়ে হাটুর উপর হাত রেখে উঠবে। এটা সুন্নত। তবে দুর্বলতা বা অন্য কোন ওজরের কারনে যদি জমীনের উপর হাত রেখে উঠে, তখনও কোন ক্ষতি নেই। -(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

এখন দ্বিতীয় রাকাতে ছানা ও তাআওজ পড়বেনা। দ্বিতীয় রাকাতের সিজদা সম্পন্ন করার পর বাম পা বিছায়ে দুই নিতম্ব তার উপর রেখে বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে এবং ডান পায়ের আঙ্গুল সমুহ ক্বিবলামুখী করবে। এটা পুরুষের জন্য। মহিলা উভয় পা ডান দিকে বের করে রাখবে এবং বাম নিতম্বের উপর বসবে। ডান হাত ডান উরুর উপর রাখবে, বাম হাত বাম উরুর উপর আঙ্গুল সমুহ আপন অবস্থায় ছেড়ে রাখবে, খোলাও রাখবেনা, প্রশস্ত বা বিছায়েও রাখবেনা। আঙ্গুলের প্রান্ত হাটুর কাছে থাকা, হাটু পাকড়াও করা উচিৎ নয়। শাহাদাতে ইশারা করা, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও আশপাশের গুলো বন্ধ রাখবে। কনিষ্ঠ আঙ্গুল ও মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানাবে এবং লা-অক্ষরে আঙ্গুল উপরে তুলবে। ইল্লা এর স্থানে রাখবে। অন্যসব আঙ্গুল সোজা রাখবে। হাদীসে আছে আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাঃ)

থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতেন তাশাহুদে যখন কলেমায়ে শাহাদত পর্যন্ত পৌঁছতেন তখন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, তবে আঙ্গুল নাড়া দিতেন না।

উপরন্তু তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাকী শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে দেখে বললেন তাওহীদ কর অর্থাৎ এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা কর।

মাসয়ালাঃ প্রথম বৈঠকের পর তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠার সময় জমীনের উপর হাত রেখে উঠবে না বরং হাঁটুর উপর জোর দিয়ে উঠবে। তবে ওজরের কারণে হলে কোন ক্ষতি নেই। -(গুনীয়া)।

মাসয়ালাঃ ফরজ নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া উত্তম। সুবহানাল্লাহ বলাও জায়েজ, তিন তাসবীহ পরিমাণ চুপ থাকলেও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু চুপ থাকা উচিৎ নয়। -(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দ্বিতীয় বৈঠকেও অনুরূপভাবে বসবে যেভাবে প্রথম বারে বসেছিল, এবং তাশাহুদও পড়বে। -(দুর্রুল মোখতার)

দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ পড়বে। উত্তম হলো ঐ দরুদ যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

দরুদ শরীফের ফাজায়েল ও মাসায়েল

মাসয়ালাঃ দরুদ শরীফে হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সৈয়দানা ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম এর পবিত্র নাম সমুহের সাথে সৈয়দানা বলা উত্তম। -(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

দরুদ শরীফের ফজীলত সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস রয়েছে বরকত স্বরূপ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হল।

হাদীস (১)ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পড়ল, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবে।

হাদীস (২)ঃ নাসায়ী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন। দশটি দরজা বুলন্দ করবেন।

হাদীস (৩)ঃ ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দরুদ পাঠ করল, আল্লাহ ও ফেরেস্তাগণ তার উপর সত্তরবার রহমত নাযিল করবেন।

হাদীস (৪)ঃ দুর্রুল মোখতারে ইসবেহানী সূত্রে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করল এবং তা কবুল হলে আল্লাহ তায়ালা তার আশি বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

হাদীস (৫)ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি সর্বার মধ্যে আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরুদ পড়েছে।

হাদীস (৬)ঃ নাসায়ী ও দারেমী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আল্লাহর কিছু মনোনীত ফেরেস্তা রয়েছে যারা জমীনে বিচরণ করে এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে থাকে।

হাদীসঃ (৭)ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধুলায় মলিন হউক, যার নিকট আমার নাম উল্লেখ হয় আর সে আমার উপর দরুদ পাঠ করেনা। আর ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধুলায় মলিন হউক যে ব্যক্তি রমজান মাস লাভ করেছে, কিন্তু তার ক্ষমা প্রার্থনার পূর্বে মাস চলে গেল এবং ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধুলায় মলিন হউক যে পিতা মাতা উভয়কে বা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে এবং তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাল না অর্থাৎ তাদের আনুগত্য ও সেবা করেনি যেন জান্নাতের যোগ্য হতে পারতো।

হাদীস (৮)ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ কৃপণ যার সামনে আমার নাম উল্লেখ হয় অথচ সে আমার উপর দরুদ পাঠ করেনা।

হাদীস (৯)ঃ নাসায়ী, দারেমী শরীফে হযরত আবু তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনয়ন করেন চেহারা মোবারকে উজ্জ্বলতা দীপ্তমান, এরশাদ করেন আমার কাছে জিব্রাইল আসল এবং বলল আপনার প্রভু বললেন আপনি কি সন্তুষ্ট নন। আপনার উম্মতের যে আপনার উপর দরুদ পাঠ করবে আমি তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবো, এবং আপনার উম্মতের যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে আমি তার উপর দশবার সালাম প্রেরণ করবো।

হাদীস (১০)ঃ তিরমিযী শরীফে আছে হযরত উবাই বিন ক্বাব (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমি একটি নির্ধারিত সময়ে আপনার উপর বেশী দরুদ পাঠ করে থাকি। এয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি কতটুক পরিমাণ সময় আপনার উপর দরুদ পাঠের জন্য নির্ধারণ করবো, হুযুর বললেন তুমি যা চাও, আরজ করলেন এক চতুর্থাংশ সময়, এরশাদ করেন তুমি যা চাও, আরো অধিক করলে তোমার জন্য মঙ্গলময় হবে, আমি আরজ করলাম দুই তৃতীয়াংশ এরশাদ করলেন তুমি যা চাও, আরো অধিক করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর আমি আরজ করলাম পূর্ণ সময়টাই আমি দরুদের জন্য নির্ধারণ করলাম। হুযুর এরশাদ করেন-এরূপ হলে আল্লাহ তোমার সকল কাজ পূর্ণ করবেন, এবং তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করবেন।

হাদীস (১১)ঃ ইমাম আহমদ রুয়াইপা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লামএরশাদ করেন যে দরুদ পাঠ করবে এবং বলবে

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনি তাকে আপনার নৈকট্য প্রাপ্ত আসনে সমাসীন করুন কিয়ামত দিবসে। তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে।

হাদীস (১২)ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আমিরুল মুমেনীন ফারুকে আজম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, দোয়া আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে উপরে উঠেনা যতক্ষণ না হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করা হয়।

মাসয়ালাঃ জীবনে একবার দরুদ শরীফ পড়া ফরজ। প্রত্যেক জিকরের জলসায় দরুদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। নাম মোবারক নিজে উচ্চারণ করুক বা অন্যজন থেকে শ্রবণ করুক। মজলিসে যদি শতবার উল্লেখ হয় প্রত্যেকবার দরুদ শরীফ পড়া উচিৎ। নাম মোবারক নিল, বা শুনল, সে সময় দরুদ পড়ল না অন্যসময়ে তা পড়ে নেবে। -(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ বিক্রেতা বিক্রির বস্তুর গুনাগুন ও শ্রেষ্ঠত্ব ক্রেতার নিকট গ্রহণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে দরুদ শরীফ পড়া বা সুবহানাল্লাহ্ বলা জায়েজ নেই এমনিভাবে কোন বড়লোককে দেখে দরুদ শরীফ পড়া এ নিয়্যতে যেন তার আগমন সম্পর্কে মানুষের নিকট সংবাদ পৌছে যায় এবং মানুষ তার সম্মানে উঠে দাঁড়াবে এবং জায়গা ছেড়ে দেবে তা জায়েজ নেই। -(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ যত পরিমাণ সম্ভব দরুদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব, এবং বিশেষভাবে নিম্নোক্ত স্থানে, জুমার দিবসে, জুমার রাত্রিতে, ও সকাল-সন্ধ্যায়, মসজিদে গমনকালে,

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়, রওজা মোবারকের যিয়ারতের সময়, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর, খুৎবায়, আজানের জবাবের পর, ইক্বামতের সময়, দোয়ার শুরু শেষ এবং মাঝখানে, , দোয়া কুনুতের পর, হজ্বের মধ্যে লাব্বায়কা, তালবীয়া সমাপ্তির পর, একত্র হলে, বা বিদায়কালে, অজু করার সময়, কোনকিছু ভুলে গেলে সে সময়, ওয়াজ করা, পড়া বা পড়ানোর সময়, বিশেষতঃ হাদীস শরীফ পাঠকালে প্রথমে এবং শেষে , প্রশ্ন বা ফতওয়া লিখার সময়, লেখনীর সময়, বিবাহের সময়, কর্জ্ব বা ধার দেওয়ার সময় , কোন বড় কাজ করার সময়, নাম মোবারক যখন লিখবে দরুদ শরীফ অবশ্যই লিখবে, অনেক আলেমদের সে মতে সে সময় দরুদ শরীফ লিখা ওয়াজিব। -(দুর্রুল মোখতার , রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ অধিকাংশ লোকদের মধ্যে বর্তমানে দরুদ শরীফের পরিবর্তে

صلعم - عم - صـ - عـ -

সংক্ষেপে লিখার প্রবণতা দেখা যায় এরূপ লিখা নাজায়েজ কঠোর হারাম এভাবে رضی اللہ تعالٰی عنہ এর স্থলে رضـ রহমাতুল্লাহি তা'আলা رحمة الله تعالى এর স্থলে رح লিখা এটাও উচিৎ নয়। যাদের নাম, মুহাম্মদ, আহমদ, আলী, হাসান, হোসাইন, ইত্যাদি তাদের নামে সংক্ষেপে صـ — عم লিখাও নিষিদ্ধ। এস্থানে তো ব্যক্তি উদ্দেশ্য তার দিকে দরুদের ইঙ্গিতের কি অর্থ? -(তাহতাবী)।

মাসয়ালাঃ শেষ বৈঠক ছাড়া ফরজ নামাযে দরুদ শরীফ পড়বেনা। নফল নামাযের প্রথম বৈঠককেও সুন্নত। -(দুর্রুল মোখতার)

দরুদের পর দোয়া পড়বে।

মাসয়ালাঃ দোয়া আরবী ভাষায় পড়বে। অনারবীয় ভাষায় পড়া মাকরূহ। -(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মুসলমান হলে নিজের জন্য পিতামাতা, ওস্তাদবৃন্দ, বিশ্বের সকল মুমীন নরনারীর জন্য প্রার্থনা করবে। নির্দ্দিষ্ট করে শুধু নিজের জন্য করবেনা। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ পিতামাতা ও শিক্ষকবৃন্দ যদি কাফের হয় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করা হারাম। মৃত্যুবরণ করলে তাদের মাগফেরাত কামনা করাটা ফকীহগণ কুফরী বলেছেন, তবে জীবিত থাকলে তাদের জন্য হেদায়ত নসীবের তৌফিক কামনা করে দোয়া করবে।-(দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ স্বভাবগত অসম্ভব ও শরয়ী অসম্ভবের বেলায় দোয়া হারাম। -(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালা যেসব দোয়া যা কুরআন হাদীসে আছে সেগুলোর সাথে দোয়া করবে কিন্তু কুরআনের দোয়া সমুহ কুরআনের নিয়্যতে এস্থানে পড়া জায়েজ নেই। বরঞ্চ ক্বেয়াম ছাড়া নামাযের অন্য কোন স্থানে কুরআন পড়ার অনুমতি নেই। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ নামাযে এমন সব দোয়া জায়েজ নেই যার মধ্যে এমন শব্দাবলী রয়েছে যা মানুষেরা পরস্পর বলে যেমনঃ اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِيْ (আলমীরি)।

মাসয়ালাঃ যে সব দোয়া স্মরণ আছে তা নামাযে পড়া সমীচীন, নামায ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে এমন দোয়া করা উত্তম যা হেফজে নেই বরং যা অন্তরে হাজির হয় তা করবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ নামাযের শেষে নামাযের জিকরের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

মুক্তাদির সকল পরিবর্তন ইমামের সাথে সাথে হওয়া। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ দুইবার বলা, প্রথমে ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে।

মাসয়ালাঃ ডান দিকে সালামে মুখ এতটুকু ফিরাবে যেন ডান মুখ মণ্ডল দেখা যায় এবং বাম দিকে বাম মুখমণ্ডল দেখা যায়। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলা মাকরূহ, এমনিভাবে শেষে وَبَرَكَاتُهٗ মিলানো সমিচীন নয়। -(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম উভয় সালাম উঁচু আওয়াজে বলা সুন্নত। কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় যেন উঁচু কম হয়। -(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ প্রথমে বাম দিকে সালাম ফিরাল কথাবার্তা না বলে দ্বিতীয়বার ডান দিকে ফিরাবে। অতঃপর বাম দিকে পুনরায় সালাম ফিরানোর প্রয়োজন নেই। যদি প্রথমে কোনদিকে মুখ না ফিরায় তখন দ্বিতীয়বারে বাম দিকে মুখ করবে, যদি বাম দিকে সালাম ফিরানো ভুলে যায় যতক্ষণ ক্বিবলার দিকে পিঠ না হয় বা কথাবার্তা বলে না থাকলে ফিরায়ে নেবে। -(দর্রুল মোখতার, আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ইমাম যখন সালাম ফিরাল মুক্তাদিও সালাম ফিরাবে যার কোন রাকাত বাদ পড়েনি অবশ্য যদি তার তাশাহুদ পূর্ণ পড়া না হয় এদিকে ইমাম সালাম ফিরায়ে দিল। সে ইমামের সাথে ফিরাবেনা। বরং তাশাহুদ পূর্ণ করে সালাম ফিরানো ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ ইমামের সালাম ফিরানো মুক্তাদি নামাযের বাহির হলনা। যতক্ষণ না সে নিজেও সালাম ফিরায়। এমনকি যদি সে ইমামের সালামের পর নিজের সালামের আগে অট্টহাসি দিল অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। -(দর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমামের আগে মুক্তাদির সালাম ফিরানো জায়েজ নেই। কিন্তু প্রয়োজন বশতঃ যেমন হাদছের আশঙ্কা হলে, বা সূর্য উদয় হওয়ার আশংকা হলে বা জুমা ও দুই ঈদের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে। (রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ প্রথমবার সালাম শব্দ মাত্রই ইমাম নামাযের বের হয়ে গেল, যদি আলাইকুম বলে নাই এসময় কেউ জামাতে শরীক হলে এক্তেদা শুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ সালামের পর যদি সাহু সিজদা করে তখন এক্তেদা শুদ্ধ হবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ইমাম ডান দিকের সালাম যেসব, মুক্তাদিদের নিয়্যত করবে যারা ডান দিকে আছে, বাম দিকের সালামে বামদিকের মুক্তাদির উদ্দেশ্য করবে। কিন্তু মহিলাদের নিয়্যত করবেনা যদিও জামাতে শরীক থাকে উপরন্তু উভয় সালামে কেরামান কাতেবীন এবং ঐ সব ফেরেস্তাদের নিয়্যত করবে যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা হেফাজতের জন্য নিযুক্ত করেছেন এবং নিয়্যতে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করবেনা। -(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মুক্তাদিও প্রত্যেকদিকের সালামে ঐ দিকের মুক্তাদিদের এবং ফেরেস্তাদের নিয়্যত করবে উপরন্ত যে দিকে ইমাম থাকে সেদিকের সালামে ইমামের নিয়্যতও করবে। ইমাম যদি মাঝামাঝি হয় উভয় সালামে ইমামেরও নিয়্যত করবে। একাকী নামায আদায়কারী হলে শুধু ফেরেস্তাদের নিয়্যত করবে। -(দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সালামের পর সুন্নত হল যে, ইমাম ডান ও বাম দিকে মুখ ফিরাবে, ডানদিকে উত্তম। মুক্তাদিদের দিকে মুখ করে বসতে পারবে যদি কোন মুক্তাদি তার সামনে নামাযে না থাকে যদিও সে কোন পিছনের সারিতে নামায পড়ছে। -(হলিয়া, যখীরা)।

মাসয়ালাঃ একাকী নামায আদায়কারী মুখ ফিরানো ছাড়া সেদিকে দোয়া প্রার্থনা করলে জায়েজ হবে। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ জোহর, মাগরীব, এশার পর সংক্ষিপ্ত দোয়া করে সুন্নত পড়বে দীর্ঘ সময় দোয়ায় লিপ্ত হবেনা। -(আলমগীরি)।

মাসয়ালাঃ ফজর, আছরের পর এখতিয়ারে রয়েছে জিকির ও দোয়া সমুহ যত ইচ্ছা পড়া যাবে। কিন্তু মুক্তাদি যদি ইমামের সাথে দোয়ায় লিপ্ত থাকে এবং মুনাজাত শেষের অপেক্ষায় রয়েছে তখন ইমাম দোয়া এতবেশি লম্বা করবে না, যাতে মুক্তাদি বিরক্ত হয়ে পড়ে। -(ফতোয়ায়ে রিজভীয়া)।

মাসয়ালাঃ সুন্নত সমুহ সেখানে পড়বেনা বরং ডানে বামে, সামনে, পিছনে সরে পড়বে। বা ঘরে গিয়ে পড়বে। -(আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ যে ফরজের পর সুন্নত রয়েছে সে সব নামায ফরজের পর কথা বলা সমীচীন নয়। যদিও সুন্নত আদায় হয় কিন্তু ছওয়াব কম পাবে।
সুন্নত আদায়ে বিলম্ব করাও মাকরূহ। এভাবে বড় বড় অজীফা ও দোয়া পড়ারও অনুমতি নেই। -(গুনীয়া, দুর্রুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ ফজরের নামাযের পর সূর্যের কিরণ উপরে উঠা পর্যন্ত সেখানে বসে থাকবে। -(আলমগীরি)।

নামাযের মুস্তাহাব সমূহঃ

☐ নামাযে ক্বেয়াম বা দাড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেয়া। ☐ রুকুর সময় পায়ের পিটের দিকে দেখা। সিজদাতে নাকের দিকে। ☐ বৈঠকে ক্রোড়ের দিকে ☐ প্রথম সালামে ডান লতির দিকে। ☐ দ্বিতয়ি সালামে বাম লতির দিকে ☐ হাই তুললে মুখ বন্ধ রাখবে, প্রতিরোধ না হলে ঠোঁট দাঁতের নীচে চাপবে এতেও প্রতিরোধ না হলে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢেকে নেবে। দাঁড়ানো অবস্থায় না হলে, বাম হাতের পিট দ্বারা বা উভয় হাতের আস্তিন বা জামার হাতা দ্বারা, তবে অপ্রয়োজনে হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখা মাকরূহ। ☐ হাই তোলা প্রতিরোধের পরীক্ষিত পদ্ধতি হলো এটা যে, অন্তরে একথা স্মরণ রাখবে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামদের হাই তোলা আসেনি। পুরুষগণ তাকবীর তাহরীমার সময় হাত কাপড়ের বাহিরে রাখবে। মহিলারা কাপড়ের ভিতর রাখা উত্তম। যতটুকু সম্ভব হাঁচি প্রতিরোধ করবে।
মুকাব্বির যখন حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ বলবে ইমামও মুক্তাদি সকলে দাঁড়িয়ে যাবে।

মুকাব্বির যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে তখন নামায শুরু করা যাবে। তবে ইকামত পূর্ণ হওয়া[illegible] শুরু করা উত্তম। দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পাঞ্জার মাঝখানে চার আঙ্গুল ফাঁক রাখা। মুক্তাদি ইমামের সাথে শুরু করা। জমীনের উপর সিজদা আড়াল বিহীন হওয়া।

নামাযের পর জিকির ও দোয়াঃ

নামাযের পর যেসব দীর্ঘ জিক্‌রের বর্ণনা হাদীসে উল্লেখ আছে তা জোহর, মাগরীব ও এশার সুন্নতের পর পড়বে। সুন্নতের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দোয়ায় তুষ্ট হওয়া সমীচীন। অন্যথায় সুন্নতের ছওয়াব কম হয়ে যাবে। -(রদ্দুল মোখতার)।

সতর্কতাঃ হাদীস শরীফে কোন দোয়ার ব্যাপারে যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার কমবেশী করবেনা। যে সব জিকিরে যে ফজিলত রয়েছে তা ঐ সংখ্যার সাথে নির্দিষ্ট। তার মধ্যে কমবেশী করার দৃষ্টান্ত এ রূপ যে, কোন তালা নির্দিষ্ট চাবি দ্বারা খোলা হয়। এখন যদি ঐ চাবির দাঁতের মধ্যে কমবেশী করা হয়, তা দ্বারা তালা খোলা যাবেনা। অবশ্য যদি গণনার মধ্যে সন্দেহ হয় বেশী পড়া যাবে। এটা অতিরিক্ত নয় বরং পূর্ণতা। -(রদ্দুল মোখতার)।
প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার এস্তেগফার পড়বে। আয়াতুল কুরসী ও তিনকুল একবার, একবার পড়বে। সোবহানাল্লাহ ৩৩ বার; আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার; আল্লাহু আকবর ৩৩ বার। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
একবার পড়বে। এ সব পড়লে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। আসর এবং ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়া দশবার দশবার পড়বে। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

প্রত্যেক নামাযের পর কপাল অর্থাৎ মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে পড়বে। بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّی الْهَمَّ وَالْحُزْنَ এবং হাত টেনে মাথা পর্যন্ত নেবে।
হাদীস (১) আবু দাউদ শরীফে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত জিকির করা বনি ঈসমাইল গোত্রের চারটি চারটি গোলাম আজাদ করা থেকে উত্তম।
হাদীস (২) তিরমিযী শরীফে উপরোক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, ফজরের নামায জামাত সহকারে পড়ার পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত জিকির করা, অতঃপর সূর্যের কিরণ উপরে উঠলে দু'রাকাত নামায পড়া। এরূপ যেমন হজ্ব ও ওমারা আদায় করল। পূর্ণরূপে, পূর্ণরূপে করল।

হাদীস (৩) বোখারী ও মুসলিম শরীফে মুগীরা বিন শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَهُوَ عَلٰى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا

مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হাদীস (৪)ঃ সহীহ্ মুসলীম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন্ যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর উচ্চ আওয়াজে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ

الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

হাদীস (৫)ঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, সম্পদশালী লোকেরা বড় বড় মর্যাদা ও চিরস্থায়ী কল্যাণ অর্জন করেছেন। এরশাদ করলেন কিভাবে? তারা বললেন, তারা যেভাবে নামায পড়ে আমারাও নামায পড়ে থাকি? তারা যেভাবে রোযা রাখে আমরাও রোযা রেখে থাকি? তারা সদকা করে আমরা তা করতে পারিনা, তারা গোলাম আজাদ করে আমরা তা পারিনা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, আমি কি তোমাদের এমন একটি কথা শিক্ষা দেবনা? যা দ্বারা যারা তোমাদের অগ্রগামী হয়েছেন তাদের উপর তোমরা মর্যাদা লাভ করবে, এবং পরবর্তীদের উপর অগ্রগামী হবে এবং কেউ তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না। কিন্তু যারা তোমাদের অনুরূপ করবে। লোকেরা বললেন হ্যাঁ এয়া রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলুনঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩বার ৩৩বার

سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়বে।

আবু সালেহ বলেন, অতঃপর দরিদ্র মুহাজিরগণ পুনরায় উপস্থিত হলেন, এবং আরজ করলেন, আমরা যা করছি আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা তা শুনেছে। তারাও

অনুরূপ করছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করেন। আবু সালেহ এর কথা শুধু মুসলিম শরীফে আছে।

হাদীস (৬)ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে কাব বিন আযরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, নামাযের পর এমন কিছু জিকির রয়েছে যা বললে নিস্ফল হয়না, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর সুবহানাল্লাহ ৩৩বার, আলহামদুলিল্লাহ্ ৩৩বার, আল্লাহ্ আকবর ৩৩বার।

হাদীস (৭)ঃ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ্ ৩৩বার, আলহামদুলিল্লাহ্ ৩৩বার, আল্লাহ্ আকবর ৩৩বার বলবে, সম্পুর্ণ ৯৯ বার হল নিম্নোক্ত কলেমা পড়ে একশতবার পূর্ণ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়।

হাদীস (৮)ঃ বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এই মিম্বরের কাঠের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুলকুরসী পাঠ করে তাকে বেহেস্তে প্রবেশ হতে মৃত্যুর অন্তরায় ব্যতীত আর কিছুতেই ঠেকায়না, আর যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণের সময় এ (আয়াতুল কুরসী) পাঠ করে আল্লাহ্ তার ঘর, তার প্রতিবেশীর ঘর এবং তার আশে পাশে যতগুলো ঘর আছে, শয়তান ও চোর থেকে নিরাপদ রাখেন।

হাদীস (৯)ঃ হযরত আবদুল রহমান ইবনে গানাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরীব ও ফজরের নামায শেষ করার পর পা প্রসারিত করার পূর্বেই (অর্থাৎ জায়নামায হতে উঠার পূর্বে) দশবার পাঠ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, এই বিশ্ব জগতের সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তারই জন্য যত প্রশংসা, তার হাতে সমস্ত কল্যাণ তিনি বাঁচান তিনি মারেন, তিনি সবকিছুর উপর অধিক ক্ষমতাবান।

তার জন্য প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে দশটি করে নেকী তার আমল নামায় লিখা হবে। তার দশটি গুনাহ্ মুছে দেয়া হবে। তার দশগুন মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।

এছাড়াও ইহা তাঁর জন্য প্রত্যেক খারাপ কর্ম হতে রক্ষা কবচ স্বরূপ হবে। অধিকন্তু শিরক ব্যতীত কোন গুনাহ্ই তাকে পাবেনা। (অর্থাৎ তাকে অধঃ পতনের দিকে নিতে পারবেনা) এবং কর্মফলের দিকদিয়ে সে উত্তম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে। তবে হ্যাঁ ঐ ব্যক্তি তাঁর চাইতে উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তাঁর চাইতেও উত্তম দোয়া পাঠ করবে (অথবা ভাল আমল করবে)। অপর এক বর্ণনায় ফজর এবং আসরের কথা উল্লেখ হয়েছে, হানফী মজহাব মতে এটাই অধিক সমীচীন।

হাদীসঃ-(১০)ঃ ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত মায়াজ বিন জাবল (রঃ) বলেন রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে এরশাদ করেন-হে মায়াজ! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি বললাম এয়া রাসুলাল্লাহ! আমিও হুযুর কে ভালবাসি। হুযুর এরশাদ করেন তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়া পাঠ করবে ছাড়বেনা

رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হাদীস (১১)ঃ তিরমিযী শরীফে আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওসাল্লাম নজদের দিকে একদল সৈন্যের অভিযান প্রেরণ করলেন, তারা প্রচুর গণীমতের মাল লাভ করল, এবং ফিরলও খুব তাড়াতাড়ি। আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি যিনি এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন নাই বললেন। আমরা এ অভিযানের তুলনায় দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী ও শ্রেষ্ঠ গনীমত লাভকারী কোন সৈন্যাভিযান দেখিনি এটা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একদল লোকের কথা বলব না, যাদের গনীমত লাভে এদের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যার্বতনেও এদের চাইতে দ্রুত। তারা সেই দল যারা ফজরের জামাতে উপস্থিত হয়েছেন অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকির করেছে তারাই হলো এদের চাইতে দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী দল এবং এদের চাইতে শ্রেষ্ঠ গনীমত লাভকারী দল।

কুরআন মজীদ পড়ার বর্ণনা ঃ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থ ঃ কুরআন হতে যা সহজ পড়।

আরো এরশাদ করেনঃ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থ ঃ যখন কোরআন পড়া হয়, মনযোগ সহকারে শ্রবন কর এবং চুপ থাক যেন তোমাদের উপর করুনা বর্ষিত হয়।

হাদীস (১-৩) বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে সূরা ফাতেহা পড়ল না তার নামায হল না, অর্থাৎ পরিপূর্ণ হল না। সহীহ্ মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত فَهِىَ خِدَاجٌ

অর্থাৎ ঐ নামায অসম্পূর্ণ, এই হুকুম ইমাম হউক বা একাকী আদায়কারী হউক উভয়ের জন্য। মুক্তাদি নিজে পড়বেনা বরং ইমামের কেরাত মুক্তাদির কেরাত এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মদ এবং তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখ জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন অনুরূপ হাদীস ইমাম আহমদ নিজ মসনদে বর্ণনা করেন ইমাম হালবী বলেন এহাদীস বোখারী ও মুসলিমের শর্তের আলোকে ছহীহ্ বা বিশুদ্ধ।

হাদীসঃ ৪-৬ (২)ঃ ইমাম আবু জাফর শরহে মায়ানিল আছার কিতাবে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর, যায়েদ বিন ছাবেত, জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত প্রশ্ন করা হলো, তাঁরা সকলে বললেন, ইমামের পিছনে কোন নামাযে ক্বেরাত পড়বে না।

হাদীসঃ (৭) মুয়াত্তা শরীফে ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ইমামের পিছনে ক্বেরাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বলেন, চুপ থাক, ইমামের ক্বেরাত তোমার জন্য যথেষ্ট।

হাদীসঃ (৮) সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এরশাদ করেনঃ আমি তার সাথে বন্ধুত্ব রাখি-যে ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়বে তার মুখে যে আগুন দেবে।

হাদীসঃ (৯) আমিরুল মু'মেনীন ফারুকে আজম (রাঃ) এরশাদ করেনঃ যে ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়বে যেন তার মুখে পাথর হয়।

হাদীসঃ (১০) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ যে ইমামের পিছনে ক্বেরাত পড়ল সে দ্বীনের ব্যাপারে ভুল করল।

ক্বেরাতের মাসায়েল

উপরে জানা গেল যে, ক্বেরাতে এতটুকু আওয়াজ দরকার যদি শ্রবণের অন্তরায় সৃষ্টিকারী হৈ চৈ না, হয় তখন নিজে যেন শুনতে পায়, এতটুকু আওয়াজ না হলে নামায হবে না।

এভাবে যে সব বিষয়ে বলা প্রয়োজন সবগুলোতে এতটুকু আওয়াজ প্রয়োজন, যেমন জন্তু জবেহের সময় বিছমিল্লাহ বলা, তালাক দেয়া, আজাদ করা, আয়াতে সিজদা পড়ার পর তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হওয়া।

মাসয়ালাঃ ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকাতে জুমা, দুই ঈদের নামায, তারাবীহ, বিতর ও রমজানের সকল নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়া ওয়াজিব এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে, এশার তৃতীয় ও চুতুর্থ, জোহর এবং আছরের সকল রাকাতে ক্বেরাত ধীরে পড়া ওয়াজিব। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ক্বেরাত বড় করে পড়া অর্থ হলো, অন্য লোকের অর্থাৎ যারা প্রথম কাতারে আছে তারা যেন শুনতে পায়। এটা নিম্নসীমা। উপরের কোন সীমা নির্ধারণ নেই এবং ধীরে পড়া অর্থ যেন নিজে শুনতে পায়।

মাসয়ালাঃ এভাবে পড়া,যেন শুধুমাত্র নিকটবর্তী দুই একজন শুনতে পায়, তা যেহের বা স্পষ্ট করে পড়া নয় বরং তা হবে ধীরে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ প্রয়োজনের অধিক বড় করে পড়া যা নিজের ও অন্যজনের কষ্টের কারণ হয় মাকরূহ। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ক্বেরাত ধীরে পড়ছে এমতাবস্থায় অন্যব্যক্তি নামাযে শামিল হয়ে গেল যা বাকী আছে তা বড় করে পড়বে। যা পড়া হয়েছে তা পুনরায় পড়বে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ বড় আয়াত একটি যেমন আয়াতুল কুরসী বা আয়াতে মাদায়েনা। যদি এক রাকাতে কিছু অংশ পড়ল, দ্বিতীয় রাকাতে কিছু পড়ল, জায়েয হবে। প্রত্যেক রাকাতে যা পড়েছে তা যদি তিন আয়াত পরিমাণ হয়। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ দিবসের নফল সমূহে ক্বেরাত ধীরে পড়া ওয়াজিব। রাত্রির নফলে এখ্তিয়ার রয়েছে একা পড়ক বা জামাতে পড়ুক ক্বেরাত বড় করে পড়া ওয়াজিব। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ প্রকাশ্য ক্বেরাত বিশিষ্ট নামাযে একা নামায আদায়কারীর এখতিয়ার রয়েছে, সময়মতো পড়লে বড় করে পড়া উত্তম, ক্বাযা পড়লে ক্বেরাত ধীরে পড়া ওয়াজিব। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ প্রকাশ্য ক্বেরাত বিশিষ্ট নামাযের ক্বাযা যদিও দিনে হয় ইমামের উপর বড় করে পড়া ওয়াজিব। ধীরে ক্বেরাত বিশিষ্ট নামাযের ক্বাযায় ধীরে পড়া ওয়াজিব। যদিও রাত্রি আদায় করা হয়। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ চার রাকাতের ফরজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ভুলে গেলে পরবর্তী রাকাতে পড়া ওয়াজিব। এক রাকাতে ভুলে গেলে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে পড়বে। মাগরিবের প্রথম দুই রাকাতে ভুলে গেলে, তৃতীয় রাকাতে পড়বে, এক রাকাতের ক্বেরাত চলে যাবে। এসব অবস্থায় সূরা ফাতেহা সহকারে পড়বে। প্রকাশ্য ক্বেরাত বিশিষ্ট নামায হলে ফাতেহা ও সূরা স্পষ্ট করে পড়বে। অন্যথায় ধীরে পড়বে এবং সব অবস্থায় সাহু সিজদা করবে এবং ইচ্ছাকৃত ছাড়লে পুনরায় পড়বে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সূরা মিলানো ভুলে গিয়ে রুকুতে স্মরণ হল, তখন দাড়িয়ে যাবে এবং সূরা মিলাবে অতঃপর রুকু করবে এবং শেষে সহু সিজদা করবে। যদি দ্বিতীয়বার রুকু না করে নামায হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ফরজের প্রথম রাকাত সমূহে ফাতেহা ভুলে গেলে পরবর্তী রাকাতে তার ক্বাযা নেই। রুকুর পূর্বে স্মরণ হলে ফাতেহা পড়ে সূরা পড়বে এবং যদি রুকুতে স্মরণ হয় তখন দাড়ানোর দিকে ফিরে যাবে এবং ফাতেহা ও সূরা পড়ে নেবে। অতঃপর রুকু করবে। যদি দ্বিতীয়বার রুকু না করে নামায হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এক আয়াত মুখস্থ করা প্রত্যেক শরীয়তের বিধান আরোপযোগ্য মুসলমানের উপর ফরজে আইন এবং পূর্ণ কুরআন শরীফ হেফজ করা ফরজে কেফায়া এবং সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছোট সূরা বা অনুরূপ তিনটি ছোট আয়াত বা একটি বড় আয়াত হেফজ করা ওয়াজিব আইন। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ প্রয়োজন পরিমাণ ফিকাহ এর মাসয়ালা জানা ফরজে আইন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা করা, পূর্ণ কুরআন হেফজ করা হতে উত্তম। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সফর যদি শান্তিময় ও নিরাপদ হয় সুন্নত হলো, ফজর ও জোহরে সূরা বুরুজ বা অনুরূপ সূরা পড়বে এবং আছর ও এশায় তার চেয়ে ছোট। মাগরিবে (ক্বেছারে মুফাচ্ছাল) এর ছোট সূরা, তাড়াতাড়ি হলে প্রত্যেক নামাযে যা ইচ্ছা পড়বে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ অস্বাভাবিক অবস্থায় যেমন সময় চলে যাচ্ছে বা শত্রু অথবা চোরের আশঙ্কা হলে তখন অবস্থা অনুসারে পড়বে। সফরে হউক বা অবস্থানে হউক এমনকি

যদি ওয়াজিব অনুসারে করা না যায় তখন অবস্থা অনুসারে করার অনুমতি রয়েছে। যেমন ফজরের সময় এত বেশী সংকীর্ণ যে মাত্র এক আয়াত পড়া যাবে। তখন তাই করবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)। কিন্তু সূর্য উপরে উঠার পর ঐ নামায পুনরায় পড়বে।

মাসয়ালাঃ ফজরের সুন্নত আদায়কালে জামাত চলে যাওয়ার আশঙ্কা হলে শুধুমাত্র ওয়াজিবের উপর যথেষ্ট করবে ছানা ও তাআউজ ছেড়ে দেবে এবং রুকু ও সিজদায় একবার একবার তাসবীহ পাঠ দ্বারা যথেষ্ট করবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ হাজর বা এক জায়গায় অবস্থানকারী হলে, যখন সময় সংকীর্ণ না হয়, তখন সুন্নত হলো ফজর ও জোহরে দীর্ঘ সূরা পড়া আছর ও এশায় মধ্যম সূরা পড়া মাগরিবে (ক্বেছারে মুফাচ্ছাল) বা সংক্ষিপ্ত সূরা পড়া। এসব অবস্থায় ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী উভয়ের জন্য একই হুকুম। (দুর্রুল মোখতার)

ফায়েদাঃ সূরা হুজরাত থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআনের সূরাগুলোকে মুফাচ্ছাল বা দীর্ঘ সূরা বলে। এতে তিন অংশ রয়েছে, সূরা হুজরাত থেকে বুরুজ পর্যন্ত বলে طوال مفصل সূরা বুরুজ থেকে لَمْ يَكُنْ পর্যন্ত اوسط مفصل এবং لَمْ يَكُنْ থেকে শেষ পর্যন্ত قصار مفصل

মাসয়ালাঃ আছর নামায মাকরূহ সময়ে আদায় করলে সঠিক হলো যে ক্বেরাতে মসনুনা পূর্ণ করবে। যখন সময় সংকীর্ণ না হয়। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ বিতরে নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ তৃতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পড়েছেন।

সুতরাং কোন সময় বরকত স্বরূপ প্রথম রাকাতে সূরা আ'লার স্থানে إِنَّا أَنْزَلْنَا পড়বে

মাসয়ালাঃ ক্বেরাতে মাসনুনার উপর অতিরিক্ত করবে না। মুক্তাদিদের উপর কষ্টকর না হলে সামান্য অতিরিক্ত করলে ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ফরজ সমূহে ধীরে ধীরে ক্বেরাত পড়বে। তারাবীহ নামাযে মধ্যম পন্থায়, রাত্রির নফল নামাযে তাড়াতাড়ি পড়ার অনুমতি রয়েছে কিন্তু এমনভাবে পড়বে যেন বুঝে আসে। অর্থাৎ কমপক্ষে ক্বারীগণ মাদ বা টেনে পড়ার যে স্থান নির্ণয় করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করা। অন্যথায় তা হারাম হবে। যেহেতু তারতীল অনুসারে কুরআন পড়ার নির্দেশ রয়েছে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)। বর্তমানে অধিকাংশ হাফেজগণ এভাবে পড়ে থাকে মাদ আদায় করা দূরে থাক,

يَعْلَمُوْنَ - تَعْلَمُوْنَ

ছাড়া কোন শব্দই বুঝে আসে না। না হরফ বিশুদ্ধভাবে আদায় হচ্ছে বরং শব্দের পর শব্দ যত দ্রুত পড়তে পারে তা গর্বের কারণ হয় যে, অমুক এই পরিমাণ দ্রুত পড়তে পারে। অথচ এভাবে কুরআন শরীফ পড়া কঠোর হারাম।

মাসয়ালাঃ সাত ক্বেরাত পড়া জায়েয তবে যে ক্বেরাত জনসাধারণের মনঃপূত নয় তা না পড়া উত্তম। এটা তাদের দ্বীনের রক্ষাকবচ। যেমন আমাদের এখানে ইমাম আছেম রেওয়ায়াতে হাফস বেশী প্রচলন। সুতরাং এটাই পড়বে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ফজরের প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘ করা সুন্নত, তার পরিমাণ এতটুকু যে প্রথমে দুই তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় রাকাতে এক তৃতীয়াংশ। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ যদি ফজরের প্রথম রাকাতে অসংগত দীর্ঘ করেছে যেমন প্রথম রাকাতে চল্লিশ আয়াত, দ্বিতীয় রাকাতে তিন আয়াত তখনও ক্ষতি নেই কিন্তু উত্তম নয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ উত্তম হলো অন্যান্য নামাযেও প্রথম রাকাতের ক্বেরাত দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘ করবে। এটা জুমা ও দু'ঈদেরও হুকুম। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ সুন্নত ও নফলে উভয় রাকাতে সমান সমান সূরা পড়বে। (মুনিয়া)

মাসয়ালাঃ দ্বিতীয় রাকাতের ক্বেরাত প্রথম রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘ করা মাকরূহ। যদি সুস্পষ্ট পার্থক্য জানা যায়। এর পরিমাণ হল এই যে, উভয় সূরার আয়াত যদি সমান হয় তখন তিন আয়াতের বেশী মাকরূহ। ছোট বড় হলে আয়াতের সংখ্যার বিবেচনা করা হবে না। বরং হরফ ও কলেমার বিবেচ্য হবে। কলেমা ও হরফের মধ্যে ব্যবধান বেশী হলে মাকরূহ। যদিও আয়াত গণনায় সমান হয় যেমন প্রথমে أَلَمْ نَشْرَحْ পড়ল। দ্বিতীয়বার لَمْ يَكُنْ. তখন মাকরূহ হবে। যদিও উভয়টিতে আট আট আয়াত হয়। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ জুমা এবং দুই ঈদের প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ দ্বিতীয় রাকাতে هَلْ أَتٰكَ সুন্নত। নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রমাণিত, ইহা উপরোক্ত বিধান বহির্ভূত। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযের জন্য সূরা নির্দিষ্ট করে নেয়া নামাযে সর্বদা একই সূরা পড়া মাকরূহ। কিন্তু যেসব সূরার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে তা কোন কোন সময় পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু স্থায়ীভাবে পড়বে না। কেউ যেন ওয়াজিব ধারণা না করে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ফরজ নামাযে আয়াতে তারগীব (যে আয়াতে ছওয়াবের বর্ণনা রয়েছে) ও তারহীব (যার মধ্যে শাস্তির উল্লেখ আছে) পড়লে মুক্তাদিও ইমাম তা পাওয়ার এবং তা থেকে মুক্তির দোয়া করবে না। জামাত সহকারে নফলেরও একই হুকুম। হ্যাঁ, নফল একাকী পড়লে দোয়া করা যাবে। (দুর্রুল মোখাতর, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দুই রাকাতে একই সূরা বারবার পড়া মাকরূহে তানযীহি। যদি কোন বাধ্যবাধকতা না থাকে। বাধ্যবাধকতা থাকলে মোটেই মাকরূহ হবে না। যেমন প্রথম রাকাতে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পূর্ণ পড়েছে তখন দ্বিতীয় রাকাতেও একই সূরা পড়বে বা দ্বিতীয় রাকাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রথম সূরাটিই শুরু করে দিল বা অন্য সূরা স্বরণ হচ্ছে না তখন প্রথমটিই পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নফলের উভয় রাকাতে একই সূরা বারবার পড়া বা এক রাকাতে একই সূরা বারংবার পড়া মাকরূহ বিহীন জায়েয। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ এক রাকাতে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করল, তখন দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহার পর হতে শুরু করবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ফরজ নামাযে প্রথম রাকাতে কয়েকটি আয়াত পড়ল দ্বিতীয় রাকাতে অন্য জায়গা হতে কয়েকটি আয়াত পড়ল যদিও একই সুরার অন্তর্ভুক্ত মাঝখানে যদি দুই বা ততোধিক আয়াত বাদ পড়ে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অপ্রয়োজনে এরূপ করবে না। আর যদি একই রাকাতে কয়েকটি আয়াত পড়ল অতঃপর কিছু ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গা থেকে পড়া আরম্ভ করল মাকরূহ হবে। ভুলবশতঃ এরূপ হলে পুনরায় পড়বে এবং বাদ পড়া আয়াত পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ প্রথম রাকাতে কোন সূরার শেষে পড়ল এবং দ্বিতীয় রাকাতে কোন ছোট সূরা যেমন প্রথমে اَفَحَسِبْتُمْ এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়লে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ফরজের এক রাকাতে দুটি সূরা পড়বে না একাকী পড়লে ক্ষতিও নেই শর্ত হলো উভয় সুরার মধ্যে যেন কোন ব্যবধান না হয়। মাঝখানে যদি এক বা কয়েকটি সূরা ছেড়ে দেয় তা মাকরূহ। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ প্রথম রাকাতে কোন সূরা পড়ল দ্বিতীয় রাকাতে অন্য একটি ছোট সূরার মাঝখান থেকে বাদ রেখে পড়ল মাকরূহ হবে। মাঝখানের সূরাটি যদি বড় হয় যা পড়লে প্রথম ক্বেরাত থেকে দ্বিতীয় ক্বেরাত লম্বা হয়ে যাবে তখন ক্ষতি নেই। যেমন وَالتِّيْنِ এরপর اِنَّا اَنْزَلْنَا পড়লে কোন ক্ষতি নেই। এবং اِذَا جَاءَ এরপর قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়া সমীচীন নয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কুরআন শরীফ উল্টা পড়া যেমন দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম দিকের উপরের সূরা পড়ল এটা মাকরূহে তাহরীমি। যেমন, প্রথমে قُلْ يَاۤ اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ল, দ্বিতীয় রাকাতে اَلَمْ تَرَ كَيْفَ পড়ল।(দুর্রুল মোখতার)। এর জন্য কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) এরশাদ করেন, যে উল্টো কুরআন পড়বে তার কি ভয় নেই যে, আল্লাহ অন্তর উল্টে দিবেন। ভুলক্রমে হলে গুনাহও হবে না। সাহু সিজদাও দিতে হবে না।

মাসয়ালাঃ ছোট ছেলেদের সহজের জন্য আমপারা তারতীবের বিপরীত কুরআন শরীফ পড়া জায়েয। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ভুলক্রমে প্রথম রাকাতে উপরের সূরা শুরু করে দিল বা একটি ছোট সূরা ব্যবধান হয়ে গেল অতঃপর স্বরণ হল তখন যেটা দিয়ে শুরু করেছে তা পূর্ণ করবে যদিও এখন একটি হরফ পড়েছে মাত্র। যেমন প্রথমে قُلْ يَاۤ اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়েছে এবং দ্বিতীয় রাকাতে اَلَمْ تَرَ كَيْفَ বা تَبَّتْ يَدَاۤ শুরু করল এখন স্বরণ হলে তা শেষ করবে তা ছেড়ে দিয়ে اِذَا جَاءَ পড়ার অনুমতি নেই। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ একটি বড় আয়াত অপেক্ষা ছোট তিনটি আয়াত পড়া উত্তম। সূরার অংশ বা পূর্ণ সূরার মধ্যে যেটার মধ্যে আয়াত বেশী তা পড়া উত্তম। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ রুকুর তাকবীর বলল, এখনো রুকুতে যায়নি, অর্থাৎ হাটু পর্যন্ত হাত পৌছা পর্যন্ত ঝুঁকে নাই আরো বেশী পড়ার ইচ্ছা করলে পড়া যাবে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

নামাযের বাহিরে ক্বেরাতের মাসায়েলঃ

মাসয়ালাঃ কুরআন মজীদ দেখে পড়া মুখস্থ পড়া থেকে উত্তম। কুরআন পড়া, দেখা, হাত দ্বারা তা স্পর্শ করা সবগুলো ইবাদত।

মাসয়ালাঃ মুস্তাহাব হলো অজু সহকারে ক্বিবলামুখী হয়ে উত্তম কাপড় পরিধান করে তিলাওয়াত করবে। তিলাওয়াতের প্রারম্ভে আউজুবিল্লাহ পড়া ওয়াজিব। সূরার শুরুতে বিছমিল্লাহ পড়া সুন্নত। মুস্তাহাব নয়। যে আয়াত পড়তে ইচ্ছুক তার প্রারম্ভের সর্বনাম যদি আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হয় যেমন:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

তথা এ সূরাতে আউজুবিল্লাহ্‌র পর বিছমিল্লাহ্ পড়া (মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদা) মাঝখানে দুনিয়াবী কোন কাজ করলে আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ পুনরায় পড়বে এবং দ্বীনি কাজ করলে যেমন সালাম বা আজানের উত্তর দিল বা সুবহানাল্লাহ এবং কলেমা তৈয়্যব ইত্যাদি জিকর পড়লে পুনরায় আউজুবিল্লাহ পড়া দায়িত্ব নয়। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ সূরা বারাআত থেকে তিলাওয়াত শুরু করলে আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ বলবে আর যে এর আগে হতে তিলাওয়াত আরম্ভ করেছে এবং সূরা বারাআত পর্যন্ত এসে গেল তখন তাসমীয়া পড়ার প্রয়োজন নেই। (গুনীয়া) এবং তার শুরুতে নতুনভাবে আউজুবিল্লাহ পড়ার যে প্রথা বর্তমান হুফেজগণ বের করেছে তা ভিত্তিহীন এবং একথাও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, সূরা তাওবা প্রথমবারে পড়লেও বিছমিল্লাহ পড়বে না এটাও নিছক ভুল কথা।

মাসয়ালাঃ গরমকালে সকালে কুরআন মজীদ খতম করা উত্তম। শীতকালে রাতের প্রথম ভাগে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে কুরআন খতম করল, সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশ্‌তারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যে রাত্রির শুরুতে খতম করল, সকাল পর্যন্ত ফেরেশ্‌তারা তার জন্য এস্তেগফার করবে। এ হাদীসটি দারেমী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। গ্রীষ্মকালে দিন যেহেতু বড় হয় সেহেতু সকালে খতম করলে ফেরেশ্‌তার এস্তেগফার বেশী হবে এবং শীতকালে রাত্রি যেহেতু বড় হয় রাত্রির প্রথমভাগে খতম করলে এস্তেগফার বেশী হবে। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা খেলাফে আওলা। নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তিন রাত্রির কম সময়ে কুরআন খতম করল সে বুঝল না। এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেন।

মাসয়ালাঃ খতমের পর তিনবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়া উত্তম। যদিও তারাবীহ নামাযে হয়। অবশ্য যদি ফরজ নামাযে খতম করলে একবারের বেশী পড়বে না। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ শয়ন অবস্থায় কুরআন পাঠে ক্ষতি নেই। পা যদি কুঞ্চিত থাকে এবং মুখ খোলা থাকে এভাবে চলা এবং কাজ করা অবস্থায়ও তিলাওয়াত করা জায়েয। যদি অন্তর অমনোযোগী না হয়। অন্যথায় মাকরূহ হবে। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ গোসলখানা এবং নাপাক স্থানে কুরআন মজীদ পড়া জায়েয নেই। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ উচ্চস্বরে কুরআন-পাঠ করা হলে উপস্থিত লোকদের উপর শ্রবণ করা ফরজ। যদি সমাবেশ শ্রবণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। অন্যথায় একজনের শ্রবণ যথেষ্ট যদিও অন্যরা নিজ কাজে থাকে। (গুনীয়া, ফতোয়া রিজভীয়া)

মাসয়ালাঃ জলসার সকলে উচ্চস্বরে পড়া হারাম, অধিকাংশ লোক প্রতিযোগিতামূলক উচ্চস্বরে পড়ে, এটা হারাম। কয়েক ব্যক্তি পাঠক হলে ধীরে পড়া সমীচীন। (দুর্রুল মোখাতর)

মাসয়ালাঃ বাজারে এবং যেসব স্থানে লোকেরা কাজে নিয়োজিত সেখানে উচ্চস্বরে পড়া নাজায়েয, মানুষেরা যদি না শুনে, পাঠকদের উপর গুনাহ হবে। লোকেরা কাজে নিযুক্তির পূর্বে পড়া শুরু করলে এবং স্থানটি যদি কাজের জন্য নির্ধারিত না হয় এবং তারা যদি সেখানে পড়া শুরু করে কিন্তু লোকেরা না শুনলে গুনাহ মানুষের উপর হবে। কাজ শুরু করার পর যদি পড়া শুরু করে গুনাহ পাঠকদের উপর হবে। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ যেখানে কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীন চর্চা করছে বা শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন চর্চা বা অধ্যায়ন করছে সেখানেও উচ্চস্বরে পড়া নিষিদ্ধ। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ কুরআন মজীদ শ্রবণ করা ও তিলাওয়াত করা নফল পড়া হতে উত্তম (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ তিলাওয়াতের সময় কোন সম্মানিত ইসলামী শাসক বা আলেমেদ্বীন, পীর, বা ওস্তাদ বা পিতা সামনে এলে তিলাওয়াতকারী তাঁদের সম্মানার্থে দাড়াতে পারবে। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ মহিলা মহিলাদের নিকট থেকে কুরআন পড়া গায়রে মুহ্‌রিম অন্ধের নিকট পড়া থেকে উত্তম। যদিও সে তাকে না দেখে কিন্তু আওয়াজ তো শুনছে। মহিলার আওয়াজও সতরের অন্তর্ভূক্ত। গায়রে মুহ্‌রিমকে বিনা প্রয়োজনে শুনানো জায়েয নেই। (গুনীয়া)

ক্বেরাতে ভুল হওয়ার বর্ণনা

মাসয়ালাঃ কুরআন পড়ার পর ভুলে যাওয়া গুনাহ। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার উম্মতের ছওয়াব আমার নিকট পেশ করা হয়েছে, এমনকি লোকেরা মসজিদ থেকে যে ধূলি-কণা বের করে তাও এবং আমার উম্মতের গুনাহও আমার নিকট পেশ করা হয়। মানুষ সূরা বা আয়াত শিক্ষার পর তা ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় কোন গুনাহ দেখা যায়নি। এ হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে ভুলে গেল কিয়ামতের দিবসে সে অলস হয়ে আসবে। এ হাদীসটি আবু দাউদ, দারেমী, নাসাঈ বর্ণনা করেন যে, এটা কুরআনে মজীদে আছে অন্ধ হয়ে উঠবে।

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি ভুলপড়ে শ্রবণকারীর উপর বলে দেয়া ওয়াজিব শর্ত হলো বলার দ্বারা যেন হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। (গুনীয়া)। এভাবে কারো কুরআন শরীফ নিজের নিকট ধার থাকলে এবং ঐ কপির লেখনীতে ভুল পরিদৃষ্ট হলে ঠিক করে দেয়া ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ কুরআন মজীদ একেবারে চিকন কলম দ্বারা লিখে ছোট করে ফেলা যেমন বর্তমানে তাবিজী কুরআন ছাপানো হয়, তা মাকরূহ। এতে তুচ্ছতা অনুমিত হয়। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ উচ্চস্বরে কুরআন পড়া উত্তম। যদি কোন নামাযী বা রুগ্নব্যক্তি বা নিদ্রিত ব্যক্তির কষ্ট না পৌছে। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ দেওয়ালে এবং মিহরাবে কুরআন মজীদ লিখা সমীচীন নয়। কুরআন শরীফ ঢেকে রাখাতে ক্ষতি নেই (গুনীয়া)। বরং তাজীমের নিয়্যতে মুস্তাহাব।

ক্বেরাত ভুল হওয়ার বর্ণনাঃ

এই অধ্যায়ের মৌলিক নীতিমালা-হলো এটা যে, যদি এমন ভুল হয় যদ্বারা অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে অন্যথায় নয়।

মাসয়ালাঃ এরাব সম্পর্কিত ভুলভ্রান্তি যদি এরূপ হয় যদ্দারা অর্থের পরিবর্তন ঘটেনা তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না। যেমন لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ نَعْبُدُ পড়া। যদি পরিবর্তন হয় যা বিশ্বাসগত ও ইচ্ছকৃত পড়লে কুফরী হবে তখন উত্তম হলো নামায পুনরায় পড়া। যেমন عَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ

এর মধ্যে মীমকে যবর এবং বা কে পেশ পড়ল, এবং

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

এর মধ্যে "আল্লাহ্"কে পেশ এবং اَلْعُلَمَاءُ কে যবর পড়ল এবং فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ এর মধ্যে যালকে যের পড়ল।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে কাফকে যের পড়ল এবং

اَلْمُصَوِّرُ এর ওয়াওকে যবর পড়ল। (রদ্দুল মোখতার,আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ তাশদীদকে তাখফীফ বা লুঘু করে পড়ল। যেমন

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যে তাশদীদ পড়ল না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর মধ্যে 'বা' এর উপর তাশদীদ পড়ল না,

قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا এর মধ্যে 'তা' এর উপর তাশদীদ পড়ল না নামায হয়ে যাবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মুখাফফাফ কে মুশাদ্দাদ পড়ল যেমন,

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ

এর মধ্যে যাল তাশদীদ সহকারে পড়ল, বা ঈদগাম বর্জন

করল যেমন

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

এর মধ্যে লাম প্রকাশ করল, নামায হয়ে যাবে (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ হরফ বৃদ্ধির দ্বারা যদি অর্থের যদি বিকৃতি না ঘটে নামায ফাসেদ হবেনা যেমন وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ এর মধ্যে 'রা' এর পর যা 'বৃদ্ধি করল,

هُمُ الَّذِيْنَ

এর মধ্যে মীমকে যযম করে আলিফ প্রকাশ করল আর যদি অর্থের বিকৃতি হয় যেমন مَثَانِيْ কে زَرَابِيْبُ কে زَرَابِيّ مَثَانِيْنَ পড়ল নামায ফছেদ হয়ে যাবে (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কোন হরফকে অন্য কলেমার সাথে মিলায়ে দিলে নামায ফাসেদ হবেনা যেমন اِيَّاكَ نَعْبُدُ এভাবে কলেমার কোন হরফ ছিন্ন হলেও নামায ভঙ্গ হবেনা, এভাবে ওয়াকফ বা আরম্ভ অবস্থানে হলেও ভঙ্গ হবেনা যদিও ওয়াকফ লাযেম হয়, যেমন

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এর মধ্যে ওয়াকফ করল অতঃপর اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

বা اَصْحٰبُ النَّارِ পড়ে ওয়াকফ করলনা, এবং اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ পড়ল এবং

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর উপর ওয়াকফ করে اِلَّا هُوَ পড়ল

উপরোক্ত সব অবস্থায় নামায হয়ে যাবে কিন্তু এরূপ করা বড় মন্দ কাজ (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কোন কলেমা বৃদ্ধি করল কলেমা কুরআনে থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় অর্থের বিকৃতি হউক বা না হউক যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, যেমন

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ

এবং اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَّجَمَالًا যদি অর্থের বিকৃতি না ঘটে নামায কাছেদ হবে না যদিও কুরআনে অনুরূপ না থাকে যেমন

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا

এবং فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّتُفَّاحٌ وَّرُمَّانٌ

(আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কোন কলেমা বাদ পড়াতে অর্থের বিকৃতি না ঘটলে, যেমন
جَزٰؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا এর মধ্যে দ্বিতীয়
سَيِّئَة পড়া না গেলে নামায় ফাছেদ হবেনা। শব্দ বাদ পড়াতে যদি অর্থের বিকৃতি হয় যেমন فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ
এর মধ্যে লা; পড়লনা তখন নামায ফাছেদ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন হরফ কম পড়লে এবং তা দ্বারা যদি অর্থ বিকৃত হয় যেমন خَلَقْنَا-خ ছাড়া এবং جَعَلْنَا - ج ছাড়া পড়লে, নামায় ফাছেদ হয়ে যাবে। আর যদি অর্থ বিকৃত না হয় যেমন, তারহীম বা সংক্ষেপনের শর্ত সহকারে বিলুপ্ত করলে যেমনঃ

يَا مَالِكُ এর মধ্যে يَا مَالُ পড়ল, তবে ফাছেদ হবেনা, এরকম যদি تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا এর মধ্যে . تَعَالَ পড়ল। নামায় হয়ে যাবে, (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ পড়ল এতে যদি অর্থ বিকৃত না হয় নামায হয়ে যাবে। যেমন عَلِيْمٌ এর জায়গায় حَكِيْمٌ পড়ল।

আর যদি অর্থ বিকৃত হয় নামায হবে না। যেমনঃ

وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ এর স্থানে غٰفِلِيْنَ পড়ল, নিসবত বা সম্পর্ক যদি ভুল করে এবং সম্পর্কিত বিষয় কুরআনে না তাকলে নামায ফাছেদ হবে। যেমন মরিয়ম ইবনে গায়লান আর কুরআনে থাকলে ফাছেদ হবেনা (মরিয়ম বিনতে লোকমান) (আলমগীরি) হরফ পূর্বাপর করার ক্ষেত্রেও যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে নামায ফাছেদ হবে, অন্যথায় হবেনা, যেমনঃ قَسْوَرَةٍ এর জায়গায় قَوْسَرَةٍ পড়ল عَصْفٌ এর জায়গায় - عَفْصٍ নামায ফাছেদ হবে। এবং اِنْفَجَرَتْ কে اِنْفَرَجَتْ পড়ল। তখন ফাছেদ হবেনা। এই হুকুম শব্দ অগে পরে হওয়ার ক্ষেত্রে.যেমনঃ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ . এর মধ্যে

شَهِيْقٌ কে زَفِيْرٌ এর আগে পড়ল নামায ফাছেদ হবে না।

এবং اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ
পড়ল নামায় ফাছেদ হবে (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ এক আয়াতকে অন্য আয়াতের স্থানে পড়ল যদি পূর্ণ ওয়াকফ করে থাকে নামায ফাছেদ হবে না। যেমনঃ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ এর -ওয়াক্‌ফ করে اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ পড়ল। বা
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
এর উপর ওয়াকফ কবল, অতঃপর
اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
পড়ল। নামায হবে, আর যদি ওয়াকফ না করে তখন অর্থের বিকৃতির ক্ষেত্রে নামায় ফাছেদ হবে যেমন বর্ণিত উদাহরণ। অন্যথায় হবেনা, যেমন
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ .
এর স্থানে فَلَهُمْ جَزَاءُ الْحُسْنٰى পড়ল নামায হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কোন শব্দ বারবার পড়ার দ্বারা অর্থের বিকৃতি ঘটলে নামায ফাছেদ হবে,
যেমন ঃ مٰلِكِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ رَبِّ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

যখন এযাফতের উদ্দেশ্যে পড়া হয় যেমন, রবের রব মালিকের মালিক 'আর যদি বিশুদ্ধির নিয়তে মাখরাজ বরাবর আদায় করে বা অনিচ্ছাকৃত মুখে বারংবার উচ্চারিত হল বা কিছুই উদ্দেশ্য করেনি। উপরোক্ত সকল অবস্থায় নামায ফাছেদ হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এক হরফের স্থানে অন্য হরফ পড়া, যদি একারণে হয় যে, মুখে ঐ হরফ আদায় হচ্ছেনা, তা আয়ত্বে আনার চেষ্টা করা জরুরী আর যদি বেপরুওয়া ভাবে হয় যেমন বর্তমানে অধিকাংশ হাফেজ আলেমগণ আদায়ে সক্ষম। কিন্তু অসাবধানতা ও অসতর্কতা হেতু হরফ পরিবর্তন করে ফেলে এ ক্ষেত্রে অর্থের বিকৃতি হলে নামাযও ফাছেদ হবে। এ প্রকারের যত নামায পড়া হয় তা ক্বাযা করা আবশ্যক, এর বিস্তারিত বিবরণ ইমামত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

মাসয়ালাঃ ط-ت-س-ث-ص-ذ-ز-ظ-ا-ع-ء-ح-ه-ض-
ذ-ظ

এসব হরফে সঠিকভাবে পার্থক্য নির্ণয় করবে, অন্যথায় অর্থের বিকৃতির ক্ষেত্রে নামায হবে না। অনেকেই তো س-ش-د-ج-ق-ك- এর মধ্যে ও পার্থক্য করেনা।

মাসয়ালাঃ মাদ, গুন্নাহ, এজহার, এখফা, এমালা যথাস্থানে পড়েনি যেখানে পড়া প্রয়োজন, পড়েনি নামায হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ লাহান বা সুর সহকারে কুরআন পাঠ করা হারাম এবং শ্রবণ করাও হারাম। কিন্তু মাদ লীনে যদি সুর করা হয় নামায ফাছেদ হবে না সুর তান যদি অশ্লীলতায় না পৌঁছে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ আল্লাহ্ তায়ালার জন্য স্ত্রীবাচক শব্দ বা সর্বনাম উল্লেখ নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে)

ইমামতের বর্ণনাঃ

হাদীসঃ (১) আবু দাউদ শরীফে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের উত্তম লোকেরা আজান বলবে, এবং ক্বারীগণ ইমামত করবে, (সে যুগে যারা অধিক কুরআন পড়ত তারা অধকি জ্ঞানী হতো।)

হাদীসঃ (২) মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমামের অধিক যোগ্য ক্বারী আর্থাৎ অধিক কুরআন পাঠকারী।

হাদীসঃ (৩) আবু শায়খ সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম ও মুয়াজ্জিন তাদের সমান ছওয়াব পাবে যারা তাদের সাথে পড়েছে।

হাদীসঃ (৪) ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী বর্ণনা করেন, আবু আতিয়া আকিলী বলেন, মীক বিন তায়াইছ (রাঃ) আমাদের এখানে আসতেন, একদিন নামাযের সময় হলো, আমরা বললাম, আগে যান নামায পড়িয়া দিন। বললেন আপনাদের মধ্যে কাউকে আগে বাড়িয়ে দিন, যিনি নামায পড়াবেন আমি কেন পড়াচ্ছি না তা বলবো, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যে কোন সম্প্রদায়ের সাক্ষাতে যাবে যে যেন তাদের ইমামতি না করে, তাদের মধ্যে কেউ যেন, ইমামতি করে।

হাদীসঃ (৫) তিরমিযী আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির নামায কান অতিক্রম করেন না, পলাতক ক্রীতদাস, ফিরে না আসা পর্যন্ত। যে মহিলা স্বামীর অসন্তুষ্টি অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, এবং কোন সম্প্রদায়ের ইমাম লোকেরা তাঁর ইমামতিকে অপছন্দ করে। (অর্থাৎ শরয়ী কোন মন্দ আচরণের কারণে)

হাদীস ঃ (৬) ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিনি ব্যক্তি আছে, যাদের নামায তাদের মাথার উপরে এক বিঘতও উপরে উঠানো হয়না, অর্থাৎ আল্লাহ কবুল করেন না, (১) যে ব্যক্তি মানুষের ইমামত করেন অথচ (তারা

ন্যায়সঙ্গত কারণেই) তাঁর উপর নাখোশ, (২) যে স্ত্রীলোক রাত্রি যাপন করল, অথচ তার স্বামী তার উপর (ন্যায়সঙ্গত ভাবেই) অসন্তুষ্ট রইলো, (৩) এবং সে দুই ভাই যারা ঝগড়া বিবাদের কারণে পরস্পরে বিচ্ছেদ লিপ্ত।

হাদীসঃ (৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি আছে তাদের নামায কবুল করা হবে না। (১) যে কোন সম্প্রদায়ের ইমামত করে অথচ তারা তাঁকে (ন্যায় সঙ্গত ভাবেই) অপছন্দ করে। (২) সে ব্যক্তি যে দেবার সময়ে নামায পড়তে আসে, আর দেবার হল উত্তম সময় চলে যাওয়ার পর নামাযে আসা। (৩) সে ব্যক্তি যে স্বাধীন নারীকে দাসী মনে করে, অথবা দাসীতে পরিণত করে। অথবা স্বাধীন পুরুষকে দাস মনে করে বা দাসে পরিণত করে।

হাদীসঃ (৮) হযরত সালামাহ্ বিনতে হুর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে ইহাও অন্যতম যে, মসজিদে সমবেত নামাযীগণ একে অপরকে ঠেলবে। অর্থাৎ ইমামত করার জন্য আহবান করবে। কিন্তু তাদের নামায পড়াতে পারবে, এমন কোন ইমাম পাবেনা।

হাদীসঃ (৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কারো ঘর বা তার ক্ষমতার স্থলে ইমামতি করবেনা এবং মসনদে বসবেনা, কিন্তু তাঁর অনুমতি সাপেক্ষ।

হাদীসঃ (১০) বোখারী মুসলিম শরীফে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন অন্যদের নামায পড়াবে তখন সহজ করবে। তাদের মধ্যে রুগ্ন. দুর্বল এবং বৃদ্ধ রয়েছে। যখন নিজে পড়বে তখন যতটুকু পরিমাণ ইচ্ছা দীর্ঘ করবে।

হাদীসঃ (১১) বোখারী শরীফে হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি নামাযে প্রবেশ করি এবং দীর্ঘ করার ইচ্ছা রাখি, ছোট শিশুদের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনতে পায় সুতরাং নামাযে সংক্ষেপ করি আমি জানি যে তার ক্রন্দনে তার মায়ের দুঃখ হয়ে।

হাদীসঃ (১২) মুসলিম শরীফে আছে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ালেন, নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ করলেন, এবং বললেন, ওহে মানুষরা, আমি তোমাদের ইমাম। রুকু, সিজদা, কেয়াম, এবং নামাযে আমার অগ্রগামী হইওনা, আমি তোমাদেরকে সামনে পিছনে দেখি থাকি।

হাদীসঃ (১৩) ইমাম মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগে নিজে মাথা উঠায়, বা ঝুকায় তার কপালের চুল শয়তানের হাতে রয়েছে।

হাদীসঃ (১৪) বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় সে, কি ভয় করেনা যে, আল্লাহ্ তায়ালা তার মাথাকে গাধার মাথা করে দেবেন। কতেক মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত যে, ইমাম নব্বী (রাঃ), হাদীস সংগ্রহের জন্য দামেশকের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নিকট গেলেন, তার নিকট অনেক কিছু পড়লেন, কিন্তু তিনি পর্দা করে পড়াতেন, দীর্ঘদিন তাঁর নিকট অনেক কিছু পড়লেন কিন্তু তাঁর মুখমন্ডল দেখেননি। দীর্ঘকাল অতিক্রম করার পর তিনি দেখতে পেলেন যে, হাদীসের প্রতি তার প্রচণ্ড ইচ্ছা। তখন তিনি একদিন পর্দা সরায়ে নিলেন, দেখতে পেলেন তাঁর মুখ গাধার মত , তিনি বললেন, প্রিয় বৎস ইমামের অগ্রগামী হওয়াকে ভয় করো, এ হাদীস আমার নিকট পৌছার পর আমি তা অসম্ভব মনে করতাম আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে ইমামের অগ্রগামী হতাম তখন আমার মুখ এ রকম হয়ে গেল যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

হাদীসঃ (১৫) আবু দাউদ শরীফে সওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিনটি কাজ কারো জন্য হালাল নয়, (১) যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে সে যেন নির্দিষ্টভাবে নিজের জন্য দোয়া করে, এবং তাদেরকে ছেড়ে না দেয়। এরূপ করলে সে খেয়ানত করল, (২) কারো ঘরের দিকে অনুমতি ছাড়া দেখবে না, এরূপ করলে যে খেয়ানত করল, এবং পায়খান প্রস্রাবের গতিবেগ রেখে নামায পড়বে না, বরং তা শেষ করে নেবে।

ফকীহি বিধানঃ ইমামতে কোবরার বর্ণনা যেহেতু আক্বাঈদ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, এ অধ্যায়ে ইমামতে ছুগরা অর্থাৎ নামাযের ইমামত সংক্রান্ত মাসায়েল বর্ণনা করা হবে ইমামতের অর্থ হলো নিজের নামাযের সাথে অন্যের নামায সম্পৃক্ত করা।

ইমামতের শর্তাবলীঃ

মাসয়ালাঃ ওজরহীন পুরুষের জন্য ইমাম হওয়ার ছয়টি শর্ত, (১) মুসলমান হওয়া (২) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (৩) বুদ্ধিমান হওয়া (৪) পুরুষ হওয়া (৫) ক্বারী হওয়া (৬) মাজুর না হওয়া।

মাসয়ালাঃ মহিলাদের জন্য পুরুষ ইমাম হওয়া শর্ত নয়, মহিলারাও ইমাম হতে পারবে, যদিও মাকরুহ্ হয়।

মাসয়ালাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ইমাম হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। বরং অপ্রাপ্ত বয়স্করাও অপ্রাপ্ত বয়স্কের ইমামতি করতে পারবে। যদি বুদ্ধিমান হয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাযুর নিজের মত বা তদাপেক্ষা বেশী ওজর ওয়ালা ব্যক্তির ইমামতি করতে পারবে। কম ওজর ওয়ালার ইমামতি করতে পারবে না, আর ইমাম ও মুক্তাদি

দুজনের যদি দু প্রকারের ওজর হয় যেমন একজনের বায়ু নির্গত রোগ অন্যজনের প্রস্রাবের ফোটা বের হওয়ার রোগ তখন একজন অন্যজনের ইমামতি করতে পারবেনা (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মা'জুর অনুরূপ অন্য মা'জুরের এক্তেদা করতে পারবে। এক ওজর ওয়ালা দু ওজর ওয়ালার এক্তেদা করতে পারবে না, এক ওজর ওয়ালা দ্বিতীয় ওজর ওয়ালার এবং দুওজর ওয়ালার এক ওজর ওয়ালা এক্তেদা করতে পারবেনা যখনও এক ওজর ঐ দুজনের ওজরের মত হয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাজুর ব্যক্তি নিজের অনুরূপ অন্যজন মাজুর এবং সুস্থ ব্যক্তির ইমামতি করল, তখন সুস্থ ব্যক্তির হবে না অন্যদের হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ পবিত্র মাজুরের এক্তেদা করা যাবেনা যদি অজুর অবস্থায় হাদছ পাওয়া যায় বা অজুর পর সময়ের ভিতর প্রকাশ হলে। যদিও নামাযের পর হয় মার অজুর সময় হাদছ ছিল না। সর্বশেষ সময় পর্যন্ত পুনরায় অজু করল না, তাহলে এ নামায় যা সে পড়াল তাতে সুস্থ ব্যক্তি এক্তেদা করতে পারবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ঐ বদ মযহাব ব্যক্তি যার মাজহাব বিরোধীতা কুফরের সীমায় পৌছল যেমন রাফেজী যদি ও শুধু মাত্র ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) খোলফত বা ছাহবী হওয়াকে অস্বীকার করে বা সায়খাইন তথা ছিদ্দিকে আকবর ও ওমর ফারুক (রাঃ) এর বিরুদ্ধে মন্দ বলে, কাদরীয়া জহমী মোশাব্বাহা এবং ঐ সম্প্রদায় যারা কুরআনকে মাখলুক বা সৃষ্ট বলে, যারা শাফায়াত ও দিদারে এলাহী বা কবরের আজাব অথবা কেরামান কাতেবীন কে অস্বীকার করে তাদের পিছনে নামায হবে না। (আলমগীরা, গুণীয়া) এর চেয়ে কঠোর বিধান রয়েছে ওহাবী সম্প্রদায়ের, যারা আল্লাহ্ এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মানহানি, সমালোচনা অবমাননা করে বা সমালোচনাকারীদেরকে নিজেদের পেশওয়া বা নেতা বা কমপক্ষে মুসলমান মনে করে, তাদের পিছনে নামায পড়াও জায়েজ নেই।

মাসয়ালাঃ যে সব বদ মযহাবী লোকেরা মযাহাব বিরোধীতা কুফরের সীমায় পৌঁছেনি, যেমন তাফজিলিয়া সম্প্রদায় তাদের পিছনে নামায মাকরূহ তাহরীমি। (আলমগীরি)

নামাযে এক্তেদার শর্তাবলীঃ

এক্তেদার শর্ত ১৩ টি। ☐ এক্তেদার করা, এক্তেদার নিয়্যত তাহরীমার সাথে করা বা তাহরীমার পূর্বে করা। শর্ত হলো নিয়্যতও তাহরীমার মাঝখানে অন্য কাজ দ্বারা যেন ব্যবধান না হয়। ☐ ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ই একস্থানে হওয়া ☐ উভয়ের নামায এক হওয়া বা ইমামের নামায মুক্তাদিকে অন্তর্ভুক্তকারী নামায হওয়া ☐ ইমামের নামায মুক্তাদির মযহাবের আলোকে সহীহ বা শুদ্ধ হওয়া ☐ ইমাম মুক্তাদি উভয়ই তা সঠিক মনে করা, ☐ মহিলার মাঝখানে না হওয়া ☐ মুক্তাদি ইমামের অগ্রগামী না হওয়া ☐ ইমামের রুকন পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত থাকা, ☐ ইমাম মুক্বীম বা মুসাফির হওয়ার ব্যাপারে অবগত থাকা, ☐ রুকন আদায়ে শরীক থাকা, রুকন আদায় কালে মুক্তাদি ইমামের মত হউক বা কম হউক শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ইমামের চেয়ে মুক্তাদি বেশী না হওয়া।

মাসয়ালাঃ আরোহী পদব্রজ ব্যক্তির বা পদব্রজ ব্যক্তি আরোহীর এক্তেদা করল, বা মুক্তাদি ও ইমাম উভয়েই বাহনের উপর এ তিন অবস্থায় এক্তেদা হবে না। যদি উভয়ের স্থান ভিন্ন হয়। যদি উভয়ে এ বাহনের উপর। আরোহন করে তখন পিছনের ব্যক্তি সম্মুখ ব্যক্তির এক্তেদা করতে পারবে যেহেতু স্থান একটি। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম, মুক্তাদির মাঝখানে যদি রাস্তা এতটুকু প্রশস্থ হয় যা দিয়ে গরুর গাড়ী যাতায়াত করা যাবে তখন এক্তেদা হবে না। এরকম যদি মাঝখানে নদী থাকে নদীতে নৌকা সাম্পান চলাচল করতে পারবে তখনও এক্তেদা শুদ্ধ হবে না। যদিও নদী মসজিদের মাঝখানে হয়, নদী যদি একেবারে ছোট হয় যার মধ্যে ডিঙ্গি নৌকাও পারাপার হয় না, এমন হলে এক্তেদা শুদ্ধ হবে (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাঝখানে জলাধার যদি একশত বর্গহাত বিশিষ্ট হয় তখন এক্তেদা হবে না, তবে কিন্তু জলাধার চৌবাচ্চার প্রান্ত যখন সারি বরাবর সংযুক্ত হয় এবং জলাধার ছোট হয় তখন এক্তেদা সহীহ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাঝখানে প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তায় কাতার দাড়িয়ে গেল যেমন-কমপক্ষে তিনজন দাড়াল তখন তাদের পিছনে অন্য লোক ইমামের এক্তেদা করতে পারবে। শর্ত হলো প্রত্যেক দুই কাতার বা প্রথম সারি এবং ইমামের মাঝখানে যেন গরু গাড়ী যেতে না পারে অর্থাৎ রাস্তা যদি বেশী প্রশস্ত হয় যে একের অধিক সারি এতে সংকুলান হবে তখন এতটুকু হওয়া বাঞ্চনীয়, দু সারির মাঝ পথে যেন গরুগাড়ী যেতে না পারে, এভাবে রাস্তা যদি লম্বা হয় যেমন আমাদের দেশে পূর্ব পশ্চিম সড়ক তখনও প্রত্যেক দু সারি এবং ইমাম ও মুক্তাদির মধ্যে পূর্বোক্ত শর্ত কার্যকর হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নদীর উপর সেতু সারি যদি তার সাথে সংযুক্ত হয় ইমাম যদিও নদীর একদিকে, অন্যদিকে লোকেরা তার এক্তেদা করতে পারবে।

মাসয়ালাঃ ময়দানে জামাত কায়েম হল, ইমাম ও মুক্তাদির মাঝখানে এতবেশী খালি জায়গা রয়েছে যাতে দুটি কাতার দাড়াতে পারবে তখন এক্তেদা সহীহ হবে না। বড় মসজিদ যেমন মসজিদে কুদস্ এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ বড় জায়গা ময়দানের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ঐ জায়গাকেও বড় বলা যাবে যেটা চল্লিশ হাত হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইদগাহ মসজিদে ইমাম, মুক্তাদির মধ্যে যতই দূরত্ব হউক এক্তেদার অন্তরায় নয়। যদিও মাঝখানে দুইবা ততোধিক সারির অবকাশ থাকে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ময়দানে জামাত কায়েম হল, প্রথম দুই সারিতে এখনো আল্লাহু আকবর বলেনি। তৃতীয় সারিতে ইমামের পর তাহরীমা বেধে নিল এক্তেদা শুদ্ধ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ময়দানে জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে সারির মাঝখানে চৌবাচ্চা পরিমাণ একশত বর্গহাত বিশিষ্ট খালি জায়গা রয়েছে যেখানে কেউ দাড়ায়নি যদি এ খালি স্থানে আশে পাশে অর্থাৎ ডান দিক বাম দিকের সারি সংযুক্ত থাকে তখন এ স্থানের পরবর্তীদের এক্তেদা সহীহ হবে। অন্যথায় হবে না। আর একশত বর্গহাত বিশিষ্ট এর চেয়ে কম পরিমাণ জায়গা খালি থাকলে তখন পিছনের লোকদের এক্তেদা সহীহ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দু'টি নৌকা পরস্পর আবদ্ধ একটির উপর ইমাম অন্যটির উপর মুক্তাদি হলে এক্তেদা সহীহ হবে। আর পৃথক হলে শুদ্ধ হবে না। নৌকা যদি কুলে ভিড়ে ইমাম নৌকার উপর মুক্তাদি স্থলভাগে হলে উভয়ের মাঝখানে যদি রাস্তা হয় বা বড় নদীর সমান দুরত্ব থাকে তখন এক্তেদা সহীহ হবে না। অন্যথায় হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার) অর্থাৎ ইমাম আবতরনে যদি সক্ষম না হন। যে ব্যক্তি নৌকা থেকে অবতরণ করে স্থলভাগে পড়তে সক্ষম নৌকার উপর তার নামায হবেই না। তবে নৌকা বা জাহাজ যদি জমীনের সাথে লেগে যায় তার উপর সর্বাবস্থায় নামায সহীহ।

মাসয়ালাঃ যে মসজিদ বেশী বড় নয়, এ রকম মসজিদে ইমাম যদিও মেহরাবে থাকে মুক্তাদি মসজিদের শেষ প্রান্তে ইমামের এক্তেদা করতে পারবে। (আলমগিরি)

মাসয়ালাঃ ইমাম, ও মুক্তাদির মাঝখানে যদি কোন বস্তু অন্তরায় হয় এবং ইমামের স্থানান্তর বিধান অনুকরণে যদি সন্দেহ না হয় যেমন ইমামের বা মুকাব্বিরের আওয়াজ শুনা যাচ্ছে বা ইমামের বা মুক্তাদিদের ইন্তেকাল বা রুকন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কোন ক্ষতি নেই যদি ও ইমাম পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তাঁর রাস্তা নেই যেমন দরজায় জালি রয়েছে ইমামকে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু খোলা না থাকায় যাবার ইচ্ছে হলে যেতে পারছেনা (দুররে মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম, মুক্তাদির মাঝখানে যদি মিম্বর অন্তরায় হয় তা এক্তেদা নিষেধ করে না যদি ইমামের অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যে স্থানের ছাদ মসজিদের সাথে সম্পূর্ণ সংযুক্ত মাঝখানে রাস্তা না থাকে তখন ছাদের উপর থেকে এক্তেদা করা যাবে। আর যদি রাস্তার দূরত্ব হয় করা যাবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদ সংলগ্ন দালান থাকলে তা থেকে মুক্তদি এক্তেদা করতে পারবে যদি ইমামের অবস্থা গোপন না থাকে (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদের বাহিরে চুত্‌রা রয়েছে এবং ইমাম মসজিদে রয়েছে মুক্তাদি এ চুত্‌রার উপর এক্তেদা করতে পারবে যদি কাতার সংযুক্ত থাকে (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযের সময় জানা ছিল, যে ইমামের নামায শুদ্ধ, পরে জানতে পারল শুদ্ধ ছিল না যেমন মোজা মুছেহ এর সময় অতিক্রম করল। বা ভুলক্রমে অযুহীন অবস্থায় নামায আদায় করেছে তখন মুক্তাদির নামাযও হয়নি। (রদ্দুল মুখতার)

মাসয়ালাঃ ইমামের নামায নিজ ধারণানুসারে সঠিক, মুক্তাদির, ধারণানুসারে সঠিক নয় তখন এক্তেদা শুদ্ধ হবে না। যেমন শাফেয়ী মযহাবের ইমামের শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, যদ্দারা হানফীদের মতে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং অজুবিহীন তিনি ইমামত করলে হানফী তার পেছনে এক্তেদা করতে পারবে না। যদি করে নামায বাতিল হয়ে যাবে, ইমামের নামায স্বয়ং নিজ ধারণায় যদি সহীহ না হয় কিন্তু মুক্তাদির ধারণামতে সঠিক, তখন তার এক্তেদা সহীহ হবে। এখন ইমাম নিজ নামায ফাছেদ হওয়ার ব্যাপারে অবগত না হয় যেমন, শাফেয়ী পন্থী ইমাম লজ্জাস্থান বা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার পর বিনা অজুতে ভুলক্রমে ইমামতি করল, হানফী পন্থীরা তার এক্তেদা করতে পারবে, যদিও সে জানে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং সে অজু করেনি (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ শাফেয়ী বা অন্য মুকাল্লিদের এক্তেদা তখন করা যাবে, যখন সে পবিত্রতার ও নামাযের মাসায়েলে আমাদের মযহাবের ফরজের প্রতি গুরুত্বারোপ করে, অথবা যদি জানা যায় যে, তার তাহারত বা পবিত্রতা এমন হয়নি, যা দ্বারা হানফীদের মতে পবিত্রতাহীন বলা যাবে নামায এরকমও নয়, যে যাকে আমরা ফাছেদ বলতে পারবো তবুও হানফীদেরকে হানফীদের এক্তেদা করা উত্তম। আর আমাদের মযাহাবের অনুকরণ যদি জানা না যায়, এ নামাযে অনুকরণ করেনি তা নয়, তখন জায়েজ। কিন্তু মাকরূহ, আর যদি জানা যায় যে এ নামাযে অনুকরণ করেনি তখন নিছক বাতিল হবে। (আলমগীরি, গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মহিলা পুরুষ বরাবর দাড়ালে পুরুষের জন্য এক্তেদা তখন নিষেধ হবে। যখন এক হাত উঁচু কোন বস্তু অন্তরায় না হয় এবং পুরুষের সমপরিমাণ উঁচুস্থানে মহিলা দাড়াবে না। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ একজন মহিলা পুরুষ বরাবর দাড়ালে তিনজন পুরুষের নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। ডান বামের দুজন, একজন পিছনের। দুজন মহিলা হলে চারজন পুরুষের নামায ভেঙ্গে যাবে, ডানে বামে দুজনের, পিছনের দুজন।

মহিলা তিনজন হলে, ডানে বামে দুজনের, একজন পিছনের প্রত্যেক সারির তিনজন তিনজনের পুরুষের নামায ভঙ্গ হবে। পূর্ণ কাতার যদি মহিলার হয় তখন পিছনের সব সারির নামায হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদে উচ্চ প্রাসাদ আছে, এর উপর মহিলারা মসজিদের ইমামের এক্তেদা করল এবং বালাখানার নীচের পুরুষেরা তাদের এক্তেদা করল, যদি পুরুষেরা মহিলাদের পিছনে হয়, নামায ফাছেদ হবে না। মহিলাদের সারি নীচে হলে এবং পুরুষেরা বালাখানার উপরে হলে তখন যতপুরুষ মহিলাদের সারির পিছনে রয়েছে তাদের নামায ফাছেদ হয়ে যাবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ একটি সারির একদিকে পুরুষ দাড়াল, অন্যদিকে মহিলারা দাড়াল, তখন শুধুমাত্র একজন পুরুষের নামায হবেনা যিনি মধ্যখানে রয়েছে। অন্য সকলের নামায হবে (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মুক্তাদির পা ইমামের পায়ের চেয়ে বড় হওয়ার কারণে ইমামের আঙ্গুলের আগে মুক্তাদির আঙ্গুল অগ্রগামী হয়ে গেল কিন্তু পায়ের গোড়ালী সমান রয়েছে নামায হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

ইমাম হওয়ার অধিক যোগ্য কে?

মাসয়ালাঃ সবার চেয়ে ইমামের যোগ্য ঐ ব্যক্তি যে নামায ও পবিত্রতার বিধানাবলী সকলের চেয়ে অধিক জানেন। যদিও অন্য শাস্ত্রে পূর্ন অভিজ্ঞতা না রাখে, শর্ত হলো এতটুকু কুরআন যেন স্মরন থাকে যে পরিমাণ পড়া সুন্নত, এবং সঠিক ভাবে মাখরাজ আদায়ে সক্ষম, এবং মযহাবের কোন ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত নয় এবং অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে। এরপর ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উপযুক্ত যিনি তাজবীদ সহ ইলমে ক্বেরাত অধিক জানেন, এবং তদানুযায়ী নামায আদায় করে যদি কয়েক ব্যক্তি এসব গুণাবলীতে সমান হয় তখন যিনি অধিক মুত্তাকী খোদাভীরু, অর্থাৎ হারামকে যে পরিহার করে এমন কি সন্দেহজনক বিষয়কেও এড়িয়ে চলে, যদি এতে সকলে সমান হয় তখন যিনি অধিক বয়স্ক অর্থাৎ যার বেশী জীবন ইসলামী অবস্থায় অতিবাহিত করেছে এতে সমান হলে যিনি অধিক সচ্চরিত্রবান এতে সকলে সমান হলে। যিনি অধিক তাহজ্জুদ গুনার, অধিক তাহজ্জুদ আদায়ে মানুষের চেহারা অধিক সুন্দর হয়, অতঃপর যারা অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী অতঃপর যারা বংশগতভাবে সম্ভ্রান্ত। অতঃপর গোত্রের দিকে দিয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অতঃপর যিনি অধিক সম্পদ শালী অতঃপর অধিক সম্মানী অতঃপর যার কাপড় অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মূলতঃ কয়েক ব্যক্তি সমান মর্যাদার অধিকারী হলে তাদের মধ্যে শরয়ী দৃষ্টিকোণে যিনি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তিনি অধিক হকদার। প্রাধান্য না পেলে লটারী দেবে, যার নাম লটারীতেউঠবে তিনি ইমামতি করবেন অথবা জামাতের লোকেরা যাকে নির্বাচিত করেন তিনি ইমাম হবেন, জামাতে মতানৈক্য হলে যে পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে তিনি ইমাম হবেন, জামাতের লোকেরা অনুত্তম লোককে ইমাম নিয়োগ করলে তারা অন্যায় করেছে কিন্তু গুনাহগার হবেনা। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নির্দিষ্ট ইমামই ইমামতির হকদার। যদিও উপস্থিতির মধ্যে কেউ তার চেয়ে অধিক জ্ঞান বা অধিক তাজবীদ সংক্রান্ত জ্ঞানী থাকে (দুর্রুল মোখতার) অর্থাৎ যখন ইমাম পূর্ণ শর্তাবলীর বাহক হন অন্যথায় তিনি শ্রেষ্ঠ হওয়া তো দুরে থাক, ইমামতির যোগ্যও নন।

মাসয়ালাঃ কারো ঘরে জামাত কায়েম করা হলো। ঘরের মালিকের মধ্যে যদি ইমামতির শর্তাদি পাওয়া যায় ইমামতির জন্য তিনিই উত্তম। যদিও অন্য কেউ ইলম ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম হউক না কেন, তবে উত্তম হলো ঘরের মালিক তাদের মধ্যে ইলমের ফাজিলতের দৃষ্টিকোণে কাউকে সামনে যাবার অর্থাৎ ইমামতি দেবে, এতে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হল, মেহমান স্বয়ং আগে অগ্রসর হলে তখনও নামায হয়ে যাবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ভাড়ার ঘর এতে ঘরের মালিক, ভাড়াটিয়া, এবং মেহমান তিনজনই উপস্থিত রয়েছে তখন ভাড়াটিয়া অধিক হকদার তাকে অনুমতি দেবে এবং তার থেকে অনুমতি গ্রহন করবে, ঘর যদি ধার নিয়ে অবস্থান করে তিনিই হকদার। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ বাদশাহ, আমির, কাযী কারো ঘরে একত্র হলে তখন বাদশাহ অধিক হকদার, অতঃপর আমির, অতঃপর কাযী, অতঃপর ঘরের মালিক (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কারো ইমামতিতে লোকেরা যদি শরীয়তের সংগত কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট হন, তখন তাকে ইমাম বানানো মাকরুহ তাহরীমি। আর অসন্তুষ্টি যদি কোন শরয়ী কারণে না হয় তখন মাকরূহ হবে না, বরঞ্চ যদি সে যোগ্য হয় তিনিই ইমাম হওয়া সমীচিন। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি ইমানতির যোগ্যতা রাখে, নিজের মহল্লায় ইমামতি করেনা, রমজান মাসে অন্য মহল্লাবাসীর ইমামতি করে, তাঁর উচিত এশার সময় হওয়ার পূর্বেই চলে যাওয়া। সময় হওয়ার পর যাওয়া মাকরূহ (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমামের উচিৎ, জামাতের দিকে লক্ষ্য রেখে সুন্নত পরিমাণ এর চেয়ে দীর্ঘ কেরাত পড়বে না, এটা মাকরুহ। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কোন বদ মাযহাব ব্যক্তির মাযহাব বিরোধীতা কুফরী সীমায় না পৌছলে এবং ফাসিকে মুলিন, যেমন মদ্য পায়ী, জুয়াটি ব্যাভীচারী, সুদখোর, চোগলখোর প্রমুখ যারা প্রকাশ্য কবীরা গুনাহ করে তাদেরকে ইমাম নিযুক্ত করা গুনাহ, তাদের পিছনে নামায মাকরূহ তাহরীমা পূনরায় পড়া ওয়াজিব। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ক্রীতদাস, অন্ধ, জারজসন্তান, অত্যন্ত বয়স্ক বালক কুষ্ট রোগাক্রান্ত ধবল, কুষ্টাক্রান্ত, নির্বোধ (যেমন ক্রয় বিক্রয়ে প্রতারণার শিকার হয়) এদের ইমামতি মাকরুহে তানযিহী তখন হবে যদি জামাতে তাদের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি না থাকে। আর যদি এরাই ইমামতির যোগ্য হন তখন মাকরূহ হবে না। অন্ধের ইমামতি সহজ মাকরুহ এর অর্ন্তভূক্ত। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যার দৃষ্টি শক্তি কম সে ও অন্ধের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ফাসেকের এক্তেদা করবেনা, শুধুমাত্র বাধ্য হয়ে জুমাতে এক্তেদা করবে, অবশিষ্ট নামাযে অন্য সমজিদে চলে যাবে শহরের কয়েক জায়াগায় জুমা হলে সেখানেও এক্তেদা করবেনা অন্য মসজিদে গিয়ে পড়বে। (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার, ফতহুল কাদীর)

মাসয়ালাঃ প্রাপ্ত বয়স্ক বালক কোন নামাযে মহিলা, খুনছা নাবালেগের পিছনে এক্তেদা করতে পারবে না, এমনকি জানাযা নামায তারাবীহ ও নফল নামাযে ও না। এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লোক তাদের সকলের ইমাম হতে পারবে। কিন্তু মহিলা ও যদি তার মুক্তাদি হয় তখন মহিলার ইমামতির নিয়্যত করতে হবে। জুমা ও দুই ঈদের নামায ছাড়া, এতে ইমাম যদিও মহিলার ইমামতির নিয়্যত না করে তথাপি মহিলারা এক্তেদা করতে পারবে। মহিলা ও খুনছা মহিলার ইমাম হতে পারবে, কিন্তু মহিলাদের জন্য সাধারণ ইমাম হওয়া মাকরুহ তাহরীমি। ফরজ হউক নফল হউক তথাপি মহিলা মহিলার ইমাম হলে ইমাম আগে যাবে না। বরং মধ্যখানে দাড়াবে। আগে হলেও নামায ভঙ্গ হবে না। খুনছার জন্য শর্ত হলো সারির অগ্রভাগে হবে। অন্যথায় নামায হবেই না। খুনচা, খুনছার ইমাম ও হতে পারবেনা (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ জানাযার নামায শুধুমাত্র মহিলারাই পড়লে ইমাম ও মহিলা মুক্তাদি ও মহিলা এ জামাত মাকরুহ হবে না। (আলমগীরি দুর্রুল মোখতার) বরং মহিলা যদি জানাযা নামাযে পুরুষদের ইমামতি করে তখন ও জানাযা নামায হয়ে যাবে যদিও পুরুষের নামায না হয়।

মাসয়ালাঃ পাগল, রোগাবসান ছাড়া ইমাম হতে পারবেনা যখন হুশ হয় এবং উপলব্ধি ও আসছে তখন পারবে। এরকমভাবে মাতাল নেশাখোর ইমাম হতে পারবে না এবং মাতাল জ্ঞানশূন্য নিজের অনুরূপ ব্যক্তির ইমাম হতে পারবে অন্যদের নয়। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার. দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যার কাছে কুরআনের সামান্য হলেও স্বরণ আছে যদিও এক আয়াত হয় সে ঐ ব্যক্তির পিছনে যার কোন আয়াত স্বরণ নেই এক্তেদা করতে পারবেনা, উম্মী হলে উম্মীর পিছনে এক্তেদা করতে পারবে যার কাছে কিছু আয়াত স্বরণ আছে কিন্তু হরফ সঠিকভাবে আদায় করতে পারে না যে কারণে অর্থের বিকৃতি ঘঠে সেও উম্মীর পর্যায়ভুক্ত। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ উম্মী বোবার পিছনে একুদা করতে পারবে না বোবা, উম্মীর পিছনে করতে পারবে। উম্মী যদি শুদ্ধরূপে তাহরীমা বাঁধতে না পারে তখন বোবার পিছনে এক্তেদা করতে পারবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ উম্মী ব্যক্তি উম্মী এবং ক্বারীর (অর্থাৎ ফরজ পরিমাণ কুরআন শুদ্ধ রূপে পাঠে সক্ষম) ইমামতি করল কারো নামায হয়নি। যদিও ক্বারী নামাযের মাঝখানে শরীক হয়। এভাবে যদি ক্বারী উম্মীকে খলিফা নিযুক্ত করল যদিও তাশাহ্‌হুদে হয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ উম্মীর উপর ওয়াজিব হলো দিবারাত্রি চেষ্টা করা যেন ফরজ পরিমাণ কুরআন মজীদ আয়ত্ত্ব হয়, অন্যথায় আল্লাহর নিকট মাজুর বা অপারগ হিসেবে বিবেচিত হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ হরফ সঠিকভাবে যার আদায় হয় না, তার উপর ওয়াজিব হলো, হরফ বিশুদ্ধ করবে দিবারাত্রি পূর্ণরূপে চেষ্টা করা আর যদি সঠিক আদায়কারীর পিছনে এক্তেদা করা যায় যতটুকু সম্ভব তার এক্তেদা করবে। অথবা যেসব আয়াত পড়বে সেগুলোর হরফ সঠিকভাবে আদায় করতে পারে উভয়টা যদি সম্ভব না হলে চেষ্টাজগতে তার নিজের নামায হয়ে যাবে এবং নিজের মত অন্যের ইমামতিও করতে পারবে। যিনি তারমত ঐ হরফ সঠিকভাবে আদায় করতে পারে না, যার নিকট এক হরফ আদায় হচ্ছেনা দ্বিতীয় জন-তা আদায় করতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় হরফ সে আদায় করতে পারে না এমন হলে একজন অন্যজনের ইমামতি করতে পারবেনা, আর যদি স্বয়ং চেষ্টাও না করে তার নিজেরও হবে না অন্যজনের নামায তার পিছনে কিভাবে হবে? বর্তমানে অধিকাংশ লোক এ ব্যাধিতে আক্রান্ত, ভুল পড়ে অথচ সংশোধনের চেষ্টা করে না এমন লোকের ইমামতি দূরে থাক, নিজের নামাযও বাতিল। যার কাছে এক হরফ বরবার উচ্চারিত হয় সে-ও একই হুকুমের পর্যায়ভুক্ত। যদি পরিষ্কার পাঠকারীর পিছনে পড়া যায় তার পিছনে পড়া আবশ্যক। অন্যথায় তার নিজের নামায হয়ে যাবে। এবং নিজের মত বা নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের ইমামতি করতে পারবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ক্বারী নামায পড়ছে এমতাবস্থায় উম্মী আসল নামাযে শরীক হলোনা, পৃথকভাবে পড়ল তার নামায হলোনা। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ক্বারী অন্য কোন নামায পড়ছে তখন উম্মী নিজে পড়ে নেয়া জায়েজ এবং অপেক্ষা করবেনা। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ উম্মী মসজিদে নামায পড়ছে ক্বারী মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান, বা মসজিদের আঙ্গিনায় রয়েছে তখন উম্মীর নামায হয়ে যাবে, (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ যার সতর উন্মুক্ত সে সতর পর্দাকারীর ইমাম হতে পারবেনা, সতর উন্মুক্তদের ইমাম হতে পারবে। যদি কিছু মুক্তাদি কাপড় আবৃত আর কিছু অনাবৃত তখন সতর পর্দাকারীদের নামায হবে না, সতর উন্মুক্তদের নামায হয়ে যাবে। যার নিকট পর্দা করার যোগ্য কাপড় নেই তার জন্য উত্তম হলো, একাকী বসে ইংগিত সহকারে দূরে সরে নামায পড়বে। জামাত সহকারে পড়া মাকরুহ।

আর যদি জামাত সহকারে পড়া হয় ইমাম মাঝখানে থাকবে সামনে অগ্রগামী হবে না। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

সতর উন্মুক্ত হওয়ার অর্থ হলো, যে যার নিকট কাপড়ই নেই পর্দা ঢাকার কাপড় থাকা অবস্থায় না ঢাকলে তা নামাযও হবে না। তার পিছনে আদায়কারী অন্য কারো নামাযও হবে না। যেমন নামাযের শর্ত সমূহের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

মাসয়ালাঃ রুকু সিজদা করতে অক্ষম, অর্থাৎ দাড়ালে বা বসার স্থলে ইশারা করে, তার পিছনে রুকু সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তির এক্তেদা শুদ্ধ হবে না। বসে রুকু সিজদা আদায়ে সক্ষম ব্যক্তির পিছনে দাড়িয়ে আদায় সক্ষম ব্যক্তির এক্তেদা হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখাতার)

মাসয়ালাঃ ফরজ আদায়কারী নফল আদায়কারীর পিছনে এবং এক ফরজ আদায়কারী অন্য ফরজ আদায়কারীর পিছনে এক্তেদা করা যাবে না। যদিও দুজনের ফরজ দুই নামে হউক- যেমন, একজন জোহরের ফরজ পড়েছে দ্বিতীয়জন আসরের ফরজ পড়ছে অথবা নামাযের ছিফতে পার্থক্য হয়, যেমন একজন আজকের জোহর পড়ছে, দ্বিতীয়জন গতকালের জোহর পড়েছে। আর যদি দুজনের একই দিনের একই ওয়াক্তের ক্বাযা হয়ে যায় তখন একজন অন্যজনের পিছনে পড়তে পারবে। এ রকম ইমাম যদি আসরের নামায সূর্যাস্তের পূর্বে শুরু করেছে দু রাকাত পড়ার পর সূর্যাস্ত হল তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি যার ঐ দিনের আসরের নামায চলে যাচ্ছে পিছনের রাকাতে সে তার এক্তেদা করতে পারবে অবশ্য মুক্তাদি যদি মুসাফির হয় তখন এক্তেদা করবেনা। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে নিয়্যত ও ইক্বামত করে নিল এক্তেদা করা যাবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ দু ব্যক্তি পাশাপাশি নামায পড়ছে প্রত্যেকে ইমামতির নিয়্যত করেছে নামায হয়ে যাবে আর যদি প্রত্যেকে এক্তেদার নিয়্যত করে দুই জনেরই হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি কোন নামায মান্নত করল, এ নামায কোন ফরজ আদায় কারী বা নফল আদায়কারীর পিছনে পড়া যাবেনা, অন্য কোন মান্নতকারী নামাযীর

পিছনেরও পড়া যাবে না। হ্যাঁ একজন মান্নত করার পর দ্বিতীয়জন মান্নত করল যে, অমুক ব্যক্তি যে নামাযের মান্নত করেছে আমিও সে নামাযের মান্নত করছি। তখন একজন অন্য জনের পিছনে পড়তে পারবে। (দুর্রুল মোখতার আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ এক ব্যক্তি নফল পড়ার শপথ করল, মান্নতকারী মান্নতের জন্য তার পিছনে পড়তে পারবেনা। এবং শপথকারী ফরজ, নফল ও মান্নতের নামায অন্য শপথ কারীর পিছনে পড়তে পারবে। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ দুই ব্যক্তি এক সাথে নফল পড়ছে এবং ভঙ্গ হয়ে গেল তখন একে অন্যের পিছনে পড়তে পারবে। একাকী পড়লে ফাছেদ হয়ে গেলে একে অন্যের এক্তেদা করা যাবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ লাহেক, মসবুকের এক্তেদা করতে পারবেনা। না লাহেকের; এরকম মাসবুক লাহেকের পিছনে এবং মসবুকের পিছনে এবং অন্য কেউ এ দু প্রকারের পিছনে এক্তেদা করতে পারবেনা। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যে সব নামাযে কছর আছে ওয়াক্ত অতিক্রম করার পর সে সব নামাযে মুসাফির মুকীমের পিছনে এক্তেদা করতে পারবেনা। মুকীম ওয়াক্তের শেষে শুরু করুক বা যথাসময়ে শুরু করুক নামায পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল অবশ্য মুছাফির যদি মুকীমের পিছনে তাহরীমা বেধে নেয় তাহরীমার পর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় তখন এক্তেদা শুদ্ধ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ অবস্থান স্থলে অর্থাৎ শহর বা গ্রামে যে ব্যক্তি চার রাকাত বিশিষ্ট নামায পড়াচ্ছে দু রাকাতে সালাম ফিরিয়ে দিলে তখন মুক্তাদির জন্য আবশ্যক যে, সে মুকীম কিনা মুসাফির জেনে নেয়া, হয়ত মুক্তাদি নিজে মুকীম বা মুসাফির যদি ইমাম নামাযের পূর্বে নিজে মুসাফির হওয়াটা না বলে পরেও বলেনি এবং চলে গেল অন্যভাবেও তার অবস্থা জানা যায়নি। তখন মুক্তাদি নিজের নামায পুনরায় পড়বে হ্যাঁ যদি জঙ্গলে বা বাড়ীতে দুরাকাত পড়ে চলে যায় তখন তার নামায হয়ে যাবে এতে বুঝা যাবে. তিনি মুসাফির (ফানিয়া বাহার)

মাসয়ালাঃ যেখানে শর্ত না থাকার কারণে এক্তেদা শুদ্ধ হবেনা। ঐ নামায প্রথম থেকে শুরুই হবে না। আর বিভিন্ন প্রকার নামায হওয়ার কারণে এক্তেদা যদি শুদ্ধ না হয় তখন তা নফল হয়ে যাবে। কিন্তু এ নফল ভঙ্গ হলে ক্বাযা ওয়াজিব নয়, (দুরুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ অজুকারী তায়াম্মুমকারীর. পা ধৌতকারী মৌজার উপর মুছেহকারীর এবং অজুর অঙ্গ সমুহ ধৌতকারী, মাটির উপর মুছেহকারীর এক্তেদা করতে পারবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ দাড়িয়ে নামায আদায়কারী উপবিষ্ট হয়ে নামায আদায়কারীর এবং মেরুদণ্ড বাঁকা কুঁজো ব্যক্তির এক্তেদা করতে পারবে। যদিও তার কুঁজো হওয়াটা রুকুর সীমায় পৌঁছে যায়। যার পা, এমন লেংড়া পূর্ণ পা জমিনে রাখতে পারে না সে অন্যদের ইমামতি করতে পারবে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি ইমাম হওয়াটা উত্তম, (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে এক্তেদা করতে পারে যদিও ফরজ আদায়কারী পিছনের রাকাতগুলোতে ক্বেরাত না পড়ে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে এক্তেদা করার পর নামায ভেঙ্গে দিল অতঃপর ঐ বাদ পড়া নামায ক্বাযার নিয়্যতে এক্তেদা শুদ্ধ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইশারায় আদায়কারী ব্যক্তি অনুরূপ ব্যক্তির পিছনে এক্তেদা করতে পারবে, কিন্তু ইমাম যখন চিৎ হয়ে ইশারায় পড়ে মুক্তাদি দাড়িয়ে বা বসিয়ে পড়ে তখন জায়েজ হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ জ্বীন ইমামতি করল এক্তেদা করলে শুদ্ধ হবে যদি মানবাকৃতি নিয়ে প্রকাশ পায় (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম পবিত্রহীন অবস্থায় নামায পড়াল, অথবা অন্যকোন রুকন বা শর্ত পাওয়া যায়নি যে কারণে তার ইমামত শুদ্ধ হবে না। তখন তার উপর আবশ্যক বিষয়টি মুক্তাদিদেরকে জানিয়ে দেয়া যতটুকু সম্ভব হয়। নিজে বলুক বা কারো দ্বারা বলা হউক, বা পত্র দ্বারা জানানো হোক মুক্তাদিরা নিজ নিজ নামায পুনরায় পড়ে নেবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম নিজে কাফের হয়েছে বলে দিল, পূর্বের ব্যাপারে তার উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, যে নামায তার পিছনে পড়া হয়েছে তা পুনরায় পড়তে হবে না, তবে তখন যে নিঃসন্দেহে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে (দুর্রুল মোখতার) কিন্তু যখন একথা বলবে এতক্ষণ কাফের ছিল, তখন মুসলমান হয়েছে।

মাসয়ালাঃ পানি না পাওয়ার কারণে ইমাম তায়াম্মুম করেছিল এবং মুক্তাদি অযু করেছিল নামাযের মধ্যে মুক্তাদি পানি দেখল, ইমামের নামায শুদ্ধ হবে, মুক্তাদির বাতিল হবে। (দুর্রুল মোখতার)

যখন তার ধারণায় থাকে যে ইমাম ও পানির সন্ধান পেয়েছিল অনেক কিতাবে এটা মুতলক হুকুম যাস্পষ্ট হচ্ছে এটা মুকায়্যাদ বা নির্দিষ্ট হুকুম

জামাতের বর্ণনা, জামাতের ফজিলত, জামাত বর্জনের মন্দপরিণতি, প্রথম সারির ফজিলত, কাতার সোজা করা ও কাঁধ মিলায়ে দাঁড়ানো, নামাজ বর্জনের শাস্তি হাদীসের আলোকে

হাদীস (১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জামাতের সাথে নামায, একাকী নামাযের চাইতে সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। (বোখারী, মুসলিম, মালেক, তিরমিযী, নাসায়ী)

হাদীসঃ (২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন আমি আমাদের সাহাবীদের কে জানি, (তাঁরা কখনও জামাত বরখেলাপ করেন না) নামাজের জামাত বরখেলাপ করে কেবল প্রকাশ্য মুনাফেকরাই অথবা (সম্পুন্ন অক্ষম) রোগী আর আমি একটা ও দেখেছি যে, রোগী দু ব্যক্তির মধ্যখানে (তাদের সাহায্যে) পথ চলেছে যাতে মসজিদে নামায লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি বলেন রসুলুল্লাহ, আমাদেরকে সুনানে হুদা শিক্ষা দিয়েছেন আর আজান হয় এমন মসজিদে জামাত সহকারে নামাজ আদায়াকারী সুনানে হুদারই অন্তর্ভুক্ত। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে মসউদ বলেন যে ব্যক্তি আগামীকাল (কিয়ামতে) পূর্ণ মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে যে যেন এ পাঞ্জেগানা আমাদের (জামাতের) প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যেখানে উহার আযান দেয়া হয়, কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবীর জন্য সুনানে হুদা নির্ধারণ করেছেন আর এ পাঞ্জেগানা নামায জামাতের সাথে পড়া সুনানে হুদার অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড় যেভাবে এ জামাত বরখেলাপকারী তার ঘরে পড়ে থাকে তা হলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ কর তাহলে নিশ্চয়ই গোমরাহ হয়ে যাবে। (অতঃপর তিনি বলেন) যে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ করে এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করে অতঃপর এ মসজিদ সমুহের কোন মসজিদের দিকে গমন করে তা হলে সে যে সকল কদম বাড়ায় তার প্রত্যেক কদমেই তার জন্য আল্লাহ একটি নেকী নির্ধারণ করেন এবং এর দ্বারা তাঁর একটি পদ উন্নত করেন এতদ্ব্যতীত তা দ্বারা তার একটি গুণাহ মাফ করে দেন। খোদার কসম আমি তোমাদেরকে (সাহাবী গণকে) দেখেছি (তাঁরা কখনো জামাত ছাড়তেন না) জামাত ছাড়ে কেবল প্রকাশ্য মুনাফিকই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই পূর্বে এরূপ ব্যক্তি দেখা গেছে যাকে দু ব্যক্তির মধ্যখানে তাদের গাড়ে ভর দিয়ে মসজিদে আনা হয়েছে যেন তাঁকে সারিতে দাড় করানো যায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ)

হাদীসঃ (৩) নাসায়ী ও ইবনে খোজায়ামা স্বীয় সহীহতে হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে পূনরূপে অজু করল অতঃপর নামাযে গমন করল এবং ইমামের সাথে নামায পড়ল তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

হাদীসঃ (৪) তিবরানী শরীফে হযরত আবু উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামাযে জামাত হতে পিছে অবস্থানকারী যদি জানতো গমনকারীর জন্য কি রয়েছে তাহলে মাটিতে ঘষে উপস্থিত হতো।

হাদীসঃ (৫-৬) তিরমিযী শরীফে হযরত আনস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্য চল্লিশ দিন জামাতের সাথে নামায পড়বে এবং প্রথম তাকবীর পাবে তার জন্য দুটি আজাদী লিখা হবে। এক জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দ্বিতীয় মুনাফেকী থেকে মুক্তি। ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত ওমন বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত্রি মসজিদে জামাত সহকারে নামায পড়বে এশার প্রথম তাকবীর বাদ না পড়ে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য দোজখের আজাদী বা মুক্তি লিপিবদ্ধ করবেন।

হাদীসঃ (৭) তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, রাত্রি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন এক আগমনকারী আসলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি আমার প্রভুকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুআলায়হি ওয়াসাল্লাম) আরজ করলাম لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (আপনার দরবারে উপস্থিত) তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান উর্দ্ধজগতের ফেরেস্তারা কোন বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি আরজ করলাম , প্রভু জানিনা তিনি স্বীয় কুদরতী হস্ত মোবারক আমার স্কন্ধের মাঝখানে রাখলে, এমন কি তাঁর শীতলতা আমি আমার বক্ষে অনুভব করলাম, তখন যা কিছু আসমানও জমীনে আছে সব কিছু জেনে নিলাম। অপর এক বর্ণনায় আছে, পূর্ব পশ্চিম দিকে যা কিছু রয়েছে সব কিছু জেনে নিলাম। বললেন হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তুমি কি জান, উর্ধজগতের ফেরেস্তারা কোন বিষয়ে বাক বিতন্ডা শুরু করছে? আরজ করলাম হ্যাঁ কাফফারাত নিয়ে বিতর্ক করছে আর কাফফারাত হল □ মসজিদে অবস্থান করা নামাযের পর □ পায়ে হেটে জামাতে হাজির হওয়া □ কষ্টের সময় ও পূর্নাঙ্গরূপে অজু করা। যে ইহা করবে কল্যাণের সাথে বাঁচবে এবং কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে তাঁর গুণাহ হতে পাক হয়ে যাবে, সেদিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বললেন হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আরজ করলাম যখন নামায পড়বে এ দোয়া করবে। দোয়াটি ২৪২পৃষ্টায় দেখুন

অর্থঃ হে আল্লাহ। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ভাল কাজ সমূহ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজ সমূহ ত্যাগ করতে। এ দরিদ্রদের ভালবাসতে, হে আল্লাহ যখন তুমি তোমার বান্দাদের ফেৎনা-ফাসাদে ফেলতে ইচ্ছা করবে, তখন আমাকে ফেৎনামুক্ত রেখে তোমার দিকে উঠায়ে নিবে হুযুর আরো বললেন, দরজাত হল সালামের প্রচলন করা। দারিদ্রকে খাদ্য দান করা এবং রাত্রে নামায পড়া, যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন।

হাদীসঃ (৮) হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন রাসালুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম, প্রত্যুষে ফজরের নামাযে আমাদের নিকট হতে অনুপস্থিত ছিলেন, এমনকি সূর্য দৃষ্টি গোচর হওয়ার কাছাকাছি পৌছলাম, তখন হুযুর দ্রুত পদে বের হয়ে আসলেন, নামাযের জন্য তাকবীর বলা হল, রাসুলুল্লাহ নামায পড়ালেন এবং নামাযের কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত করেন। সালাম ফিরায়ে আমাদের স্বশব্দে ডাকলেন এবং বললেন তোমরা সারির যে যেখানে বসে আছো সেখানে বসে থাক। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন কি জিনিষ ভোরে আসতে আমাকে বাঁধা দিয়েছে তা আজ তোমাদের বলবো আমি রাত্রি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়ালাম। অতঃপর অযু করলাম এবং আমার পক্ষে যতটুকু সাধ্য নামায পড়লাম, তখন নামাযের মধ্যেই আমার তন্দ্রা আসল আমি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম, হঠাৎ দেখতে পাই আমি আমার প্রতিপালক কল্যাণময় মহান আল্লাহর কাছে বসেছি আর তিনি অতি মনোরম অবস্থায় আছে, তখন সম্বোধন করলেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমি জবাব করলাম, হে আমার প্রতিপালক, আমি উপস্থিত। আল্লাহ বললেন উর্ধজগতের ফেরেস্তারা কি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছে? আমি জবাব দিলাম, আমি জ্ঞাত নই প্রভু। এভাবে তিনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। (আমিও একই রকম জবাব দিলাম) অতঃপর আমি দেখলাম আল্লাহ তায়ালা তাঁর (কুদরতের) হাত আমার দু কাঁধের মধ্যখানে স্থাপন করলেন এমনকি তাঁর হাতের আঙ্গুলের শীতল স্পর্শ আমার দু কাঁধের মধ্যখানে অর্থাৎ বক্ষে অনুভব করলাম এখন সব জিনিস আমার কাছে আলোকিত হয়ে উঠলো, আমি সবকিছু অবগত হলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমি বললাম আমি উপস্থিত হে প্রভু! কি জিনিষ নিয়ে উর্ধ জগতের ফেরেস্তারা বিতর্ক করছে। আমি জবাব দিলাম গুনাহ সমুহের কাফফারা নিয়ে। তিনি বললেন সে গুলো কি? আমি আরজ করলাম ☐ পায়ে হেটে জামাতে হাজির হওয়া ☐ নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ☐ কষ্টের সময়ও যথাযথভাবে অজু করা। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, আর কি নিয়ে বিতর্ক করছে, আমি জবাব

দিলাম মর্যদা সমূহ নিয়ে। পরিশেষে হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, ইহা সত্য স্বপ্ন। ইহা নিজে শিক্ষা কর অন্যকে জানিয়ে দাও। তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি সহীহ, আমি মুহম্মদ বিন ঈসমাইল বোখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি তিনি বলেন, এ হাদীসটি সহীহ অনুরূপ হাদীস দারমী, তিরমিযী হযরত আবদুর হরমান ইবনে আয়িশ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

হাদীসঃ (১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে মসজিদে গমন করবে এবং মানুষদেরকে নামাযরত অবস্থায় পাবে, তার আল্লাহ তাকেও জামাত আদায়কারীদের অনুরূপ ছওয়াব দেবেন এবং তাদের ছওয়াব থেকে কমও হবে না। হাকেম বলেন, এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে সহীহ।

হাদীসঃ (১১) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ নাসায়ী, হাকেম এবং ইবনে খোযায়মা, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসালুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক উপস্থিত আছে কি? সাহাবীরা আরজ করলেন, না হুযুর! হুযুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক উপস্থিত আছে কি? লোকেরা বললেন জিনা, তখন হুযুর বললেন নিশ্চয়ই ও দুটি নামায (অর্থাৎ ফজর ও এশা) মুনাফিকদের পক্ষে খুবই কঠিন নামায, যদি তোমরা জানতে এ দুই নামাজের কি মাহাত্ম্য রয়েছে তা হলে তোমরা হাটতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই নামাযে হাজির হতে। ইহা জেনে রেখো; নামাযের প্রথম সারি ফেরেস্তাদের সারিতুল্য। যদি তোমরা এর ফজীলত সম্পর্কে জানতে, তাহলে কার আগে কে আসবে চেষ্টা করতে, (আরো জেনে রেখো) কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে একত্রে নামায পড়ত, তার একাকী নামায পড়া থেকে উত্তম। এভাবে নামাযে লোক যতই বেশী হবে ততই তা আল্লাহ তায়ালার কাছে অধিক প্রিয়তর হবে। ইয়াহিয়া বিন মুঈন এবং যুহলী বলেন এ হাদীসটি সহীহ।

হাদীসঃ (১২) সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জামাত সহকারে এশার নামায পড়ল সে যেন অর্ধেক রাত্রি জাগ্রত থাকল। যে জামাত সহকারে ফজরের নামায পড়ল, সে যেন সারা রাত্রি জাগ্রত থাকল। অনুরূপ হাদীস, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খোজায়মা প্রমুখ বর্ণনা করেন।

হাদীসঃ (১৩) বোখারী মুসলীম শরীফে হযরত আবু হুরায়ারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এশা ও ফজরের নামাজ মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে বেশী কষ্টকর। যদি জানতে এতে কি রয়েছে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে। নিশ্চয় আমি সংকল্প করলাম নামায কায়েমের নির্দেশ করবো, অতঃপর কাউকে মানুষের নামায পড়াবার নির্দেশ দিব এবং আমি আমার সহযোগী কিছু লোকদের যাদের কাছে লাকড়ীর বোঝা আছে তাদের নিকট নিয়ে যাব যারা নামাযে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিব, ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, যদি ঘরে মহিলা বা শিশু সন্তান না থাকতো, নামাযে এশা করতাম এবং যুবকদের নির্দেশ দিতাম যেন ঘরে যা কিছু আছে সব জালিয়ে দেয়।

হাদীসঃ (১৪) ইমাম মালেক আবু বকর বিন সোলাইমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মুমেনীন ফারুক আজম (রাঃ)ফজরের নামাযে সুলাইমান বিন আবি হাশমাহ্ (রাঃ)-কে দেখেননি, বাজারে গিয়েছেন রাস্তায় হযরত সোলাইমানের ঘর ছিল। ফারুকে আজম, সোলাইমানের মা শাফা এর কাছে গমন করলেন বললেন ফজরের নামাযে সোলাইমানকে পাইনি। তিনি বললেন রাত্রি নামায পড়েছে অতঃপর নিদ্রা এসে গেছে। বললেন ফজরের নামাজ জামাত সহকারে পড়া এটা আমার কাছে সারা রাত জাগ্রত থাকার চেয়ে উত্তম।

হাদীসঃ (১৫) আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ ইবনে হাব্বান ইবনে আবাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আজান শুনল এবং মসজিদে আসতে কোন ওজর তথা প্রতিবন্ধক নেই, তার এ নামায কবুল হবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ওজর কি বললেন, ভয় বা রোগ। ইবনে আব্বাস ও হাকেমের অপর এক বর্ণনায় আছে যে আজান শুনল, অথচ ওজরমুক্ত হাজির হয়নি তার নামাযই হবে না। হাকেম বলেন ও হাদীসটি সহীহ।

হাদীসঃ (১৬) আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খোজাইমা ইবনে খাব্বান হাকেম, আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন কোন গ্রামে বা জঙ্গলে যেখানে তিনজন রয়েছে নামায কায়েম করেনি শয়তান তাদের উপর বিজয় হলো, তোমরা জামাত অপরিহার্য মনে করো নেকড়ে বাঘ ঐ ছাগলকে ভক্ষণ করবে। যেটা যুথ বা পাল থেকে পৃথক দুরে অবস্থান করছে।

হাদীসঃ (১৭-২০) আবু দাউদ, নাসায়ী, বর্ণনা করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আরজ করলেন এরা রাসুলাল্লাহ। মদীনায় প্রচুর হিংস্র প্রাণী রয়েছে আমি হলাম অন্ধ আমার জন্য কি ঘরে পড়ার অনুমতি আছে। বললেন

حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ শুনতে পাও কি? বললেন,

জামাতে হাজির হও। অনুরূপ হাদীস মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এবং তিবরানী কবীরে, আবু উমামা থেকে আহমদ, আবু য়াআলী এবং তিরানী আওসাতে এবং ইবনে খাব্বান জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

হাদীসঃ (২১) আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফে, হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে হাজির হল। এ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, নামায পড়তেছিলেন বললেন কেউ তাকে সদকা কর (অর্থাৎ তার সাথে নামায পড়লে জামাতের ছাওয়াব পাওয়া যাবে) একজন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) তার সাথে নামায পড়লেন।

হাদীসঃ (২২) ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,দুই বা দুয়ের অধিক দ্বারা জামাত হয়।

হাদীসঃ (২৩) বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যদি লোকেরা জানতো, আজান এবং প্রথম সারিতে কি আছে তারা লটারী চাড়া না পেয়ে লটারী দিয়ে অর্জন করতো।

হাদীসঃ (২৪) ইমাম আহমদ. তিবরানী আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেস্তাগণ (নামাযের) প্রথম সারির উপর সালাত প্রেরণ করেন। অর্থাৎ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সাহাবীরা বললেন, এয়া রাসুলাল্লাহ। হুযুরঃ দ্বিতীয় সারির উপরও? বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তারা নামাযের প্রথম সারির উপর অনুগ্রহ বর্ষন করেন। সাহাবীরা পুনরায় বললেন এয়া রাসুলাল্লাহ। নামাযের দ্বিতীয় সারির উপরও,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন নিশ্চয়ই, আল্লাহ ও ফেরেস্তারা নামাযের প্রথম সারির উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ বললেন তোমরা তোমাদের সারি সোজা করবে, তোমাদের বাহু মুল কে পরস্পর সমান রাখবে। এবং তোমাদের ভাইদের হাতে বাহুমূল কে নরম রাখবে। (অর্থাৎ কেহ ধরে সোজা করতে চাইলে তার আনুগত করবে) এবং তোমাদের মধ্যকার ফাঁক সমূহকে পূর্ণ করে ফেলবে। কেননা শয়তান তোমাদের মধ্যে হার্ফযের মত ঢুকে পড়ে হার্ফয হল ছোট কাল ভেড়ার বাচ্চা।

হাদীসঃ (২৫) হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সারি সমূহ সোজা করতেন, এমনভাবে যেন তীর সোজা করেতেছেন, তিনি এরূপ করতেন যতক্ষণ না তিনি বুঝতে পারতেন যে, আমরা বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছি।

একদা তিনি ঘর হতে বের হয়ে আসলেন, এবং নামাযে দাড়ালেন তাকবীরে তাহরীমা বলবেন এমন সময় দেখলেন এক ব্যক্তি সারি হতে সম্মুখে সীনা বাড়িয়ে দানাল, তখন হুজুর বললেন, আল্লাহর বান্দারা! হয়ত্ তোমরা তোমাদের সারি সোজা করে দাঁড়াবে নত্বা আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহ পার্থক্য করে দেবেন। ইমাম বোখারীও এ হাদীসের শেষাংশ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসঃ (২৬) বোখারী মুসলিম, ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সারি সোজা করবে, সারি সোজা করা নামাযের পূর্ণতা,

হাদীসঃ (২৭) ইমাম মুসলিম আবু দাউদ নাসায়ী.ইবনে মাযাহ্ হযরত জাবের বিন সামুরা (রাঃ) ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ফেরেস্তারা যেরূপ নিজ প্রতিপালকের সম্মুখে সারিবদ্ধ হয় তোমরা কেন সেরকম সারিবদ্ধ হও না? আরজ করলাম, এয়া রাসুলাল্লাহ, ফেরেস্তারা কিভাবে প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয় বললেন আগের কাতার প্রথমে পূর্ণ করেন, এবং সোজা কাতার হয়ে দাঁড়ায়।

হাদীসঃ (২৮) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ , নাসায়ী, ইবনে খোজায়মা, হাকেম, ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সারি মিলাবে আল্লাহ্ তাকে মিলাবেন, যে সারি ছিন্ন করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ছিন্ন করবেন। হাকেম বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তের আলোকে এ হাদীসটি সহীহ।

হাদীসঃ (২৯) ইমাম আহমদ ইবনে খোজায়মা ইবনে হাব্বান, হাকেম, উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন হুযুর সাল্লাল্লাহ্ তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আল্লাহ্ ও তার ফেরেস্তারা তাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। যারা কাতারব ন্দী হন হাকেম বলেন, মুসলিমের শর্তের আলোকে এ হাদীসটি সহীহ।

হাদীসঃ (৩০) ইবনে মাযাহ শরীফে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে ব্যক্তি কাতারের প্রসস্ততা বন্ধ করবে আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা উন্নত করবেন। তিবরানী শরীফের বর্ণনায় এতটুকু এরশাদ হয়েছে যে, তাঁর জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এর বিনিময়ে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

হাদীসঃ (৩১) সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খোজায়মা, বারা বিন আযিব (রাঃ) থেকে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গমন করতেন। এবং আমাদের মুত্তি সিনার উপর হাত রাখতেন, ফিরাতেন বলতেন এলো মেলো দাড়াবে না তোমাদের অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাবে।

হাদীসঃ (৩২-৩৪) তিবরানী ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে আবু দাউদ, বারা বিন আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সে কদমের চেয়ে বড় ছওয়াব কোন কদমের হবে না যে কদম নামাযের সারিতে খোলা জায়গা পূর্ণ করার কাজে চলে, বাজ্জাজ হাসান আবু হুজায়ফা সূত্রে বর্ণনা করেন, যে নামাযের সারির খালি জায়গা বন্ধ করবে তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

হাদীসঃ (৩৫) আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্ হাসান সূত্রে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আল্লাহ্ এবং ফেরেস্তারা নামাযের সারির ডান দিকের নামাযীর উপর রহমত বর্ষণ করেন।

হাদীসঃ (৩৬) তিবরানী কবীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন। যে মসজিদের বাম দিককে এ জন্যে আবাদ করবে, সেদিকে লোক কম, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে।

হাদীসঃ (৩৭) মুসলিম, আবু দাউদ তিরমিযী নাসায়ী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন পুরুষের নামাযের সারি সকল সারির চেয়ে উত্তম সবচেয়ে কম উত্তম পিছনের সারি, মহিলাদের সব সারির মধ্যে পিছনের সারি উত্তম, প্রথম সারি এর চেয়ে কম।

হাদীসঃ (৩৮-৩৯) আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ ইবনে হাব্বান ইবনে খোজায়মা উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাযাহ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সর্বদা প্রথম কাতার হতে মানুষ পিছনে সরতে থাকবে এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে পিছে হটিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

হাদীসঃ (৪০) আবু দাউদ শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রথম সারি পূর্ণ করো, অতঃপর পরবর্তী সারি যদি সামান্য কম হয় পিছনের সারিতে দাড়াবে।

হাদীসঃ (৪১) আবু দাউদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মহিলারা ঘরের দালানে নামায পড়া আঙ্গিনায় পড়া থেকে উত্তম, কামরায় পড়া দালান হতে উত্তম।

হাদীসঃ (৪২) তিরমিযী শরীফে আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীকরীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন প্রত্যেক চক্ষু ব্যাভিচারী (অর্থাৎ যে অপরিচিত বেগানার দিকে দৃষ্টিপাত করে) নিশ্চয়ই মাহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মজলিসে গমন করা এরূপ এরকম অর্থাৎ ব্যাভিচারিনী। আবু দাউদ, নাসায়ী শরীফেও অনুরূপ হাদীস আছে।

হাদীসঃ (৪৩) সহীহ মুসলিম শরীফে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন। তোমাদের জ্ঞানী বিবেকবান লোকেরা আমার নিকবর্তী, অতঃপর তারা যারা তাদের নিকটবর্তী (এরূপ তিনবার বললেন) এবং বাজারের ডাক চিৎকার থেকে বেচে থাক।

জামাতের মাসায়েল

বুদ্ধিমান, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর জামাত ওয়াজিব। ওজর ছাড়া একবার তাগকারীও গুনাহগার এবং শাস্তির যোগ্য। কয়েকবার বর্জনকারী ফাসিক, শাহাদাত ত্যাগকারী তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। প্রতিবেশীরা যদি নীরব থাকে তারাও গুনাহগার হবে। (দুর্রুল মোখতার, গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জুমা ও দুই ঈদে জামাত শর্ত। তারাবী নামযে জামাত সুন্নতে কেফায়া। মহল্লার সকলে ত্যাগ করলে সকলে অন্যায় করল, অপরাধ করল এবং কিছু লোক কায়েম করলে বাকীরা জিম্মা থেকে রহিত হবে। রমজানের বিতরে জামাত মুস্তাহাব নফল এবং রমজান ছাড়া অন্য সময়ের বিতরে যদি ঘোষণা বা আহবানের ভিত্তিতে হয় মাকরূহ। তাদায়ী অর্থ হলো তিনের অধিক মুক্তাদি হওয়া।

সূর্যগ্রহণে জামাত সুন্নত এবং চন্দ্রগ্রহণে ঘোষণার সহিত মাকরূহ। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ জামাতে যুক্ত হওয়া যেন এক রাকাতও বাদ না পড়ে অজুর মধ্যে তিনবার করে অঙ্গ ধৌত করার চেয়ে উত্তম। এবং তিন তিনবার অঙ্গ ধৌত করা প্রথম তাকবীর পাওয়া হতে উত্তম। অর্থাৎ অজুতে তিন তিনবার অঙ্গ ধৌত করতে গিয়ে যদি রাকাত চলে যায় তখন তিন তিনবার ধৌত না করা উত্তম এবং রাকাত যেতে দেবে না। আর যদি দেখা যায় যে, রাকাত পাওয়া যাবে কিন্তু প্রথম তাকবীর পাওয়া যাবে না, তখন তিনবার তিনবার ধৌত করবে। (ছগীরি)

মাসআলাঃ মহল্লার মসজিদ যেখানে ইমাম নিযুক্ত আছে সেখানে আজান ইকামত সহকারে সুন্নত অনুসারে প্রথম বারের ন্যায় দ্বিতীয়বার জামাত কায়েম করা মাকরূহ। আজান ছাড়া যদি দ্বিতীয় জামাত হয় ক্ষতি নেই। যদি মেহরাব থেকে সরে পড়া হয়। যদি প্রথম জামাত আজান ছাড়া হয় বা আজান ধীরে হয়েছে বা অন্য লোকেরা জামাত কায়েম করেছে তখন পুনরায় জামাত কায়েম করা যাবে। এবং এ জামাত দ্বিতীয় জামাত হবে না। প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্য ইমাম মেহরাব থেকে ডানে বামে সরে দাড়ানোটা যথেষ্ট। মহাসড়কের মসজিদে যেখানে মানুষ দলে দলে আসে এবং নামায পড়ে চলে যায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট নামাযী নেই এমন মসজিদে যদিও আজান ইকামত সহকারে দ্বিতীয় জামাত কায়েম করা হয়, কোন ক্ষতি নেই। বরং এটাই উত্তম যে, যে দল আসবে নতুন আজান ইকামত সহকারে জামাত পড়বে। অনুরূপ ষ্টেশন ও সড়ক মসজিদে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যার জামাত চলে যাচ্ছে তার উপর অন্য মসজিদে জামাত অনুসন্ধান করে পড়া ওয়াজিব নয় তবে মুস্তাহাব। অবশ্য যার নিকট মসজিদে হেরেম শরীফের জামাত চলে যায় অন্যস্থান তালাশ করা তার উপর মুস্তাহাবও নয়। (দুর্রুল মোখতার)

জামাত ত্যাগের ওজর সমূহ

মাসআলাঃ রুগ্ন ব্যক্তি, মসজিদ গমনে যার কষ্ট হয়, অপারেশনে যার পা কর্তিত, অর্ধাঙ্গ রোগে যে আক্রান্ত, অধিক বৃদ্ধ যিনি মসজিদ গমনে অক্ষম, অন্ধ ব্যক্তি যদিও অন্ধের জন্য এমন কেউ থাকে যে হাত ধরে মসজিদ পর্যন্ত পৌছায়ে দেবে, বজ্রবৃষ্টিপাত হওয়া, বেশী কাদা অন্তরায় হওয়া, তীব্র ঠাণ্ডা পড়া, অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, মালামাল বা খাদ্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকা, কর্জদাতা পাকড়াও করার আশঙ্কা হলে, অত্যাচারীর ভয় হলে, পায়খানা প্রস্রাবের প্রবল বেগ হলে, খাবার উপস্থিত অন্তরের তীব্র আকর্ষণ খাবারের প্রতি, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার আশঙ্কা হলে, রোগীর সেবাশুশ্রূষায় নিয়োজিত ব্যক্তি সে জানে যে, জামাত পড়তে গেলে রোগীর কষ্ট হবে রোগী ভয় পাবে এসবগুলো জামাত ত্যাগের ওজর। (দুর্রুলমোখতার)

মাসআলাঃ মহিলাদের জন্য কোন নামাযের জামাতে উপস্থিতি জায়েয নেই। দিনের নামায হউক বা রাত্রির নামায হউক, জুমা হউক বা দুই ঈদের নামায হউক, যুবতী হউক বা বৃদ্ধা হউক। অনুরূপ ওয়াজের মসলিসে গমনও জায়েয নেই। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ঘরের সকলেই মহিলা সেখানে পুরুষের ইমামতি জায়েয নেই। হ্যাঁ, মহিলারা যদি তার বংশীয় মুহ্‌রিমা হয় বা স্ত্রী হয় অথবা সেখানে কোন পুরুষও থাকলে নাজায়েয নয়। (দুর্রুল মোখতার)

মুক্তাদি কোথায় দাঁড়াবে

মাসআলাঃ একক মুক্তাদি যদিওবা বালক হয় ইমামের বরাবর ডানদিকে দাঁড়াবে বাম দিকে বা পিছনে দাড়ালে মাকরূহ হবে। মুক্তাদি দু'জন হলে পিছনে দাঁড়াবে ইমামের বরাবর দাড়ালেমাকরূহ তানযীহি। দু'এর অধিক মুক্তাদি হলে ইমামের বরাবর দাড়ানো মাকরূহে তানযীহি। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুক্তাদি দু'জন, একজন পুরুষ, অপর একজন ছেলে, দু'জনই পিছনে দাড়াবে। যদি একক মহিলা মুক্তাদি হয় তখন পিছনে দাড়াবে। মহিলা অধিক হলেও একই হুকুম। মুক্তাদি দু'জন হলে একজন পুরুষ একজন মহিলা পুরুষ ইমামের বরাবর দাড়াবে। মহিলা পিছনে দাড়াবে। পুরুষ দু'জন মহিলা এক জন হলে, পুরুষ ইমামের পিছনে দাড়াবে। মহিলা তার পিছনে দাঁড়াবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ একব্যক্তি ইমামের বরাবর দাড়াল পিছনে সারি রয়েছে এটা মাকরূহ। (দুর্রুল মোখতার)

ইমামের বরাবর দাড়ানো অর্থ এই যে, মুক্তাদির পা ইমামের আগে যেন না হয়। তার পায়ের গীড়া ইমামের গিড়ার আগে যেন না হয়, মাথা আগে পিছে হওয়াটা বিবেচ্য নয়। মুক্তাদি যদি ইমামের বরাবর দাড়ায় মুক্তাদি ইমামের চেয়ে সামান্য লম্বা হওয়ায় সিজদাতে মুক্তাদির মাথা ইমামের মাথার আগে হবে কিন্তু পায়ের গিড়া যদি ইমামের গিড়ার আগে না হয় কোন ক্ষতি নেই এভাবে মুক্তাদির পা যদি বড় হয় আঙ্গুল সমূহ ইমামের আঙ্গুল এগিয়ে গেছে তখনও ক্ষতি নেই। যদি গিড়া আগে না হয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইশারায় নামায পড়লে কদম বরাবর হওয়াটা শর্ত নয় বরং শর্ত হলো মুক্তাদির মাথা যেন ইমামের আগে না হয় যদিও বা মুক্তাদির কদম ইমামের আগে হয়। ইমাম রুকু সিজদা সহকারে পড়ুক বা ইশারায় বসে বা শুয়ে ক্বিবলার দিকে পা বিস্তার করে আর ইমাম যদি বালিশে কাত হয়ে ইশারায় পড়ছে তখন মাথা বরাবর হওয়াটা ক্ষতি নয়। বরং শর্ত হলো মুক্তাদি যেন ইমামের পিছনে কাত হয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুক্তাদি যদি এক পায়ের উপর দাড়ায় তখন বরাবর করার ক্ষেত্রে ঐ পা গণ্য হবে যদি দু'পায়ের উপর দাড়ায় একটি বরাবর আর একটি পিছনে নামায সহীহ্ হবে। একটি বরাবর, আর একটি সামনে, তখন নামায সহীহ না হওয়া উচিৎ। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ একা ব্যক্তি ইমামের বরাবর দাড়াল অতঃপর আর একজন আসল, তখন ইমাম সামনে এগিয়ে যাবে এবং আগুন্তুক মুক্তাদির বরাবর দাঁড়াবে বা মুক্তাদি নিজে পিছনে সরে যাবে। বা আগুন্তুক ব্যক্তি তাকে টেনে নামাবে। তাকবীরের পর হউক বা আগে হউক এসব অবস্থা জায়েয, যা করা যায় করবে। সবগুলো সম্ভবহলে তখন এখ্তিয়ার থাকবে। কিন্তু মুক্তাদি যদি একজন হয় তখন সে পিছনে সরে দাড়ানোটা উত্তম। দু'জন হলে ইমাম আগে এগিয়ে যাওয়াটা উত্তম। মুক্তাদি বলার দরুন যদি ইমাম সামনে এগিয়ে গেল বা মুক্তাদি পিছনে সরে যাওয়াটা যদি এ নিয়্যতে হয় যে, এটা বললে গ্রহণ করবো তখন নামায ফাছেদ হয়ে যাবে। শরীয়তের নির্দেশ পালনার্থে হলে কোন ক্ষতি হবে না। (দর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ পুরুষ ছোট ছেলে, খুনছা এবং মহিলা যদি একত্র হয় তখন নামাযের সারির তারতীব এরূপ করবে যে, প্রথমে পুরুষের সারি, অতঃপর বালকদের, অতঃপর খুনছা অতঃপর মহিলার সারি। বালক একা হলে পুরুষের সারিতে ঢুকে যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ সারি সোজা করে দাড়িয়ে যাবে মধ্যখানে প্রশস্ততা রাখবে না এবং সকলের মুড়ি যেন সমান হয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমামের উচিৎ মধ্যখানে দাড়ানো, ডানে বা বাম দিকে দাড়ানোটা সুন্নতের বিপরীত। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পুরুষের সারি ইমামের কাছাকাছি হওয়া দ্বিতীয়টি থেকে উত্তম। অতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এ নিয়মানুসারে। (আলমগীরি)

মুক্তাদির জন্য উত্তম স্থান হলো ইমামের কাছাকাছি হওয়া এবং উভয় দিকে সমান হওয়া তবে ডান দিকে উত্তম। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আগের সারি উত্তম হওয়াটা জানাযা ছাড়া অন্য নামাযে। জানাযার শেষ সারি উত্তম। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম স্তম্ভের মাঝামাঝি দাড়ানো মাকরূহ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রথম সারিতে জায়গা আছে পিছনের সারি পূর্ণ হয়ে গেল তখন তা ফাক করে খালি স্থানে গিয়ে দাড়াবে। হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে ব্যক্তি সারি প্রশস্ত দেখে তা বন্ধ করবে অবশ্যই তাঁর মাগফেরাত বা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (আলমগীরি) এটা সেখানে করবে যেখানে ফেৎনা ফ্যাসাদের আশঙ্কা না হয়।

মাসয়ালাঃ মসজিদের আঙ্গিনায় জায়গা থাকা সত্ত্বেও দালানের উপর এক্তেদা করা মাকরূহ এরকম সারিতে স্থান রেখে পিছনের সারিতে দাড়ানো নিষিদ্ধ। (দুর্রুল মোখতার)

মহিলার বরাবর দাঁড়ালে পুরুষের নামায ফাছেদ হওয়ার শর্তাবলী

মাসআলাঃ মহিলা পুরুষের বরাবর দাঁড়ালে পুরুষের নামায ভঙ্গ হবে। এর কয়েকটি শর্ত আছে।

(১) মহিলা কাম বাসনা পূর্ন হওয়া অর্থাৎ সহবাসের যোগ্য হওয়া যদি ও বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়। কাম বাসনা পূর্ন হওয়ার জন্য বয়স ধর্তব্য নয় নয় বৎসর হউক এর চেয়ে কম হউক। যদি তার গুপ্তাঙ্গ এর যোগ্য হয়, যোগ্য না হলে, নামায ফাছেদ হবে না, যদি ও বা নামায পড়তে জানে, বৃদ্ধা মহিলা ও এ মাসয়ালায় কাম বাসনা পূর্ণ মহিলার অন্তর্ভূক্ত। যদি স্বামী সাথে থাকে বা মুহরিম যার সাথে বিবাহ হারাম এমন ব্যক্তি থাকে তখন ও নামায ফাসেদ হবে।

(২) কোন বস্তু আঙ্গুল বরাবর মোটা হওয়া, এবং এক হাত পরিমান উচ্চতা অন্তরায় না হওয়া উভয়ের মাঝখানে এতটুকু স্থান খালি না থাকা যেখানে একজন পুরুষ দাড়াতে পারে। মহিলা এতটুকু উচু স্থানে হবেনা যেখানে পুরুষের কোন অঙ্গ তার কোন অঙ্গের সমান হবে।

(৩) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে বরাবর হওয়া জানাযা নামাযে বরাবর হলে নামায ফাসেদ হবে না।

(৪) তাহ্রীমার মধ্যে উভয়ে নামাযে অন্তর্ভুক্ত থাকা অর্থাৎ মহিলা তার এক্তেদা করলো, বা উভয়ে কোন ইমামের এক্তেদা করল, যদি ও বা শুরু থেকে শরীক না হয় তখন যদি উভয়ে নিজে নিজে পড়ে, নামায ফাসেদ হবে না। মাকরূহ হবে।

(৫) নামায আদায়ে উভয়ে সংযুক্ত হওয়া, পুরুষ তার ইমাম হল, বা অন্য কেউ উভয়ের ইমাম হলো, পিছনে যারা আদায় করেছে প্রকৃত বা হুকমান উভয়ে লাহেক মুক্তাদি হলে, ইমাম থেকে পৃথক হওয়ার পর যদিও বা ইমামের পিছনে নেই, কিন্তু হুকমান ইমামের পিছনেই আছে। মসবুক মুক্তাদি হলে, ইমামের পিছনে প্রকৃত ও হুকমান কোনভাবেই নেই বরং সে মুনফারিদ বা পৃথক, মসবুকের সংজ্ঞাঃ (ইমাম এক বা একাধিক রাকাত পড়ার পর যে ব্যক্তি জামাতে শামিল হয় এবং নামায শেষ হওয়ার পর্যন্ত ইমামের সাথে থাকে এবং বাদ পড়া রাকাতগুলো একাকী আদায় করে তাকে মাসবুক বলে)

(৬) উভয়ে একই দিকে মুখ করলে যদি দিক পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন অন্ধকার রাত্রি বুঝা যায় না, একদিকে ইমামের মুখ আর একদিকে মুক্তাদির মুখ, বা ক্বাবা শরীফের দিকে পড়ছে এবং দিক পরিবর্তন হলে নামায হয়ে যাবে।

(৭) মহিলা বুদ্ধিমান বিবেকবান হওয়া, পাগলিনী মহিলার বরাবর হলে নামায ফাসেদ হবে না।

(৮) ইমাম, মহিলার ইমামতির নিয়্যত করেছে যদি ও বা আরম্ভ করার সময় মহিলা শামিল ছিল না, আর যদি মহিলার ইমামতির নিয়্যত না করে থাকে তখন মহিলার নামায ফাসেদ হবে। পুরুষের হবে না।

(৯) এতক্ষন সময় পর্যন্ত বরাবর থাকলে যতক্ষণে একটি পূর্ন রুকন আদায় হবে, অর্থাৎ তিন তাসবীহ পরিমান সময়।

(১০) উভয়ে নামায পড়তে জানলে।

(১১) পুরুষ বিবেকবান ও বালেগ হলে।

(দুররুল মোখতার রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ পুরুষ নামায শুরু করার পর মহিলা এসে বরাবর দাড়াল এবং সে মহিলার ইমামতের নিয়াত ও করল। কিন্তু শামিল হওয়া মাত্র পিছনে সরে পড়ার ইঙ্গিত দিল কিন্তু সরেনি তখন মহিলার নামায ফাসেদ হবে পুরুষের ফাসেদ হবে না। এরকম যদি মুক্তাদির বরাবর দাড়ায় পিছনে সরে যাবার ইঙ্গিত করল সরেনি তখন মহিলার নামায ভঙ্গ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ খুনছা মুশকাল এর বরাবর দাড়ালে নামায ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ পুরুষ, সুন্দর পুরুষের বরাবর দাড়ালে নামায নামায ভঙ্গ হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মুক্তাদির প্রকারভেদ

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি চার প্রকার (১) মুদরিক (২) লাহেক (৩) মসবুক (৪) লাহেকমসবুক

সংজ্ঞাঃ মুদারিক বলা হয় যে, প্রথম রাকাত থেকে তাশাহুদ পর্যন্ত ইমামের সাথে পড়েছে, যদিওবা প্রথম রাকাতে ইমামের সাথে রুকুতে শামিল হয়।

❑ লাহেক বলা হয় সে মুক্তাদিকে যে ইমামের সাথে প্রথম রাকাতে একতেদা করল একতেদার পর তার সম্পূর্ণ রাকাত বা কয়েক রাকাত বাদ পড়ল ওজরের কারণে বাদ যাক যেমন, অলসতা বা ভীড়ের কারণে রুকু সিজদা পায়নি নামাযে তার হাদছ বা অজু ভেঙ্গে গেল। বা মুকীম মুসাফিরের পিছনে একতেদা করল, বা ভয়কালীন নামাযে প্রথম দল যে রাকাত ইমামের সাথে পায়নি হয়তঃ বা ওজর ছাড়া বাদ পড়েছে যেমন ইমামের আগে রুকু সিজদা করে নিল। অতঃপর তা দোহরায়া ও পড়েনি তখন ইমামের দ্বিতীয় রাকাত তার জন্য প্রথম রাকাত হবে এবং তৃতীয় দ্বিতীয় এবং চতুর্থ তৃতীয় এবং শেষে এক রাকাত পড়তে হবে।

❑ মসবুকঃ বলা হয় তাকে, যে ইমাম এক বা একাধিক রাকাত পড়ার পর নামাযে শামিল হল এবং শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে শামিল ছিল।

❑ লাহেকমসবুকঃ বলা হয়, সে মুক্তাদিকে যে, শুরুর কয়েক রাকাত পায়নি, অতঃপর শামিল হওয়ার পর লাহেক হল।

মাসয়ালাঃ লাহেক মুক্তাদি মুদরিকের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত যখন বাদপড়া নামায পড়বে তখন ক্বেরাত পড়বেনা, সাহু সিজদা ও করবেনা। মুসাফির হয়ে থাকলে একামতের নিয়াতের কারণে তার ফরজ পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ দুরাকাতের স্থলে চার রাকাত হবে না। এবং বাদ পড়া নামায প্রথমে পড়ে নেবে, এরকম করা যাবে না যে, ইমামের সাথে পড়ে নেবে অতঃপর ইমামের সমাপ্তির পর আবার নিজে পড়বে। যেমন তার অযু চলে গেল অজু করে এসে ইমামকে শেষ বৈঠকে পেল, তখন এ বৈঠকে শামিল হবে না। বরং যেখান থেকে বাকী ছিল সেখান থেকে পড়া শুরু করবে। এরপর ইমামকে পাওয়া গেলে তখন ইমামের সঙ্গে পড়বে। যদি এরকম না করে ইমামের সাথে হয়ে গেল অতঃপর ইমাম সালাম ফিরানোর পর বাদ পড়া নামায পড়ে নিল, হয়ে যাবে কিন্তু গুনাহগার হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ তৃতীয় রাকাতে নিদ্রা গেল, চতুর্থ রাকাতে জাগ্রত হল, তখন তার হুকুম হলো যে, প্রথমে তৃতীয় রাকাত কেরাত ছাড়া পড়বে, অতঃপর ইমাম কে যদি চতুর্থ রাকাতে পাওয়া যায় ইমামের সাথে হবে। নতুবা চতুর্থ রাকাত ও ক্বেরাত ছাড়া একা পড়বে। এরকম না করলে বরং চতুর্থ রাকাত ইমামের সাথে পড়ে নিল। অতঃপর তৃতীয় রাকাত পড়ল, হয়ে যাবে। তবে গুনাহগার হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসবুকের আহকাম নিম্নোক্ত বিষয়ে লাহেকের বিপরীত। প্রথমে ইমামের সাথে হবে অতঃপর ইমাম সালাম ফিরানোর পর নিজের বাদ পড়া নামায পড়বে এবং বাদ পড়া নামাযে ক্বেরাত পড়বে এবং সহ্ হলে সহ্ সিজদা করবে, এবং ইকামতের নিয়্যতে ফরজ পরিবর্তিত হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাসবুক নিজের বাদ পড়া নামায আদায়ে একাকী, ইমাম উচ্চস্বরে কেরাত পড়ার কারণে প্রথমে ছানা পড়তে পারেনি। বা ইমাম রুকুতে ছিল, ছানা পড়তে গেলে রুকু পাওয়া যাবে না বা ইমাম বৈঠকে ছিল। মূলকথা যে কোন কারণেই হোক পড়তে পারেনি এখন পড়ে নেবে এবং ক্বেরাতের পূর্বে আউজুবিল্লাহ পড়বে। (আলমগীরি রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাসবুক নিজের বাদ পড়া নামায পড়ার পর ইমামের অনুসরণ করল নামায ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাসবুক ইমামকে বৈঠকে পেল, তখন তাকবীর তাহরীমা সোজা হয়ে দাঁড়াবার অবস্থায় করে নেবে। অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর বলে বৈঠকে যাবে। (আলমগীরি)

রুকু সিজদায় পাওয়া ও এরকম করবে। প্রথম তাকবীর বলেই ঝুকে পড়ল এবং রুকুর সীমায় পৌছে গেল এসব অবস্থায় নামায হবে না।

মাসয়ালাঃ মাসবুক ইমাম নামায শেষ করার পর, যদি বাকী নামায শুরু করে, তখন রাকাতের দিক দিয়ে এ রাকাত প্রথম রাকাত সাব্যস্ত হবে। তাশাহুদের ক্ষেত্রে প্রথম হবে না। বরং দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ যেটা গণনায় আসে যেমন, তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে এক রাকাত পেল। তখন তাশাহুদের ক্ষেত্রে এখন যেটা পড়া হচ্ছে সেটা দ্বিতীয় রাকাত। সুতরাং এক রাকাত ফাতেহা ও সুরা সহকারে পড়ার পর বসবে। আর যদি ওয়াজিব তথা ফাতেহা বা সুরা মিলানো ছেড়ে দেয় এবং ইচ্ছাকৃত হয় তখন দোহরায়া পড়া ওয়াজিব। ভুলক্রমে হলে সহসিজদা ওয়াজিব। অতঃপর পরবর্তী রাকাতেও ফাতেহার সাথে সুরা মিলাবে এবং এতে বসবেনা। অতঃপর এর পরবর্তী রাকাতে ফাতেহা পড়ার পর রুকু করবে. এবং তাশাহুদ ইত্যাদি পড়ে নামায শেষ করবে। দু'রাকাত পেল দু'রাকাত পেলনা তখন উভয় রাকাতে ক্বেরাত পড়বে, এক রাকাতে ও ফরজ ক্বেরাত বর্জন করলে নামায হবে না। (দুরুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ চারটি বিষয়ে মসবুক মুক্তাদির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, (১) তাঁর এক্তেদা করা যাবে না, তবে ইমাম তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু খলিফা হবার পর সালাম ফিরাবে না। এর জন্য অন্যজন কে খলিফা বানাবে।

(২) সম্মিলিতভাবে তাকবীরে তাশরীক বলবে।

(৩) যদি নতুনভাবে শুরু থেকে নামায পড়ার এবং পূর্বের নামায বাদ দেয়ার নিয়্যতে তাকবীর বলে তখন নামায বাতিল হবে। একাকী আদায়কারীর বিপরীত, তার নামায বাতিল হবে না। নিজের বাদ পড়া নামায পড়ার জন্য দাড়িয়ে গেল এবং সহ্ সিজদা রয়েছে যদিও বা তার এক্তেদার পূর্বে ওয়াজিব তরক হয়েছিল এবং নিজের রাকাতের সিজদা না করে থাকলে, সিজদায় ফিরে যাবে। আর ফিরে না গেলে শেষে দু'টি সহ্ সিজদা করবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসবুকের উচিত ইমাম সালাম ফিরা মাত্রই তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে না যাওয়া, বরং এতটুকু দেরী করবে যেন জানা যায় যে, ইমামের সহ্ সিজদা নেই। কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ হলে করা যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম সালাম ফিরাবার পূর্বে মাসবুক দাড়িয়ে গেল, ইমামের তাশহুদ পরিমাণ বসার পূর্বে যদি দাড়িয়ে যায় তখন যা ইতোপূর্বে আদায় করেছে তা গন্য হবে না। যেমন ইমামের তাশাহুদ পরিমাণ বসার পূর্বে সে পাঠ সমাপ্ত করেছে এ পাঠ যথেষ্ট হবে না, এবং নামায হয়নি এবং পরে প্রয়োজন পরিমান পড়ে নিলে হবে। ইমাম যদি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর এবং সালামের পূর্বে দাড়িয়ে যায় তখন যে রুকন আদায় হয়েছে তা গন্য হবে তার বিনা প্রয়োজনে সালামের পূর্বে দাড়ানো মাকরূহ তাহরীমি অতঃপর ইমামের সালাম ফিরানোর পূবে যদি বাদ পড়া নামায় আদায় করে দিল। এবং সালামে ইমামের সাথে শরীক হল। তখন ও সহীহ হবে। আবার বৈঠক এবং তাশাহুদে অনুসরণ করলে নামায ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমামের সালামের আগে মসবুক কোন ওজরের কারনে দাড়িয়ে গেল, যেমন সালামের অপেক্ষা করলে হাদছের আশঙ্কা আছে, বা ফজর, জুমা, ঈদাঈনের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে বা মাসবুক মাজুর অপারগ এবং নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার ধারণা করছে বা মৌজার উপর মুছেহ করেছে মুছেহের সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যাবে, এসব অবস্থায় মাকরুহ হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযে ইমামের কোন সিজদা বাদ পড়ল, মসবুকের দাড়িয়ে যাবার পর স্মরণ হল, এক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ মাসবুকের উপর ফরজ। যদি পুনরায় ফিরায়ে না পড়ে তার নামাযই হবে না, এ পর্যায়ে মাসবুক রাকাত পূর্ণ করে সিজদাও করে নিল। তার নামায মুলতঃ হয়নি ইমামের সিজদা সহ ও তিলাওয়াতে সিজদা রয়েছে সে নিজের রাকাতের সিজদা করার পর অনুসরণ করলে ফাসেদ হয়ে যাবে অন্যথায় হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাসবুক ইচ্ছাকৃত ইমামের পিছনে সালাম ফিরাল ধারনা করছে যে, আমাকে ও ইমামের সাথে সালাম ফিরানো উচিৎ, নামায ফাসেদ হবে। ভুলক্রমে সালাম ফিরালে এবং ইমামের সালামের কিছুক্ষণ পর ফিরাল তখন সহু সিজদা অপরিহার্য। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরালে অপরিহার্য নয় (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ভুলে ইমামের সাথে সালাম ফিরাল, ধারণা হল, নামায ফাসেদ হয়ে গেছে নতুনভাবে পড়ার নিয়্যত করে আল্লাহু আকবর বলল, নামায ফাসেদ হয়ে গেল। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমাম ভুল বশতঃ শেষ বৈঠকের পর পঞ্চম রাকাতের জন্য উঠে গেল, মসবুক যদি ইচ্ছাকৃত ইমামের অনুসরণ করে নামায ফাসেদ হবে, ইমামের শেষ বৈঠকে বসেনি, পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করা পর্যন্ত নামায ফাসেদ হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম সহু সিজদা করল, মসবুক তার অনুসরণ করল, অতঃপর জানতে পারল, ইমামের সহু সিজদা ছিলনা, মসবুকের নামায ফাসেদ হয়ে গেল। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দু জন মসবুক একই রাকাতে ইমামের এক্তেদা করল। অতঃপর বাকী নামায যখন নিজে পড়ছে তখন একজনের রাকাতের কথা স্মরণ ছিল না দ্বিতীয় জনকে দেখে দেখে যতটুকু পড়ছে সে ও পড়ছে যদি তার এক্তেদার নিয়্যত না করে হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ লাহেকে মসবুকের হুকুম হলো যে, যত রাকাতে শামিল হয়েছে তা ইমামের তারতীব অনুসারে পড়বে, এবং এতে লাহেকের বিধান জারী হবে। এরপর ইমামের সমাপ্তির পর যে রাকাতে মসবুক যে গুলো পড়বে এবং এগুলোতে মসবুকের বিধান জারী হবে। যেমন, চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাকাত শামিল হল। অতঃপর দু'রাকাতে ঘুম ছিল। তাহলে প্রথমে যে সব রাকাতে নিদ্রিত ছিল সে গুলো ক্বেরাত ছাড়া আদায় করবে। মাত্র এতটুকু সময় দেরী পর্যন্ত চুপ হয়ে দাড়িয়ে থাকবে। যতক্ষন সুরা ফাতেহা পড়তে সময় লাগে। অতঃপর ইমামের সাথে যা পাওয়া যায় তাঁর অনুসরণ করবে। অতঃপর বাদ পড়া নামায ক্বেরাত সহকারে পড়বে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দুই রাকাতে নিদ্রিত ছিল, একরাকাতের ব্যাপারে সন্দেহ তা ইমামের সাথে পড়ছে কিনা? তখন তা নামাযের শেষে পড়বে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ প্রথম বৈঠকে ইমাম তাশহুদ পড়ার পর দাঁড়িয়ে গেল, কিছু মুক্তাদি তাশাহুদ পড়া ভুলে গেল তারা ও ইমামের সাথে দাড়িয়ে গেল, তখন যারা তাশাহুদ পড়েনি, তারা বসে যাবে, তাশাহুদ পড়ে ইমামের অনুসরণ করবে। যদিও বা রাকাত বাদ পড়ে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ রুকু ও সিজদা থেকে ইমামের পূর্বে মুক্তাদি মস্তক উত্তোলন করল, তখন তা ফিরায়ে পড়া ওয়াজিব, এ দু রুকু এবং দু সিজদা হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমাম দীর্ঘ সিজদা করল, মুক্তাদি মাথা তুললো, এবং ধারণাকরল, ইমাম দ্বিতীয় সিজদায়, সেও তার সাথে সিজদা করল প্রথম সিজাদার নিয়্যত করল, বা কোন নিয়্যত করল না বা দ্বিতীয় সিজদার অনুসরণের নিয়্যত করল, তা উত্তম হলো। যদি শুধুমাত্র দ্বিতীয় সিজদার নিয়্যাত করে দ্বিতীয় সিজদা হবে। ইমাম ও সিজদা করেছে এ নিয়্যতে সেও সিজদায় আছে তখন জায়েজ হবে। ইমামের দ্বিতীয় সিজদা করার পূর্বে যদি সে মাথা তুলে নেয় জায়েজ হবে না, এবং এ সিজদা পূনরায় দেয়া তার উপর অপরিহার্য, যদি পুনরায় আদায় না করে নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি সিজদাতে বিলম্ব করেছে এমনকি ইমাম প্রথম সিজদা থেকে মাথা তুলে দ্বিতীয় সিজদায় গেল এখন মুক্তাদি মাথা উঠাল এবং ধারণা করলো যে, ইমাম এখনো প্রথম সিজদায় রয়েছে তখন সিজদা করলে সেটা দ্বিতীয় সিজদা হবে। যদি ও প্রথম সিজদারই নিয়্যাত করেছিল। (আলমগীরি)

মুক্তাদি কখন ইমামের অনুসরণ করবে, কখন করবে না

মাসয়ালাঃ পাঁচটি কাজ ইমাম ত্যাগ করলে মুক্তাদি ও করবেনা, (১) ইমামের সঙ্গে দুই ঈদের তাকবীর সমূহ। (২) প্রথম বৈঠক (৩) তিলাওয়াতে সিজদা (৪) সিজদায়ে সহু (৫) কুনুত যখন রুকু বাদ পড়ার আশঙ্কা হয়, নতুবা কুনুত পড়ে রুকু করবে। (আলমগীরি ছাগিরী) কিন্তু প্রথম বৈঠক করেনি এবং এখনো সোজা হয়ে দাড়ায়নি তখন এমতাবস্থায় মুক্তাদি তা বর্জনে ইমামের অনুসরন করবেনা, বরং তাকে বলবে যেন ফিরে আসে, ফিরে আসলে তো ভাল, যদি সোজা দাড়িয়ে যায় তখন আর বলবেনা বরং নিজে বৈঠক ছেড়ে দেবে এবং দাড়িয়ে যাবে।

মাসয়ালাঃ চারটি কাজ ইমাম করলে মুক্তাদি তার সাথে করবেনা, (১) নামাযে কোন অতিরিক্ত সিজদা করলে। (২) দু ঈদের তাকবীর সমূহে সাহাবীদের উক্তির অতিরিক্ত করলে। (৩) জানাযায় পাঁচটি তাকবীর বললে। ৯৪) পাঁচ রাকাতের জন্য ভুলে দাড়িয়ে গেল এ অবস্থায় শেষ বৈঠক করলে মুক্তাদি তার অপেক্ষা করবে পাঁচ রাকাতের সিজদার পূর্বে যদি ফিরে আসে মুক্তাদি তার সাথে ফিরবে এবং সালাম ফিরাবে এবং তার সাথে সহু সিজদা করবে, আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে মুক্তাদি একা সালাম ফিরাবে, যদি শেষ বৈঠক করেনাই পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নিল তখন সকলের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদিও বা মুক্তাদি তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরায়ে ফেলে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নয়টি কাজ ইমাম যদি না করে মুক্তাদি তার অনুকরণ করবেনা, বরং আদায় করবে। (১) তাকবীর তাহরীমায় হাত উঠানো, (২) ছানা পড়া যখন ইমাম ফাতেহার মধ্যে থাকে এবং ধীরে পড়বে। (৩) রুকু (৪) সিজদার তাকবীর সমূহ (৫) তাছবীহ সমুহ (৬) তাসমী অর্থাৎ রুকুর তাসবীহ (৭) তাশাহদ পড়া (৮) সালাম ফিরানো (৯) তাকবীরে তাশরীক (আলমগীরি, ছগিরী)

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি সব রাকাতে ইমামের পূর্বে রুকু সিজদা করে নিল, তখন পরে ক্বেরাত ছাড়া একরাকাত পড়বে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমামের পূর্বে সিজদা করল , কিন্তু তার মাথা উঠাবার পূর্বে ইমাম ও সিজদায় পৌঁছে গেল, সিজদা হয়ে গেল কিন্তু মুক্তাদি কে এরকম করা হারাম। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমাম এবং মুক্তাদিদের মধ্যে যত বিরোধ হলো মুক্তাদি বলছে তিন রাকাত পড়া হয়েছে ইমাম বলছে চার রাকাত পড়া হয়েছে, তখন ইমামের প্রবল বিশ্বাস হলে পূনরায় পড়তে হবে না। অন্যথায় পড়তে হবে। আর মুক্তাদিদের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ হলে, তখন ইমাম যে পক্ষে থাকবে তাদের কথা গ্রহনীয় হবে। এক ব্যক্তির বিশ্বাস তিন রাকাত হয়েছে, আর একজনের বিশ্বাস চার রাকাত হয়েছে বাকী মুক্তাদিও ইমামের সন্দেহ হয়েছে তখন লোকদের করার কিছু নেই যার কম হওয়ার বিশ্বাস হয় সে পুবরায় পড়বে। ইমামের তিন রাকাতের বিশ্বাস আর এক ব্যক্তির রাকাত পরিপূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস তখন ইমাম ও মুক্তাদি পুণরায় পড়বে। এবং দৃঢ় বিশ্বাসীদের পূনরায় পড়তে হবে না, এক ব্যক্তির বিশ্বাস কম হয়েছে এবং ইমাম ও জামাতের লোকদের সন্দেহ হয়েছে যদি ওয়াক্ত বাকী থাকে পুনরায় পড়বে। অন্যথায় তাদের জিম্মায় কিছু পড়তে হবে না। হ্যাঁ যদি দুজন ন্যায় পরায়ন লোক দৃঢ়তার সাথে বলে তখন সর্বাবস্থায় পূনরায় পড়তে হবে। (আলমগীরি)

---

২২৫ পৃষ্ঠার বাকী অংশ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ
حُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ
اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ

নামাযে অযুহীন হওয়ার বর্ণনা

আবু দাউদ শরীফে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কেউ নামাযে অযুহীন হয়ে পড়ে তখন নাক চেপে ধরবে এবং বের হয়ে যাবে, ইবনে মাযাহ দারে কুতনী বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যার বমি আসে বা নাক দিয়ে রক্ত পড়ে বা মযি, বের হয় তখন বের হয়ে যাবে, এবং অজু করে এর উপর নামাযের ভিত্তি করবে শর্ত হল যেন কথা না বলে অসংখ্য ছাহাবায়ে কেরাম যেমন, ছিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আজম মওলা আলী আবদুল্লাহ বিন আমর সালমান ফারসী এবং তাবেয়ীন কেরাম যেমন, আলকামা, তাউস, সালেম বিন আবদুল্লাহ যায়েদ বিন যুবাইর, শাবী ইবরাহীম নাখয়ী আতা মাকহুল, সাঈদ বিন আলামুসায়্যাব রাদি আল্লাহ তায়ালা আনহুম প্রমুখের একই কথা।

ফকিহী বিধানঃ নামাযে যার অজু চলে যায় যদি ও বা শেষ বৈঠকে তাশাহদের পর সালামের পূর্বে সে অযু করে যতটুকু বাকী আছে সেখান থেকে পড়ে নেবে একে বেনা বা ভিত্তি বলা হয়। কিন্তু শুরু থেকে পড়া উত্তম। একে এস্তেনাফ বলা হয় পুরুষ মহিলা এক্ষেত্রে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

মাসয়ালাঃ যে রুকুনে অযু নষ্ট হয়েছে সে রুকন পুনরায় পড়বে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামায ভিত্তির শর্ত তেরটি, যদি একটি শর্ত ও পাওয়া না যায় ভিত্তি জায়েজ হবে না।

নামায ভিত্তির শর্ত সমূহ

(১) হাদছ অজু ওয়াজিব কারী হওয়া (২) তার অস্তিত্ব দূর্লভ না হওয়া (৩) হাদছ আসমানী হওয়া, অর্থাৎ তা বান্দার ইচ্ছাধীন নয় বান্দার কারণে ও নয়। (৪) হাদছ এর শরীর থেকে হওয়া (৫) হাদছ সহকারে কোন রুকন আদায় না করা (৬) ওজর ছাড়া একটি রুকন আদায় করা পরিমান সময় দাড়িয়ে না থাকা, (৭) চলন্ত অবস্থায় রুকন আদায় না করা।

(৮) নামায পরিপন্থি, যা তার জন্য অনুমোদিত নয় এমন কাজ না করা।

(৯) এমন কোন কাজ করেছে যার অনুমতি রয়েছে তবে বিনা প্রয়োজনে নিষিদ্ধ পরিমান অতিরিক্ত না করা।

(১০) আসমানী হাদসের পর, পূর্বের কোন হাদছ প্রকাশিত না হওয়া।

(১১) হাদছের পর ছাহেবে তারতীবের ক্বাযা স্মরণে না আসা।

(১২) মুক্তাদি হলে ইমাম পৃথক হওয়ার পূর্বে অন্যস্থানে আদায় না করা।

(১৩) ইমাম হলে এমন কাউকে খলিফা না বানানো যে ইমামতির যোগ্য নয়।

(দুররুল মোখতার আলমগীর)

এসব শর্তাবলীর শাখা প্রশাখাঃ

মাসয়ালাঃ নামাযে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে যেমন। মানসিক চিন্তার কারণে বীর্যপাত ঘটল তখন নামাযের ভিত্তি হবে না পবিত্রতার পর শুরু থেকে পড়া অপরিহার্য। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ হাদছ যদি নাদেরুল ওজুদ হয়, যেমন অট্টহাসি, সংজ্ঞাহীন পাগল হলে ভিত্তি করা যাবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ হাদছ যদি আসমানী না হয়, হয়ত মুসল্লীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত নিজে অযু ভেঙ্গে ফেলল (যেমন মুখভরে বমি করল, নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করল, কেটে দিল বা হাটুর মধ্যে ফোঁড়া ছিল। সিজদার সময় হাটুর উপর জোর দেওয়ায় রক্ত প্রবাহিত হল বা অন্য কারো পক্ষ থেকে হউক যেমন কেউ তার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করল, যদ্বারা রক্ত প্রবাহিত হলো কেউ ফোড়া গালিয়ে দিল রক্ত প্রবাহিত হল, বা ছাদ থেকে কেউ তার উপর পাথর ছুটল, রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হল বা কারো চলার কারণে পাথর নিজে পড়ল এসব অবস্থায় শুরু থেকে নামায পড়বে। ভিত্তি করা যাবে না। এরকম বৃক্ষ থেকে ফল পতিত হল, যা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হল, রক্ত প্রবাহিত হল। বা পায়ে কাটা বিদ্ধ হল বা সিজদায় কপালে কাটা বিদ্ধ হল রক্ত বের হলে বা ভীমরুল কামড় দিল রক্ত প্রবাহিত হল তখন নামায পূর্বের উপর ভিত্তি করা যাবে না। শুরু থেকে পড়তে হবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ অনিচ্ছাকৃত মুখভর্তি বমি হল তখন পূর্বের নামাযে ভিত্তি করবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিত্তি করা যাবে না নামাযে নিদ্রা আসল এবং হাদছ সৃষ্টি হল কিছুক্ষণ পর চেতন হলে ভিত্তি করা যাবে। চেতন অবস্থায় বিলম্ব করল, নামায ফাসেদ হবে, হাঁচি দেয়া বা কাঁশি দ্বারা যদি বায়ু বের হয় বা প্রস্রাবের ফোটা বিন্দু বের হলে নামাযের ভিত্তি যাবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কেউ তার শরীরে নাপাক নিক্ষেপ করল, বা যে কোন ভাবে তা কাপড় বা শরীরের এক দেরহাম এর চেয়ে বেশী পরিমবণ স্থান নাপাক হল, তখন তা পাক করার পর ভিত্তি করা যাবে না, আর যদি ঐ কারণে অপবিত্র হয় তখন ভিত্তি করা যাবে, আর যদি বাহির থেকে এবং হাদছ দুর করার দ্বারা অপবিত্র হয় তখন ভিত্তি করা যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কাপড় অপবিত্র হয়ে গেল, অন্য কাপড় মওজুদ থাকলে তাৎক্ষনিক বদলাবে তাৎক্ষনিক পরিবর্তন করলে হয়ে যাবে। পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় কাপড় যদি না থাকে বা ঐ অবস্থায় এক রুকন আদায় করেছে বা স্থগিত করেছে নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ রুকু বা সিজদায় হাদছ হল এবং রুকন আদায়ের নিয়াতে মাথা উঠাল অর্থাৎ রুকু হতে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং সিজদা হতে আল্লাহ আকবর বলে মাথা উঠাল বা অযুর জন্য গমন কালে বা ফিরার সময় ক্বেরাত পড়ল নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, ভিত্তি করা যাবে না। سُبْحٰنَ اللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বললে। নামাযের ভিত্তি করতে ক্ষতি নেই। (আলমগীরি রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ আসমানী হাদসের পর ইচ্ছাকৃত হাদছ করেছে তখন ভিত্তি করা যাবে না। (রদ্দুল মোখতার আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ হাদছ হল, অযু পরিমান পানি মওজুদ আছে, তা ছেড়ে দুর স্থানে পানির জন্য গেল, ভিত্তি করা যাবে না। এরকম হাদছের পর কথা বলল বা পানাহার করল। তখন ভিত্তি করা যাবে না। (আলমগীরি রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ অযুর জন্য কুপ থেকে পানি ভর্তি করে নিয়ে ভিত্তি করা যাবে, বিনা প্রয়োজনে করলে ভিত্তি করা যাবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ অজুর সময় সতর খুলে গেল বা প্রয়োজনে সতর খুললো, যেমন মহিলা অযুর জন্য হাতের কব্জি খুললো নামায ফাসেদ হবে না। বিনা প্রয়োজনে সতর খুললে নামায ফাসেদ হবে। যেমন মহিলা অযুর জন্য এক সাথে উভয় হাতের কব্জি খুলে নিলে তখন নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নিকটে কুপ আছে কিন্তু পানি উঠাতে হয়, উঠানো পানি দুরে রয়েছে তখন পানি তুলে অযু করলে নামায শুরু থেকে পড়বে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামযে অযু ভঙ্গ হল। তার ঘর কুপ অপেক্ষা নিকটে ঘরে পানি মওজুদ আছে তারপরও অযুর জন্য কুপে গেল, কুপ এবং ঘরের মধ্যে যদি দু সারির কম পরিমাণ দুরত্ব হয় নামায ফাসেদ হবে না। বেশী দুরত্ব হলে নামায ফাসেদ হবে। ঘরে পানি থাকাটা স্মরণ ছিল না, অভ্যাস অনুসারে কুপ হতে অযু করলে পূর্বের নামাযে ভিত্তি করা যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ অযু ভঙ্গের পর অযুর জন্য ঘরে গেল দরজা বন্ধ পেল খুলে অযু করল চোরের ভয় হলে ফিরে আসতে বন্ধ করবে, অন্যথায় খোলা রাখবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ অযুর সময় সুন্নত ও মুস্তাহাব সহকারে অযু করবে, যদি তিন তিনবার এর স্থলে চারবার চারবার ধৌত করে তখন শুরু থেকে পড়বে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কুপের যে স্থান অধিক নিকটতম সেখানে অযু করবে, ওজর ছাড়া তা অন্যস্থানে দু কাতারের বেশী পরিমান স্থান সরে করলে নামায ফাসেদ হবে। আর সেখানে ভীড় থাকলে ফাসেদ হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ অযুর সময় মুছেহ ভুলে গেলে যতক্ষন নামাযে দণ্ডায়মান হয়নি গিয়ে মুছেহ করে আসবে, নামাযে দাড়াবার পর স্মরন হলে তখন শুরু থেকে পড়বে। সেখানে যদি কাপড় ভুলে রেখে আসে, গিয়ে উঠায়ে নিলে শুরু থেকে পড়বে।। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদে পানি আছে তাদ্বারা অযু করে এক হাত দিয়ে পাত্র নামাযের স্থানে উঠায়ে নিল তখন নামায ভিত্তি করা যাবে। উভয় হাত দ্বারা উঠানো হলে করা যাবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মোজার উপর মুছেহ ছিল, নামাযে হাদছ হল, অযুর জন্য গমনকালে মুছেহের সময় সীমা শেষ হয়ে গেল। বা তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়ছিল, এরপর হাদছ হল। এবং পানি পেল। বা পাট্রির উপর মুছেহ করছিল হাদছের পর আঘাত সুস্থ হয়ে পাট্রিখুলে গেল। এসব অবস্থায় নামায পূর্বের উপর ভিত্তি করা যাবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ অযুহীন হায়েছে ধারণা করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল, পরে জানতে পারল, অজু যায়নি তখন শুরু থেকে পড়বে এবং মসজিদের বাইরে না আসলে বাকী নামায পড়বে। (হেদায়া) মহিলারা এ ধরনের ধারণা করে মসল্লার থেকে সরে যাওয়া মাত্রই নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ যদি ধারণা করা হয় অযুহীন অবস্থায় নামায শুরু করা হয়েছিল বা মোজার উপর মুছেহ ছিল ধারণা হল সময়সীমা শেষ হয়েছে বা ছাহেবে তারতীব জোহরের নামাযে ছিল ধারণা হল ফজরের নামায পড়েনি বা তায়াম্মুম করেছিল, চড়াতে দৃষ্টি পড়ল এবং তা পানি মনে করল বা কাপড়ের উপর রং দেখে নাপাক মনে করল এসব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়ার ধারণায় সরে পড়ল, পরে জানলো ধারণা ভুল হয়েছে তখন নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ রুকু বা সিজদায় হাদছ হল আদায় করার ইচ্ছা করে যদি মাথা তুলে, নামায বাতিল হয়ে যাবে। এর উপর নামায ভিত্তি করা যাবে না। (দুররুল মোখতার)

খলিফা করার বর্ণনা

মাসয়ালাঃ নামাযে ইমামের হাদছ হলে উপরে বর্ণিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে অন্যজনকে খলিফা মনোনীত করবে। (একে এস্তখেলাপ বলা হয়) যদিও বা এ নামায জানাযা নামায হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাৎ যে স্থানে নামাযের ভিত্তি জায়েজ সেখানে খলিফা নিযুক্তি সহীহ, যেখানে নামাযের ভিত্তি সহীহ নয় সেখানে খলিফা নিযুক্তি ও সহীহ নয়। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি হাদছকারীর ইমাম হতে পারে, সে খলিফা ও হতে পারে, যে ইমাম হতে পারেনা সে খলিফাও হতে পারে না, (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ যখন ইমামের হাদছ বা অযু ভঙ্গ হবে তখন নাক বন্ধ করবে (যেন লোকেরা নাক দিয়া রক্ত পড়া মনে করে) পিট ঝুকায়ে পিছনে সরবে এবং ইংগিতে কাউকে খলিফা নিযুক্ত করবে। খলিফা নিযুক্ত কালে কথা বলবেনা। (আলমগীরি রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ময়দানে নামায চলছে যতক্ষন কাতার হতে বের হলনা খলিফা বানাতে পারবে মসজিদে হলে যতক্ষন মসজিদ থেকে বের হয়নি ততক্ষন খলিফা বানাতে পারে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদের বাহির পর্যন্ত সমানভাবে সারি রয়েছে ইমাম মসজিদের কাউকে খলিফা বানাল না বরং বাহিরের একজন কে খলিফা বানাল, এ খলিফা নিযুক্তি সঠিক হয়নি, মুক্তাদি ও ইমাম সকলের নামায ফাসেদ হল, সামনে এগিয়ে গেলে যতক্ষন পর্যন্ত খলিফা নিযুক্ত করা যায় ততক্ষন সুতরা বা সিজদার স্থান অতিক্রম না করবে। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ঘর বা ছোট ঈদগাহ মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বড় মসজিদ, বড় বড় স্থান বা বড় ঈদগাহ ময়দানের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম কাউকে খলিফা করল না বরং মুক্তাদিরা বানিয়ে দিল বা নিজেই ইমামের স্থানে ইমামতের নিয়্যাত করে দাড়িয়ে গেল, তখন সে ইমামের খলিফা হয়ে যাবে। নিছক ইমামের স্থানে চলে গেলে ইমাম হবেনা যতক্ষন ইমামতের নিয়্যত না করে। (রদ্দুল মোখাতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদ ও ময়দানে খলিফা বানানোর যে সীমা নির্ধারিত হয়েছে এখনো তা অতিক্রম হয়নি। না নিজে কাউকে খলিফা নিযুক্ত করেছে না জামাতের লোকেরা কাউকে নিযুক্ত করেছে তখন ইমামের ইমামতি কায়েম থাকবে এমনকি এ সময় ও কেউ যদি তার এক্তেদা করে, হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসবুক কে খলিফা না বানানো ইমামের জন্য উত্তম। বরং অন্য কাউকে, এবং যে ইমাম, মুসবুককে খলিফা বানাবে তার উচিৎ কবুল না করা। কবুল করে নিলে হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমামের হাদচ হল। পিছনের সারি থেকে কাউকে খলিফা করে মসজিদের বাহির চলে গেল, খলিফা যদি তাৎক্ষনিক ইমামতের নিয়্যত করে ফেলে যত মুক্তাদি খলিফার আগে আছে সকলের নামায ফাসেদ হবে। এ সারির যারা ডানে বামে আছে বা এ সারির পিছনে যারা রয়েছে তাদের এবং প্রথম ইমামের নামায ফাসেদ হয়নি। যদি খলিফা এ নিয়্যত করে যে ইমামের স্থানে পৌছার পর ইমাম হয়ে যাব, এবং ইমামের স্থানে পৌছার পূর্বে ইমাম বের হয়ে গেল তখন সকলের নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসবুককে খলিফা নিযুক্ত করেই নিল, তখন ইমাম যেখানে শেষ করেছে মসবুক সেখান থেকেই শুরু করবে। মসবুকের কি জানা আছে কতটুকু বাকী রয়েছে বিধায় ইমাম তাকে ইশারায় বলে দেবে, যেমন এক রাকাত বাকী থাকলে এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। দুরাকাত হলে দু আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। রুকু করতে হলে হাটুর উপর হাত রেখে ইশারা করবে, সিজদার জন্য কপালের উপর ক্বেরাতের জন্য মুখের উপর, তিলাওয়াতে সিজদার জন্য কপাল ও মুখের উপর সহ সিজদার জন্য সিনার উপর রাখবে। মুসবুকের জানা হলে ইশারার কোন প্রয়োজন নেই। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে এক ব্যক্তি এক্তেদা করল, অতঃপর ইমামের হাদছ হল, তাকে খলিফা বানাল তার জানা নেই যে, ইমাম কতটুকু পড়েছে কতটুকু বাকী আছে, তখন চার রাকাত পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে বৈঠক করবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসবুককে খলিফা করল, তখন ইমামের নামাজ পূর্ন করার পর সালাম ফিরানোর জন্য কোন মুদরিক কে সামনে এগিয়ে দেবে তিনিই সালাম ফিরাবেন, (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ চার বা তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাযে ঐ মসবুককে খলিফা করল যে দু রাকাত পায়নি তখন এ খলিফার উপর দুটি বৈঠক ফরজ (১) ইমামের শেষ বৈঠক, (২) আর একটি তার নিজের বৈঠক, যদি ইমাম ইশারা দিয়ে থাকে যে, প্রথম রাকাত সমূহে ক্বেরাত পড়েনি চার রাকাত বিশিষ্ট নামযের প্রতি রাকাতে তার উপর ক্বেরাত ফরজ, (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসবুক ইমামের নামায পূর্ন করার পর অট্রহাসি দিল বা ইচ্ছাকৃত হাদছ করল, বা কথা বলল, বা মসজিদের বাহির হল, তখন তার নামায ফাসেদ হবে মুক্তাদির নামায ফাসেদ হবে না। প্রথম ইমাম যদি নামাযের আরকান সমাপ্ত করে তাও হয়ে গেল, অন্যথায় হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ লাহেক মুক্তাদিকে খলিফা নিযুক্ত করল, তখন এর হুকুম হলো, যে, জামাতের দিকে ইশারা করবে, প্রত্যেক মুক্তাদি আপন অবস্থায় থাকবে, এমনকি যা তার জিম্মায় আছে তা পূর্ণ করে ইমামের নামায পরিপূর্ণ করবে যদি প্রথমে ইমামের নামায পূর্ণ করে দেয়, যখন সালামের সময় আসবে সালাম ফিরানোর জন্য কাউকে খলিফা বানাবে, এবং নিজের গুলো পূর্ণ করবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমাম একজনকে খলিফা বানাল সে অন্য একজনকে খলিফা বানাল, ইমাম মসজিদ থেকে বের হওয়া এবং খলিফা ইমামের স্থানে পৌছার পূর্বে এটা হয়ে থাকলে জায়েজ নতুবা জায়েজ নয়। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ এক নামাযরত অবস্থায় অযু বিনষ্ট হল, এখনো মসজিদ থেকে বর হয়নি, কেউ তার এক্তেদা করল, তখন মুক্তাদি খলিফা হয়ে গেল, (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মুসাফিররা মুসাফিরের এক্তেদা করল, ইমামের অযু নষ্ট হল, সে মুকীম কে খলিফা করল, মুসাফিরদের উপর চার রাকাত পূর্ণ করা অপরিহার্য নয়। খলিফার উচিৎ কোন মুসাফিরকে সামনে বাড়িয়ে দেয়া, সে সালাম ফিরাবে, মুক্তাদিদের মধ্যে মুকীম আরো থাকলে তখন তারা দু'রাকাত ক্বেরাত ছাড়া পড়বে, এখন যদি এ খলিফার এক্তেদা করা হয় সকলের নামায বাতিল হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম পাগল হয়ে গেল, বা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল বা অট্রহাসি দিল, বা কোন গোসল ওয়াজিব কারী কারণ পাওয়া গেল, যেমন নিদ্রাগেল এবং স্বপ্নদোষ হল, বা চিন্তা করার বা কামবাসনার সাথে দৃষ্টিপাত করায় বা স্পর্শ করায় বীর্য নির্গত হল, এসব অবস্থায় নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। শুরু থেকে পড়তে হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি প্রবলভাবে পায়খানা প্রস্রাবের বেগ আসে নামায পূর্ণ করতে পারছেনা, খলিফা নিযুক্তি জায়েজ নেই। এরকম পেটে তীব্র ব্যাথা হলে এমনকি দাড়াতে পারছেনা, বসে পড়ছে তখন খলিফা নিযুক্তি জায়েজ আছে, (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ লজ্জা বা ভীতির কারণে যদি ক্বেরাত পাঠে অক্ষম হলে তখন খলিফা নিযুক্তি জায়েজ নেই সম্পূর্ণ ভুলে গেলে তো না জায়েজ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমামের হাদছ হল, অন্য কাউকে খলিফা বানাল খলিফা এখনো নামায পূর্ণ করেনি ইমাম অযু শেষ করল, তখন তার উপর ফিরে আসা ওয়াজিব অর্থাৎ এতটুকু নিকট হবে, যেন এক্তেদা করা যায়, খলিফা পূর্ণ আদায় করলে, তার ইখতিয়ার থাকবে, হয়তঃ পূর্ণ করবে বা এক্তেদার স্থানে চলে আসবে। এরকম একাকী আদায় কারীর ইখতিয়ার আছে মুক্তাদির হাদছ হলে ফিরে আসা ওয়াজিব। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযে ইমামের ইন্তেকাল হলে, যদিও বা শেষ বৈঠকে হয়, তখন মুক্তাদিদের নামায বাতিল হয়ে যাবে। শুরু থেকে পড়া অপরিহার্য। (রদ্দুল মোখতার)

নামাজ ভঙ্গ কারী বিষয়ের বর্ণনা

সহীহ মুসলিম শরীফে মুয়াবিয়া বিন হিকম থেকে বর্ণিত হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন নামাযে মানুষেরা কোন কথা বলা ঠিক নয়। ঠিক তো নয় কিন্তু তাসবীহ, তাকবীর, ক্বেরাত কুরআন পড়বে। সহীহ বোখারী, সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর নামাযে ছিলেন, আমরা হুযুরকে সালাম করতাম এবং হুযুর জবাব দিতেন যখন আমরা নাজ্জাশীর সেখান থেকে ফিরে আসলাম। সালাম আরজ করলাম, জবাব দিলেন না, আরজ করলাম এয়া রসুলাল্লাহ! আমরা সালাম করতাম হুযুর জবাব দিতেন (এখন আমাদের জবাব মিলছে না) বললেন, নামাযের ব্যস্ততা, আবু দাউদের বর্ণনায় আছে যে বললেন আল্লাহ নিজের নির্দেশ যা ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং যা প্রকাশ করেছেন তা হলো এই যে, তোমরা নামাযে কথা বলবে না।

এরপর সালামের জবাব দিলেন, এবং বললেন, নামাযে ক্বেরাত কুরআন এবং আল্লাহর জিকরের জন্য, তোমরা যখন নামাযে থাকবে, তোমাদের অবস্থা এরকম হওয়া উচিৎ। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দুটি কালো বস্তু সর্প এবং বিচ্ছু নামযে হত্যা করো।

ফকিহী বিধানঃ

কথা বললে নামায ভঙ্গ হবে, ইচ্ছাকৃত হউক বা ভুলক্রমে হোক নিদ্রায় হউক বা জাগ্রত অবস্থায় হউক, স্বয়ং সন্তুষ্ট চিত্তে কথা বলল, বা কেউ কথা বলতে বাধ্য করল তার জানা নাই যে, কথা বললে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, (দুরুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কথা কম হউক বেশী হউক, পার্থক্য নেই, নামায সংশোধন করার জন্য কথা বলুক বা অন্য কারণে যেমন ইমামের বসা উচিৎ ছিল দাড়িয়ে গেল, মুক্তাদি বসে যাওয়ার জন্য বলে দিল নামায ফাসেদ হবে। (দুররুল মোখতার আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইচ্ছাকৃত কথা বললে নামায তখন ফাসেদ হবে যখন তাশাহুদ পরিমান না বসবে। আর যদি বসে থাকে নামায হয়ে যাবে, অবশ্য মাকরূহ তাহরীমা হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ঐ কথা নামায ভঙ্গকারী যেকথা এতটুকু উচ্চ আওয়াজে হয় যেন কম পক্ষে নিজে শুনতে পারে যদি কোন প্রতিবন্ধক না হয়, আর যদি আওয়াজ এতটুকু উচ্চ না হয় বরং শুধু হরফ সহীহ বা শুদ্ধভাবে বুঝা গেল। নামায ফাসেদ হবেনা। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামায পরিপূর্ণ হওয়ার পুর্বে ভুলক্রমে সালাম ফিরাল তাতে ক্ষতি নেই ইচ্ছাকৃত হলে নামায ফাসেদ হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কাউকে ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে সালাম করলে নামায ফাসেদ হবে। যদিওবা ভুল বশতঃ আস্‌সালাম বলেছে স্মরণ হল যে সালাম করা উচিৎ ছিলনা এবং চুপ থাকল। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসবুককে ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হবে মনে করে সালাম ফিরালে, নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসবুক ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হবে মনে করে সালাম ফিরাল, নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ এশার নামাযে তারাবীহ্ মনে করে দুরাকাতে সালাম ফিরাল বা জোহরকে জুমা ধারণা করে দুরাকাতে সালাম ফিরাল বা মুকীম নিজকে মুসাফির মনে করে দু রাকাতে সালাম ফিরাল নামায ফাসেদ হবে, তার উপর ভিত্তি ও জায়েজ হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ দ্বিতীয় রাকাত কে চতুর্থ রাকাত মনে করে সালাম ফিরাল পুনরায় স্মরণ হলো, নামায পূর্ন করে সহ্ সিজদা করবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মুখে সালামের উত্তর দিলে নামায ভঙ্গ হবে, হাতের ইশারায় দিলে মাকরূহ হবে। সালামের নিয়্যাতে করমর্দন করলে ও নামায ভঙ্গ হবে। (দুররুল মোখতার আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মুসল্লীর নিকট কিছু চাইলে বা কোন কথা জিজ্ঞেস করলে সে মাথা বা হাত দ্বারা ইশারায় হ্যাঁ বা না বললে নামায ফাসেদ হবে না। অবশ্য মাকরূহ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কারো হাঁচি আসলে নামাযী তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰه বললে নামায ফাসেদ হবে। আর যদি নিজের হাঁচি আসে এবং নিজকে সম্বোধিত করে يَرْحَمُكَ اللّٰه বলল, নামায ফাসেদ হবেনা। অন্য কারো হাঁচি আসলে মুসল্লী اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললে নামায ফাসেদ হবে না। জবাবের নিয়্যাতে বললে নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযে হাঁচি আসল, অন্য কেউ يَرْحَمُكَ اللّٰه বলল তার জবাবে আমিন বললে নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে, আলহামদুলিল্লাহ বলে ফেললে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না, আর যদি এ সময় হামদ না করে, নামায শেষে হামদ বলবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ আনন্দের সংবাদ শুনে জবাবে আলহামদু লিল্লাহ বললে নামায ফাসেদ হবে, আর যদি জবাবের নিয়্যাতে না বলে বরং নামাযে রয়েছে তা প্রকাশের জন্য করলে ফাসেদ হবে না। অনুরূপভাবে কোন আশ্চর্যজনক বস্তু দেখে জবাবের উদ্দেশ্য سُبْحَانَ اللّٰه لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বা-আল্লাহুআকবর বললে নামায ফাসেদ হবে, অন্যথায় নয়। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কেউ আসার অনুমতি চাইলে। তিনি যে নামাযে রয়েছে তা প্রকাশের জন্য জোরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বা اَللّٰهُ اَكْبَرُ বা سُبْحَانَ اللّٰه পড়ল, নামার্য ফাসেদ হবেনা।(গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ খারাপ সংবাদ শুনে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলল। বা কুরআনের শব্দ দ্বারা কাউকে জবাব দিল। নামায ফাসেদ হবে, যেমন কেউ জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ ছাড়া কি দ্বিতীয় কোন আল্লাহ আছে? জবাব দিল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বা জিজ্ঞেস করল, তোমার কিকি মাল আছে? জবাব দিল اَلْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيْرُ বা জিজ্ঞেস করল, কোথা হতে এসেছো বলল, وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ এভাবে কাউকে কুরআনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন করল, যেমন তার নাম ইয়াহিয়া, তাকে বলল, يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ মুসা নাম তাকে বলল وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى নামায ফাসেদ হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ আল্লাহর নাম শুনে جَلَّ جَلَالُهٗ বলল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শুনে দরুদ শরীফ পড়ল, বা ইমামের ক্বেরাত শুনে صَدَقَ اللّٰهُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهٗ বলল। এসব অবস্থায় নামায ফাসেদ হবে। যদি জবাবের উদ্দেশ্য বলে থাকে আর যদি জবাবে না বলে ক্ষতি নেই এভাবে যদি আজানের জবাব দেয়, নামায ফাসেদ হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ শয়তানের আলোচনা শুনে তার উপর অভিসম্পাৎ দিল, নামায ফাসেদ হবে। ওয়াসওয়াসা বা কুপ্ররোচনা প্রতি রোধে لَاحَوْلَ পড়ল যদি পার্থিব বিষয়ে হয় নামায ফাসেদ হবে। যদি পরকালীন বিষয়ে হয় ফাসেদ হবেনা।

মাসয়ালাঃ চন্দ্র দেখে رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ বলল, বা জ্বর ইত্যাদির কারণে কুরআনের কিছু পড়ে দম (ফুক)দিল নামায ফাসেদ হবে, রুগ্ন ব্যক্তি উঠা বসার কষ্ট এবং ব্যাথা বেদনায় বিসমিল্লাহ বললে নামায ফাসেদ হবেনা (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কোন ছত্র লাইন কবিতার সুরে কুরআনে ধারাবাহিক পাওয়া গেলে তা কবিতার নিয়্যতে পড়লে, নামায ফাসেদ হবে। যেমন,

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا

আর যদি নামাযে কবির্তার সুর করল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না যদিও বা নামায ফাসেদ না হয় গুনাহগার হবে, (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযে মুখে হ্যাঁ বা ওহে শব্দ জারী হল, যদি এ শব্দ বলতে অভ্যস্ত হয় নামায ফাসেদ হবে। অন্যথায় নয়। (দুর্রুল মোকতার)

লোকমা দেওয়ার বর্ণনা

মাসয়ালাঃ মুসল্লী নিজ ইমাম ছাড়া অন্যজনকে লোকমা দিল নামায ফাসেদ হবে। যাকে লোকমা দেয়া হল সে নামাযে হোক বা না হউক মুক্তাদি হউক বা একাকী আদায়কারী হউক বা অন্যকারো ইমাম হউক (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি লোকমার নিয়্যতে না বলে বরং তিলাওয়াতের নিয়্যতে পড়ল ক্ষতি নেই। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নিজের মুক্তাদি ছাড়া অন্যের লোকমা গ্রহন করাও নামায ভঙ্গের কারণ। অবশ্য সে বলার সময় যদি নিজের স্মরণ হয়, তার বলার কারণে নয় অর্থাৎ সে না বললেও তার স্মরণ হতো, তার বলার কোন অধিকার নেই আর তার বলে দেয়াটা পড়লে নামায ফাসেদ হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নিজের ইমামকে লোকমা দেয়া এবং ইমাম কর্তৃক লোকমা গ্রহণ করা নামায ভঙ্গের কারণ নয়। হ্যাঁ মুক্তাদি যদি অন্য কারো থেকে শুনে যে ব্যক্তি নামাযে শামিল নয় লোকমা দিল এবং ইমাম তা গ্রহণ করল। তখন সকলের নামায ফাসেদ হবে আর যদি ইমাম লোকমা গ্রহন না করে শুধু মুক্তাদির নামায ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ লোকমা দানকারী ক্বেরাতের নিয়্যত করবেনা বরং লোকমা দেয়ার নিয়্যতে শব্দ বলবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ তৎক্ষণাৎ লোকমা দেয়া মাকরূহ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিৎ যেন ইমাম স্বয়ং বের করবে, কিন্তু যদি তার অভ্যাস এর নিকট জানা থাকে যে বারণ করলে এমন কিছু শব্দ বের হয়ে আসবে যা নামায ভঙ্গকারী তখন তাৎক্ষনিক বলবে, এভাবে ইমামের জন্য মাকরূহ, মুক্তাদিকে লোকমা দেয়ার জন্য বাধ্য করা বরং অন্য কোন সুরার দিকে ফিরে যাবে, বা অন্য আয়াত শুরু করবে। কিন্তু শর্ত হলো সুরার মিল যেন নামায ভঙ্গের কারণ না হয়। প্রয়োজন পরিমান পড়ে থাকলে রুকুতে চলে যাবে। বাধ্য করা অর্থ হলো, বারবার পড়া বা চুপ করে দাড়িয়ে থাকা। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার) কিন্তু ভূল যদি এরকম হয় যে, যার মধ্যে অর্থের বিকৃতি হয় তখন নামায শুদ্ধের জন্য সুরা পুনরায় পড়া উচিৎ। স্মরণ না হলে মুক্তাদিকে বাধ্য করবে তারা ও বলতে না পারলে নামায ফাসেদ হবে।

মাসয়ালাঃ লোকমা দেয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়, অপ্রাপ্ত বয়স্করা ও লোকমা দিতে পারে (আলমগীরি) তবে শর্ত হলো নামায জানতে হবে এবং নামাযে উপস্থিত হতে হবে।

মাসয়ালাঃ এমন দোয়া যার আবেদন বান্দার নিকট করা যায়না জায়েজ আছে যেমন, اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ যেসব আবেদন বান্দার নিকট করা যায় তা নামাজ ভঙ্গকারী যেমন اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنِیْ اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِیْ (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ আহ্, উহ্, উফ, তফ্ এসব বেদনা দায়ক শব্দ দুঃখের কারণে বের হলে বা শব্দ করে কাঁদতেছে এসব অবস্থায় নামায ফাসেদ হবে। ক্রন্দনে যদি শুধু অশ্রু বের হয় শব্দ না হয় তখন ক্ষতি নেই (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ রোগীর মুখ থেকে যদি অনিচ্ছাকৃত আহ্ শব্দ বা উহ্ শব্দ বের হয় নামায ফাসেদ হবে না,অনুরূপভাবে হাঁচি কাশি, কফ, ডেকুর এর সময় যত শব্দ অনিচ্ছাবশতঃ বের হয় তা মার্জনীয়। (দুরুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ বেহেস্ত, দোজখের স্মরণে যদি এসব শব্দ বলে নামায ফাসেদ হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমামের পড়া পছন্দ হলে এবং ক্রন্দন করলে এবং "আরে" হ্যাঁ মুখে বের করলে কোন ক্ষতি নেই। তবে এটা যদি বিনয়ের কারণে হয়। যদি গলার সুন্দর স্বরের কারণে হয় তখন নামায ফাছেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ফুঁক এর মধ্যে শব্দ সৃষ্টি না হয় তখন সেটা হল নিশ্বাসের মত নামায ভঙ্গকারী। কিন্তু ইচ্ছাকৃত করা মাকরূহ। আর যদি দুটি হরফ সৃষ্টি হয়, যেমন উফ, তফ, তখন নামায ভঙ্গ হবে। (গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ গলা পরিস্কার করার সময় যখন দুটি শব্দ প্রকাশ পায় নামায ভঙ্গ হবে যদি ওজর ছাড়া হয়, বা কোন সঠিক উদ্দেশ্যে, না হয়, যদি ওজরের কারনে হয় যেমন স্বভাবের চাহিদা বা কোন সঠিক উদ্দেশ্যের জন্য যেমন আওয়াজ পরিস্কার করার জন্য বা ইমামের ভূল হয়ে গেল এ জন্য গলা হাকড়াচ্ছে যেন ঠিক করে নেয়। বা এজন্য গলা হাকড়াচ্ছে যেন অন্য ব্যক্তি তাকে নামাযে হওয়া সম্পর্কে জানতে পারে এসব অবস্থায় নামায ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়লে নামায ভঙ্গ হবে। এভাবে মেহরাবের উপরে লিখিত বিষয় লেখা পড়লে ও নামায ভঙ্গ হবে। হ্যাঁ যদি নিজের হেফজ থেকে পড়ছে কুরআনে বা মেহরাবে শুধু মাত্র দৃষ্টি রয়েছে তখন কোন ক্ষতি নেই। (দুর্রুল মোখতার রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন কাগজে কুরআন শরীফ লিখিত আছে,তা দেখছে এবং বুঝছে নামাযে ক্ষতি হবে না, অনুরূপভাবে ফিকহর কিতাব দেখলে এবং বুঝলে নামায ফাসেদ হবে না। বুঝার জন্য তা দেখুক বা অন্য কারনে যদি ইচ্ছাকৃত দেখে এবং ইচ্ছাকৃত বুঝে তখন মাকরূহ, অনিচ্ছাকৃত হলে মাকরূহ হবে না। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ একই হুকুম প্রত্যেক লিখিত বিষয়ের। আর যদি ধর্মীয় না হয় আরো বেশী মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ শুধুমাত্র তাওরীত ও ইঞ্জিল থেকে নামাযে পড়ছে, নামায হবে না কুরআন পড়তে জানুক বা না জানুক (আলমগীরি) আর যদি প্রয়োজন পরিমাণ কুআন শরীফ পড়ল তাওরীত ও ইঞ্জিলের কিছু আয়াত পড়ল, যে গুলোতে আল্লাহর জিকর রয়েছে তখন ক্ষতি নেই তবে এরূপ করা সমীচীন নয়।

মাসয়ালাঃ আমলে কছীর যা নামাযের আমলের অন্তভূক্ত নয় নামাযের সংশোধনের জন্য ও করা হয়নি নামায ফাসেদ হবে। আমলে কলিল নামায ভঙ্গকারী নহে। যে কর্মসম্পাদন কারীকে দূর থেকে দেখে তাকে নামাযে না থাকার সন্দেহ না হয় বরং প্রবল ধারণ হলো যে, নামাযে নেই তখন আমল কছীর। দূর থেকে প্রত্যাক্ষকারীর যদি সন্দেহ হয় নামাযে আছে কিনা? তখন আমলে কলিল (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযরত জামা বা পায়জামা পরিধান করল বা লুঙ্গি পরিধান করল নামায ফাসেদ হবে। (গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ অপবিত্র স্থানে পর্দাবিহীন সিজদা করল, নামায ফাসেদ হবে। যদিও বা এ সিজদা পবিত্র স্থানে পূনরায় আদায় করে (দুর্রুল মোখতার) অনুরূপভাবে হাটু বা হাত সিজদায় অপবিত্র স্থানে রাখল নামায ফাসেদ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সতর খোলা রেখে বা নিষিদ্ধ পরিমাণ নাপাকী সাথে রেখে পূর্ণ রুকন আদায় করা বা তিন তাসবীহর সময় অতিক্রম করা নামায ভঙ্গকারী, এভাবে ভীড়ের কারণে দীর্ঘক্ষণ মহিলার সারিতে পড়ে গেল বা ইমামের আগে হয়ে গেল, নামায ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার) ইচ্ছাকৃত সতর খোলা নামায ভঙ্গকারী, যদি ও বা সাথে সাথে ঢেকে নেয়। এতে বিরতির ও প্রয়োজন নেই।

মাসয়ালাঃ দুটি কাপড় একসাথে যুক্ত করে সিলাইকৃত এর বহিঃ পরিচ্ছেদ নাপাক এবং অন্তঃপরিচ্ছেদ পাক তখন বহিঃপরিচ্ছদেও নামায হবে না, যদি নিষিদ্ধ পরিমাণ নাপাক সিজদার স্থানে হয় এবং সিলাইকৃত না হলে তখন বহিঃপরিচ্ছেদের উপর জায়েজ, যদি এতটুকু পাতলা না হয় যে বহিঃ পরিচ্ছেদ চমৎকার দেখা যাচ্ছে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ না পাক ভূমির উপর চুনা মাটি ভালভাবে বিছায়ে দিল এর উপর নামায পড়া যাবে। আর যদি সামান্য পরিমান মাটি ছিটিয়ে দেয় যাদ্বারা নাপাকের দুর্গন্ধ আসছে তখন নাজায়েজ, যখন সিজদার স্থানে নাপাক হয়। (গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ নামাযের মধ্যে পানাহার করলে সাধারণতঃ নামায ফাসেদ হবে, ইচ্ছাকৃত হউক ভুল বশতঃ হোক, কম হোক, বেশী হোক, এমন কি তিল পরিমান বস্তু চিবানো ছাড়া, বের করে নিল। বা তৈলবীজের কোন ফোটা তার মখে পতিত হল, এবং নিজে বের করে নিল, নামায ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দাঁতের ফাঁকে খাদ্য দ্রব্যের কোন বস্তু রয়ে গেল, তা বের করবে যদি চনা পরিমান চেয়ে কম হয় নামায ফাসেদ হবে না। মাকরূহ হবে। চনার সমান হলে ফাসেদ হবে, দাঁত হতে রক্ত বের হলো, যদি থুথু প্রবল হয়, বের হলে নামায ফাসেদ হবে না অন্যথায় ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার , আলমগীরি) প্রবল হওয়ার চিহ্ন হল, গলায় রক্তের স্বাদ অনুভূত হওয়া, নামায ভঙ্গের ব্যাপারে স্বাদ ধর্তব্য। অযু ভঙ্গের ব্যাপারে রং দেখা ধর্তব্য

মাসয়ালাঃ নামাযের পূর্বে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ভক্ষণ করল, তার অংশ বিশেষ বের করে নিল, শুধুমাত্র মুখের লালার মধ্যে কিছু মিষ্টির প্রভাব রয়েছে, তা বের করলে নামায ফাসেদ হবে না। মুখে চিনি জাতীয় কিছু থাকলে তা গিলে কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করলে নামায ফাসেদ হবে। আটা গঁদ মুখে ছিল চিবায়ে কিছু অংশ কণ্ঠনালীর ভিতর প্রবেশ করল, নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ সিনাকে কি্বলার দিক হতে ফিরালে, নামায ফাসেদ হবে। যদি কোন ওজর না থাকে, অর্থাৎ এতটুকু ফিরালো যে, সিনা ক্বাবার নিদ্দিষ্ট দিক থেকে পয়তাল্লিশ ভাগ সরে গেল, ওজরের কারণে হলে নামায ফাসেদ হবে না। যেমন অযু হীন মনে হল এবং মুখ ফিরানোই ছিল, ধারণা ভূল হওয়াটা প্রকাশ হল, তখন মসজিদ থেকে বের হয়ে- না থাকলে নামায ফাসেদ হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কি্বলার দিকে এক কাতার পরিমান চলল, অতঃপর এক রুকন পরিমান দাঁড়াল, অতঃপর চলল, আবার দাড়াল, যদি ও অনেক বার হয় যতক্ষণ স্থান পরিবর্তন না করবে নামায ফাসেদ হবে না। যেমন মসজিদ থেকে বের হল, বা ময়দানে নামায চলছিল এবং এ ব্যক্তি কাতার সমূহ অতিক্রম করল। উভয় অবস্থা স্থান পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত। এতে নামায ফাসেদ হবে। এভাবে সম্পূর্ণরূপে দু'কাতার পরিমান চলল, নামায ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ উম্মুক্ত ময়দানে, যদি এর আগে কাতার না থাকে বরং তিনি ইমাম, এবং সিজদার স্থান অতিক্রম করল, যদি এতটুকু আগে বাড়ে যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত এবং সবচেয়ে নিকটের কাতারের মাঝখানে দুরত্ব থাকে তখন ফাসেদ হবে না। এর অতিরিক্ত সরে গেলে তখন ফাসেদ হবে। আর যদি একাকী নামায আদায়কারী হয়, তখন সিজদার স্থান গন্য হবে, অর্থাৎ সামনে পিছনে, ডানে, বামে এতটুকু দুরত্ব থাকতে পারে, এর চেয়ে বেশী সরে গেলে নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কাউকে চতুস্পদজন্তু একেবারে তিন কদম পরিমান টেনে নিল বা সিং মারল নামায ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এক নামায হতে অন্য নামাযের দিকে তাকবীর বলে পরিবির্তন হল, প্রথমের নামায ফাসেদ হবে। যেমন, জোহরের নামায পড়ছিল, আছর বা নফলের নিয়্যত করে আল্লাহ আকবর বলল, জোহরের নামায ফাসেদ হবে। যদি ছাহেবে তারতীব হয়। (অর্থাৎ যার জিম্মায় ছয় ওয়াক্ত থেকে কম ক্বাযা রয়েছে তাকে ছাহেবে

তারতীব বলে।) এবং ওয়াক্তের সুযোগ থাকে তখন আছরের ও হবে না বরং উভয় অবস্থায় নফল হবে, নতুবা আছরের নিয়্যাত করলে আসর এবং নফলের নিয়্যত করলে নফল। একা নামায পড়ছে একেদার নিয়্যাতে আল্লাহ্ আকবর বলল, বা মুক্তাদি ছিল একা পড়ার নিয়্যাতে আল্লাহ্ আকবর বলল, নামায ফাসেদ হবে। এভাবে, জানাযার নামায পড়ছিল দ্বিতীয় জানাযা আনা হল, উভয় জানাযার নিয়্যতে আল্লাহ্ আকবর বলল, বা দ্বিতীয়টি নিয়্যতে, তখন দ্বিতীয় জানাযার নামায শুদ্ধ হবে প্রথমটির ফাসেদ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মহিলা নামায পড়ছে, ছোটবাচ্চা তার দুধের বাট চুষছে যদি দুধ রেব হয় নামায ফাসেদ হবে।

মাসয়ালাঃ মহিলা নামাযে আছে, পুরুষ চুম্বন করল বা কামভাবের সাথে হাত দ্বারা শরীর স্পর্শ করল, নামায ফাসেদ হবে। পুরুষ নামাযে ছিল, মহিলা এরূপ করলে, নামায ফাসেদ হবে না, যতক্ষণ পুরুষের কামভাব না হয়। (দুর্রুল মোখতার. রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দাঁড়ী বা মাথায় তেল লাগালে, বা আচড়ালে বা সুরমা লাগালে নামায ফাসেদ হবে। হ্যাঁ যদি হাতে তৈল ছিল তা মাথা বা শরীরের কোন স্থানে লাগলে নামায ফাসেদ হবে না। (গুনিয়া মুনিয়া)

মাসয়ালাঃ কোন মানুষকে নামাযরত অবস্থায় থাপ্পড় দিলে বা বেত্রাঘাত করলে নামায ফাসেদ হবে। জন্তুর উপর আরোহী অবস্থায় নামায পড়ছিল দুই একবার হাত বা পায়ের গোড়ালী দ্বারা হাকালে নামায ফাসেদ হবে না।। পর্যায়ক্রমে তিনবার করলে নামায ফাসেদ হবে। এক পায়ের গোড়ালী লাগাল, এভাবে পর্যায়ক্রমে তিনবার হলে নামায ফাসেদ হবে। অন্যথায় হবে না। উভয় পা দ্বারা হাকালে ফাসেদ হবে, কিন্তু পা যদি ধীরে লাগায় যা দ্বিতীয় জন গভীরভাবে দেখলে বুঝতে পারবে। তখন নামায ফাসেদ হবে না। (গুনিয়া, মুনিয়া)

মাসয়ালাঃ ঘোড়াকে চাবুক দ্বারা রাস্তা দেখাল, এবং প্রহারও করল, নামায ফাসেদ হবে। নামাযরত অবস্থায় ঘোড়ার উপর সওয়ার হল, নামায ফাসেদ হবে। আর বাহনের উপর নামায পড়ছিল, এমতাবস্থায় অবতরণ করলে নামায ফাসেদ হবে না। (মুনিয়া ক্বাযীখান)

মাসয়ালাঃ তিনটি শব্দ এমনভাবে লিখা, যার হরফ গুলো স্পষ্ট হলে নামায ফাসেদ হবে। আর যদি হরফ স্পষ্ট না হয়, যেমন পানির উপর বা বাতাসের উপর লিখল, তা মূল্যহীন নামায মাকরূহ তাহরীমা হবে। (গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ নামায আদায়কারীকে উঠায়ে নিল, অতঃপর ওখানে রেখে দিল, যদি ক্বিবলা হতে সিনা ফিরে না যায় নামায ফাসেদ হবে না।, আর যদি তাকে উঠায়ে বাহনের উপর রাখল, নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মৃত্যু হলে, পাগল ও সংজ্ঞাহীন হলে নামায ফাসেদ হবে। ওয়াক্তের মধ্যে যদি সংজ্ঞা ফিরে আসে, আদায় করবে। অন্যথায় ক্বাযা করবে। শর্ত হলো একদিন একরাত যেন অতিক্রম না করে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইচ্ছাকৃত অযু ভাঙ্গল বা গোসল ওয়াজিবকারী কোন কারণ পাওয়া গেল, বা কোন রুকন ছেড়ে দিল, এ নামাযের মধ্যে তা আদায় করে না নিলে বা ওজর ছাড়া শর্ত ছেড়ে দিল, বা মুক্তাদি ইমামের পূর্বে রুকন আদায় করে নিল, ইমামের সাথে বা পরে তা পুনরায় আদয় করল না, এমনকি ইমাম সালাম ফিরায়ে নিল বা মসবুক বাদ পড়া রাকাতের সিজদা করে ইমামের সহ সিজদার অনুকরণ করল, বা শেষ বৈঠকের পর নামাযের সিজদা, বা তিলাওয়াতে সিজদার কথা স্মরণ হল, তা আদায় করার পর পুনরায় বৈঠক করল না বা কোন রুকন শুয়ে আদায় করেছে তা পুনরায় আদায় করলনা, এসব অবস্থায় নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি, গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ সাপ, বিচ্ছু মারলে নামায ভঙ্গ হবে না যতক্ষন না তিন কদম চলতে হয় এবং তিনবার মারার প্রয়োজন হয়, অন্যথায় নামায ভঙ্গ হবে। কিন্তু মারার অনুমতি আছে। যদিওবা নামায ফাসেদ হয়। (আলমগীরি গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ নামায়ে সাপ, বিচ্ছু মারা তখন মুবাহ্, যখন সামনে দিয়ে অতিক্রম করে এবং কামড় দেয়ার ভয় হয়, আর যদি কষ্ট দেয়ার আশঙ্কা না হয়, তখন মাকরূহ। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ পরস্পর তিনটি চুল উপড়ে ফেললে, বা তিনটি জোঁক মারলে বা একটি জোঁক তিনবার মারলে নামায ফাসেদ হবে। পরপর না হলে নামায ফাসেদ হবেনা, কিন্তু মাকরূহ হবে। (আলমগীরি, গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ মোজা প্রশস্ত তা খুলে ফেললে নামায ফাসেদ হবে না এবং মোজা পরিধান করলে নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ঘোড়ার মুখে লেগাম দিল, বা তার উপর কটি প্রবিষ্ট করল, বা ,কটি নামিয়ে নিল, নামায ফাসেদ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ একটি রুকুনে তিনবার চুলকান হলে নামায ফাসেদ হবে। অর্থাৎ চুলকানোর পর হাত সরিয়ে নিল। পুনরায় চুলকাল, আবার হাত উঠালো এভাবে করতে লাগলো, আর যদি একবার হাত রেখে কয়েকবার নাড়াচড়া করে তখন একবার চুলকান ধরা হবে। (আলমগীরি, গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ রুকন পরিবর্তনের তাকবীর সমূহে 'আল্লাহ্' এর আলিফকে টেনে পড়ল, বা আকবর এর বা এর পর আলিফ বৃদ্ধি করল আকবার বলল, নামায ফাসেদ হবে, তাকবীরে তাহরীমাতে যদি এরকম করা হয় তাহলে নামায শুরুই হলো না। (দুর্রুল মোখতার ও অন্যান্য
23 কিতাব) ক্বেরাত বা দু'আ সমূহে যদি এমন কোন ভুল হয়, যদ্বারা অর্থের বিকৃতি ঘটে, নামায ভঙ্গ হবে। এসম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

নামাযীর আগে গমন করা নিষিদ্ধতা

মাসয়ালাঃ নামাযীর সামনে দিয়ে গমণ করা বা সিজদার স্থান দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে নামায ফাসেদ হবেনা। গমণকারী পুরুষ হোক, মহিলা হোক, কুকুর হোক, বা গাঁধা হোক।

মাসয়ালাঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম শক্ত গুনাহ। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে যে, এর মধ্যে কতবেশী গুনাহ্ তা যদি গমনকারী জানত তখন অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকাটা উত্তম মনে করতো। বর্ণানাকারী বলেন, আমি জানিনা যে, কি চল্লিশ দিন বলেছেন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বৎসর। ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যদি কেউ জানতো যে, নিজের ভাইয়ের নামাযের সামনে অতিক্রম করার মধ্যে কি আছে তখন এক কদম চলা থেকে একশত বৎসর দাঁড়িয়ে থাকাটা উত্তম মনে করতো। ইমাম মালেক (রাঃ) বলেন যে, ক্বাব আখবার বলেন যে, নামাযীর সামনে অতিক্রমকারী যদি জানতো এর মধ্যে কি গুনাহ্ রয়েছে, তখন জমীনে ধ্বসে যাওয়াটা অতিক্রম করার চেয়ে ভাল মনে করতো, ইমাম মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমি রাসুল রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় দেখেছি, হুযুর 'আবতহ' নামক স্থানে চামড়ার একটি লাল গম্বুজের ভিতর তশরীফ রেখেছেন, হযরত বেলাল (রাঃ) হুজুরের জন্য অযুর পানি আনলেন , লোকেরা দ্রুতভাবে তা সংগ্রহ্ করছে যারা সেখান থেকে যা পাচ্ছে তা তারা নিজেদের মুখে এবং সিনায় মালিশ করছে, যারা পেলনা তারা অন্যদের হাত হতে তরলতা গ্রহন করছে। অতঃপর বেলাল (রাঃ) একটি বর্শা গেড়ে দিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক জোড়া লালবর্ণের জুতো পরিধান করে তাশরীফ আনলেন, এবং বর্শার দিকে মুখ করে দু রাকাত নামায পড়ালেন, আমি, মানুষ ও চতুস্পদ জন্তুদের বর্শার দিক দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেছি।

মাসয়ালাঃ ময়দান বা বড় মসজিদে মুসল্লীর পা থেকে সিজদার স্থান পর্যন্ত অতিক্রম করা নাজায়েজ। সিজদার স্থানের অর্থ হলো, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেবে, যতদুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেটা সিজদার স্থান। তার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করা জায়েজ নহে।

ঘর বা ছোট মসজিদে কদম থেকে ক্বেবলার প্রাচীর পর্যন্ত কোথাও অতিক্রম করা জায়েজ নেই, যদি সুত্রা না থাকে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি উচুস্থানে নামায পড়ছে, তার নীচ দিয়ে অতিক্রম করা জায়েজ নেই। যদি অতিক্রমকারীর কোন অঙ্গ নামাযীর সামনে পড়ে, ছাঁদ বা তক্তার উপর নামায আদায় কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করাও একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদি ওসব বস্তু এতটুকু উচু হয় যে, কোন অঙ্গ সামনে পড়বে না, তখন ক্ষতি নেই। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযীর সামনে ঘোড়া ইত্যাদির উপর আরোহন করে অতিক্রম করল, যদি অতিক্রমকারীর পা ইত্যাদি শরীরের নিচু অংশ নামাযীর মাথার সামনে হয়, তখন নিষিদ্ধ। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযীর সামনে সুত্রা থাকবে। অর্থাৎ এমন কোন বস্তু, যদ্বারা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়, সুতরাং বাহির দিয়ে অতিক্রম করলে ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ সুত্রাহ্ এক হাত পরিমাণ উঁচু হবে। এবং আঙ্গুল বরাবর মোটা হবে এবং বেশীর মধ্যে তিন হাত উঁচু হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম বা একা আদায়কারী যখন ময়দানে বা এমন কোন স্থানে নামায পড়ে যেখান দিয়ে লোকদের অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে, তখন সুত্রা গেড়ে দেয়া মুস্তাহাব। এবং সুত্রা নিকটে হওয়া উচিত। পূর্ণ সুত্রা নাকের সোজা হবেনা। বরং ডানে বা বামের ভ্রূর যেন সোজা হয়। ডানদিকে স্থাপন করাটা উত্তম। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সুত্রা স্থাপন করা যদি অসম্ভব হয় সুত্রার জিনিষগুলো লম্বা করে রাখবে, রাখার জন্য কোন জিনিষ যদি না থাকে, তখন রেখা টানবে, দৈর্ঘ্যতে হোক বা মেহরাবের মত হোক। (দুর্রুল মোখতার , আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ সুত্রার জন্য কোন জিনিষ যদি না থাকে, তার নিকট যদি কিতাব বা কাপড় মওজুদ থাকে তা সামনে রাখবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমামের সুত্রাই মুক্তাদির সুত্রা তার জন্য নতুনভাবে সুত্রার প্রয়োজন নেই। ছোট মসজিদে যদি মুক্তাদির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যায় ইমামের আগে, না হলে ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ বৃক্ষ, জন্তু, মানুষ ইত্যাদিও সুত্রা করা যায়, এর বাহির দিয়ে অতিক্রমে ক্ষতি নেই (গুনিয়া) কিন্তু মানুষকে এমন অবস্থায় সুত্রা করা যাবে যখন তার পিট নামাযীর দিকে হয়, নামাযীর দিকে মুখ করা নিষিদ্ধ।

মাসয়ালাঃ বাহন যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তখন তার জন্য কৌশল হল, বাহনকে মুসল্লা করবে এবং এদিক দিয়ে অতিক্রম করবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ দু'ব্যক্তি সমান সমানভাবে ইমামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করল, তখন যে, নামাযের স্থানের নিকটতম সে গুনাহগার হবে এবং দ্বিতীয়জনের জন্য ইহাই সুত্রা হয়ে গেল। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তখন তার সামনে যদি সুত্রার যোগ্য কোন বস্তু থাকে, তা তার সামনে রেখে অতিক্রম করবে। অতঃপর তা উঠায়ে নেবে। যদি দুব্যক্তি অতিক্রম করে চায় তাদের কাছে সুত্রার কোন কিছু নেই, তখন তাদের একজন নামাযীর সামনে তার দিকে পিট করে দাড়াবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার আড়াল ধরে অতিক্রম করবে, অতঃপর অন্যজন তার পিটের পিছনে নামাযীর মেরুদন্ড বরাবর দাঁড়াবে, এবং এ ব্যক্তি অতিক্রম করবে অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি যেখান থেকে সে সময় এসেছে, সেদিকে সরে যাবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি তার সাথে লাঠি থাকে, কিন্তু স্থাপন করা যায় না তখন তা খাড়া করে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েজ। যদি তা হাত থেকে ছুটে পড়ে যাবার পূর্বে অতিক্রম করা যায়।

মাসয়ালাঃ সামনের কাতারে জায়গা ছিল, তা খালি রেখে পিছনে দাঁড়াল, তখন আগমনকারী ব্যক্তি তার গর্দান লাফায়ে যাবে। সে নিজের সম্মান নিজে ক্ষুন্ন করেছে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি কেউ গমনাগমন বা যাতায়াতের আশঙ্কা না হয় এবং সামনে রাস্তাও নেই তখন সুত্‌রা স্থাপন না করলেও ক্ষতি নেই। তবুও স্থাপন করা উত্তম। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযীর সামনে সুত্‌রা নেই, কোন ব্যক্তি অতিক্রম করতে চাচ্ছে অথবা সুত্‌রা আছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি মুসল্লী এবং সুত্‌রার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তখন নামাযীর অনুমতি আছে সে অতিক্রমকারীকে প্রতিরোধ করবে। "সুবহানাল্লাহ্ বলে হোক বা উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়ে হোক বা হাত ও মাথা অথবা চক্ষু দ্বারা ইশারায় নিষেধ করবে। এর অতিরিক্ত করার অনুমতি নেই। যেমন কাপড় ধরে হেচড়ানো বা প্রহার করা বরং যদি আমলে কছির হয় নামায ফাসেদ হবে। (রদ্দুল মোখতার, দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ তাসবীহ ও ইশারা দুটি বিনা প্রয়োজনে একত্র করা মাকরূহ। মহিলার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তাসফীক দ্বারা নিষেধ করবে। অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুল সমূহ বাম হাতের পিটের উপর মারবে। আর যদি পুরুষ তাসফীক করে এবং মহিলা তাসবীহ বলে তখনও ফাসেদ হবে না। কিন্তু সুন্নতের বিপরীত হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদে হেরেম শরীফে নামায পড়ছে তার সামনে তাওয়াফরত লোকেরা অতিক্রম করতে পারবে। (রদ্দুল মোখতার)

নামাযের মাকরূহ সমূহের বর্ণনা

হাদীস (১) বোখারী, মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে কোমরের উপর হাত রাখতে নিষেধ করেছেন।

হাদীস (২) শরহে সুন্নাহ্ হাদীস গ্রন্থে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, নামাযে কোমরের উপর হাত রাখা জাহান্নামীদের প্রশান্তি।

হাদীস (৩) বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ নাসায়ী বর্ণন করেন, উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) এরশাদ করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে, নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, এরশাদ করলেন এটা হচ্ছে লাফ দেয়া। বান্দার নামাযের মধ্যে শয়তান লাফ দিয়ে দেয়।

হাদীস (৪) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খোজায়মা, হাকেম, সহীহ সূত্রে আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে বান্দা নামাযে রয়েছে, মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত তাঁর দিকে নিবদ্ধ হয়। যতক্ষন না এদিক সেদিক দেখবে, যখন সে মুখ ফিরাবে তার অনুগ্রহও ফিরে যাবে।

হাদীস (৫) ইমাম আহমদ, হাসান সূত্রে আবু ইয়ালা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার বন্ধু খলীল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন (১) মোরগের ন্যায় চিৎকার করতে (২) কুকুরের ন্যায় বসতে (৩) শৃগালের ন্যায় এদিক সেদিক দেখতে।

হাদীস (৬) বাজ্জাজ, জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন মানুষ নামাযে দন্ডায়মান হয়, মহান আল্লাহ স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহ সহকারে তার দিকে মনোনিবেশ করেন, যখন এদিক সেদিক দেখেন তখন বলেন, হে আদম সন্তান, কোন্ দিকে থাকাচ্ছ! আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কি আছে যে দিকে তুমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার দেখেন অনুরূপ বলেন। অতঃপর যখন তৃতীয়বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহকে তার থেকে ফিরায়ে নেন।

হাদীস (৭) তিরমিযী, হাসন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আনস বিন মালিক (রাঃ) কে বললেন, হে বৎস! নামাযে এদিক সেদিক দেখা হতে বেছে থাক। নামাযে এদিক সেদিক দেখা ধ্বংশের কারণ।

হাদীস (৮-১২) বোখারী, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ, শরীফে হযরত আনস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কি হয়েছে সে সব লোকের; যারা নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করে, তা থেকে বিরত থাকবে। এতে তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হবে। একই বিষয়ের অনুরূপ হাদীস ইবনে ওমর আবু হুরায়রা, আবু সাইদ খুদরী, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) প্রমুখের হাদীসের কিতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস (১৩) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ, ইবনে খাব্বান ও ইবনে খোজায়মা প্রমুখ বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দাড়াবে, কঙ্কর স্পর্শ করবে না, রহমত তার মধ্যভাগে আছে।

হাদীস (১৪) সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে, মোআইকিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, কঙ্কর স্পর্শ করো না, যদি নিরূপায় হয়ে সরাতে হয়, তাহলে একবার।

হাদীস (১৫) সহীহ ইবনে খোজায়মা গন্থে, হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুজুরের নিকট নামাযে কঙ্কর স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, বললেন, একবার। যদি এর থেকেও বাচতে পার তাহলে কালো চক্ষু বিশিষ্ট একশত উষ্ট্রী দান করা থেকেও উত্তম।

হাদীস (১৬-১৭) মুসলিম শরীফে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন নামাযে কারো হাইতোলা আসে যতদুর সম্ভব প্রতিরোধ করবে। এতে শয়তান মুখে প্রবশে করে। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নামায়ে কারো হাইতোলা, আসে যতদুর সম্ভব প্রতিরোধ করবে। 'বা' শব্দ করবেনা এটা শয়তানের পক্ষ থেকে, এতে শয়তানের হাসি হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ তার থেকে বর্ণনা করেন, এর পর বলেন, মুখের উপর হাত রাখবে।

হাদীস (১৮-১৯) ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, দারমী প্রমুখ বর্ণনা করেন ক্বাব বিন আযরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যখন কেউ উত্তমরূপে অযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হবে তখন এক হাতের আঙ্গুল সমূহ দ্বিতীয় হাতে প্রবিষ্ট করবে না, সে নামাযে রয়েছে। অনুরূপ হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস (২০) সহীহ বোখারী শরীফে, শকীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হুজায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তি কে দেখলেন, যিনি রুকু সিজদা পূর্ণরূপে করেনি, নামায শেষে তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমার নামায হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে, এটাও বলেছেন যে, যদি তোমার মৃত্যু হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বীন ছাড়া অন্যের উপর হবে।

হাদীস (২১-২৪) খালিদ বিন ওলীদ, আমর বিন আস, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান ও শুরহাবিল বিন হাসানাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি কে নামায পড়তে দেখেন, যে ব্যক্তি রুকু পূর্ণরূপে করেনি, সিজদায় টুকর মারছে মাত্র, নির্দেশ দিলেন,রুকু পূর্ণ করো, এবং বললেন এ অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের উপর মৃত্যু হবে না। অতঃপর বললেন, যে ব্যাক্তি রুকু পূর্ণভাবে করেনা। সিজদায় টুকর মারে, তার দৃষ্টান্ত সে ক্ষুধার্তের ন্যায়, যে একটি দুটি খেজুর ভক্ষন করেছে যা তার ক্ষুধা মিটাবেনা কোন কাজে আসেনি।

হাদীস (২৫) আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, সবচেয়ে বড় চোর সে, যে নিজ নামাযে চুরি করে, সাহাবীরা আরজ করেন, এয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে কিরূপে চুরি করে-? বললেন, রুকু, সিজদা পূর্ণ করেনা।

হাদীস (২৬) নোমান বিন মররা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শাস্তির বিধান অবতীর্ন হওয়ার পুর্বে ছাহাবায়ে কেরামকে বললেন, মদ্যপায়ী ব্যাভীচারী এবং চোর সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? সকলে আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুল অধিক জানেন, হুযুর বললেন এসব অত্যন্ত মন্দকাজ এবং এর শাস্তি রয়েছে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সে যে স্বীয় নামাযে চুরি করে, আরজ করলেন এয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাজ কিভাবে চুরি করে? বললেন রুকু সিজদা পূর্ণভাবে আদায় না করা। অনুরূপ দারমী ও বর্ণনা করেন।

হাদীস (২৭) তলক বিন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার সে নামাযের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না যে নামাযে রুকু সিজদার মাঝখানে পিট সোজা করা না হয়।

হাদীস (২৮) হযরত আনস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর যুগে দরজায় দাঁড়ানো হতে বেচে থাকতাম। অপর বর্ণনায় রয়েছে, আমরা ধাক্কা দিয়ে দরজা সরিয়ে দিতাম।

হাদীস (২৯) হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমাদের 'আফলাহ' নামক একজন ক্রীতদাস যখন সিজদা করতো, মাটিতে ফুক দিতো, বললেন, হে 'আফলাহ' নিজ মুখমন্ডল মাটিতে মর্দন করে নাও।

হাদীস (৩০) আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমরা নামাযে হবে আঙ্গুল সমুহ মটকাবেনা, বরং এক বর্ণনায় আছে, যখন মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় থাকবে, তখন সে সময় আঙ্গুল সমূহ মটকানো নিষেধ করেছেন।

হাদীস (৩১) সিহাহ সিত্তাহ শরীফে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করি, এবং চুল বা কাপড় যেন ভাঁজ না করি।

হাদীস (৩২) বোখারী, মুসলিম শরীফে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করি, মুখ, দু হাত, দু হাটু, দু পাঞ্জা এবং আদিষ্ট হয়েছি, যেন কাপড় বা চুল ভাঁজ না করি।

হাদীস (৩৩) হযরত আবদুর রহমান বিন শিবল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'কাকের' ন্যায় ঠুকর মারতে এবং পাখির ন্যায় পা বিছাতে নিষেধ করেছেন এবং মসজিদে কোন ব্যক্তি জায়গা নির্ধারণ করে নেয়াকে নিষেধ করেছেন, যেহেতু উটই জায়গা নির্ধারন করে রাখে।

হাদীস (৩৪) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, হে আলী! আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তা-তোমার জন্যও পছন্দ করি, যা অপছন্দ করি তা তোমার জন্যও অপছন্দ করি। দু'সিজদার মাঝখানে "একআ" করবেনা, (অর্থাৎ এভাবে বসবে না যে, নিতম্ব জমীনে থাকবে হাটু খাড়া থাকবে)।

হাদীস (৩৫) হযরত বোরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পুরুষরা যেন শুধুমাত্র পায়জামা পরিধান করে, চাদর না জড়িয়ে নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন।

হাদীস (৩৬) বোখারী মুসলিম, শরীফে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ সর্বদা এক কাপড় দিয়ে এভাবে নামায পড়বেনা। যে, জামার কাঁধের উপর কিছু থাকবেনা।

হাদীস (৩৭) সহীহ বোখারী শরীফে, উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যে এক কাপড়ে নামায পড়ে ওটাই চাদর ওটাই লুঙ্গি, তখন এদিকের প্রান্ত ওদিক করবে, আর ওদিকের প্রান্ত এদিক করবে।

হাদীস (৩৮) হযরত আবদুর রাজ্জাক মুসান্নেফ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নাফেঈ কে পরিধানের জন্য দুটি কাপড় দিলেন, এসময় সে ছোট ছেলে ছিল, এর পর মসজিদে গেলেন এবং তাকে একটি কাপড় জড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখেন, এর পর বললেন তোমার কাছে কি পরিধানের দুটি কাপড় নেই? আরজ করলেন, হ্যাঁ! আছে বললেন, বলো ঘরের বাইরে যদি তোমাকে পাঠানো হয়, তখন উভয়টি পরিধান করবে না? বললেন, হ্যাঁ তাহলে কি আল্লাহ তায়ালার দরবারের জন্য সৌন্দর্যতা বেশী সমচীন না মানুষের জন্য, বললেন, আল্লাহর জন্য।

হাদীস (৩৯) হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, এক কাপড়ে নামায সুন্নত, অর্থাৎ জায়েজ, আমরা হুযুরের যুগে এরূপ করতাম এবং আমাদেরকে এজন্য দোষারোপ করা হতো না, হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) বললেন-এটা তখন প্রযোজ্য, যদি কাপড় কম থাকে, যাকে আল্লাহ প্রাচুর্যতা দিয়েছেন, তার জন্য দু কাপড়ে নামায বেশী উত্তম।

হাদীস (৪০) হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি নামাযে অহঙ্কারের সাথে লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখবে তার জন্য আল্লাহর রহমাত হিলের মধ্যে হেরেমে নহে।

হাদীস (৪১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি লুঙ্গি ঝুলায়ে নামায পড়তেছিল, বললেন যাও; অজু করে আস, সে গেল এবং অজু করে ফিরে আসলো, কেউ জিজ্ঞেস করলেন, এয়া রাসুলাল্লাহ কি হলো? তাকে অজুর নির্দেশ দেয়া হলো, বললেন, সে লুঙ্গি ঝুলায়ে নামায পড়তেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না। যে লুঙ্গি ঝুলায়ে রাখে, (অর্থাৎ এত নীচে করা যেন পায়ের গোড়ালী দেখা যায়) শায়খ মুহাক্কিক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) "লোময়াত" ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন যে, অজুর নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, যেন বুঝতে পারে এটা অপরাধ। এবং সব লোকদের বলে দেয়া হয়, অজু গুনাহের কাফফারা, এবং গুণাহের কারণ সমূহ দুরীভূতকারী।

হাদীস (৪২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যখন কেউ নামায পড়বে তখন ডান দিকে জুতা রাখবেনা, বামদিকেও রাখবেনা এতে অন্য জনের ডান দিকে হবে, কিন্তু এসময় বাম দিকে যদি কেউ না থাকে, বরং উভয় পায়ের মাঝখানে রাখবে।

নামাযের ৪৩ টি মাকরুহ তাহরীমি সমূহ

কাপড়, দাড়ি, বা শরীর নিয়ে খেলা করা কাপড় কুড়িয়ে নেয়া যেমন, সিজদায় গমন কালে সামনে বা পিছন থেকে তুলে নেয়া যদিও বা আশপাশ থেকে রক্ষার জন্য হয়ে থাকে, যদি বিনা কারণে হয়, আরো অধিক মাকরূহ। কাপড় লটকিয়ে রাখা, যেমন মাথা বা কাঁধে এভাবে রাখা, যেন উভয় কিনারা লটকে থাকে। এসব মাকরূহ তাহরীমি।

মাসয়ালাঃ যদি শার্ট কুর্তা, ইত্যাদির হাতায় হাত ঢুকায়ে পিঠের দিকে নিক্ষেপ করে তখনও একই হুকুম (অর্থাৎ মাকরুহ তাহরীমি)

মাসয়ালাঃ রুমাল বা শাল, বা রজাই বা চাদরের কিনারা কাঁধের দু দিকে লটকায়ে রাখা নিষিদ্ধ ও মাকরূহ তাহরীমি। এক প্রান্ত অন্য কাধের উপর রাখল, দ্বিতীয় প্রান্ত ঝুলায়ে রাখলে ক্ষতি নেই। আর যদি একই কাঁধের উপর রাখে এভাবে যে, এক প্রান্ত পিঠের উপর ঝুলায়ে আছে, দ্বিতীয় প্রান্ত পেটের উপর যেমন, সাধারণতঃ বর্তমান যুগে কাঁধের উপর রুমাল রাখার পদ্ধতি প্রচলিত। এটাও মাকরূহ। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন হাতা কজির অর্ধেকের চেয়ে বেশী উঠায়ে বা আঁচল কুড়ায়ে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমি। আগে উঠায়ে থাকুক বা নামায়ের মধ্যে উঠায়ে রাখুক (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ পায়খানা, প্রস্রাবের গতি প্রবল হওয়ার সময়, বা বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবলতার সময় নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমি। হাদীস শরীফে আছে যে, যখন জামাত কায়েম হয়ে যায় এবং কারো পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়, প্রথমে পায়খানায় যাবে। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আবদুল্লাহ বিন আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এবং আবু দাউদ, নাসায়ী, এবং মালেকও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

মাসয়ালাঃ নামায শুরু করার পূর্বে যদি এসব বস্তুর প্রবলতা বৃদ্ধি পায়, তাহলে ওয়াক্তের মধ্যে প্রসস্ততা থাকা সত্ত্বেও শুরু করা নিষিদ্ধ ও গুনাহ যদিও জামাত চলে যায়, হাজত সেরে নেবে, আর যদিও দেখা যায় যে, হাজত সেরে অযুর পর ওয়াক্ত চলে যাবে তখন সময়ের বিবেচনা করে নামায আগে পড়ে নেবে। যদি নামাযরত এ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সময়ও থাকে তখন নামায ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। আর যদি সে অবস্থায় পড়ে নেয় গুণাহগার হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ পুরুষরা ঝুটা বেধে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমি, নামাযরত ঝুটা বাধলে নামায ফাসেদ হবে।

মাসয়ালাঃ নামাযে কংকর সরানো মাকরূহ তাহরীমি। যদি সুন্নত অনুসারে সিজদা আদায় করা না যায় তখন একবার সরানো অনুমতি আছে, কিন্তু একবার হতেও বেছে থাকা উত্তম। যদি সরানো ছাড়া ওয়াজিব আদায় না হয় তখন সরানো ওয়াজিব যদিও বা একবারের অধিক প্রয়োজন হয়। (দুরুল মোখতার রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ আঙ্গুল মটকানো, এবং এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে প্রবিষ্ট করলে মাকরূহ তাহরীমি। (দুর্রুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ নামাযে গমণ কালে, এবং নামাযের অপেক্ষারত সময়েও এ দুটি কাজ মাকরূহ আর যদি নামাযে বা নামাযের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে না হয় মাকরূহ হবেনা, যদি কোন প্রয়োজনে হয়। (দুর্রুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসয়ালাঃ কোমরে হাত রাখা মাকরূহ তাহরীমি নামায ছাড়াও কোমরে হাত রাখা সমীচীন নয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ এদিক ওদিক মুখ ফিরায়ে দেখা মাকরূহ তাহরীমি, সম্পূর্ণ চেহারা যদি ফিরে যায় বা আংশিক, যদি মুখ না ফিরে শুধু চোখের কোণে বিনা প্রয়োজনে এদিক ওদিক দেখে তখন মাকরূহ তানযিহী, কোন সঠিক উদ্দেশ্যে হলে তখন মূলতঃ ক্ষতি নেই। দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ করা মাকরূহ তাহরীমা।

মাসয়ালাঃ তাশাহুদ বা সিজদার মাঝখানে কুকুরের ন্যায় বসা, অর্থাৎ হাটু সমূহ সিনার সাথে মিলায়ে দুহাত জমীনের উপর রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়া বসা। ❒ পুরুষ সিজদার মধ্যে জামার হাতা বিছালে। ❒ কোন লোকের মুখের সামনে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমি। এভাবে অন্য লোক নামাযীর দিকে মুখ করাও নাজায়েজ ও গুণাহ। যদি মুসল্লির পক্ষ থেকে হয় মাকরূহ মুসল্লীর উপর বর্তাবে। অন্যথায় অন্যজনের উপর।

মাসয়ালাঃ মুসল্লীরা এবং ঐ ব্যক্তির মধ্যে যদি দুরত্ব হয়, তখনও মাকরূহ হবে। কিন্তু মাঝখানে যদি কোন বস্তু অন্তরাল হয় যেন দাড়ানো ও সামনে না হয় তখন ক্ষতি নেই আর যদি উঠা বসার মুখোমুখি, দুজনের মাঝখানে একব্যক্তি, মুসল্লীর দিকে পিট করে বসে গেল। এ অবস্থায় বসলে তো মুখোমুখী হবে না, কিন্তু দাড়ালে মুখোমুখি হবে, তখন ও মাকরূহ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কাপড় এমনভাবে জড়িয়ে যাওয়া, যদ্বারা হাত বের করা যাচ্ছেনা মাকরূহ তাহরীমা হবে। নামায ছাড়াও বিনা প্রয়োজনে, এভাবে কাপড় জড়িয়ে রাখা সমীচীন নয়, এবং বিপদ জনক স্থানে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

মাসয়ালাঃ পাগড়ী এমনভাবে বাঁধা যে, মাথার মধ্যভাগে না হলে মাকরূহ তাহরীমি নামাযের বাইরেও এভাবে পাগড়ি বাধা মাকরূহ। এভাবে নাক, মুখ ঢেকে, রাখা এবং বিনা প্রয়োজনে গলা হাকড়ানো, এসব মাকরূহ তাহরীমি। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে হাই তোলা মাকরূহে তাহরীমী এমনি হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু বারণ করা মুস্তাহাব, প্রতিরোধে বারণ না হলে দাত দ্বারা ঠোট চেপে ধরবে। এতেও প্রতিরোধ না হলে তখন ডান হাত বা বাম হাত মুখে রাখবে, বা হাতা দ্বারা মুখ চেপে ধরবে। দাড়ান অবস্থায়, হাত দ্বারা ঢেকে রাখবে, অন্য স্থানে বাম হাত দ্বারা (মারাকিউল ফালাহ)

ফায়েদাঃ নবীগণ (আলাইহিমুস সালাতওয়াচ্ছালাম) এর থেকে সংরক্ষিত, যেহেতু এর মধ্যে শয়তানের প্রবিষ্ঠতা আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যখন তোমাদের মধ্যে কারো হাই তোলা আসে, যতদুর সম্ভব বন্ধের চেষ্টা করবে এ হাদীসটি বোখারী মুসলিম, সহীহাঈনে বর্ণনা করেন, এবং কতেক বর্ণনায় আছে শয়তান দেখে হাসে।

ওলামাগণ বলেন, যে ব্যক্তি হাই তোলার সময় মুখ খোলে শয়তান তার মুখ দিয়ে থুথু নিক্ষেপ করে, যে ব্যক্তির কাহ্ কাহ্ শব্দ বের হয় তা শয়তানের অট্টহাসি তার মুখ বিকৃত করে অট্টহাসি দেয় এবং যে থুথু বের হয় তা শয়তানের থুথু। তা বন্ধ করার উত্তম উপায় হলো এ, যে যখন তা জানা যায় তখন অন্তরে ধারণা করবে, আল্লাহর নবীগণ এর থেকে সংরক্ষিত ছিল তাৎক্ষণিক বন্ধ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

ছবির বিধান

মাসয়ালাঃ যেসব কাপড়ে প্রাণীর ছবি আছে, তা পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি। নামাযের বাইরেও এ ধরণের কাপড় পরিধান করা নাজায়েজ। এভাবে মুসল্লীর মাথার উপর বা ছাদের উপর বা ঝুলন্ত থাকে বা সিজদার স্থানে হলে এবং তার উপর সিজদা করা হলে নামায মাকরূহে তাহরীমি। এভাবে নামাযীর সামনে, ডানে, বামে ছবি থাকলে নামায মাকরূহে তাহরীমি এবং পিঠের পিছনে হলেও মাকরূহ, এ চার অবস্থায় মাকরূহ তখন হবে, যখন ছবি সামনে, পিছনে, ডানে, বামে লটকানো থাকলে বা খাড়া রাখলে, বা দেওয়ালে অঙ্কিত হলে, বা অন্য কোথাও খুদিত হলে, যদি বিছানার উপর হয় এবং এর উপর সিজদা করা না হয় মাকরূহ হবে না। আর ছবি যদি অপ্রাণীর হয় যেমন নদী, পাহাড় ইত্যাদির হয় এতে ক্ষতি নেই।

মাসয়ালাঃ ছবি যদি অপমানকর স্থানে হয়, যেমন জুতো রাখার স্থানে বা বিছানার অন্য কোন স্থানে যা লোকদের পদ দলিত হয় বা বালিশের উপর, যা হাটু ইত্যাদির নীচে রাখা হয় এমন ছবি ঘরে থাকলে মাকরূহ নহে। এর দ্বারা নামাযও মাকরূহ হবে না। যদি এর উপর সিজদা করা না হয়। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ যে বালিশে ছবি আছে তা খাড়া রাখা ছবির প্রতি সম্মানের শামিল এবং এ ধরণের করলে নামাযও মাকরূহ হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি হাতে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে ছবি থাকে কিন্তু কাপড় দ্বারা ঢেকে আছে, বা আংটির উপর ছোট ছবি অঙ্কিত আছে বা সামনে, পিছনে, উপরে, নীচে, ডানে, বামে, কোন স্থানে ছোট ছবি থাকে অর্থাৎ এ পরিমাণ হওয়া যে, তা জমীনে রেখে দাড়িয়ে দেখলে আঙ্গুলসমূহের পৃথক পৃথক দেখা যায় না, বা পায়ের নীচে বা বসার স্থানে হলে, এসব অবস্থায় নামায মাকরূহ হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ছবির মাথা কাটা বা চেহারা বিলীন করে দেয়া হলে যেমন, কাগজ বা কাপড় বা দেওয়ালে তার উপর আলোকছটা পতিত হয় বা তার মাথা বা চেহারা যদি ঘষে ফেলা হয় বা ধুয়ে ফেলা হয় মাকরূহ হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যদি ছবির মাথা কাটা থাকে কিন্তু মাথা স্বীয় স্থানে লাগানো আছে কখনও পৃথক হয় না তখনও মাকরূহ হবে। যেমন কাপড়ে ছবি ছিল তার ঘাড়ে সেলাই করা হলে শৃঙ্খলের মত পরিণত হল। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মাকরূহ থেকে রক্ষার জন্য চেহারা বিলীন করাই যথেষ্ট। যদি চক্ষু, ভ্রু বা হাত পা পৃথক করে নেয়া হয় এর দ্বারা মাকরূহ দুরীভূত হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ থলে বা পকেটে ছবি অদৃশ্যভাবে থাকলে নামায মাকরূহ হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করেছে এবং তার উপর অন্য কাপড় পরিধান করল ছবি ঢেকে গেল তখন নামায মাকরূহ হবে না। (রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসাআলাঃ ছবি যদি ছোট না হয় এবং অপমানকর স্থানে না হয় এবং এর উপর পর্দা না থাকে তখন সর্বাবস্থায় এর কারণে নামায মাকরূহে তাহরীমি। কিন্তু সবচেয়ে বড় মাকরূহ তখন হবে, যখন ছবি নামাযীর সামনে ক্বিবলার দিকে হয় এবং মাথার উপর হয়। এরপর ডানে, বামে হলে দেওয়ালের মধ্যে এরপর দেওয়ালের পিছনে বা পর্দার আড়ালে হলে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ উপরোক্ত মাসয়ালাঃ সমূহ তো নামাযের বিধান সম্পর্কে। বাকী আছে ছবি রাখা সম্পর্কে। এ সম্পর্কে তো সহীহ হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে ঘরে কুকুর বা ছবি আছে সে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না। (অর্থাৎ যদি অপমানের সাথে না হয় এবং এতটুকু ছোট ছবি না হয়)।

মাসয়ালাঃ রুপি, মুদ্রা এবং অন্যান্য সিকির ছবিতেও ফেরেস্তা প্রবেশের অন্তরায় কি-না এ সম্পর্কে ইমাম ক্বাযী আয়াজ (রহঃ) বলেন, যে অন্তরায় নহে এবং ওলামায়ে কেরামের ভাষ্যমতেও তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ উপরোক্ত বিধান তো ছবি বা ফটো রাখা সম্পর্কে, অপমানকর স্থান এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিত এ হুকুমের বহির্ভূত। এখন রইলো, ছবি তোলা ও নির্মাণ করা তা সর্বাবস্থায় হারাম। হস্তে নির্মিত হোক বা ফটোগ্রাফে গৃহীত ছবি হোক। উভয়টির একই হুকুম।(রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ উল্টা কুরআন মজীদ পড়া, কোন ওয়াজিবকে বর্জন করা, মাকরূহে তাহরীমি। যেমন রুকু সিজদায় পিঠ সোজা না করা। এভাবে দাড়া বা বসার মধ্যে সোজা হওয়ার পূর্বে সিজদায় চলে যাওয়া। দাড়ানো অবস্থা ছাড়া অন্য কোন স্থানে কুরআন মজীদ পড়া। বা রুকুতে ক্বেরাত শেষ করা। ইমামের পূর্বে মুক্তাদি রুকু সিজদায় চলে যাওয়া। বা ইমামের পূর্বে মাথা উঠানো।

মাসয়ালাঃ শুধু পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধান করে নামায পড়েছে কুর্তা শার্ট জামা থাকা সত্ত্বেও নামায মাকরূহে তাহরীমি। যার নিকট অন্য কাপড় নেই তার জন্য মার্জনীয়। (আলমগীরি, গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ ইমাম কোন আগন্তুক ব্যক্তির অপেক্ষায় নামায দীর্ঘ করা মাকরূহে তাহ্‌রীমি। আর যদি পরিচিত হয় এবং তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নামাযে তার সাহায্যার্থে যদি এক দু'তসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করে তখন মাকরূহ হবে না। (আলমগীরি)

রুকু সারির পিছন থেকেই আল্লাহু আকবর বলে নামাযে শামিল হল অতঃপর সারির অন্তর্ভুক্ত হলে মাকরূহে তাহ্‌রীমি হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ছিনতাইকৃত জমিন বা ক্ষেতে যার মধ্যে ফসল মওজুদ রয়েছে বা হালচাষ ক্ষেতে নামায পড়া মাকরূহে তাহ্‌রীমি। কবরের সামনে হওয়া এবং নামাযী ও কবরের মধ্যখানে কোন কিছু অন্তরায় না হলে মাকরূহে তাহ্‌রীমি। (দুর্‌রুল মোখতার আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কাফেরদের উপাসনালয়ে নামায পড়া মাকরূহ। তা হল শয়তানের স্থান, স্পষ্ট কথা হলো তা মাকরূহ তাহ্‌রীমি। (বাহার) বরং এর মধ্যে গমন করাও নিষিদ্ধ। (রদ্দুল মোখতার)

মাকরূহ তানযীহ সমূহ

মাসয়ালাঃ উল্টো কাপড় পরিধান করে বা উঠিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। প্রকাশিত হলে হারাম এভাবে ভিতরের কাইস না বাধা বা জামার বোতাম না লাগা যদি তার নীচে কুর্তা, শার্ট ইত্যাদি না থাকে এবং সিনা খোলা থাকে তখন প্রকাশ্য মাকরূহ তাহ্‌রীমি এবং নীচে জামা, কুর্তা থাকলে মাকরূহে তানযীহি। এ পর্যন্ত যেসব মাকরূহ সমূহের বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে যেসব বিষয় মাকরূহে তাহ্‌রীমি হওয়াটা উল্লেখযোগ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই নির্ভরযোগ্য। এখন অন্য কতিপয় মাকরূহ সমূহের বর্ণনা দেয়া হবে, যেগুলোর অধিকাংশ মাকরূহ তানযীহি হওয়াটা সুস্পষ্ট। কিন্তু আংশিক মতান্যৈক্য রয়েছে। তবে তানযীহ হওয়াটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত। সিজদা বা রুকুর মধ্যে বিনা প্রয়োজনে তিন তাসবীহ এর কম বলা, হাদীস শরীফে একে মোরগের ন্যায় ঠুকর মারা বলা হয়েছে। হাঁ, সময় সংকীর্ণ হলে বা ট্রেন গাড়ী চলে যাবার আশংকা হলে ক্ষতি নাই। যদি মোক্তাদি তাসবীহ না পায় ইমাম মাথা উঠিয়ে নিলে ইমামের সাথে অনুসরণ করবে।

মাসয়ালাঃ অন্য কাপড় থাকা সত্বেও কাজ-কর্মের কাপড় দ্বারা নামায পড়া মাকরূহে তানযীহি, অন্যথায় মাকরূহ নহে (মতুন)

মাসয়ালাঃ মুখে কোন কিছু নিয়ে নামায পড়া ও পড়ানো মাকরূহ যদি ক্বেরাতের অন্তরায় না হয়। ক্বেরাতের অন্তরায় হলে যেমন আওয়াজই বের হচ্ছে না এমন সব শব্দ বের হচ্ছে যা কুরআনের নয় তখন নামায ফাসেদ হবে। (দুর্‌রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ অলসতা করে খালি মাথায় নামায পড়া অর্থাৎ টুপি পরিধান করাটা বোঝা মনে করল বা গরম অনুভব হল মাকরূহে তানযীহি, আর যদি নামাযের তুচ্ছতা উদ্দেশ্য হয় যেমন নামায এই রকম কোন মহিমান্বিত বস্তু নয় যে যার জন্য টুপি বা পাগড়ী পরিধান করতে হবে তখন কুফরী হবে। আর নম্র বিনয়ের জন্য অনাবৃত মাথায় পড়লে তখন মোস্তাহাব। (দুর্‌রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযে টুপি পড়ে গেল, উঠায়ে নেয়াটা উত্তম যখন আমলে কছীর এর প্রয়োজন না পড়ে অন্যথায় নামায ফাসেদ হবে। বারংবার পড়ে উঠাতে হলে ছেড়ে দেবে। না উঠানোটা বিনয় উদ্দেশ্য হলে না উঠানোই উত্তম। (দুর্‌রুল মোখতার), রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কপালে মাটি বা ঘাস লাগা মাকরূহ যদি এর দ্বারা নামাযে অনুশোচনা না হয় বরং অহংকার উদ্দেশ্য হয় তখন মাকরূহে তাহ্‌রীমি। আর যদি কষ্টকর হয় ধারণা বিস্মৃতি হয় ক্ষতি নাই। নামাযের পর ঝেড়ে ফেলাটা ক্ষতিকর নয়। বরঞ্চ রিয়ার অনুপ্রবেশ না ঘটার জন্য তা করা সমীচীন। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ এভাবে প্রয়োজনের সময় কপাল হতে ঘাম মুছা বরং এমন সব আমলে কলিল যা নামাযের জন্য উপকারী তা জায়েয। যা উপকারী নয় তা মাকরূহ। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযে নাক দিয়ে পানি পড়লে তা মুছে নেয়া, জমীনে পড়া থেকে উত্তম। মসজিদ হলে তা মুছে নেয়াটা জরুরী। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ নামাযে আঙ্গুল দ্বারা আয়াত, সূরা এবং তাসবীহ সমূহ গণনা করা মাকরূহ, ফরজ নামায হউক, কিংবা নফল। অন্তরে গণনা করা এবং সংখ্যা সংরক্ষণের জন্য সব আঙ্গুল সমূহ সুন্নত অনুসারে স্বীয় স্থানে থাকলে এর দ্বারা ক্ষতি নাই। কিন্তু খেলাপে আওলা। এতে অন্তর অন্য দিকে মনোনিবেশ করবে। আর মুখ দিয়ে গণনা করলে নামায ভঙ্গ হবে। (দুর্‌রুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ নামাযের বাইরে গণনা করলে কোন ক্ষতি নাই বরং কতেক হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে তা হল এই যে, আঙ্গুল সমূহকে প্রশ্ন করা হবে এরা বলবে (রদ্দুল মোখতার, হলিয়া)

মাসয়ালাঃ তাসবীহ রাখলে ক্ষতি নাই যদি রিয়ার জন্য না হয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ হাত বা মাথার ইঙ্গিতে সালামের উত্তর দেওয়া মাকরূহ (দুর্‌রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নামাযে ওজর ব্যতীত চার যানু হয়ে বসা মাকরূহ। ওজর থাকলে ক্ষতি নাই এবং নামাযের বাইরে এ ধরনের বসলে কোন ক্ষতি নাই। (দুর্‌রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ আঁচল বা জামার হাতা দিয়ে বাতাস ঢুকালে মাকরূহ, যদি একবার হয় (মারাকিউল ফালাহ)। এ কথার ভিত্তি হল যে, এক রুকুনে তিনবার নড়া চড়া নামাজ ভঙ্গের কারণ। ফুঁক দিয়ে আগুন জ্বালানো নামায ভঙ্গের কারণ। এতে দূর থেকে প্রত্যক্ষকারী মনে করবে যে, নামাযের অন্তর্ভুক্ত নহে। (মুনতাকা, জহীরা, মুহীত, রেজবী, তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ)

মাসয়ালাঃ "এসবাল" অর্থাৎ কাপড় পরিমিত সীমার অতিরিক্ত দীর্ঘ করা নিষিদ্ধ। নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন নামায পড়বে তখন ঝুলন্ত কাপড়কে উঠায়ে নেবে এর যে অংশ মাটিতে লাগবে সেটা জাহান্নামে যাবে। এ হাদীসটি ইমাম বোখারী "তারীখে" এবং তিবরানী "কবীরে", ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আঁচল এবং পেঁচের মধ্যে এসবাল বা তহবন্দ প্রলম্বিত হওয়া অর্থ এই যে, হাটুর নীচে হওয়া, হাতার মধ্যে আঙ্গুলের নীচে হওয়া এবং পাগড়ীর ক্ষেত্রে বসার সময় নীচে ঝুললে তা এসবাল।

মাসয়ালাঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোচড় দিলে, ইচ্ছাকৃত কাঁশলে বা গলা হাকড়ালে মাকরূহ। আর যদি স্বাভাবিকভাবে প্রতিরোধ করে ক্ষতি নেই। নামাযরত অবস্থায় থুথু নিক্ষেপ মাকরূহ। (আলমগীরি)

"তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ" কিতাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মোচড়ানোকে প্রকাশ্যভাবে মাকরূহে তানযীহি বলেছেন।

মাসয়ালাঃ নামাযের সারিতে পৃথকভাবে দাড়ানো মাকরূহ। যেন দাড়া বসা ইত্যাদি কার্য্যাদি লোকদের বিপরীতভাবে করা যায় এরূপ করা মাকরূহ। এভাবে মুক্তাদি কাতারের পিছনে একাকী দাড়ালে মাকরূহ, যদি কাতারে জায়গা থাকে। আর যদি কাতারে স্থান না থাকে ক্ষতি নেই। কাউকে কাতারে টেনে নিয়ে তার সাথে দাড়ালে উত্তম। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, যাকে টেনে আনা হচ্ছে সে যেন এ মাসয়ালা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। টানার দ্বারা যেন নামায ভঙ্গ না করে, তবে এ ব্যক্তি কাউকে ইশারা করা সমীচীন। (আলমগীরি, ফতহুল কদীর)

মাসয়ালাঃ ফরজের এক রাকাতে ইখ্‌তিয়ার অবস্থায় কোন আয়াতকে বারবার পড়া মাকরূহ। ওজরের কারণে হলে ক্ষতি নেই। এভাবে এক সূরাকে বারংবার পড়াও মাকরূহ। (আলমগীরি, গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ সিজদায় গমনকালে হাটুর আগে হাত রাখা এবং উঠার সময় হাতের আগে হাটু উঠানো বিনা ওজরে মাকরূহ। (গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ রুকুর মধ্যে মাথাকে পিঠ থেকে উঁচু বা নীচু করা মাকরূহ। (মুনীয়া)

মাসয়ালাঃ বিসমিল্লাহ, আউজুবিল্লাহ, ছানা এবং আমীন উচ্চস্বরে বলা বা দুআ সমূহ স্বীয় স্থান থেকে অন্যস্থানে পড়া মাকরূহ। (গুনিয়া, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ বিনা ওজরে দেওয়ালে বা লাঠির উপর ঠেস দেয়া মাকরূহ। ওজর থাকলে ক্ষতি নেই। বরং ফরজ, ওয়াজিব এবং ফজরের সুন্নতে দাঁড়াবার সময় ওজর থাকলে এর উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো ফরজ। যদি তাছাড়া দাড়ানো না যায় যেমন দাড়ানোর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। (গুনিয়া ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ রুকুর মধ্যে হাটুর উপর, সিজদার মধ্যে জমীনের উপর হাত না রাখা মাকরূহ। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ পাগড়ী মাথা থেকে খুলে জমীনে মাটিতে রাখলে বা জমীন থেকে মাথায় রাখলে নামায ফাসেদ হবে না। অবশ্য মাকরূহ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ জামার হাত বিছায়ে সিজদা করা যেন চেহারায় মাটি না লাগে মাকরূহ হবে। অহংকার বশতঃ হলে মাকরূহে তাহ্‌রীমি। গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাপড়ের উপর সিজদা করলে ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ রহমতের আয়াতে প্রার্থনা করা, আযাবের আয়াতে মুক্তি চাওয়া, একা নফল আদায়কারীর জন্য জায়েয। ইমাম মুক্তাদির জন্য মাকরূহ। (আলমগীরি) ইমাম কর্তৃক মুক্তাদিদের কষ্ট হওয়াটা মাকরূহে তাহ্‌রীমি।

মাসয়ালাঃ ডানে, বামে হেলানো মাকরূহ, কখনো এক পায়ের উপর জোর দেয়া, কখনো দ্বিতীয় পায়ে, এটা সুন্নত।

মাসয়ালাঃ সিজদা হতে উঠার সময় সামনে পিছনে পা উঠানো মাকরূহ। সিজদায় যাবার সময় ডান দিকে জোর দেয়া, উঠার সময় বাম দিকে জোর দেয়া মুস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ নামাযে চক্ষু বন্ধ রাখা মাকরূহ। কিন্তু খুলে রাখার দ্বারা যদি বিনয়ীভাব সৃষ্টি না হয় তখন বন্ধ করলে ক্ষতি নেই বরং উত্তম। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সিজদার মধ্যে ক্বিবলার দিক থেকে আঙ্গুল ফিরে নেয়া মাকরূহ। (আলমগীরি ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ উঁকুন বা মশা যদি কষ্ট দেয় মেরে ফেললে ক্ষতি নেই (গুনিয়া)। যখন আমলে কছীর এর প্রয়োজন না হয়।

মাসয়ালাঃ মুক্তাদী বিহীন ইমাম একা মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরূহ। বাইরে দাঁড়িয়ে মেহরাবে সিজদা করলে, বা একা না হলে বরং তার সাথে মেহরাবে কিছু মুক্তাদিও থাকলে ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে মুক্তাদিদের জন্য মসজিদ সংকীর্ণ হলে তখনও মেহরাবে দাড়ানো মাকরূহ হবে না। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ইমাম দরজার মুখে দাঁড়ানো মাকরূহ। অনুরূপভাবে প্রথম জামাতের ইমাম মসজিদের এক কোণে বা এক পার্শ্বে দাঁড়ানো মাকরূহ, মাঝখানে দাড়ানো সুন্নত ও মধ্যস্থানের নাম মেহরাব। মধ্যস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে দাঁড়ালে যদিও বা উভয়দিকে কাতার সমান হয় তখনও মাকরূহ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম একক উঁচুস্থানে দাঁড়ানো মাকরূহ। উচ্চতার পরিমাণ হলো দেখতে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চতা প্রকাশ পায়, অতঃপর উচ্চতা যদি কম হয় মাকরূহে তানযীহি। অন্যথায় প্রকাশ্য হারাম। ইমাম নীচে মুক্তাদি উচুস্থানে হওয়া এটাও মাকরূহ এবং সুন্নতের বিপরীত। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কা'বা শরীফ এবং মসজিদের ছাদে নামায পড়া মাকরূহ এতে সম্মান বর্জিত হয়। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদে কোন স্থান নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া এখানেই নামায পড়বে, মাকরূহ হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ কোন ব্যক্তি বসে বা দাড়িয়ে কথা বলছে তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহ হবে না। তার কথায় অন্তর আকৃষ্ট হওয়ার আশংকা না হলে। কুরআন শরীফ এবং তরবারীর পিছনে এবং নিদ্রিত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া মাকরূহ নহে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ তরবারী, কামান ইত্যাদি বহন করে নামায পড়া মাকরূহ যদি তা নড়াচড়ায় অন্তরে উৎসাহ হয়। অন্যথায় ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ জ্বলন্ত আগুন নামাযীর সামনে হওয়া মাকরূহ। বাতি বা প্রদীপ হলে মাকরূহ হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ হাতে এমন কোন মাল থাকলে যা একস্থানে রাখা প্রয়োজন। তা সাথে নামায পড়লে মাকরূহ হবে, কিন্তু যদি এমন স্থান হয় সাথে না রাখলে সংরক্ষণ সম্ভব নহে তখন সাথে রাখবে।

মাসয়ালাঃ নামাযীর সামনে পায়খানা ইত্যাদি নাপাকী হওয়া বা এমনস্থানে নামায পড়ছে যা নাপাক ধারণায়। মাকরূহ হবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ সিজদায় উরুকে পেট দ্বারা ঢেকে রাখা বা বিনা ওজরে হাত দ্বারা মাছি তাড়ানো মাকরূহ (আলমগীরি)। কিন্তু মহিলারা সিজদায় উরু পেটের সাথে মিলাবে।

মাসয়ালাঃ কার্পেট বা বিছানার উপর নামায পড়লে ক্ষতি নেই। যেন এতটুকু নরম বা মোটা না হয়, যেখানে সিজদায় কপাল স্থির হবে না। অন্যথায় নামায হবে না। (গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ এমন জিনিষের সামনে যা অন্তর আকৃষ্ট করে নামায পড়া মাকরূহ যেমন সৌন্দর্যতা, এবং খেলা-ধূলা ইত্যাদি।

মাসয়ালাঃ নামাযের জন্য দৌড়ানো মাকরূহ। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা, ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপের স্থান, নালা, গবাদি পশুর বাধার স্থান, বিশেষতঃ উট বাধার স্থান, আস্তাবল বা ঘোড়া বাধার স্থান, পায়খানার ছাদে এবং খোলা ময়দানে এমন সব স্থানে নামায মাকরূহ (দুর্রুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ কবরস্থানের যে জায়গায়টি নামাযের জন্য নির্ধারিত, এস্থানে যদি কবর না হয় সেখানে নামায পড়তে ক্ষতি নেই। মাকরূহ তখন হবে, যদি কবর সামনে হয় এবং কবর ও নামাযীর মাঝখানে কোন জিনিষ সুত্‌রা পরিমাণ অন্তরাল না হয়। কবর যদি ডানে, বামে বা পিছনে হয় এবং সুত্‌রা পরিমাণ কোন জিনিষ যদি অন্তরাল হয় মাকরূহ হবে না। (আলমগীরি, গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ একটি জমীন মুসলমানের, অপরটি কাফেরের তখন মুসলমানের জমীনে নামায পড়বে যদি ক্ষেত না হয়। অন্যথায় রাস্তার উপর পড়বে। কাফেরের জমীনে পড়বে না। জমীনে যদি ফসল থাকে এবং এর সাথে ও জমীনের মালিকের সাথে যদি বন্ধুত্ব থাকে, যদ্দ্বারা তার অপছন্দ হবে না তখন পড়া যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

নামায ভঙ্গের ওজর সমূহ

মাসয়ালাঃ সাপ ইত্যাদি মারতে গিয়ে যদি কষ্ট পাওয়ার আশংকা হয় বা কোন প্রাণী পালিয়ে গেছে তা ধরার জন্য, বকরীকে নেকড়ে বাঘের হামলার আশংকা হলে নামায ভঙ্গ করা জায়েয। অনুরূপভাবে নিজের বা অপরের এক দিরহাম পরিমাণ ক্ষতির আশংকা হলে যেমন, দুধ উথলিয়ে যাচ্ছে বা মাংশ, তরকারী, রুটি ইত্যাদি পুড়ে যাবার আশংকা হলে বা চোর এক দিরহাম পরিমাণ কোন জিনিষ নিয়ে পলায়ন করেছে এসব অবস্থায় নামায ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ পায়খানা প্রস্রাব দেখতে পেল, বা কাপড় কিংবা শরীরে এতটুকু নাপাক দেখতে পেল, যা নামায নিষেধ করেনা বা তাকে কোন বেগানা মহিলা স্পর্শ করেছে তখন নামায ভেঙ্গে ফেলা মুস্তাহাব। জামাতের ওয়াক্ত ফওত না হওয়া শর্ত। পায়খানা প্রস্রাবের প্রবল হাজতের সময় জামাত চলে যাবার খেয়াল রাখবে না। অবশ্য ফওত হওয়াটা ওয়াক্তে বিবেচিত হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ফরিয়াদ করছে, নামাযীকে ডাকছে, বা সাধারণ কোন মানুষকে ডাকছে বা কেউ ডুবে যাচ্ছে, বা আগুনে পুড়ে যাবে বা অন্ধ পথিক কূপে পতিত হচ্ছে এসব অবস্থায় নামায ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। যদি সে এদেরকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী বংশের কোন ব্যক্তি ডাকলে নামায বন্ধ করা জায়েজ নেই, যদি তাদের আহ্বান করাটা বড় কোন বিপদের কারণে হয় যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন নামায ভেঙ্গে ফেলবে। এটা ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে। আর যদি নফল নামায হয় এবং নামায পড়ছে একথা তাদের জানা আছে তখন তাদের সামান্য ডাকে নামায ভাঙ্গবে না। নামাযরত হওয়াটা না জানলে এবং ডাকলে ভেঙ্গে ফেলবে এবং জবাব দেবে যদিও সাধারণ ব্যাপারে ডাকে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মসজিদের বিধানাবলীর বিবরণ

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

অর্থঃ তারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে, আল্লাহ ও পরকালের এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। উহাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে (সূরা তাওবা)

হাদীসঃ (১-৪) বোখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন পুরুষের নামায জামাত সহকারে মসজিদে পড়া, ঘরে এবং বাজারে পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী ছাওয়াব। তা এভাবে যে, যখন উত্তমরূপে অযু করে মসজিদে বের হল। যে কদম চলছে তদ্বারা মর্যাদা বুলন্দ হচ্ছে এবং গুনাহ মাফ হচ্ছে। নামাযরত অবস্থায় ফেরেস্তারা তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করছে। যতক্ষণ মহল্লায় থাকে এবং সর্বদা নামাযে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষা করছে। ইমাম আহমদ, আবু ইয়ালা প্রমুখ আকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রতি কদমের বিনিময়ে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ হচ্ছে। যখন থেকে ঘর হতে বের হল, ফিরে যাওয়া পর্যন্ত নামায আদায়কারীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে এদের বর্ণনার কাছাকাছি ইবনে ওমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও বর্ণনা করেন।

হাদীসঃ - (৫) নাসায়ী শরীফে হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে ফরজ নামাযে গেল এবং মসজিদে নামায পড়লো তার গুনাহ মাফ হবে।

হাদীসঃ (৬) মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, মসজিদে নববীর পাশে কিছু জমীন খালি হয়েছিল, বনু সালমা মসজিদের কাছে চলে আসার ইচ্ছে করলো, এ সংবাদ নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলে হুযুর বললেন, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, তুমি মসজিদের নিকটে চলে আসার ইচ্ছে করেছো, আরজ করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ ইচ্ছেতো করেছি, বললেন, হে বনু সালমা নিজেদের ঘরেই থাক। তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হবে, একথা দু'বার বললেন। বনু সালমা বললেন, ঘর পরিবর্তন আমাদের আর পছন্দ হল না।

হাদীসঃ (৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের ঘর মসজিদ থেকে দূর ছিল। তারা মসজিদের নিকটে আসতে চাইলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ

অর্থঃ আমি লিপিবদ্ধ করছি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং তাদের পদচিহ্ন সমূহ।

হাদীসঃ (৮) বোখারী, মুসলিম শরীফে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামাযের মধ্যে সর্বাধিক পূণ্য সে ব্যক্তির জন্য, যে অনেক দূর থেকে আসে।

হাদীসঃ (৯) মুসলিম শরীফে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক আনসারী ছাহাবীর বাড়ী মসজিদ থেকে বহুদূর ছিল, তাঁর নামাযে ভুল হতো না, তাঁকে বলা হলো, অনতিবিলম্বে তুমি একটি বাহন ক্রয় করে নাও। অন্ধকার রজনী এবং গ্রীষ্মকালে তাঁর উপর আরোহণ করে আসবে। জবাব দিলেন, আমি চাই আমার মসজিদে গমণ করে এবং অতঃপর ঘরে ফিরে আসাটা যেন লিপিবদ্ধ করা হয়। নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাকে এসবগুলো একত্রে দিয়েছেন।

হাদীসঃ (১০) হযরত বজ্জাজ, আবু ইয়ালা হাসান সূত্রে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কষ্টের মধ্যে পূর্ণরূপে অযু করা, এবং মসজিদে গমন করা, এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। গুনাহ সমূহ ভালভাবে ধৌত করে দেয়।

হাদীসঃ (১১) তিবরানী শরীফে আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে গমন করা আল্লাহর পথে এক প্রকারের জিহাদ বিশেষ।

হাদীসঃ (১২) বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুরকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে গমন করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য জান্নাতে মেহমানের খাবার প্রস্তুত করেন। যত বারই গমন করুক।

হাদীসঃ (১৩-২৩) আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফে হযরত বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং ইবনে মাযাহ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যেসব লোক অন্ধকারে মসজিদে গমনকারী, কিয়ামত দিবসে তাদেরকে পরিপূর্ণ আলোর শুভ সংবাদ শুনানো হবে। একই ধরণের হাদীস, আবু দাউদ, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, সাহ্ল বিন সা'দ সাঈদী, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু সাঈদ খুদরী যায়েদ বিন হারেছা প্রমুখ, উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

হাদীসঃ (২৪) আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে, যদি জীবিত থাকে জীবিকা দেন অভাবহীন করেন, মৃত্যু হলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরা হলো, যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘর ওয়ালাদের সালাম করেন। তারা আল্লাহর জিম্মায় আছেন। যে মসজিদে গমন করে, সে আল্লাহর জিম্মায়। যে আল্লাহর পথে বের হলো সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে।

হাদীসঃ (২৫) হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ঘরে, উত্তমরূপে অযু করল এবং মসজিদে গমন করল, সে আল্লাহর সাক্ষাৎকারী যার সাক্ষাৎ করা হয় তার কর্তব্য হলো সাক্ষাৎকারীকে সম্মান করা।

হাদীসঃ (২৬) ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীকরীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ঘর থেকে নামাযে যাবে এবং নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ هٰذَا فَاِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا وَّلَا بَطَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً وَّ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِىْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

তার দিকে আল্লাহ্ তাআলা কুদরতী চেহারা নিয়ে মনোনিবেশ করেন এবং সত্তর হাজার ফেরেস্তা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হাদীসঃ (২৭-২৯) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু দাউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীকরীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,, যখন কেউ মসজিদে যাবে তখন বলবে– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আর যখন বের হবে তখন বলবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গমন করতেন তখন এ দোয়া বলতেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

বললেন, এরূপ বলো, শয়তান বলে যে এরূপ বলল। সে পূর্ণ দিবস আমার প্ররোচনা থেকে সংরক্ষিত রইলো। তিরমিযী শরীফে হযরত ফাতেমাতুজ্জুহরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন দরূদ পড়তেন এবং বলতেন– رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

যখন বের হতেন দরূদ পড়তেন এবং বলতেন–

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

ইমাম আহমদ ও ইবনে মাযাহ এর বর্ণনায় আছে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় বলতেন, এরপর দোয়া পড়তেন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

হাদীসঃ (৩০-৩৩) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ এবং সবচেয়ে ঘৃণিত বাজার। অনুরূপ হাদীস যুবাইর বিন মুতয়িম, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আনস বিন মালেক (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে কতেক বর্ণনায় আছে যে, এটি আল্লাহর উক্তি।

হাদীসঃ (৩৪) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সাত (প্রকারের) ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা ছায়া দান করবে, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া হবে না।

(১) ন্যায় পরায়ণ শাসক। (২) ঐ যুবক ব্যক্তি যার যৌবন আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। (৪) ঐ দু'জন ব্যক্তি যারা পরস্পর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব রাখে এর উপর একত্রিত হয় এবং পৃথক হয় (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সম্ভ্রান্ত সুন্দর রমনী আহ্বান করেছে সে বলেছে আমি আল্লাহকে ভয় করছি। (৬) ঐ ব্যক্তি যে কোন কিছু দান করলে এত গোপনে তা করে তার ডান হস্ত কি ব্যয় করল, তা বাম হস্ত অবগত নয়। (৭) ঐ ব্যক্তি যে একা-নির্জনে আল্লাহর স্মরণে অশ্রুসিক্ত করে।

হাদীসঃ (৩৫) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীকরীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমরা কাউকে দেখবে নিয়মিত মসজিদে গমন করছে তোমরা তাঁর ঈমানের সাক্ষী হয়ে যাও। আল্লাহ্ বলেন, মসজিদ তারাই আবাদ রাখেন, যে আল্লাহর উপর এবং পূর্বের দ্বীনের উপর ঈমান-রাখবে। ইমাম তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি হাসন, গরীব। হাকেম বলেন, এ হাদীসটির সনদ সূত্র বিশুদ্ধ।

হাদীসঃ (৩৬) সহীহাঈনে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মসজিদে থুথু ফেলা, গুনাহ্। এর কাফ্ফারা হলো তা দূরীভূত করা।

হাদীসঃ (৩৭) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার নিকট আমার উম্মতের ভালমন্দ সব আমল পেশ করা হয়। ভাল কাজের মধ্যে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোকে পেয়েছি। মন্দ আমল হলো, মসজিদের থুথু দূরীভূত না করা।

হাদীসঃ (৩৮-৩৯) আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত আনস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার কাছে উম্মতের ছওয়াব পেশ করা হয়েছে। এমনকি মসজিদ থেকে কেউ ধূলি-কণা বের করলে তা-ও। এবং গুনাহ্ পেশ করা হয়েছে এর চেয়ে বড় কোন গুনাহ্ দেখিনি। কেউ আয়াত বা সূরা শিক্ষা করেছে অতঃপর তা ভুলে গেছে। ইবনে মাযাহ্ শরীফের অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মসিজদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে নেবে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবে।

হাদীসঃ (৪০-৪২) ইবনে মাযাহ্, তিবরানী ওয়াছেলো বিন আসকা থেকে আবু দাউদ শরীফে আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মসজিদকে শিশু, পাগল, এবং ক্রয় বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, উচ্চস্বরে কথা বলা, দন্ডবিধি কায়েম করা ও তরবারী তাক করা থেকে রক্ষা করো।

হাদীসঃ (৪৩) তিরমিযী, দারমী শরীফে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে, তখন বলবে, আল্লাহ্ তোমার ব্যবসায় লাভবান না করুক।

হাদীসঃ (৪৪) বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হাসান বসরী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এমন এক যুগ আসবে যখন মসজিদে দুনিয়াবী কথা হবে, তোমরা তাদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে আল্লাহর কোন কাজ নেই।

হাদীসঃ (৪৫) ইবনে খোজায়মা, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে ক্বিবলার দিকে থুথু দেখলেন, তা পরিষ্কার করলেন, অতঃপর লোকদের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ কাজ পছন্দ করে যে, তার সামনে কোন ব্যক্তি দাড়ায়ে থাকুক তার মুখের দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে।

হাদীসঃ (৪৬-৪৭) আবু দাউদ, ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবীকরীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ক্বিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করে কিয়ামত দিবসে সে এভাবে আসবে যে, তার থুথু দু'চক্ষুর মাঝখানে হবে। ইমাম আহমদ আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ।

হাদীসঃ (৪৮) সহীহ বোখারী শরীফে আছে, ছায়েব বিন ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে নিদ্রিত ছিলাম। এক ব্যক্তি আমার প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখলাম, তখন আমীরুল মু'মেনীন ফারুকে আজম (রাঃ) ছিলেন। বললেন, যাও ঐ দু'ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি দু'জনকে উপস্থিত করলাম। বললেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক? কোথাকার বাসিন্দা? তারা বললো, তায়েফের বাসিন্দা। বললেন, যদি তোমরা মদীনাবাসী হতে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম। (সেখানকার লোকেরা আদাব সম্পর্কে অবগত) আল্লাহর রাসূলের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছো।

ফকিহী আহকামঃ

মাসয়ালাঃ ক্বিবলার দিকে ইচ্ছাকৃত পা বিস্তার করা মাকরূহ। নিদ্রায় হোক জাগ্রত অবস্থায় হোক। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য শরয়ী কিতাব সমূহের দিকেও পা তাক করা মাকরূহ। হ্যাঁ, কিতাব যদি উঁচুস্থানে থাকে পায়ের বরাবর দিক না হয় তাহলে ক্ষতি নেই। বা বহু দূরে থাকলে যা প্রচলিতভাবে কিতাবের দিকে পা বিস্তার করা বলা হবে না, তখন মাফ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের পা ক্বিবলামুখী করে শয়ন করায়ে দিলে তা-ও মাকরূহ হবে। মাকরূহ হওয়াটা শয়নকারীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদের দরজা বন্ধ করে রাখা মাকরূহ। অবশ্য মসজিদের সামগ্রী চুরি হওয়ার আশংকা হলে, তখন নামাযের ওয়াক্ত ছাড়া বন্ধ করার অনুমতি রয়েছে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদের ছাদের উপর সহবাস, প্রস্রাব, পায়খানা করা হারাম। অনুরূপভাবে অপবিত্র এবং ঋতু সম্পন্না মহিলা সেখানে গমন করা হারাম। এটাও মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। মসজিদের ছাদে বিনা প্রয়োজনে চড়া মাকরূহ। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদকে রাস্তা বানানো, এর ভিতর দিয়ে আরোহন করাও নাজায়েয। তা অভ্যাসে পরিণত করা ফাসেকী, যদি এ নিয়্যাতে কেউ মসজিদে গেল, মাঝখানে গিয়ে লজ্জিত হলো, তখন ঐ দরজা দিয়ে সে বের হয়ে পড়বে। ঐ দরজা ছাড়া অন্য দরজা দিয়েও বের হতে পারবে বা সেখানে নামাজ পড়বে, অতঃপর বের হবে। আর অযু না থাকলে যেদিক হতে এসেছে ফিরে যাবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদে নাপাক নিয়ে গমন করা যদিও বা তদ্বারা মসজিদ অপবিত্র না হয়, বা যার শরীরে নাপাক লেগেছে এমন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ নাপাক তৈল মসজিদে জ্বালানো বা নাপাক চুনামাটি মসজিদে লাগানো নিষিদ্ধ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদে কোন পাত্রে প্রস্রাব করা, রক্তস্রাব নেয়াও জায়েয নেই (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ শিশু, পাগল, নাপাক ধারণা হলে তাদের মসজিদে নিয়ে যাওয়া হারাম। অন্যথায় মাকরূহ। যেসব লোক জুতো নিয়ে মসজিদে যায় তাদের উচিৎ জুতোর মধ্যে অপবিত্রতা লাগলে তা পরিষ্কার করে নেয়া এবং জুতা পরিধান করে মসজিদে প্রবেশ করা বেআদবী। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ঈদগাহ বা এমনস্থান যা জানাযা পড়ার জন্য করা হয়েছে, এক্তেদা সম্পর্কিত মসজিদের মাসায়েলে বর্ণিত হয়েছে যে, যদিও বা ইমাম ও মুক্তাদির মাঝখানে যত কাতারের জায়গাই দূরত্ব থাকুক এক্তেদা সহীহ হবে। বাকী মসজিদের আহকাম এর জন্য প্রযোজ্য নয়। এর অর্থ এ নয়, যে, এখানে পায়খানা প্রস্রাব করা জায়েয হবে, বরং মর্মার্থ হলো এই যে, অপবিত্র এবং ঋতুবর্তী মহিলারা এখানে আসা-যাওয়া করা জায়েয, মসজিদের আঙ্গিনা, মদ্রাসা, খানকাহ ছাড়া, এবং পুকুরের চত্বরের যে স্থানগুলো নামায পড়ার জন্য নির্মিত সবগুলো এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত যে হুকুম ঈদগাহের জন্য প্রযোজ্য। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদের দেওয়ালে কারুকার্য ও চিত্র প্রদর্শনী অঙ্কিত করা এবং সোনার পানি ছিটকানো নিষিদ্ধ নহে। যদিও মসজিদের তা'জীমের নিয়্যত হয়। কিন্তু ক্বিবলার দিকের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন মাকরূহ। এ হুকুম তখন হবে যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় হালাল সম্পদ দিয়ে চিত্র অঙ্কন করে। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ থেকে চিত্র সজ্জা করা হারাম। যদি মুতাওয়াল্লী ভাড়া বা প্রেইন্টারকে বেতন প্রদান করে তখন জায়েয হবে। যদি সম্পদ ওয়াক্‌ফ নিজে করে এবং মুতাওয়াল্লীকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছে তখন ওয়াক্‌ফ সম্পদ থেকে ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদের সম্পদ জমা থাকলে, জালিম কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হলে এমন অবস্থায় রং ও চিত্র সজ্জায় ব্যয় করা যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদের দেওয়ালে বা মেহরাবে কুরআন শরীফ লিখা সমীচীন নহে। এখান থেকে খসে পড়ে মাটির নীচে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অনুরূপভাবে বাড়ীর দেওয়ালে একই কারণে সমীচীন নহে। অনুরূপভাবে যে বিছানায় বা মসল্লায় আল্লাহ নাম সমূহ লিখিত আছে তা বিছানো বা অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয নেই। নিজের মালিকানা হতে পৃথক করে অন্যের ব্যবহারে না দেয়া তা-ও নিষিদ্ধ। এতে কি শান্তি রয়েছে! এসব জিনিষ সবচেয়ে উপরস্থানে রাখা ওয়াজিব, যেন তার উপর কোন জিনিষ না হয় (আলমগীরি)। অনুরূপভাবে অনেক দস্তরখানা এর উপর কবিতা লিপিবদ্ধ থাকে তা বিছানো এবং এর উপর খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ।

মাসয়ালাঃ মসজিদে অযু করা এবং কুল্লি করা এবং মসজিদের দেওয়ালে বা চাটাই এর উপর বা চাটায়ের নীচে থুথু ফেলা নাক সিটকানো নিষিদ্ধ। চাটাইয়ের নীচে ফেলা উপরে ফেলার চেয়ে আরো বেশী খারাপ। নাক ঝাকড়ানো বা থুথু ফেলাটা যদি অধিক প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন কাপড়ে নিয়ে নিবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদের মধ্যে কোন স্থান অযুর জন্য শুরুতেই নির্মাণ করেছে। মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা মসজিদ সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই তা করেছে যেখানে নামায হয় না, সেখানে অযু করতে পারবে। অনুরূপভাবে থালা বা অন্য কোন পাত্রেও অজু করতে পারে। তবে পূর্ণ সতর্কতার শর্তে যেন, পানির ছিটকা মসজিদে না পড়ে (আলমগীরি)। বরং মসজিদকে প্রত্যেক ঘৃণিত কাজ হতে রক্ষা করা জরুরী। বর্তমানে দেখা যায় অধিকাংশ লোক অযুর পর মুখ এবং হাতের পানি মুছে মসজিদে ঝেড়ে ফেলে এরূপ করা নাজায়েয।

মাসয়ালাঃ পায়ের সিক্ত কাদা মসজিদের দেওয়ালে বা স্তম্ভে মুছে নেয়া নিষিদ্ধ অনুরূপভাবে বিক্ষিপ্ত, কাদা, বালি, মাটি মুছে নেয়াটাও জায়েয নেই। কাদা জমাট হলে মুছে নিতে পারে। এভাবে মসজিদের পরিত্যক্ত লাকড়ী যেগুলো মসজিদ ভবনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তদ্বারা মুছতে পারবে। অকেজো চাটাইয়ের অংশ যার উপর পড়া হয় না, তাতেও মুছতে পারবে। কিন্তু বেঁচে থাকাটা উত্তম। (আলমগীরি, ছগীরি)

মাসয়ালাঃ কাদা ঝেড়ে মসজিদের এমন কোন স্থানে ফেলবে না যেখানে বেআদবীর শামিল। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদে কূপ খনন করা যাবে না। মসজিদ হওয়ার পূর্বে কূপ ছিল, এখন মসজিদের অন্তর্ভূক্ত চলে আসলে তা রাখা যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদে গাছ লাগানো জায়েয নেই। হ্যাঁ, যদি মসজিদের প্রয়োজন হয় যে জমীনে সজীবতা আছে শাখা প্রশাখা বিস্তার না করে এমন বৃক্ষ সজীবতা গ্রহণের জন্য লাগানো যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদের কাজ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মসজিদের আসবাবপত্র সামগ্রী রাখার জন্য মসজিদে কামরা বা কক্ষ নির্মাণ করা যেতে পারে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদে ভিক্ষা চাওয়া হারাম এবং এ ভিক্ষুককে দান করা নিষিদ্ধ। মসজিদে হারানো বস্তু তালাশ করা নিষেধ। হাদীস শরীফে আছে যে, যখন তোমরা মসজিদে হারানো বস্তু তালাশ করতে দেখবে, তখন বলবে। আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেয়। মসজিদ এজন্য নির্মিত হয়নি। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। (দুর্রুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ মসজিদে কবিতা পড়া নাজায়েয। অবশ্য কবিতা আল্লাহর প্রশংসা, প্রিয় নবীর প্রশংসাসূচক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হলে তা জায়েয। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসজিদে খানা-পিনা করা, ঘুম যাওয়া, এতেকাফকারী এবং বিদেশী ছাড়া কারো জন্য জায়েয নেই। সুতরাং যখন খানা-পিনা ইত্যাদির ইচ্ছা করবে তখন এতেকাফের নিয়্যতে মসজিদে যাবে। কিছু জিক্‌র নামায দুআ পড়ার পর খানা-পিনা করবে। অনেকেই শুধুমাত্র এতেকাফকারীর জন্য অনুমোদিত বলে উল্লেখ করেন। এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। রাষ্ট্রের নাগরিকত্বহীন লোকেরাও এতেকাফের নিয়্যত করবে। এর বিপরীত হতে বেচে থাকবে। (দুর্রুল মোখতার, ছগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদে কাঁচা রসুন, পিয়াজ খাওয়া, বা খেয়ে যাওয়া জায়েয নেই, যতক্ষণ গন্ধ থাকবে। এতে ফেরেস্তাদের কষ্ট হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন। যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধযুক্ত, বৃক্ষ থেকে খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে, যদ্বারা মানুষের কষ্ট পৌছে তদ্বারা ফেরেস্তাদেরও কষ্ট হয়। এ হাদীসটি বোখারী, মুসলিম, জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। একই হুকুম প্রত্যেক সেসব বস্তুতে, যেগুলোতে দুর্গন্ধ আসে। যেমন ঠাসা মুলা, কাঁচা মাংস, মাটির তৈল, এমন দিয়াশলাই যা প্রজ্বলনে গন্ধ বের হয়, বায়ু বের করা ইত্যাদি, যে ময়লাযুক্ত তৈল ব্যবহার করেছে বা কোন দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতস্থান বা গন্ধযুক্ত ঔষধ সেবন করলে যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গন্ধ দূরীভূত হবে না মসজিদে গমন নিষেধ। অনুরূপভাবে কসাই, মাছ বিক্রেতা, কুষ্ট রোগী, বা চর্মরোগী এবং এমন সব লোক যারা মানুষকে মুখে কষ্ট দেয় তাদেরকে মসজিদ থেকে প্রতিরোধ করা যাবে। বা আসতে বাধা দেয়া যাবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ ক্রয়, বিক্রয় এবং প্রত্যেক প্রকার বিনিময় চুক্তি মসজিদে নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র
এতেকাফ পালনকারীর জন্য অনুমতি রয়েছে। যদি ব্যবসার জন্য ক্রয়-বিক্রয় না করে
বরং নিজের এবং সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনে এবং ঐ বস্তু যদি মসজিদে নিয়ে আসা
না হয় তখন জায়েয হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসাআলাঃ মুবাহ কথাও মসজিদে বলা জায়েয নেই এবং আওয়াজ উচ্চ করাও
জায়েয নেই। (দুর্রুল মোখতার, ছগীরি)

দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে লোকেরা মসজিদকে আলাপচারিতার কেন্দ্রে
পরিণত করেছে। এমনকি অনেককেই মসজিদে গালাগালি ও মন্দ ব্যবহার
করতে দেখা যায়। (নাউজুবিল্লাহ)

মাসয়ালাঃ দরজী বা কাপড় সেলাইকারী মসজিদে বসে ভাড়ার ভিত্তিতে কাপড়
সেলাই করা জায়েয নেই যদি শিশুদের বাধা দেয়া বা মসজিদের হেফাজতের জন্য
বসে তখন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে লিখক মসজিদে বসে লিখা জায়েয নেই।
যদি ভাড়ার ভিত্তিতে লিখে। বিনিময় ছাড়া লিখলে জায়েয আছে, যদি লেখনী খারাপ
বিষয়ে না হয়। অনুরূপভাবে পারিশ্রমিক ভিত্তিতে শিক্ষক মসজিদে বসে শিক্ষা দেয়ার
অনুমতি নেই বিনিময় ছাড়া হলে অনুমতি আছে। (আলমগীরি)

মসজিদের বাতি ঘরে নেয়া যাবে না। রাত্রির তৃতীয়াংশে পর্যন্ত বাতি জ্বালাতে পারবে।
যদিও বা জামাত হয়ে যায়। এর বেশী জয়েয নেই। হ্যাঁ, ওয়াক্ফকারী যদি শর্ত যুক্ত
করে বা ওখানে রাত্রির তৃতীয়াংশের বেশী পরিমাণ জ্বালানোর নিয়ম থাকে তখন
জ্বালানো যাবে। যদিও বা পূর্ণ রাত্রি হয়। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদের বাতি দিয়ে কিতাব অধ্যায়ন, লেখা-পড়া, রাত্রির তৃতীয়াংশ
পর্যন্ত করা যাবে। যদিও বা জামাত হয়ে যায়। এরপর অনুমতি নেই। কিন্তু যেখানে
এরপরও জ্বালাবার নিয়ম রয়েছে সেটা ভিন্ন। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ বাদুর, কবুতর ইত্যাদি পাখির বাসা মসজিদের পরিচ্ছন্নতার জন্য
নিষ্পেষণ করতে ক্ষতি নেই। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ যিনি মসজিদ নির্মাণ করেছেন সংস্কার করা, লোটা বা ছোট জলপাত্র
ছাটাই, প্রদীপ ইত্যাদির তিনিই হকদার। এবং আজান, ইকামত, ইমামতের তিনি
যোগ্য হলে তিনিই হকদার। অন্যথায় তার মতামতের ভিত্তিতে তার উত্তরাধিকার
এবং পরিবার বা গোষ্ঠীর অন্যান্যরা উত্তম। (আলমগীরি, গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ মসজিদ নির্মাতা একজনকে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছে,
গ্রামবাসীরা অন্যজনকে বরল, গ্রামবাসীরা যাকে পছন্দ করেছেন তিনি যদি
শ্রেষ্ঠ হন, তাকে রাখা উত্তম।

মাসয়ালাঃ সব মসজিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উত্তম হলো মসজিদে হেরেম শরীফ। তারপর
মসজিদে নববী, অতঃপর মসজিদুল আকসা। অতঃপর ক্বোবা, অতঃপর জামে
মসজিদ সমূহ, অতঃপর গ্রামের মসজিদ এরপর সড়কের মসজিদ (রদ্দুল মোখতার)।

মাসয়ালাঃ মহল্লার মসজিদে নামায পড়া, যদিও বা জামাত ছোট হয় জামে মসজিদ
থেকে উত্তম, যদিও বা সেখানে বড় জামাত হয়। বরঞ্চ মহল্লার মসজিদে যদি জামাত
না হয়। তখন একা যাবে আজান ইকামত বলে নামায পড়াটা জামে মসজিদের
জামাত থেকে উত্তম। (ছগীরি ও অন্যান্য কিতাব)

মাসয়ালাঃ যদি কয়েকটি মসজিদ বরাবর হয় তখন এমন মসজিদ এখ্তিয়ার
করবে যে মসজিদের ইমামের জ্ঞান, যোগ্যতা অধিক (ছগীরি)। এতেও সমান
হলে, তখন যিনি প্রবীন। অনেকে বলেছেন, যে মসজিদ বেশী নিকটে হবে।
এটি প্রাধান্য যোগ্য।

মাসয়ালাঃ মহল্লার মসজিদে জামাত না পেলে অন্য মসজিদে জামাত
সহকারে পড়া উত্তম। অন্য মসজিদেও জামাত না পেলে তখন মহল্লার
মসজিদেই পড়া উত্তম। মহল্লার মসজিদে যদি প্রথম তাকবীর বা এক
দু'রাকাত চলে যায় কিন্তু অন্য মসজিদে পাওয়া যাবে, তখন অন্য মসজিদে
যাবে না। যদি আজান বলা হয় এবং জামাতে কেউ নেই, তখন মুয়াজ্জিন একা
পড়বে, অন্য মসজিদে যাবে না। (ছগীরি)

মাসয়ালাঃ মসজিদের যে আদব, মসজিদের ছাদেরও একই আদব। (গুনিয়া)

মাসয়ালাঃ আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। হাদীসে এরশাদ
হয়েছে যে, মুনাফিক ছাড়া কেউ আজানের পর মসজিদ থেকে বের হয় না। কিন্তু ঐ
ব্যক্তি যদি কোন কাজবশতঃ বের হয় এবং ফিরে আসার ইচ্ছে রাখে অর্থাৎ জামাত
কায়েমের পূর্বে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্য মসজিদের জামাতের ব্যবস্থাপক তাকে
সেখানে চলে যাওয়া সমীচিন।

মাসয়ালাঃ যদি ঐ ওয়াক্তের নামায পড়ে, ফেলে তখন আজানের পর মসজিদ
থেকে বের হতে পারবে। কিন্তু জোহর ও এশার নামাযে ইকামত হয়ে গেলে
বের হওয়া যাবে না। নফলের নিয়্যতে জমাতে শামিল হওয়ার হুকুম রয়েছে।
আর আবশিষ্ট তিন ওয়াক্তের নামাযে যদি তাকবীর হয়ে যায় এবং এ নামায
একা পড়ে নিয়েছে তখন বের হয়ে যাওয়া ওয়াজিব।

قد تم هٰذا الجزء بحمد الله سبحانه وتعالىٰ وصلى الله تعالىٰ
على حبيبه وآله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين والحمد
لله رب العٰلمين

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

بهار شريعت

حصه چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الاحد الصّمد المتفرد فى ذاته وصفاته فلا مثل له ولاضد له ولم يكن له كفواً احد، والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على رسوله وحبيبه سيد الانس والجان الذى انزل عليه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله وصحبه ماتعاقب الملوان وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين، لاسيما الأئمة المجتهدين خصوصاً على افضلهم واعلمهم الامام الاعظم والهمام الافخم الذى سبق فى مضمار الاجتهاد كل فارس وصدق عليه لوكان العلم عند الثريا لناله رجل من ابناء فارس سيدنا ابى حنيفة النعمان بن ثابت - ثبتنا الله به بالقول الثابت - فى الحياة الدنيا وفى الآخرة واعطانا الحسنى وزيادة فاخرة وعلينا لهم وبهم ياارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.

বাহারে শরীয়ত

৪র্থ খণ্ড

মূল

সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী (রহঃ)

অনুবাদ

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

প্রকাশক ঃ মোঃ মোহাঃ সাঈদুর রহমান

সাঈদ বুক ডিপো

কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম-৫০

ফোন - (০৩৫১২) ২৪৪১৪৮

মো- ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

প্রকাশক ঃ মৌঃ মোঃ সাঈদুর রহমান

সাঈদ বুক ডিপো

নিউ মার্কেট, রুম নং-৫০

কালিয়াচক, মালদহ।

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ লেখকের

মুদ্রণে ঃ নূর কম্পিউটার প্রেস, গুপ্ত মার্কেট (দ্বিতল), ৫তলা মসজি
সামনে, কালিয়াচক, মালদা। মো. ৯৭৩৩৩০১০২২ (সালাউদ্দি

تقریظ

امام اهل سنت مجدد مائة حاضره مؤيد ملّت طاهره اعليحضرت قبله رحمة الله عليه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لاسيما على الشارع المصطفى ومقتفيه فى المشارع اولى الطاهرة والصفا

فقير غفر له المولى القدير نے یہ مبارک رسالہ بہار شریعت حصہ چهارم تصنیف لطیف اخى فى الله ذى المجد والجاه والطبع السليم والفكر القويم والفضل والعلى مولانا ابوالعلى مولوى حكيم محمد امجد على قادرى بركاتى اعظمى بالمذهب والمشرب السكنى رزقه الله تعالى فى الدارين الحسنى مطالعه كيا، الحمد لله مسائل صحيحه رجيحه محققه منقحه پر مشتمل پایا آجکل ایسے کتاب کی ضرورت تهی که، عوام بهائی سلیس اردو میں صحیح مسئلے پائیں اور گمراهی واغلاط کے مصنوع وملمع زیوررونکی طرف آنکه نه اٹهائے مولى عز وجل مصنف کی عمر وعلم وفيض میں برکت دے اور هر باب میں اس کتاب کے اور حصص کافی وشافی ووافی تالیف کرنیکی توفیق بخشے اور انهیں اهل سنت میں شائع ومعمول اور دنیا وآخرت میں نافع ومقبول فرمائے. آمین.

والحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين. آمين. ١٢ شعبان المعظم ١٣٣٧ هجرية على صاحبها وآله الكرام افضل الصلوة والتحية، آمين.

كتبه عبده المذنب احمد رضا
عفى عنه بمحمدن المصطفے صلى الله عليه وسلم

মোজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর

অভিমত

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অসংখ্য সালাম তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি, বিশেষতঃ শরীয়তের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি, পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার ধারক শরয়ী বিধানে তাঁর পদাঙ্ক অনুসারীদের প্রতি।

মহান্য ও বান্দা মোস্তফিজাল মাওলা শফা করুন এর বরকতময় গ্রন্থ 'বাহারে শরীয়ত' চতুর্থ খণ্ড মুফতিঃ মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আমজাদ আলী কাদেরী বরকাতী আ'জমী আল্লাহ তাআলা তাঁকে উভয় জাহানে সফলতা দান করুন আমি পাঠ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ মাসআলা সমূহ বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধতাপূর্ণ এবং চমৎকার পেয়েছি। বর্তমানে এমন কিতাবের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা ছিলো। যেন সাধারণ ভাইয়েরা বিশুদ্ধ উর্দুতে বিশুদ্ধ মাসআলা সমূহ পায় এবং ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ, ভুল, মনগড়া এবং বাহ্যিক চাকচিক্যময় মাসআলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে মহান আল্লাহ তাআলা রচয়িতার আয়ু, জ্ঞান এবং কর্মক্ষেত্রে বরকত দান করুন। এ কিতাবের প্রতিটি পরিচ্ছেদে বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ, ত্রুটিহীন, পবিত্র এবং সত্য মাসআলা লিপিবদ্ধ করার তাওফীক দান করুন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে এ কিতাবের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হোক এবং তা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী এবং মকবুল করুন। আমীন।

'ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, ওয়াসাল্লাল্লাহু আ'লা সৈয়্যদানা ওয়ামাওলানা মুহাম্মদ, ওয়াআলিহি ওয়াছহাবিহি ওয়াইবনিহি ওয়াহিযবিহি আজমায়ীন।'

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিত ছাহাবীদের প্রতি উত্তমতর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আমীন।

১৩ই শা'বান, ১৩৩৭ হিজরী

আহমদ রেযা

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা সৈয়্যদিনা মাওলানা মুহাম্মদিন ওয়ালিহি ওয়াসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম

পরম করুণাময় মহান রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি যার অপরিসীম রহমতে বাহারে শরীয়ত চতুর্থ খণ্ডটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের খেদমতে পেশ করার সুযোগ হয়েছে। পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মুফাসসির সদরুশ শরীয়ত হযরতুল আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী (রহঃ) প্রণীত ২০ খণ্ডে লিখিত বাহারে শরীয়ত কিতাবটির ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড অনুদিত হয়ে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, অনূদিত খণ্ডগুলো পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। অপ্রকাশিত খণ্ডগুলো পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য পাঠক মহলের আগ্রহ এবং বিষয় বস্তুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশণার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। নামাজের বিস্তারিত বিধিবিধান, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব মাকরূহ, জানাযা, কাফন, দাফন, শোক পালন, শহীদের বর্ণনা সহ অজস্র নির্ভরযোগ্য মাসআলার সুষ্ঠ সমাধান সম্বলিত চতুর্থ খণ্ডটি প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জন্য একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকারী কিতাব। ধর্মানুরাগী জনাব আলহাজ্ব খায়রুল বশর ছাহেবের তনয় স্নেহের আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ'র ব্যয়বহুল আর্থিক বদান্যতায় কিতাবখানি সুলভ মূল্যে পাঠকদের সমীপে ৩য় সংস্করণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, আল্লাহ তাঁকে উভয় জাহানের কামিয়াবী দান করুন। কিতাবখানা প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও মাওলানা ইকবাল হোসেনের ক্লান্তিহীন শ্রম ও সহযোগিতায় সম্মানিত পাঠকদের সমীপে গ্রন্থটি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। প্রমাদমুক্ত করণের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না। অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করছি। পাঠক সমাজের গঠন মূলক পরামর্শ, সুচিন্তিত মতামত পরবর্তী সংস্করণ সংশোধনে বিশেষ অবদান রাখবে নিঃসন্দেহে, গ্রন্থখানির বহুল প্রচারে সম্মানিত বিক্রেতাগণ ও পাঠক মহলের আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে কাম্য। গ্রন্থখানি পাঠ করে মুসলিম ভাই বোনেরা যদি সামান্যটুকুও উপকৃত হন, এ অধমের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা স্বার্থক মনে করবো। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওসীলায় এ ক্ষুদ্র খিদমতকে কবুল করুন। আমীন। বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন। ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের সমষ্টি পবিত্র ধর্ম আল ইসলাম। মানবজাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলাম পেশ করেছে এক সঠিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল নির্দেশিকা। চিরস্থায়ী শান্তি ও মুক্তি অর্জনের প্রয়াসে ইসলামী বিধি বিধানের সঠিক অনুসরণ অনুকরণ ও যথার্থ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ঈমান গ্রহণের পর একজন মুসলমানের উপর সর্বাগ্রে অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে সালাত কায়েম বা নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দৈনন্দিন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, নামাজের ওয়াজিব সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং যাবতীয় বিধিবিধান সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলিম নরনারীদের সম্যক জ্ঞান না থাকায় প্রতিনিয়ত ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষে অপরাধের শামিল। ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রের জগতে বাহারে শরীয়ত গ্রন্থটি ইসলামী ফতোয়ার বিশ্বকোষ বলা চলে। উর্দূ ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে ভাষান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী ছাহেব অনূদিত ইতিপূর্বে বাহারে শরীয়ত ২য় ও ৩য় খণ্ড পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। যা ইতিপূর্বে ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নামাজের বিস্তারিত বিধি-বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনে অত্র চতুর্থ খণ্ডটি প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ। অনুবাদের এ মহৎ কর্মের জন্য আমি মুহতারম অনুবাদককে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমি নিজকে ধন্য মনে করছি। আল্লাহ আমাদের সকলের খিদমত কবুল করুন ও উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। আমিন।

বিনীত

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

বাহারে শরীয়ত

৪র্থ খণ্ড

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিতরের বর্ণনা ও ফজিলত	১১
বিতরের মাসাঈল ও দোআ কুনুতের বর্ণনা	১৩
সুন্নাত ও নফল সমূহের বর্ণনা ও নফলের ফজিলত	১৮
সুন্নাতে মুআক্কাদাহ'র বর্ণনা	২২
ফজরের সুন্নাতের ফজিলত	২৩
জোহরের সুন্নাতের মাসআলা	২৪
আসরের সুন্নাতের ফজিলত	২৫
মাগরিবের সুন্নাত ও সালাতুল আওয়াবিন এর বর্ণনা	২৬
এশার সুন্নাতের বর্ণনা	২৬
সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও নফলের মাসাঈল	২৭
নফল শুরু করার পর ভঙ্গ করার বর্ণনা	২৮
দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে গাড়ীতে নফল পড়ার মাসাঈল	৩০
ফরজ ওয়াজিব নামায বাহন বা গাড়ীতে পড়ার মাসাঈল ও ওজর সমূহের বর্ণনা	৩১
মান্নতের নামায পড়ার মাসাঈল	৩৪
তাহয়্যাতুল মসজিদ নামাযের মাসাঈল ও ফজিলত	৩৫
তাহয়্যাতুল অযুর নামায, এশরাকের নামায ও চাশতের নামাযের ফজিলত ও মাসাঈল	৩৫
সফরের নামায ও সফর থেকে ফিরে আসার পর নামাযের মাসাঈল ও ফজিলত	৩৭
সালাতুল লায়ল ও তাহাজ্জুদ নামাযের মাসাঈল ও ফজিলত	৩৭
রাত্রি পড়ার কতিপয় দোআ সমূহ	৪১
এস্তেখারার নামাযের বর্ণনা	৪২
সালাতুত তাসবীহ্ এর বর্ণনা	৪৪
সালাতুল হাজত এর বর্ণনা	৪৬
সালাতুল আসরার নামাযের নিয়ম	৪৮
তওবার নামায ও সালাতুর রাগায়িব এর বর্ণনা	৪৯
তারাবীহ নামাযের বর্ণনা	৪৯
একা নামায শুরু করল, জামাত কায়েম হল এ সম্পর্কিত মাসাঈল	৫৫
আজানের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নিষিদ্ধতা	৫৭

ইমামের বিরোধিতা করা এবং জামাতে শামিল হওয়ার মাসাঈল ৫৮
ক্বাযা নামাযের বর্ণনা, নামায ক্বাযা করার ওজরের বর্ণনা ৬০
ক্বাযা ও আদা'র সংজ্ঞা ক্বাযা নামায পড়ার নিয়মসমূহ ৬১
কয়েক ওয়াক্তের নামায ক্বাযা হলে তারতীব ওয়াজিব ও এর শর্ত সমূহ ৬৪
ক্বাযার বিভিন্ন মাসাঈল ৬৭
নামযের ফিদয়া' সম্পর্কে মাসাঈল ও ওমরী ক্বাযার বর্ণনা ৬৮
সাহু সিজদার বর্ণনা ৬৯
রুগ্ন ব্যক্তির নামাযের বর্ণনা ৮১
তিলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা ৮৭
সিজদার আয়াত সমূহের বর্ণনা ৮৮
তিলাওয়াতে সিজদার দোআ সমূহ ৯২
নামাযে সিজদার আয়াত পড়ার মাসাঈল ৯৪
এক মজলিসে সিজদার আয়াত পড়া ও তার মাসাঈল মজলিস পরিবর্তন করা না করার বিধান ৯৬
শুকরিয়া সিজদার কতিপয় স্থান ১০০
মুসাফিরের নামযের বর্ণনা ১০০
মুসাফির কাকে বলে? মুসাফিরের বিধানাবলী ১০২
একামত বা অবস্থানের নিয়তের শর্তাবলী ১০৫
মুসাফির, মুক্বীমের এক্তেদা করল, অথবা মুক্বীম, মুসাফিরের এক্তেদা করল এর বিধান ১১০
ওয়াতনে আছলী ও ওয়াতনে একামতের বর্ণনা ১১২
জুমআ'র বর্ণনা ও জুমআ'র দিবসের ফজিলতের বর্ণনা ১১৩
জুমআ'র দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যখন দোআ কবুল হয় ১১৭
জুমআ'র দিনে বা রাতে মারা যাওয়ার ফজিলত ১১৭
জুমআ'র নামাযের ফজিলত ১১৮
জুমআ' বর্জনকারীর শাস্তির বর্ণনা ১১৯
জুমআ'র দিনে গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করার ফজিলত ১২১
জুমআ'র জন্য প্রথমভাগে গমন করার ছওয়াব ও কাঁধের উপর অতিক্রম করার নিষিদ্ধতা ১২৩
জুমআ' পড়ার শর্তসমূহ ১২৫
প্রথম শর্তঃ শহর হওয়া– শহরের সংজ্ঞা ও বিধান ১২৫
দ্বিতীয় শর্তঃ ইসলামী শাসক হওয়া ও এর বিধান ১২৮
তৃতীয় শর্তঃ জোহরের সময় হওয়া এর মর্মার্থ ১২৯
চতুর্থ শর্তঃ খোৎবা পাঠ করা, এর শর্তাবলী খোৎবার সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহের বর্ণনা ১৩০
পঞ্চম শর্তঃ জামাতে ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন পুরুষ হতে হবে ১৩২
ষষ্ঠ শর্তঃ সাধারণ অনুমতি ১৩৩
জুমআ' ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী ১৩৩
শহরে জুমআ'র দিন যোহর পড়ার বিধান ১৩৬
খোৎবা সম্পর্কে কতিপয় মাসাঈল ১৩৭
জুমআ'র দিনে ও রাতে জুমআ'র কতিপয় আমল ১৩৯
দু'ঈদের বর্ণনা ১৪০
ঈদের দিনের মুস্তাহাব সমূহ ১৪২
ঈদের নামাযের নিয়ম, মসবুক ও লাহেকের বিধান ১৪৩
তাকবীরে তাশরীক এর মাসাঈল ১৪৭
গ্রহণের নামাযের বর্ণনা ১৪৮
এমন কতিপয় সময় যখন নামায পড়া মুস্তাহাব ১৫১
অন্ধকার, মেঘ ও বিদ্যুৎ গর্জনের সময় দোআ পড়ার বর্ণনা ১৫১
এস্তেস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযের বর্ণনা ১৫৩
ভয়কালীন নামাযের বর্ণনা ১৫৮
কিতাবুল জানায়েয বা জানাযার অধ্যায় ১৬৩
রোগ-ব্যাধির বর্ণনা ও এর উপকারিতা ১৬৩
রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করার ফজিলত ১৬৭
মৃত্যুর বর্ণনা ১৭১
মৃত ব্যক্তির গোসলের বর্ণনা ১৭৫
কাফনের বর্ণনা ১৮৩
কাফন পরিধানের নিয়ম ১৮৬
জরুরী মাসআলা সমূহ ১৮৭
জানাযা নিয়ে চলার বর্ণনা ১৮৮
জানাযা নামাযের বর্ণনা ১৯১
জানাযা নামাযের শর্তাবলী ১৯১
জানাযার চৌদ্দটি দোআ ১৯৫
জানাযার নামায কে পড়াবে ২০৪
কবর ও কাফনের বর্ণনা ২১১
কবর যিয়ারতের বর্ণনা ২১৬
কাফনের পর তলকীনের বর্ণনা ২১৯
শোক প্রকাশের বর্ণনা ২২০
বিলাপ ও ক্রন্দন করার বর্ণনা ২২৩
শহীদের বর্ণনা ২২৫
জিহাদে নিহত হওয়া ছাড়াও যারা শহীদের ছওয়াব পাবে তাদের বর্ণনা ২২৬
শহীদের সংজ্ঞা ও বিধান ২২৮
ক্বা'বা শরীফে নামায পড়ার বর্ণনা ২৩১-২৩২

بهار شریعت

حصہ چہارم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الاحد الصّمد المتفرد فی ذاته وصفاته فلا مثل له ولاضد له ولم يكن له كفواً احد، والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على رسوله وحبيبه سيد الانس والجان الذى انزل عليه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله وصحبه ماتعاقب الملوان وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين، لاسيما الأئمة المجتهدين خصوصاً على افضلهم واعلمهم الامام الاعظم والهمام الافخم الذى سبق فى مضمار الاجتهاد كل فارس وصدق عليه لوكان العلم عند الثريا لناله رجل من ابناء فارس سيدنا ابى حنيفة النعمان بن ثابت – ثبتنا الله به بالقول الثابت – فى الحياة الدنيا وفى الآخرة واعطانا الحسنى وزيادة فاخرة وعلينا لهم وبهم ياارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكرم

বিতরের বর্ণনা ও ফজিলত

হাদীস-১ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে নিদ্রা গেলাম, দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা হ'তে জাগ্রত হলেন। মিসওয়াক ও অজু করলেন, এমতাবস্থায় এ দোয়া পাঠ করলেন, اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। অর্থ "নিশ্চয় আসমান সমূহ ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে" সূরার শেষ নাগাদ পাঠ করেন, অতঃপর উঠে দাড়ালেন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। এ দু'রাকাতের কেয়াম, রুকু ও সিজদা খুব দীর্ঘায়িত করলেন। নামাজ শেষে তিনি পুণরায় নিদ্রা গেলেন। এমনকি তাঁর নাক ডাকতে লাগল, এভাবে তিনি তিনবার করলেন যাতে মোট ছয় রাকাত হল। প্রতিবারই তিনি মিসওয়াক করলেন অজু করলেন এবং উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলেন। পরে বিতর নামাজ তিন রাকাত পড়লেন।

হাদীস-২ঃ সহীস মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের রাত্রের শেষ নামাজকে বিতর বা বে-জোড় করবে। আরো এরশাদ করেন– সুবৃহে সাদেক আবির্ভাব হবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বিতর নামাজ পড়ে নেবে।

হাদীস-৩ঃ সহীহ্ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত জাবের (রঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শেষ রাত্রিতে উঠতে পারবে না এ আশংকা করে, সে যেন প্রথম রাত্রিতেই বিতর নামাজ আদায় করে ফেলে; আর যার শেষ রাত্রে উঠার ভরসা আছে সে যেন শেষ রাত্রেই (তাহাজ্জুদের পর) পড়ে। কেননা শেষ রাত্রের নামাজে রহমতের ফেরেস্তাগণ উপস্থিত থাকেন, আর এটাই হল উত্তম।

হাদীস-৪-৬ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আলী (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন," আল্লাহ্ স্বয়ং বেজোড়, ভালবাসেন বে-জোড়কে, হে কুরআনধারীগণ!

তোমরা বিতর নামাজ পড়বে, অনুরূপ বর্ণনা হযরত জাবের (রঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

হাদীস-৭-১১ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত খারিজাহ্ বিন হুযাফা (রঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তায়ালা একটি নামাজ দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, উহা তোমাদের জন্য লাল রঙের উট হতেও উত্তম। তা-হল বিতর নামাজ, আল্লাহ্ তায়ালা উক্ত নামাজ তোমাদের এ'শার নামাজ এবং সুবৃহে সাদেক উদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ হাদীসটি অপরাপর সাহাবীদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন– হযরত মায়াজ বিন জবল, আবদুল্লাহ্ বিন আমর ও ইবনে আব্বাস ওকবা বিন আমের জুহনী প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহ্ তায়ালা আনহুম থেকে বর্ণিত আছে।

হাদীস-১২ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রঃ) মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে যেন ফজরে তা কাজা করে।

হাদীস-১৩-১৬ঃ ইমাম আহমদ উবাই বিন কা'ব হতে, ইমাম দারমী ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে, আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রঃ) হতে, নাসায়ী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবযা (রঃ) প্রমুখ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম রাকতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (অর্থাৎ সূরা আ'লা) দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (অর্থাৎ সূরা কাফেরুন) তৃতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (অর্থাৎ সূরা ইখলাস) পড়তেন।

হাদীস-১৭ঃ আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম সহীহ সূত্রে বোরায়দা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বিতর নামাজ অপরিহার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বিতর পড়বে না, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

হাদীস-১৮ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি বিতর নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা পড়তে ভুলে গেছে, যখনই তার

স্মরণ পড়ে অথবা যখনই সজাগ হয় তখনই যেন উহা পড়ে নেয়।

হাদীস-১৯-২০ঃ আহমদ, নাসায়ী, দারে কুত্নী, আবদুর রহমান বিন আওফ সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন বিতর নামাজে সালাম ফিরাতেন, তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পড়তেন এবং তৃতীয়বার উচু আওয়াজে পড়তেন।

বিতরের মাসাঈল ও দোআ কুনুতের বর্ণনা

বিতর নামাজ ওয়াজিব, যদি ভুলক্রমে বা ইচ্ছকৃত পড়া না হয় ক্বাজা পড়া ওয়াজিব। ছাহেবে তারতীবের জন্য যদি তার স্মরণ থাকে যে বিতর নামাজ পড়েনি এবং সময়ের মধ্যে সুযোগও ছিল এমতাবস্থায় ফজরের নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে, নামাজ আরম্ভ করার শুরুতে স্মরণ হোক অথবা মাঝখানে স্মরণ হোক (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কোন ওজর ব্যতীত বিতর নামাজ বসে পড়া অথবা আরোহী অবস্থায় পড়া যাবে না। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ বিতর নামাজ তিন রাকাত। এতে প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। প্রথম বৈঠকে শুধুমাত্র আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দাড়িয়ে যাবে দরুদ পড়বে না, সালাম ফিরাবে না– যেমন মাগরিবে করা হয়। প্রথম বৈঠকে ভুলে যদি দাড়িয়ে যায় তখন পুণরায় করার অনুমতি নেই বরং সাহু সিজদা দিবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বিতরের প্রত্যেক রাকাতে মূলতঃ কেরাত ফরজ। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। উত্তম হলো, প্রথমে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (সূরা আ'লা) অথবা إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (সূরা কদর) দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (সূরা কাফেরুন) আর তৃতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস) পড়া।

কখনো কখনো অন্যান্য সূরাও পড়বে। তৃতীয় রাকাতে কেরাত সম্পন্ন করে রুকুর পূর্বে কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে 'আল্লাহ্ আকবর' বলবে, যেমন তাকবীরে তাহরীমাতে করা হয়। অতঃপর হাত বেঁধে নেবে এবং দুআ কুনুত পড়বে। দুআ কুনুত পড়া ওয়াজিব। এতে বিশেষ কোন দুআ পড়া জরুরী নহে। ঐ দুআ পড়াই উত্তম যা নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত। এছাড়া অন্যকোন দুআ

পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দোয়া নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করছি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আপনার প্রতি ঈমান (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখছি এবং আপনার উপর ভরসা করছি। আপনার উত্তম প্রশংসা করছি (চিরকাল) আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। কখনও আপনার অকৃতজ্ঞ বা কুফরী করব না, আপনার নাফরমানী যারা করে তাদের সঙ্গে আমরা কোন সংশ্রব রাখব না। তাদের আমরা পরিত্যাগ করে চলব, হে আল্লাহ আমরা একমাত্র আপনারই এবাদত করব একমাত্র আপনারই জন্য নামাজ পড়ব এবং অন্য কাউকে সিজদা করব না এবং একমাত্র আপনার আদেশ পালন ও তাবেদারির জন্য (সর্বদা) দৃঢ়মনে প্রস্তুত আছি। আপনার রহমতের আশা এবং আপনার আযাবের ভয় হৃদয়ে পোষণ করি। নিশ্চয়ই আপনার আসল আজাব শুধু নাফরমানদের উপরই হবে।

উপরোক্ত দুআর সাথে নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করাও উত্তম, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, দুআটি নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ مَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন কর এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের তুমি পথ প্রদর্শন করেছ, আমাকে শান্তি দান কর এবং তাদের দলভুক্ত কর যাদের তুমি শান্তি-স্বস্তি দান করেছ, তুমিই আমার অভিভাবক হও, তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি যা কিছু আমাকে দান করেছ, তা আমার জন্য কল্যাণকর কর, আর যেখানে তুমি অকল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছো– ওসব অকল্যাণ হতে আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই নির্দেশ দান কর। কিন্তু তোমার উপর আদেশ করা যেতে পারে না। নিশ্চয়ই যাকে তুমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে সে

কখনো অপমানিত হয় না। তুমি যাকে শত্রু জেনেছ সে সম্মানিত হয় না। হে আমার প্রতিপালক, তুমি কল্যাণময় ও মহিয়ান, আল্লাহ্ নবীর উপর দরুদ পাঠ করেন ও তাঁর বংশধরদের উপরও।

আর একটি দুআ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিতরের শেষে পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সন্তুষ্টি দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে; তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার শাস্তি হতে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি তোমার অভিসম্পাৎ হতে। আমি তোমার প্রশংসার হিসাব নিকাশ করার ক্ষমতা রাখি না, তুমি তদ্রুপই যতটা তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।

হযরত ওমর (রাঃ) عذابك الجد بالكفار ملحق এর পর এ দুআটি পড়তেন

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ عَلَيْهِمْ بَاْسَكَ الَّذِيْ لَمْ يُرَدَّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, সকল মুমিন নর-নারী ও মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা কর, তাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও,তাদের পরস্পর সম্পর্ক শুদ্ধ করে দাও, তোমার শত্রু ও তাদের শত্রুর উপর তাদেরকে সাহায্য কর, হে আল্লাহ! আহলে কিতাব কাফিরদের প্রতি তুমি অভিসম্পাৎ কর, যারা তোমার রসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ করে তুমি তাদের কথায় বিরোধিতা সৃষ্টি করে দাও, তাদের পদস্খলন কর। ওদের উপর তোমার সে শাস্তি নাজিল কর, যারা অপরাধী সম্প্রদায় থেকে ফিরে আসে না।

মাসআলাঃ দুআ কুনুতের পর দরুদ শরীফ পাঠ করা উত্তম। (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ দোয়া কুনুত ধীরে ধীরে নিম্নস্বরে পড়বে ইমাম হোক বা মুক্তাদি , আদা হোক বা ক্বাজা হোক, রমজানে হোক বা অন্যদিনে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি দুআ কুনুত পড়তে জানে না এ দুআটি পড়বেঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকাল পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের শাস্তি হতে আমাদেকে মুক্তি দান করুন।

মাসআলাঃ দোয়া কুনুত পড়তে যদি ভুলে যায় আর রুকুতে চলে গেল, তখন দাড়ানোর দিকেও ধাবিত হবে না, রুকুতেও তা পড়বে না। আর যদি দাড়ানোর দিকে ফিরে আসে এবং কুনুত পড়ে নেয় বা রুকুতে পড়ে নেয়, তখন নামাজ ফাসেদ হবে না। কিন্তু গুনাহগার হবে।

শুধু 'আলহামদু' (সূরা ফাতেহা) পড়ে রুকুতে চলে গেল তখন পুণরায় দাড়িয়ে যাবে আর সূরা এবং কুনুত পড়ে নেবে। অতঃপর রুকু করবে, শেষে সহু সিজদা করবে। এভাবে যদি 'আলহামদু' পড়া ভুলে যায় এবং সূরা পড়ে নিল তখন পুণরায় ফিরে ফাতেহা, সূরা ও কুনুত পড়ার পর রুকু করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রুকুতে ইমামের স্মরণ হল যে, দুআ কুনুত পড়া হয়নি, তখন দাড়ানোর দিকে যাবে না, তারপরও যদি দাড়িয়ে যায় এবং দুআ পড়ে নেয়, তখন পুণরায় রুকু করতে হবে না। আর যদি রুকু পুণরায় করে মুক্তাদিগণ যদি প্রথম রুকুতে ইমামের সাথে ছিল না দ্বিতীয় রুকু ইমামের সাথে করল, বা প্রথম রুকু ইমামের সাথে করেছে দ্বিতীয় রুকু করেনি উভয়াবস্থায় তাদের নামাজও ফাসেদ হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বিতরের কুনুতে মুক্তাদি ইমামের অনুসরণ করবে, মুক্তাদি এখনো কুনুত শেষ করেনি ইমাম রুকুতে চলে গেল তখন মুক্তাদিও ইমামের সাথে রুকুতে যাবে। ইমাম কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে গেল মুক্তাদি এখনো কিছু পড়েনি, তখন যদি মুক্তাদির রুকু বাদ পড়ার আশংকা হয় তখন রুকু করে নিবে। নতুবা কুনুত পড়ে রুকুতে যাবে। দুআ কুনুত নামে প্রসিদ্ধ দুআটি পড়ার প্রয়োজন নেই বরং সাধারণ যে কোন দুআ যাকে কুনুত বলা চলে পড়ে নিবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি সন্দেহ হয় যে, এটি প্রথম রাকাত, বা দ্বিতীয় রাকাত বা তৃতীয় রাকাত তখনও কুনুত পড়বে এবং বৈঠক করবে অতঃপর আরো দু'রাকাত পড়বে।

প্রতি রাকাতে কুনুতও পড়বে এবং বৈঠক বসবে। এভাবে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকাত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তখন উভয় রাকাতে কুনুত পড়বে। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ ভুলবশতঃ প্রথম রাকাত বা দ্বিতীয় রাকাতে দুআ কুনুত পড়ে নিল, তখন তৃতীয় রাকাতে পুণরায় পড়বে। এটিই অগ্রগণ্য (গুনীয়া, হুলীয়া, বাহার)

মাসআলাঃ মসবুক মুক্তাদি ইমামের সাথে পড়বে, পরে পড়বে না। ইমামের সাথে যদি তৃতীয় রাকাতের রুকুতে মিলিত হয়, পরে যা পড়বে তাতে কুনুত পড়বে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বিতর নামাজ শাফেয়ী মাজহাবপন্থী লোকদের পিছনে পড়া যাবে। তবে শর্ত হলো দ্বিতীয় রাকাতের পর সালাম ফিরাবে না। অন্যথায় সহীহ হবে না। এমতাবস্থায় কুনুত ইমামের সাথে পড়বে। অর্থাৎ তৃতীয় রাকাতের রুকু হতে দাঁড়াবার পর– ইমাম যদি শাফেয়ী মতাবলম্বী হয় (ফিকহার কিতাব সমূহ)

মাসআলাঃ ফজরে যদি শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামের এক্তেদা করা হয় এবং সে যদি স্বীয় মজহাব অনুসারে কুনুত পড়ে তখন মুক্তাদি পড়বে না। তবে হাত উত্তোলনের সময় পর্যন্ত চুপ করে থাকবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ বিতর ব্যতীত অন্য কোন নামাজে কুনুত পড়বে না। তবে যদি কোন বড় ধরনের বিপদ ঘটে তখন ফজরের নামাজেও পড়া যাবে। প্রকাশ্য মত হল, রুকুর পূর্বে কুনুত পড়বে। (দুররুল মোখতার ও খামুভী)

মাসআলাঃ বিতরের নামাজ ক্বাজা হয়ে গেলে তখন ক্বাজা পড়া ওয়াজিব। যদিও দীর্ঘকাল হয়। ভুলবশতঃ ক্বাজা হোক বা ইচ্ছাকৃত ক্বাজা হোক, যখন ক্বাজা পড়বে তখন কুনুত সহ পড়বে। অবশ্য ক্বাজার মধ্যে কুনুতের তাকবীরের জন্য হাত উঠাবে না– যখন মানুষের সামনে পড়বে; যেহেতু মানুষ তার ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ রমজান শরীফ ব্যতীত অন্য দিনে বিতর জামাত সহকারে পড়বে না এবং তা যদি ঘোষণা বা আহ্বানের ভিত্তিতে হয় তখন মাকরূহ হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যিনি রাতের শেষভাগে জাগ্রত হবার ব্যাপারে অভ্যাশীল, তার জন্য রাতের শেষভাগে বিতর পড়া উত্তম। অন্যথায় এশার পর পড়ে নেবে। (হাদীস)

বিঃদ্রঃ মসবুকের সংজ্ঞাঃ যে মুক্তাদি, ইমাম এক বা একাধি রাকাত পড়ার পর নামাযে শামিল হল শেষয় পর্যন্ত ইমামের সাথে শামিল ছিল তাকে মসবুক বলা হয়।

মাসআলাঃ রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়ে নিদ্রা গেল অতঃপর শেষাংশে জাগ্রত হয়ে দ্বিতীয়বার বিতর পড়া জায়েয নেই। তবে নফল নামাজ যত ইচ্ছে পড়া যাবে। (গুণীয়া)

মাসআলাঃ বিতরের পর দু'রাকাত নফল পড়া উত্তম। এ প্রথম রাকাতে اِذَا زُلْزِلَتِ দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়া উত্তম। হাদীস শরীফে আছে, যদি রাতে উঠা না যায় এ নামাজ তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে। এ বিষয়টি হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত।

সুন্নাত ও নফল নামাজ সমূহের বর্ণনা ও নফলের ফজিলত

হাদীস-১ঃ সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তাঁকে যুদ্ধের ঘোষণা দিই। আর আমার বান্দা কোন কিছু দ্বারা (আমার) এতোধিক নৈকট্য অর্জন করতে পারে না, যতো ফরজ কার্যাদি পালন করা দ্বারা পারে। আর নফলসমূহ দ্বারা সর্বদা (আমার) নৈকট্য অর্জন করতে থাকে- শেষ পর্যন্ত (আমি) তাঁকে আমার মাহবুব করে নিই। আর যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, তাঁকে তা প্রদান করবো। আর যদি পরিত্রাণ চায়, তবে পরিত্রাণ দেবো।

হাদীস-২-৩ঃ সহীহ মুসলিম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, উম্মুল মুমেনীন উম্মে হাবিবা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনে ও রাত্রে বার রাকাত নামাজ পড়বে, তার জন্য বেহেস্তে একখানা ঘর নির্মাণ করা হবে। জোহরের ফজরের পূর্বে চার রাকাত জোহরের পর দু'রাকাত মাগরিবের ফরজের পর দু'রাকাত এশার ফরজের পর দু'রাকাত এবং ফজরের ফরজের পূর্বে দু'রাকাত অন্যান্য রাকাতের বিবরণ শুধুমাত্র তিরমিযী শরীফে উল্লেখ আছে তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা শরীফে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি উপরোক্ত নামাজ যথাযথ আদায় করবে, জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীস-৪ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, (কুরআনে পাকের সূরা

তূরে) তারকারাজির অস্ত যাবার কালে যে ادبار النجوم নামাজ আদায় করার কথা বলা হয়েছে, তা-হল ফজরের ফরজের পূর্বের দু'রাকাত এবং ادبار السجود অর্থাৎ সূরা কাফে উল্লেখিত নামায, মাগরিবের ফরজের পর দু'রাকাতের কথা বলা হয়েছে।

হাদীস-৫ঃ সহীহ মুসলিম, তিরমিযী শরীফে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ফজরের পূর্বের দু'রাকাত নামাজ দুনিয়া ও উহার সমুদয় সবকিছু অপেক্ষা অনেক উত্তম।

হাদীস-৬ঃ সহীহ বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ শরীফে হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নফল বা সুন্নত নামাজ সমূহের মধ্যে কোন নামাজের প্রতিই এত অধিক লক্ষ্য রাখতেন না, যত অধিক লক্ষ্য রাখতেন ফজরের (পূর্বের) দু'রাকাত সুন্নতের প্রতি।

হাদীস-৭ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক সাহাবী আরজ করলেন- এয়া রাসুলাল্লাহ! এমন কিছু আমল বলুন, যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। এরশাদ করলেন, ফজরের পূর্বের দু'রাকাতকে অপরিহার্য কর- এতে বড় ফজীলত রয়েছে।

হাদীস-৮ঃ আবু ইয়ালা হাসন সূত্রে আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান আর রসুলুল্লাহ উভয় সূরা ফজরের সুন্নতে পড়তেন এবং এটা বলতেন, এ সূরা সমূহে যুগের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে।

হাদীস-৯ঃ আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ফজরের সুন্নত ত্যাগ করো না, যদিও শত্রুর ঘোড়া তোমাদের আক্রমণ করে বসে।

হাদীস-১০ঃ আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ শরীফে উম্মুল মোমেনীন উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার এবং পরের চার রাকাতের হেফাজত করবে, আল্লাহু তাআলা তার উপর দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন।" তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান, সহীহ, গরীব বলেছেন।

হাদীস-১১ঃ আবু দাউদ ইবনে মাজাহ্ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জোহরের ফরজের পূর্বের চার রাকাত নামাজ পড়ে– যার মাঝখানে সালাম ফিরাবে না, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

হাদীস-১২ঃ আহমদ, তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সায়েব (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমে হেলে যাবার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়তেন এবং বলতেন ইহা এমন একটি সময়, যে সময়ে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। সুতরাং আমি পছন্দ করি যে, সে সময় আমার একটি নেক আমল তথায় উঠুক।

হাদীস-১৩ঃ বাজ্জার (রঃ) সওবান (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, দুপুরের পর চার রাকাত পড়া হুজুর পছন্দ করতেন, উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রঃ) আরজ করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এ সময়ে হুজুর নামাজ পড়াকে পছন্দ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এ সময় আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিরাজির প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখেন। আদম (আঃ) নুহ (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ) প্রমুখ এ নামাজের যত্ন করতেন।

হাদীস-১৪-১৫ঃ তবরানী শরীফে হযরত বা'রা বিন আযেব (রঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বের চার রাকাত আদায় করল, সে যেন তাহাজ্জুদের চার রাকাত আদায় করল। যে এশার পর চার রাকাত পড়ল, সে যেন শবে কদরের চার রাকাত পড়ল। হযরত ফারুকে আজমসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস-১৬ঃ আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফে হাসন সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা সে ব্যক্তির উপর রহমত করেন যে আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ে।

হাদীস-১৭ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আসরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় আছে যে, দু'রাকাত পড়তেন।

হাদীস-১৮-১৯ঃ তবরানী কবির গ্রন্থে হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা (রঃ) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে আসরের (ফরজের পূর্বে) চার রাকাত পড়বে, আল্লাহ তার দেহের উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করবেন। তবরানীর অপর এক বর্ণনায় হযরত আমর বিন আস থেকে বর্ণিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মজলিসে যেখানে আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রঃ)ও উপস্থিত ছিলেন, এরশাদ করলেন, যে আসরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত পড়বে তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।

হাদীস-২০-২১ঃ রযীন হযরত মাকহুল থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরজ পড়ার) পর কথাবার্তা বলার পূর্বে দু'রাকাত পড়বে, তার নামাজ ইল্লিয়্যীনে পৌছানো হবে। অপর এক বর্ণনায় চার রাকাত উল্লেখ আছে। একই বর্ণনা হযরত হুযায়ফা (রঃ) থেকে বর্ণিত। এতে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, মাগরিবের পর দু'রাকাত তাড়াতাড়ি পড়ো, তা ফরজের সাথে পেশ করা হবে।

হাদীস-২২ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজা শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়বে মাঝখানে যদি কোন মন্দ কথাবার্তা না বলে, তা বার বৎসরের এবাদতের সমান হবে।

হাদীস-২৩ঃ তবরানী শরীফের বর্ণনায় আম্মার বিন ইয়াসের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়বে তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।

হাদীস-২৪ঃ তিরমিযী শরীফে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে– যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরজ) নামাজের পর বিশ রাকাত (নফল) নামাজ পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেস্তে একখানা গৃহ নির্মাণ করবেন।

হাদীস-২৫ঃ আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এশার নামাজ পড়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে তশরীফ আনতেন, তখন চার রাকাত অথবা ছয় রাকাত নফল নামাজ পড়তেন।

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ'র বর্ণণা

সুন্নতের মধ্যে কতিপয় সুন্নতে মোআক্কাদা– যেসব সুন্নতের ব্যাপারে শরীয়তের তাগিদ রয়েছে, বিনা ওজরে একবারও বর্জন করলে গুনাহ্গার হবে। বর্জনে অভ্যস্থ হয়ে পড়লে ফাসিক এবং(শরয়ী বিধানে) তার সাক্ষ্য পরিত্যাজ্য ও শাস্তির যোগ্য হবে। কোন কোন ইমামগণ বলেছেন, তাকে পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য করা হবে এবং গুনাহ্গার হবে। যদিও গুনাহ্ ওয়াজিব বর্জনের চেয়ে কম হয়। তালভীহ্ নামক কিতাবে আছে, সুন্নতে মুআক্কাদা বর্জন হারামের নিকটতম। তা বর্জনকারী (আল্লাহ ক্ষমা করুক) শাফায়াত হতে বঞ্চিত হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে আমার সুন্নত পরিত্যাগ করবে সে আমার শাফায়াত পাবে না। 'সুন্নতে মুআক্কাদাহ'কে 'সুনানুল হুদা'ও বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ যাকে 'সুন্নতে যায়েদাহ'ও বলা হয়। এ প্রকারের সুন্নত সম্পর্কে শরীয়তের তাগিদ নেই। কোন সময় এ প্রকার সুন্নতকে মুস্তাহাব এবং মানদুবও বলা হয়। নফল হচ্ছে সাধারণ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ যা সুন্নতের উপরও প্রয়োগ হয়। সুন্নত ব্যতীত অন্য ইবাদতকে নফল বলা হয়। এ কারণেই ফোকাহায়ে কেরাম নফলের অধ্যায়ে সুন্নতকেও উল্লেখ করেছেন বিধায় নফলও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (রদ্দুল মোখতার)

সুতরাং নফলের যতসব বিধানাবলী বর্ণনা হবে তা সুন্নতকেও শামিল করবে। অবশ্য যদি সুন্নত সম্পর্কে কোন বিশেষ আলোচনা হলে তখন সাধারণ হুকুম থেকে তা পৃথক হয়ে যাবে। যেখানে বিশেষিত হবে না, সেক্ষেত্রে মুতলাক হুকুম নফলের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে হবে।

মাসআলাঃ সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

* ফজরের নামাজের পূর্বে দু'রাকাত
* জোহরের নামাজের পূর্বে চার রাকাত আর পরে দু'রাকাত
* মাগরিবের নামাজের পরে দু'রাকাত
* এশার নামাজের পর দু'রাকাত
* জুমার নামাজের পূর্বের চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত

জুমার দিন জুমা আদায়কারীর জন্য সর্বমোট চৌদ্দ রাকাত আর জুমা ব্যতীত অন্যান্য দিন সমূহে প্রতিদিন বার রাকাত হিসেবে। (ফিকহ্র কিতাব সমূহ)

মাসআলাঃ উত্তম হলো জুমার পর চার রাকাত পড়বে। অতঃপর দু'রাকাত পড়বে, যেন উভয় হাদীসের উপর আমল করা হয়।(গুনীয়া)

মাসআলাঃ যেসব সুন্নত চার রাকাত বিশিষ্ট যেমন জুমা ও জোহরের সুন্নত তখন চার রাকাত এক সালামে পড়বে। অর্থাৎ চার রাকাত পড়েই সালাম ফিরাবে। দুই রাকাত দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাবে না। যদি কেউ এরূপ করে সুন্নত আদায় হবে না। অনুরূপভাবে যদি চার রাকাতের মান্নত করা হয় তা যদি দু'রাকাত দু'রাকাত করে পড়া হয় মান্নত পূর্ণ হবে না। বরং জরুরী হলো এক সালামে চার রাকাত পড়া। (দুররুল মোখতার)

ফজরের সুন্নাতের ফজিলত

মাসআলাঃ সব সুন্নতের মধ্যে ফজরের সুন্নত সর্বাধিক গুরুত্ববহ। এমনকি অনেকেই ইহাকে ওয়াজিব বলেছেন। যদি তার বিধান কেউ অস্বীকার করে সন্দেহমূলক বা অজ্ঞতাবশতঃ তখন কুফরীর আশংকা রয়েছে। আর যদি নিঃসন্দেহে জ্ঞাতসারে অস্বীকার করে কাফির হয়ে যাবে বিধায় বিনা ওজরে ওসব সুন্নত বসে কিংবা আরোহী অবস্থায় হোক বা চলমান গাড়ীতে পড়া যাবে না।

ওসবের বিধান উপরোক্ত বিষয়ে বিতরের হুকুমের মত। এরপর গুরুত্বের দিক দিয়ে মাগরিবের সুন্নাত সমূহ এরপর জোহরের পরবর্তী সুন্নত। এরপর এশার পরবর্তী সুন্নত অতঃপর জোহরের পূর্বের সুন্নতসমূহ। বিশুদ্ধ মতানুসারে ফজরের সুন্নাতের পর জোহর নামাজের পূর্বের সুন্নতের মর্তবা। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে এরশাদ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে সে আমার শাফায়াত পাবে না। (রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যদি কোন আলেম ফতোয়াদানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সুন্নত পড়ার সময় পাচ্ছে না, তখন তাঁর জন্য ফজর ছাড়া অবশিষ্ট সুন্নত সমূহ পরিত্যাগ করা যাবে। এ সময়ে যদি সুযোগ না হয় স্থগিত রাখবে আর সময় থাকতে যদি সুযোগ মিলে পড়ে নেবে। সুযোগ পাওয়া না গেলে মাফ। ফজরের সুন্নতসমূহ এ অবস্থাও বর্জন করা যাবে না (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফজরের নামাজ ক্বাজা হয়ে গেল, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে পড়ে নিল, তখন সুন্নতও পড়ে নেবে। অন্যথায় নহে। ফজর ব্যতীত অন্য

সুন্নতসমূহ ক্বাজা হয়ে গেল তখন ওসবের ক্বাজা করতে হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ দু'রাকাত নফল পড়ল, ধারণা হলো এখনো ফজর উদিত হয়নি, পরে অবগত হলো, ফজর উদয় হল, তখন এ দু'রাকাত ফজরের সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। ফজর উদয় অবস্থায় আদায় হল তখন এ সুন্নত ফজরের সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে ফজরের সুন্নত জায়েয হবে না। উদয়ের ব্যাপারে সন্দেহজনক হলে তখনও জায়েয নহে। উদয়ের সাথে সাথে শুরু করলে জায়েয হবে। (আলমগীরি)

জোহরের সুন্নতের মাসআলা

মাসআলাঃ জোহর বা জুমার পূর্বের সুন্নত বাদ পড়ে গেল, ফরজ পড়ে নেবে সময় থাকলে ফরজের পর পূর্বের সুন্নত পড়ে নেবে। উত্তম হলো পরের সুন্নত আদায়ের পর পূর্বের সুন্নত পড়ে নেয়া। (ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ ফজরের সুন্নত ক্বাজা হল, ফরজ পড়ে নিল, এখন সুন্নতের ক্বাজা নেই। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেছেন, সূর্যোদয়ের পর পড়ে নেয়া উত্তম (গুনীয়া)। তবে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তে সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। (রদ্দুল মোখতার)

বর্তমানে সাধারণ জনগণ ফরজের পর দ্রুতভাবে পড়ে দেয়, এরূপ করা জায়েয নহে। পড়তে চাইলে সূর্য উঁচু হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে চলে যাবার পূর্বে পড়ে নেবে।

মাসআলাঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সুন্নত ক্বাজা পড়ার জন্য শুরু করে ভেঙ্গে দেয়া, পুণরায় আদায় করা, এটা নাজায়েয। ফজরের সুন্নত পড়ে নিল ফরজ ক্বাজা হল, ফরজ ক্বাজা পড়ার ক্ষেত্রে সুন্নত পুণরায় পড়বে না। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ ফরজ একাকী পড়লে তখনও সুন্নত পরিত্যাগ করা জায়েয নেই। (আলমগীরি)

ফজরের সুন্নতের প্রথম রাকাতে আলহামদুর পর সূরা 'কাফেরুন' দ্বিতীয় রাকাতে 'কুলহুআল্লাহ' পড়া সুন্নত। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ জামাত কায়েম হবার পর কোন প্রকার নফল শুরু করা জায়েয নেই। ফজরের সুন্নত ব্যতীত যদি মনে হয় সুন্নত পড়ার পর জামাত পাওয়া যাবে যদিও

বৈঠকে শামিল হোক, তখন সুন্নত পড়ে নেবে। কিন্তু সারির বরাবর পড়া জায়েয নেই। বরং নিজ ঘরে বা মসজিদের বাহিরে নামাজের উপযোগী কোন জায়গা থাকলে সেখানে পড়ে নেবে। যদি তা সম্ভব না হয় এবং ভিতরের অংশে জামাত হচ্ছে তখন বাহির অংশে পড়বে। বাহির অংশে জামাত হলে ভিতর অংশে পড়বে। যদি মসজিদের ভিতরে বাহিরে দু'টি দরজা না থাকে তখন দেওয়াল বা স্তম্ভের আড়ালে পড়বে। যেন নামাজী এবং সারির মধ্যে পর্দা হয়ে যায়। সারির পিছনে পড়াও নিষিদ্ধ। যদিও সারিতে পড়া অধিক অন্যায় কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশে জনগণ এর প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে না এবং সারিতে ঘেষে শুরু করে দেয়, এরূপ নাজায়েয। যদি এখনো জামাত শুরু হয়নি তখন যেথায় ইচ্ছে সুন্নত শুরু করা যাবে। যে কোন সুন্নত হোক (গুনীয়া)। কিন্তু যদি নামাযী জানেন শীঘ্রই জামাত কায়েম হবে এবং এ সময়ের মধ্যে সুন্নত শেষ করা যাবে না মনে হলে তখন এমন স্থানে পড়বে না– যে কারণে কাতার বন্ধ হয়ে পড়বে।

মাসআলাঃ যদি সময়ের মধ্যে সুযোগ থাকে এবং এমন সময়ে নফল পড়া মাকরূহও নহে তখন যত ইচ্ছে নফল পড়া যাবে। আর যদি ফরজ নামাজ ব জামাত চলে যাচ্ছে তখন নফলে লিপ্ত হওয়া জায়েয নেই।

মাসআলাঃ সুন্নত ও ফরজের মাঝখানে কথা বলার ব্যাপারে হুকুম হলো, সুন্নত বাতিল হবে না। অবশ্য ছওয়াব কম হবে। এ হুকুম প্রত্যেক কাজে যেগুলো হারামের পরিপন্থী (তানভীর)। যদি ক্রয় বিক্রয় বা পানাহারে মশগুল হয়, তখন পুণরায় পড়বে। তবে ফরজের পরবর্তী সুন্নতের মধ্যে যদি খাবার সামনে আনা হয় এবং স্বাদ নষ্ট হবার আশংকা হলে তখন খাবার খেয়ে নেবে। তারপর সুন্নত পড়বে। কিন্তু যদি সময় চলে যাওয়ার আশংকা হয় নামাজের পর খাবার খাবে। বিনা ওজরে ফজরের পরবর্তী সুন্নত বিলম্ব করাও মাকরূহ যদিও আদায় হয়ে যায়। (রদ্দুল মোখতার)

আসরের সুন্নাতের ফজিলত

মাসআলাঃ এশা ও আছরের পূর্বে এবং এশার পর চার-চার রাকাত এক সালাম সহকারে পড়া মুস্তাহাব। এবং এটাও এখতিয়ার আছে যে, এশার পর দু'রাকাত পড়লেও মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে। এভাবে জোহরের পর চার রাকাত পড়া মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, যে জোহরের পূর্বে চার এবং পরে চার

রাকাত সংরক্ষণ করেছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করেছেন। আল্লামা সৈয়্যদ তাহতাবী বলেছেন সে শুরু থেকে জাহান্নামে প্রবেশই করবে না এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যারা তার নিকট পাওনাদার আল্লাহ তায়ালা সে দলকে সন্তুষ্ট করে দেবেন। অথবা এর মর্মটি হলো তাকে এমন কাজের তৌফিক দেবেন যার উপর শাস্তি হবে না। আল্লামা শামী বলেছেন– তার জন্য সুসংবাদ, তার সমাপ্তি শুভ হবে এবং দোযখে যাবে না।

মাসআলাঃ সুন্নতের মান্নত করল এবং পড়ল, আদায় হয়ে গেল, এভাবে শুরু করে ভেঙ্গে দিল পুণরায় পড়ল তখনও সুন্নত আদায় হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নফল নামাজ মান্নতসহকারে পড়া মান্নতবিহীন পড়ার চেয়ে উত্তম– যদি মান্নত কোন শর্তের সাথে যুক্ত না হয়। যেমন অমুক রোগ সুস্থ হলে এত রাকাত নামাজ পড়বো। সুন্নতের ক্ষেত্রে মান্নত না করা উত্তম। (রদ্দুল মোখতার)

মাগরিবের সুন্নাত ও সালাতুল আওয়াবীন-এর বর্ণনা

মাসআলাঃ মাগরিবের পর ছয় রাকাত মুস্তাহাব– এগুলোকে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়। এক সালাম সহকারে অথবা দুই সালাম সহকারে অথবা তিন সালাম সহকারে পড়া যায়। প্রত্যেক দু'রাকাত পর সালাম ফিরানো উত্তম। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জোহর ও মাগরিব এবং এশার পর যে মুস্তাহাব আছে সেক্ষেত্রে সুন্নতে মুআক্কাদাও শামিল আছে। যেমন জোহরের পর চার রাকাত পড়লে মুআক্কাদাহ এবং মুস্তাহাব উভয়টি আদায় হয়ে যাবে। এরকমও করা যায় যে, মুআক্কাদাহ ও মুস্তাহাব উভয়টি এক সালাম সহকারে আদায় করবে। অর্থাৎ চার রাকাতের পর সালাম ফিরাবে। (ফতহুল কদীর)

এশার সুন্নাতের বর্ণনা

মাসআলাঃ এশার পূর্বের সুন্নত বাদ পড়লে তার ক্বাজা নেই এরপরও যদি পরবর্তীতে পড়লে নফল মুস্তাহাব হবে। যে সুন্নতে মুস্তাহাব্বা বাদ পড়েছে তা আদায় হল না। (দুররুল মোখাতর, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ দিনের নফল নামাজ এক সালাম সহকারে চার রাকাতের বেশী এবং

রাতে এক সালাম সহকারে আট রাকাতের বেশী পড়া মাকরূহ। দিনে হোক রাতে হোক উত্তম হলো চার রাকাত পর পর সালাম ফিরানো। (দুররুল মোখতার)

সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ ও নফলের মাসাঈল

মাসয়ালাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নতে মুয়াক্কাদায় প্রথম বৈঠকে মাত্র আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। ভুলবশতঃ দরূদ শরীফ পাঠ করলে সাহু সিজদা দিতে হবে। এমন সুন্নতের মধ্যে যখন তৃতীয় রাকাতের জন্য দাড়াবে তখন 'সুবহানাকা' এবং আউজু বিল্লা' পড়বে না। এছাড়া চার রাকাত বিশিষ্ট নফল নামাজের প্রথম বৈঠকেও দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং তৃতীয় রাকাতে 'সুবহানাকা' এবং 'আউজুবিল্লাহ' পড়বে। তবে দু'রাকাতের পর বৈঠক করা শর্ত। অন্যথায় প্রথম সুবহানাকা এবং আউজুবিল্লাহ-ই যথেষ্ট। মান্নতের নামাজেও প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ এবং তৃতীয় রাকাতে 'ছানা' ও 'তাউজ' পড়বে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ চার রাকাত নফল পড়ল, প্রথম বৈঠক বাদ পড়ল বরং ইচ্ছাকৃতভাবে হলেও বাদ পড়ল– নামাজ বাতিল হবে না। ভুলবশতঃ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাড়িয়ে গেল, তখন পুণরায় দোহরাবে না, সাহু সিজদা করে নেবে নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তিন রাকাত পড়ল, দ্বিতীয় রাকাতে বসল না, নামাজ ফাসেদ হয়ে গেল, দু'রাকাতের নিয়ত করল, বৈঠক ছাড়া তৃতীয় রাকাতের জন্য দাড়িয়ে গেল, তখন দোহরাবে অন্যথায় ফাসেদ হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নামাজে দীর্ঘক্ষণ দাড়ানো অধিক রাকাত হতে উত্তম। অর্থাৎ যখন কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নামাজ পড়তে চায় যেমন দু'রাকাতের মধ্যে এতটুকু দীর্ঘ সময় ব্যয় করা চার রাকাত পড়ার চেয়ে উত্তম। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নফল নামাজ ঘরে পড়া উত্তম। কিন্তু তারাবীহ, তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে দু'রাকাত নফল নামাজ মসজিদে পড়া উত্তম এবং ইহরাম এর দু'রাকাত মিকাতের নিকটবর্তী কোন মসজিদে পড়া উত্তম।

তাওয়াফের দু'রাকাত মক্বামে ইবরাহীমের নিকটে পড়বে। এতেক্বাফকারীর নফল এবং সূর্যগ্রহণের নামাজ মসজিদে পড়বে। যদি ঘরে গিয়ে কাজের ব্যস্ততায় নফল বাদ পড়ার আশংকা হলে অথবা ঘরে যদি একাগ্রতা না আসে বা বিনয়ী কম হওয়ার

আশংকা হয় তখন মসজিদে পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)।

মাসআলাঃ নফলের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য কেরাত পাঠ করা ফরজ। আর যদি মুক্তাদি হয় যদিও ফরজ আদায় কারীর পিছনে এক্তেদা করে তখন ইমামের কেরাত তার জন্যও যথেষ্ট। মুক্তাদি নিজকে ক্বেরাত পড়তে হবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

নফল শুরু করার পর ভঙ্গ করার বর্ণনা

মাসআলাঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নফল নামাজ শুরু করলে ওয়াজিব হয়ে যায়, ভেঙ্গে ফেললে ক্বাজা পড়তে হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত শুরু না করে যেমন ধারণা ছিল ফরজ আদায় করবে এবং ফরজের নিয়তে শুরু করেছে পরে স্মরণ হল ফরজ পড়া হয়েছে এখন এগুলো নফল হবে, আর তা ভেঙ্গে ফেললে ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। শর্ত হলো স্মরণ হওয়া মাত্রই ভেঙ্গে ফেলবে এবং স্মরণ আসামাত্র নফল পড়া এখতিয়ার করল, স্বেচ্ছায় গ্রহণের পর ভেঙ্গে ফেললে ক্বাজা ওয়াজিব হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি বিনা ইচ্ছায় নামাজ ফাসেদ হয়ে যায় তখনও ক্বাজা ওয়াজিব। যেমন তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়তেছিল, নামাজরত অবস্থায় পানি ব্যবহারে সক্ষম হলো, এভাবে নফল আদায়ের সময় স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হল, তখন ক্বাযা ওয়াজিব হবে। পবিত্রতার প.র ক্বাজা পড়বে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ শুরু করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, একটি হলো তাহরীমা বাধবে দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাড়িয়ে গেল, শর্ত হলো শুরুটা শুদ্ধ হতে হবে। শুরু যদি শুদ্ধ না হয়, যেমন মূর্খ বা স্ত্রীলোকের পিছনে এক্তেদা করল, অথবা বিনা ওজুতে নাপাক কাপড়ে শুরু করে দিল তখন কাজ্বা ওয়াজিব হবে না। (রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ফরজ আদায়কারীর পিছনে নফলের নিয়তে শুরু করল, তার স্মরণ হলো যে, এ ফরজ পড়া আমার জন্য অপরিহার্য আর তখন তা' ভেঙ্গে ঐ ফরজের নিয়তে আবার ইক্তেদা করল, তখন সে যা পড়তেছিল বা ছেড়ে দিয়ে অন্য নফল পড়ার নিয়ত করে জমাতে অন্তর্ভুক্ত হয়– তবে ঐ নফলের (যা সে পূর্বে নিয়ত করেছিল) ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় নফল নামায শুরু করল, তখন ঐ নামায ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব এবং তা মাকরূহ বিহীন সময়ে ক্বাজা করবে। আর দ্বিতীয়বার মাকরূহ সময়ে পড়ল, নামাজ হলেও গুনাহ হবে। পূর্ণ করে নিলে হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরূহ সময়ে পড়ার কারণে গুনাহ হবে। কোন শরয়ী কারণ ব্যতিরেকে নফল শুরুর পর ভেঙ্গে ফেলা হারাম। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নফল নামাজ শুরু করল, যদিও চার রাকাতের নিয়ত বাধল, তথাপি দু'রাকাতে হিসেবে আরম্ভকারী বিবেচিত হবে। নফলের প্রতি দু'রাকাত পৃথক পৃথক নামাজ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ চার রাকাত নফলের নিয়ত করল, প্রথম দু'রাকাত পর বা চার রাকাতে ভেঙ্গে ফেলল, তখন দু'রাকাত ক্বাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু দ্বিতীয় জোড়ে ভঙ্গের কারণে দু'রাকাত ক্বাযা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো, যদি দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করে থাকে নতুবা চার রাকাত ক্বাযা দিতে হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ সুন্নতে মুআক্কাদাহ বা মান্নত নামাজ যদি চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, তা ভঙ্গের কারণে চার রাকাত ক্বাযা দিতে হবে। যদি চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ আদায়কারীর পিছনে নফলের নিয়্যত করল এবং ভেঙ্গে দিল তখন চার রাকাতের ক্বাযা ওয়াজিব-হবে। প্রথম দু'রাকাতে ভঙ্গ করুক বা দ্বিতীয় দু'রাকাতে ভঙ্গ করুক। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ চার রাকাতের নিয়্যত করল এবং প্রতি রাকাতে কেরাত পড়ল না, অথবা প্রথম দু'রাকাতে বা শেষের দু'রাকাতে কেরাত পড়ল না, অথবা প্রথম দু'রাকাতের এক রাকাতে পড়ল না। অথবা শেষের দু'রাকাতের এক রাকাতে পড়ল না, অথবা প্রথম দু রাকাত বা শেষের দু'রাকাতের একটির মধ্যে কেরাত ছেড়ে দিল, তখন উপরোক্ত ছয় অবস্থায় দু'রাকাত ওয়াজিব হবে (ফিকহর কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)। প্রথম দু'রাকাতের এক রাকাতে অথবা শেষের দু'রাকাতের এক রাকাতে অথবা প্রথম দু'রাকাতের এক রাকাতে এবং শেষের দু'রাকাতে কেরাত ছেড়ে দিল তখন এসব অবস্থায় চার রাকাত ক্বাযা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ দু'রাকাতে তাশাহহুদ পরিমাণ বসল, অতঃপর ভেঙ্গে দিল এমতাবস্থায় মোটেই ক্বাযা দিতে হবে না। শর্ত হলো তৃতীয় রাকাতের জন্য যদি না দাড়ায়, এবং প্রথম দু'রাকাতে কেরাত পাঠ করে থাকলে। (দুররুল মোখতার)

কিন্তু ওয়াজিব বর্জনের কারণে তা পুণরায় পড়ার হুকুম রয়েছে।

মাসআলাঃ নফল আদায়কারী, নফল আদায়কারীর পিছনে এক্তেদা করল, যদিও তাশাহুহুদ অবস্থায় হয় তখন ইমামের যে অবস্থা মুক্তাদিরও একই অবস্থা অর্থাৎ ইমামের উপর যত রাকাতের ক্বাযা ওয়াজিব মুক্তাদির উপরও অনুরূপ ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার)

দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে ও গাড়ীতে নফল পড়ার মাসাঈল

মাসআলাঃ দাড়িয়ে পড়ার সক্ষমতা সত্ত্বেও বসে নফল নামাজ পড়া যাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। হাদীসে এরশাদ হয়েছে– বসাবস্থায় আদায়কারী নামাজ দাড়িয়ে আদায়কারী নামাজের অর্ধেক। ওজরের কারণে বসে পড়লে ছওয়াব কম হবে না। বর্তমানে সাধারণতঃ যেটা প্রচলিত হয়ে আছে যে, নফল নামাজ বসে পড়া। মনে হয় যেন, এরা বসে পড়াকে উত্তম মনে করে থাকে। এরূপ হলে তাহা নিতান্ত ভুল। বিতরের পর যে দু'রাকাত নফল পড়া হয় তাও একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। দাড়িয়ে পড়া উত্তম। এক্ষেত্রে ঐ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিতরের পর বসে নফল আদায় করেছেন– এটা সহীহ নয়। এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। বসাবস্থায় আদায়কারীর নামাজ দাড়িয়ে আদায়কারীর নামাজীর অর্ধেক। এরপর আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম তখন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বসে নামাজ আদায়রত দেখতে পেলাম। মাথা মোবারকের উপর হাত রাখলাম আর বললাম, (অসুস্থ তো নয়) এরশাদ করলেন, হে আবদুল্লাহ কী হলো? বললাম, এয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এরূপ বলেছেন এবং আপনি স্বয়ং বসে নামাজ আদায় করছেন। এরশাদ ফরমান, হ্যাঁ! কিন্তু আমি তোমাদের মত নই। ইমাম ইব্রাহীম হালভী, দুররুল মোখতার প্রণেতা, রদ্দুল মোখতার প্রণেতা বলেছেন– এ হুকুম হুজুরের বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এ হাদীসটা প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করেন।

মাসআলাঃ যদি রুকুর সীমা পর্যন্ত ঝুঁকে নফলের তাহরীমা বাধে তখন নামাজ হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

চিৎ হয়ে নামাজ পড়া জায়েয নেই। যদি ওজর না হয়– ওজরের কারণে হলে এরূপ পড়া জায়েয। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ দাড়িয়ে শুরু করেছে, অতঃপর বসে গেল অথবা বসে শুরু করেছিল অতঃপর দাড়িয়ে গেল উভয় অবস্থায় জায়েয। এক রাকাত দাড়িয়ে পড়ুক এবং এক রাকাত বসে পড়ুক অথবা এক রাকাতের এক অংশ বসে পড়ুক অথবা এক রাকাতের এক অংশ দাড়িয়ে পড়েছে এবং কিছু অংশ বসে পড়েছে জায়েয হবে (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ দাড়িয়ে শুরু করেছে অতঃপর বসে পড়েছে এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। এরূপ করা থেকে বিরত থাকা উত্তম।

মাসআলাঃ দাড়িয়ে নফল পড়তেছিল, ক্লান্ত হয়ে গেল, তখন লাঠি বা দেওয়ালের উপর ঠেস দিয়ে পড়লে কোন ক্ষতি নেই (আলমগীরি)। ক্লান্তিহীন অবস্থায় এরূপ করলে নামাজ হয়ে যাবে তবে মাকরূহ হবে।

মাসআলাঃ নফল বসে পড়লে এরূপভাবে বসবে যেমন তাশাহুহুদে বসা হয়, কিন্তু কেরাতের অবস্থায় নাভীর নীচে হাত বাঁধবে। যেমন দাঁড়ানো অবস্থায় বাধা হয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

ফরজ ওয়াজিব নামায বাহন বা গাড়ীতে পড়ার মাসাঈল ও ওজর সমূহের বর্ণনা

মাসআলাঃ শহরের বাহিরে বাহনের উপরও নফল নামাজ পড়া যাবে, এমতাবস্থায় ক্বেবলামুখী হওয়া শর্ত নয়। বরং বাহন যেদিকে চলমান সেদিকেই মুখ ফিরাবে মুখ যদি সেদিক না হয় নামাজ জায়েয হবে না। শুরু করার সময়ও ক্বেবলার দিকে মুখ করা শর্ত নয় বরং বাহন যেদিকে চলমান সেদিকে মুখ হবে। রুকু, সিজদা ইশারায় করবে, সিজদার ইশারা রুকুর তুলনায় নিম্নগামী হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বাহনের উপর নফল পড়লে এবং বাহন বা সওয়ারীকে তাড়ানো যদি প্রয়োজন পড়ে এবং আমলে কলীল যোগে তাড়ায়। যেমন এক পা দ্বারা ধাক্কা দিল, অথবা হাতে চাবুক আছে তা দিয়ে ভয় দেখাল কোন ক্ষতি নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে এরূপ করা জায়েয নেই। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বাহনের উপর নামাজ শুরু করল, অতঃপর আমলে কলীল সহকারে অবতরণ করল, তখন নামাজকে এর উপর ভিত্তি করা যাবে, দাড়িয়ে পড়ুক বা বসে পড়ুক কিন্তু তখন ক্বেবলামুখী হওয়া জরুরী। জমীনের উপর শুরু করেছিল তারপর আরোহন করল, তখন পর্বের উপর ভিত্তি করা যাবে না। নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ জঙ্গলে বা তাবুতে অবস্থানকারী যখন জঙ্গল বা তাবু হতে বের হবে তখন বাহনের উপর নফল পড়তে পারবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ শহরের বাহিরে বাহনের উপর শুরু করেছিল, নামায পড়তে পড়তে শহরের ভিতরে প্রবেশ করল যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে না পৌছবে বাহনের উপর পূর্ণ করা যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ উঠের হাওদা এবং সওয়ারীর উপর মুতলক নফল নামায পড়া জায়েয– যখন একাকী পড়বে। নফল নামায জামাত সহকারে পড়তে চাইলে শর্ত হলো ইমাম ও মুক্তাদি পৃথক পৃথক বাহনের উপর হতে পারবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ উঠের হাওদার উপর ফরজ নামায তখন জায়েয হবে যখন সওয়ারী হতে অবতরণ করতে সক্ষম না হয়। আর যদি উঠের হাওদা দাড়ানো থাকে নীচে কাঠ লাগানো থাকে যা জমীনের সাথে সংযুক্ত তখন জায়েয। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ গাড়ীর জোঁয়াল প্রাণীর উপর আছে গাড়ী দাঁড়ানো বা চলমান আছে এর হুকুম প্রাণীর উপর নামায আদায়ের হুকুমের অনুরূপ। অর্থাৎ ফরজ, ওয়াজিব ও ফজরের সুন্নত বিনা ওজরে জায়েয নেই আর যদি জোঁয়াল প্রাণীর উপর না হয় এবং আটকানো থাকে তখন নামাজ জায়েয আছে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

এ হুকুম সেসব গাড়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলোর দু'টি চাকা আছে চার চাকা বিশিষ্ট হলে যখন থামানো হবে তখন জোঁয়াল প্রাণীর উপর হবে এবং গাড়ী জমীনের উপর স্থির থাকবে। সুতরাং যখন দাড়ানো অবস্থায় থাকবে এর উপর নামায জায়েয হবে। যেমন কাঠের আসনের উপর পড়া হয়।

মাসআলাঃ নিম্নোক্ত ওজরের কারণে গাড়ী বা বাহনের উপর নামাজ পড়া হয় যেমন বৃষ্টি বর্ষণ হলে, বৃষ্টির কারণে এতটুকু কাদা হয়েছে যে বাহন থেকে পতিত হলে মুখ ধ্বসে যাবে, অথবা কাদার মধ্যে লেপটে যাবে, অথবা যে কাপড় বিছানো হবে

তা একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে যাবে, এমতাবস্তায় সওয়ারী না থাকলেও দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারায় পড়বে।

তেমনিভাবে সাথী চলে যাবার আশংকা হলে, অথবা আরোহীর বাহন দুষ্ট প্রকৃতির, আরোহনে কষ্ট হবে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, সাহায্যকারীও নেই এমন হলে বাহনের উপর পড়ে নেবে। অথবা বৃদ্ধ লোক অবতরণ করলে সাহায্য ছাড়া উঠতে পারবে না এবং সাহায্যকারীও নেই, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অথবা রোগ বৃদ্ধি পাবে, জান-মালের ক্ষতি হলে, অথবা মহিলার ইজ্জত সম্ভ্রমের আশংকা হলে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার) চলমান রেলগাড়ীতেও ফরজ ওয়াজিব ও ফজরের সুন্নত হবে না। রেলগাড়ীকে জাহাজ অথবা নৌকার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ধারণা নিতান্ত ভুল।

নৌকা যদি থামানোও যায় তবুও জমীনের উপর থামে না, রেলগাড়ী কিন্তু এরকম নহে। নৌকাতেও ঐ সময় নামায জায়েয হবে যখন নদীর মাঝখানে হবে। আর যখন কিনারায় আছে শুকনা জায়গায় আসা যাবে তখন নৌকার উপর জায়েয হবে না। সুতরাং ষ্টেশনে যখন গাড়ী থামবে নেমে নামায পড়ে নেবে। আর যদি দেখা যায় সময় চলে যাচ্ছে তখন যেভাবে সম্ভব পড়ে নেবে। অতঃপর যখন সুযোগ পাবে পুনরায় পড়ে নেবে। কোথাও বান্দার নিকট কোন শর্ত বা রুকন বিলুপ্ত হলে একই হুকুম।

মাসআলাঃ উঠের পিটের হাওদার উপর এক পার্শ্বে স্বয়ং আরোহী অন্য পাশে তার মা বা স্ত্রী অন্য কোন মুহরিম আছে, যারা নিজেরা স্বয়ং আরোহন করতে পারে না। আরোহী নিজে নেমে আরোহন করতে পারে কিন্তু সে নামলে হাওদা পড়ে যাবার আশংকা রয়েছে তার জন্যও হাওদার উপর পড়ার হুকুম রয়েছে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রাণী অথবা চলমান গাড়ীর উপর অথবা সে গাড়ীর উপর, যার জোয়াল প্রাণীর উপর রয়েছে শরয়ী ওজর ব্যতীত ফরজ ও ফজরের সুন্নত সমস্ত ওয়াজিব যেমন বিতর, মান্নত এবং সে নফল যা ভঙ্গ করেছে এবং তিলাওয়াতে সিজদা, যদি আয়াতে সিজদা জমীনে তিলাওয়াত করে থাকে এসবগুলো আদায় হবে না, যদি ওজরের কারণে হয়, ওসবের মধ্যে শর্ত হলো যদি সম্ভব হয় ক্বেবলামুখী দণ্ডায়মান করে আদায় করবে, নতুবা যেভাবে সম্ভব হয় আদায় করে নেবে। (দুর্রুল মোখতার)

মান্নতের নামায পড়ার মাসাঈল

মাসআলাঃ কেউ মান্নত করল, দু'রাকাত বিনা পবিত্র অবস্থায় পড়বে। অথবা দু'রাকাতে কেরাত পড়বে না। অথবা উলঙ্গ পড়বে, অথবা এক রাকাত বা অর্ধ রাকাতের মান্নত করেছে তখন উপরোক্ত সব অবস্থায় তার উপর পবিত্রতার সাথে কেরাত ও সতর সহ দু'রাকাত পড়া ওয়াজিব। তিন রাকাত মান্নত করলে চার রাকাত ওয়াজিব হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ মান্নত করল যে, অমুক স্থানে নামায পড়বে এর চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে আদায় করল, আদায় হবে। যেমন মসজিদে হেরেমে পড়ার মান্নত করল বায়তুল মোকাদ্দাস বা ঘরের মসজিদে আদায় করল আদায় হবে। স্ত্রী লোক মান্নত করল আগামীকাল নামায পড়বে বা রোজা রাখবে, দ্বিতীয় দিনে তার ঋতুস্রাব হল তখন ক্বাযা করবে। আর যদি মান্নত করে যে, ঋতুস্রাব অবস্থায় দু'রাকাত পড়ার, তখন কোন নামায পড়তে হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মান্নত করল আজকে দু'রাকাত পড়বে, কিন্তু আজকে পড়ল না, তার ক্বাজা নেই বরং কাফ্ফারা দিতে হবে। (তার কাফ্ফারা হল কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার অনুরূপ। একজন গোলাম আজাদ করা, অথবা দশজন মিসকীনকে দু'বেলা পেটভরে খাবার খাওয়ানো, বা কাপড় দেয়া অথবা তিনটি রোজা রাখা) (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পূর্ণ মাস নামায আদায়ের মান্নত করল তখন এক মাসের ফরজ ও বিতরের অনুরূপ তার উপর ওয়াজিব হবে। সুন্নতের সাদৃশ্য নেই কিন্তু বিতর ও মাগরিবের স্থলে চার রাকাত পড়বে। অর্থাৎ প্রতিদিন বাইশ রাকাত হিসেবে পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ দাড়িয়ে নামায পড়ার মান্নত করল, তখন দাড়িয়ে পড়া ওয়াজিব। আর মুতলক বা সাধারণভাবে নিয়ত করলে তখন ইচ্ছাধীন থাকবে। (আলমগীরি)

সতর্কঃ নফল নামায অসংখ্য। নিষিদ্ধ সময় সমূহ ছাড়া যত ইচ্ছা পড়বে। কতিপয় নফল নামায যেগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও আইম্মায়ে কেরাম (রঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো।

তাহায়্যাতুল মসজিদ নামাযের মাসাঈল ও ফজিলত

তাহিয়্যাতুল মসজিদঃ যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, তার জন্য দু'রাকাত নামায পড়া সুন্নত। বরং চার রাকাত পড়া উত্তম। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়ে নেবে।"

মাসআলাঃ এমন সময়ে মসজিদে আসল, যে সময়ে নফল নামায পড়া মাকরূহ যেমন ফজর উদয় হবার পর অথবা আসর নামাযের পর সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে না। বরং তাসবীহ, তাহলীল ও দরুদ শরীফ পাঠে মশগুল থাকবে। এতে মসজিদের হক আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফরজ, সুন্নত অথবা অন্য কোন নামায মসজিদে পড়ে নিল তাহায়্যাতুল মসজিদ আদায় হয়ে গেল, যদিও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়্যত করেনি। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য যে নামাজের নিয়্যতে মসজিদে যায়নি বরং শিক্ষা অর্জন বা জিকরের জন্য গিয়েছে যদি ফরজ বা একেদার নিয়্যতে মসজিদে গেল এটা তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, প্রবেশের পরেই পড়তে হবে। আর যদি কিছুক্ষণ পরে পড়ে তখন তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বসার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেয়াটা উত্তম। পড়া বিহীন বসে গেলে দায়িত্ব থেকে বাদ যাবে না। পড়ে নেবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদ প্রতিদিন একবার পড়লে যথেষ্ট। প্রতিবার নামাজের সময় জরুরী নহে। কোন ব্যক্তি বিনা অজুতে মসজিদে প্রবেশ করল, বা অন্য কোন কারণে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে পারছে না, তখন চারবার সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআল্লাহু আকবর' পড়বে। (দুররুল মোখতার)

তাহিয়্যাতুল অজু, এশরাকের নামায ও চাশতের নামাযের ফজিলত ও মাসাঈল

তাহিয়্যাতুল অজুঃ অজুর পর অঙ্গ সমূহ শুকানোর পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করল এবং তা উত্তমরূপে করল, এবং জাহের বাতেন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়ল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

এশরাকের নামাযঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জামাত সহকারে ফজরের নামাজ পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে রত থাকে অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়ে সে পূর্ণ হজ্ব এবং ওমরার ছওয়াব লাভ করবে।

চাশ্‌তের নামাযঃ চাশ্‌তের নামাজ কমপক্ষে দু'রাকাত, অধিক হলো বার রাকাত পড়া মুস্তাহাব। তবে বার রাকাত পড়া উত্তম। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি চাশ্‌তের বার রাকাত পড়বে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য জান্নাতে স্বর্ণের বালাখানা নির্মাণ করবেন।" এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষের অঙ্গের প্রতিটি জোড়ার বিনিময়ে সাদকা রয়েছে। সর্বমোট তিনশত ষাটটি জোড়া রয়েছে প্রতি তাসবীহ হচ্ছে সাদকা, প্রতিটি হামদ সাদ্‌কা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা সাদ্‌কা, উত্তম কথার আদেশ করা সাদ্‌কা, অন্যায় থেকে বিরত রাখা সাদ্‌কা আর এসবের পক্ষ থেকে চাশ্‌তের দু'রাকাত যথেষ্ট।

ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ ও আবু যর (রাঃ) থেকে আবু দাউদ ও দারেমী, নঈম ইবনে হুমার (রাঃ) থেকে ইমাম আহমদ উপরোক্ত সবার থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক এরশাদ ফরমান, হে আদম সন্তান, দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত পড়, দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য যথেষ্ট করবো।

তবরানী শরীফে হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি চাশ্‌তের দু'রাকাত পড়ল, তার নাম অলসদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে না। যে ব্যক্তি চার রাকাত পড়বে, তাঁর নাম আবেদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি ছয় রাকাত পড়বে, ঐ দিন তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে অর্থাৎ সব কাজ সহজ হবে। যে আট রাকাত পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করবেন। যে বার রাকাত পড়বে,

আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতে তাঁর জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন। এমন কোন দিন বা রাত নেই, যে সময় আল্লাহ্ বান্দাদের উপর অনুগ্রহ ও সাদ্‌কা করেন না। বান্দার চেয়ে কারো উপর অধিক অনুগ্রহ করেন না, যে বান্দা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে চাশ্‌তের দু'রাকাত নিয়মিত পড়বে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।

মাসআলাঃ চাশ্‌তের নামাযের সময় সূর্য উত্তোলন হবার পর থেকে অর্ধ দিবস পর্যন্ত। তবে উত্তম হলো দিবসের এক চতুর্থাংশে পড়বে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

সফরের নামায ও সফর থেকে ফিরে আসার পর নামাযের মাসাঈল ও ফজিলত

সফরের নামাযঃ সফরে যাবার সময় নিজ ঘর থেকে দু'রাকাত পড়ে বের হবে। তবরানীর হাদীসে উল্লেখ আছে কেউ স্বীয় পরিবারের নিকট ঐ দু'রাকাতের চেয়ে অধিক উত্তম কিছু রেখে যাননি, যে ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করলে তাদের নিকট দু'রাকাত পড়বে।

সফর হতে আসার পর নামাযঃ সফর হতে ফিরে আসার পর মসজিদে দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে দিবসের চাশ্‌তের সময় তাশরীফ আনতেন। প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং দু'রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর ঐ মসজিদেই তাশরীফ রাখতেন।

মাসআলাঃ মুসাফিরের উচিৎ নিজ গৃহস্থলে বসার পূর্বে দু'রাকাত নফল পড়বে। যেমন হুজুরপুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম করেছেন। (রদ্দুল মোখতার)

সালাতুল লায়ল ও তাহাজ্জুদ নামাযের মাসাঈল ও ফজিলত

সালাতুল লায়লঃ রাতের বেলা এশার নামাযের পর যে নফল পড়া হয় তাকে সালাতুল লায়ল (রাতের নামায) বলা হয়, রাত্রির নফল দিনের নফল থেকে উত্তম। সহীহ মুসলিম শরীফে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ফরজের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাত্রির নামায। তবরানী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন। এশার ফরজের পর যে

নামায পড়া হয় তা হলো সালাতুল লায়ল।

মাসআলাঃ সালাতুল লায়লের এক প্রকার হলো, তাহাজ্জুদ, এশার পর রাতে ঘুমানোর পর উঠবে এবং নফল পড়বে। নিদ্রার পূর্বে যা পড়া হয়, তা তাহাজ্জুদ নহে। (রদ্দুল মোখতার, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ তাহাজ্জুদ কমপক্ষে দু'রাকাত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে আট রাকাত পর্যন্ত প্রমাণ আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি রাত্রি জাগ্রত হলো, নিজের পরিবারকেও জাগ্রত করল অতঃপর উভয়ে দু'রাকাত, দু'রাকাত পড়বে, তাদেরকে অধিক স্মরণকারীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। ইমাম নাসায়ী, ইবনে মাজা, সুনানে ইবনে খাব্বান স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে হাকেম, মুস্তাদরেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মনযরী বলেছেন, এ হাদীস বোখারী মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ্ বা বিশুদ্ধ (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি রাতের দুই তৃতীয়াংশ ঘুমাতে চায় এবং এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতে চায়, তারজন্য উত্তম হলো প্রথম এবং শেষের তৃতীয়াংশে ঘুমাবে। মাঝখানের তৃতীয়াংশে ইবাদত করবে। আর যদি অর্ধ রাত্রিতে ঘুমাতে চায় এবং অর্ধরাত্রি জাগ্রত থাকতে চায়, তখন শেষের অর্ধরাত্রিতে ইবাদত উত্তম। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মহান প্রভু আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি রাত্রি যখন শেষের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে আসমানী জগতে বিশেষ তজল্লী নিবদ্ধ করেন এবং বলেন, কোন প্রার্থনাকারী আছ কি? তার প্রার্থনা কবুল করবো, কোন ভিক্ষুক আছো কি? তাকে দান করবো, ক্ষমাপ্রার্থনাকারী কেউ আছো কি? তাকে ক্ষমা করবো। সবচেয়ে বড় নামায নামাযে দাউদ।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সকল নামাযের চেয়ে আল্লাহর নিকট নামাযে দাউদ অধিক প্রিয়। যিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশে ইবাদত করতেন, অতঃপর ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদে অভ্যস্থ বিনা ওজরে তা পরিত্যাগ করা মাকরূহ। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফ প্রমুখ হাদীসে রয়েছে। হুজুর করীম সাল্লাল্লাহ্

আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এরশাদ করেন, "হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হইওনা, যে রাত্রি জাগতেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়েছে।" বোখারী ও মুসলিম শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে যেটি সর্বদা করা হয়, যদিও কম হয়।

মাসআলাঃ দুই ঈদ এবং শা'বানের পনের তারিখের রাত্রি, রমজানের শেষের দশ রাত্রি, জিলহজ্বের প্রথম দশ রাত্রি রাত জাগরণ করা মুস্তাহাব। রাতের বেশীর ভাগ জাগ্রত থাকাও শব বেদারী। (দুর্রুল মোখতার)

দুই ঈদের রাত্রি শববেদারী হলো, এশা ও ফজরের নামায প্রথম জমাতে পড়া। সহীহ্ হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যে এশার নামাজ জমাত সহকারে পড়েছে সে যেন অর্ধে রাত ইবাদত করল। যে ব্যক্তি ফজরের নামায জমাত সহকারে আদায় করল যে যেন পূর্ণ রাত্রি ইবাদত করল। উপরোক্ত রাত সমূহে যদি বিনিদ্র থাকে ঈদের নামাজ ও কোরবানী ইত্যাদি কষ্টকর হবে বিধায় এতটুকুতে যথেষ্ট করবে। আর কাজে যদি কোন প্রকার অসুবিধা না হয় জাগ্রত থাকা অনেক উত্তম।

মাসআলাঃ উপরোক্ত রাত সমূহে একাকী নফল নামায পড়া কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা, হাদীস শরীফ পাঠ করা ও শ্রবণ করা এবং দরুদ শরীফ পড়া, শব বেদারী। বিনা ইবাদতে জেগে থাকা শববেদারী নয়। (রদ্দুল মোখতার)

সালাতুল লাইল সম্পর্কে আটটি হাদীস এখন আলোকপাত করা হলো, এর ফজায়েল সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস শুনুন।

হাদীসঃ বোখারী মুসলিমের শর্তানুসারে তিরমিযী ইবনে মাজাহ্ ও হাকেম আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় শুভাগমন করেন, তখন অধিক সংখ্যক লোক প্রিয় নবীর খেদমতে উপস্থিত হলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমিও হাজির হলাম। যখন আমি হুজুরের চেহারা মোবারককে গভীরভাবে দেখলাম, জানতে পারলাম, এ মুখে মিথ্যা কথা বলা হয় না, প্রথম যে কথা আমি হুজুর থেকে শুনেছি তা হলো, হে লোকেরা, সালাম প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করো। রাত্রে মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে নামাজ পড়ো, নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসঃ হাকেম সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জিজ্ঞাসা

করেছেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! এমন বিষয় নির্দেশ করুন, যা আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করবো, এরপরও একই এরশাদ ব্যক্ত হয়েছে।

হাদীসঃ তবরানী কবীরে হাসান সূত্রে শায়খাঈনের শর্তানুসারে সহীহ্ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে যার অভ্যন্তরে বাহির হতে দেখা যায় এবং ভিতর থেকে বাহিরে দেখা যায়। আবু মালেক আশয়ারী (রঃ) আরজ করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! ওটা কার জন্য! এরশাদ করলেন, যে উত্তম কথা বলবে। খাবার খাওয়াবে, রাত জাগরণ করবে মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে। অনুরূপ হাদীস হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

হাদীসঃ বায়হাকী শরীফে হযরত আসমান বিনতে ইয়াযিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিবসে মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত করা হবে। সে সময় আহ্বানকারী আহ্বান করবে, কোথায় তারা যাদের পার্শ্বদেশ বিছানা হতে পৃথক হয়েছিল। ওসব লোক দাঁড়াবে তারা সংখ্যায় স্বল্প হবেন, তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর অন্য লোকদের হিসাবের নির্দেশ হবে।

হাদীসঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রঃ) থেকে বর্ণিত। হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রাত্রির মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে কোন মুসলিম ব্যক্তি সে মুহূর্তে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দুনিয়া আখেরাতের যে মঙ্গল প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে তা দেবেন, আর এ মুহূর্তটি প্রতি রাতে আছে।

হাদীসঃ তিরমিযী শরীফে আবু ওসামা বাহেলী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. কিয়ামুল লাইল কে নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নাও। এটা হলো পূর্ববর্তী মহৎ ব্যক্তিদের তরীকা এবং তোমাদের প্রভুর সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, পাপ দূরীভূতকারী। গুনাহ থেকে বাধাদানকারী। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, এটা দেহ থেকে রোগব্যাধি বিদূরীতকারী।

হাদীসঃ সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে উঠবে এবং নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে।

রাত্রে পড়ার কতিপয় দোআ সমূহ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্বভৌমত্ব তাঁরই জন্য। সব প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি নেই সামর্থ নেই। অতঃপর বলেন, হে আমার প্রতিপালক তুমি আমায় ক্ষমা কর। অতঃপর যে দুআ করবে, তা কবুল হবে। আর যদি অজু সহকারে নামায পড়ে তার নামায কবুল হবে।

হাদীস ঃ সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তখন নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই, তুমি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এর মধ্যখানে যা আছে সবগুলোর প্রতিষ্ঠাকারী, সব প্রশংসা তোমার আসমান সমূহ ও জমিন সমূহে যা কিছু আছে তুমি তাঁর নূর বা আলো, তুমিই আসমান ও জমিন সমূহের এবং এর মধ্যকার সবকিছুর একমাত্র সার্বভৌম মালিক। সব প্রশংসা তোমারই জন্য তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাও সত্য তোমার বাণী সত্য, বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, তোমার যত নবী তারাও সত্য, আমি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)ও সত্য। কেয়ামতও

সত্য। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পন করলাম, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তোমারই উপর নির্ভর করলাম। তোমারই সাহায্যে শত্রুর সাথে লড়ছি, তোমারই কাছে ফয়সালা প্রার্থনা করছি, তথা বিচার প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমায় ক্ষমা কর, যেসব পাপ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করব, যা আমি গোপনে করেছি এবং যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এসবও। গুনাহ্ সম্বন্ধে তুমি আমার চাইতে বেশী জান। তুমিই অগ্রগামী তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

এ দুআটি এবং কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হলো, এছাড়া এ নামাযের ফজীলত সংক্রান্ত আরো অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে আল্লাহপাক যাকে তৌফিক নসীব করেন তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

এস্তেখারার নামাযের বর্ণনা

এস্তেখারার নামাজঃ সহীহ্ হাদীস, যেটি ইমাম মুসলিম ব্যতীত মুহাদ্দিসগণের বৃহৎ দল হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রতিটি বিষয়ে এস্তেখারার শিক্ষা দিতেন। যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। এরশাদ করেন, যখন কেউ কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বে। অতঃপর পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ – اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ –وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ۔

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তোমার নিকট ভালদিক জ্ঞাত হওয়া প্রার্থনা করছি। তোমরই কুদরত ও ক্ষমতার সাহায্যে তোমার নিকট তা অর্জনের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ হতে ভিক্ষা প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। অথচ আমি কোন কিছুতেই ক্ষমতা রাখি না। তুমি (আমার ইপ্সিত বস্তুর উপর) জ্ঞান রাখ অথচ আমি উহার কিছুই জানি না।

তুমি আমাদের অদৃশ্য ও অজ্ঞাত গায়েব সমূহ সম্পর্কে সঠিক পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আমি যে কাজটি করতে চাই যদি এ কাজটি আমার পক্ষে ভাল হবে বলে জান আমার দ্বীনের ব্যাপারে আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে এবং আমার কাজের শেষ ফলের ব্যাপারে অথবা তিনি বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার ইহ ও পরকালের ব্যাপারে তা হলে তুমি তা আমার জন্য ব্যবস্থা কর এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর আমার জন্য তাতে কল্যাণ দান কর। আর যদি এ কাজ আমার জন্য মন্দ বা অকল্যাণকর জান আমার দ্বীনের ব্যাপারে আমার জীবনধারনের ব্যাপারে এবং আমার কাজের শেষ ফলের ব্যাপারে অথবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার ইহ ও পরকালের ব্যাপারে তাহলে তুমি তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ কর তা যেখানেই আছে। অতঃপর তুমি আমাকে সন্তুষ্ট রাখ।

এবং স্বীয় প্রয়োজন বা সমস্যা উল্লেখ করবে هٰذَا الْاَمْرَ এর স্থানে সমস্যার নাম উল্লেখ করবে। অথবা এরপর اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ এর মধ্যে او বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, একসাথে এরূপ বলবে- وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَعَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ (গুনীয়া)

মাসআলাঃ হজ্ব, জেহাদ এবং অন্যান্য ভাল কাজের ক্ষেত্রে মূল কাজের জন্য এস্তেখারা করতে হবে না। হ্যাঁ তবে সময়ের নির্দিষ্টতার জন্য এস্তেখারা করা যায়। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ মুস্তাহাব হলো উপরোক্ত দুআর প্রথমে ও শেষে আলহামদু লিল্লাহে এবং দরুদ শরীফ পড়বে। প্রথম রাকাতে قُلْ یٰاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়বে। কতিপয় মাশায়েখ বলেন, প্রথম রাকাতে وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَیَخْتَارُ থেকে یُعْلِنُوْنَ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকাতে وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ উত্তম হলো, এস্তেখারা সাতবার করা, অতঃপর অন্তরের দিকে থাকাও অন্তরে কি বিরাজ করছে, নিঃসন্দেহে এতে কল্যাণ রয়েছে, কোন কোন মাশায়েখ থেকে বর্ণিত, উপরোক্ত দুআ পড়ে অজু সহকারে ক্বেবলামুখী হয়ে ঘুমাবে। স্বপ্নে যদি সাদা বা সবুজ দেখা যায় তখন মনে করবে ঐ কাজ উত্তম। আর যদি কালো বা লাল দেখা যায় তখন মনে করবে ঐ কাজ মন্দ বা খারাপ তা থেকে বিরত থাকবে।

(রদ্দুল মোখতার)

এস্তেখারার সময় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না রায় একদিকে পূর্ণরূপে সৃষ্টি হবে।

সালাতুত তাসবীহ্-এর বর্ণনা

সালাতুত তাসবীহঃ এ নামাযে অসংখ্য সওয়াব রয়েছে। কোন কোন তাত্ত্বিক গবেষকগণ বলেছেন যে, এর গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য শুনে দ্বীনের ব্যাপারে অলস ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এটা পরিত্যাগ করে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলেন, ওহে চাচা, আমি কি তোমাকে প্রদান করবো না? আমি কি তোমাকে বখশিশ করবো না? আমি তোমাকে দেব না? তোমাদের সাথে কি আমি অনুগ্রহ করবো না? দশটি অভ্যাস রয়েছে, যখন তোমরা পালন করবে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন। পূর্বের, পরের, নতুন, পুরাতন যা ভুলক্রমে করা হয়েছে যা ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে, ছোট বড়, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব গুনাহ্ ক্ষমা করবেন। এরপর সালাতুত তাসবীহ্র নিয়মাবলী শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর এরশাদ করেন, তোমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, প্রতিদিন একবার পড়ো আর যদি প্রতিদিন করতে না পারো প্রতি জুমার দিন একবার পড়ো। তাও করতে না পারলে প্রতি মাসে একবার। এটাও করতে না পারলে জীবনে একবার। এ নিয়মানুসারে সুনানে তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রাঃ)র সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আকবার বলার পর নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণঃ সোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গায়রুকা

অতঃপর এ দুআ পনের বার পাঠ করবে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আল্লাহু আকবর।

অতঃপর আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ্ ও সূরা পাঠ করে দশবার উক্ত তাসবীহ্ পাঠ করবে। অতঃপর রুকু করবে, রুকুতে দশবার পাঠ করবে।

অতঃপর রুকু হতে মাথা উঠাবে আর তাসমী অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্ এবং তাহমীদ তথা আলহামদু বলার পর দশবার পড়বে। অতঃপর সিজদায় যাবে আর সিজদায় দশবার পাঠ করবে। অতঃপর সিজদা হতে মাথা তুলে বসে দশবার। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে তাতে দশবার পড়বে। এভাবে চার রাকাত পড়বে। প্রতি রাকাতে ৭৫ বার তাসবীহ্ চার রাকাতে মোট ৭৫×৪=৩০০ তিনশতবার হবে। রুকু ও সিজদায়

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ – سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

বলার পর তাসবীহ্ সমূহ পড়বে। (গুনীয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এ নামাযের সূরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সূরা তাকাসুর, সূরা আস,র কুলইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন এবং কুল হু আল্লাহ্ পড়বে। কেউ কেউ বলেন, সূরা হাদীদ, সুরা হাশর, সূরা সাফ ও তাগাবুন (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সালাতুত তাসবীহ্ নামাযে যদি সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হয়, সাহ্ সিজদা করবে, তবে সাহ্ সিজদায় উপরোক্ত তাসবীহ্ পড়বে না। কোন স্থানে যদি ভুলবশতঃ দশবারের চেয়ে কম পড়া হয় অন্যস্থানে পড়ে নেবে। যেন পরিমাণ পূর্ণ হয়। উত্তম হলো এই যে, এরপর যখন দ্বিতীয়বার তাসবীহ্র সুযোগ আসবে, তখনই পড়ে নেবে। যেমন দাড়ানোর সময়ের তাসবীহ্ সিজদায় পড়বে, রুকুতে ভুলে গেলে তাও সিজদায় পড়বে। রুকুর তাসবীহ্ দাড়ানোতে পাঠ করবে না। দাড়ানোর পরিমাণ স্বল্প হয়ে থাকে। প্রথম সিজদায় ভুলে গেলে তখন দ্বিতীয় সিজদায় করবে, বৈঠকে পড়বে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ আঙ্গুল দিয়ে তাসবীহ্ গণনা করবে না বরং অন্তরে গণনা করবে, নতুবা আঙ্গুল সমূহ দাবিয়ে করবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রত্যেক মাকরূহ্ বিহীন সময়ে এ নামায পড়া যায়, তবে জোহরের পূর্বে পড়া উত্তম। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এ নামাযে সালামের পূর্বে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ الْهُدٰى وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْيَقِيْنِ وَمُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ
اَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰى

اَخَافَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِىْ عَنْ مَعَاصِيْكَ حَتّٰى اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ وَحَتّٰى اُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ وَحَتّٰى اُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حُبًّا لَكَ وَحَتّٰى اَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِى الْاُمُوْرِ حُسْنَ ظَنٍّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ (رد المختار)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সত্যান্বেষীদের তৌফিক প্রার্থনা করছি। বিশ্বাসীদের কর্ম, তওবাকারীদের কল্যাণ, ধৈর্যশীলদের দৃঢ়তা, খোদাভীরুদের প্রচেষ্টা, অনুরাগীদের অন্বেষা, মুত্তাকীদের ইবাদত, জ্ঞানবানদের মারফত যেন আমি তোমাকে ভয় করি, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন ভয় প্রার্থনা করি, যা তোমার নাফরমানী থেকে আমাকে বিরত রাখবে, যেন আমি তোমার আনুগত্য দ্বারা এমন আমল করতে পারি, যদ্বারা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উপযুক্ত হই। যেন তোমার ভয়ে বিশুদ্ধ তওবা করতে পারি। তোমার ভালবাসার নিমিত্ত যাবতীয় কল্যাণ কামনা, একনিষ্ঠভাবে যেন তোমারই নিকট করতে পারি সকল কাজে তোমার উপর ভরসা করছি, তোমার প্রতি উত্তম ধারণার নিমিত্ত। পবিত্র! নূরের স্রষ্টা (রদ্দুল মোখতার)

সালাতুল হাজত-এর বর্ণনা

হাজতের নামাজঃ আবু দাউদ শরীফে হযরত হুজায়ফা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাজির হতো তখন নামাজ পড়তেন। হাজত পূরনের জন্য দু'রাকাত বা চার রাকাত পড়বে। হাদীস শরীফে আছে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা ও তিনবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। অবশিষ্ট তিন রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং কুলহু আল্লাহু ও কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস একবার একবার পড়বে। এ নামায এমন হলো যেমন শবে ক্বদরে চার রাকাত। মাশায়েখ বলেন, আমরা এ নামায পড়েছি এবং আমাদের হাজত পুরণ হয়েছে। এক হাদীসে আছে, যা তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফা থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট কারো কোন উদ্দেশ্য থাকলে অথবা আদম সন্তানের নিকট কোন উদ্দেশ্য থাকলে তখন উত্তমরূপে অজু করবে এবং দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে। অতঃপর এ দুআ পাঠ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দয়ালু। আমি সে মহান আরশের প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমার সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি দু'জাহানের প্রতিপালক। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে এমন কাজ প্রার্থনা করি, যার বদৌলতে তোমার রহমত আমার উপর অবধারিত হবে এবং এমন কাজের সংকল্প করতে প্রার্থনা করি যার ওসীলায় তোমার ক্ষমা অবধারিত হবে। প্রতিটি ভাল কাজের উপকারিতা প্রার্থনা করি। প্রতিটি গুনাহের কাজ হতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে সকল অনুগ্রহকারীর মহান অনুগ্রহকারী আল্লাহ! তুমি আমার কোন অপরাধকেই ক্ষমা ব্যতীত ছাড়িও না। আমার কোন বিপদকেই দূর করা ব্যতীত অবশিষ্ট রাখিও না। আমার যে কোন প্রয়োজন যা তোমার সন্তোষ লাভের কারণ হয় তা পূর্ণ করা ব্যতীত বাকী রাখিও না।

তিরমিযী শরীফে হাসান ও সহীহ সূত্রে, ইবনে মাজাহ, তবরানী হাদীসগ্রন্থে হযরত ওসমান বিন হানিফ (রঃ) থেকে বর্ণিত। একদা এক অন্ধ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন, আরজ করলেন, আমার আরোগ্যের জন্য দুআ করুন। এরশাদ করলেন, যদি তুমি চাও দুআ করবে। আর যদি চাও ধৈর্য ধারন করো, ধৈর্য অবলম্বন করা এটা তোমার জন্য উত্তম। তিনি আরজ করলেন, হুজুর! দুআ করুন। হুজুর নির্দেশ দিলেন, অজু কর, উত্তমরূপে অজু করো এবং দু'রাকাত নামায পড়ে এ দুআ পড়ো।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَتَوَسَّلُ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, ওসীলা ধারণ করছি। তোমার নবীর ওসীলায় তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি যিনি রহমতের নবী, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার এ প্রয়োজন পূরনার্থে আমার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ করছি। যেন আমার উদ্দেশ্য পুরন হয়। হে আল্লাহ! আমার অনুকূলে

তাঁর সুপারিশ কবুল কর।

ওসমান বিন হানিফ (রঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ আমরা এখনো উঠিনি, আলোচনায় রত আছি। তিনি আমদের নিকট আসলেন। মনে হলো যেন কখনো তার অন্ধত্বই ছিল না।

এছাড়া হাজত পুরনের আরো এক প্রকার পরীক্ষিত নামায রয়েছে যা ওলামারা পড়ে আসতেছেন। তা হলো হযরত ইমাম আজম (রঃ)'র মাজারে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বে, ইমামের ওসীলা নিয়ে আল্লাহর নিকট প্রাথনা করবে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, আমি এরূপ করতাম। অতি দ্রুত আমার হাজত পুরন হয়ে যেতো। (খায়রাতুল হেসান)

সালাতুল আসরার নামাযের নিয়ম

সালাতুল আসরারঃ হাজত পূরনের আর এক প্রকার পরীক্ষিত নামায হলো সালাতুল আসরার। যে সম্পর্কে ইমাম আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী বিন জরীর লহমী শতনুফী, বাহজাতুল আসরার গ্রন্থে এবং মোল্লা আলী ক্বারী ও শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) হুজুর সৈয়্যদানা গাউসে আজম (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এর নিয়ম হল, নিম্নরূপঃ

মাগরিবের নামাজের পর সুন্নত সমূহ পড়ে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে, উত্তম হলো 'আল হামদুলিল্লাহ'র পর প্রতি রাকাতে এগার বার করে 'কুল হু আল্লাহ' পড়বে। সালাম ফিরানোর পর আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসা করবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এগারবার দরুদ সালাম পেশ করবে। এবং এগারবার বলবেঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

অর্থঃ এয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া নবীয়্যাল্লাহ! আমার উদ্দেশ্য পূরনার্থে আমাকে সাহায্য করুন। হে উদ্দেশ্যসমূহ পূরনকারী।

অতঃপর ইরাকের দিকে এগার কদম অগ্রসর হবে। প্রতি কদমে এ দুআ পড়বেঃ

يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْنِ وَيَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِيْ وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

অর্থঃ হে মানব-দানবের সাহায্যকারী! হে পিতা-মাতা উভয়দিক থেকে সম্মানিত বুজুর্গ, আমার উদ্দেশ্য পূরনে আমাকে সাহায্য করুন। হে উদ্দেশ্য সমূহ পূরনকারী।

অতঃপর হুজুরের ওসীলায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।

তওবার নামায ও সালাতুর রাগায়েব-এর বর্ণনা

তাওবার নামাযঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান স্বীয় সহীহ গ্রন্থে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন। যখন কোন বান্দা গুনাহ করে অতঃপর অজু করে নামায পড়বে। অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহর তার গুনাহ ক্ষমা করবেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দুআটি পড়বেঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থঃ এবং ঐসব লোক যখন (তাদের কেউ) অশ্লীলতা কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে স্বীয় গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত গুনাহ কে ক্ষমা করবে? আর তারা জেনে বুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের প্রতি পুনঃপুনঃ অগ্রসর হয় না।

মাসআলাঃ সালাতুর রাগায়েব হলো রজবের প্রথমজুমার রাত্রি শা'বানের পনের তারিখ রাত্রি, ক্বদরের রাত্রি জামাত সহকারে নফল নামায কোন কোন লোকেরা আদায় করে থাকেন। ফোকাহায়ে কেরাম তা নাজায়েয, মাকরূহ ও বেদয়াত বলেছেন।

লোকেরা এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণনা করেন হাদীস বিশারদগণ ওসব হাদীসকে মওজু' বা ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কেরাম হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে। সুতরাং নিষিদ্ধতা বর্ণনায় সীমালংঘন উচিৎ নয়। জমাতের মধ্যে যদি তিনজনের অধিক মুক্তাদি না হয়, তখন মূলতঃ কোন ক্ষতি নেই।

তারাবীহ নামাজের বর্ণনা

মাসআলাঃ তারাবীহ নারী পুরুষ সকলের জন্য সর্বসম্মতভাবে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। তারাবীহ ছেড়ে দেয়া জায়েয নেই। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

খোলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা এর উপর আমল করেছেন। প্রিয় নবী এরশাদ করেছেন, আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত নিজের উপর আবশ্যক করে নাও। স্বয়ং হুজুরও তারাবীহ পড়েছেন এবং তারাবীহ অত্যন্ত পছন্দ করতেন। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রমজানের কেয়াম (বা রাত জাগরণ) করবে ঈমানের কারণে এবং পূণ্যলাভের প্রত্যাশায় তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (অর্থাৎ ছগীরা গুনাহ সমূহ) অতঃপর উম্মতের উপর ফরজ হওয়ার আশংকায় ছেড়ে দিয়েছেন, অতঃপর ফারুকে আজম (রাঃ) রমজানে এক রাত্রি মসজিদে তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং

লোকদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে নামাজ পড়তে দেখেছেন। কেউ একাকী পড়তেছেন, কারো সাথে কিছু লোক পড়তেছে, তিনি বললেন, এসব লোকদেরকে এক ইমামের সাথে একত্রিত করা আমি ভাল মনে করছি। অতঃপর সকলকে একজন ইমাম হযরত উবাই বিন কা'ব (রহঃ)র সাথে একত্রিত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়দিন তাশরীফ নিলেন, দেখলেন লোকেরা নিজেদের ইমামের পিছনে নামায আদায় করছে। বললেন, نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ – رواه اصحاب السنن এটি হলো উত্তম বেদআত।

মাসআলাঃ জমহুর ওলামাদের মতে তারাবীহ্ বিশ রাকাত– এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বায়হাকী সহীহ্ সূত্রে ছায়েব বিন ইয়াযিদ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা ফারুকে আজমের যুগে বিশ রাকাত পড়তেন। হযরত ওসমান ও আলী (রাঃ) এর যুগেও অনুরূপ ছিল। মোয়াত্তা শরীফে ইয়াযিদ বিন রওহান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)'র যুগে লোকেরা রমজান শরীফে তেইশ রাকাত পড়তেন। বায়হাকী বলেন, এর মধ্যে তিন রাকাত বিতরের নামাজ ছিল।

মওলা আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ করেছেন, রমজানে লোকদেরকে বিশ রাকাত নামাজ পড়াবে। উপরন্তু বিশ রাকাত হওয়ার মধ্যে হিকমত হলো, ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ এর দ্বারা পূর্ণতা পায়। প্রতিদিন ফরজ ও ওয়াজিব হলো বিশ রাকাত। সুতরাং এটাও বিশ রাকাত হওয়া সঙ্গত। যেন পূর্ণতার ক্ষেত্রে সমতা বিধান হয়।

মাসআলাঃ তারাবীহ'র সময় এশার ফরজের পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। বিতরের পূর্বেও হতে পারে এবং পরেও হতে পারে। যদি কয়েক রাকাত বাকী থাকে ইমাম বিতরের জন্য দাড়িয়ে যায় তখন ইমামের সাথে পড়ে নেবে। অতঃপর বাকী নামায আদায় করে নেবে– যদি ফরজ জামাতের সাথে পড়ে থাকে। এবং এটা হলো উত্তম।

যদি তারাবীহ্ পূর্ণ করে বিতর একাকী পড়ে তখনও জায়েয। যদি পরে জানা যায় যে, এশার নামাজ অজু ব্যতীত পড়া হয়েছে এবং তারাবীহ ও বিতর অজু সহকারে পড়ে থাকলে এশা ও তারাবীহ্ পূনরায় পড়বে, তবে বিতর হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ তারাবীহ্ রাত্রির তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব এবং অর্ধ রাত্রির পরে পড়লে তখনও মাকরূহ্ হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ তারাবীহ্ বাদ গেলে এর ক্বাজা নেই। একাকী ক্বাজা পড়ে নিলে তারাবীহ্ হবে না, বরং নফল, মুস্তাহাব হবে। যেমন মাগরিব ও এশার সুন্নত সমূহ। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ তারাবীহ্ বিশ রাকাত দশ সালামে আদায় করবে, অর্থাৎ প্রত্যেক দু'রাকাত পর সালাম ফিরাবে। কেউ বিশ রাকাত পড়ে শেষে সালাম ফিরাল– যদি পত্যেক দু'রাকাতে বসে থাকলে হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরূহ্ হবে। আর যদি দু'রাকাতের বৈঠক না করে থাকলে তখন দু'রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ সতর্কতা হলো, যখন দু'রাকাত পর সালাম ফিরাবে, তখন প্রত্যেক দু'রাকাত পর পৃথক পৃথক নিয়্যত করবে। যদি একই সাথে বিশ রাকাতের নিয়্যত করলে তখনও জায়েয। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ তারাবীহ্র মধ্যে একবার কুরআন মজীদ খতম করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ্, দু'বার খতম করা উত্তম। তিনবার করা অধিক উত্তম। মানুষের অলসতার কারণে খতম পরিত্যাগ করবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম, মুক্তাদি সকলে প্রতি দু'রাকাতে ছানা পড়বে এবং তাশাহ্হুদের পর দুআও পড়বে। মুক্তাদিদের যদি কষ্ট হয় তখন তাশাহ্হুদের পর اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ এর উপর যথেষ্ট করবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ২৭শে রমজান রাত্রে খতমে কুরআন অর্থাৎ তারাবীহ্র খতম ২৭শে রমজান করা উত্তম। যদি এ রাতে বা এর পূর্বে কুরআন খতম করলেও তারাবীহ্ শেষ রমজান পর্যন্ত সমানভাবে আদায় করবে। যেহেতু তারাবীহ্ হচ্ছে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ উত্তম হলো প্রতি দু'রাকাতে কেরাত যেন সমান হয়। এরূপ না করলেও কোন ক্ষতি নেই। এভাবে প্রতি জোড়ের প্রথম রাকাত এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত যেন সমান হয়। দ্বিতীয় রাকাতের কেরাত প্রথম রাকাতের চেয়ে দীর্ঘ না হওয়া উচিৎ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কেরাত এবং রুকন সমূহ্ আদায়ের ক্ষেত্রে দ্রুত করা মাকরূহ্। তারতীল যত অধিক হবে তত উত্তম। এভাবে তাউজ, তাসমীয়া ও তাসবীহ্ ছেড়ে দেয়াও মাকরূহ্। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রতি চার রাকাত পর ততক্ষণ বসা মুস্তাহাব চার রাকাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে। পাঁচ তারবীহা এবং বিতরের মাঝখানে বসাটা যদি মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয় বসবে না। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ তারবীহার বৈঠকে এখতিয়ার রয়েছে। চাই চুপ করে থাকুক বা দুআ কলেমা পড়ুক বা তেলাওয়াত করুক বা দরুদ শরীফ পড়ুক অথব একা চার রাকাত নফল পড়বে। জামাত সহকারে পড়া মাকরূহ্। অথবা এ তাসবীহ্ পাঠ করবে।

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَنَامُ وَلَايَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

– غنية، رد المختار وغيرهما)

উচ্চারণঃ সুবহানা যিলমুলকে ওয়াল মালাকুতি সুবহানা বিল যিল ইজ্জতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হায়বতে ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল জবরুতি সুবহানাল মালিকিল হায়্যি আল্লাযি লা ইনামু ওয়ালা ইয়ামুতু সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররুহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু নাসতাগফিরুল্লাহা নাসআলুকাল জান্নাতি ওয়া নাউজুবিকা মিনান্নারি (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ প্রতি দু'রাকাত পর দু'রাকাত পড়া মাকরূহ। এভাবে দশ রাকাত পর বসাও মাকরূহ। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ তারাবীহর জামাত হচ্ছে সুন্নাতে কেফায়া মসজিদের সকল লোক ছেড়ে দিলে সকলে গুনাহগার হবে। যদি কোন একজন ঘরে একা পড়ে গুনাহগার হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি নেতৃস্থানীয় সে থাকলে জামাত বড় হবে ছেড়ে দিলে লোক কম হবে– তার জন্য বিনা ওজরে জামাত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ তারাবীহ মসজিদে জামাত সহকারে পড়া উত্তম। যদি ঘরে জামাত সহকারে পড়ে তাহলে মসজিদের জামাত পরিত্যাগের গুনাহ হবে না। কিন্তু মসজিদে পড়লে যে ছওয়াব পেত, তা পাওয়া যাবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ আলেম যদি হাফেজও হয় উত্তম হলো নিজে পড়বে। অন্যের এক্তেদা করবে না। ইমাম সাহেব ভুল পড়লে মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে গমন করলে কোন ক্ষতি নেই। এভাবে অন্যস্থানের ইমামের কণ্ঠ যদি সুন্দর হয় অথবা ছোট কেরাত পাঠ করে, বা মহল্লার মসজিদে খতম না হয়ে থাকলে তখন অন্য মসজিদে গমন করা জায়েয। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সুমধুর কণ্ঠধারীকে ইমাম বানানো উচিৎ নয় বরং বিশুদ্ধ পাঠকারীকে ইমাম বানাবে। (আলমগীরি)

কিন্তু অতীব আফসোসের বিষয় হচ্ছে বর্তমান যুগের হাফেজদের অবস্থা খুবই নাজুক। অনেকেই তো এমনভাবে পড়েন 'ইয়ালামুন', 'তা'লামুন' ব্যতীত কোন কিছু বুঝা যায় না। শব্দ এবং অক্ষর সমূহ কোথায় যাচ্ছে কোন হদীস নেই যাদেরকে ভাল পাঠকারী বলা হয়, তাদেরকে দেখা যায় হরফ বিশুদ্ধভাবে আদায় হচ্ছে না।

همزه ও الف – عين – ذ – ز – ظ – ث ও س – ص – ت – ط ইত্যাদি হরফের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করে না। যে কারণে নিশ্চিতভাবে নামাযই হয় না। আমি (লেখক) নিজেও এসব বিপদের কারণে তিন বৎসর খতমে কুরআন শুনার সুযোগ আমার হয়নি। মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ভাইদেরকে আল্লাহপাক যেভাবে নাজিল করেছেন সেভাবে পড়ার যেন তৌফিক নসীব করেন।

মাসআলাঃ বর্তমানকালে অধিক প্রচলন হয়ে গেছে যে, হাফেজ সাহেবদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে তারাবীহ পড়ানো হয়, এটা জায়েয নয়। দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই গুনাহগার হবে। শুধু পারিশ্রমিকের বিনিময় হয় তা নয় বরং পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয় যে, এত টাকা দিতে হবে বা এত টাকা নেব। বরং যদি জানা যায় এখানে কিছু পাওয়া যাবে, যদিও তা উল্লেখযোগ্য নহে, এটাও নাজায়েয। নীতিমালা হলো اَلْمَعْرُوْفُ كَالْمَشْرُوْطِ প্রসিদ্ধতা বা জানাশুনা বিষয় শর্ত যুক্তের ন্যায়। হ্যাঁ যদি বলে দেয় কিছু দেব না বা নেব না তারপরও পড়লে এবং হাফেজদের খেদমত করলে এতে কোন ক্ষতি নেই। الصَّريح يفوق الدلالة স্পষ্টতা নির্দেশনার অগ্রগামী।

মাসআলাঃ এক ইমাম যদি দুই মসজিদে তারাবীহ পড়ায় এবং উভয় মসজিদে যদি সম্পূর্ণরূপে পড়ায় তখন নাজায়েয। মুক্তাদি যদি দুই মসজিদে পূর্ণরূপে তারাবীহ পড়ে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বিতর পড়া জায়েয নেই যখন প্রথমটিতে এশা পড়েছিল। আর যদি ঘরে তারাবীহ পড়ার পর মসজিদে আসে এবং ইমামতি করে তখন মাকরূহ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ লোকেরা তারাবীহ পড়ে নিল, দ্বিতীয়বার যদি পড়তে চায় একা একা পড়া যাবে, তবে জামাত সহকারে পড়ার অনুমতি নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ এক ইমামের পিছনে তারাবীহ পড়া উত্তম। দু'জনের পিছনে পড়লে পূর্ণ তারাবীহতে ইমাম পরিবর্তন করা উত্তম। যেমন আট রাকাত একজনের পিছনে দ্বিতীয়জনের পিছনে বার রাকাত। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পিছনে প্রাপ্তবয়স্কদের তারাবীহ হবে না এটাই বিশুদ্ধ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রমজান শরীফে বিতর জামাত সহকরে পড়া উত্তম। যে ইমামের পিছনে এশা ও তারাবীহ পড়েছে তার পিছনে হোক অথবা অন্য জনের পেছনে হোক। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি এশা ও বিতর পড়াল অন্যজন তারাবীহ পড়াল, এরূপ পড়া জায়েয। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) এশার ও বিতরের ইমামতি করতেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তারাবীর ইমামতি করতেন। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সব লোক যদি এশার জামাত ছেড়ে দিলে তারাবীহও জামাতের সাথে পড়বে না। তবে এশার জামাত হয়েছে কিছু লোক জামাত পাইনি তখন তারাও তারাবীর জামাতে শামিল হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ এশা যদি জামাতে পড়ে এবং তারাবীহ একা পড়লে তখন বিতরের জমাতে শামিল হতে পারবে। আর যদি এশা একা পড়ে যদিও তারাবীহ জামাতে পড়ে তখন বিতর একা পড়বে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ এশার সুন্নতের সালাম না ফিরায়ে তার সাথে তারাবীহ মিলায়ে শুরু করলে তারাবীহ হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বিনা ওজের তারাবীহ বসে পড়া মাকরূহ। বরং অনেকের মতে মোটেও হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ অনেকে বসে থাকেন, ইমামের রুকুর সময় হলে দাড়িয়ে যান মুক্তাদির জন্য এটা জায়েয নেই এটা মুনাফিকদের সাদৃশ্যতা বহন করে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

إِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

অর্থঃ মুনাফিক যখন নামাযে দাড়ায় তখন অলসভাবে দাড়ায়। (গুনীয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ইমামের ভুল হলে কোন সূরা বা আয়াত বাদ পড়লে মুস্তাহাব হলো সেটা পড়ে সামনে অগ্রসর হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ দু'রাকাতে না বসে ভুলক্রমে দাড়িয়ে গেলে যতক্ষণ না তৃতীয় রাকাতের সিজদা করবে বসে পড়বে। সিজদা করে নিলে চার রাকাত পূর্ণ করবে। এটাকে দু' অংশে গণ্য করবে, যে দ্বিতীয় রাকাতে বসেছিল তার জন্য চার রাকাত হলো। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরাল, দ্বিতীয় রাকাতে যদি না বসে হবে না। এর পরিবর্তে পুনরায় দু'রাকাত পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ প্রথম বৈঠকে মুক্তদি নিদ্রা গেল, ইমাম সালাম ফিরানোর পর আরো দু'রাকাত পড়ে বৈঠকে আসল তখন মুক্তাদি চেতন হল মুক্তাদি জানতে পারলে সালাম ফিরায়ে শামিল হয়ে যাবে। ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাড়াতাড়ি পূর্ণ করে ইমামের সাথে হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বিতর পড়ার পর লোকদের স্মরণ হলো দু'রাকাত বাদ পড়েছে তখন জমাতের সাথে পড়ে নেবে। আর যদি আজকে স্মরণ হয় যে কালকে দু'রাকাত বাদ পড়েছে। তখন জামাতে পড়া মাকরূহ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সালাম ফিরানোর পর কেউ বলল, দু'রাকাত হয়েছে কেউ বলল, তিন রাকাত হয়েছে, তখন ইমামের জ্ঞানে যেটা সঠিক মন হয় সেটা গণ্য হবে। কারো কথায় যদি ইমাম নিশ্চিত না হয়, তখন যাকে সত্যবাদী মনে করবে তার কথা গ্রহণ করবে। এতে যদি মুসল্লীদের সন্দেহ থাকে বিশ রাকাত হলো না, আঠার রাকাত হলো, তখন মুসল্লীরা একা একা দু'রাকাত পড়ে নেবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কোন কারণে যদি তারাবীহ নামায ফাসেদ হয়ে যায়, তখন যতটুকু পরিমাণ কুরআন মজীদ উক্ত রাকাত সমূহে পড়া হয়েছে তা পুনরায় পড়বে যেন খতমে কুরআনে ত্রুটি না হয়। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কোন কারণে খতম না হলে তখন সূরা তারাবীহ পড়বে। এরজন্য কেউ কেউ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন, اَلَمْ تَرَ থেকে শেষ পর্যন্ত দু'বার পড়লে বিশ রাকাত হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ বিসমিল্লাহ শরীফ একবার প্রকাশ্যে পড়া সুন্নত এবং প্রত্যেক সূরার শুরুতে চুপে চুপে পড়া মুস্তাহাব। বর্তমানকালে কিছু মূর্খেরা যে পদ্ধতি বের করেছে যে, একশত চৌদ্দটি সূরাতে স্পষ্টভাবে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। অন্যথায় খতম হবে না– হানফী মজহাব মতে এসবগুলো ভিত্তিহীন কথা।

পরবর্তীযুগে ইমামগণ খতমে তারাবীহতে তিনবার 'কুলহুআল্লাহ' পড়া মুস্তাহাব বলেছেন। উত্তম হলো, শেষের দিন শেষ রাকাতে الم থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়বে।

মাসআলাঃ শবীনা খতমে এক রাতের তারাবীতে পূর্ণ কুরআন পাঠ করা হয় যেমন বর্তমানে প্রচলন আছে। কেউ বসে বসে কথা বলছে। কেউ শুয়ে পড়েছে। কেউ চা পানে মশগুল রয়েছে। কেউ মসজিদের বাহিরে হুক্কা বা ধুমপানে ব্যস্ত। যখন ইচ্ছে হল এক রাকাত অর্ধ রাকাতে শামিলও হয়ে গেল এটা জায়েয নেই।

নোটঃ আমাদের ইমাম আজম (রঃ) রমজান শরীফে একষট্টি খতম আদায় করতেন ত্রিশটি দিনে ত্রিশটি রাতে এক খতম তারাবীতে এবং পয়তাল্লিশ বৎসর এশার অজু দিয়ে ফজরের নামাজ পড়েছেন।

একা নামায শুরু করল, জামাত কায়েম হল এ সম্পর্কিত মাসাইল

ইমাম মালেক ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে মাহজন নামক একজন ছাহাবী হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় আজান হল, হুজুর দাঁড়ালেন, নামাজ পড়লেন। ছাহাবাটি বসে রইলেন। হুজুর এরশাদ করলেন। কিসে তোমাকে জামাত সহকারে নামাজ থেকে বিরত রেখেছে? তুমি কি মুসলমান নহে? আরজ করলেন এয়া রাসুলাল্লাহ! আমি

মুসলমান হই; কিন্তু আমি ঘরে পড়ে নিয়েছি। হুজুর এরশাদ করলেন– যখন নামাজ পড়ে মসজিদে আসবে এবং মসজিদে নামাজ কায়েম হয়ে যায়, তখন তুমি মানুষের সাথে নামাজ পড়ে নেবে, যদি পড়ে থাকো। ইয়াযিদ বিন আমের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ ঘটনার প্রমাণ রয়েছে। যা আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এরশাদ করেন, মাগরিব এবং ফজরের নামাজ পড়ে থাকলে অতঃপর ইমামের সাথে যদি পায় পুনরায় পড়তে হবে না।

মাসআলাঃ একাকী ফরজ নামায শুরু করেছে, এখনো প্রথম রাকাতের সিজদা করেনি। জামাত কায়েম হয়ে গেল, তখন নামাজ ভঙ্গ করে জামাতে শামিল হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফজর অথবা মাগরিবের নামায এক রাকাত পড়েছে জামাত কায়েম হয়ে গেল, তখন দ্রুত নামায ভঙ্গ করে জামাতে শামিল হয়ে যাবে। যদিও দ্বিতীয় রাকাত পড়তেছিল। অবশ্য দ্বিতীয় রাকাতের সিজদা করে থাকলে তখন ভঙ্গ করার অনুমতি নেই এবং নামাজ পূর্ণ করার পরও নফলের নিয়্যতে জামাতে শামিল হতে পারবে না। যেহেতু ফজরের পর নফল জায়েয নেই। মাগরিবে এ কারণে জায়েয নেই যে, যেহেতু তিন রাকাত নফল নেই। আর মাগরিবের যদি শামিল হয়ে যায় ঠিক করেনি। ইমামের সালাম ফিরানোর পর আরো এক রাকাত যুক্ত করে চার রাকাত করবে। আর যদি ইমামের সাথে সালাম ফিরায়ে নেয়, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। চার রাকাত ক্বাজা করবে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মাগরিব আদায়কারীর পিছনে নফলের নিয়্যতে শামিল হয়ে গেল, ইমাম চার রাকাতকে তৃতীয় রাকাত মনে করে দাঁড়িয়ে গেল, আর ঐ মুক্তাদিও তার অনুসরণ করল, তার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তৃতীয় রাকাতে ইমাম শেষ বৈঠকে বসুক বা না বসুক। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ শুরু করে এক রাকাত পড়ল। অর্থাৎ প্রথম রাকাতের সিজদা করল, তখন আরো এক রাকাত পড়া ওয়াজিব। এরপর ভঙ্গ করলে এ দু'রাকাত নফল হয়ে যাবে। আরো দু'রাকাত পড়ে নেবে। এবং তখনই ভঙ্গ করবে অর্থাৎ তাশাহুহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। আর তিন রাকাত পড়ে থাকলে ভঙ্গ করলে গুনাহগার হবে। বরং হুকুম হল পূর্ণ করে নফলের নিয়্যতে জামাতে শামিল হলে জামাতের ছওয়াব পাবে। কিন্তু আছরে শামিল হতে পারবে না। যেহেতু আসরের পর নফল জায়েয নেই। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জামাত কায়েম হওয়া মানে মুয়াজ্জিনের তাকবীর বলাটা উদ্দেশ্য নহে, বরং নামাজ শুরু হওয়াটাই উদ্দেশ্য। মুয়াজ্জিন তাকবীর বললেই বন্ধ করবে না। যদি প্রথম রাকাতের সিজদা এখনো করেনি। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জামাত কায়েম হলে নামাজ বন্ধ করার বিধান সে সময় প্রযোজ্য হবে যখন যে স্থানে নামাজ পড়তেছে সেস্থানে জামাত কায়েম হলে আর এদিকে ঘরে নামাজ পড়তেছে এদিকে মসজিদে জামাত কায়েম হয়েছে। অথবা এক মসজিদে নামায পড়তেছে অন্য মসজিদে জামাত শুরু হয়েছে তখন নামায বন্ধ করার বিধান নেই। যদিও প্রথম রাকাতের সিজদা এখনো করেনি। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নফল শুরু করেছে ওদিকে জামাতও শুরু হয়েছে তখন বন্ধ করবে না। বরং দু'রাকাত পূর্ণ করবে। যদিও প্রথম রাকাতের সিজদা করেনি আর তৃতীয় রাকাতে থাকলে তখন চার রাকাত পূর্ণ করে নেবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জুমা এবং জোহরের সুন্নত পড়ার সময় খোতবা বা জামাত শুরু হলে তখন চার রাকাত পূর্ণ করে নেবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ সুন্নত অথবা ক্বাজা নামাজ শুরু করেছে এদিকে জামাত শুরু হয়েছে তখন তা পূর্ণ করে জামাতে শামিল হবে। হ্যাঁ যে ক্বাজা শুরু করেছে যদি ঠিক একই ক্বাজার জামাত কায়েম হয় তখন ভঙ্গ করে জামাতে শামিল হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বিনা ওজরে নামায ভঙ্গ করা হারাম। মাল-সম্পদের ক্ষতির আশংকা হলে তখন ভঙ্গ করা মুবাহ। পূর্ণতার জন্য হলে মুস্তাহাব। প্রাণ রক্ষার জন্য হলে তখন ওয়াজিব। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নামাজ ভঙ্গের জন্য বসার প্রয়োজন নেই। দাড়ানো অবস্থায় একদিকে সালাম ফিরায়ে ভঙ্গ করা যায়। (আলমগীরি)

আজানের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নিষিদ্ধতা

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি নামাজ পড়েনি, আজানের পর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ তাহরীমি। ইবনে ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আজানের পর যে মসজিদ থেকে চলে গেল, কোন হাজতের জন্য যায়নি আর ফিরে আসারও ইচ্ছা নেই, সে মুনাফিক। ইমাম বোখারী ব্যতীত একদল হাদীসবেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন যে, আবুশ শাআশা বলেছেন যে, আমরা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)র সাথে মসজিদে ছিলাম। যখন মুয়াজ্জিন আসরের আজান দিল, তখন এক ব্যক্তি চলে গেল। তারপর তিনি বলেন, সে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করল। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ আজানের উদ্দেশ্য হল নামাজের সময় হওয়া, এখন আজান হোক বা না হোক। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি অন্য কোন মসজিদে জামাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে যেমন ইমাম বা মুয়াজ্জিন সে মসজিদে থাকলে মানুষ হয়, অন্যথায় দিক বিদিক ছুটে যায়– এমন ব্যক্তির জন্য এখান থেকে স্বীয় মসজিদে চলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। যদিও এখানে ইকামতও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যে মসজিদের দায়িত্বশীল সে মসজিদে যদি জামাত হয়ে যায় তখন এখান থেকে যাওয়ার অনুমতি নেই। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সবকের সময় হলে তখন এখান থেকে স্বীয় ওস্তাদের মসজিদে যেতে পারবে। অথবা যদি কোন প্রয়োজন থাকে ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলে তখনও যাওয়ার অনুমতি আছে। যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, জামাতের পূর্বে ফিরে আসতে পারবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি জোহর বা এশার নামাজ একাকী পড়েছে তার জন্য মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার নিষিদ্ধতা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন ইকামত শুরু হয়ে যায়। তবে ইকামতের পূর্বে যেতে হবে। আর যখন ইকামত শুরু হয়ে যাবে তখন হুকুম হলো, জামাতে নফলের নিয়্যতে শামিল হয়ে যাবে এবং মাগরিব, ফজর ও আসরে এই হুকুম। যদি নামায পড়ে থাকে মসজিদের বাহিরে চলে যাবে। (দুররুল মোখতার)

ইমামের বিরোধীতা করা এবং জামাতে শামিল হওয়ার মাসাঈল

মাসয়ালাঃ মুক্তাদি দু'টি সিজদা করে নিল, ইমাম এখনো প্রথম সিজদায় আছে, তখন মুক্তাদির দ্বিতীয় সিজদা হয়নি। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের এক রাকাত ইমামের সাথে পেল, সে জামাত পায়নি। তবে জামাতের ছওয়াব পাবে। কিন্তু যার কোন রাকাত বাদ পড়েছে সে এতটুকু ছওয়াব পাবে না যতটুকু ছওয়াব প্রথম থেকে অংশ গ্রহণকারীর জন্য রয়েছে। এ মাসআলার সারকথা হলো এই যে, কেউ শপথ করল, অমুক নামাজ জামাতে পড়বে, তখন কোন রাকাত বাদ পড়লে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কাফ্ফারা দিতে হবে। তিন রাকাত বা দু'রাকাত বিশিষ্ট নামাজেও এক রাকাত না পেলে জামাত পায়নি, লাহেকের হুকুম পূর্ণ জমাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম রুকুতে রয়েছে কেউ তার এক্তেদা করে দাড়িয়ে আছে, ইমাম মাথা উঠায়ে নিল, সে রাকাত পেল না বিধায় ইমামের সমাপ্তির পর সে বাকী রাকাত পড়ে নেবে। আর যদি ইমামকে দাড়ানো অবস্থায় পায় এবং তার সাথে যদি রুকুতে শামিল না হয়, তখন প্রথম রুকু করে নেবে, অতঃপর অন্যান্য কার্যাদি ইমামের সাথে করবে। আর যদি প্রথমে রুকু না করে থাকে এবং ইমামের সাথে শামিল হয়ে যায় তখন ইমামের সমাপ্তির পর রুকু করলে তখনও হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়াজিব বর্জনের কারণে গুনাহগার হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুক্তাদির রুকু করার পূর্বে ইমাম মস্তক উত্তোলন করে নিল,তখন মুক্তাদি রাকাত পেল না। এমতাবস্থায় নামাজ ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নেই। যেমন কতেক মূর্খেরা করে থাকে। বরং তার উপর ওয়াজিব হলো সিজদায় ইমামের অনুসরণ করবে। যদিও এ সিজদা রাকাতে গণ্য না হয়। এভাবে যদি সিজদায় পাওয়া যায় তখন সঙ্গে সিজদা করবে। সিজদা না করলেও নামাজ ফাসেদ হবে না। এমনকি ইমামের সালামের পর সে নিজ রাকাত পড়ে দিলে নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়াজিব বর্জনের কারণে গুনাহগার হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুক্তাদি ইমামের পূর্বে রুকু করল, কিন্তু মাথা উত্তোলনের পূর্বে ইমামও রুকু করল, তখন রুকু হয়ে গেল, শর্ত হলো সে এমন সময়ে রুকু করেছে যে ইমাম ফরজ কেরাতের সময় পরিমাণ করেছে, অন্যথায় রুকু হবে না। এমতাবস্থায় যদি ইমামের সাথে বা পরে দ্বিতীয়বার রুকু করলে হয়ে যাবে। অন্যথায় নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ইমামের পূর্বে রুকু এবং যে কোন রুকন আদায় করলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম রুকুতে ছিল, মুক্তাদি তকবীর বলে ঝুঁকেছিল ইমাম দাড়িয়ে গেল সামান্য হলেও ঝুকে পড়াটা যদি রুকুর সীমায় শামিল হয়– রাকাতে গণ্য হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুক্তাদি সম্পূর্ণ রাকাতে রুকু ও সিজদা ইমামের পূর্বে করেছে, তখন সালামের পর জরুরী হলো, কেরাতবিহীন এক রাকাত পড়ে দেয়া, না পড়লে নামাজ হবে না। ইমামের পরে রুকু সিজদা করলে নামাজ হবে। ইমামের আগে রুকু করেছে, সিজদা সাথে করল, তখন চারো রাকাত কেরাতবিহীন পড়বে। আর যদি রুকু সাথে করেছে সিজদা আগে করেছে তখন দু'রাকাত পরে পড়বে। (আলমগীরি)

ক্বাযা নামায ও ক্বাযা করার ওজরের বর্ণনা

খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের কারণে হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নামাজ ক্বাজা হয়েছে। এমনকি রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হল। বেলাল (রাঃ)কে নির্দেশ দিলেন, তিনি আজান ও ইকামত দিলেন। হুজুর জোহরের নামাজ পড়লেন, অতঃপর ইকামত বললেন, আছরের নামাজ পড়লেন, অতঃপর ইকামত দিলেন, মাগরিবের নামায পড়লেন, অতঃপর ইকামত দিলেন, এশা পড়লেন। ইমাম আহমদ আবি জামআ হাবিব বিন সাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, আহযাবের যুদ্ধে আমি মাগরিবের নামাজ সম্পন্ন করলাম। হুজুর এরশাদ করলেন, আমি আসরের নামায পড়েছি কি না? কারো জানা আছে কি? লোকেরা আরজ করলেন পড়েননি। মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিলেন, তিনি ইকামত দিলেন। হুজুর আসর পড়লেন, অতঃপর মাগরিব পূণরায় পড়লেন।

তবরানী, বায়হাকী শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন নামাজ ভুলে যায় আর তা স্মরণ হলো এমন সময় যে সময় ইমামের সাথে আদায় করছে, ইমামের সাথে নামাজ পূর্ণ করবে। অতঃপর ভুলে যাওয়া নামাজ পড়ে নেবে। অতঃপর ইমামের সাথে পড়া নামাজ পুনরায় পড়বে।

সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রা গেল বা ভুলে গেল, নামাজ পড়েনি, যখনই স্মরণ হবে পড়ে নেবে। সেটাই তার সময়।

সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এটাও এসেছে, নিদ্রায় যদি নামাজ চলে যায়, কোন অপরাধ নয়, অপরাধতো জাগ্রত অবস্থায়।

মাসআলাঃ শরয়ী ওজর ব্যতীত নামাজ ক্বাজা করা বড় কঠিন গুনাহ, তার জন্য ক্বাজা পড়ে নেয়া ওয়াজিব এবং বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করবে। তওবা অথবা মকবুল হজ্বের দ্বারা বিলম্বে আদায়ের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ তওবা যখনই শুদ্ধ হল, ক্বাজা পড়ে নেবে তা যদি আদায় করা না হয়, তওবা কোথায় যাবে? এটা তওবা নহে, যে নামাজ তার দায়িত্বে ছিল তা না পড়ায় এখনো তা বাকী রয়েছে। গুনাহ থেকে বিরত হল না, তওবা কোথায় হল? (রদ্দুল মোখতার)

হাদীসে এরশাদ হয়েছে, গুনাহর কাজে লিপ্ত থেকে এস্তেগফারকারী ঐ ব্যক্তির মত যে স্বীয় প্রভুর সাথে বিদ্রুপ করছে।

মাসআলাঃ শত্রুর ভয় নামাজ ক্বাজা করার জন্য ওজর। যেমন মুসাফিরের চোর এবং ডাকাতের আশংকা রয়েছে এ কারণে ওয়াক্তিয়া নামাজ ক্বাজা করা যাবে। শর্ত হলো কোন প্রকারে যদি নামাজ পড়তে সক্ষম না হয়। আর যদি আরোহী হয় এবং বাহনের উপর পড়া গেলে বাহনের উপর পড়বে। যদিও চলন্ত অবস্থায় বা বসাবস্থায় হয় পড়তে পারবে তখন ওজর হিসাবে গণ্য হবে না। এভাবে যদি ক্বেবলামুখী হলে শত্রুর মুখামুখী পড়ে গেলে তখন যেদিকে পড়া যায় সেদিকে পড়ে নিলে হয়ে যাবে। অন্যথায় নামাজ ক্বাজা করলে গুনাহ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রসূতি নামাজ পড়লে সন্তান মারা যাবার আশংকা রয়েছে তখন নামাজ ক্বাজা করার জন্য এটা ওজর হিসাবে গণ্য হবে। সন্তানের মস্তক বেরিয়ে আসল, নেফাসের পূর্বে যদি সময় শেষ হয়ে যায়, তখন এমতাবস্থায়ও তার মায়ের উপর নামাজ পড়া ফরজ। না পড়লে গুনাহগার হবে। সন্তান কষ্ট না পায় মত কোন পাত্রে সন্তানের মস্তক রাখবে এবং নামাজ পড়বে। এ পদ্ধতিতে পড়ার ক্ষেত্রেও সন্তান মারা যাবার আশংকা থাকলে তখন বিলম্ব ক্ষমাযোগ্য। নেফাসের পর নামাজ ক্বাজা পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

ক্বাযা ও আদা'র সংজ্ঞা ক্বাযা নামায পড়ার নিয়ম সূমহ

মাসআলাঃ বান্দার উপর যে কাজ করার হুকুম রয়েছে, যথাসময়ে তা পালন করাকে আদায় বলা হয়। নির্ধারিত সময়ের পর পালন করাকে ক্বাজা বলা হয়। আর ঐ আদেশ পালনে যদি কোন প্রকার ক্ষতি সৃষ্টি হলে তখন ক্ষতি দূরীভূত করার জন্য দ্বিতীয়বার পালন করাকে 'এয়াদা' বা পুনরায় পড়া বলা হয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ সময়ের মধ্যে তাহরীমা বেঁধে নিল, তখন ক্বাজা হবে না বরং আদায় হবে। (দুররুল মোখতার) কিন্তু ফজরের নামাজ, জুমার নামাজ ও দু'ঈদের নামাজে যদি সালামের পূর্বে সময় শেষ হয়ে যায় নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলাঃ নিদ্রার কারণে বা ভুলক্রমে নামাজ ক্বাজা হয়ে গেলে তখন ক্বাজা পড়াও ফরজ। অবশ্য ক্বাজা হওয়াতে তার উপর গুনাহ হবে না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় বা স্মরণে আসার পর হলে ক্বাজার গুনাহ হবে। মাকরূহ সময় না হলে ঐ সময়েই

পড়ে নিবে। বিলম্ব করা মাকরূহ। হাদীসে এরশাদ হয়েছে নিদ্রা বা ভুলবশতঃ যার নামাজ চলে গেছে স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ে নেবে এটাই তার সময়। (আলমগীরি ইত্যাদি)

কিন্তু ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর নিদ্রা গেল, অতঃপর সময় চলে গেল, তখন অবশ্যই গুনাহগার হবে– যদি জাগ্রত হওয়া বা জাগ্রতকারী কেউ উপস্থিত থাকার আশাবাদী না হয়। বরং ফজরের সময় শুরুর পূর্বেও ঘুমানোর অনুমতি নেই। হতে পারে যদি অধিকাংশ রাত জাগ্রত থেকেছে জাগ্রত হওয়ার ধারণায় ঘুমিয়ে পড়েছে সময়মত চোখ খুলেনি।

মাসআলাঃ কেউ ঘুমাচ্ছে বা নামাজ পড়তে ভুলে গেছে, যার জানা আছে তার উপর ওয়াজিব হল, নিদ্রাকারীকে জাগিয়ে দেয়া এবং ভুলকারীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি আশংকা হয় ফজরের নামাজ চলে যাবে তখন শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত তার জন্য দেরীক্ষণ জাগ্রত থাকা নিষিদ্ধ। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফরজের ক্বাজা ফরজ। ওয়াজিবের ক্বাজা ওয়াজিব। সুন্নতের ক্বাজা সুন্নত। (অর্থাৎ ওসব সুন্নত যেগুলোর ক্বাজা রয়েছে) যেমন ফজরের সুন্নত যখন ফরজও বাদ পড়ে যায় এবং জোহরের পূর্বের সুন্নত যখন জোহরের সময় বাকী থাকে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্বাজার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই জীবনে যখনই পারে পড়ে নেবে দায়িত্বমুক্ত হবে। কিন্তু সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় নামাজ জায়েয নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পাগলের পাগলাবস্থায় যে নামাজ বাদ গেছে, সুস্থ হওয়ার পর তা ক্বাজা দেয়া ওয়াজিব নহে। যদি পাগলামী ছয় ওয়াক্ত নামাজের সময় পর্যন্ত সমানভাবে বহাল থাকে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহী হয়ে গেল, অতঃপর ইসলাম কবুল করল তখন মুরতাদ অবস্থায় বাদ পড়া নামাজের ক্বাজা নেই। মুরতাদ হওয়ার পূর্বে ইসলামী যুগে যে নামাজ সমূহ বাদ পড়েছে তা ক্বাজা দেয়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ দারুল হরবে কোন ব্যক্তি মুসলমান হল, শরীয়তের বিধি-বিধান, নামায রোযা, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে সে অবগত হয়নি, যতদিন পর্যন্ত সেখানে থাকবে ততদিন সমূহের ক্বাজা তার উপর ওয়াজিব নয়। যখন দারুল ইসলাম বা মুসলিম রাষ্ট্রে আসল, তখন থেকে যে নামাজ ক্বাজা হল ওসব নামায পড়া ফরজ।

মুসলিম রাষ্ট্রে বিধি-বিধান না জানা ওজর নহে। অন্য কোন ব্যক্তিও তাকে নামায ফরজ হওয়ার ব্যাপারে অবগতি প্রদান করেছে যদিও সে ফাসিক, ছোট ছেলে, মহিলা, অথবা ক্রীতদাস হোক। সুতরাং অবগতির পর যত নামাজ পড়েনি সব নামাজ ক্বাজা দেয়া ওয়াজিব। মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান হল, যত নামায বাদ পড়েছে ওসব নামাযের ক্বাজা ওয়াজিব। যদিও বলা হয় যে, এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান ছিল না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ এমন রুগ্ন ব্যক্তি ইশারায়ও নামাজ পড়তে পারছে না, এ অবস্থা যদি পূর্ণ ছয় ওয়াক্ত পর্যন্ত থাকে তখন ঐ অবস্থায় যে নামায বাদ পড়েছে ওসব নামায ক্বাজা করা ওয়াজিব নহে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে নামায যেভাবে বাদ পড়েছে সে নামায সেভাবে ক্বাযা পড়তে হবে। যেমন সফরে নামায ক্বাযা হলে, তখন চার রাকাত বিশিষ্ট নামায দু'রাকাত পড়বে– যদিও মুকীম অবস্থায় পড়া হয়। মুকীম অবস্থায় বাদ পড়া নামাজ চার রাকাতের নামায চার রাকাত দিয়ে ক্বাযা করবে– যদিও সফরে পড়া হয়। অবশ্য ক্বাযা পড়ার সময় কোন ওজর থাকলে তা বিবেচনা করবে। যেমন যে সময় বাদ পড়েছে সে সময় দাড়িয়ে পড়তে সক্ষম ছিল। এখন দাড়াতে সক্ষম নহে তাহলে বসে পড়বে। অথবা এ সময় ইশারায় পড়তে পারে তাহলে ইশারায় পড়বে। সুস্থ হওয়ার পর তা পুনরায় পড়তে হবে না। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মেয়েলোক এশার নামায পড়ে বা নামায পড়াবিহীন নিদ্রা গেল, চোখ খোলার পর জানতে পারল, প্রথমে তার ঋতুস্রাব হয়েছিল, তখন তার উপর ঐ এশা ফরজ হয়নি, যদি স্বপ্নদোষে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার হুকুম পুরুষ লোকের হুকুমের অনুরূপ। পর্দা ফাটার পূর্বে চক্ষু খুললে তখন তার উপর নামায ফরজ হবে। যদিও নামায পড়ে নিদ্রা যায়। আর পর্দা ফাটার পর চোখ খুলে তখন এশা পুনরায় পড়বে, বয়সের কারণে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অর্থাৎ তার বয়স যদিও পূর্ণ পনের বৎসরে উপনীত হয়েছে সে সময়ের নামায তার উপর ফরজ হবে। যদিও প্রথমে পড়ে থাকে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

কয়েক ওয়াক্তের নামায ক্বাযা হলে তারতীব ওয়াজিব ও এর শর্ত সমূহ

মাসআলাঃ পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ সমূহ তার সাথে অন্য ফরজ ও বিতরের মধ্যে তরতীব রক্ষা করা জরুরী। প্রথমে ফজর অতঃপর জোহর অতঃপর আছর অতঃপর মাগরিব অতঃপর এশা অতঃপর বিতর পড়বে। উপরোক্ত সবগুলো ক্বাযা হোক বা কিছু ক্বাযা হোক কিছু আদায় হোক। যেমন জোহরের ক্বাযা হল, তখন ফরজ হল প্রথমে জোহর পড়বে তারপর আছর পড়বে অথবা বিতর ক্বাযা হল, তখন বিতর পড়ে ফজর পড়বে। স্মরণ থাকা সত্বেও যদি আছর বা ফজর পড়ে নেয় নাজায়েয হবে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ সময়ের মধ্যে যদি এতটুকু প্রশস্ততা থাকে যেটুকুতে ওয়াক্তিয়া ও ক্বাযা নামায সবগুলো পড়া যাবে, তখন ওয়াজিব ও ক্বাযা নামাযে তারতীব অনুসারে যতটুকু পড়া যায় পড়বে। বাকীটুকুতে তারতীব বাদ পড়বে। যেমন এশা ও বিতরের নামায ক্বাযা হল এবং ফজরের সময়ে পাঁচ রাকাত পড়ার সুযোগ থাকলে তখন বিতর ও ফজর পড়বে আর যদি ছয় রাকাতের সুযোগ থাকে তখন এশা ও ফজর পড়বে। (শরহে বেকায়াহ)

মাসআলাঃ তারতীবের জন্য মুতলাক বা সাধারণ ওয়াক্ত হলেই হয়, মুস্তাহাব সময় হওয়ার প্রয়োজন নেই। যার আছরের নামায ক্বাযা হল এবং সূর্য নীল হওয়ার পূর্বে জোহর সম্পন্ন করা যাবে না। কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে উভয়টি পড়া যাবে, তখন প্রথমে জোহর পড়বে অতঃপর আছর। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সময় যদি সংকীর্ণ হয় যে সংক্ষিপ্তাকারে হলে উভয়টি পড়া যাবে, আর উত্তমরূপে পড়লে উভয় নামায পড়ার সুযোগ না হলে এক্ষেত্রেও তারতীব ফরজ এবং জায়েয পরিমাণ যতটুকু সংক্ষিপ্ত করা যায় করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ওয়াক্তের সংকীর্ণতার কারণে তারতীব সে সময় বাদ পড়বে, যখন শুরু করার সময়ই সময় সংকীর্ণ ছিল। শুরু করার সময় তারতীব রক্ষার সুযোগ ছিল এবং স্মরণে পড়ল এ ওয়াক্তের পূর্বের নামায ক্বাযা হয়েছে তখন নামায দীর্ঘ করায় সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, তখন এ নামায হবে না। তবে ভঙ্গ করে পুনরায় পড়লে হবে। আর যদি ক্বাযা নামাযের কথা স্মরণ ছিল না, ওয়াক্তিয়া নামায দীর্ঘ করেছে যে কারণে সংকীর্ণ হয়ে গেল তখন যদি ক্বাযা নামাযের কথা স্মরণ হয় হয়ে যায়, নামায বন্ধ করবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ধারণা করাটা মূখ্য নয় বরং এটা দেখতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে ওয়াক্ত সংকীর্ণ ছিল কি না! যেমন যে ব্যক্তির এশার নামায ক্বাযা হল, এরপর ফজরের সময় সংকীর্ণ হবে ধারণা করে ফজর পড়ে নিল অতঃপর অবগত হল, সময় সংকীর্ণ ছিল না। ফজর নামায হবে না। এ সময়ে যদি এশা ও ফজর উভয়টি পড়ার সুযোগ থাকে তখন এশার পড়ে তারপর ফজর পড়বে। অন্যথায় ফজর পড়বে। দ্বিতীয়বারও যদি ভুল অবগত হওয়া যায় তখনও একই হুকুম। অর্থাৎ উভয়টি পড়া গেলে উভয়টি পড়বে নতুবা শুধুমাত্র ফজর পড়বে। আর যদি ফজর পুনরায় না পড়ে এশা পড়তে শুরু করল, তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসতে পারেনি এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হল, তখন ফজরের যে নামায পড়েছিল হয়ে গেল। এভাবে যদি ফজরের নামায ক্বাযা হয়ে যায় এবং জোহরের সময়ে উভয় নামাযের সময়ের সুযোগ তার ধারণায় নেই জোহর পড়ে নিল। এরপর জানল, ফজরও পড়ার সুযোগ ছিল, তাহলে জোহর হয়নি, ফজর পড়ার পর জোহর পড়বে। এমনকি ফজর পড়ে যদি জোহরের এক রাকাত পড়া যায় তথাপি ফজর পড়ে জোহর শুরু করবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ জুমার দিবসে ফজর নামায ক্বাযা হল, ফজর পড়ে জুমায় শরীক হওয়া গেলে তখন ফরজ হল প্রথমে ফজর পড়ে নেবে। যদিও খুতবা পাঠ চলতে থাকে। আর যদি জুমা পাওয়া না যায় বরং জোহরের সময় অবশিষ্ট থাকবে তখনও ফজর পড়ে জোহর পড়বে। আর যদি এরূপ হয় যে, ফজর পড়লে জুমা চলে যাবে এবং জুমার সাথে সময় চলে যাবে তখন জুমা পড়ে নেবে তারপর ফজর পড়বে। এক্ষেত্রে তারতীব বাদ যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সময়ের সংকীর্ণতার কারণে তারতীব বাদ পড়লে এবং ওয়াক্তিয়া নামায পড়তেছিল নামায আদায়কালে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল, তখন তারতীব পুনরায় করবে না। অর্থাৎ ওয়াক্তিয়া নামায হয়ে গেল। (আলমগীরি)

কিন্তু ফজর ও জুমাতে সময় চলে যাবার পর এগুলো এমনিতেই হয়নি।

মাসআলাঃ ক্বাযা নামায স্মরণ ছিল না ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে নিল। পড়ার পর স্মরণ হল, ওয়াক্তিয়া হয়ে গেল, পড়ার সময় স্মরণ হলে ওয়াক্তিয়াও হবে না। (ফিকহর কিতাব সমূহ)

মাসআলাঃ নিজকে অজু সম্পন্ন মনে করে জোহর পড়ে নিল, অতঃপর অজু করে

আসর পড়ল , তারপর অবগত হল জোহরে অজু ছিল না। তখন আসরের নামায হয়ে যাবে শুধু জোহর পুনরায় পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ফজরের নামায ক্বাযা হল, স্মরণ থাকা সত্ত্বেও জোহর পড়ে নিল, তারপর ফজর পড়ল, জোহরের নামায হয়নি, আসর পড়ার সময় জোহর স্মরণে আসলে নিজ ধারণায় জোহর জায়েয মনে করেছে আসর হয়ে যাবে।

মূলতঃ তারতীব ফরজ অনবগতির হুকুম ভুলকারী ব্যক্তির অনুরূপ। তার নামায হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ছয় ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে গেল, ছয় ওয়াক্তের সময়ও শেষ হয়ে গেল, তারজন্য তারতীব ফরজ নহে– স্মরণ ও সময়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। সবগুলো এক সাথে ক্বাযা হোক বা পৃথকভাবে। যেমন, একাধারে ছয় ওয়াক্তের নামায পড়েনি, বা পৃথকভাবে ক্বাযা হয়েছে যেমন ছয়দিন ফজর নামায পড়েনি। অবশিষ্ট নামায পড়েছে, কিন্তু বাকী নামায পড়াকালে ক্বাযা নামায ভুলে গিয়েছিল, সবগুলো পুরানো হোক বা কিছু নতুন কিছু পুরাতন যেমন এক মাসের নামায পড়েনি। অতঃপর পড়া শুরু করেছে অতঃপর এক ওয়াক্ত ক্বাযা হয়ে গেল, তারপরের নামায হয়ে যাবে। যদিও ক্বাযা হওয়া স্মরণ থাকে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ছয় ওয়াক্তের নামায ক্বাযা হওয়ার কারণে তারতীব যখন বাদ পড়ে গেল, এর থেকে যদি সামান্য পড়ে নেয়, ছয় থেকে কমে গেল, তখন তারতীবের দিকে ফিরে যাবে না। অর্থাৎ এর মধ্যে যদি দুই ওয়াক্তের বাকী থাকে তখন স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সবগুলো ক্বাযা নামায পড়ে নেয়, তখন তাহলে তারতীব হয়ে গেল। এখন যদি কোন নামায ক্বাযা হয় তখন পূর্বোক্ত শর্তের আলোকে সেগুলো পড়ে ওয়াক্তিয়া নামায পড়বে। অন্যথায় হবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)।

বিঃ দ্রঃ সাহেবে তারতীবঃ যার জিম্মায় ছয় ওয়াক্ত থেকে কম ক্বাযা রয়েছে তাকে সাহেবে তরতীব বলা হয়।

মাসআলাঃ ভুলক্রমে বা সময়ের স্বল্পতার কারণে তারতীব যদি বাদ পড়ে তখন তা পুনরায় ফিরাবে না। যেমন, ভুলক্রমে নামায পড়ে নিল এখন স্মরণ হল, তখন নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যদিও সময়ের মধ্যে অনেক সুযোগ থাকে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্মরণ থাকা ও সময়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায সম্পর্কে যা বলা হয়েছে যে, নামায হবে না। এর অর্থ হল এই যে, ঐ নামায স্থগিত রাখবে। যদি ওয়াক্তিয়া পড়তে থাকে ক্বাযা বাদ রাখে উভয়টি মিলে যখন ছয় ওয়াক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ছয়টির সময় শেষ হয়ে যায়, তখন সবগুলো সহীহ হবে। যদি এর মাঝখানে ক্বাযা পড়ে সবগুলো নফল হয়ে যাবে। সবগুলো পুনরায় পড়বে। (দুররুল মোখতার)

ক্বাযার বিভিন্ন মাসাঈল

মাসআলাঃ কোন নামায পড়ার সময় ক্বাযা স্মরণ থাকে এবং কোন সময় স্মরণ থাকে না, যেসব নামাযে ক্বাযা স্মরণ থাকে এর মধ্যে যদি পাঁচ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ ক্বাযা সহ যদি ছয় ওয়াক্ত হয়ে যায়– সবগুলো শুদ্ধ হবে। আর যেসব নামায আদায়ের সময় ক্বাযার স্মরণ থাকে না তা পরিগণিত হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্ত্রী লোকের এক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হল, এরপর ঋতুস্রাব হল। ঋতুস্রাব হতে পবিত্র হয়ে প্রথমে ক্বাযা পড়ে নেবে তারপর ওয়াক্তি নামায পড়ে নেবে। ক্বাযা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে নিলে হবে না। যদি সময়ের মধ্যে সুযোগ থাকে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যার দায়িত্বে ক্বাযা নামায আছে, যদিও দ্রুততার সাথে তা পড়া ওয়াজিব। কিন্তু সন্তান-সন্ততি ভরণ-পোষণ এবং স্বীয় প্রয়োজনীয়তা ও ব্যস্ততার কারণে বিলম্ব করা জায়েয। কারবারও করবে যে সময় সুযোগ মিলবে সে সময়ে ক্বাযা নামাযও পড়তে থাকবে শেষ পর্যন্ত যেন পূর্ণ হয়ে যায়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্বাযা নামায নফল থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যে সময় নফল পড়বে তা ছেড়ে এর পরিবর্তে ক্বাযা নামায পড়বে। যেমন দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায়। অবশ্য তারাবীহ এবং বারো রাকাত সুন্নতে মোআক্কাদাহ পরিত্যাগ করবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মান্নতের নামাযে যদি কোন নির্দিষ্ট সময় বা দিনের শর্ত যুক্ত করা হয়, তখন ঐ নির্দিষ্ট সময় বা দিনে পড়া ওয়াজিব। নতুবা ক্বাযা হয়ে যাবে। সময় ও দিন যদি নির্দিষ্ট না থাকে তখন যে কোন সময় পড়ার সুযোগ থাকবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হয়ে গেল তবে কোন ওয়াক্তের নামায তা স্মরণ নেই, তখন এক দিনের নামায পড়ে দিবে। যদি দু'ওয়াক্তের নামায

দু'দিনে ক্বাযা হয় তখন দুই দিনের সবগুলো নামায পড়ে নিবে। এভাবে তিন দিনের তিন নামায এবং পাঁচ দিনের পাঁচ নামায পড়ে নিবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ এক দিনের আছর এক দিনের জোহর ক্বাজা হয়ে গেল, তবে প্রথমে কোন নামায ক্বাযা হল, তা স্মরণ নেই, এমতাবস্থায় অন্তর যেদিকে দৃঢ় হবে সেটা প্রথমে স্থির করবে। কোন দিকে অন্তর দৃঢ় না হলে যেটা ইচ্ছে প্রথমে পড়বে। কিন্তু দ্বিতীয়টি পড়ার পর যা প্রথমে পড়েছে তা পুনরায় পড়বে। তবে উত্তম হলো প্রথমে জোহর পড়বে তারপর আছর তারপর জোহর পুনরায় পড়বে। যদি প্রথমে আছর পড়া হয় তারপর জোহর পুনরায় আছর পড়ল এতে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আছরের নামায পড়াকালে স্মরণ হল, নামাযের একটি সিজদা রয়ে গেল, তবে স্মরণ নেই কি আসরের নামাযের নাকি জোহরের তখন অন্তর যেদিকে স্থির হয় তার উপর আমল করবে। আর যদি কোন দিকে স্থির না হয়, তখন আসর পূর্ণ করে শেষে একটি সিজদা করবে। তারপর জোহর পুনরায় পড়বে, তারপর আসর। পুনরায় না পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

নামাযের ফিদ্য়া সম্পর্কে মাসাঈল ও ওমরী ক্বাযার বর্ণনা

মাসআলাঃ যে ব্যক্তির নামায ক্বাযা হয়ে গেল এবং মৃত্যুবরণ করল তখন অছিয়ত করে থাকলে এবং সম্পদ রেখে গেলে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা প্রত্যেক ফরজ ও বিতরের পরিবর্তে অর্ধ সা' গম (পৌনে ২ কেজি) অথবা এক সা' যব (সাড়ে তিন কেজি) সাদকা করবে। সম্পদ রেখে না গেলে উত্তরাধিকারগণ ফিদয়া দিতে চাইলে তখন নিজ থেকে কিছু মাল দ্বারা বা কর্জ নিয়ে মিসকীনকে সাদকা করে তার মালিকানায় দিবে এবং মিসকীন নিজ পক্ষ থেকে তা দান করবে এবং সে তা গ্রহণও করবে। তারপর মিসকীনকে দিবে। এভাবে দেওয়া নেওয়া করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সব ফিদয়া যেন আদায় হয়ে যায়। আর যদি সম্পদ রেখে যায় তবে তা যথেষ্ট নয় তখনও এরূপ করবে। আর যদি অছিয়ত না করে অভিভাবক নিজ পক্ষ থেকে অনুগ্রহ পূর্বক ফিদ্য়া দিতে চায়, দেবে। মালের এক তৃতীয়াংশে যথেষ্ট তবে অছিয়ত করেছে সে, এর থেকে অল্প নিয়ে দেওয়া নেওয়া করে ফিদ্য়া যেন পূর্ণ করা হয়। আর বাকীগুলো যদি ওয়ারিশ বা অন্যকেউ নিয়ে ফেলে তখন গুনাহগার হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি অলীকে তার পরিবর্তে নামায পড়ার অছিয়ত করেছে, অলী

তা পড়েছে ইহা যথেষ্ট নয়। এভাবে রুগ্ন অবস্থায় নামাযের ফিদ্য়া দিলে আদায় হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন কোন অনবগত ব্যক্তি এভাবে ফিদ্য়া দিয়ে থাকে যে, নামাযের ফিদ্য়ার হাদিয়া নির্ধারণ করে সবগুলোর বিনিময়ে কুরআন মজীদ প্রদান করে থাকে এভাবে সম্পূর্ণ ফিদ্য়া আদায় হবে না। এটা নিছক ভিত্তিহীন কথা, বরং কুরআন মজীদের হাদিয়া যতটুকু ততটুকু ফিদ্য়া আদায় হবে।

মাসআলাঃ শাফেয়ী মতাবলম্বীর নামায ক্বাযা হল, এরপর হানফী মতাবলম্বী হল, তখন হানফী মজহাব অনুসারে ক্বাযা পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যার নামাযে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মাকরূহ হয়, সে যদি সারা জীবনের নামায পুনরায় পড়ে তো ভাল। আর যদি কোন ত্রুটি হয় চইলে না পড়বে, পড়লে ফজর ও আসরের পরে পড়বে না। সব রাকাত পরিপূর্ণ পড়বে। বিতরের মধ্যে কুনুত পড়ে তৃতীয় রাকাতের পর বৈঠক করবে অতঃপর আরো এক রাকাত মিলাবে চার হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ওমরী ক্বাযা ব্যক্তি শবে কদর অথবা রমজানের আখেরী জুমা জামাত সহকারে পড়ে এবং মনে করবে জীবনের ক্বাযা নামায ঐ এক নামায দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। এটা নিছক বাতিল ধারণা।

সাহু সিজদার বর্ণনা

হাদীসে আছে একবার হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত পড়ে দাড়িয়ে গেলেন, বসলেন না, অতঃপর সালাম ফিরায়ে সাহু সিজদা করলেন এ হাদীসটি হযরত মুগিরা বিন শো'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এ হাদীসটি সহীহ-হাসান।

মাসআলাঃ ওয়াজিব নামাযের মধ্যে যখন ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে সাহু সিজদা ওয়াজিব। এর নিয়ম হলো, আত্তাহিয়্যাতু পাঠের পর ডান দিকে সালাম ফিরাবে দু'টি সিজদা করবে তারপর তাশাহুদ ইত্যাদি পাঠ করে সালাম ফিরাবে। (ফিকহার কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ সালাম ফিরানো ব্যতীত যদি সাহু সিজদা করে নেয়, তা আদায় হবে, কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ তানযিহী। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব পরিত্যাগ করল সাহ্ সিজদা দ্বারা এ ক্ষতি দূরীভূত হবে না বরং নামায পুনরায় পড়তে হবে। এভাবে যদি ভুলক্রমে ওয়াজিব বর্জন হলে সাহ্ সিজদা করেনি তখনও এয়েদা বা পুনরায় পড়া ওয়াজিব। (দুর্‌রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ এমন কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া হল, যা নামাযের ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং বাহ্যিক কারণে তা ওয়াজিব হয়েছে তখন সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে না। যেমন তারতীবের খেলাপ কুরআন শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব বর্জনের শামিল। কিন্তু তারতীব অনুযায়ী পড়া ওয়াজিব তেলাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত নামাযের ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নহে, বিধায় এতে সাহ্ সিজদা নেই। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফরজ বর্জন হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, সাহ্ সিজদার দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হয় না বিধায় পুনরায় পড়তে হবে। সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ যেমন আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, ছানা, আমীন, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার তাকবীর ও তাসবীহ্ সমূহ বর্জন করলেও সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে না। বরং নামায হবে। (রদ্দুল মোখতার, গুণীয়া) কিন্তু পুনরায় পড়া মুস্তাহাব, ভুলক্রমে বর্জন হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে।

মাসআলাঃ সাহ্ সিজদা তখন ওয়াজিব হবে, যদি সময়ের মধ্যে সুযোগ থাকে। আর যদি সুযোগ না থাকে যেমন ফজর নামাযে সাহ্ হল, প্রথমে সালাম ফিরাল, সিজদা এখনো করেনি, এদিকে সূর্য উঠে গেল, তখন সাহ্ সিজদা রহিত হয়ে যাবে। এভাবে ক্বাযা নামায পড়তেছিল সিজদার পূর্বে সূর্যের কিরণ নীল হয়ে গেল, সাহ্ সিজদা রহিত হবে। জুমা বা ঈদের সময় চলে যাচ্ছে, তখনও একই হুকুম (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যেসব জিনিষ নামায ভিত্তির অন্তরায় যেমন কথা-বার্তা ইত্যাদি নামায ভিত্তির অন্তরায় এমন সব বিষয় যদি সালামের পর পাওয়া যায় তখন সাহ্ সিজদা দিতে হবে না। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সাহ্ সিজদা বাদ যাওয়াটা যদি নিজের কর্মের কারণে হয়, তখন নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। অন্যথায় নয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফরজ ও নফল উভয়টির একই হুকুম অর্থাৎ নফল সমূহের ক্ষেত্রেও ওয়াজিব বর্জন হলে সাহ্ সিজদা ওয়াজিব। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নফলের দু'রাকাত পড়ল, এতে ভুল হয়ে গেল, অতঃপর এর উপর ভিত্তি করে আবারও পড়বে তখন সাহ্ সিজদা করবে। ফরজের মধ্যে সাহ্ হল, এর উপর ইচ্ছাকৃতভাবে নফলের ভিত্তি করল, তখন সাহ্ সিজদা নেই। বরং ফরজ পুনরায় পড়বে। আর যদি ফরজের সাথে ভুলবশতঃ নফল মিলায়ে ফেলে যেমন চার রাকাতের বৈঠক করে দাঁড়িয়ে গেল পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নিল। তখন আর এক রাকাত মিলাবে এ দু'রাকাত নফল হয়ে যাবে এবং এতে সাহ্ সিজদা করবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সাহ্ সিজদার পরও আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব। আত্তাহিয়্যাতু পাঠ শেষে সালাম ফিরাবে। উত্তম হলো– উভয় বৈঠকে দরুদ শরীফও পাঠ করবে। (আলমগীরি) এটাও এখ্‌তিয়ার রয়েছে যে, প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু ও দরুদ শরীফ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় বৈঠকে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে।

মাসয়ালাঃ সাহ্ সিজদা দ্বারা উপরোক্ত প্রথম বৈঠক বাতিল হয়নি। কিন্তু পুনরায় বৈঠক বসা ওয়াজিব। নামাযের কোন সিজদা বাদ পড়ে গেল, বৈঠকের পর তা আদায় করল, অথবা তেলাওয়াতে সিজদা করল, তখন উক্ত বৈঠক বাতিল হবে পুনরায় বৈঠক করা ফরজ কওদা বা বৈঠক ব্যতীত নামায শেষ করলে হবে না। প্রথম অবস্থায় হবে। কিন্তু পুনরায় পড়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ এক নামাযে কয়েকটি ওয়াজিব বর্জন হলে, দু'টি সিজদাই সবগুলোর জন্য যথেষ্ট। (রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

নামাযের ওয়াজিব সমূহের বিস্তারিত বিবরণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আহকামের বিশ্লেষণের জন্য পুনরায় ব্যক্ত করা উত্তম হবে। ওয়াজিব পরে আদায় করা, রুকন আগে আদায় করা বা পরে আদায় করা অথবা তা বারবার আদায় করা অথবা ওয়াজিবের মধ্যে পরিবর্তন করা এসবগুলো ওয়াজিব বর্জনের শামিল।

মাসআলাঃ ফরজের প্রথম দু'রাকাতে এবং নফল ও বিতরের যে কোন রাকাতে সূরা ফাতেহার এক আয়াত বাদ পড়ে গেল, অথবা সূরার পূর্বে দু'বার আলহামদু পড়েছে অথবা সূরা মিলানো ভুলে গেল। অথবা ফাতেহার পূর্বে সূরা পড়ে নিল। অথবা আলহামদুর পর একটি বা দুইটি ছোট আয়াত পাঠ করে রুকুতে চলে গেল তারপর স্মরণ হল এবং ফিরে আসল, তিন আয়াত পড়ে রুকু করল, উপরোক্ত সব অবস্থায় সাহ্ সিজদা ওয়াজিব। (দুর্‌রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ আলহামদুর পর সূরা পড়ল, এরপর আবার আলহামদু পড়ল, তখন সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। এভাবে ফরজের পিছনের রাকাত সমূহে ফাতেহা দু'বার পড়ার দরুন সাহু সিজদা ওয়াজিব নহে। প্রথম রাকাতে আলহামদুর বেশীরভাগ পড়ে নিল, পুনরায় দোহরায়ে পড়ল তখন সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আলহামদু পাঠ ভুলে গেল। সূরা শুরু করে দিল, এক আয়াত পরিমাণ পড়ে নিল এখন স্মরণ হল, তখন আলহামদু পড়ে সূরা পড়বে এবং সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। এভাবে সূরা পড়ার পর বা রুকুতে অথবা রুকু হতে দাড়াবার পর স্মরণ হল, তখন আবার সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য সূরা পড়বে এবং রুকু দোহরাবে ও সাহু সিজদা করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ফরজের পিছনের রাকাত সমূহে সূরা মিলালে সাহু সিজদা দিতে হবে না। ইচ্ছাকৃত মিলালেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ইমামের উচিত নয়। এভাবে যদি পিছনের রাকাতে আলহামদু না পড়ে তখন সাহু সিজদা নেই আর যদি রুকু, সিজদা এবং বৈঠকে কুরআন পাঠ করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আয়াতে সিজদা পাঠ করল, সিজদা করা ভুলে গেল তখন তেলাওয়াতে সিজদা আদায় করবে ও সাহু সিজদা করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে কাজ নামাযে বারবার হয় তার মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব বিধায় তারতীবের খেলাপ কোন কাজ পাওয়া গেলে তখন সাহু সিজদা করবে। যেমন কেরাতের পূর্বে রুকু করে নিল। রুকুর পর কেরাত করল না, তখন নামায ফাসেদ হবে। যেহেতু ফরজ বর্জন হয়েছে আর যদি রুকুর পর কেরাত করে পুনরায় রুকু করেনি, তখন ফাসেদ হবে। যেহেতু কেরাতের কারণে রুকু ভঙ্গ হয় আর যদি ফরজ পরিমাণ কেরাত পাঠ করে রুকু করে কিন্তু ওয়াজিব কেরাত আদায় করেনি, যেমন আলহামদু পড়েনি অথবা সূরা মিলানো হয়নি, তখন হুকুম হলো পুনরায় পাঠ করবে। আলহামদু ও সূরা পাঠ করে রুকু করবে এবং সাহু সিজদা করবে। দ্বিতীয়বার রুকু না করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেহেতু প্রথম রুকু ভঙ্গ হয়ে গেছে (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন রাকাতের কোন সিজদা রয়ে গেল, শেষে স্মরণ হল, তখন সিজদা করে নেবে, অতঃপর আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে সাহু সিজদা করবে। সিজদার পূর্বে নামাযের যেসব কাজ আদায় করেছে তা বাতিল হবে না, তবে বৈঠকের পর নামায

সম্পন্ন সিজদা করলে তাহলে শুধুমাত্র উক্ত বৈঠক বাতিল হবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ তা'দীল আরকান বা স্থিরভাবে রুকন আদায় করা ভুলে গেল, সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ফরজের মধ্যে প্রথম বৈঠক ভুলে গেল যতক্ষণ না সোজা হয়ে দাড়াবে ফিরে যাবে এবং সাহু সিজদা করতে হবে না। বিশুদ্ধ মজহাব মতে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু গুনাহগার হবে। সুতরাং বিধান হলো যদি ফিরে যায় তাহলে দ্রুত দাড়িয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার, গুনীয়া)

মাসআলাঃ মুক্তাদি যদি ভুলবশতঃ দাঁড়িয়ে যায় ফিরে যাওয়াটা জরুরী যেন ইমামের বিরোধীতা না হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ শেষ বৈঠক ভুলে গেল। যতক্ষণ না উক্ত রাকাতের সিজদা করে ফিরে যাবে এবং সাহু সিজদা করবে। শেষ বৈঠকে বসেছে তবে তাশাহুদ পরিমাণ বসেনি। দাড়িয়ে গেছে তখন ফিরে যাবে এবং প্রথমে যে দেরীক্ষণ বসেছিল তা গণনা হবে। অর্থাৎ বৈঠকে ফিরে যাবার পর যতটুকু দেরীক্ষণ বসেছিল এটি এবং প্রথম বৈঠক দু'টি মিলে যদি তাশাহুদ পরিমাণ হয়ে যায় ফরজ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সাহু সিজদা এ অবস্থায়ও ওয়াজিব হবে। উক্ত রাকাতের সিজদা করে নিলে, সিজদা হতে মস্তক উত্তোলন মাত্রই উক্ত ফরজ নফলে পরিণত হল বিধায় ইচ্ছে করলে মাগরিব ব্যতীত অপরাপর নামাযে আরও এক রাকাত মিলাবে যেন জোড় রাকাত হয়ে যায় বিজোড় রাকাত যেন না থাকে। যদিও তা ফজর কিংবা আসর হয়। মাগরিবে আর মিলাবে না চার পূর্ণ হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নফলের প্রতিটি বৈঠক অথবা আখেরী বৈঠক ফরজ। যদি বৈঠক না করে এবং ভুলবশতঃ দাঁড়িয়ে যায় যতক্ষণ উক্ত রাকাতের সিজদা না করবে, ফিরে যাবে এবং সাহু সিজদা করবে। ওয়াজিব নামায যেমন বিতর– ফরজের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বিধায় বিতরের প্রথম বৈঠক ভুলে গেলে ঠিক সে হুকুম যে হুকুম ফরজের প্রথম বৈঠক ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ তাশাহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক করেছে এবং দাড়িয়ে গেছে। যতক্ষণ না উক্ত রাকাতের সিজদা করবে বৈঠকের দিকে ফিরে যাবে এবং সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাবে। দাড়ানো অবস্থায় সালাম ফিরালেও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু সুন্নত

বর্জন হবে। এমতাবস্থায় যদি ইমাম দাড়িয়ে যায় মুক্তাদি তার সাথে যাবে না, বরং বসে অপেক্ষা করবে। যখন ফিরে আসবে সাথে হয়ে যাবে। ফিরে আসেনি সালাম ও সিজদা করে নিল, তখন মুক্তাদি সালাম ফিরাবে, ইমাম আরো এক রাকাত মিলাবে দু'রাকাত নফল হয়ে যাবে। সাহ্ সিজদার করে সালাম ফিরাবে এবং এ দু' রাকাত জোহরের সুন্নত বা এশার সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হবে না। উক্ত দুই রাকাতে কেউ ইমামের সাথে এক্তেদা করল, অথবা এখন শামিল হল এবং মুক্তাদিও ছয় রাকাত পড়বে আর যদি সে ভেঙ্গে ফেলে তখন দু'রাকাত ক্বাযা পড়বে। ইমাম চতুর্থ রাকাতে বসেনি তখন মুক্তাদি ছয় রাকাতের ক্বাযা পড়বে। ইমাম যদি উক্ত রাকাত সমূহ ভঙ্গ করে দেয়, তখন তার উপর ক্বাযা দিতে হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ চতুর্থ রাকাতে বৈঠক করে দাঁড়িয়ে গেল, কোন ফরজ আদায়কারী তার এক্তেদা করল, এক্তেদা শুদ্ধ হবে না, যদিও ফিরে যায়। বৈঠক করেনি, যতক্ষণ না পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে এক্তেদা করা যাবে, যেহেতু এখনো ফরজের মধ্যে আছে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ দু'রাকাতের নিয়ত ছিল, তাতে ভুল করল, দ্বিতীয় বৈঠকে সাহ্ সিজদা করল, তারজন্য নফলের ভিত্তি মাকরূহ তাহরীমি। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির সাহ্ সিজদা কায়েমের নিয়ত করেছে তখন চার রাকাত পড়া ফরজ। শেষে সাহ্ সিজদা দোহরাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রথম বৈঠকে তাশাহুহুদের পর এতটুকু পড়েছে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আ'লা মুহাম্মাদিন' তখন সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। দরুদ শরীফ পড়ার কারণে নয় বরং তৃতীয় রাকাতের দাড়ানোতে বিলম্ব হওয়ার কারণে। এতটুকু পরিমাণ বিলম্ব করে নিরব থাকলেও সাহ্ সিজদা ওয়াজিব। যেমন, কাওদা বা বৈঠকে, রুকুতে, সিজদাতে কুরআন শরীফ পড়ার দরুনও সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। অথচ তা আল্লাহর বাণী। ইমাম আজম রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন, হুজুর এরশাদ করলেন, দরুদ পাঠকারীর উপর তুমি কেন সিজদা ওয়াজিব করেছ? আরজ করলেন এজন্য করেছি যেহেতু সে ভুলে পাঠ করেছে, হুজুর তাঁর উত্তর যথাযথ মনে করলেন। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন বৈঠকে তাশাহুহুদ সামান্য রয়ে গেল, সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। নফল নামায হোক বা ফরজ হোক। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ প্রথম দু'রাকাতের দাঁড়ানো অবস্থায় আলহামদুর পর তাশাহুহুদ পড়ল, সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। আলহামদুর পূর্বে পড়লে হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পিছনের রাকাতের কেয়ামে বা দাঁড়ানোতে তাশাহুহুদ পড়ল, সিজদা ওয়াজিব হবে না। যদি প্রথম বৈঠকে কয়েকবার তাশাহুহুদ পড়ে তখন সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রুকুর স্থানে সিজদা করল অথবা সিজদার স্থানে রুকু করল, অথবা এমন কোন রুকনকে দু'বার আদায় করল, যা বারবার করা নামাযে শরীয়ত সম্মত নয়, অথবা কোন বিধান বা রুকনকে আগে আদায় করল, বা আগেরটি পরে করল, এসব অবস্থায় সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কুনুত অথবা তাকবীরে কুনুত অর্থাৎ কেরাতের পর কুনুতের জন্য যে তাকবীর বলা হয় তা ভুলে গেল তাতে সাহ্ সিজদা করবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ দুই ঈদের সব তাকবীর অথবা কয়েকটি ভুলে গেল, বা বেশী বলল, অথবা যথাযথ স্থানে বলেনি এসব অবস্থায় সাহ্ সিজদা ওয়াজিব। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমাম দু'ঈদের তাকবীর সমূহ ভুলে গেল রুকুতে চলে গেল, তখন তাকবীরে ফিরে যাবে। মাসবুক মুক্তাদি যদি রুকুতে শামিল হয় তখন রুকুতেই তাকবীর সমূহ বলবে, (আলমগীরি) দু'ঈদে দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তাকবীর ভুলে গেল,তখন সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। প্রথম রাকাতের রুকুর তাকবীর ভুলে গেলে সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ জুমা ও দু'ঈদের নামাযে সাহ্ হলে জামাত যদি বড় হয়, সাহ্ সিজদা না করা উত্তম। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম প্রকাশ্য নামাযে, নামায জায়েয হওয়া পরিমাণ এক আয়াত নিশ্চুপভাবে পড়েছে। অপ্রকাশ্য নামাযে প্রকাশ্যভাবে কেরাত পড়েছে তখন সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। এক শব্দ যত ধীরে বা প্রকাশ্যে পড়লে তা ক্ষমাযোগ্য। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার, গুনীয়া)

মাসআলাঃ একাকী নামায আদায়কারী অপ্রকাশ্য ক্বেরাত বিশিষ্ট নামাযে প্রকাশ্যে

পড়েছে তখন সাহ্ সিজদা ওয়াজিব। প্রকাশ্যের স্থলে ধীরে পড়লে ওয়াজিব নহে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ছানা, দুআ ও তাশাহ্হুদ উচ্চ আওয়াজে পড়লে, সুন্নতের খেলাফ হবে। কিন্তু সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্বেরাত ইত্যাদি কোন স্থানে চিন্তা করতে ছিল এক রুকন পরিমাণ অর্থাৎ ছুবহানাল্লাহ্ বলা পরিমাণ সময় বিরতি হল, সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমামের ভুল হল সাহ্ সিজদা করল, মুক্তাদির উপরও সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হবে। মুক্তাদি সাহ্ হওয়ার পর জামাতে শামিল হলে ইমামের সিজদা বাদ পড়লে মুক্তাদির থেকেও বাদ যাবে অতঃপর ইমাম থেকে বাদ যাওয়াটা তার কোন কাজের কারণে হলে তখন মুক্তদির উপরও নামায দোহ্রায়ে পড়া ওয়াজিব। অন্যথায় ক্ষমাযোগ্য। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুক্তাদি হতে এক্তেদা অবস্থায় সাহ্ হলে সিজদা ওয়াজিব হবে না। (সাধারণ কিতাব সমূহ)

মাসআলাঃ মসবুক মুক্তাদি ইমামের সাথে সাহ্ সিজদা করবে। যদি তার শামিল হওয়ার পূর্বে সাহ্ হয়, ইমামের সাথে সিজদা না করে অবশিষ্ট নামায পড়ার জন্য যদি দাঁড়িয়ে যায় তখন শেষে সাহ্ সিজদা করবে এবং উক্ত মসবুক মুক্তাদির যদি নিজের নামাযেও সাহ্ হয়ে থাকলে শেষের এ সিজদার দ্বারা যথেষ্ট আর ইমামের জন্যও একই সিজদা যথেষ্ট। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মসবুক মুক্তাদি স্বীয় নামায রক্ষার জন্য ইমামের সাথে সাহ্ সিজদা করেনি, মনে করেছে সিজদা করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে যেমন ফজরের নামাযে সূর্য উঠে যাবে, অথবা জুমার সময় আসর হয়ে যাবে, অথবা অপারগ এবং সময় শেষ হয়ে যাবে অথবা মোজার উপর মুছেহ এর সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যাবে এসব অবস্থায় ইমামের সাথে সিজদা না করলে মাকরূহ হবে না বরং তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর দাঁড়িয়ে যাবে। (গুনীয়া)

মাসয়ালাঃ মসবুক মুক্তাদি ইমামের সাহুর সাথে সাহ্ সিজদা করেছে, অতঃপর যখন নিজে পড়তে দাঁড়াল সেখানেও সাহ্ করল, এর মধ্যেও সাহ্ সিজদা দিতে

হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ মসবুক ইমামের সাথে সালাম ফিরানো জায়েয নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে ফিরালে নামায ভঙ্গ হবে। ভুলবশতঃ হলে এবং সালাম ইমামের সাথে বিরতিহীন ছিল, তখন এর জন্য সাহ্ সিজদা নেই। আর যদি সালাম ইমামের কিছুক্ষণ পর ফিরালে তখন দাঁড়িয়ে যাবে স্বীয় নামায পূর্ণ করে সাহ্ সিজদা করবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমামের এক সিজদা করার পর নামাযে শামিল হলে, তখন দ্বিতীয় সিজদা ইমামের সাথে করবে, প্রথমটির জন্য ক্বাযা নেই। উভয় সিজদার পর শামিল হলে নিজ জিম্মায় ইমামের সাহ্ সিজদা আদায় করবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ইমাম সালাম ফিরাল, মসবুক স্বীয় নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়াল তখন ইমাম সাহ্ সিজদা করে তখন সে ফিরে যাবে এবং ইমামের সাথে সিজদা করবে। ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন সে নিজে স্বীয় বাকী নামায পড়বে, প্রথমে যে কেয়াম, রুকু, ক্বেরাত করেছিল তা গণ্য হবে না। বরং পুনরায় ওসব কাজ আবার করবে। পুনরায় না দোহ্রালে এবং নিজে পড়ে নিলে শেষে সাহ্ সিজদা করবে। উক্ত রাকাতের সিজদা করে থাকলে দোহ্রাবে না। দোহ্রালে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমামের সাহুর কারণে লাহেক মুক্তাদির উপরও সাহ্ সিজদা ওয়াজিব। কিন্তু লাহেক তার নামায শেষে সাহ্ সিজদা করবে, ইমামের সাথে সিজদা করলে শেষে পুনরায় করবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ তিন রাকাতে যদি মসবুক হয়, এক রাকাতে লাহেক হয় তখন ক্বেরাত বিহীন এক রাকাত পড়ে বসবে এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সাহ্ সিজদা করবে। তারপর এক রাকাত ক্বেরাতসহ্ পড়ে বসবে। এটা তার জন্য দ্বিতীয় রাকাত তারপর এক রাকাত ক্বেরাত সহ্ এক রাকাত ক্বেরাত ছাড়া পড়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি এক রাকাতে মসবুক হয়, তিন রাকাতে লাহেক হয় তখন তিন রাকাত পড়ে সাহ্ সিজদা করবে। অতঃপর ক্বেরাত সহ্ এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে। (রদ্দুল মোখতার)

বিঃ দ্রঃ লাহেক মুক্তাদির সংজ্ঞাঃ লাহেক বলা হয় যে ইমামের সাথে প্রথম রাকাতে এক্তেদা করল এক্তেদার পর তার সম্পূর্ণ রাকাত বা কয়েক রাকাত বাদ পড়ল, তাকে লাহেক বলে।

মাসআলাঃ মুকীম মুসাফিরের পিছনে এক্তেদা করল, ইমামের সাহ্ হলে ইমামের সাথে সাহ্ সিজদা করবে। তারপর নিজে দু'রাকাত পড়ে নেবে নিজের দু'রাকাতেও সাহ্ হলে শেষে সাহ্ সিজদা করবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সালাতুল খওফ অর্থাৎ ভয়কালীন নামাযে যদি ইমামের সাহ্ হয়, (সালাতুল খাওফের বর্ণনা ও পদ্ধতি ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করা হবে) তখন ইমামের সাথে দ্বিতীয় দল সাহ্ সিজদা করবে, প্রথম দল যখন নিজেদের নামায শেষ করবে তখন করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমামের হাদস হল এদিকে নামাযে সাহ্ও হল, ইমাম খলিফা নিযুক্ত করেছে খলিফারও খেলাফত অবস্থায় সাহ্ হল, তখন উক্ত সিজদাই যথেষ্ট হবে। আর যদি ইমাম থেকে সাহ্ হল না, কিন্তু খলিফা থেকে এ অবস্থায় সাহ্ হল, তখন ইমামের উপরও সাহ্ সিজদা ওয়াজিব। খলিফার সাহ্ যদি নিযুক্তির পূর্বে হয় সিজদা ওয়াজিব নহে। তার উপরও নয় ইমামের উপরও নয়। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যার উপর সাহ্ সিজদা ওয়াজিব হল, সাহ্ হওয়াটা যদি স্মরণ না থাকে নামায শেষে করার নিয়তে সালাম ফিরাল তবে এখনো নামায হতে বের হয়নি এ শর্তে সিজদা করবে বিধায় যতক্ষণ না কথাবার্তা অথবা ইচ্ছাকৃত হাদছ অথবা মসজিদ থেকে বের হওয়া অথবা নামাযের অন্তরায় এমন কোন কাজ করে একই হুকুম অর্থাৎ সিজদা করবে, সালামের পর যদি সাহ্ সিজদা না করে থাকলে সালাম ফিরানোর সময় থেকে নামায থেকে বের হয়ে গেল। সুতরাং সালাম ফিরানোর পর যদি কেউ এক্তেদা করে ইমাম সাহ্ সিজদা করে নিল, তখন এক্তেদা শুদ্ধ হবে। সিজদা না করলে শুদ্ধ হবে না। আর যদি স্মরণ থাকে যে সাহ্ হয়েছে নামায শেষ করার নিয়তে সালাম ফিরায়ে নিল, সালাম ফিরা মাত্রই নামায হতে বের হয়ে গেল, তখন সাহ্ সিজদা করা যাবে না। বরং নামায দোহরায়ে পড়বে। ভুলবশতঃ সিজদা করে থাকলে এতে যদি কেউ শামিল হয় এক্তেদা সহীহ্ হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ তেলাওয়াতে সিজদা বাদ পড়ল অথবা শেষ বৈঠকে তাশাহুহুদ পড়েনি কিন্তু তাশাহুহুদ পরিমাণ সময় বসেছিল এবং তেলাওয়াতে সিজদা ও তাশাহুহুদ বাদ পড়ার কথা স্মরণ আছে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরাল, তখন সিজদা রহিত হবে। নামায থেকে বের হয়ে গেলে নামায ফাসেদ হয়নি। যেহেতু সবগুলো রুকন

আদায় করা হয়েছে। কিন্তু ওয়াজিব বর্জন করার কারণে মাকরূহ তাহ্রীমি হবে। এভাবে উভয়টি স্মরণ আছে অথবা শুধুমাত্র তেলাওয়াতে সিজদার কথা স্মরণ আছে, তথাপি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরাল তখন উভয়টি রহিত হবে। যদি নামাযের সিজদা ও সাহ্ সিজদা বাদ রয়ে গেল, নামাযের সিজদা স্মরণ হওয়া মাত্রই সালাম ফিরাল তখন নামায ফাসেদ হয়ে যাবে আর যদি নামাযের সিজদা ও তেলাওয়াতের সিজদা বাকী থাকে এবং সালাম ফিরানোর সময় উভয়টি স্মরণ আছে অথবা একটি স্মরণ আছে তখনও নামায ফাসেদ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নামাযের সিজদা বা তিলাওয়াতের সিজদা বাকী ছিল অথবা সাহ্ সিজদা করার ছিল, ভুলক্রমে সালাম ফিরায়ে নিল যতক্ষণ না মসজিদ থেকে বের হবে সিজদা করে নেবে। ময়দানে থাকলে যতক্ষণ না সারি অতিক্রম করবে অথবা সিজদার স্থান অতিক্রম করেনি তাহলে সিজদা করে নেবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ রুকুতে স্মরণ হল যে, নামাযের কোন সিজদা বাদ রয়ে গেল, সেখান থেকেই সিজদায় চলে গেল, অথবা সিজদায় স্মরণ হল এবং মাথা তুলে সিজদা করে নিল, তখন উত্তম হলো যে, রুকু সিজদা পুনরায় করবে এবং সাহ্ সিজদা করবে। আর যদি সে সময় না করে বরং নামাযের শেষে করে তখন তার রুকু সিজদা পুনরায় করবে না, সাহ্ সিজদা করতে হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ জোহরের নামায পড়তেছিল, চার রাকাত পূর্ণ হয়েছে মনে করে দু'রাকাতে সালাম ফিরায়ে নিল, তখন চার রাকাত পূর্ণ করে নেবে এবং সাহ্ সিজদা করবে। আর যদি ধারণা করে যে, আমার উপর দু'রাকাতই আছে যেমন নিজকে মুসাফির মনে করছে অথবা জুমার নামায ধারণা করেছে, অথবা নও মুসলিম মনে করেছে যে, দু'রাকাতই জোহরের ফরজ অথবা এশার নামাযকে তারাবীহ্ ধারণা করেছে তখন নামায ভঙ্গ হবে। এভাবে যদি কোন রুকন বাদ যায় স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও সালাম ফিরালে নামায ভঙ্গ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যার রাকাত গণনায় সন্দেহ্ হয় যেমন তিন রাকাত হয়েছে না চার রাকাত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এটাই প্রথম ঘটনা, তখন সালাম ফিরায়ে বা নামায ভঙ্গকারী কোন কাজ করে নামায ভেঙ্গে ফেলবে। অথবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নামায পড়ে নেবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় উক্ত নামায শুরু থেকে পড়ে নিতে

হবে। নিছক ভঙ্গ করার নিয়তই যথেষ্ট নয়। যদি এমন হয় যে, এরূপ সন্দেহ প্রথমবার নয় বরং ইতিপূর্বেও হয়েছে, এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা যেদিকে হয় তার উপর আমল হবে। নতুবা রাকাত কম হওয়ার দিকটি গ্রহণ করবে অর্থাৎ তিন ও চার এর মধ্যে যদি সন্দেহ হয়, তখন তিন রাকাত স্থির করবে। দুই বা তিন এর মধ্যে সন্দেহ হলে দু'রাকাত স্থির করবে, এরূপ কিয়াস করবে। তৃতীয়, চতুর্থ উভয় রাকাতে বৈঠক করবে, তৃতীয় রাকাতটি চতুর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং চতুর্থ রাকাতে বৈঠকের পর সাহু সিজদা করার পর সালাম ফিরাবে। তবে প্রবল ধারণার অবস্থায় সাহু সিজদা নেই। কিন্তু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এক রুকনের সময় পরিমাণ বিরতি ঘটলে তখন সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (হেদায়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ নামায পূর্ণ করার পর সন্দেহ হলে তা ধর্তব্য নহে। নামাযের পর নিশ্চিত হলো যে কোন ফরজ রয়ে গেল কিন্তু কোন ফরজ বাদ পড়েছে সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে তখন পুনরায় পড়া ফরজ। (ফতহুল কদীর, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জোহর পড়ার পর কোন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি সংবাদ দিল যে, তিন রাকাত পড়া হয়েছে, তখন নামায পুনরায় পড়বে। যদিও তার ধারণায় এ সংবাদ ভুল। সংবাদ দানকারী যদি ন্যায়বান না হয়, তখন তার সংবাদ বিবেচনাযোগ্য নয়। মুসল্লির যদি সন্দেহ হয় এবং দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি সংবাদ দিল তাদের সংবাদের উপর আমল করা জরুরী। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ নেই স্বয়ং নামায সম্পর্কে সন্দেহ হয়েছে যেমন জোহরের দ্বিতীয় রাকাতে সন্দেহ হল যে, এটা আসরের নামায পড়ছি তৃতীয় রাকাতে নফলের সন্দেহ হল, চতুর্থ রাকাতে জোহরের সন্দেহ হল, তখন জোহরই পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ তাশাহুদের পর সন্দেহ হল যে, তিন রাকাত হল না চার রাকাত হল, এক রুকন পরিমাণ সময় চুপ রইল, চিন্তা কচ্ছে তারপর নিশ্চিত হল যে, চার রাকাত হল, তখন সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। আর যদি একদিকে সালাম ফিরানোর পর এরূপ হলে ওয়াজিব হবে না। আর যদি হাদছ বা অজু ভঙ্গ এবং অজু করতে যায় এবং তাতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, চিন্তামগ্নতায় অজুতে দেরীক্ষণ বিরতি ছিল, তখন সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সন্দেহ সৃষ্টি হল যে, সে ওয়াক্তের নামায পড়ছে নাকি নয়, যদি সময় থাকে পুনরায় পড়বে। অন্যথায় নহে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সন্দেহ সৃষ্টির সর্বাবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব, প্রবল ধারণা অবস্থায় নয়। কিন্তু চিন্তামগ্নতায় যদি এক রুকনের বিরতি হয়ে যায় তখন ওয়াজিব হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ অজুহীন বা মুছেহ বিহীন হওয়া নিশ্চিতহলে উক্ত অবস্থায় এক রুকন আদায় করে নিল, তখন নতুনভাবে নামায পড়বে, যদিও পরে নিশ্চিত হয় যে অজু ছিল এবং মুছেহ করেছিল। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নামাযে সন্দেহ হল, মুকীম না মুসাফির, তখন চার রাকাত পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাতের পর কওদা বা বৈঠক জরুরী। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বিতরে সন্দেহ হল যে, দ্বিতীয় রাকাত না তৃতীয় রাকাত তখন কুনুত পড়ে বৈঠক করে আরো এক রাকাত পড়বে এবং এর মধ্যেও কুনুত পড়বে এবং সাহু সিজদা করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমাম নামায পড়াচ্ছে অন্যদের সন্দেহ হল যে, প্রথম রাকাত বা দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকাত এবং তৃতীয় রাকাতে সন্দেহ হলে মুক্তাদিদের দিকে থাকাবে। তারা দাঁড়ালে দাঁড়াবে, বসলে বসবে– এতে ক্ষতি নেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি)

রুগ্ন ব্যক্তির নামাযের বর্ণনা

হাদীসে আছে, হযরত এমরান বিন হাসীন (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর এরশাদ ফরমালেন, দাঁড়িয়ে নামায পড়ো, সক্ষম না হলে বসে পড়ো, তাতেও সমর্থ না হলে শুয়ে পড়ো, আল্লাহ তায়ালা সাধ্যের বাইরে কোন আত্মাকে কষ্ট দেন না। উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম ব্যতীত মুহাদ্দেসীন কেরামের এক বৃহৎ জামাত বর্ণনা করেছেন। বাজ্জাজ মসনদে, বায়হাকী মা'আরাফা-এ-জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা কোন রুগ্ন ব্যক্তির সেবা যত্নের জন্য তাশরীফ নিলেন, দেখলেন বালিশের উপর নামায পড়ছে অর্থাৎ সিজদা করছে হুজুর তা নিক্ষেপ করলেন, সে একটি কাঠ নিল তাতে নামায পড়ছে হুজুর তাও নিক্ষেপ করলেন, এরশাদ করেন, জমিনের উপর নামায পড়বে, যদি

সমর্থবান হও, অন্যথায় ইঙ্গিতে পড়বে এবং সিজদাকে রুকু থেকে অবনত করবে।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম দাঁড়িয়ে পড়লে ক্ষতি সাধিত হবে বা রোগ বৃদ্ধি পাবে বা দেরীতে সুস্থ হবে বা মাথা সীমাহীন ব্যথা বা অসহ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হবে, এসব অবস্থায় বসে বসে রুকু সিজদা সহকারে নামায পড়বে। (দুররুল মোখতার) এ সম্পর্কে অনেক মাসয়ালা নামাযের ফরজের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ নিজে নিজে যদি বসতেও না পারে তবে ছেলে, ক্রীতদাস বা সেবক বা কোন অপরিচিত ব্যক্তি সেখানে আছে যিনি বসাইয়ে দিতে পারেন– তখন বসে পড়া জরুরী। আর যদি বসে থাকা না যায় তখন বালিশ, দেওয়াল বা কোন ব্যক্তির সাথে হেলান দিয়ে পড়বে। বসে পড়া যদি সম্ভব হয়, শুয়ে পড়লে নামায হবে না। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বসে পড়লে কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বসাটা জরুরী নহে। বরং রুগ্নব্যক্তির পক্ষে যেরূপ সহজ হবে সেভাবে বসবে। দোজানু করে বসাটা যদি সহজ হয় বা অন্যকোনভাবে বসার সমান হলে দোজানু করে বসাটা উত্তম। অন্যথায় যেটা সহজ সেটা গ্রহণ করবে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ নফল নামাযে থমকে গেল, দেওয়াল বা লাটির উপর ঠেস দিলে ক্ষতি নেই। অন্যথায় মাকরূহ হবে। বসে পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ চার রাকাত বিশিষ্ট নামায বসে পড়ল, শেষ বৈঠকের স্থলে তাশাহুহুদ পড়ার পূর্বে কেরাত শুরু করে দিল, রুকুও করল, তার হুকুম দাড়িয়ে আদায়কারী চতুর্থ রাকাতের পর দাড়িয়ে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় বিধায় সে যতক্ষণ না পঞ্চম রাকাতের সিজদা করবে– তাশাহুহুদ পড়বে এবং সাহু সিজদা করবে। পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নিলে নামায ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বসে আদায়কারী ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে সিজদা থেকে মাথা তুলল, দাঁড়াবার নিয়ত করল, কিন্তু কেরাতের পূর্বে স্বরণ হয়ে গেল, তখন তাশাহুহুদ পড়বে, নামায হয়ে যাবে। সাহু সিজদাও দিতে হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রুগ্ন ব্যক্তি বসে নামায পড়ছে, চতুর্থ রাকাতে সিজদা থেকে মাথা তুলল, তৃতীয় রাকাত ধারণা করল, কেরাত পড়ল, ইঙ্গিতে রুকু সিজদা করল,

নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সিজদার পর এ ধারণা করে দ্বিতীয় কেরাত শুরু করে দিল। তারপর স্বরণ হল তখন তাশাহুহুদের দিকে ফিরে যাবে না। বরং পূর্ণ করবে এবং শেষে সাহু সিজদা করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ দাঁড়াতে পারে কিন্তু রুকু সিজদা করতে পারে না অথবা শুধু সিজদা করতে পারে না, যেমন কণ্ঠনালীতে ফোঁড়া হয়েছে, সিজদা করলে রক্ত প্রবাহিত হবে বা ফেটে যাবে, তখনও বসে বসে ইশারায় পড়তে পারবে। এটাই উত্তম। এমতাবস্থায় দাড়িয়েও পড়া যাবে। রুকুর জন্য ইশারা করবে, বা রুকুতে সক্ষম হলে রুকু করবে। তারপর বসে সিজদার জন্য ইশারা করবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইশারায় পড়াকালে সিজদার ইশারা রুকুর ইশারা থেকে নিম্নগামী হওয়া জরুরী,তবে মাথা সম্পূর্ণরূপে মাটির সাথে নিকটবর্তী হওয়া আবশ্যক নহে। সিজদার জন্য বালিশ ইত্যাদি কোন বস্তু কপালের নিকট তুলে এর উপর সিজদা করা মাকরূহ তাহরীমি। সে নিজে এ বস্তু উত্তোলন করুক বা অন্যজন করুক। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কোন বস্তু উঠায়ে তার উপর সিজদা করল, সিজদাতে রুকুর তুলনায় মাথা অধিক অবনত করল, তবুও সিজদা হয়ে যাবে। কিন্তু গুনাহগার হবে। সিজদার জন্য মাথা অধিক অবনত না করলে সিজদা হবেই না। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ কোন উঁচু জিনিষ জমিনের উপর রেখে তার উপর সিজদা করল রুকুর জন্য শুধু ইশারা করল, হবে না বরং পেটসহ ঝুকালে শুদ্ধ হবে। তবে সিজদার শর্ত পাওয়া যাওয়া শর্ত। যেমন শক্ত জিনিষের উপর সিজদা করা এমনভাবে কপাল দাবানো, পুনরায় দাবাতে চাইলে দাববে না এবং তার উচ্চতা যেন বার আঙ্গুলের অধিক না হয়। উপরোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকার পর প্রকৃতপক্ষে রুকু সিজদা পাওয়া গেল তাকে ইশারায় আদায়কারী বলা যাবে না। দাড়িয়ে আদায়কারী তার এক্তেদা করতে পারবে। এ ব্যক্তি যখন এরূপভাবে রুকু সিজদা করতে পারে এবং দাঁড়াতে সক্ষম হলে দাড়ানো তার উপর ফরজ। অথবা নামাযের মধ্যে দাঁড়াতে সক্ষম হলে, তখন অবশিষ্ট নামায দাড়িয়ে পড়া ফরজ। বিধায় যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে পারে না। কিন্তু উল্লেখিত শর্তের ভিত্তিতে কোন বস্তু জমিনে রেখে সিজদা করতে পারে তার জন্য সেভাবে সিজদা করা ফরজ। তার জন্য ইশারায়

সিজদা করা জায়েয নেই। যে জিনিষের উপর সিজদা করল তা যদি ঐরূপ না হয় প্রকৃতপক্ষে সিজদা হয়নি। বরং সিজদার জন্য ইশারা হল। বিধায় দাড়িয়ে আদায়কারী ব্যক্তি তার এক্তেদা করতে পারবে না। উক্ত ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে দাঁড়াতে সক্ষম তখন শুরু থেকে নামায পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কপালে জখম বা ক্ষত হয়েছে সিজদার জন্য মাথা স্থাপন করতে পারছে না, তখন নাক দিয়ে সিজদা করবে। এরূপ না করে ইশারা করলে নামায হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অসুস্থ ব্যক্তি যদি বসতে সক্ষম না হয়, তখন শুয়ে ইশারায় পড়বে। হয় ডান পার্শ্বে বা বাম পার্শ্বে কাৎ হয়ে শয়ন করে। ক্বিবলার দিকে মুখ করবে। বা চিৎ হয়ে শয়ন করে ক্বিবলার দিকে পা রাখুক, কিন্তু পা বিস্তার করবে না। ক্বিবলার দিকে পা বিস্তার করা মাকরূহ বরং হাটু খাড়া রাখবে এবং মাথার নীচে বালিশ ইত্যাদি রেখে উঁচু করবে যেন মুখ ক্বিবলার দিকে হয়। কাৎ হয়ে এ পদ্ধতিতে পড়া উত্তম। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মাথা দ্বারা ইশারাও যদি করতে না পারে তখন নামায বাদ যাবে। চক্ষু বা ভ্রু বা অন্তরে ইশারা করে পড়াটা জরুরী নহে। অতঃপর এ অবস্থায় যদি ছয় ওয়াক্ত অতিক্রম করে তখন তার ক্বাযাও রহিত হবে। ফিদ্‌য়া দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। সুস্থ হওয়ার পরও ওসব নামায ক্বাযা দেয়া অপরিহার্য নহে। যদিও এতটুকু সুস্থ হয় যে, মাথার ইশারায় পড়া যায়। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ অসুস্থ ব্যক্তি স্বয়ং নিজে ক্বিবলার দিকে মুখ করতে পারছে না, অন্যজনের দ্বারাও পারছে না, এমতাবস্থায় সেভাবেই পড়ে নেবে। সুস্থতার পর উক্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যদি এমন কোন লোক যাকে বললে ক্বিবলামুখী করে দেবে। কিন্তু সে তাকে বলেনি, তখন হবে না। ইশারায় যে নামায পড়েছে সুস্থতার পর উক্ত নামায পুনরায় দোহরাতেও হবে না। এভাবে যদি মুখ বন্ধ হয়ে যায়, বোবার ন্যায় নামায পড়েছে তার পর মুখ খুলছে তখন উক্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ অসুস্থ ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌছল যে, রুকু সিজদার সংখ্যা স্মরণ রাখতে পারছে না, তখন তার জন্য নামায আদায় করা জরুরী নয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ সুস্থ ব্যক্তি নামায পড়তেছিল নামাযের মধ্যে এমনভাবে রোগ সৃষ্টি হল,

নামাযের রুকন আদায়ে অক্ষম হয়ে গেল, তখন যেভাবে সম্ভব বসে চিৎ হয়ে নামায পূর্ণ করবে। শুরু থেকে পড়ার প্রয়োজন নেই। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ বসে রুকু সিজদা সহকারে নামায পড়তেছিল, নামাযের মধ্যে দাঁড়াতে সক্ষম হল, বাকী নামায দাঁড়ায়ে পড়বে। ইশারায় পড়তেছিল, নামাযের মধ্যে রুকু সিজদা করতে সক্ষম হল, তখন শুরু থেকে পড়বে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ রুকু সিজদায় সক্ষম ছিল না, দাঁড়িয়ে বা বসে নামায শুরু করেছিল, ইশারায় রুকু সিজদা করার আগেই সুস্থ হয়ে গেল, তখন উক্ত নামায পূর্ণ করবে। শুরু থেকে পড়ার প্রয়োজন নেই। শুয়ে নামায শুরু করেছিল ইশারার পূর্বে দাঁড়াবে বা বসে রুকু সিজদা করতে সক্ষম হল, তখন শুরু থেকে পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ চলন্ত নৌকা বা জাহাজে ওজর ব্যতীত বসে নামায পড়া সহীহ্ হবে না। তবে শর্ত হলো নেমে শুকনা জায়গায় পড়া। নৌকা বা জাহাজ মাটির সাথে লেগে গেলে নেমে পড়ার প্রয়োজন নেই। নৌকা বা জাহাজ এক কিনারায় বাধা হলে যেখানে নেমে পড়া যায়, নেমে শুকনা জায়গায় পড়বে। অন্যথায় নৌকাতেই দাঁড়িয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নংগর দিয়ে বসে পড়তে পারবে। বাতাসের গতি যদি ঝুকিপূর্ণ হয়, দাড়ালে ধাক্কা লাগার প্রবল আশংকা হয় এবং বাতাসের দরুন যদি অধিক নড়াচড়া না হয় তখন বসে পড়া যাবে না। নৌকা বা জাহাজে নামায পড়লে ক্বিবলামুখী হওয়া অপরিহার্য। জাহাজ ফিরে গেলে নামাযী ব্যক্তিও ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরায়ে নেবে। বাতাসের প্রবলতা যদি শক্তিশালী হয় ক্বিবলার দিকে মুখ করতে অক্ষম এ সময় নামায স্থগিত রাখবে আর যদি দেখা যায় সময় চলে যাচ্ছে তখন পড়ে নেবে। (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ সংজ্ঞাহীন ও জ্ঞানহীন মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় যদি পূর্ণ ছয় ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হয়– তখন ঐ অবস্থার নামাযগুলো ক্বাযা দিতে হবে না। যদিও সংজ্ঞাহীনতা ব্যক্তির কারণে বা প্রাণীর ভয়ে হোক। ছয় ওয়াক্তের কম হলে ক্বাযা ওয়াজিব। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি কোন কোন সময় সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সময় নির্ধারিত কি না? তা দেখতে হবে। সময় যদি নির্ধারিত হয় এর পূর্বে যদি পূর্ণ ছয় ওয়াক্ত অতিক্রান্ত না হয়, তখন ক্বাযা ওয়াজিব। সংজ্ঞা ফিরে আসার সময় দিন যদি নির্ধারিত না হয়, বরং একবার সংজ্ঞা ফিরে আসে পুনরায় পূর্বাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন এ সংজ্ঞা ফিরে

আসার বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য নয়। অর্থাৎ পূর্ণ অবস্থা সংজ্ঞাহীনতা হিসেবে মনে করতে হবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ শরাব বা মদ পান করেছে যদিও ঔষধের উদ্দেশ্য হয় এবং জ্ঞানলোপ পেয়েছে, তখন ক্বাযা ওয়াজিব। যদিও জ্ঞানহীন অবস্থায় যত অধিক সময় অতিবাহিত হোক না কেন। এভাবে অন্যজনে বাধ্য করে মদ পান করায়েছে তখনও ক্বাযা সাধারণভাবে ওয়াজিব। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ নিদ্রায় ছিল, যে কারণে নামায চলে গেল, তখন ক্বাযা ফরজ। যদিও নিদ্রা পূর্ণ ছয় ওয়াক্তকে বেষ্টন করে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, রোজা রাখলে দাড়িয়ে নামায পড়তে পারে না, রোজা না রাখলে দাঁড়ায়ে পড়তে পারে, তখন রোজা রাখবে এবং নামায বসে পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অসুস্থ ব্যক্তি ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায পড়ে নিল, এ ধারণা করে যে, সময়মত পড়তে পারবে না, তখন নামায হবে না। ক্বেরাত ব্যতীতও হবে না। কিন্তু যখন কেরাতে অপারগ হবে তখন হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামীর উপর তাকে অজু করায়ে দেয়া ফরজ নহে। গোলাম যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে অজু করায়ে দেওয়া মুনিবের দায়িত্ব। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ছোট তাবুতে অবস্থান করে যেখানে দাড়াতে পারছে না, বাহির হলে বৃষ্টি ও কাদা রয়েছে তখন বসে পড়বে। এভাবে দাঁড়ালে শত্রুর আশংকা রয়েছে– তখন বসে পড়া যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অসুস্থতায় নামায ক্বাযা হয়ে গেল, সুস্থ হওয়ার পর তা পড়তে চাইলে সেভাবে পড়বে যেভাবে সুস্থ ব্যক্তি পড়ে থাকে। রুগ্ন ব্যক্তির ন্যায় পড়তে পারবে না। যেমন বসে বা ইশারায়। যদি এরূপভাবে পড়ে হবে না। সুস্থাবস্থায় নামায ক্বাযা হলে রুগ্নাবস্থায় তা পড়তে চাইলে তখন যেভাবে পড়া যায় সেভাবে পড়লে হয়ে যাবে। সুস্থতার মত পড়া সে সময় ওয়াজিব নহে।

মাসআলাঃ পানিতে ডুবে যাচ্ছে,এমতাবস্থায়ও আমলে কষ্টীর বিহীন ইশারায় পড়া যাবে। যেমনঃ সাতারু অথবা কাঠের আশ্রয় পেলে তখন পড়া ফরজ। অন্যথায় অপারগ। বেঁচে গেলে তখন ক্বাযা পড়বে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ চক্ষু অপারেশন করেছে অভিজ্ঞ মুসলমান চিকিৎসক শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে তখন শুয়ে ইশারায় পড়বে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ রুগ্ন ব্যক্তির নীচে নাপাক বিছানা বিছানো আছে, অবস্থা এরূপ হয়েছে– যদি পরিবর্তনও করা হয় তথাপি নামায পড়তে পড়তে নিষিদ্ধ পরিমাণ নাপাক হয়ে যায়। তার উপরই নামায পড়বে। কিন্তু পরিবর্তন করা হলে সে পরিমাণ চামড়া নাপাক হবে না। কিন্তু পরিবর্তনে অধিক কষ্ট হবে। তখন সে নাপাকীর উপরই পড়ে নেবে। (আলমগীরি)

জরুরী সতর্কতাঃ মুসলমান মাত্রই এ অধ্যয়ের মাসআলা দেখলে ভালভাবেই অবগত হবে যে, ইসলামী শরীয়তে কতিপয় দুর্লভ অবস্থা ব্যতীত কোন অবস্থাতেই নামায মাফ নেই বরং এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেভাবেই সম্ভব পড়ে নেবে।

বর্তমান যারা বড় নামাযী দাবী করে থাকে, তাদের অবস্থা দেখা যায়, সামান্য জ্বর ব্যথা অনুভূত হলে নামায ছেড়ে দেয়। কোন কঠিন ব্যথা হলেই নামায ছেড়ে দেয়। কোন কিছু ফেটে বের হলেই নামায ছেড়ে দেয়। এমনকি এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, যে ব্যথা-বেদনা ও সর্দি কাশি হলে নামায ছেড়ে দিয়ে বসে। অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত ইশারাও পড়া যায়, না পড়লে শাস্তির যোগ্য। যা কিতাবের প্রারম্ভে নামায বর্জনকারী সম্পর্কে হাদীস দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করুন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ مُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِنْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَ شَرِيْعَةِ
حَبِيْبِكَ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ – اٰمِيْنَ.

তিলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করেন, শয়তান পলায়ন করে এবং প্রতিউত্তরে বলেন– হায়! আমার সর্বনাশ আদম সন্তানকে নির্দেশ হয়েছে তারা সিজদা করেছে তাদের জন্য জান্নাত। আমাকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি অস্বীকার করেছি, আমার জন্য জাহান্নাম।

সিজদার আয়াত সমূহের বর্ণনা

মাসয়ালাঃ সিজদার আয়াত চৌদ্দটি আয়াত সমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ হলঃ

১। সূরা আ'রাফ (শেষের আয়াত)

• إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.

২। সূরা রা'দঃ • وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

৩। সূরা নাহলঃ • وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.

৪। সূরা বনী ইসরাইলঃ

• إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

৫। সূরা মরিয়মঃ • إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

৬। সূরা হজ্বঃ

• أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

৭। সূরা ফুরকানঃ

• وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.

৮। সূরা নমলঃ

• أَلَّا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

৯। সূরা সিজদাহঃ

• إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

১০। সূরা ছোয়াদঃ

• فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ.

১১। সূরা হা-মীম-সিজদাহঃ

• وَمِنْ اٰيٰتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ.

১২। সূরা নাজমঃ • فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوا

১৩। সূরা ইনশিক্বাক্বঃ • فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُونَ

১৪। সূরা আলাক্ব • وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

মাসআলাঃ সিজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে সিজদাহ ওয়াজিব হবে। পড়ার মধ্যে শর্ত হলো যে, আওয়াজ যেন এতটুকু হয় বিনা ওজরে যাতে নিজে শুনতে পায়। শ্রবণকারীর জন্য ইচ্ছাকৃত শুনা বা অনিচ্ছাকৃত শুনা আবশ্যক নহে। বিনা ইচ্ছায় শুনতে পেলেও সিজদাহ ওয়াজিব হবে। (হেদায়া, দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণ আয়াত পড়া আবশ্যক নহে। বরং সিজদার মূলাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ হলে এর সাথে পূর্বে বা পরে কোন শব্দ মিলায়ে পড়া যথেষ্ট হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি এতটুকু আওয়াজে আয়াত পড়া হয় যা দ্বারা শুনা যায় কিন্তু হৈ চৈ বা বধির হওয়ার কারণে শুনতে পায়নি, তখনও সিজদাহ ওয়াজিব হবে। আর যদি ঠোঁট নড়াচড়া করা হয় এবং শব্দ সৃষ্টি না হয় তখন ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ পাঠকারী আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু অন্যজন শুনেনি, যদিও একই মজলিসে হোক, তার উপর সিজদাহ্ ওয়াজিব নহে। নামাযে ইমাম আয়াত পাঠ করলে মুক্তাদির উপরও ওয়াজিব হয়ে যাবে– যদিও শুনতে না পায়। যদিও আয়াত পাঠকালে সে উপস্থিত ছিল না। আয়াত পাঠের পর সিজদার পূর্বে নামাযে শামিল হয়েছে তথাপি ওয়াজিব। যদি ইমাম থেকে আয়াত শুনতে পায় কিন্তু ইমামের সিজদাহ্ করার পর উক্ত রাকাতে শামিল হয়েছে তখন ইমামের সিজদাহ্ তাকেও করতে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হলে ইমামের সিজদাহ তার জন্যও প্রযোজ্য। দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হলে নামাযের পর সিজদাহ্ করবে। এভাবে যদি শামিলও না হন তখনও সিজদাহ করবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সূরা হজ্বের শেষ আয়াত যেখানে সিজদাহ্র উল্লেখ আছে তা পড়লে বা শুনলে সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। যেহেতু এ আয়াতে সিজদাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নামাযের সিজদাহ অবশ্য যদি শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামের এক্তেদা করা হলে এবং এ স্থানে শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমাম সিজদাহ করলে তার অনুসরণ মুক্তাদির উপরও ওয়াজিব। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম সিজদার আয়াত পাঠ করেছে, সিজদাহ্ করল না, তখন মুক্তাদিও তাঁর অনুসরণে সিজদাহ করবে না, যদিও আয়াত শুনতে পায়। (তবঈন)

মাসআলাঃ মুক্তাদি সিজদার আয়াত পাঠ করল, তখন তার উপরও সিজদাহ্ ওয়াজিব

হবে না, ইমামের উপরও হবে না এবং মুক্তাদির উপর নামাযের মধ্যে বা পরেও ওয়াজিব হবে না। অবশ্য যদি অন্য নামাযী যিনি তার সাথে নামাযে শামিল হননি, আয়াত শুনতে পেলে, সে একাকী নামায আদায়কারী হোক বা অন্য ইমামের মুক্তাদি বা অন্য ইমাম হোক তার উপর নামাযের পর সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। এভাবে যারা নামাযে ছিল না তাদের উপরও ওয়াজিব। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি নামাযে নেই, সিজদার আয়াত পাঠ করল, কোন নামাযী শুনতে পেল, তখন নামাযের পর সিজদাহ্ করবে। নামাযে করবে না। নামাযে করে নিলে যথেষ্ট হবে না। নামাযের পর পুনরায় করতে হবে। এতে নামায ফাসেদ হবে না। হ্যাঁ যদি তেলাওয়াতকারীর সাথে সিজদাহ্ করলে এবং অনুসরণের ইচ্ছাও করেছে, তখন নামায ভঙ্গ হবে।

মাসয়ালাঃ যে ব্যক্তি নামাযে ছিল না, সিজদার আয়াত পড়েই নামাযে শামিল হল, তখন সিজদাহ বাদ যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ রুকু বা সিজদায় সিজদার আয়াত পাঠ করেছে তখন সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে এবং একই রুকু সিজদাহ দ্বারা তা আদায়ও হয়ে গেল। তাশাহুদ পড়লে তখন সিজদাহ্ ওয়াজিব হয়ে যাবে। বিধায় সিজদাহ্ করবে।

মাসআলাঃ সিজদার আয়াত পাঠকারীর উপর তখন সিজদাহ ওয়াজিব হবে যদি সে ওয়াজিব নামাযের যোগ্য হয়। অর্থাৎ আদায় বা ক্বাযার ব্যাপারে যদি সে আদিষ্ট হয়। বিধায় যদি কাফের, মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, ঋতুস্রাব সম্পন্ন বা নেফাস সম্পন্ন মহিলা সিজদার আয়াত পাঠ করলে তখন তার উপর সিজদাহ্ ওয়াজিব নয়। আর মুসলমান জ্ঞানী বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক নামাযের যোগ্য ব্যক্তি তাদের থেকে শুনলে তখন তার উপর ওয়াজিব হবে। মস্তিষ্ক বিকৃতি পাগলামী যদি একদিন একরাতের অতিরিক্ত না হয় তখন মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি শুনলে বা পড়লে সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। অজুহীন বা অপবিত্র ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করেছে বা শুনেছে তখন সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি আয়াত পড়লে বা শুনলে তখন সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। এভাবে নিদ্রাবস্থায় আয়াত পাঠ করেছে জাগ্রত হওয়ার পর কেউ সংবাদ দিল তখন সিজদাহ্ করবে। নেশাগ্রস্ত নিদ্রিত ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করেছে, তখন শ্রবণকারীর উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মহিলা নামাযে সিজদার আয়াত পাঠ করল, সিজদাহ্ করল না, এমনকি ঋতুস্রাব হয়ে গেল, তখন সিজদাহ্ বাদ যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নফল আদায়কারী সিজদার আয়াত পড়ল, সিজদাও করল, অতঃপর নামায ফাসেদ হয়ে গেল, ক্বাযার মধ্যে সিজদাহ পুনরায় দিতে হবে না। সিজদাহ না করে থাকলে নামাযের বাহিরে করবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফার্সী অথবা কোন ভাষায় আয়াতের অনুবাদ পাঠ করল, তখন পাঠকারী ও শ্রবণকারীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। এটা যে সিজদার আয়াতের অনুবাদ তা শ্রবণকারীর বুঝে আসুক না আসুক, অবশ্য তার জানা না থাকা থাকলে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, এটা সিজদার আয়াতের অনুবাদ এবং আয়াত পড়াও হল, তখন শ্রবণকারীকে এটা যে সিজদার আয়াত তা বলা জরুরী নহে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কয়েক ব্যক্তি একটি একটি করে হরফ পাঠ করেছে সবগুলোর সমষ্টি সিজদার আয়াত হয়ে গেল, তখন কারো উপর সিজদা ওয়াজিব নহে। এভাবে আয়াত বানান করে পাঠকারী ও বানান শ্রবণকারীর উপরও ওয়াজিব হবে না। এভাবে পাখি হতে সিজদার আয়াত শুনতে পেল অথবা জঙ্গলে বা পর্বত ইত্যাদি স্থানে আয়াতের অবিকল আওয়াজ হল এবং কানে পৌঁছল, তখনও সিজদাহ্ ওয়াজিব নহে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সিজদার আয়াত পড়ার পর নাউজুবিল্লাহ্ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেল, পুনরায় মুসলমান হল, তখন উক্ত সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ সিজদার আয়াত লিখলে, অথবা সেদিকে দেখলে সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ তেলাওয়াতে সিজদার জন্য তাহরীমা ব্যতীত সবগুলো শর্ত রয়েছে যেগুলো নামাযের মধ্যে রয়েছে। যেমন, পবিত্রতা ক্বেবলামুখী হওয়া, নিয়ত করা, সতর ঢাকা, পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম করে সিজদাহ্ করা জায়েয নেই। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ অমুক আয়াতের সিজদাহ্ এটা নিয়ত করা শর্ত নয়। বরং সাধারণভাবে তেলাওয়াতে সিজদার নিয়ত করলে যথেষ্ট হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যেসব কারণে নামায ভঙ্গ হয় সেসব কারণে সিজদাও ফাসেদ হবে। যেমন ইচ্ছাকৃত হাদছ বা অজুভঙ্গকারী কারণ পাওয়া গেলে, অট্টহাসিতে কথা বললে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ সিজদার সুন্নত নিয়ম হলো, দাড়ায়ে আল্লাহ্ আকবর বলে সিজদায় যাবে। কমপক্ষে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলবে। তারপর আল্লাহ্ আকবর বলে দাড়িয়ে যাবে। প্রথমে ও শেষে উভয়বার আল্লাহ্ আকবর বলা সুন্নত। দাড়ানো থেকে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদার পর দাড়ানো উভয়টি মুস্তাহাব (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মুস্তাহাব হলো তেলাওয়াতকারী সামনে শ্রবণকারী তার পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে সিজদাহ করবে এবং এটাও মুস্তাহাব যে, শ্রবণকারীগণ পাঠকারীর আগে মাথা তুলবে না। আর যদি বিপরীত করে যেমন নিজ নিজ স্থানে সিজদাহ করল, যদিও তেলাওয়াতকারীর সামনে বা তার পূর্বে সিজদাহ করেছে অথবা পাঠকারী সে সময় সিজদাহ্ করেনি, শ্রবণকারীগণ করেছে এতে ক্ষতি নেই। তেলাওয়াতকারীর সিজদাহ্ যদি ফাসেদ হয়ে যায়– তার সিজদার উপর উনাদের কোন প্রভাব নেই, বাস্তব এটা এক্তেদা নয়, মহিলা যদি তেলাওয়াত করে তখন পুরুষদের ইমাম সিজ দার সামনে থাকতে পারবে, মহিলা পুরুষের মাঝখানে হলে ফাসেদ হবে না। (গুনীয়া, আলমগীরি)

মাসআলাঃ যদি সিজদার শুরুতে বা শেষে না দাড়ায় 'আল্লাহ্ আকবর'ও বলেনি, অথবা 'ছুবহানা'ও পড়ল না, হয়ে যাবে। কিন্তু তাকবীর ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়। এটা পূর্ববর্তী ইমামদের খেলাপ। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ একাকী সিজদাহ্ আদায় করলে সুন্নত হলো তাকবীর এতটুকু আওয়াজে করবে যেন নিজে শুনতে পায়। অন্য লোক যদি সাথে থাকে তখন মুস্তাহাব হলো এতটুকু আওয়াজ করবে যেন তারাও শুনতে পায়। (রদ্দুল মোখতার)

তিলাওয়াতে সিজদার দোআ সমূহ

মাসআলাঃ তেলাওয়াতে সিজদায় 'ছুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলার ব্যাপারে উপরে যা বর্ণিত হলো তা হলো ফরজ নামাযে। নফল নামাযে সিজদাহ্ করলে চাই এটা পড়বে বা অন্য দোয়া পড়বে যা হাদীস সমূহে উল্লেখ রয়েছে।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

অর্থাৎ, আমার চেহারা সিজদাহ্ করল তাঁরই জন্য যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার আকৃতি সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ক্ষমতায় তার কান ও চক্ষুকে বিদীর্ণ করেছেন, বরকতময় সত্ত্বা যিনি উত্তম স্রষ্টা। অথবা পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ عِنْدَكَ بِهَا اَجْرًا وَّضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَّاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ সিজদার ওসীলায় তুমি আমার জন্য তোমার নিকট পূণ্য লিপিবদ্ধ কর এর বিনিময়ে তুমি আমার থেকে গুনাহ্ দূরীভূত কর এবং তোমার নিকট আমার জন্য তা সঞ্চিত কর, আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর, যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) এর পক্ষ থেকে কবুল করেছ। অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে।

سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

অর্থাৎ পবিত্র আমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবেই।

যদি নামাযের বাইরে হয় ইচ্ছা হলে উক্ত দোয়া পড়বে অথবা ছাহাবা, তাবেয়ীন থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেসব দোয়া পড়বে। যেমন হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِيْ وَبِكَ اٰمَنَ فُؤَادِيْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عِلْمًا يَّنْفَعُنِيْ وَعَمَلًا يَّرْفَعُنِيْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমার দেহ তোমাকে সিজদা করেছে, আমার অন্তর তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে তুমি আমাকে উপকারী জ্ঞান দান কর এবং জীবিকার কাজ দান কর। (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ তেলাওয়াতে সিজদায় 'আল্লাহ্ আকবর, বলার সময় হাত উঠাবে না, তাশাহ্হুদও পড়বে না। সালামও ফিরাবে না। (তানভীরুল আবছার)

মাসআলাঃ নামাযের বাইরে সিজদার আয়াত পাঠ করলে তাৎক্ষণিক সিজদাহ্ করাটা ওয়াজিব নয়। তবে দ্রুত করে নেয়াটা উত্তম। অজু অবস্থায় বিলম্ব করলে মাকরূহ তানযিহী হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে সময় সিজদার আয়াত পড়া হয় সে সময় কোন কারণে যদি সিজদাহ্ করতে না পারে তখন পাঠকারী ও শ্রবণকারীর উপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে নেয়া মুস্তাহাব।

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (رد المحتار)

অর্থঃ আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি তোমার ক্ষমা হোক! হে আমাদের প্রতিপালক এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সূরা বাকারা পারা-৩, আয়াত ২৮৫)

নামাযে সিজদার আয়াত পড়ার মাসাইল

মাসআলাঃ তেলাওয়াতে সিজদা নামাযে করা ওয়াজিব। বিলম্বকারী গুনাহগার হবে। সিজদা করা ভুলে গেলে যতক্ষণ নামাযের তাহরীমায় থাকবে করে নেবে। যদিও সালাম ফিরানো হয় এবং সাহু সিজদা করবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

যেমন বিলম্ব বলতে তিন আয়াতের অতিরিক্ত পড়ে নেয়া কম হলে বিলম্ব নেই। কিন্তু সূরার শেষে সিজদাহ্ হলে যেমন [illegible] তখন সূরা পূর্ণ করে সিজদাহ্ করলেও ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ নামাযে সিজদার আয়াত পড়লে নামাযেই সে সিজদা ওয়াজিব হবে। নামাযের বাইরে হবে না। ইচ্ছাকৃত না করলে গুনাহগার হবে। তাওবা অপরিহার্য। তবে সিজদার আয়াতের পর দ্রুত রুকু সিজদাহ্ করেনি এরূপ হওয়া শর্ত। নামাযে সিজদার আয়াত পাঠ করেছে সিজদাহ্ করেনি অতঃপর উক্ত নামায ফাসেদ হয়ে গেল অথবা ইচ্ছাকৃত ফাসেদ করেছে তখন নামাযের বাইরে সিজদাহ্ করে নেবে আর সিজদাহ্ করে নিলে পুনরায় করার প্রয়োজন নেই। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ আয়াত পড়ার পর যদি দ্রুত নামাযের সিজদা করে নিল, অর্থাৎ সিজদার আয়াতের পর তিন আয়াতের বেশী পড়েনি রুকু করে সিজদায় করে নিল, তখন যদিওবা তেলাওয়াতে সিজদার নিয়ত হয়নি তথাপি আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ নামাযের সিজদা তেলাওয়াতে সিজদার দ্বারাও আদায় হয় এবং রুকু দ্বারাও হয়। কিন্তু রুকু দ্বারা তখন আদায় হবে যদি দ্রুত করে। দ্রুত না করলে সিজদা করা জরুরী। যে রুকু দ্বারা তেলাওয়াতে সিজদা আদায় করল উক্ত রুকু নামাযের রুকু হোক বা নামায ছাড়া হোক, যদি নামাযের রুকু হয় তখন সিজদা

আদায়ের নিয়ত করবে আর যদি বিশেষ সিজদার জন্য রুকু হয়ে থাকে, তখন রুকু থেকে উঠার পর মুস্তাহাব হলো দুই বা তিন আয়াত বা অতিরিক্ত আয়াত পাঠ করে নামাযের রুকু করবে। দ্রুত করবে না। আর যদি সিজদার আয়াত সূরা শেষে হয় এবং সিজদার জন্য রুকু করেছে তখন অন্য সূরার আয়াত পাঠ করে রুকু করবে। (গুনীয়া, আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ সিজদার আয়াত যদি সূরার মাঝখানে হয়, উত্তম হলো তা পাঠ করে সিজদা করবে। অতঃপর আরো কিছু আয়াত পাঠ করে রুকু করবে। আর যদি না করে কেবল রুকু করে এবং রুকুর মধ্যে সিজদা আদায়ের নিয়তও যদি করে যথেষ্ট হবে। সিজদাও করেনি রুকুও করেনি বরং সূরা শেষ করে রুকু করেছে, তখন যদিও নিয়ত করে যথেষ্ট হবে না। যতক্ষণ নামাযে থাকবে সিজদা কাযা করা যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সিজদাতে যদি সূরা শেষ করে এবং সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করেছে তখন সিজদা থেকে উঠার পর অন্য সূরার কিছু আয়াত পাঠ করে রুকু করবে। না পড়ে রুকু করলেও জায়েয হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যদি সিজদার আয়াতের পর সূরা শেষ হতে আরো দুই তিন আয়াত অবশিষ্ট থাকে তখন ইচ্ছা হলে দ্রুত রুকু করবে। অথবা সূরা শেষ করার পর বা দ্রুত সিজদা করে নেবে। অতঃপর অবশিষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করে রুকুতে যাবে। অথবা সূরা শেষ করে সিজদায় যাবে। সব ধরনের এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু আখেরী রুকুতে সিজদা থেকে উঠে অন্য সূরার কিছু আয়াত পাঠ করে রুকু করবে। (গুনীয়া, আলমগীরি)

মাসআলাঃ রুকুতে যাবার সময় সিজদার নিয়্যত করেনি বরং রুকুতে বা রুকু হতে উঠার পর নিয়ত করেছে এ নিয়্যত যথেষ্ট হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ তেলাওয়াতে সিজদার পর ইমাম রুকুতে গেল এবং সিজদার নিয়ত করে নিল কিন্তু মুক্তাদিগণ করেনি তাদের সিজদাহ্ আদায় হয়নি। তাই ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন মুক্তাদি সিজদাহ্ করে বৈঠক করবে এবং সালাম ফিরাবে এবং উক্ত কাওমা বা বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা ওয়াজিব। না করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এ হুকুম প্রকাশ্য কেরাত বিশিষ্ট নামাযের জন্য প্রযোজ্য, অপ্রকাশ্য নামাযে যেহেতু মুক্তাদি জানে না, বিধায় অপারগ। ইমাম যদি রুকুতে

তেলাওয়াতে সিজদার নিয়ত না করে তখন উক্ত নামাযের সিজদাহ্ দ্বারা মুক্তাদিদের তেলাওয়াতে সিজদাহ্ আদায় হয়ে যাবে। যদিও নিয়ত না হয়। বিধায় ইমামের উচিৎ রুকুতে সিজদার নিয়ত না করা। মুক্তাদিগণ যদি নিয়ত না করে তাদের সিজদাহ্ আদায় হবে না। রুকুর পর যখন ইমাম সিজদাহ করবে এর দ্বারা তেলাওয়াতে সিজদাও অবশ্যই আদায় হয়ে যাবে। নিয়ত করুক বা না করুক। পুণরায় নিয়তের কি প্রয়োজন? (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রকাশ্য নামাযে ইমাম সিজদার আয়াত পড়লে সিজদাহ্ করা উত্তম। অপ্রকাশ্য নামাযে রুকু করা উত্তম। যেন মুক্তাদিগণ প্রতারিত না হয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম তেলাওয়াতে সিজদাহ্ করেছে মুক্তাদিগণ রুকুর ধারণা করেছে এবং রুকুতে গেল, তখন রুকু ভঙ্গ করে সিজদাহ্ করবে। যে ব্যক্তি রুকু এবং এক সিজদাহ্ করছে সেটাও আদায় হয়ে যাবে। রুকু করে দু'টি সিজদাহ্ করলে তার নামায হয়ে গেল। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসল্লী তেলাওয়াতে সিজদাহ্ ভুলে গেল রুকু বা সিজদাহ্ অথবা কাওদা (বৈঠকে) স্মরণ হল, তখনই সিজদাহ্ করে নেবে এবং যে রুকুনে ছিল সে রুকুনের দিকে ফিরে যাবে। অর্থাৎ রুকুতে থাকলে সিজদাহ্ করে রুকুতে ফিরে যাবে। এরপর কিয়াস করে উক্ত রুকুন না দোহরালেও নামায হয়ে যাবে (আলমগীরি)। কিন্তু আখেরী বৈঠক দোহরানো ফরজ। যেহেতু সিজদার দ্বারা বৈঠক বাতিল হয়ে যায়।

এক মজলিসে সিজদার আয়াত পড়া ও শুনার মাসাঈল মজলিস পরিবর্তন করা না করার বিধান

মাসআলাঃ এক মজলিসে সিজদাহ্ করল, এক আয়াতকে বারবার পাঠ করলে বা বারবার শুনলে একটি সিজদাই ওয়াজিব হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ পাঠকারী কয়েক মজলিসে একই আয়াত বারবার পড়েছে শ্রবণকারীর মজলিস পরিবর্তন হয়নি, এমতাবস্থায় পাঠকারী যত মজলিসে পড়বে ততবার সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। শ্রবণকারীর উপর একবার ওয়াজিব হবে। এর বিপরীত হলে অর্থাৎ পাঠকারী একই মজলিসে বারবার পাঠ কতে লাগল, শ্রবণকারীর মজলিস পরিবর্তন হল, তখন পাঠকারীর জন্য একটি সিজদাহ্ ওয়াজিব। শ্রবণকারী যতবার মজলিসে

শুনেছে ততবার ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মজলিসে আয়াত পড়ল বা শুনল এবং সিজদা করে নিল অতঃপর একই মজলিসে একই আয়াত পড়েছে বা শুনেছে, তখন প্রথম সিজদাই যথেষ্ট হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ এক মজলিসে কয়েকবার সিজদার আয়াত পড়ল, বা শুনল পরিশেষে ততবারই সিজদা করতে চাইলে তবে এটা মুস্তাহাবের বিপরীত বরং একবারই করবে। তবে এটা দরুদ শরীফের বিপরীত যে, প্রিয় নবীর নাম মোবারক নিলে বা শুনলে তখন একবার দরুদ শরীফ পাঠ ওয়াজিব এবং প্রতিবার মুস্তাহাব। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ দু'এক লোকমা আহার করলে বা দু'এক ঢোক পান করলে, দাড়ালে দু'এক কদম চললে, সালামের জবাব দিলে দু'একটি কথা বললে, কোন স্থানের এক কোণ থেকে অন্য কোণে গমন করলে মজলিস পরিবর্তন হয় না, তবে জায়গা যদি বড় হয়, যেমন শাহী মহল এমন স্থানে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গমনে মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়। নৌকাতে আরোহী নৌকা চলছে মজলিস পরিবর্তন হবে না, রেলগাড়ীরও একই হুকুম হওয়া সমীচীন। প্রাণীর উপর আরোহী হলে প্রাণী চলছে, তখন মজলিস পরিবর্তন হবে। তবে বাহনের উপর নামায পড়লে মজলিস পরিবর্তন হবে না। তিন গ্রাস আহার করল তিন ঢোক পান করলে তিন শব্দ বললে তিন কদম ময়দানে চললে, বিবাহ বা বেচা কেনা করলে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লে মজলিস পরিবর্তন হয়ে যাবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার, গুনীয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ বাহনের উপর নামায পড়ছে, কোন ব্যক্তি সাথে চললে অথবা সেও বাহনের উপর আছে, কিন্তু নামাযে নেই এরকম অবস্থায় যদি আয়াত পরপর পড়লে তার উপর সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। যিনি সাথে আছেন তিনি যতবার শুনেছেন ততবার সিজদাহ্ করবেন। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কোন রশি শক্তভাবে টানা নদীতে বা কুপে সাতরালে বৃক্ষের এক ডালা থেকে অপর ডালায় গেলে চাষের হাল, ডানে চালালে, ষাঁড়ের চাকার পিছনে ফিরলে, মহিলারা শিশুকে দুধ পান করালে এসব অবস্থায় মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়। যতবার আয়াত পড়বে বা শুনবে ততবার সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। (গুনীয়া, দুররুল মোখতার ইত্যাদি) ষাঁড়ের পিছনে পরিচালনাকারীরও একই হুকুম হওয়া সমীচীন।

মাসআলাঃ এক জায়গায় বসে বসে শরীরে আরাম নিচ্ছে তখন মজলিস পরিবর্তন হবে যদিও ফাতহুল কদীর কিতাবে এর বিপরীত লিখা হয়েছে তার জন্য এটা আমলে কছির (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন মজলিসে দেরীক্ষণ বসে কেরাত তাসবীহ তাহলীল শিক্ষা বা ওয়াজের মজলিসে মশগুল থাকলে মজলিস পরিবর্তন হবে না। যদি উভয়বার পড়ার মাঝখানে কোন দুনিয়াবী কাজ করে থাকলে যেমন কাপড় সেলাই ইত্যাদি করছে তখন মজলিস্ পরিবর্তন হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সিজদার আয়াত নামাযের বাইরে পাঠ করেছে সিজদা করে পুনরায় নামায শুরু করেছে, নামাযে পুনরায় একই আয়াত পাঠ করল, এখন এর জন্য দ্বিতীয়বার সিজদাহ্ করবে। প্রথমবারে না করলে এটা পূর্বেরটারও স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। তবে শর্ত হলো আয়াত পড়া ও নামাযের মাঝখানে যেন অন্য কোন কাজ দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি না হয়। আর যদি প্রথমবারে সিজদাহ্ না করে আর নামাযেও করেনি তখন উভয়টি বাদ যাবে এবং গুনাহগার হবে। তাওবা করবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ এক রাকাতে বারবার একই আয়াত পাঠ করলে একটি সিজদাই যথেষ্ট হবে। কয়েকবার পড়ে সিজদাহ্ করুক বা একবার পড়ার পর সিজদাহ্ করুক। তারপর দু'বার তিনবার আয়াত পড়েছে, এভাবে এক নামাযের সব রাকাতে অথবা দু'তিন রাকাতে একই আয়াত পাঠ করলে সব রাকাতের জন্য একটি সিজদাই যথেষ্ট। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নামাযে সিজদার আয়াত পাঠ করল এবং সিজদা করল, সালাম ফিরানোর পর সে মজলিসে একই আয়াত পাঠ করেছে এমতাবস্থায় কথা না বললে, নামাযের সিজদাহ্ উক্ত সিজদারও স্থলাভিষিক্ত হবে। কথা বললে দ্বিতীয়বার সিজদাহ্ করতে হবে। নামাযে যদি সিজদাহ্ না করে থাকে, সালাম ফিরানোর পর একই আয়াত পাঠ করল তখন একটি সিজদা করলে নামাযের সিজদাহ্ করতে হবে না। (হালিয়া, গুনীয়া, আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নামাযে সিজদার আয়াত পাঠ করল, সিজদা করল, অতঃপর অজু চলে গেল, অজু করে আবার নামায শুরু করল, পুনরায় একই আয়াত পাঠ করল, তখন দ্বিতীয় সিজদাহ্ ওয়াজিব হয়নি। আর যদি নতুনভাবে শুরুর পর অন্যজন থেকে

একই আয়াত শুনতে পায় তখন দ্বিতীয়বার ওয়াজিব এবং এ দ্বিতীয় সিজদাহ্টি নামাযের পর করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ এক মজলিসে সিজদার কয়েকটি আয়াত পাঠ করা হল, সবগুলো সিজদা করবে। একটি সিজদাহ্ যথেষ্ট হবে না। (ফিকাহ্র কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ পূর্ণ সূরা পড়া এবং সিজদার আয়াত ছেড়ে দেয়া মাকরূহ তাহ্রীমি। কেবল সিজদার আয়াত পাঠ করা মাকরূহ নয়। তবে দু'একটি আয়াত আগে বা পরে মিলালে উত্তম। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ শ্রবণকারীগণ সিজদার সম্মান করলে এবং সিজদা যদি তাদের নিকট ভারী না হয়– তখন আয়াত উচ্চস্বরে পড়া উত্তম। নতুবা ধীরে ধীরে পড়বে। শ্রোতাদের অবস্থা জানা না থাকলে তারা আন্তরিক কি না? তখন চুপে চুপে ধীরে পড়া উত্তম। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সিজদার আয়াত পাঠ হয়েছে কিন্তু কাজের ব্যস্ততার কারণে শুনতে পায়নি তখন বিশুদ্ধ মতে সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু অনেক আলেম বলেছেন যদিও শুনতে না পায় সিজদাহ্ ওয়াজিব হয়েছে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাঃ যে উদ্দেশ্যে এক মজলিসে সিজদার সব আয়াত পাঠ করে সিজদাহ্ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার সব উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন। এক এক আয়াত পাঠ করে সিজদাহ্ করুক বা সবগুলো আয়াত পাঠ করে শেষে চৌদ্দটি সিজদাহ্ করুক। (গুনীয়া, দুর্রুল মোখতার, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ জমিনে সিজদার আয়াত পাঠ করেছে এ সিজদাহ্ বাহনের উপর করা যাবে না। তবে ভয়ানক অবস্থায় করা যাবে। বাহনের উপর সিজদার আয়াত পাঠ করলে সফরের অবস্থায় বাহনের উপর সিজদাহ্ করা যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অসুস্থাবস্থায় ইশারায় সিজদাহ্ করলে আদায় হয়ে যাবে। এভাবে সফরে বাহনের উপর ইশারায় করলে আদায় হবে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ জুমা, দুই ঈদ এবং প্রকাশ্যে কেরাতবিহীন নামাযে যে নামাযে বড় জামাত হয় এসব ক্ষেত্রে সিজদার আয়াত পাঠ করা ইমামের জন্য মাকরূহ। তবে আয়াতের পর দ্রুত রুকু সিজদাহ্ করলে এবং রুকুতে নিয়ত না করলে মাকরূহ হবে না। (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মিম্বরের উপর সিজদার আয়াত পাঠ করেছে পাঠকারী ও শ্রবণকারীর উপর সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। যারা শুনেনি, তাদের উপর ওয়াজিব নয়। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

শুকরিয়া সিজদার কতিপয় স্থান

মাসআলাঃ শুকরিয়া সিজদাহ্ যেমন সন্তান জন্ম হলে, সম্পদ অর্জন হলে, অথবা হারানো বস্তু পাওয়া গেলে অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য হলে, মুসাফির ফিরে আসলে, এভাবে যে কোন নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় সিজদাহ্ করা মুস্তাহাব আর এ সিজদায়ে শুকর এর নিয়ম তেলাওয়াতে সিজদার অনুরূপ। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বিনা কারণে সিজদা করা যেমন অধিকাংশ জনসাধারণ করে থাকে এতে ছওয়াব নেই মাকরূহও নহে। (আলমগীরি)

মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থঃ এবং যখন তোমরা যমীনে সফর করো তখন তোমাদের এ'তে গুনাহ নেই যে, কোন কোন নামায কৃসর করে পড়বে যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফির তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। (সূরা নিসা- পারা-৫, আয়াত-১০১)

হাদীস (১) সহীহ্ মুসলিম শরীফে ইয়ালা বিন ওমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)র নিকট আরজ করলাম যে, আল্লাহ্ তায়ালা তো আয়াতে বলেছেনঃ

اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ, তোমরা নামায কৃসর করে পড়বে যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফির তোমাদেরকে কষ্ট দেবে।

এখন তো লোকেরা শান্তিতে নিরাপদে আছে। অর্থাৎ শান্তি অবস্থায় কসর না পড়া সমীচীন। তিনি বললেন, এতে আমিও আশ্চর্যবোধ করি। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাস করছি, তিনি এরশাদ করেছেন, এটা এক প্রকার

সাদকা, যা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর দান করেছেন, আর বললেন- আল্লাহর সাদকা গ্রহণ করো।

হাদীস (২) সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে হারেসা বিন ওহাব খাজায়ী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিনাতে দু'রাকাত নামায পড়ায়েছেন, অথচ আমাদের মধ্যে শান্তি এত অধিক পরিমাণ কখনো ছিল না।

হাদীস (৩) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় জোহরের নামায চার রাকাত পড়েছেন জুল হোলায়ফা স্থানে আসরের নামায দু'রাকাত পড়েছেন।

হাদীস (৪) তিরমিযী শরীফে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর ও একামত উভয় অবস্থায় নামায পড়েছি, মুকীম অবস্থায় হুজুরে সাথে জোহরের নামায চার রাকাত পড়েছি এরপর দু'রাকাত, সফরের মধ্যে জোহরের দু'রাকাত এরপর দু'রাকাত এবং আসরের দু'রাকাত এরপর নেই। মাগরিবে, মুসাফির ও মুকীম সর্বাবস্থায় সমানভাবে তিন রাকাত পড়েছি। সফর ও মুকীম কোন অবস্থায় মাগরিব নামাযে কসর করেননি, এরপর দু'রাকাত।

হাদীস (৫) বোখারী ও মুসলিম শরীফে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায দু'রাকাত ফরজ করা হয়েছে। অতঃপর যখন হুজুর হিজরত করলেন তখন চার রাকাত ফরজ করা হল, সফরের নামায প্রথমের ফরজকেই রাখা হল।

হাদীস (৬) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামের একামতে চার রাকাত ফরজ করেছেন, সফরের মধ্যে দু'রাকাত, ভয়কালীন এক অর্থাৎ ইমামের সাথে।

হাদীস (৭) ইবনে মাজাহ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফরের দু'রাকাত নামায নির্ধারণ করেছেন এবং এটা হল পূর্ণ। কম নয়। যদিও বাহ্যিকভাবে দু'রাকাত কম হয়েছে কিন্তু ছওয়াবে দু'রাকাত চার রকাতের সমান।

মুসাফির কাকে বলে? মুসাফিরের বিধানাবলী

ফিকহী মাসায়েলঃ শরীয়তে ঐ ব্যক্তি মুসাফির যে তিন দিনের পথ পর্যন্ত গমনের উদ্দেশ্যে এলাকা থেকে বের হয়।

মাসআলাঃ এখানে দিন বলতে বছরের সবচেয়ে ছোট দিনটাই উদ্দেশ্য। তিন দিনের পথ বলতে এটা বুঝানো হয়নি যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকা। পানাহার, নামায এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পন্ন করার জন্য অবস্থান করাতো জরুরী। বরং এর দ্বারা দিনের অধিকাংশকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সুবহে ছাদেক থেকে দ্বিপ্রহর অতিক্রম করা পর্যন্ত চলার পর যাত্রা বিরতি করল, এভাবে দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন যাত্রার পর যতটুকু পথ অতিক্রম করবে সেটাকে সফরের দূরত্ব গণ্য করা হবে।

দ্বিপ্রহর অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত চলা বলতেও অবিরাম চলাকে বুঝানো হয়নি। বরং সাধারণতঃ যতটুকু আরাম করা চাই মাঝপথে ততটুকু পরিমাণ আরামও করা যাবে। চলন বলতে স্বাভাবিক চলন বুঝাবে বেশী দ্রুতও নয় অতি ধীর গতিও নয়।

শুষ্ক অবস্থায় মানুষও উটের স্বাভাবিক মধ্যম ধরনের চলনই ধর্তব্য। পাহাড়ী রাস্তাও সে হিসাবে হবে যেটা এর জন্য প্রযোজ্য। সমুদ্রে সে সময়কার নৌকার চলনকে ধরতে হবে। যখন বাতাস একেবারে বন্ধও না থাকে প্রচণ্ড জোরেও প্রবাহিত না হয়। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ বছরের ছোট দিন ঐ স্থানে বিবেচ্য হবে, যেখানে দিন রাত স্বাভাবিক থাকে। অর্থাৎ ছোট দিনের অধিকাংশে গন্তব্য অতিক্রম করা যায়, বিধায় যেসব শহরে দিন একেবারে ছোট হয় যেমন বলগার ওখানে দিন অতি ছোট হয়ে থাকে। বিধায় সেখানকার দিন ধর্তব্য নয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সফরের ক্ষেত্রে মাইল বিবেচ্য নয়। কারণ মাইল বড় ছোট হয়ে থাকে বরং তিন মনযিলই বিবেচ্য। শুষ্ক মৌসুমে মন্জিলের হিসেবে সাড়ে সাতান্ন মাইল হচ্ছে সফরের দূরত্বের পরিমাণ। (ফতোওয়ায়ে রিজভীয়া)

মাসআলাঃ কোন জায়গায় গমনের দু'টি পথ রয়েছে, একটি দিয়ে সফর দূরত্ব বেশী দ্বিতীয়টি দিয়ে দূরত্ব বেশী নয়। যে রাস্তা দিয়ে যাবে সেটা বিবেচ্য। নিকটতম রাস্তা দিয়ে গমন করলে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে না। দূরবর্তী পথ দিয়ে গমন

করলে মুসাফির হবে। যদিও রাস্তা গ্রহণের ক্ষেত্রে তার কোন সঠিক উদ্দেশ্য ছিল না। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন স্থানে গমনের দু'টি পথ রয়েছে একটি সমুদ্র পথে অপরটি স্থলপথ। এর মধ্যে একটি দু'দিনে অতিক্রম করা যায় অন্যটি তিনদিনে অতিক্রম করা যায়। তিন দিনের রাস্তা দিয়ে গমন করলে তখন মুসাফির হবে। নতুবা হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ তিন দিনের পথকে যদি কোন অলী স্বীয় কেরামত দ্বারা স্বল্প সময়ে অতিক্রম করলেও বাহ্যিকভাবে মুসাফিরের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ইমাম ইবনে হুমান তাকে মুসাফির বলা অসম্ভব বলেছেন। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নিছক সফরের নিয়ত করলে মুসাফির হয় না। বরং মুসাফির তখনই বলা যাবে, যখন নিজ লোকালয়ের বাইরে চলে যাবে। শহর হলে শহরের বাইরে চলে যাওয়া গ্রাম হলে গ্রামের বাইরে চলে যাওয়া। শহরবাসীর জন্য শহরের নিকটে যে শহরতলী আছে সেখান থেকেও বাইরে যেতে হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ শহরতলীর সাথে যেসব গ্রাম সংযুক্ত শহরবাসীর জন্য সেসব গ্রাম থেকে বের হয়ে যাওয়া জরুরী নহে। এভাবে শহরের নিকটে যদি বাগান থাকে যদিও এর তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বশীর এর মধ্যে অবস্থান করে বাগান থেকে তাদের বের হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ শহরতলী, অর্থাৎ শহরের বইরে যেসব জায়গা শহরের কাজে ব্যবহৃত যেমন কবরস্থান, ঘোড়া দৌড়ানোর ময়দান, তীর নিক্ষেপের স্থান, এসব যদি শহরের নিকটে হলে এর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জরুরী। শহর ও শহরতলীর মাঝখানে যদি দূরত্ব হয় বেরিয়ে যাওয়া জরুরী নয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ লোকালয়ের বাইরে যাওয়া বলতে এটা বুঝানো হচ্ছে যে, যেদিকে গমন করা হচ্ছে সেদিকে যেন লোকালায় শেষ হয়ে যায়। যদিও এর অভ্যন্তরে অন্যদিকে লোকালয় শেষ না হয়। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ কোন এলাকা প্রথমে শহরের সাথে সংযুক্ত ছিল যখন পৃথক হয়ে গেল তখন ওখান থেকেও বেরিয়ে যাওয়া জরুরী। যেসব এলাকা বিরান হয়ে গেছে প্রথমে শহরের সাথে সংযুক্ত ছিল এরকম হোক অথবা এখনো সংযুক্ত আছে এমন

এলাকা থেকে বের হওয়া শর্ত নয়। (গুণীয়া, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যেখানে ষ্টেশন লোকালয়ের বাইরে তখন ষ্টেশনে পৌঁছলে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে। যখন সফরের দূরত্ব পরিমাণ গমনের ইচ্ছা থাকে।

মাসআলাঃ সফরের জন্য এটা জরুরী যে, যেখান থেকে সফর শুরু হচ্ছে ওখান থেকে তিনদিনের পথ উদ্দেশ্য হতে হবে। আর যদি দু'দিনের পথের উদ্দেশ্য বের হয়, ওখানে পৌঁছার পর অন্যস্থানে গমনে ইচ্ছা করলে সেটাও তিনদিনের চেয়ে কম পথ। এভাবে সারা পৃথিবী ঘুরে আসলে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে না। (গুণীয়া, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ সফরের জন্য এটাও শর্ত যে, তিনদিন লাগাতার সফরের উদ্দেশ্য হতে হবে। যদি এরকম উদ্দেশ্য করে যে, দু'দিনের পথ পৌঁছার পর কিছু কাজকর্ম করবে। এরপর আর একদিনের পথ অতিক্রম করবো তাহলে এটা তিনদিনের পথ লাগাতার অতিক্রম করার উদ্দেশ্য হলো না। বিধায় মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে না। (ফতওয়ায়ে রিজভীয়া)

মাসআলাঃ মুসাফিরের জন্য নামাযে কসর পড়া ওয়াজিব অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ দু'রাকাত পড়বে। মুসাফিরের ক্ষেত্রে দু'রাকাতই পূর্ণ নামায। ইচ্ছাকৃত চার রাকাত পড়লে এবং দু'টি বৈঠক করলেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে। শেষের দু'রাকাত নফল হয়ে যাবে। কিন্তু গুনাহগার ও আযাবের যোগ্য হবে। যেহেতু ওয়াজিব ত্যাগ করেছে। সুতরাং তওবা করবে। দু'রাকাতে বৈঠক বসেনি, ফরজ আদায় হয়নি। নফল হয়ে যাবে। তবে তৃতীয় রাকাতের সিজদাহ্ করার পূর্বে মুকীম হওয়ার নিয়ত করলে ফরজ বাতিল হবে না। কিন্তু কেয়াম ও রুকু পুনরায় করতে হবে। আর যদি তৃতীয় রাকাতের সিজদায় নিয়ত করে তখন ফরজ ভঙ্গ হবে। এভাবে যদি প্রথম দু'রাকাতে বা এক রাকাতে কেরাত না পড়লে নামায ফাসেদ হবে। (হেদায়া, আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফিরের কসরের সুযোগ সাধারণ, তার সফর জায়েয কাজের জন্য হোক অথবা নাজায়েয কাজের জন্য হোক– সর্বাবস্থায় মুসাফিরের বিধান তার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে।

মাসআলাঃ কাফির তিন দিনের পথের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। দু'দিন পর মুসলমান হল, তারজন্য কসর প্রযোজ্য। অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিনদিনের পথের উদ্দেশ্য

বের হয়েছে রাস্তায় প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে, ওখান থেকে যেখানে যেতে চায় তিনদিনের রাস্তা না হলে তখন নামায পূর্ণ পড়বে। ঋতুবর্তী মহিলা পবিত্র হয়েছে, ওখান থেকে তিন দিনের রাস্তা হয়নি, তখন কসর করবে না। পূর্ণ পড়বে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ বাদশাহ্ প্রজাদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য রাষ্ট্রে সফর করলে কসর পড়বে না। যদি প্রথমে তিন মনযিল অতিক্রম করা উদ্দেশ্য না হয়, আর যদি অন্য কোন কারণে হয় এবং দূরত্ব যদি সফর পরিমাণ হয়, তখন কসর পড়বে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ সুন্নত নামাযে কসর নেই। বরং পূর্ণ পড়তে হবে। অবশ্য ভয়ের সময় বা কোথাও যাত্রাপথে ক্ষমাযোগ্য। নিরাপদ অবস্থায় সুন্নত পড়তে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসাফির তখনই মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ নিজ এলাকায় পৌঁছে না যাবে। অথবা লোকালয়ে 'পনেরদিন অবস্থানের নিয়ত না করবে। এটা তখনই হবে যদি তিনদিনের রাস্তা অতিক্রম করে যদি তিন মনযিল পৌঁছার পূর্বেই ফিরে আসার ইচ্ছা করল, তখন মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে না। যদিও জঙ্গলে হোক। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

একামত বা অবস্থানের নিয়তের শর্তাবলী

মাসআলাঃ অবস্থানের নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(১) যাত্রা ত্যাগ করা, চলমান অবস্থায় অবস্থানের নিয়ত করলে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে না।

(২) যে জায়গায় অবস্থান করবে সেটা অবস্থানের উপযোগী হওয়া, জঙ্গল, সমুদ্র বা অনাবাদী জায়গায় অবস্থানের নিয়ত করলে মুকীম হবে না।

(৩) পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করতে হবে, এরকম অবস্থানের নিয়ত করলে মুকীম হবে না।

(৪) একই জায়গায় অবস্থানের নিয়ত করা। যদি দু'জায়গায় অবস্থানের ইচ্ছা করে যেমন এক জায়গায় দশদিন অন্য জায়গায় পাঁচদিন নিয়ত করলে মুকীম হবে না।

(৫) স্বীয় ইচ্ছা স্বাধীন হওয়া চাই, অর্থাৎ কারো অনুগত না হওয়া চাই।

(৬) তার অবস্থা তার উদ্দেশ্যের বিপরীত না হওয়া চাই। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির যাত্রাপথে আছে, এখনো শহরে বা গ্রামে পৌছেনি অবস্থানের নিয়ত করে নিল, তাহলে মুকীম হবে না। পৌছার পর নিয়ত করলে হবে। যদিও তখনও বাড়ী বা ঠিকানা অনুসন্ধানে আছে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসলিম সৈনিকগণ কোন জঙ্গলে যদি ফাঁড়ি স্থাপন করে এবং তাঁবু স্থাপন করে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করে মুকীম হবে না। আর যেসব লোক জঙ্গলে বসবাস করে ওরা যদি জঙ্গলে তাঁবু স্থাপন করে পনের দিনের নিয়ত করে অবস্থান করলে মুকীম হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো যে, ওখানে পানি ও খানা ইত্যাদি যেন নাগালে থাকে। আমাদের জন্য শহর ও গ্রাম যেরূপ ওদের জন্য জঙ্গল তদ্রুপ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ দু'জায়গায় পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করল,উভয়টি যদি স্বতন্ত্র হয়, যেমন মক্কা ও মিনা তাহলে মুকীম হবে না। আর যদি একটি অপরটির অধীনে হয় যেমন শহর ও শহরতলী তখন মুকীম হবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ এরূপ নিয়ত করল যে, দু'এলাকায় পনের দিন অবস্থান করবে। এক জায়গায় দিনে অবস্থান করবে। অন্য জায়গায় রাত্রে অবস্থান করবে। যেখানে দিবসে অবস্থানের ইচ্ছে করেছে ওখানে যদি প্রথমে যায় মুকীম হবে না। যেখানে রাতে অবস্থানের ইচ্ছা করেছে, ওখানে যদি প্রথমে যায় মুকীম হিসেবে গণ্য হবে। অতঃপর ওখান থেকে অন্য এলাকায় গমন করল, তখনও মুকীম হবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির যদি স্বীয় ইচ্ছায় স্বাধীন না হয়, তখন পনের দিন নিয়ত করলে মুকীম হবে না। যেমন যে স্ত্রীর মোহরে মোয়াজ্জল স্বামীর দায়িত্বে বাকী নেই সে স্ত্রী স্বামীর অধীন, তার স্বীয় নিয়ত অর্থহীন। গোলাম যদি মোকাতব বা চুক্তিবদ্ধ না হলে মালিকের অধীন। সেনাবাহিনী যারা বায়তুল মাল বা বাদশাহর পক্ষ থেকে খোরাকী লাভ করে থাকে তারা মালিকের অধীন, কর্মচারী তার মুনীবের অধীন আবদ্ধ লোক বন্দীকারীর অধীন, যে সম্পদশালীর উপর ভরণ-পোষণ অপরিহার্য, যে ছাত্র শিক্ষকদের পক্ষ থেকে খাদ্য লাভ করে সে শিক্ষকের অধীন, সুপুত্র স্বীয় পিতার অধীন, ওদের সবার নিয়ত অর্থহীন। বরং তারা যাদের অধীনস্ত ওদের নিয়তই বিবেচ্য। ওদের নিয়ত যদি অবস্থানের হয় অধীনস্ত অনুসারীও মুকীম হবে।

ওদের নিয়ত অবস্থানের নিয়ত নাহলে তারাও মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্ত্রীর অনাদায়ী মোহর বাকী থাকলে তার জন্য নিজকে বিরত রাখার অধিকার রয়েছে। এ সময় সে স্বামীর অধীন নয়। এভাবে মুকাতিব বা চুক্তিবদ্ধ গোলাম মালিকের অনুমতি ব্যতীত সফর করার অধিকার রয়েছে, যেহেতু সে অধীন নয়। যে সৈনিক, বাদশাহ অথবা বায়তুল মাল থেকে খোরাকী গ্রহণ করেন না সে বাদশাহর অনুগত বা অধীন নয়। যে শ্রমিক বাৎসরিক বা মাসিক হিসেবে নিযুক্ত নয় বরং দৈনিক হিসাবে তার নিযুক্তি দৈনিক কাজের উপর সে তার চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে বিধায় সে অধীন নয়। যে মুসলমানকে শত্রু বন্দী করেছে মনে হচ্ছে তিন দিনের পথে নিয়ে যাবে– তখন কসর পড়বে। আর যদি জানতে না পারে জিজ্ঞাস করবে বা বলবে সে অনুযায়ী আমল করবে। আর যদি না বলে তখন দেখতে হবে শত্রু যদি মুকীম হয় তখন পূর্ণ নামায পড়বে। মুসাফির হলে কসর পড়বে। এটাও জানা না গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনদিনের পথ অতিক্রম না করবে পূর্ণ পড়বে।

যার উপর জরিমানা অপরিহার্য হয়েছে সে সফরে ছিল গ্রেফতার হয়েছে। যদি গরীব হয় পনের দিনের মধ্যে আদায় করার ইচ্ছা আছে অথবা কোন ইচ্ছা নেই তখনও কসর পড়বে। আদায় না করার ইচ্ছা থাকলে তখন পূর্ণ পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ অনুসারীর উচিত যাকে অনুসরণ করছে তাকে জিজ্ঞাসা করা। সে যা বলবে তদানুযায়ী আমল করবে। যদি সে কিছু না বলে দেখতে হবে, সে মুকীম না কি মুসাফির। মুকীম হলে নিজকে মুকীম মনে করবে। মুসাফির হলে নিজকে মুসাফির মনে করবে। এটাও জানতে না পারলে তিন দিনের পথ অতিক্রম করার পর কসর পড়বে। এর পূর্বে পূর্ণ নামায পড়বে। আর যদি জিজ্ঞাস না করে তখন হুকুম অনুরূপভাবে যেরূপ জিজ্ঞাস করার পরও উত্তর পাওয়া না যায়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ অন্ধের সাথে কোন গ্রেফতারকারী যদি গমন করে সে যদি তার চাকর হয় তখন অন্ধ ব্যক্তির নিয়ত বিবেচ্য। নিছক অনুগ্রহ পূর্বক তার সাথে থাকলে তখন ওর নিয়তে বিবেচ্য। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে সৈনিক সর্দারের অনুগত ছিল, সৈনিক পরাজিত হলে এবং সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তখন অনুগত থাকবে না। বরং তার অবস্থানে ও সফরে স্বয়ং নিজ নিয়তই বিবেচ্য হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্রীতদাস মালিকের সাথে সফরে ছিল। মালিক কোন মুকীমের হাতে তাকে বিক্রি করে দিল এবং নামাযে সেটা তার জানা ছিল দু'রাকাত পড়লে পুনরায় পড়বে। এভাবে গোলাম নামাযে ছিল মালিক অবস্থানের নিয়ত করে নিল। অজ্ঞাতসারে যদি দু'রাকাত পড়ে পুনরায় পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্রীতদাস দু' ব্যক্তির মালিকানাধীন, দু'জনই সফরে রয়েছে একজন অবস্থানের নিয়ত করেছে অন্যজন করেনি। ক্রীতদাস থেকে সেবা নেয়ার পালা যদি ধার্য্য থাকে তখন মুকীমের পালার দিন চার রাকাত পড়বে এবং মুসাফিরের পালার দিন দু'রাকাত পড়বে। আর যদি পালা ধার্য্য না হয়, প্রত্যেক দিন চার রাকাত পড়বে এবং দু'রাকাত পর বৈঠক ফরজ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে অবস্থানের নিয়ত করেছে কিন্তু তার অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে পনর দিন অবস্থান করবে না, তখন নিয়ত শুদ্ধ হবে না। যেমন হজ্বে গেল জিলহজ্বের শুরুতে পনর দিন মক্কা মোয়াজ্জমায় অবস্থানের ইচ্ছা করল, এ নিয়ত অর্থহীন। হজ্বের যখন ইচ্ছা করেছে আরাফাত ও মিনাতে অবশ্যই যেতে হবে। তবুও কিভাবে এতদিন মক্কা মোয়াজ্জমায় অবস্থান করা যাবে! মিনা থেকে ফিরে এসে নিয়ত করলে শুদ্ধ হবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি কোথাও গমন করল, ওখানে পনের দিন অবস্থানের ইচ্ছা নেই। কিন্তু কাফেলার সাথে গমনের ইচ্ছা আছে এটাও নাজায়েয যে কাফেলা পনের দিন পর যাবে– তাহলে সে মুকীম। যদিও অবস্থানের নিয়ত নেই। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির কোন কাজের জন্য অথবা সাথীদের অপেক্ষায় দু'চার দিন বা তের চৌদ্দ দিনের নিয়তে অবস্থান করেছে, ইচ্ছে করছে কাজ হয়ে গেলে চলে যাবে, উভয় অবস্থায় আজকাল করতে করতে বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায় তখন মুসাফির থাকবে। নামায কসর পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসলিম সৈন্যরা কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে গেল, অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রে কোন দুর্গ অবরুদ্ধ করল, তখনও মুসাফির থাকবে। যদিও পনের দিনের নিয়ত করেছে, যদিও প্রকাশ্য জয়লাভ করে। এভাবে যদি মুসলিম রাষ্ট্রে বিদ্রোহীদের অবরুদ্ধ করল মুকীম হবে না। যে ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা নিয়ে গমন করেছে এবং পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করেছে, তখন চার রাকাত পড়বে।

(গুনীয়া, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ দারুল হরব বা অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী ওখানে মুসলমান হয়ে গেল, কাফিরগণ ওকে হত্যা করার চিন্তায় আছে। সে ওখান থেকে তিন দিনের পথে ইচ্ছা করে পলায়ন করেছে তখন নামায কসর করবে। কোথাও দু'এক মাসের জন্য আত্মগোপন করে তখনও কসর পড়বে। যদি সে শহরে আত্মগোপন করে তখন নামায পূর্ণ পড়বে। মুসলমান যদি দারুল হরব বা অমুসলিম রাষ্ট্রে বন্দী ছিল ওখান থেকে পালিয়ে কোন গুহায় আত্মগোপন করেছে তখন কসর পড়বে, যদিও পনের দিনের ইচ্ছা করে।

দারুল হরবে বা অমুসলিম রাষ্ট্রের শহরে বসবাসকারীর সকলে যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং অমুসলিম যোদ্ধারা তাদের সাথে যদি লড়তে চায়, তখন তারা সকলে মুকীম হবে। এভাবে কাফেরদের শহরে যদি বিজয় হয় এবং ওসব লোক শহর ছেড়ে একদিনের পথে চলে গেছে, তখনও মুকীম হবে। যদি তিনদিনের ইচ্ছা করে তখন মুসাফির। আবার ফিরে আসলে এবং কাফেররা ওদের শহর দখল করেনি, তখন মুকীম হবে। শহরে যদি মুশরিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায় ওখানে বসবাস করছে, কিন্তু মুসলমাগণ ফিরে এসে তাদেরকে ছেড়ে দিল মুসলমানগণ যদি ওখানে থাকতে চায় এটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হল, নামায পূর্ণ করবে। আর যদি ওখানে থাকতে ইচ্ছা না করে বরং শুধুমাত্র একমাস বা অর্ধ মাস অবস্থান করে মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাবে তখন কসর পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসলিম সৈন্যরা অমুসলিম রাষ্ট্রে গমন করল এবং বিজয় লাভ করেছে, সে শহরকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করছে তখন কসর পড়বে না। যদি নিছক দু'এক মাস বসবাসের ইচ্ছা করে তাহলে কসর পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসাফির নামাযের মধ্যে অবস্থানের নিয়ত করেছে, এ নামাযও পূর্ণ পড়বে। অবস্থা এরূপ হল যে, এক রাকাত পড়তে সময় শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় রাকাতে অবস্থানের নিয়ত করেছে। তখন এ নামায দু'রাকাতই পড়বে। এরপর চার রাকাত পড়বে। মুসাফির লাহিক মুক্তাদি ছিল, ইমাম ও মুসাফির ছিল ইমামের সালামের পর অবস্থানের নিয়ত করলে তখন দু'রাকাতই পড়বে। ইমামের সালামের পূর্বে নিয়ত করলে চার রাকাত পড়বে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ আদা ও ক্বাযা উভয় নামাযে মুকীম মুসাফিরের পিছনে এক্তেদা করা যাবে। ইমামের সালামের পর নিজে বাকী দু'রাকাত পড়ে নেবে। ওসব রাকাতে মোটেও কেরাত পড়বে না। বরং সূরা ফাতেহা পরিমাণ সময় নীরবে দাড়িয়ে থাকবে। (দুর্রুল মোখতার)

মুসাফির মুকীমের এক্তেদা করল অথবা মুকীম মুসাফিরের এক্তেদা করল এর বিধান

মাসআলাঃ ইমাম হল মুসাফির, মুক্তাদি হল মুকীম, ইমামের সালামে মুক্তাদি দাড়িয়ে গেল, সালাম ফিরানোর পূর্বে ইমাম অবস্থানের নিয়ত করে নিল, মুক্তাদি তৃতীয় রাকাতের সিজদা না করে থাকলে ইমামের সাথে হয়ে যাবে। অন্যথায় নামায ভঙ্গ হবে। তৃতীয় সিজদার পর ইমাম অবস্থানের নিয়ত করল, তখন অনুসরণ করবে না। অনুসরণ করলে নামায ভঙ্গ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ এটা প্রথমে জানা গেছে যে, এক্তেদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত, ইমাম মুকীম না মুসাফির সেটা জানতে হবে। নামায শুরু করার সময় জানা হোক বা পরে হোক। ইমাম মুসাফির হলে নামায শুরু করার সময় বলে দেয়া চাই। শুরুতে না বললে নামাযের পর বলে দেবে যে, আমি মুসাফির তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ করো। (দুর্রুল মোখতার)

শুরুতে বললেও পরেও বলে দেবে যেন সেসময় যারা উপস্থিত ছিল না তারাও জানতে পারে।

মাসআলাঃ সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর মুসাফির মুকীমের এক্তেদা করতে পারবে না। সময়ের মধ্যে পারা যাবে। এ অবস্থায় মুসাফিরের ফরজও চার রাকাত হয়ে গেল, এ হুকুম চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের জন্য। যেসব নামাযে কসর নেই ওসব নামাযে সময় ও সময়ের পর উভয়াবস্থায় এক্তেদা করা যাবে। সময় থাকাবস্থায় এক্তেদা করেছিল নামায পূর্ণ করার পূর্বে সময় শেষ হয়ে গেল, তখনও এক্তেদা শুদ্ধ হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির মুকীমের এক্তেদা করল, ইমামের মজহাব মতে ওটা ক্বাযা মুক্তাদির মযহাব মতে ওটা আদা, যেমন ইমাম হচ্ছে শাফেয়ী মতাবলম্বী, মুক্তাদি হানফী মতাবলম্বী।

মূল ছায়ার একগুণ পর জোহরের নামাযে একে অন্যের পিছনে আদায় করেছে এক্তেদা শুদ্ধ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির মুকীমের পিছনে নামায শুরু করে ফাসেদ করে দিল, তখন দু'রাকাতই পড়বে। অর্থাৎ যখন একাকী পড়বে বা কোন মুসাফিরের এক্তেদা করলে তখন দু'রাকাত পড়বে যদি পুনরায় কোন মুকীমের এক্তেদা করে তখন চার রাকাত পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির মুকীমের এক্তেদা করেছে তখন মুক্তাদির উপরও প্রথম বৈঠক ওয়াজিব হয়ে গেছে ফরজ রইল না। ইমাম যদি বৈঠক না করে নামায ফাসেদ হবে না আর যদি মুকীম মুসাফিরের এক্তেদা করে তখন মুক্তাদির উপরও প্রথম বৈঠক ফরজ হয়ে গেল। (রদ্দুল মোখতার, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ কসর এবং পূর্ণ পড়ার ক্ষেত্রে শেষ সময়ই বিবেচ্য যদি না পড়ে থাকে। কেউ নামায পড়েনি সময় এতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, আল্লাহ আকবর বলা যাবে, মুসাফির হয়ে যাবে। তখন কসর করবে। মুসাফির ছিল এমতাবস্থায় অবস্থানের নিয়ত করল তখন চার রাকাত পড়বে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ জোহর নামায ওয়াক্ত অনুযায়ী পড়ার পর সফর করল এবং আসরের দু'রাকাত পড়েছে, অতঃপর কোন প্রয়োজনে স্বীয়স্থানে ফিরেএল, এখনো আসরের সময় অবশিষ্ট রয়েছে। অবগত হল যে, উভয় নামাযই অজুহীন পড়া হয়েছে, তখন জোহরের দু'রাকাত পড়বে। আসরের চার রাকাত পড়বে। আর যদি জোহর ও আসর পড়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে সফর করে এবং অবগত হয় যে, উভয় নামাযই অজুহীন পড়েছে। তখন জোহরের চার রাকাত পড়বে। অসরের দু'রাকাত পড়বে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফিরের সাহু হল, দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরানোর পর অবস্থানের নিয়ত করল, এ নামাযের মধ্যে মুকীম হবে না। সাহু সিজদা রহিত হবে। সিজদা করার পর অবস্থানের নিয়ত করলে শুদ্ধ হবে এবং চার রাকাত পড়া ফরজ যদিও একটি সিজদার পর নিয়ত করে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসাফির ব্যক্তি মুসাফিরদের ইমামতি করেছে নামাযের মধ্যে অজুহীন হয়ে পড়ল, অন্য কোন মুসাফিরকে খলিফা নিযুক্ত করল, খলিফা অবস্থানের নিয়ত করল, তখন এর পিছনে যেসব মুসাফির রয়েছে ওদের নামায দু'রাকাত থাকবে।

এভাবে যদি মুকীমকে খলিফা নিযুক্ত করে তখনও মুসাফির মুক্তাদি দু'রাকাতই পড়বে। আর যদি ইমাম অজু ভঙ্গের পর মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে ইকামতের নিয়ত করলে তখন চার রাকাত পড়বে। (আলমগীরি)

ওয়াতনে আছলী ও ওয়াতনে একামতের বর্ণনা

মাসআলাঃ মাতৃভূমি দু'প্রকার, এক প্রকার আসল অবস্থানের জায়গা, দুই- সাময়িক অবস্থানের জায়গা। আসল অবস্থানের জায়গা হচ্ছে যেটা নিজ জন্মস্থান। অথবা নিজ পরিবারের লোকেরা যেখানে বসবাস করে। অথবা ওখানে বসবাস করছে সেখান থেকে যাবে আর যাবে না বলে সংকল্প করেছে।

সাময়িক অবস্থানের জায়গা হচ্ছে যেখানে মুসাফির পনের দিন বা ততোধিক সময় ওখানে অবস্থানের ইচ্ছা করেছে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসাফির কোথাও বিবাহ করলে যদিও বা ওখানে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করে মুকীম হয়ে যায়। যে দু'শহরে তার স্ত্রী বসবাস করছে ঐ দু'স্থানে পৌছা মাত্রই মুকীম হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তির আসল জায়গা একটি। এখন সে অন্যস্থানে বসবাস শুরু করলো যদি প্রথম স্থানে সন্তান-সন্ততি বিদ্যমান থাকে তখন উভয় জায়গা আসল জ ায়গা হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় প্রথম জায়গাটি আসল জায়গা গণ্য হবে না। উভয় জায়গার দূরত্ব সফর পরিমাণ হোক বা না হোক। (দুর্রুল মোখার)

মাসআলাঃ এক অবস্থানের জায়গা অন্য অবস্থানের জায়গাকে বাতিল করে দেয়, অর্থাৎ এক জায়গায় পনের দিনের অবস্থানের ইচ্ছা করলো, দ্বিতীয় জায়গায়ও পনের দিন অবস্থানের উদ্দেশ্য করলো, তাহলে প্রথম অবস্থানের জায়গাটি এখন অবস্থানের জায়গা হিসেবে গণ্য হবে না। এ দু'জায়গার মাঝখানে সফরের দূরত্ব থাকুক বা না থাকুক। এভাবে অবস্থানের জায়গা আসল জায়গা ও সফরের কারণে বাতিল হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি নিজ ঘরের লোকদের নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায় প্রথম জায়গায় স্থান ও আসবাব পত্র ইত্যাদি যদি মওজুদ থাকে সেটাও আসল জায়গা হিসেবে গণ্য হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অবস্থানের জায়গার জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, তিনদিনের সফরের

পর ওখানে অবস্থান করতে হবে। বরং সফরের সময়সীমা অতিক্রম করার পূর্বে অবস্থান করলে সেটাও অবস্থানের জায়গা হবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রাপ্ত বয়স্ক পিতা মাতা কোন শহরে বসবাস করছে, শহরটি তার জন্মস্থান নয়, ওদের পরিবারও ওখানে থাকে না, সে জায়গা তার জন্য স্থায়ী বসবাসের জায়গারূপে গণ্য হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির যখন আসল জায়গায় পৌছে যাবে সফর শেষ হয়ে যাবে। যদিও অবস্থানের নিয়ত না করে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্ত্রী বিবাহের পর শ্বাশুরালয়ে চলে গেল, সেখানে বসবাস শুরু করলো, তখন ওর বাপের বাড়ী মূল অবস্থান রইল না। অর্থাৎ শাশুর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী তিন মনযিল হয় তখন বাপের বাড়ী আসলে এবং পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করলে তখন কসর পড়বে। আর যদি বাপের বাড়ী অবস্থান ত্যাগ না করে বরং সাময়িকভাবে শ্বাশুরালয়ে থাকে তখন পিত্রালয়ে আসার সাথে সাথে সফর শেষ হয়ে যাবে এবং পূর্ণ নামায পড়বে।

মাসআলাঃ মহিলা মুহরেম ব্যতীত তিনদিন বা ততোধিক এর পথ গমন জায়েয নয়। বরং একদিনের পথ যাওয়াও সহীহ নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বা মতিভ্রম কারো সাথেও সফর করা যাবে না। প্রাপ্তবয়স্ক মুহরেম বা স্বামী সাথে থাকা আবশ্যক। (আলমগীরি)

মুহরেম শক্ত ফাসিক ও সীমাহীন অবাধ্য না হওয়া জরুরী।

জুমআ' ও জুমআ'র দিবসের ফজিলতের বর্ণনা

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যখন নামাযের জন্য আযান হয় জুমুআ'হ দিবসে, তখন আল্লাহর যিক্‌রের দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো। (সূরা জুম'আহ, ১৮ পারা, আয়াত-৯)

জুমআ'র দিবসের ফযীলত

হাদীস (১-২) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমরা হলাম সর্বশেষ আগমনকারী অর্থাৎ পৃথিবীতে আগমনের দিক থেকে আর কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী পার্থক্য হল যে, তাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দান করা হয়েছে আমাদেরকে তাদের পর কিতাব দেয়া হয়েছে। এ জুমআর দিনটি ওদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, অর্থাৎ তারা যেন এদিনটিকে সম্মান করে। কিন্তু তারা দিনটির ব্যাপারে মতভেদ করল আর আল্লাহ্ তায়ালা এ ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন, ফলে এ ব্যাপারে অন্যান্য লোকেরা আমাদের পিছনে রইল, ইয়াহুদীগণ পরের দিন (শনিবার)কে এবং নাসারাগণ তার পরদিন (রবিবার)কে নির্ধারণ করল।

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আছে হযরত হুজায়ফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আমরা পরবর্তী আগমনকারীরাই কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী হব, কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিকুলের পূর্বে প্রথমে আমাদের ফায়সালা হয়ে যাবে।

হাদীস (৩) মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যেদিনগুলোতে সূর্য উদয় হয় তম্মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুমআর দিন। এ দিনই হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনই তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করানো হয়েছে এদিনই তাঁর প্রতি জন্নাত থেকে বের হওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে এবং জুময়ার দিনই কিয়ামত সংগঠিত হবে।

হাদীস (৪-৫) আবু দাউদ, নাসঈ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী শরীফে আউস বিন আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের সকল দিন হতে জুমআর দিনই শ্রেষ্ঠ। এতে হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে, উক্ত দিবসে তাঁর ওফাত হয়েছে, এ দিবসেই বিশ্ব ধ্বংসের জন্য সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সুতরাং এদিনে আমার উপর বেশী করে দরুদ পাঠ করবে। তোমাদর দরুদ নিশ্চয় আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের দরুদ আপনার নিকট কেমন করে উপস্থিত করা হবে। তখন তো আপনি ইন্তেকাল ফরমাবেন, হুজুর এরশাদ করেন, নবীদের শরীর (বিনষ্ট

করা) আল্লাহ্ তায়ালা জমিনের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, জুমআর দিনে আমার উপর অধিক দরুদ পাঠ কর, এটা প্রসিদ্ধ দিন এ দিনে ফেরেস্তারা উপস্থিত হয়ে আমার উপর দরুদ পাঠ করে তা উপস্থিত করা হয়। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম হুজুর ইন্তেকালের পরেও? এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা জমিনের উপর নবীদের শরীর ভক্ষণ করা (বিনষ্ট করা) হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী জীবিত। তাঁকে তথায় রিযিক দেয়া হয়।

হাদীস (৬-৭) ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনযির (রাঃ) ও ইমাম আহমদ হযরত সাদ বিন মুয়ায (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জুময়ার দিন সপ্তাহের সকল দিনের নেতা বা সর্দার এবং আল্লাহর নিকট অন্যান্য দিন হতে বড়। এদিন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ঈদুল আযহারও ঈদুল ফিতরের দিন হতেও সম্মানিত। এ দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে (১) এদিনে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেছেন (২) এদিনে আল্লাহ্ তাঁকে জমীনে প্রেরণ করেছেন (৩) এদিনে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)কে ওফাত দান করেছেন। (৪) এদিনে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে যে সময়ে আল্লাহর কোন বান্দা কোন কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয় তাকে তা দান করেন যদি তা কোন নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য না হয়। (৫) এদিনে কেয়ামত সংগঠিত হবে প্রত্যেক সম্মানিত ফেরেস্তা আকাশসমূহ, জমিন বাতাস, পাহাড় পর্বত ও সমুদ্র সবকিছুই জুমআর দিন ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

হাদীস (৮-১০) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জুমআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে কোন মুসলমান বান্দা যখন তা পাবে এবং এমন সময়ে যদি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কল্যাণের প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে তা দান করেন। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, সে সময়টি অতি সংক্ষিপ্ত। এখন রইল সে সময় কোনটি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে দু'টি বর্ণনা শক্তিশালী। একটি হলো এই যে, ইমাম খোতবার জন্য বসা হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়টি। এ হাদীসটি মুসলিম, আবু বুরদা বিন আবি মুসা থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয়টি হলো এ যে, সে মুহূর্তটি হচ্ছে জুমআর শেষ সময়টি। ইমাম মালেক আবু দাউদ, তিরমিযী নাসঈ, আহমদ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি তুর পর্বতের দিকে গেলামএবং কা'ব আখবার এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তার নিকট বসলাম, তিনি আমাকে তাওরাতের বর্ণনা পাঠ করে শুনালেন আমি তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাদীস সমূহ বর্ণনা করলাম, ওসব হাদীসের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে দিনগুলোতে সূর্যোদয় হয়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল, জুমআর দিন। এদিনে আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছ এদিনেই তাঁকে দুনিয়াতে অবতরনের নির্দেশ করা হয়েছে এদিনে তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, এদিনে তিনি ওফাত বরণ করেন, এদিনেই কিয়ামত সংগঠিত হবে। এমন কোন প্রাণী নেই জুমআ বারের ঊষার উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিয়ামতের বিভীষিকার আশংকায় উৎকণ্ঠ না থাকে মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত (অর্থাৎ আজই কিয়ামত হয় না কি? এ ভয়ে চিৎকার করতে থাকে) জুমআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কোন মুসলমান বান্দা নামায পড়া অবস্থায় উক্ত মুহূর্তটি পায় এবং আল্লাহ্ তায়ালার কাছে যে কোন বস্তু প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তায়ালা তাহা দান করেন এ কথা শুনে কা'ব বললেন এ জুমআ বৎসরে একবার আসে মাত্র। আমি বললাম না প্রত্যেক জুমআ বারেই আসে। তখন কা'ব তওরাত পাঠ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্যিই বলেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং কা'ব আখবারের সাথে আমার বৈঠকের ঘটনা এবং জুমআ সম্পর্কে তাঁর সাথে যা আলোচনা করেছি তা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম এবং বললাম, কা'ব বলেছেন, ঐ মুহূর্তটি প্রত্যেক বৎসরের মাত্র এক জুমআয় আসে। তখন আবদুল্লাহ্ বিন সালাম বললেন, কা'ব ভুল বলেছে, তখন আমি তাঁকে (আবদুল্লাহকে) বললাম। অতঃপর কা'ব তাওরাত পাঠ করলেন এবং বললেন, না। ঐ মুহূর্তটি প্রত্যেক জুমআবারেই আসে। তখন আবদুল্লাহ্ বিন সালাম বললেন, কা'ব সত্য কথাই বলেছে। এরপর আবদুল্লাহ্ বিন সালাম বললেন, সে মুহূর্তটি কি তা তুমি অবগত আছো, অনুগ্রহ পূর্বক তা আমাকে অবহিত করুন। কার্পণ্য করো না। বললেন, জুমআর দিনের শেষ মুহূর্তটি আমি জিজ্ঞেস করলাম, জুমআর দিনের শেষ মহূর্তটি কিভাবে হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, যদি কোন মুসলমান বান্দা সে মুহূর্তটি নামাযরত অবস্থায় পায় (এবং ওটা নামাযের সময় নয় আসরের পর কোন নামায পড়া মাকরূহ) তখন আবদুল্লাহ্ বিন সালাম বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম কি এ কথা বলেননি যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে সে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে থাকে যতক্ষণ না সে ঐ নামায সম্পন্ন করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, বলেছেন এটা হচ্ছে ওটাই অর্থাৎ নামাযের অপেক্ষায় থাকাকেই নামায পড়া অর্থে বুঝানো হয়েছে।

জুমআ'র দিন এমন একটি সময় আছে যখন দোআ কবুল হয়

হাদীস (১১) তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জুমআ বারের সে সময়টি যখন দোআ কবুল হওয়ার আশা করা যায়, তা আসর হতে সূর্যাস্ত সময়ের মধ্যে তালাশ কর।

হাদীস (১২) তবরানী আওসাতে হাসন সূত্রে হযরত আনস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা কোন মুসলমানকে জুমআর দিনে ক্ষমা করা ব্যতীত ছেড়ে দেন না।

হাদীস (১৩) আবু ইয়ালা হযরত আনস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জুমআ বারের দিনে ও রাত্রে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এমন কোন ঘন্টা নেই যে সময় আল্লাহ্ তায়ালা জাহান্নাম থেকে ছয় লক্ষ জাহান্নামীকে মুক্তি দেন না। যাদের উপর জাহান্নাম অবধারিত হয়েছিল।

জুমআ'র দিনে বা-রাতে মারা যাওয়ার ফজিলত

হাদীস (১৪) আহমদ ও তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মুসলমান জুমআবারের দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।

হাদীস (১৫) আবু নঈম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জুমআবারের দিনে বা রাতে যে মৃত্যুবরণ করবে, কবরের শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করা হবে। কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে তার উপর শহীদদের মোহর থাকবে।

হাদীস (১৬) হোমাঈদ তারগীবে আয়াস বিন বুকাইর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে জুমআর দিনে মৃত্যুবরণ করবে, তার জন্য শহীদের পূণ্য লিখা হবে এবং কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।

হাদীস (১৭) আতা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মুসলমান পুরুষ বা মুসলমান নারী জুমআবারের দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করবে, কবরের শাস্তি এবং কবরের ফিৎনা থেকে তাঁকে রক্ষা করা হবে। আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ হবে তার কোন হিসাব হবে না এবং তার সাথে সাথী থাকবে যারা তার জন্য সাক্ষ্য দেবে। অথবা মোহর থাকবে। হাদীস (১৮) বায়হাকী শরীফে হযরত আনস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুমআবারের রাত উজ্জ্বল রাত্রি জুমআর দিন জ্যোতিময় দিন ।

হাদীস (১৯) তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একদা নিম্ন আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অথঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম। (সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-৩)

এমন সময় তাঁর নিকট একজন ইয়াহুদী উপস্থিত ছিল, সে বলল, এ আয়াত যদি আমাদের উপর নাযিল হত তবে আমরা নাযিলের দিনকে ঈদের দিন বানাতাম। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, এ আয়াত এমন দিনে নাযিল হয়েছে যেদিনটি দু'টি ঈদের দিন ছিল। অর্থাৎ একদিকে জুমআর দিন অপরদিকে আরাফাতের দিন। অর্থাৎ ঐদিনকে ঈদের দিন করা আমাদের প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ তায়ালা যেদিনে আয়াতটি নাযিল করেছেন যে দিনে দুটি ঈদ ছিল জুমআ ও আরফা এ দু'টি দিন মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন দিনটি ছিল জুমআর দিন এবং জিলহজ্জের নবম তারিখ।

জুমআ'র নামাযের ফজিলত

হাদীস (২০) মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযু করবে এবং উত্তমরূপে অযু সম্পন্ন করবে অতঃপর জুমআর

নামাযের জন্য মসজিদে আসবে এবং মনযোগ সহকারে খোৎবা শুনবে এবং চুপচাপ থাকবে, তাঁর এ জুমআ হতে পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। বরং আরো অতিরিক্ত তিনদিনের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি খোৎবার সময় অথবা নামাযের মধ্যে কংকর বালি নাড়াচাড়া করল, সেও অযথা কাজ করল, অর্থাৎ খুৎবা শ্রবণকালে এতটুকু কাজও অযথা কাজের শামিল যে, কোন কংকর পড়ে থাকবে তা সরায়ে দেয়া।

হাদীস (২১) তবরানী শরীফে হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জুমআ হচ্ছে কাফ্ফারা স্বরূপ। এক জুমআ থেকে অপর জুমআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ। বরং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। এটা এজন্য যে, আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন, যে একটি উত্তম কাজ করবে, তাঁর দশগুণ পাবে।

হাদীস (২২) ইবনে খাব্বান স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবীকরীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, একদিনে যে ব্যক্তি পাঁচটি কাজ করবে, তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাত লিপিবদ্ধ করবেন। (১) যে রুগ্ন ব্যক্তির সেবা শশ্রুষা করবে (২) জানাযা নামাযে উপস্থিত হবে (৩) রোজা রাখবে (৪) জুমআর নামাযে গমন করবে (৫) গোলাম মুক্ত করবে।

হাদীস (২৩) তিরমিযী সহীহ্ ও হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, ইয়াযিদ বিন মরিয়ম বলেন, আমি জুমআর নামাজে গমন করছিলাম ইবায়া বিন রেফায়ার সাথে সাক্ষাৎ হল, তিনি বললেন, তোমার জন্য শুভ সংবাদ, তোমার এ পথ চলা আল্লাহ্র পথে। আমি আবু আবসকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তির পদযুগল আল্লাহ্র পথে চলার ধুলাবালি যুক্ত হবে, তা আগুনের জন্য হারাম করা হয়েছে। বোখারী শরীফের বর্ণনায় এটুকু আছে যে, আবায়া বলেন, আমি জুমআয় গমন করছিলাম পথিমধ্যে আবু আবসের সাক্ষাৎ হলে তিনি হুজুরের এরশাদ শুনালেন।

জুমআ' বর্জনকারীর শাস্তির বর্ণনা

হাদীস (২৪-২৬) মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রাঃ) হতে নাসঈ ও ইবনে মাজা শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, লোকেরা হয়তঃ

জুমআর নামায তরক করা হতে বিরত থাকবে। নতুবা আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করবেন। অতঃপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীস (২৭-৩১) এরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি অলসতা বশতঃ পরপর তিন জুমআর নামায ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্তরে মোহরাঙ্কিত করে দেবেন। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা দারেমী ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান, হাকেম, আবুল জাদ জুমাইরী থেকে ইমাম মালেক সাফওয়ান বিন সোলাইমান থেকে ইমাম আহমদ হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান। হাকেম বলেন, মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ। ইবনে খোজায়মা ও হাব্বানের বর্ণনায় আছে যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমআ তরক করে সে মুনাফিক। রযীন এর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক নেই। তবরানীর বর্ণনায় উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তাঁকে মুনাফিকদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তাঁকে মুনাফিক হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে। যার লিখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তনও করা যায় না। আর একটি বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি পরপর তিন জুমআ ছেড়ে দিয়েছে, সে ইসলামকে পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করেছে। এ হাদীসটি আবু ইয়ালা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস (৩২) আহমদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ্ হযরত সামুরা বিন যুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমআর নামায তরক করে, সে যেন এক দিনার সাদকা করে যদি সমর্থ না হয় তবে অর্ধ দিনার দান করবে। এ দিনার সাদকা করা হয়তঃ এজন্য যে, যেন তাওবা কবুলের সহায়ক হয়, নতুবা প্রকৃতপক্ষে তওবা করা ফরজ।

হাদীস (৩৩) সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা পোষণ করেছি যে, আমি কোন ব্যক্তিকে আদেশ করব, সে আমার পরিবর্তে লোকদের নামায পড়াবে, অতঃপর আমি সেসব লোকদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিব, যারা জুমআর নামায হতে সরে থাকে।

হাদীস (৩৪) ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোৎবা দিলেন এবং বললেন, হে লোকেরা! মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি তওবা করা; দুনিয়াতে মগ্ন হওয়ার পূর্বে উত্তম কাজের প্রতি অগ্রগামী হও। অধিকভাবে আল্লাহর স্মরণ কর, তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যরূপে অধিক সাদকা দ্বারা তোমাদের প্রভুর সাথে কারবার স্থাপন কর। এরূপ করলে তোমাদের রিযিক দেয়া হবে, তোমাদের সাহায্য করা হবে। তোমাদের পরাজয় দূর করা হবে। জেনে রাখো! এ স্থানে এদিনে এ বৎসরে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর জুমআ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি আমার জীবদ্দশায় বা আমার পর তুচ্ছ মনে করে অথবা অস্বীকার বশতঃ জুমআর নামায তরক করে এবং তার জন্য যদি কোন ইমাম অথবা ইসলামী শাসক ন্যায়পরায়ণ অথবা অত্যাচারী হোক আল্লাহ্ তাআলা না তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা একত্র করবেন, না তার কাজে বরকত দান করবেন। সাবধান! তওবা না করা পর্যন্ত তার নামায, জাকাত হজ্ব, রোজা, ভাল কাজ কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন।

হাদীস (৩৫) দারে কুতনী শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে তার উপর জুমআর নামায ফরজ। তবে রুগ্ন ব্যক্তি মুসাফির, মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এবং ক্রীতদাস ব্যতীত। (আর যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি এদিনে) যে ব্যক্তি খেলাধুলা ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার দিক হতে বিমুখ থাকবেন, অথচ আল্লাহ্ স্বয়ং সমৃদ্ধ ও অধিক প্রশংসিত।

জুমআ'র দিনে গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করার ফজিলত

হাদীস (৩৬-৩৮) সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, পবিত্রতা অর্জনে যে সক্ষম পবিত্রতা অর্জন করবে, তৈল লাগাবে, ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করবে অতঃপর মসজিদের দিকে রওয়ানা হবে এবং দু'ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না। অর্থাৎ দু'ব্যক্তি বসা থাকলে তাদের সরায়ে মাঝখানে বসবে না এবং যে নামায তার জন্য নির্ধারিত তা পড়বে। অতঃপর ইমাম যখন খোৎবা পড়বে তখন চুপ করে শুনবে। নিশ্চয়ই তাঁর এ জুমআ ও পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ

মাফ করা হবে। আবু দাউদ (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস (৩৯-৪০) আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী হাসন সূত্রে নাসঈ, ইবনে মাজা ইবনে খোজায়মা, ইবনে খাব্বান, হাকেম, সহীহ সূত্রে আউসবিন আউস এবং তবরানী আওসাতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে জামা-কাপড় ধৌত করবে এবং নিজেও গোসল করবে এবং তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হবে এবং অগেভাগে মসজিদে গমন করবে এবং কোন কিছুতে আরোহন না করে পদব্রজে গমন করবে এবং ইমামের কাছাকাছি বসবে আর মনযোগ সহকারে ইমামের খোৎবা শ্রবন করবে এবং কোন অযথা, অনর্থক কাজ করবে না– তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসর দিনের বেলায় রোজা ও রাত্রের নফল নামাযের সওয়াব পাবে। অনুরূপ হাদীস অন্যান্য সাহাবা হতেও বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস (৪১) বোখারী, মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সাত দিনে এক দিন গোসল রয়েছে, এ দিনে মাথা ও শরীর ধৌত করবে।

হাদীস (৪২) আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী সামুরা বিন যুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যিনি জুমআর দিনে অযু করল, ভাল কাজ করল, যিনি গোসল করল, সে আরো অধিক উত্তম কাজ করল।

হাদীস (৪৩) আবু দাউদ, ইকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইরাক থেকে কিছু লোক আগমন করলেন, তারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জুমআর দিনে গোসল করা অপরিহার্য মনে করেন? বললেন, না, তবে হ্যাঁ এটি অধিক পবিত্রতা। যে গোসল করবে, তার জন্য ভাল। যে গোসল করবে না তার জন্য ওয়াজিব নয়।

হাদীস (৪৪) ইবনে মাজা, হাসান সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জুমআর দিনকে আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন করেছেন, যখন জুমআর দিন হবে, গোসল করবে, সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে।

হাদীস (৪৫) আহমদ, তিরমিযী হাসন সূত্রে বারা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মুসলমানদের উপর অবশ্যই কর্তব্য যে, জুমআর দিনে গোসল করবে ঘরে সুগন্ধি থাকলে সুগন্ধি লাগাবে, আর যদি সুগন্ধি না পায় তবে গোসলের পানিই তার সুগন্ধি।

হাদীস (৪৬-৪৭) তবরানী, কবীর ও আওসাতে হযরত ছিদ্দিক আকবর ও এমরান বিন হাসিন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করবে, তার গুনাহ ও পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। যখন সে জুমআর জন্য চলা শুরু করে তখন প্রতি পদক্ষেপে বিশটি সওয়াব লিখা হয়, অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রতি পদক্ষেপে বিশ বৎসরের আমল লিখা হয়, আর যখন নামায সম্পন্ন করেন তখন দুইশত বৎসরের আমলের সওয়াব পাবে।

হাদীস (৪৮) তবরানী, কবীরে নির্ভরযোগ্য সূত্রে হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুময়ার গোসল চুলের গোড়া থেকে গুনাহসমূহ টেনে বের করে আনে।

জুমআ'র জন্য প্রথমভাগে গমন করার সওয়াব এবং কাঁধের উপর অতিক্রম করার নিষিদ্ধতা

হাদীস (৪৯) বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মালেক, নাসাঈ ইবনে মাজাহ, প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ কনে, যে ব্যক্তি জুময়ার দিনে গোসল করবে, যেমন নাপাকীর অবস্থায় গোসল করে থাকে এবং প্রথমভাগে মসজিদে গমন করল; সে যেন উঠের কোরবানী দিল। আর যে দ্বিতীয় নম্বরে আসল, সে যেন গাভী কোরবানী করল, আর যে তৃতীয় নম্বরে আসল সে যেন শিং বিশিষ্ট ভেড়া কোরবানী করল, আর যে চতুর্থ নম্বরে আসল সে যেন মুরগী উত্তম কাজে খরচ করল, তারপর যে পঞ্চম নম্বরে আসলে, সে যেন একটি ডিম প্রেরণকারীর মত হল, অতঃপর ইমাম যখন খোৎবা দেয়ার জন্য বের হন, ফেরেস্তারা জিকর শুনার জন্য উপস্থিত হন।

হাদীস (৫০-৫২) বোখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজা শরীফের অপর বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন জুময়ার দিন হয়, তখন ফেরেস্তারা মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ান এবং মসজিদে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাজিরা গ্রহণ করেন। সকলের মধ্যে প্রথম আগমনকারী, তারপর পরবর্তীজন

অতঃপর পরবর্তীর সওয়াব– যা উপরের বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে। তা বর্ণনা করেন, অতঃপর ইমাম যখন খোৎবার জন্য বের হন, ফেরেস্তারা নিজেদের দপ্তর গুছিয়ে নেন এবং জিকর শুনতে থাকেন, অনুরূপ হাদীস হযরত সামুরা বিন যুন্দব (রাঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস (৫৩) ইমাম আহমদ ও তবরানী হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম খোৎবা দেয়ার জন্য বের হন, তখন ফেরেস্তারা দপ্তর গুছিয়ে নেন। কেউ তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করেছে, যে ব্যক্তি ইমাম বের হবার পর আসবে তার জুমা কি হবে না? বললেন, হ্যাঁ, হবে তবে তা ফেরেস্তার দপ্তরে লিখা হয়নি।

হাদীস (৫৪) যে ব্যক্তি জুময়ার সারিতে মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে পা মেরে সম্মুখ দিকে যাবে, সে জাহান্নামের দিকে পুল তৈরী করল। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজা মুয়ায বিন আনাস আল জুহানী (রাঃ) থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব, সকল মুহাদ্দিস ওলামাগণ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন।

হাদীস (৫৫) আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, আবদুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি লোকদের কাঁধের উপর পা মেরে সম্মুখ পানে যাচ্ছে, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোৎবা পাঠ করতেছিলেন. বললেন, বসে যাও, তুমি কষ্ট দিয়েছ।

হাদীস (৫৬) আবু দাউদ শরীফে আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জুমআর নামাযে তিন প্রকারের লোক উপস্থিত হয়, এক প্রকার হচ্ছে অযথা কাজের সাথে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এমন সব কাজ করে যাদ্বারা সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন খোৎবার সময় কথাবার্তা বলল, অথবা কংকর সরাল, জুমআ হতে সে তাই লাভ করবে। অর্থাৎ জুমআর উপস্থিতি বৃথা যাবে।

আর এক প্রকার লোক আছে যে দোয়ার সাথে উপস্থিত হয়। সে আল্লাহর প্রার্থনা করে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা দান করেন, আর ইচ্ছা না করলে বঞ্চিত করেন। আর এক প্রকার লোক আছে যে উপস্থিত হয় সন্তর্পনে নীরবতার সাথে। যে ব্যক্তি সম্মুখে যাবার জন্য কোন মুসলমানের ঘাঁড়ে কদম ফেলে

না, কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না– জুমআ তার গুনাহের কাফ্ফারা হবে। এ জুমআ হতে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সময়ের সকল সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা হবে। আরো অতিরিক্ত তিনদিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

টীকাঃ হাদীস শরীফে ।اتخذ جسرا। শব্দ এসেছে, এটি কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য দু'ভাবে পড়া যায়। উপরোক্ত অনুবাদ কর্তৃবাচ্যের ভিত্তিতে, কর্মবাচ্য হিসেবে পড়লে অর্থ এরূপ হবে যে তাঁকে স্বয়ং জাহান্নামের পুল বানানো হবে। অর্থাৎ যেভাবে সে মানুষের কাঁধের উপর পা দিয়ে সম্মুখপানে অতিক্রম করেছে, কেয়ামতের দিবসে মানুষ সেভাবে জাহান্নামে যাবার জন্য তাকে পুল হিসেবে ব্যবহার করবে। তার উপর চড়ে লোকেরা এগিয়ে যাবে।

ফিকহী মাসায়েলঃ জুমআ ফরযে আইন। এর ফরজটা জোহরের ফরয হতে অধিকতর দৃঢ়, তথা গুরুত্ত্ববহ। এর অস্বীকারকারী কাফির। (দুর্রুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

জুমআ' পড়ার শর্ত সমূহ

মাসআলাঃ জুমআ পড়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে। যদি এর মধ্যে একটি শর্তও পাওয়া না যায় জুমআ হবে না।

(১) শহর বা শহরতলী হওয়াঃ শহর এমন স্থানকে বলা হয়, যেখানে বিভিন্ন প্রকার অলিগলি ও বাজার থাকে এবং সেটা জেলা বা মহকুমা হবে, যার সাথে গ্রাম সংযুক্ত থাকে। সেখানে এমন কোন শাসক থাকে যিনি স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভাবে মজলুমের সুষ্ট বিচার জালিমের থেকে আদায় করে নিতে পারে। অর্থাৎ যিনি ন্যায় বিচারে যথার্থ সামর্থবান। যদিও বা যথাযথ বিচার না করে বা প্রতিদান গ্রহণ না করে থাকে, শহরের আশে পাশের জায়গা যা শহরের স্বার্থে ব্যবহার হয় এই জায়গা শহরতলী হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কবরস্থান, ঘৌড়দৌড় মাঠ, সেনানিবাস, কাছারী, ষ্টেশন, এসবগুলো শহরের বাইরে হলেও তবুও শহরতলী হিসেবে গণ্য হবে। সেখানে জুমআ জায়েয (গুনীয়া) সুতরাং জুমআ শহরে, শহরতলী বা জেলাতে পড়া জায়েয। গ্রামে জায়েয নয়। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ যে শহরে কাফিরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম নিবাস থাকে সেখানেও জুমআ জায়েয। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ শহরের জন্য শাসক থাকাটা আবশ্যক। শাসক পরিদর্শক হিসেবে কোন স্থানে গেলে সেটা শহর হিসেবে গণ্য হবে না। সেখানে জুমআ কায়েম করা যাবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে জায়গা শহরের নিকটবর্তী কিন্তু শহরের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, শহর ও এর মাঝখানে যদি ক্ষেত ফসলের জমির ব্যবধান থাকে, সেখানেও জুমআ জায়েয নয়। যদিও জুমআর আজানের আওয়াজ সেখানে পৌছে। (আলমগীরি)

অধিকাংশ ইমামগণ বলেছেন যে, আজানের আওয়াজ ততদূর পৌছে থাকলে ওসব লোকদের জন্য জুমআ পড়া ফরজ। বরং অনেকেই তা এরকমই বলেছেন যে, জায়গা যদি শহর থেকে দূরেও হয় বিনাকষ্টে যদি গমনাগমন করা যায় তখন জুমা পড়া ফরজ। (দুর্রুল মোখতার) সুতরাং যেসব লোক শহরের নিকটে গ্রামে থাকে তাদের উচিৎ শহরে এসে জুমা পড়বে।

মাসআলাঃ গ্রামে বসবাসকারী শহরে আসলো, জুমআর দিনে শহরে থাকার ইচ্ছা রাখলে জুমআ ফরজ হবে এবং ঐদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাবার পূর্বে বা পরে ফিরে যাবার ইচ্ছা থাকলে জুমআ ফরয নহে। তবে পড়লে ছওয়াবের অধিকারী হবে। এভাবে মুসাফির শহরে আসলো, অবস্থানের নিয়্যত করল না জুমা ফরজ হবে না। গ্রামে বাসকারী শহরে আসলো, অন্য কোন কাজের উদ্দেশ্যও রয়েছে, তাহলে সে জুমার জন্য গমনের ছওয়াবও পাবে। জুমআ পড়লে জুমার ছাওয়াবও পাবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ হজ্বের দিন সমূহে মিনায় জুমা পড়া যাবে। যদি খলিফা বা আমিরে হজ্ব ওখানে থাকে এবং মক্কার হাজীগণও যদি ওখানে থাকে। সাময়িক আমির অর্থাৎ যাকে হাজীদের জন্য শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি জুমআ কায়েম করতে পারবে না। হজ্ব ছাড়া অন্যদিন সমূহে মিনায় জুমা হবে না। আরাফাতে মোটেই হবে না, হজ্ব কালেও নয় হজ্ব ব্যতীত অন্য সময়েও নয়। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ শহরের কয়েক জায়গায় জুমআ হতে পারে, শহর ছোট হোক বা

বড় হোক। জুমআ দু' মসজিদে হোক বা ততোধিক মসজিদে (দুর্রুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে অনেক জায়গায় জুমা কায়েম করা যাবে না। কারণ জুমা ইসলামের নিদর্শন সমূহের অন্যতম এবং জামাত সমূহের সমষ্টি। অনেক মসজিদে অনুষ্ঠিত জুমাতে ইসলামের সে শান শওকত বজায় থাকে না– বৃহৎ জামায়াতে সেটা পরিলক্ষিত হয়। কেবল অসুবিধা দূরীকরণার্থে একাধিক জায়গায় জুমআ পড়া জায়েয রাখা হয়েছে। সুতরাং অনর্থক জামাতের সৌন্দর্য বিনষ্ট করা মহল্লায় মহল্লায় জুমআ কায়েম করা অনুচিত। উপরন্তু একটি জরুরী বিষয়, যেদিকে জনসাধারণের মোটেই মনযোগ নেই সেটা হচ্ছে, জুমআকে অন্যান্য নামাযের মত মনে করা। যার ইচ্ছা নতুন জায়গায় জুমআ কায়েম করলো এবং নামায পড়ায়ে দিল এটা জায়েয নয়। কারণ জুমার ব্যবস্থা করা ইসলামী শাসক বা এর প্রতিনিধির কাজ। এর বর্ণনা সামনে আসছে। যেখানে ইসলামী শাসক না থাকে সেখানে যিনি সবচেয়ে বড় ফকীহ্ বিশুদ্ধ সুন্নী আক্বীদা সম্পন্ন শরীয়তের বিধিবিধান জারী করার ব্যাপারে ইসলামী শাসকের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনিই জুমা কায়েম করবেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত জুমআ হবে না। যদি এ রকম আলেমও না থাকে তখন সাধারণ লোকেরা যাকে ইমাম বানাবে, সে জুমআ কায়েম করবে। আলেম থাকাবস্থায় সাধারণ লোকেরা অন্য কাউকে ইমাম বানাতে পারে না. এরকমও হতে পারে না যে, কয়েকজন মিলে কাউকে করল, এরকম জুমআর কোন প্রমাণ নেই।

মাসআলাঃ এখতিয়াতি জোহর বা সতর্কতা মূলক জোহর (জুমআর পর চার রাকাত নামায এ নিয়্যতে পড়া যে, সকলের মধ্যে যিনি যোহরের শেষে ওয়াক্ত পেল জুমা পড়ল না)। জুমআর ফরজ আদায় হওয়ার ব্যাপারে যার সন্দেহ নেই এমন বিশেষ লোকের জন্য। সাধারণ লোকের জোহ্‌রে এখতিয়াতি পড়লে জুমআ আদায় হবার ব্যাপারে তাদের সন্দেহ থাকবে, তারা পড়বে না। তারা চার রাকাত পূর্ণ পড়বে। উত্তম হলো জুমআর শেষে চার রাকাত সুন্নত পড়ে জোহ্‌রে এখতিয়াতি পড়বে। অতঃপর দু'রাকাত সুন্নত পড়বে। এ ছয় রাকাত ওয়াক্তিয়া সুন্নতের নিয়্যত করবে। (আলমগীরি, ছগিরী, রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

দ্বিতীয় শর্তঃ ইসলামী শাসক হওয়া ও এর বিধান

জুমআ'র দ্বিতীয় শর্তঃ ইসলামী শাসক বা এর প্রতিনিধি, শাসক যাকে জুমআ' কায়েমের নির্দেশ দিয়েছে।

মাসআলাঃ শাসক ন্যায় বিচারক হোক বা অত্যাচারী হোক, জুমা কায়েম করতে পারবে। অনুরূপ যদি জোরপূর্বক শাসক হয়ে যায় অর্থাৎ শরীয়ত মতে ইমামতের অধিকার রাখে না,যেমন কুরায়শী না হলে, বা অন্য কোন শর্ত পাওয়া না গেলেও জুমআ' কায়েম করতে পারবে। অনুরূপভাবে মহিলা যদি শাসক হয়ে যায় তার নির্দেশে জুমআ' কায়েম করা যাবে। সে নিজে কায়েম করতে পারবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ শাসক যাকে জুমার ইমাম নিযুক্ত করেছে, সে অন্যের দ্বারাও পড়াতে পারবে। যদিও তাকে অন্যজনের দ্বারা পড়ানোর এখতিয়ার দেয়া না হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ জুমার ইমামের অনুমতি ব্যতীত কেউ জুমা পড়াল, অথবা ইমাম বা যে ব্যক্তির নির্দেশে জুমা কায়েম হয় সে জুমায় শরীক হল, তাহলে হবে। অন্যথায় হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ শহরের শাসক ইন্তেকাল করল অথবা বিপর্যয়ের কারণে কোথাও চলে গেল, তার খলিফা বা প্রতিনিধি বা অনুমতিপ্রাপ্ত বিচারক জুমা কায়েম করল, জায়েয হবে। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ কোন শহরে ইসলামী শাসক যার নির্দেশে জুমা কায়েম করা যায়, না থাকলে তখন সাধারণ লোকেরা যাকে ইচ্ছে ইমাম বানাবে। অনুরূপভাবে শাসক থেকে অনুমতি নেয়া না গেলেও তখন অন্য কাউকে নিযুক্ত করা যাবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ শহরের শাসক যদি নাবালেগ বা কাফের হয় এখন প্রাপ্তবয়স্ক হল বা কাফের মুসলমান হল, তখনও জুমা কায়েম করার অধিকার নেই। যদি নতুন কোন নির্দেশ তার জন্য জারী হলে বা বাদশাহ্ যদি বলে থাকে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া বা ইসলাম গ্রহণের পর জুমা কায়েম করবে তখন কায়েম করা যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ খোতবার অনুমতি জুমার অনুমতির নামান্তর এবং জুমার জন্য অনুমতি খোতবার জন্য অনুমতিকে শামিল করে। যদিও বলে দেয়া হয় যে, খোৎবা পড়বে এবং জুমা কায়েম করবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ শাসক যদি জনগণকে জুমা কায়েমে নিষেধ করে তখন লোকেরা নিজেরাই কায়েম করবে। শাসক যদি কোন শহরের শহর হওয়াটা বাতিল করে তখন লোকদের জুমা পড়ার এখতিয়ার থাকবে না। (রদ্দুল মোখতার) এটা তখন প্রযোজ্য হবে যে, যদি তা ইসলামী শাসক কর্তৃক বাতিল হয়। কাফের কর্তৃক বাতিল হলে তখন পড়বে।

মাসআলাঃ শাসক জুমার ইমামকে অপসারণ করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত অপসারণের নির্দেশনামা না আসবে, অথবা স্বয়ং শাসক না আসবে অপসারণ কার্যকর হবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ শাসক ভ্রমণ করে নিজ দেশের কোন শহরে পৌছল, সেখানে নিজে জুমা কায়েম করতে পারবে। (আলমগীরি)

জুমআ'র তৃতীয় শর্ত হলোঃ জোহরের সময় হওয়া

অর্থাৎ জোহরের সময়ে যেন নামায পূর্ণ হয়। জুমআর নামাযে এমনকি তাশাহহুদ পড়ার পর যদি আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায় জুমা বাতিল হয়ে গেল। জোহরের ক্বাযা পড়বে। (প্রায় কিতাব সমূহে বর্ণিত)

মাসআলাঃ মুক্তাদি নামাযে নিদ্রা গেল, ইমাম সালাম ফিরানোর পর চোখ খুলল, তখন সময় থাকলে জুমা পূর্ণ করবে। অন্যথায় জোহরের ক্বাযা পড়বে। অর্থাৎ নতুন তাহরীমা সহকারে। (আলমগীরি ও অন্যান্য কিতাব সমূহ) অনুরূপভাবে যদি এতটুকু ভিড় হয় যে, রুকু সিজদা করা যাচ্ছে না, এমনকি ইমাম সালাম ফিরায়ে নিল, তখনও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য। (দুররুল মোখতার)

খোতবার শর্তাবলী খোতবার সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহের বর্ণনা

(৪) জুমার চতুর্থ শর্ত খোৎবা পাঠ করাঃ খোৎবার জন্য শর্ত হলো, (১) ওয়াক্তের মধ্যে হওয়া (২) নামাযের আগে হওয়া (৩) এ রকম জামাতের সামনে হওয়া যা জুমআর জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ খতীব ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন পুরুষ হতে হবে। (৪) এতটুকু আওয়াজ হওয়া যেন কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে আশেপাশের লোকজন শুনতে পায় যদি সূর্য ঝুঁকে পড়ার আগে খোৎবা পড়ে নেয় বা নামাযের পরে খোৎবা পড়ে বা মহিলা শিশুদের সামনে খোৎবা পড়লে বা একাকী পড়লে, এসব অবস্থায় জুমআ হবে না। যদি বধির বা নিদ্রিত ব্যক্তিদের সামনে খোৎবা পড়া হয়, অথবা উপস্থিত লোকেরা যদি দূরে হয় শুনতে না পায় বা মুসাফির অথবা রুগ্ন ব্যক্তিদের সামনে পড়লে, যারা তারা যদি জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হয় তখন জায়েয হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ খোতবা হচ্ছে আল্লাহর জিকিরের নাম, যদি কেবলমাত্র একবার আলহামদু লিল্লাহ্ বা সুবহানাল্লাহ্ বা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললো, এতটুকুতে ফরজ আদায় হয়ে গেল, তবে এতটুকুতে সংক্ষিপ্ত করা মাকরূহ। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ হাঁচি আসলো, আলহামদুলিল্লাহ্ বললো, অথবা আশ্চর্য হয়ে সুবহানাল্লাহ্ বা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললো, ফরয আদায় হল না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ খোতবা ও নামাযের মাঝখানে যদি অধিক ব্যবধান হয় তখন পঠিত খোতবা যথেষ্ট নয়। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ দু'টি খোতবা পড়া সুন্নত। তবে দীর্ঘ না হওয়া চাই যদি উভয়টা মিলে তওয়ালে মুফাচ্ছিল বা (অতিরিক্তি লম্বা) থেকে বেড়ে যায় তখন মাকরূহ। বিশেষতঃ শীতকালে। (দুররুল মোখতার, গুনীয়া)

মাসআলাঃ জুমার খোতবার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুন্নত।

(১) খতীব পবিত্র হওয়া (২) দাঁড়ানো (৩) খোতবার পূর্বে খতীবের বসা (৪) খতীব মিম্বরের উপর হওয়া (৫) শ্রোতাদের দিকে মুখ করা (৬) কিবলার দিকে পিঠ রাখা, (মিম্বর মেহরাবের বাম পার্শ্বে হওয়া উত্তম) (৭) উপস্থিত সকলে ইমামের দিকে মনোনিবেশ করা (৮) খোতবার পূর্বে নিম্নস্বরে আউজুবিল্লাহ্ পড়া (৯) এতটুকু উঁচু আওয়াজে খোতবা পড়া যেন লোকেরা শুনতে পায় (১০) আলহামদু বলে শুরু করা

(১১) আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করা (১২) মহান আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামের রেসালতের সাক্ষ্য দেয়া (১৩) হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করা (১৪) কমপক্ষে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা, (১৫) প্রথম খোতবায় ওয়াজ নসীহত করা (১৬) দ্বিতীয় খোতবায় ছানা, হামদ, শাহাদত ও দরুদের পুনরাবৃত্তি করা (১৭) মুসলমানদের জন্য দোয়া করা। (১৮) উভয় খোতবা হালকা করা (১৯) উভয় খোতবার মাঝখানে তিন আয়াত পাঠ পরিমাণ সময় বসা। মুস্তাহাব হচ্ছে, দ্বিতীয় খোতবায় প্রথম খোতবার তুলনায় আওয়াজ ছোট হওয়া। (২০) খোলাফায়ে রাশেদীন, সম্মানিত দু'জন চাচা হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহ্ আনহুমা এর আলোচনা করা। দ্বিতীয় খোতবা এভাবে শুরু করা উত্তম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তাঁরই নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, আমরা তাঁরই প্রতি ঈমান রাখি, তাঁরই উপর ভরসা রাখি। আর আমাদের প্রবৃত্তির কুচক্র হতে ও যাবতীয় মন্দ কাজের কুফল হতে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করি যাকে আল্লাহ্ তায়ালা হেদায়ত করেন তাকে কেহ্ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তায়ালা যাকে সুপথ না দেখান তাকে কেহ্ হেদায়ত করতে পারে না।

পুরুষরা যদি ইমামের সামনে হয় ইমামের দিকে মুখ করবে। ডানে বামে হলে ফিরে যাবে। ইমামের নিকট হওয়া উত্তম। তবে ইমামের নিকট হওয়ার জন্য লোকদের কাঁধের উপর পা দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া জায়েয নেই। ইমাম এখনো খোতবা শুরু করেনি সামনে জায়গা থাকলে সামনে যাওয়া যাবে। খোতবার শুরুর পর মসজিদে প্রবেশ করলে তখন মসজিদের এক প্রান্তেই বসে যাবে। খোতবা শ্রবণকালে দু'জানু হয়ে বসবে যেমন নামাযে বসে থাকে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার, গুনীয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ খোতবার মধ্যে ইসলামী শাসকের এরকম গুণকীর্তন করা যা তার মধ্যে নেই সেটা হারাম। যেমন مالك رقاب الامم (উম্মতকুলের অধিপতি) এটা নিছক মিথ্যা এবং হারাম (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ খোতবার মধ্যে আয়াত না পড়া, অথবা দু'খোতবার মাঝখানে না বসা, অথবা খোতবা পড়ার সময় কথা বলা মাকরূহ। অবশ্য খতীব যদি কোন ভাল কাজের হুকুম করেন অথবা মন্দ কথা থেকে বারণ করেন তাহলে কোন নিষেধ নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আরবী ভিন্ন অন্য ভাষায় খোতবা পড়া বা আরবীর সাথে অন্য ভাষা মিশ্রিত করা চিরাচরিত সুন্নতের খেলাপ। অনুরূপ খোতবায় কবিতা পড়াও অনুচিত। যদিও আরবীতে হয়। অবশ্য উপদেশমূলক দু'একটি কবিতা কখনো পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

(৫) পঞ্চম শর্তঃ জামাতে ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন পুরুষ হতে হবে।

মাসআলাঃ যদি তিনজন ক্রীতদাস বা মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি অথবা বোবা বা নিরক্ষর ব্যক্তি মুক্তাদি হয় তখনও জুমা হবে। কেবল মহিলা বা শিশু সন্তান হলে হবে না। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ খোতবার সময় যেসব লোক ছিল ওরা চলে গেল, অপর তিনজন আসলো, তাদের সাথে ইমাম জুমআ পড়বে। অর্থাৎ জুমআর জন্য পূর্বের লোকেরা যারা খোতবার সময় উপস্থিত ছিল ওরা উপস্থিত থাকা জরুরী নয়। বরং অন্যদের দ্বারাও হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রথম রাকাতের সিজদা করার পূর্বে সকল মুক্তাদি চলে গেল, বা কেবল দু'জন রয়ে গেল, তখন জুমআ বাতিল হয়ে গেল, নতুনভাবে জোহরের নিয়ত করবে। আর যদি সকলে চলে যায় কিন্তু তিনজন পুরুষ অবশিষ্ট থাকলে অথবা সিজদার পর চলে গেল, বা তাহ্‌রীমার পর চলে গেল কিন্তু প্রথম রুকুতে এসে শামিল হল অথবা খোতবা পর চলে গেল এবং ইমাম অপর তিনজন পুরুষের সাথে জুমআ পড়ে নিল– এসব অবস্থায় জুমআ জায়েয হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম যখন আল্লাহু আকবর বলল, সে সময় মুক্তাদি অযুসম্পন্ন ছিল কিন্তু মুক্তাদি নিয়্যত বাঁধল না অতঃপর সব অযুহীন হয়ে গেল এবং অন্যলোক আসলো, পূর্বে লোকেরা চলে গেল, তখন জুমআ হবে। আর যদি তাহ্‌রীমার সময়ই সব মুক্তাদি অযুহীন থাকে অতঃপর আরো লোক আসলো, তখন ইমাম নতুনভাবে তাহ্‌রীমা বাঁধবে। (হানিয়া)

(৬) ষষ্ঠ শর্তঃ ইযনে আম, তথা সাধারণ অনুমতিঃ অর্থাৎ মসজিদের দরজা খুলে দেয়া হবে, যে কোন মুসলমান ইচ্ছে করলে যেন আসতে পারে। কারো জন্য যেন বাধা বিপত্তি না থাকে। জামে মসজিদে যখন সব লোক সমবেত হল, তখন দরজা বন্ধ করে জুমআ পড়লে হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ শাসক স্বীয় জায়গায় জুমআ পড়লো এবং দরজা খুলে দিল, লোকদের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি রয়েছে লোক আসুক বা না আসুক নামায হবে। আর যদি দরজা বন্ধ করে পড়ে বা দারোয়ানকে বসায়ে দিল, যেন লোকজন আসতে না দেয়, তাহলে জুমআ হবে না।

মাসআলাঃ মহিলাদেরকে যদি জামে মসজিদে যাবার থেকে বাধা দেয় হয় তাহলে সাধারণ অনুমতির বিপরীত হবে না। কারণ মহিলাদের আগমনে ফিৎনার ভয় রয়েছে (রদ্দুল মোখতার)

জুমআ' ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

জুমা ওয়াজিব হওয়ার জন্য এগারটি শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে একটিও পাওয়া না গেলে জুমা ফরজ হবে না। এরপরও পড়লে হয়ে যাবে। বরং পুরুষ, জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমা পড়াটা উত্তম। আর মহিলাদের জন্য জোহর পড়াটা উত্তম। তবে মহিলার ঘর যদি একেবারে মসজিদের সাথে সংযুক্ত হয়, যেখানে ঘরে থেকে মসজিদের ইমামের এক্তেদা করা যায় তখন মহিলার জন্যও জুমা উত্তম। আর নাবালেগ যদি জুমআ পড়ে তাহলে নফল হবে। তার উপর নামাযই ফরয হয়নি। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

-প্রথম শর্তঃ শহরে মুকীম বা অবস্থানকারী হওয়া

দ্বিতীয় শর্ত ঃ সুস্থতা অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তির উপর জুমা ফরজ নয়, রুগ্ন ব্যক্তি বলতে এমন রোগীকে বুঝায় যিনি জুমা মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে না। অথবা গেলে রোগ বৃদ্ধি পাবে। বা দেরীতে সুস্থ হবে। (গুনীয়া) থুরথুরে বৃদ্ধদের বেলায় রুগ্ন ব্যক্তির হুকুম প্রযোজ্য। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি রোগীর সেবায় নিয়োজিত। সে জানে যে জুমআয় গেলে রোগী অসুবিধায় পড়বে তার অবস্থার উন্নতি ঘটবে না, তাহলে সেই সেবাশুশ্রূষাকারীর উপর জুমআ ফরজ নয় (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

তৃতীয় শর্তঃ আযাদ হওয়া। ক্রীতদাসের উপর জুমআ ফরজ নয়। তার মুনিব জুমা থেকে বারণ করতে পারে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাসের উপর জুমআ ওয়াজিব। অনুরূপ যে গোলামের আংশিক আযাদ করা হয়েছে বাকী অংশ আযাদীর জন্য সচেষ্ট রয়েছে অর্থাৎ অবশিষ্টাংশ আযাদ হওয়ার জন্য উপার্জন করে মালিককে দিতে থাকলে ওর উপরও জুমা ফরজ। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে গোলামকে তার মালিক ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে অথবা তার দায়িত্বে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উপার্জন করাটা স্থির করেছে তার উপর জুমআ' ফরজ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মালিক স্বীয় গোলামকে নিয়ে জামে মসজিদে গেল, গোলামকে দরজায় রাখল, যেন বাহন হেফাজত করা হয়, তাহলে প্রাণীর হেফাজতে অসুবিধা না হলে পড়ে নেবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মালিক গোলামকে জুমআ' পড়ার অনুমতি দিলেও ওয়াজিব হবে না। আর যদি মালিকের অনুমতি ব্যতীত জুমা অথবা ঈদের জামাতে গেলে এবং সে যদি জানে যে, এতে মালিক অসন্তুষ্ট হবে না, তাহলে জায়েয হবে। অন্যথায় হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে জুমা থেকে বাধা দেয়া যাবে না। অবশ্য জামে মসজিদ দূরে হলে এবং মালিকের ক্ষতিহলে, ক্ষতির পরিমাণ বেতন থেকে কেটে রাখতে পারবে এবং কর্মচারীরা এর দাবী করতে পারবে না। (আলমগীরি)

চতুর্থ শর্তঃ পুরুষ হওয়া।

পঞ্চম শর্তঃ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

ষষ্ঠ শর্তঃ বিবেকবান হওয়া। উপরোক্ত এ শর্ত দু'টি কেবল জুমার জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত।

সপ্তম শর্তঃ চক্ষু বিশিষ্ট হওয়া।

মাসআলাঃ এক চক্ষু বিশিষ্ট অথবা যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল তার উপর জুমা ফরজ নয়। অনুরূপ যে অন্ধ আজানের সময় মসজিদে অযু সম্পন্ন থাকে তার উপরও জুমআ' ফরজ। আর অন্ধ ব্যক্তি যে নিজে জুমা মসজিদ পর্যন্ত বিনাকষ্টে যেতে পারে না। যদিও বা

মসজিদ পর্যন্ত নেয়ার জন্য কেউ থাকে– যিনি পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিবে বা বিনা পারিশ্রমিকে নিবে তাহলেও তার জন্য জুমআ ফরজ নয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কতেক অন্ধ ব্যক্তি বিনা কষ্টে কারো সাহায্য ছাড়া বাজারে বা সড়কে চলাফেরা করতে পারে এবং যে মসজিদে ইচ্ছে কারো নিকট জিজ্ঞেস করা ছাড়াও যেতে পারে– এমন অন্ধের উপর জুমা ফরজ। (রদ্দুল মোখতার)

অষ্টম শর্তঃ চলা ফেরায় সক্ষম হওয়া।

মাসআলাঃ পঙ্গু ব্যক্তির উপর জুমা ফরজ নয়। যদিওবা এমন কেউ থাকে যিনি তাকে মসজিদে নিয়ে রেখে আসবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যার এক পা কর্তিত বা অর্ধাঙ্গ রোগে অচল হলে গেল, যদি মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে তার উপর জুমা ফরজ। অন্যথায় নয়। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

নবম শর্তঃ বন্দী অবস্থায় না হওয়াঃ যদি কোন কর্জের কারণে বন্দী করা হয়, যদি সে ধনশালী হয় এবং কর্জ আদায়ে সামর্থবান হয় তখন তার উপর জুমা ফরজ। (রদ্দুল মোখতার)

দশম শর্তঃ শাসক বা চোর ইত্যাদি কোন জালেমের ভয় না হওয়া, গরীব কর্জ গ্রহীতার যদি বন্দী হওয়ার ভয় থাকে তার উপর জুমা ফরজ নয়। (রদ্দুল মোখতার)

একাদশ শর্তঃ বন্যা, ঝড় তুফান, সাইক্লোন, হিম প্রবাহ ইত্যাদি না হওয়া। এগুলো যদি এত শক্তিশালী হয় যে, ফলে ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে তার উপর জুমা ফরজ নয়।

মাসআলাঃ জুমার ইমামতি প্রত্যেক সেসব পুরুষরা করতে পারে যিনি অন্যান্য নামায সমূহের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যদিওবা তার উপর জুমা ফরজ নয়। যেমন রুগ্ন ব্যক্তি, মুসাফির, ক্রীতদাস এবং এখতিয়ার সম্পন্ন লোক। অর্থাৎ ইসলামী শাসক বা এর সহকারী অথবা যিনি তার অনুমিত প্রাপ্ত অসুস্থ বা মুসাফির হলেও জুমার নামায পড়াতে পারবে। অথবা তারা তিনজন কোন রোগী বা মুসাফির বা গোলাম অথবা ইমামতের যোগ্য অন্য কাউকে অনুমতি দিয়ে থাকলে-বা প্রয়োজনবোধে সাধারণ লোকেরা এমন কাউকে ইমাম নিযুক্ত করলো, যিনি ইমামতি করতে পারে– তাহলে সে পড়াতে পারে। অবশ্য যার হুকুম সে জুমআ পড়ালে জুমা হবে না।

শহরে জুমআ'র দিন জোহর পড়ার বিধান

মাসআলাঃ যার উপর জুমা ফরজ, তার জন্য শহরে জুমার নামায হয়ে যাবার পূর্বে যোহর নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি। বরঞ্চ ইমাম ইবনুল হুমাম (রঃ) বলেছেন, হারাম, যদিও বা পড়ে নেয় তবুও জুমআর জন্য যাওয়া ফরজ। জুমআ হয়ে যাবার পর জোহর পড়লে মাকরূহ হবে না। বরং তখন তো জোহরই পড়া ফরজ। যদি জুমআ অন্য কোন স্থানে না মিলে কিন্তু জুমা বর্জনের গুনাহ তার দায়িত্বে বর্তাবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি জুমা হয়ে যাবার পূর্বে জোহর পড়ে নিল, লজ্জিত হয়ে জুমার নিয়াতে ঘর থেকে বের হল, এমন সময় যদি ইমাম নামাযে থাকে জোহর বাতিল হবে জুমা পাওয়া গেলে জুমা পড়বে অন্যথায় জোহরের নামায পুনরায় পড়বে। যদিও বা মসজিদ দূরে হওয়ার কারণে জুমা পাওয়া না যায়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ একব্যক্তি জামে মসজিদে রয়েছে। যিনি জোহরের নামায পড়ে নিল, যে জায়গায় নামায পড়েছে সেই জায়গায় বসে রয়েছে, তাহলে যতক্ষণ জুমা শুরু হবে না, জোহর বাতিল হবে না। আর যদি জুমার উদ্দেশ্যে সেস্থান থেকে সরে উঠে তাহলে জোহর বাতিল হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি ঘর থেকে বেরই হয়নি অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে বের হয়েছে, অথবা ইমাম নামায শেষ করার সময় বা শেষ করার পর বের হয়েছে বা ঐদিন জুমা পড়াই হয়নি, অথবা লোকেরা জুমা পড়া শুরু করেছে, কিন্তু কোন ঘটনার কারণে পূর্ণ করেনি এসব অবস্থায় জোহর বাতিল হবে না। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যেসব অবস্থায় জোহর বাতিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা বুঝতে হবে ফরজ বাতিল হয়েছে। এ নামায এখন নফলে পরিণত হয়েছে। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যার উপর জুমআ ফরজ ছিল, তিনি জোহরের নামাযের ইমামতি করলেন, অতঃপর জুমআর জন্য বের হলেন, তার জোহর বাতিল হবে। কিন্তু যেসব মুক্তাদি জুমআর জন্য বের হয়েছে, তাদের ফরজ বাতিল হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যার উপর কোন ওজরের কারণে জুমআ ফরজ হয়নি, সে যদি জোহর পড়ার পর জুমআর জন্য বের হয় উপরোল্লেখিত শর্তের ভিত্তিতে তার নামায বাতিল হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ রোগী, মুসাফির বা বন্দী লোক অথবা এমন কোন ব্যক্তি যার উপর জুমআ ফরজ নয়, ওসব লোকদের জন্যও জুমআর দিন শহরে জামাত সহকারে জোহর পড়া মাকরূহ তাহরীমি। জুমআ হওয়ার আগে জামাত করুক অথবা পরে করুক, অনুরূপ যারা জুমআর নামায পায়নি তারাও আজান ইকামত ব্যতীত পৃথক পৃথকভাবে জোহর নামায পড়বে। তাদের জন্যও জামাত নিষেধ (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ওলামায়ে কেরাম বলেন, যেসব মসজিদে জুমার নামায হয় না, সেসব মসজিদে জুমার দিন জোহরের সময় যেন বন্ধ করে রাখা হয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ গ্রামে জুমআর দিনেও যেন জোহরের নামায আযান, ইকামত ও জামাত সহকারে পড়ে (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মাজুর বা অপারগ ব্যক্তি যদি জুমার দিন জোহর পড়ে তখন মুস্তাহাব হলো যে, জুমার নামায হয়ে যাওয়ার পর যেন পড়ে আর যদি দেরী না করে মাকরূহ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি জুমার বৈঠক পেয়েছে বা সাহু সিজদার পর শরীক হয়েছে, সে জুমা পেল, সুতরাং নিজেই দু'রাকাত পূর্ণ করবে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ জুমার নামাযের জন্য আগে যাওয়া, মিসওয়াক করা, ভাল ও সাদা কাপড় পরিধান করা, তৈল ও সুগন্ধি লাগানো, প্রথম কাতারে বসা মুস্তাহাব এবং গোসল করা সুন্নাত। (আলমগীরি)

খোতবা সম্পর্কে কতিপয় মাসাঈল

মাসআলাঃ যখন ইমাম খোতবার জন্য দাড়াবে, সেই সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায জিকির আযকার এবং সবধরনের কথাবার্তা নিষেধ। অবশ্য ছাহেবে তরতীব ব্যক্তি স্বীয় কাযা নামায পড়ে নিতে পারবে। যে ব্যক্তি সুন্নত বা নফল নামাযে রত থাকে, তাড়াতাড়ি যেন শেষ করে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যেসব জিনিষ নামাজে হারাম যেমন, পানাহার সালাম ও সালামের উত্তর দান ইত্যাদি এসবগুলো খোতবার অবস্থায়ও হারাম। এমনকি সৎ কাজের

নির্দেশ দেয়াও। অবশ্য খতীব সৎ কাজের নির্দেশ দিতে পারেন, যখন খোৎবা পড়া হয় তখন সমবেত সকলের জন্য শ্রবণ করা, নিরব থাকা ফরজ। যেসব লোক ইমাম থেকে দূরে রয়েছে, খোতবার আওয়াজ যাদের কান পর্যন্ত পৌছে না ওদেরও চুপ থাকা ওয়াজিব। কাউকে মন্দ কথা বলতে দেখলে, হাত বা মাথার ইশারায় নিষেধ করা যাবে। কিন্তু মুখে বলা জায়েয নেই। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ খতীব মুসলমানদের জন্য দোয়া করার সময় শ্রোতাদের হাত উঠানো বা আমীন বলা নিষেধ। যদি এরূপ করে গুনাহগার হবে। খোতবায় দরুদ শরীফ পড়ার সময় খতীব ডানে বামে মুখ করা জায়েয নেই। জুমআর খতীব যখন হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম নেবেন তখন উপস্থিত জনতা মনে মনে দরূদ শরীফ পড়বে। মুখে উচ্চারণ করে পড়ার অনুমতি নেই। অনুরূপ ছাহাবায়ে কেরামের আলোচনার সময় রাদিআল্লাহ্ আনহুম মুখে বলা জায়েয নেই। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ জুমআর খোতবা ছাড়াও অন্যান্য খোতবা সমূহ শ্রবণ করাও ওয়াজিব। যেমন দুই ঈদের খোতবা ও বিবাহের খোতবা ইত্যাদি। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রথম আজান হওয়ার পর পরই তাড়াহুড়া করা ওয়াজিব এবং ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি যেগুলো তাড়াহুড়ার বিপরীত, বর্জন করা ওয়াজিব। এমনকি রাস্তা দিয়ে যাবার পথে বেচাকেনা করলে সেটাও নাজায়েয। মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করাতো মারাত্মক গুনাহ। খাবার গ্রহণকালে জুমার আওয়াজ কানে আসলো, যদি এ আশংকা হয় যে খেতে গেলে জুমা বাদ যাবে, তখন খানা বাদ দেবে এবং জুমায় চলে যাবে। জুমার জন্য ধীরস্থির ও গাম্ভীর্য সহকারে গমন করবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ খতীব যখন মিম্বরে বসবে তখন তার সামনে দ্বিতীয়বার আযান দিতে হবে। (মুতুন) এ কথা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, সামনে বলতে মসজিদের অভ্যন্তরে, মিম্বরের কাছে নয়। মসজিদের অভ্যন্তরে আযান দেয়া ফকীহগণ মাকরুহ্ বলেছেন।

মাসআলাঃ অধিকাংশ স্থানে দেখা যায় দ্বিতীয় আজান নিম্নস্বরে দেয়া হয়। এটা অনুচিত বরং দ্বিতীয় আজানও যেন উচ্চস্বরে দেয়া হয় কারণ এটার দ্বারাও ঘোষণা উদ্দেশ্য। কারণ যে প্রথম আযান শুনেনি সে দ্বিতীয় আজান শুনে যেন মসজিদে

উপস্থিত হয়। (বাহার ও অন্যান্য কিতাবসমূহ)

মাসআলাঃ খোতবা শেষ হওয়া মাত্রই যেন ইকামত বলা হয় খোতবা ও ইকামতের মাঝখানে দুনিয়াবী কথা বলা মাকরূহ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যিনি খোতবা পড়বেন তিনিই নামায পড়াবেন। অন্যজন যেন না পড়ায়। অন্যজন পড়ালেও হয়ে যাবে। যদি সে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। অনুরূপ নাবালেগ যদি শাসকের নির্দেশে খোতবা পড়ায় এবং বালেগ নামায পড়ায়, জায়েয হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জুমআর নামাযে উত্তম হচ্ছে, প্রথম রাকাতে সুরা জুমা দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফেকুন, বা প্রথম রাকাতে سبح اسم এবং দ্বিতীয় রাকাতে هل اتك পড়া। তবে সব সময় এগুলো যেন পড়া না হয়, মাঝেমধ্যে অন্য সূরাও পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

জুমআ'র দিনে ও রাতে জুমআ'র কতিপয় আমল

মাসআলাঃ জুমআর দিন যদি সফরে বের হতে হয় এবং দ্বিপ্রহরের আগে যদি শহরের লোকালয়ের বাইরে চলে যাওয়া যায় তাহলে কোন দোষ নেই; অন্যথায় নিষেধ। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করা, নখ কর্তন করা, জুমার পর উত্তম। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ভিক্ষুক যদি নামাযীর আগে অতিক্রম করে বা কাধের উপর পা দিয়ে অতিক্রম করে বা প্রয়োজনে ভিক্ষা করে তখন ভিক্ষা করাও নাজায়েয। এমন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়াও নাজায়েয। (রদ্দুল মোখতার) বরং মসজিদে সাধারণভাবে নিজের জন্য ভিক্ষা করাও জায়েয নেই।

মাসাআলাঃ জুমআর দিনে বা রাতে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা উত্তম এবং অধিক মহিমান্বিত রাতসমূহেও পড়া যাবে। নাসাঈ, বায়হাকী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রহঃ) থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পড়বে তার জন্য উভয় জুমআ'র মধ্যবর্তী সময়ে নূর বিকশিত হবে। দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার রাত্রি সূরা কাহাফ পড়বে, তার জন্য সেখান থেকে কা'বা পর্যন্ত নূর আলোকিত হবে এবং আবু বকর বিন মরজুবিয়া ইবনে ওমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহাফ পড়বে, তার কদম হতে আসমান পর্যন্ত নূর উচ্চকিত হবে। যে নূর কেয়ামতের দিবসে তার জন্য আলোকিত হবে এবং দু'জুমার মধ্যবর্তী সময়ে যে গুনাহ্ হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ হাদীসের সনদসূত্রে কোন ত্রুটি নেই। 'হা-মীম', 'আদ্দোখান' পড়ার ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। তবরানী শরীফে আবু উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে বা রাতে 'হা-মীম' আদ্দোখান পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন রাতে 'হা-মীম আদ্দোখান' পাঠ করবে, তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। জ মআর দিনে বা রাতে যে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে।

ফায়েদাঃ জুমার দিনে রূহ সমূহ একত্রিত হয় সুতরাং এদিনে জেয়ারত করা উচিৎ এবং এ দিনে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয় না। (দুররুল মোখতার)

দুই ঈদের বর্ণনা

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

অর্থঃ তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করবে এবং এর উপর যে, তিনি তোমাদের হিদায়ত করেছেন। (সূরা বাক্বারা, পারা-২, আয়াত-১৮৫)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অর্থঃ সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (সূরা কাওসার, পারা-৩০, আয়াত-২)

হাদীস (১) ইবনে মাযাহ্ শরীফে আবু উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে দুই ঈদের রাত্রি জাগ্রত থাকবে তার প্রাণের মৃত্যু হবে না যেদিন মানুষের প্রাণের মৃত্যু হবে।

হাদীস (২) ইসবাহানী মুয়াজ বিন জবল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে পাঁচ রাতে রাত জাগরণ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। জিলহজ্বের ৮ম, ৯ম, দশম তারিখের রাত্রি ঈদুল

ফিতরের রাত, শা'বানের পনের তারিখের রাত অর্থাৎ শবে বরাত।

হাদীস (৩) আবু দাউদ শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় শুভাগমন করলেন, তখন মদীনাবাসীরা বৎসরে দুইটি দিনে আনন্দ উৎসব উদ্যাপন করতো, (মেহেরজান ও নওরোজ) হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কিরূপ? লোকেরা বললো, আমরা জাহেলী যুগে এ দু'দিনে খুশী আনন্দ উদ্যাপন করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তোমাদের এ দিনদ্বয়ের পরিবর্তে এর চাইতে আরো উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।

হাদীস (৪-৫) তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, দারেমী শরীফে হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন নামাযের উদ্দেশ্যে বের হতেন না যতক্ষণ না তিনি কিছু খেতেন, আর ঈদুল আযহার দিন কিছুই খেতেন না, যতক্ষণ না ঈদের নামায আদায় করতেন। বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খাওয়া পর্যন্ত নামাযে গমন করতেন না এবং জোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন।

হাদীস (৬) তিরমিযী ও দারেমী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে যখন এক ঈদগাহের দিকে বের হতেন, তখন অপর রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করতেন।

হাদীস (৭) আবু দাউদ ও ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবারএক ঈদের দিনে তাদেরকে বৃষ্টি পেল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদের মধ্যে ঈদের নামায পড়ালেন।

হাদীস (৮) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন দু'রাকাত ঈদের নামায পড়লেন, কিন্তু এ দু'রাকাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোন নামায পড়েননি।

হাদীস (৯) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে দু'ঈদের নামায একবার নয় দু'বার নয় বরং বহুবার পড়েছি আযান ও ইকামত ব্যতীত।

ফিকহী মাসায়েলঃ দুই ঈদের নামায ওয়াজিব। তবে সবার উপর নয়। বরং যাদের উপর জুমআ ওয়াজিব তাদের উপর। জুমার নামাযের যেসব শর্ত রয়েছে দু'ঈদের নামাযেও সেসব শর্ত রয়েছে। তবে পার্থক্য হলো যে, জুমায় খোতবা শর্ত। দু'ঈদের মধ্যে খোতবা সুন্নত। জুমআয় খোতবা না পড়লে জুমআ হবে না। আর যদি দু'ঈদের নামাযে খোতবা পড়া না হয় নামায হবে। কিন্তু মন্দ কাজ করল।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো যে, জুমআর খোতবা দিতে হয় নামাযের পূর্বে। দুই ঈদের খোতবার নামাযের পরে। প্রথমে পড়ে নিলে মন্দ করল, কিন্তু নামায হয়ে যাবে পুনরায় পড়া যাবে না, খোতবাও পুনরায় পড়া যাবে না।

দু'ঈদের নামাযে আযান ও ইকামত নেই। কেবল দু'বার اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ বলার অনুমতি রয়েছে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

বিনা কারণে ঈদের নামায বর্জন করা গোমরাহী ও বিদয়াত। (জাওহেরো নায়্যারা ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মফস্বলে ঈদের নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমি। (দুর্রুল মোখতার)

ঈদের দিনে মুস্তাহাবসমূহ

মাসআলাঃ ঈদের দিন নিম্নবর্ণিত কাজ সমূহ মুস্তাহাবঃ

(১) চুল, দাঁড়ি, গোঁফ ঠিক করা (২) নখ কাটা (৩) গোসল করা (৪) মিসওয়াক করা (৫) ভাল কাপড় পরিধান করা অর্থাৎ নতুন কাপড় অথবা ধোলাই করা কাপড় পরিধান করা (৬) আংটি পরিধান করা (৭) সুগন্ধি লাগানো (৮) ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া (৯) সকাল সকাল ঈদগাহে গমন করা (১০) নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা (১১) ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া (১২) এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে আসা (১৩) নামাযে যাবার আগে তিন, পাঁচ, সাত বেজোড় সাংখ্যক খেজুর খাওয়া। খেজুর না থাকলে মিষ্টি জাতীয় কোন কিছু খাওয়া, তবে নামাযের পূর্বে কিছু না খেলে গুনাহগার হবে না। কিন্তু এশা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা দোষণীয়। (ফিকহর কিতাব সমূহ)

মাসআলাঃ বাহনযোগে ঈদগাহে গেলে ক্ষতি নেই। কিন্তু যিনি হেঁটে যেতে সক্ষম, হেঁটে যাওয়া উত্তম। ফিরে আসার সময় বাহনযোগে আসলে অসুবিধা নেই। (জাওহেরা, আলমগীরি)

মাসআলাঃ ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত। যদিওবা মসজিদে সুযোগ

থাকে, ঈদগাহে মিম্বর তৈরী করা বা মিম্বর নিয়ে যাওয়ায় ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মোখতার)

(১৪) আনন্দ প্রকাশ করা (১৫) বেশী করে দান সদকা করা (১৬) ঈদগাহে ধীরস্থির গাম্ভীর্য সহকারে নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে গমন করা। (১৭) পরস্পর মোবারকবাদ দেওয়া মুস্তাহাব। রাস্তায় উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায মাকরূহ ঈদগাহে হোক বা ঘরে হোক। তার উপর ঈদের নামায ওয়াজিব হোক বা না হোক। এমনকি মহিলারা যদি ঘরে চাশ্‌তের নামায পড়তে চায় তাহলে ঈদের নামায হয়ে যাওয়ার পর পড়বে এবং ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ। ঘরে পড়া যাবে। বরং মুস্তাহাব হলো চার রাকাত পড়া।

এ আহকাম হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর জন্য। সাধারণ মানুষ যদি নফল পড়ে যদিও ঈদের নামাযের পূর্বে হয় এবং ঈদগাহে হয় তাদেরকে যেন নিষেধ করা না হয়। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ঈদের নামাযের সময় হচ্ছে সূর্য যখন তার বরাবর উপরে উঠে এবং শরয়ী অর্ধদিবস পর্যন্ত বাকী থাকে। কিন্তু ঈদুল ফিতরে দেরী করা, ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। যদি সালাম ফিরানোর আগে দ্বিপ্রহর হয়ে যায় তাহলে নামায হবে না। দ্বিপ্রহর বলতে শরয়ী অর্ধদিবসকে বুঝানো হয়েছে, যা সময়ের বিবরণ সম্পর্কিত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈদের নামাযের নিয়ম, মসবুক ও লাহেকের বিধান

ঈদের নামাযের নিয়ম হলো যে, দু'রাকাত ওয়াজিব ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নিয়ত করে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত বেঁধে ছানা পড়বে। এরপর পুনরায় কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত ছেড়ে দেবে। আবার হাত উঠাবে এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত বেঁধে নিবে। অর্থাৎ প্রথম তাকবীরে হাত বাঁধবে এরপর দু'তাকবীরে হাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবে।

এটাকে এভাবে স্মরণ রাখুন যে, যখন তাকবীরের পর কিছু পড়তে হয় তখন হাত বাঁধবে যখন কিছু পড়তে হয় না তখন হাত ছেড়ে দিবে।

চতুর্থ তাকবীরের পর যখন হাত বেঁধে নিবে তখন ইমাম সহেব আউজুবিল্লাহ ও

বিসমিল্লাহ্ নিম্নস্বরে পড়ার পর আলহামদু ও অন্য একটি সূরা পড়বে। অতঃপর রুকু সিজদা করে প্রথম রাকাত শেষ করবে।

দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে আলহামদু ও সূরা পড়ে পুনরায় তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে আল্লাহ্ আকবর বলবে। কিন্তু হাত বাঁধবে না। চতুর্থবার হাত না উঠায়ে আল্লাহ্ আকবর বলে রুকুতে চলে যাবে। এতে বুঝা গেল যে, দু'ঈদের অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর রয়েছে। তিন তাকবীর প্রথম রাকাতে কেরাতের আগে, তাকবীর তাহ্রীমার পরে। তিন তাকবীর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পর রুকুর তাকবীরের আগে। এ ছয় তাকবীরে প্রত্যেকবার হাত উঠাবে এবং প্রত্যেক দু'তাকবীরের মাঝখানে তিন তাসবীহ্ পরিমাণ বিরতি দিবে। দু'ঈদের মধ্যে মুস্তাহাব হচ্ছে প্রথম রাকাতে সূরা জুমা দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফেকুন অথবা প্রথম রাকাতে سبح اسم এবং দ্বিতীয় রাকাতে هل اتاك পড়া। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ইমাম যদি ছয় তকবীরের চেয়ে অতিরিক্ত বলে, তখন মুক্তাদিও ইমামের অনুসরণ করবে। কিন্তু তের তকবীরের অধিকে ইমামের অনুসরণ করবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রথম রাকাতে ইমাম তাকবীর বলার পর মুক্তাদি শামিল হল, তাহলে ঐ সময় তিন তকবীর বলে নিবে যদিও বা ইমাম কেরাত শুরু করে থাকে এবং তিন তকবীরই বলবে। যদিও ইমাম তিনের অধিক বলে। আর যদি ওসব তকবীর না বলে, ইমাম রুকুতে চলে যায় তখন দাড়িয়ে তাকবীর বলবে না। বরং ইমামের সাথে রুকুতে যাবে এবং রুকুতে তাকবীর বলবে। আর যদি ইমামকে রুকুতে পায় এবং প্রবল ধারণা হয় যে, তকবীর বলার পর ইমামকে রুকুতে পাওয়া যাবে। তখন দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তকবীর বলে নেবে। অতঃপর রুকুতে যাবে। অন্যথায় আল্লাহ্ আকবর বলে রুকুতে যাবে এবং রুকুতে তকবীরসমূহ্ বলবে। অতঃপর যদি রুকুতে তকবীর পূর্ণ করতে না পারে ইমাম মাথা উঠায়ে নিল, তখন বাকী তাকবীরগুলো বাদ যাবে। ইমাম রুকু হতে উঠার পর শামিল হলে, তখন তকবীর বলবে না বরং যখন নিজে পড়বে তখন তকবীর বলে নেবে। আর রুকুতে যেখানে তকবীর বলার জন্য বলা হয়েছে ওখানে হাত উঠাবে না। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতে শামিল হয়, তখন প্রথম রাকাতের তকবীর সমূহ্ এখন বলবে না বরং বাদ পড়া রাকাত পড়ার জন্য নিজে যখন দাড়াবে তখন বলবে। আর দ্বিতীয় রাকাতের

তকবীর যদি ইমামের সাথে পাওয়া যায় তো ভাল। অন্যথায় এ ব্যাপারেও সেসব বর্ণনা রয়েছে যা প্রথম রাকাতের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শামিল হলো অতঃপর নিদ্রা গেল, তার অযু চলে যাবে। এখন যদি পড়ে তকবীর ততগুলো বলবে যতগুলো ইমাম বলেছিল।যদিও বা মযহাব মতে ততটুকু না থাকে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমাম তকবীর বলতে ভুলে গেল, রুকুতে চলে গেল, দাঁড়ানোর দিকে ফিরবে না এবং রুকুতে তকবীর বলবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ প্রথম রাকাতে ইমাম তকবীরগুলো ভুলে গেল কেরাত শুরু করে দিল, তাহলে কেরাতের পরে তকবীর বলবে বা রুকুতে এবং কেরাত পুনরায় পড়বে না। (গুনীয়া, আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমাম অতিরিক্ত তকবীর সমূহে হাত উঠায়নি মুক্তাদি তার অনুসরণ করবে না, বরং হাত উঠাবে। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ঈদের নামাযের পর ইমাম দু'টি খোতবা পড়বে। জুমার খোতবায় যা কিছু সুন্নত ঈদের খোতবায়ও সেসব সুন্নত। জুমার খোতবায় যা মাকরূহ্ ঈদের খোতবায়ও তা মাকরূহ্। কিন্তু দু'টি বিষয়ে প্রার্থক্য রয়েছে একটি হলো, জুমআ'র প্রথম খোতবার আগে খতীবের বসা সুন্নত। ঈদের মধ্যে না বসাটা সুন্নত। দ্বিতীয়টি হলো, ঈদের মধ্যে প্রথম খোতবার আগে নয় বার দ্বিতীয় খোতবার আগে সাতবার এবং মিম্বর হতে অবতরণের পূর্বে চৌদ্দবার আল্লাহ্ আকবর বলা সুন্নাত। জুমার মধ্যে সুন্নত নয়। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ঈদুল ফিতরের খোতাবায় সদকায়ে ফিতরের আহ্কাম শিক্ষা দিবে। এগুলো পাঁচটি বা তিনটি।

(১) কাহার উপর ওয়াজিব (২) কাহার জন্য ওয়াজিব (৩) কখন ওয়াজিব (৪) কতটুকু ওয়াজিব। (৫) কোন জিনিষে ওয়াজিব।

বরং উচিৎ হলো যে, ঈদের পূর্বে যে জুমা পড়বে সে জুমায় এসব আহ্কাম ও বিধানাবলী যেন বেল দেয়া হয়, যেন পূর্ব থেকে লোকেরা অবগত হতে পারে।

ঈদুল আযহার খোতবায় কোরবানীর বিধান এবং তকবীর তাশরীক সম্পর্কে শিক্ষা দিবে। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমাম নামায পড়ে নিল, কোন ব্যক্তি বাদ পড়ে গেল, হয়তঃ সে শামিলই হয়নি, অথবা শামিল হয়েছে কিন্তু তার নামায ফাসেদ হয়েছে তাহলে দ্বিতীয় জায়গায় যদি নামাযের জামাত পাওয়া যায় পড়ে নিবে, অন্যথায় পড়া যাবে না। তবে উত্তম হলো যে, এ ব্যক্তি চার রাকাত চাশতের নামায পড়ে নিবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন ওজরের কারণে ঈদের দিন নামায অনুষ্ঠিত হল না, যেমন অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে বা মেঘের জন্য চাঁদ দেখা যায়নি, বা এমন সময় চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন নামায পড়ার সময় নেই। অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় নামায পড়তে দ্বিপ্রহর গড়িয়ে গেল, তাহলে দ্বিতীয়দিন পড়া যাবে। যদি দ্বিতীয় দিনও পড়া না যায় তাহলে ঈদুল ফিতর তৃতীয় দিন পড়া যাবে না। আর দ্বিতীয় দিনের নামাযের সময় প্রথম দিনের অনুরূপ অর্থাৎ টী পরিমাণ সূর্য উঠার পর শরয়ী অর্ধদিবস পর্যন্ত। বিনা কারণে ঈদুল ফিতরের নামায যদি প্রথম দিনে পড়া না যায় তাহলে দ্বিতীয় দিন পড়া যাবে না। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ঈদুল আযহার সমস্ত আহকাম ঈদুল ফিতরের অনুরূপ। কেবল কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে– ঈদুল আযহায় মুস্তাহাব হলো, নামাযের আগে কিছু না খাওয়া, যদিওবা কোরবানী না করে, আর যদি খেয়ে ফেলে মাকরূহ হবে না। উচ্চস্বরে তকবীর সহকারে রাস্তা দিয়ে গমন করা। ঈদুল আযহার নামায কোন অজুহাতের কারণে বার তারিখ পর্যন্ত বিনা মাকরূহে দেরী করা যায় বার তারিখের পর দেরী করা যায় না। বিনা কারণে দশ তারিখের পর পড়া মাকরূহ। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কোরবানী দাতার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, ১লা জিলহজ্ব থেকে ১০ই জিলহজ্ব পর্যন্ত দাঁড়ি, চুল গোঁফ ও নখ না কাটা। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ আরফার দিবসে অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্বে লোকেরা কোন জায়গায় একত্রে হয়ে হাজীদের মত অবস্থান করা এবং জিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি অপরিহার্য বা ওয়াজিব মনে না করে। আর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে একত্র হয়, যেমন বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযের জন্য তখনও মতদ্বৈততা ছাড়া জায়েয। মূলতঃ ক্ষতি নেই। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা আলিঙ্গন ও করমর্দন করা যেমন

সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে, উত্তম হলো এর মধ্যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। (বশাহুল যয়াদ)

তাকবীরে তাশরীক-এর মাসাঈল

মাসআলাঃ ৯ই জিলহজ্বের ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্বের আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর যেটা জামাত সহকারে আদায় করা হয়, একবার উচ্চস্বরে তকবীর বলা ওয়াজিব, এটাকে তকবীরে তশরীক বলা হয়। তকবীর নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

আল্লাহ্ আকবর আল্লাহ্ আকবর লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওআল্লাহ্ আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ (তানভীরুল আবসার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ তকবীর তাশরীক সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে বলা ওয়াজিব, অর্থাৎ যতক্ষণ এমন কোন কাজ না হয় যে কারণে ঐ নামাযে ভিত্তি করা যাবে না যদি মসজিদের বাইরে হয়ে যায়, তা ইচ্ছাকৃত অযু ভঙ্গ করলো, বা কথা বললো, যদিও ভুলবশতঃ হয় তাহলে তকবীর বাদ পড়ে গেল, আর যদি বিনা ইচ্ছায় অযু ভঙ্গ হয় তখন তকবীর বলে নিবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ শহরে বসবাসকারীর উপর তকবীর তাশরীক ওয়াজিব, বা যে শহরে বসবাসকারীর পিছনে এক্তেদা করে। যদিও এক্তেদাকারী মহিলা বা মুসাফির বা মফস্বলে বসবাসকারী হোক, এসব লোক যদি শহরে বসবাসকারীর এক্তেদা না করে থাকে, তাহলে তাদের উপর ওয়াজিব নয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর এক্তেদা করল, তাহলে ইমামের অনুসরণ মুক্তাদির উপরও ওয়াজিব। যদিওবা ইমামের সাথে সে ফরজ পড়েনি। আর মুকীম যদি মুসাফিরের পিছনে এক্তেদা করে তখন মুকীমের উপর ওয়াজিব। যদিওবা ইমামের উপর ওয়াজিব নয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্রীতদাসের উপর তকবীর তশরীক ওয়াজিব, মহিলাদের উপর ওয়াজিব নয় যদিওবা জামাত সহকারে নামায পড়ে। তবে পুরুষের পিছনে মহিলা নামায পড়লে এবং ইমাম যদি মহিলার ইমাম হওয়ার নিয়্যাত করে তাহলে মহিলার উপরও তকবীর বলা ওয়াজিব হবে। কিন্তু নিম্নস্বরে বলবে। অনুরূপ যারা বিবস্ত্র নামায পড়ে তাদের উপরও ওয়াজিব নয়, যদিও জামাত পড়ে ওদের জামাত মুস্তাহাব জামাত

নয়। (দুর্রুল মোখতার, জাওহেরা ইত্যাদি)

মাসআলাঃ নফল সুন্নত ও বিতরের পর তকবীর ওয়াজিব নয়। জুমার পর তকবীর তশরীক ওয়াজিব, ঈদের নামাযের পরেও বলে নিবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মসবুক ও লাহেক শ্রেণীর মুক্তাদির উপর তকবীর ওয়াজিব। কিন্তু নিজে যখন সালাম ফিরাবে তখন বলবে। ইমামের সাথে বলে নিলেও নামায ফাসেদ হবে না এবং নামায শেষ করার পর তকবীর পুনরায় পড়তে হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ অন্য দিনের নামায ক্বাযা হয়ে গেল তাশরীকের দিনে ওসব নামায কাযা পড়লে তখন তকবীর তশরীক ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ তাশরীকের দিনের নামায অন্য দিনে পড়লে তখনও ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ গত বৎসরের তাশরীক দিবসের কাযা নামায এ বৎসর তাশরীকের দিনে ক্বাযা পড়লে তখন ওয়াজিব হবে না। তবে যদি ঐ বৎসরের তাশরীক দিনের নামায ঐ বৎসরে ঐ দিন সমূহে জামাত সহকারে পড়লে তখন তকবীর তাশরীক বলা ওয়াজিব। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ একাকী নামায আদায়কারীর উপর তকবীর ওয়াজিব নয়। (জাওহেরা নায়্যারা) কিন্তু ছাহেবাঈনের মতে একাকী নামায আদায়কারীর উপর তকবীর বলা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ ইমাম তকবীর বলল না, তখনও মুক্তাদির বলা ওয়াজিব। যদিও বা মুক্তাদি মুসাফির, মহিলা, বা মফস্বলে বসবাসকারী হোক। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ উপরোক্ত তারিখে সাধারণ লোকেরা যদি বাজারে ঘোষণা সহকারে তকবীর বলে, ওদেরকে যেন নিষেধ করা না হয়। (দুর্রুল মোখতার)

গ্রহণের নামাযের বর্ণনা

হাদীস (১) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হল, হুজুর তখন মসজিদে আসলেন এবং দীর্ঘ কেয়াম রুকু ও সিজদা সহকারে নামায আদায় করলেন অথচ আমি তাঁকে এরূপ করতে আর কখনো দেখিনি, অতঃপর বললেন, এগুলো হল আল্লাহর নিদর্শন যা তিনি কখনো কখনো

প্রদর্শন করেন। ইহা কারো মৃত্যুর কারণে বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। অতএব তোমরা যখন এর কিছু দেখবে (চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ) তখন ভীতসন্ত্রস্তভাবে আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাঁর কাছে দোয়া কামনা করবেএবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে।

হাদীস (২) বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে দেখেছি কোন কিছু নেয়ার ইচ্ছে করলেন, আবার পিছনে সরে গেলেন।

উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বেহেস্ত দেখেছিলাম আর বেহেস্তের গাছ হতেএকটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে চেয়েছিলাম। যদি আমি উহা নিতাম তাহলে দুনিয়া বাকী থাকা পর্যন্ত তোমরা তা খেতে পারতে। আমি দোযখও দেখেছিলাম আর আজকের মত এমন বিভৎস দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। আর জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীদেরকেই দেখলাম নারী। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, এয়া রাসুলাল্লাহ! এর কারণ কি? হুজুর বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর কুফরীর কারণে? তিনি বললেন, তারা তাদের স্বামীদের কুফরী করে থাকে এবং তাদের স্বামীদের অনুগ্রহের অস্বীকার করে থাকে। কোন এক মহিলাকে যদি তুমি এ দীর্ঘ সময় আজীবন এহসান বা অনুগ্রহ করে থাক অতঃপর সে যদি তোমার নিকট হতে সামান্য একটু ত্রুটি দেখতে পায় তখন সে নিঃসঙ্কোচে বলে উঠে, আমি তোমার নিকট থেকে কখনও কোন ভাল কিছু পেলাম না।

হাদীস (৩) সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে সূর্য গ্রহণকালে দাসমুক্ত করতে আদেশ করেছেন।

হাদীসঃ সুনানে আরবা-এ- হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন অথচ আমরা তাঁর কেরাত পাঠের শব্দ শুনলাম না। অর্থাৎ কেরাত নিম্নস্বরে পড়েছেন।

ফিকহী মাসায়েলঃ

সূর্য গ্রহণের নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। চন্দ্র গ্রহণের নামায মুস্তাহাব। সূর্য গ্রহণের নামায জামাত সহকারে পড়া মুস্তাহাব। একাকীও পড়া যায়। জামাত সহকারে

পড়লে খোতবা ব্যতীত সমস্ত শর্ত জুমার শর্তের অনুরূপ প্রযোজ্য। সেই ব্যক্তিই এর জামাত কায়েম করতে পারেন, যিনি জুমা পড়াতে পারেন। এ রকম লোক পাওয়া না গেলে একাকী ঘরে বা মসজিদে পড়বে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ গ্রহণের নামায তখনই পড়তে হয় যখন গ্রহণ শুরু হয়। গ্রহণ ছেড়ে দেয়ার পর নয়। গ্রহণ ছেড়ে দিতে শুরু করেছে কিন্তু এখনও বাকী রয়েছে তখনও নামায শুরু করা যাবে। গ্রহণের সময় সেটার উপর মেঘের আবরণ আসলে তখনও নামায পড়া যায়। (জাওয়াহেরো নাইয়্যারা)

মাসআলাঃ এমন সময় গ্রহণ হয়েছে যে সময় নামায নিষিদ্ধ, তখন নামায পড়বে না। বরং দোআয় নিয়োজিত থাকবে। এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে গেলে দোআ শেষ করে মাগরিব নামায পড়বে। (জাওহেরো, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ গ্রহণের নামায নফল নামাযের মত দু'রাকাত পড়বে। অর্থাৎ প্রত্যেক রাকাতে একটি রুকু ও দু'টি সিজদা করবে। এতে আযান ও ইকামত নেই। উচ্চ আওয়াজে কেরাতও পড়বে না। নামাযের পর গ্রহণ ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত দোআয় নিয়োজিত থাকবে। দু'রাকাতের অধিকও পড়া যায়। দু'রাকাত পরপর বা চার রাকাত পর সালাম ফিরা যায়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি লোকজন নামাযের জন্য সমবেত না হয়, তাহলে اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ শব্দ যোগে আহ্বান করা যায়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ উত্তম হলো ঈদগাহ বা জামে মসজিদে গ্রহণের জামাত কায়েম করা। অন্য জায়গায় কায়েম করলেও ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যদি স্মরণ থাকে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান এর মত বড় বড় সূরা সমূহ পাঠ করবে এবং রুকু সিজদা দীর্ঘায়িত করবে। নামাযের পর সূর্য গ্রহণ ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত দোআয় মশগুল থাকবে। নামায সংক্ষিপ্ত করে দোআ দীর্ঘায়িত করাও জায়েয আছে। ইমাম কেবলামুখী হয়েও দুআ করতে পারেন বা মুক্তাদিগণের দিকে মুখ করেও দাড়াতে পারেন– এটা উত্তম। সব মুক্তাদি আমীন বলবে। দোআ করার সময় লাঠি বা কামানের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোও উত্তম। তবে দোআ করার জন্য মিম্বরের উপর যাবে না। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ সূর্য গ্রহণ ও জানাযা নামায যখন একত্র হয় প্রথমে জানাযার নামায পড়বে। (জাওহেরো)

মাসআলাঃ চন্দ্র গ্রহণের নামাযে জামাত নেই। ইমাম উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় একাকী পড়বে। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি) ইমাম ব্যতীত দু'তিন ব্যক্তি নিয়ে জামাত করা যায়।

এমন কতিপয় সময় যখন নামায পড়া মুস্তাহাব

মাসআলাঃ প্রচণ্ড অন্ধকার হল, বা দিনে ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গেল বা রাতে ভয়ংকর আলো দেখা গেল বা অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে লাগলো, বা আকাশ লাল হয়ে গেল, অধিকহারে বিদ্যুৎ চমকালো, শীলা বর্ষণ হলো, প্লেগ বা মহামারি ইত্যাদি দেখা দিল বা ভূমিকম্প আসলো। বা শত্রুর ভয় বা ভয়ানক কোন কিছু দেখা দিল, এসব অবস্থায় দু'রাকাত নামায মুস্তাহাব। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার ইত্যাদি) কতিপয় হাদীসে অন্ধকারের যে বর্ণনা আলোকপাত হয়েছে, এস্থানে তা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি– যেন মুসলমানরা এর উপর আমল করতে পারেন। আল্লাহ তৌফিক নসীব করুন!

অন্ধকার মেঘ ও বিদ্যুৎ গর্জনের সময় দোআ পড়ার বর্ণনা

হাদীস (১) সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাতাস যখন প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَهَا وَخَیْرَ مَا فِیْهَا وَخَیْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا فِیْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর ভাল দিকটি এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তাহা এবং একে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তার ভাল দিকটি প্রার্থনা করছি এবং এর মন্দ দিকটি হতে, এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে এবং যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে এর মন্দ দিক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাদীস (২) ইমাম শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী প্রমুখ 'দাওয়াতে কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বাতাস আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত যা অনুগ্রহ ও শাস্তি নিয়ে আসে। বাতাসকে মন্দ বলো না, আল্লাহর নিকট এর কল্যাণ প্রার্থনা কর আর মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

হাদীস (৩) তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সামনে বাতাসকে অভিসম্পাৎ দিল, রাসূলুল্লাহ্ এরশাদ করেন, বাতাসকে অভিসম্পাত দিও না, বাতাস আদিষ্ট বস্তু। যে ব্যক্তি কোন বস্তুর উপর অভিসম্পাত করলো ঐ বস্তু অভিসম্পাতের উপযুক্ত না হলে, ঐ অভিসম্পাত লা'নতকারীর দিকে ফিরে আসবে।

হাদীস (৪) আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ ও ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হত, তখন হুযুর কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং আকাশমুখী হয়ে এ দোয়া পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তোমার নিকট উহার যা কিছু অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মেঘ সরে গেলে আল্লাহর প্রার্থনা করতেন এবং বৃষ্টিপাত হলে এ দোয়া পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا

অর্থঃ হে আল্লাহ! উপকারী পানি বর্ষণ কর।

হাদীস (৫) ইমাম আহমদ ও তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মেঘ ও বিদ্যুতের গর্জন শুনতেন নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

অর্থঃ তুমি আমাদের তোমার রাগ ও রোষের দ্বারা হত্যা করো না। তোমার শাস্তি দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না এবং ইহার পূর্বেই আমাদেরকে শান্তি দান কর।

হাদীস (৬) ইমাম মালেক হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মেঘের আওয়াজ শুনতেন, তখন কথাবার্তা বলা বর্জন করতেন এবং বলতেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ আমি সেই সত্ত্বার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যার পবিত্রতা ঘোষণা করে মেঘের

গর্জন তাঁর প্রশংসার সাথে এবং ফেরেস্তাকুল পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ভয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

হাদীস (৭) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন মেঘের গর্জন শুনবে, তখন আল্লাহর তসবীহ পাঠ করো, তকবীর বলো না।

ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযের বর্ণনা

মহান আল্লাহপাক এরশাদ করেনঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থঃ এবং তোমাদেরকে যে মুসীবত স্পর্শ করেছে, তা তারই কারণে যা তোমাদেরকে হাতগুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছু তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরা, পারা- ২৫, আয়াত- ৩০) সুতরাং এমতাবস্থায় অধিকহারে এস্তেগফার করা অতীব প্রয়োজন এটাও তার মহ ন অনুগ্রহ যে, তিনি অনেক কিছু ক্ষমা করেন। অন্যথায় যদি সব বিষয়ে পাকড়াও করতেন তাহলে গন্তব্য কোথায়?

এরশাদ হচ্ছেঃ

لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

অর্থঃ এবং যদি আল্লাহ্ মানবকুলকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তবে পৃথিবী পৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকেই ছাড়তেন না। (সূরা ফাতির, পারা- ২২, আয়াত- ৪৫)

আরো এরশাদ করেনঃ

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ
وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا

অর্থঃ আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রাথনা করো, তিনি মহা ক্ষমাশীল। তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন এবং সম্পদ ও সন্তান দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগান বানিয়ে দেবেন; আর তোমাদের জন্য নহর সমূহ প্রবাহিত করবেন। (সূরা নূহ, পারা- ২৯, আয়াত- ১১-১২)

হাদীস (১) ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ওজন ও

পরিমাপে কম দেয় সে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যুযন্ত্রণা এবং বাদশাহর অত্যাচারে নিপতিত হবে। যদি চতুষ্পদ প্রাণীগুলো না হতো তাদের উপর বৃষ্টিপাত হতো না।

হাদীস (২) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দুর্ভিক্ষ এটা নয় যে, তোমাদের প্রতি বৃষ্টিপাত হবে না। বরং ভয়াবহ দুভিক্ষ এটা যে, তোমাদের প্রতি বৃষ্টিপাত হবে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে বটে অথচ জমীন কিছুই উৎপাদন করবে না।

হাদীস (৩) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইস্তিস্কা ব্যতীত তাঁর কোন দোয়াতেই দু'হাত উত্তোলন করতেন না। এতে তিনি এতটুকু হাত উঠাতেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেতো।

হাদীস (৪) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আনস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন এবং হাতলীদ্বয়ের পিট আকাশের দিকে রাখলেন। (দোয়ার মধ্যে নিয়ম হলো, হাতলীদ্বয় আকাশের দিকে করা। ইস্তিস্কার দোআয় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হাতলীদ্বয়কে উপুড় করে মুনাজাত করার দ্বারা অবস্থার পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে)

হাদীস (৫) তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম পুরাতন কাপড় পরিধান করে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন, বিনয় সহকারে, ভয় বিহ্বল অবস্থায়, কাতরভাবে ফরিয়াদ করতে করতে।

হাদীস (৬) আবু দাউদ শরীফে হযরত উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামার নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল, তখন তিনি একটি মিম্বর স্থাপন করতে আদেশ করলেন, অতঃপর তাঁর জন্য ঈদগাহে মিম্বর রাখা হল এবং তিনি তাদেরকে কথা দিলেন যে, তিনি নির্দিষ্ট একদিন ঈদগাহের দিকে বের হবেন। হযরত আয়েশা (রঃ) বলেন, সে মতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন সূর্যের কিনারা উদয় হতেই ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং মিম্বরের উপর বসলেন, তারপর আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করলেন এবং তার প্রশংসা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা (আল্লাহ ও রাসূলের কাছে) তোমাদের শহরে অনাবৃষ্টি ও বৃষ্টির

মৌসুম অতিক্রান্ত হবার পরও বৃষ্টি বিলম্ব হবার অভিযোগ করেছো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁকে ডাক এবং তিনি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْتَ قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক, দয়াময় ও অতিশয় দয়ালু। বিচার দিনের মালিক, তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা করেন, তুমি অমুখাপেক্ষী আমরা তোমারই মুখাপেক্ষী ফকীর। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আর যা বর্ষণ করবে তা আমাদের জন্য শক্তি ও কল্যাণের কারণ বানাও, যেন আমরা উহা দ্বারা দীর্ঘদিন যাবৎ উপকৃত হতে পারি।

অতঃপর তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এতটা উত্তোলন করলেন যে, নিজের বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রকাশ হল। অতঃপর জনতার দিকে পিঠ ঘুরালেন এবং নিজের চাদর উল্টায়ে দিলেন, তখনও তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলিত ছিল। তারপর জনতার দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিম্বর হতে নামলেন। অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়ালেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালা এক খণ্ড মেঘ সৃষ্টি করলেন, মেঘ গর্জন করল এবং বিদ্যুৎ চমকাল, বৃষ্টি বর্ষণ হল, আল্লাহর নবী তাঁর মসজিদে আসতে না আসতেই বৃষ্টির পানির ঢল নামল।

হাদীস (৭) ইমাম মালেক ও আবু দাউদ হযরত আমর বিন শোয়াইব (রঃ) হতে তিনি তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন, বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে এবং তোমার পশুদেরকে পানি দান কর এবং এদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ ছড়িয়ে দাও এবং তোমার মৃত জমীনকে প্রানবন্ত কর।

হাদীস (৮) আবু দাউদ শরীফে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইস্তিস্কায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে এ দোয়া পাঠ করতে দেখেছিঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান কর যা সুপেয় ফসল উৎপাদনকারী। উপকারী ক্ষতিকর নহে। শীঘ্রই আগমনকারী বিলম্বকারী নয়। হুযুর এ দোয়া পড়ার সাথে সাথেই মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিতে লাগিল।

হাদীস (৯) সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আনস (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হত, তখন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের উসীলায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন। তখন তিনি বলতেন হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আমাদের প্রিয় নবীর উসীলায় (তাঁর জীবদ্দশায়) বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতাম, আর এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচা হযরত আব্বাস (রঃ) এর উসীলায় বৃষ্টির প্রার্থনা করছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। যখন এরূপ বলতেন বৃষ্টি দান করা হতো। (অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার জীবদ্দশায় হুযুর আমাদের সামনে হতেন আমরা হুযুরের পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দোয়া করতাম (ওফাতের পর) এখন যেহেতু এটা সম্ভব নয় আমরা হুযুরের চাচাকে সামনে রেখে দোয়া করছি। এটাও হুযুরের প্রতি উসীলার নামান্তর। জাগতিকভাবে সম্ভব না হলে আত্মিকভাবে উসীলা ধারণ করা যায়।

ফিকহী মাসায়েলঃ

ইস্তিস্কা দোআ ও এস্তেগফারের বা ক্ষমা প্রার্থনার নাম। ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামায জামাত সহকারে পড়া জায়েয। কিন্তু এর জন্য জামাত সুন্নত নহে। জামাতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক উভয়টা এখতিয়ার রয়েছে। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ইস্তিস্কার জন্য পুরাতন বা জোড়া তালিকৃত কাপড় পরিধান করে, বিনয় ও নম্রতার সাথে খালি মাথায় পায়ে হেটে গমন করবে এবং পা খালি রাখলে উত্তম। যাবার পূর্বে দান খায়রাত করবে, কাফেরদেরকে সঙ্গে নিবে না। যাওয়া হচ্ছে রহমতের জন্য কাফের সাথে থাকলে অভিসম্পাতের কারণ হবে। তিন দিন পূর্ব থেকে রোজা রাখবে। তওবা ও এস্তেগফার করবে। অতঃপর ময়দানে গমন

করবে। ওখানে তওবা করবে মৌখিক তওবা যথেষ্ট নয় বরং অন্তরে তওবা করবে। নিজ জিম্মায় কারো হক থাকলে সবগুলো আদায় করবে বা ক্ষমা চেয়ে নেবে। দুর্বল, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও শিশুদের উসীলায় দোয়া করবে সবাই আমীন বলবে। সহীহ বোখারী শরীফে আছে যে, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দুর্বল, অসহায়দের উসীলায় তোমরা জীবিকা ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকো। অপর এক বর্ণনায় আছে– যদি বিনয়ী যুবক, বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী রুকুকারী বৃদ্ধ এবং দুধপানকারী শিশু না হতো, তাহলে তোমাদের উপর কঠিন আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ হতো। সে সময় শিশুকে তার মায়ের নিকট থেকে পৃথক রাখবে। চতুষ্পদ জন্তুও সঙ্গে নিবে। মূলকথা রহমত প্রাপ্তির সব উপকরণ প্রস্তুত রাখবে এবং লাগাতার তিন দিন জঙ্গলে যাবে। দোয়া করবে। এভাবেও করতে পারে যে, ইমাম প্রকাশ্য কেরাতযোগে দু'রাকাত নামায পড়াবে। উত্তম হলো প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ এবং দ্বিতীয় রাকাতে هَلْ اَتٰكَ পড়া। নামাযের পর জমিনে দাড়িয়ে খোতবা পড়বে। উভয় খোতবার মাঝখানে বসবে। একটি খোতবাও পড়া যাবে খোতবায় দু'আ, তাসবীহ, এস্তেগফার পড়বে। খোতবার মাঝখানে চাদর উল্টায়ে দেবে অর্থাৎ উপরের দিক নীচে আনবে এবং নীচের দিকটা উপরে তুলবে। যেন অবস্থা পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে। খোতবা শেষে মানুষের দিকে পিঠ এবং কেবলার দিকে মুখ করে দোয়া করবে। হাদীসে বর্ণিত দোয়া সমূহ হচ্ছে উত্তম দোয়া। দোয়ার সময় হাত ভালভাবে উপরে তুলবে এবং হাতের পিঠ আসমানের দিকে রাখবে। (আলমগীরি, গুনীয়া, দুররুল মোখতার, জাওহেরা ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ময়দানে যাবার পূর্বে বৃষ্টিপাত হয়ে গেলেও গমন করবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। বৃষ্টির সময় হাদীসে বর্ণিত দোয়াটি পড়বে। মেঘ গর্জন করলে তখন দোয়া পড়বে। বৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দাড়াবে যেন শরীরে পানি পৌছে। (দুররুল মোখতার রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বৃষ্টিপাত অধিক হলে ক্ষতিকর মনে হলে, বৃষ্টি বন্ধের জন্য হাদীসে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ, টিলা, পাহাড় পর্বত, নালা যেখানে উদ্ভিদ জন্মায় সর্বত্র পানি বর্ষণ করুন। এ হাদীসটি বোখারী মুসলিম হযরত আনাস (রঃ) হতে বর্ণনা করেন।

ভয়কালীন নামাযের বর্ণনা

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেনঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

অর্থঃ অতঃপর যদি আশংকায় থাকো, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় যেমনি সম্ভব হয় অতঃপর যখন নিরাপদে থাকো তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করো। যেমন তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা, আয়াত- ২৩৯)

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا - فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

(সূরা নিসা, পারা-৫, আয়াত-১০১-১০৩)

অর্থঃ এবং হে মাহবুব! যখন আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন, অতঃপর নামাযে তাদের ইমামত করেন, তখন উচিৎ যেন তাদের মধ্য থেকে একটা দল আপনার সঙ্গে থাকে এবং তারা (অপর দল) নিজেদের হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাকে। অতঃপর যখন তারা (যারা সাথে নামায আরম্ভ করেছে) সাজদা করে নেয় তখন তারা হটে গিয়ে তোমাদের পিছনে এসে যাবে এবং এখন দ্বিতীয় দল আসবে, যারা এখনো পর্যন্ত নামাযে শরীক ছিলো না। এখন তারা আপনার মুক্তাদী হবে এবং উচিৎ যেন স্বীয় আশ্রয় এবং হাতিয়ার নিয়ে অবস্থান করে। কাফিরদের কামনা হচ্ছে যে, কখনো তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং আসবাবপত্র থেকে অসতর্ক হয়ে যাবে, তখনই তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবং বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা পীড়িত হও তবে স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখার মধ্যে তোমাদের ক্ষতি নেই এবং আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করো। নিশ্চয়ই

আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন। অতঃপর যখন তোমরা নামায পড়ে নাও তখন আল্লাহর স্মরণ করো, দণ্ডায়মান হয়ে ও উপবিষ্ট হয়ে, এবং কবট সমূহের উপর শুয়ে। অতঃপর যখন নিরাপদ হয়ে যাও তখন বিধি মোতাবেক নামায কায়েম করো। নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত সময়ে ফরয।

হাদীসঃ তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম উসফান ও দাজ্নান নামক এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন মুশরিকরা বললো, ওদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) এমন একটি নামায আছে যা তাদের পিতামাতা ও সন্তানাদি হতেও তাদের নিকট অতি প্রিয়। তা হল তাঁদের আসর নামায। সুতরাং তোমরা সংঘবদ্ধ হও এবং তোমাদের সিদ্ধান্তকে পাকাপোক্ত করে নাও এবং নামাযরত অবস্থায় তাদের উপর হঠাৎ একযোগে আক্রমণ করো। এ সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামার নিকট হাজির হলেন এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে দু'দলে বিভক্ত করতে নির্দেশ দিলেন আর তিনি যেন একদলকে নামায পড়ান এবং অপর দল তাদের পিছনে শত্রুর মুকাবিলায় দাড়িয়ে থাকে। এতদভিন্ন তারা যেন সদা সতর্ক থাকে এবং সশস্ত্র প্রস্তুত থাকে। এতে তাদের এক রাকাত এবং রাসূলুল্লাহর দু'রাকাত হবে।

হাদীসঃ সহীহ্ বোখারী শরীফ ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাথে যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হলাম, যখন আমরা 'যাতুর রেকা' নামক স্থানে পৌছলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তথায় আমরা একটা ছায়াদার বৃক্ষের নিকট আসলাম এবং যথারীতি তা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামার জন্য ছেড়ে দিলাম। রাবী বলেন, (হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম বৃক্ষের ছায়ায় আরাম করতেছিলেন) এমন সময় মুশরিকদের এক ব্যক্তি এসে বলল, এ সময় হুজুরের তরবারী বৃক্ষের সাথে ঝুলন্ত ছিল। লোকটি এসে হুজুরের তরবারীটি নিজের হাতে নিল এবং তা কোষমুক্ত করল এবং রাসূলুল্লাহকে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় কর? হুজুর বললেন, কখনও না। লোকটি বলল, এখন কে তোমাকে আমার থেকে রক্ষা করবে? হুজুর বললেন, আল্লাহ তাআলাই আমাকে তোমার থেকে রক্ষা করবেন। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহর ছাহাবাগণ তাকে ভয় দেখাল, ফলে সে তরবারী

কোষবদ্ধ করে পূর্ববৎ ঝুলায়ে রাখল। অতঃপর নামাযের আযান দেয়া হল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে একদল লোককে দু'রাকাত নামায পড়ালেন অতঃপর তাঁরা পিছনে সরে গেল এবং অপর দল সম্মুখে অগ্রসর হল এবার তিনি দ্বিতীয় দলকেও দু'রাকাত নামায পড়ালেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামার নামায হল মোট চার রাকাত আর লোকদের হয়েছিল দুই দুই রাকাত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাথে।

ফিকহী মাসায়েলঃ

ভয়ের নামায জায়েয। শত্রুর নিকটবর্তী হওয়াটা যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তখন ভয়ের নামায জায়েয। যদি এ ধারণা হয় যে, শত্রু নিকটবর্তী হয়েছে এবং ভয়ের নামায পড়েছে পরবর্তীতে ধারণা ভুল প্রমাণিত হল, তখন মুক্তাদি নামায পুনরায় পড়বে। অনুরূপ শত্রু যদি দূরবর্তী হয়, তাহলে এ নামায জায়েয নেই। অর্থাৎ মুক্তাদির হবে না ইমামের হয়ে যাবে। ভয়ের নামাযের নিয়ম হলো যে, শত্রু যখন মুখোমুখি হবে এবং আশংকা হয় যে, সবাই একসাথে নামায পড়লে আক্রমণ করবে– এমতাবস্থায় ইমাম জামাতকে দু'দলে বিভক্ত করবে। যে দল পরে পড়তে সম্মত হবে তারা শত্রুর মোকাবিলা করবে। দ্বিতীয় দলের সাথে পূর্ণ নামায পড়ে নেবে। অতঃপর যে দল নামায পড়েনি, ওদের মধ্যে কেউ ইমাম হবে এবং এসব লোক তার সাথে জামাতে নামায পড়বে। দু'দলের কেউ যদি পরে পড়তে সম্মত না হয় তখন ইমাম একদলকে শত্রুর মুকাবিলায় দাড় করাবে। দ্বিতীয় দল ইমামের পিছনে নামায পড়বে। ইমাম যখন এ দলের সাথে এক রাকাত পড়বে, অর্থাৎ প্রথম রাকাত, দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠায়ে এ দল শত্রুর মোকাবিলায় দাড়াবে। যারা ওখানে ছিল তারা এখন চলে আসবে, এখন ইমাম তাদের সাথে বাকী এক রাকাত পড়বে এবং তাশাহ্হুদ পড়ার পর সালাম ফিরাবে। কিন্তু মুক্তাদি সালাম ফিরাবে না। বরং ওসব লোক শত্রুর মোকাবিলায় দাড়াবে অথবা ওখানেই নিজেদের নামায পূর্ণ করে নেবে এবং অপর দলের লোকেরা আসবে। আর এক রাকাত কেরাত বিহীন পড়ে তাশাহ্হুদের পর সালাম ফিরাবে এটাও হতে পারে যে, এ দল আসবে না বরং ওখানেই নিজেদের নামায পূর্ণ করে নেবে। দ্বিতীয় দল যদি নামায পূর্ণ করে নেয় তাহলে তো ভাল অন্যথায় এখন পূর্ণ করে নেবে। ওসব লোক ওখানে হোক বা পৃথকভাবে কেরাত সহকারে নিজের এক রাকাত পড়ে নেবে এবং তাশাহ্হুদের পর সালাম ফিরাবে। এ নিয়ম হলো দু'রাকাত বিশিষ্ট

নামাযের। নামায দু'রাকাত বিশিষ্ট হোক যেমন ফজর, ঈদ, জুমআ বা সফরের কারণে চার রাকাতের স্থলে দু'রাকাত। অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামায হোক– তাহলে প্রত্যেক দলের সাথে ইমাম দু-দু রাকাত পড়বে। মাগরীবের নামাযে প্রথম দলের সাথে দু'রাকাত দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়বে। যদি প্রথম দলের সাথে এক রাকাত দ্বিতীয় দলের সাথে দু'রাকাত পড়ে তাহলেও নামায হবে। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ উপরোক্ত বিধান সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ইমাম ও মুক্তাদি সকলেই মুকীম হবে বা সকলে মুসাফির হবে। অথবা ইমাম অবস্থানকারী এবং মুক্তাদি মুসাফির হলে ইমাম যদি মুসাফির হয় মুক্তাদি যদি অবস্থানকারী হয় তাহলে ইমাম এক দলের সাথে এক রাকাত পড়বে এবং দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিলে অতঃপর প্রথম দল আসবে তিন রাকাত কেরাত বিহীন পড়বে অতঃপর দ্বিতীয় দল আসবে এবং তিন রাকাত পড়বে প্রথম রাকাতে ফাতেহা ও সূরা পড়বে। ইমাম যদি মুসাফির হয়, আর কিছু মুক্তাদি যদি মুকীম হয়, আর কিছু মুসাফির হয়, তাহলে মুকীম, মুকীমের নিয়মানুসারে আমল করবে। মুসাফির, মুসাফির হিসেবে আমল করবে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ এক রাকাতের পর শত্রুর মোকাবিলায় পদব্রজে যাবে বাহনের উপর আরোহন করে গেলে নামায ভঙ্গ হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ভয় যদি অধিক হয় বাহন থেকে অবতরণ করা না যায় তখন বাহনের উপর একাকী ইঙ্গিত সহকারে যেদিকে মুখ করা যায় সেদিকে নামায পড়বে। বাহনের উপর জামাত সহকারে পড়া যাবে না। তবে একটি ঘোড়ার উপর যদি দু'জন আরোহী হয়, তাহলে পিছনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অগ্রবর্তীর এক্তেদা করতে পারবে এবং বাহনের উপর ফরজ নামায তখনই জায়েয হবে যখন শত্রু পশ্চাদানুসরণ করতে থাকে। আর যদি শত্রুর পশ্চাদানুসরণের কবলে না পড়ে তাহলে বাহনের উপর নামায হবে না। (জাওহেরা, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ভয়ের নামাযে কেবল শত্রুর সম্মুখীন যাওয়া ওখান থেকে ইমামের পার্শ্বে সারিতে দাড়ানো অথবা অজু নষ্ট হলে অজু করতে যাওয়া ক্ষমাযোগ্য। এতদভিন্ন চলাচল করলে নামায ভঙ্গ হবে। শত্রু যদি তাকে ধাওয়া করে অথবা সে শত্রুকে ধাওয়া করেছে তাহলে নামায ভঙ্গ হবে। অবশ্য প্রথম অবস্থায় যদি বাহনের

উপর হয় ক্ষমাযোগ্য। (দুর্‌রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বাহনের উপর ছিল না নামাযের মধ্যে বাহনে আরোহণ করলো, নামায ভঙ্গ হবে– যে কোন উদ্দেশ্যে আরোহণ করুন না কেন। যুদ্ধ করার কারণেও নামায ভঙ্গ হবে। তবে একটি তীর নিক্ষেপের অনুমতি রয়েছে। (দুর্‌রুল মোখতার) অনুরূপ বর্তমানে বন্দুকের একটি ফায়ার করারও অনুমতি রয়েছে।

মাসআলাঃ নদীতে সন্তরণকারী যদি সামান্য দেরীক্ষণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া ব্যতীত থাকতে পারলে ইশারায় নামায পড়বে। অন্যথায় নামায হবে না। (দুর্‌রুল মোখতার)

মাসআলাঃ যুদ্ধে নিয়োজিত যেমন তরবারী চলমান রয়েছে নামাযের সময়ও শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে নামায বিলম্ব করবে। যুদ্ধ শেষে নামায পড়বে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বিদ্রোহী এবং সেসব ব্যক্তি যাদের সফর কোন গুনাহের জন্য হলে সালাতুল খওফ তথা ভয়ের নামায জায়েয নেই। (দুর্‌রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ভয়ের নামায চলছিল, নামাযের মধ্যে যদি ভয় দূরীভূত হয়, অর্থাৎ শত্রু চলে যায় অবশিষ্ট নামায স্বাভাবিক নিয়মে শান্তিপূর্ণভাবে পড়বে। তখন ভয়ের নামায জায়েয হবে না।

মাসয়ালাঃ শত্রু চলে যাওয়ার পর কেউ কেবলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ ভয়ের নামাযে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখা মুস্তাহাব। ভয়ের নামাযে কেবল প্রয়োজনে চলা জায়েয। নিছক ভয়ের কারণে নামাযে কসর করা যাবে না। (আলমগীরি, দুর্‌রুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ ভয়ের নামায শত্রুর ভয়ে যেমন পড়া জায়েয তেমনিভাবে প্রাণী ও বড় সর্প ইত্যাদির ভয়েও জায়েয আছে।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

জানাযার অধ্যায়

রোগ ব্যাধির বর্ণনা ও এর উপকারিতা

রোগও একটি বড় নিয়ামত। এর উপকারিতা অসংখ্য যদিওবা বাহ্যিকভাবে এর দ্বারা মানুষের কষ্ট হয়। বাস্তবিক পক্ষে এর দ্বারা আরাম ও বিশ্রামের একটি বড় ভান্ডার হস্তগত হয়। বাহ্যিক রোগব্যাধি যেটাকে মানুষ রোগ মনে করে থাকে প্রকৃতপক্ষে এটা রূহানী রোগ সমূহের একটি শক্তিশালী চিকিৎসা। রূহানী রোগ হচ্ছে প্রকৃত রোগ। এটা অবশ্যই বড় ভয়ানক বিষয়। এটাকেই ধ্বংসকারী রোগ মনে করা উচিৎ। অনেক বড় কথা যা প্রত্যেক লোকই জানে যে, যে যতই অলস হোক কিন্তু যখনই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন কি পরিমাণ আল্লাহকে স্মরণ করে তওবা ও এস্তেগফার করে থাকে, এটাতো উস্তাদের সম্মানিত লোকদের মর্যাদা। কষ্টকেও এমনভাবে অভ্যার্থনা জানায় সাদরে গ্রহণ করে যে,

راحت کاع آنچه از دوست میرسید نیکوست

কমপক্ষে আমরা যেন এতটুকু করি যে, ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করি, ভীত ও অধৈর্য্যতা প্রকাশ করে ছওয়াব হাতছাড়া করবে না। এতটুকু তো প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, অধৈর্য্যতা প্রকাশ করলে আগত বিপদাপদ দূর হবে না। এতবড় ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়াটা আর একটি মুসীবত বৈ কি? অনেক অজ্ঞ ব্যক্তিরা অসুস্থাবস্থায় বেহুদা কথাবার্তা বলে থাকে, বরং অনেক কথা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (আল্লাহ ক্ষমা করুক!) এটাকে আল্লাহ্ তায়ালার জুলুম বলে মন্তব্য করে, এ ধরনের উক্তি ইহকাল-পরকালের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায়। এখন আমরা রোগ ব্যাধির অনেক উপকারিতা যেগুলো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা আলোকপাত করার প্রয়াস করি। মুসলমানরা যেন নিজেদের সম্মানিত রসূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামার বাণী সমূহ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, আল্লাহ্ তায়ালা তৌফিক দান করুন।

হাদীস (১-২) সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করেন, মুসলমানের যে দুঃখ যাতনা কষ্ট গ্লানি আসে, কাঁটা বিদ্ধ হলে আল্লাহ্ তায়ালা এর উসীলায় তার গুনাহ্ বিলোপ করেন।

হাদীস (৩) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রঃ) হতে বর্ণিত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মুসলমানের যে দুঃখ কষ্ট হয় রোগে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক আল্লাহ্ তায়ালা এর উসীলায় বান্দার গুনাহসমূহ ফেলে দেন যেমন বৃক্ষ থেকে পাতা সমূহ ঝরে পড়ে।

হাদীস (৪-৫) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মে সায়েবের নিকট তাশরীফ নিলেন আর বললেন, তোমার কি হলো? তুমি যে কাঁপছো? আরজ করলেন– জ্বরাক্রান্ত হয়েছি, আল্লাহ্ এর মধ্যে বরকত দিচ্ছে না। হুজুর এরশাদ করেন জ্বরকে মন্দ বলো না, এ রোগ গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে ফেলে, যেমন কর্মকার লৌহার মরিচাকে পরিষ্কার করে থাকে। অনুরূপ হাদীস সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে।

হাদীস (৬) সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আনস (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, যখন আমার বান্দার চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় অতঃপর সে ধৈর্য্য অবলম্বন করে তাহলে চোখের বিনিময়ে তাঁকে জান্নাত দান করব।

হাদীস (৭) তিরমিযী শরীফে আছে হযরত উমাইয়া হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রঃ)র নিকট নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতের মর্মার্থ জিজ্ঞেস করলেন,

إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ যা তোমাদের অন্তরে আছে তা প্রকাশ করো বা গোপন করো আল্লাহ তোমাদের থেকে এর হিসেব নিবেন।

অন্য আয়াতে

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

অর্থঃ যে মন্দ কাজ করবে এর প্রতিদান তাকে দেয়া হবে। যখন প্রতিটি মন্দ কাজের প্রতিদান রয়েছে এবং যে বিপদাশংকা অন্তরে বিরাজ করে, এরও ছওয়াব রয়েছে– তাহলে বড় মুশকিল হচ্ছে এর থেকে কে পরিত্রাণ পাবে। আয়েশা ছিদ্দিকা

বললেন, যখনই আমি হুজুরের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি, আমার নিকট কেউ আর জিজ্ঞেস করেনি, হুজুর এরশাদ করেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তোষ। আল্লাহ বান্দাকে জ্বর (রোগ ব্যাধি) কষ্ট, বিপদ দেন। এমন জমার আস্তিনে রাখা সম্পদ হারিয়ে গেলে এসব কারণে যদি ভীতির সম্মুখীন হয়– এর উসীলায় আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের করেন যেমন ভাঁটি থেকে লাল স্বর্ণ বের করা হয়। অর্থাৎ গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যেমন কর্মকারের ভাটি থেকে স্বর্ণ মরিচামুক্ত হয়ে বের হয়।

হাদীস (৮) তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মুসা (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, গুনাহের কারণেই বান্দার নিকট কম বেশী দুঃখ কষ্ট পৌছে, আল্লাহ তায়ালা যা ক্ষমা করেন তা অনেক বড় এবং এ আয়াত পাঠ করেনঃ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

অর্থঃ এবং তোমাদেরক যে মুসীবত স্পর্শ করেছে, তা তারই কারণে যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছু তো তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরা, পারা-২৫, আয়াত- ৩০)

হাদীস (৯-১০) শরহে সুন্নতে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বান্দার ইবাদত যখন সঠিক নিয়মানুযায়ী হবে অতঃপর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য নিযুক্ত ফেরেস্তাকে বলা হয়, ওর জন্য এমন আমল লিখ যেরূপ রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ছিলো। এমনকি আমি রোগ থেকে আরোগ্য দান করি এবং আমার দিকে ডাকি অর্থাৎ মৃত্যু দান করি। হযরত আনস (রঃ)র বর্ণনায় আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মুসলমান যখন শারিরীক কোন বিপদে পতিত হয়, ফেরেস্তাকে হুকুম করা হয়, ওর আমল নামায় পূর্বের ন্যায় ছওয়াব লিখ, তখন আরোগ্য লাভ করে গুনাহ থেকে পরিষ্কার হয়। যখন মৃত্যু হয়, তখন তাকে ক্ষমা করা হয় এবং রহমত করা হয়।

হাদীস (১১) তিরমিযী, সহীহ্ ও হাসান সূত্রে ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী সাদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কার উপর বিপদ অধিক ভয়াবহ হয়? ফরমালেন– নবীদের উপর, অতঃপর যারা শ্রেষ্ঠ

অতঃপর যারা শ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে ধার্মিকতা যতটুকু থাকে ততটুকু পরিমাণ বিপদে পরীক্ষা করা হয়। যে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় হয় তার উপর বিপদও কঠিন হয়। দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বল হলে তার উপর নিমজ্জিত বিপদও সহজ হয়। যে সর্বদা বিপদে নিমজ্জিত থাকে এমনকি এভাবে জমীনে বসবাস করে তার উপর কোন গুনাহ থাকে না।

হাদীস (১২) তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ আনাস (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বিপদ যতো অধিক হবে ছওয়াব অনুরূপ অধিক হবে এবং আল্লাহ যখন কোন গোত্রকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে বিপদে ফেলেন যে এতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য সন্তুষ্টি আর যে অসন্তুষ্ট তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে। তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তায়ালা বান্দার কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়াতেই শাস্তি দান করেন আর যার অকল্যাণ ইচ্ছা করেন তার গুনাহের বিনিময় দেন না। কিয়ামতের দিবসে তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।

হাদীস (১৩) ইমাম মালেক ও তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মুসলমান নর-নারীর জান-মাল ও সন্তানাদির উপর সর্বদা বিপদ লেগে থাকে এমনকি সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার উপর কোন গুনাহ থাকবে না।

হাদীস (১৪) আহমদ ও আবু দাউদ মুহাম্মদ বিন খালিদ সূত্রে তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বান্দার জন্য আল্লাহর ইলমে কোন মর্যাদা নির্ধারিত হয়, আমলের বিনিময়ে যদি সে মর্যাদায় পৌঁছতে না পারে তখন তাকে জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। অতঃপর তাকে ধৈর্য দান করেন। এমনকি তাকে ঐ মর্যাদায় উপনীত করা হয়– যা তার জন্য আল্লাহর ইলমে রয়েছে।

হাদীস (১৫) তিরমিযী জাবের (রঃ) হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিনে বিপদগ্রস্তদের যখন ছওয়াব দেয়া হবে তখন সুস্থ লোকেরা আকাঙ্খা করবে যে, দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের চামড়া কর্তন করা হতো।

হাদীস (১৬) আবু দাউদ, আমেরুর রাম (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রোগীদের ব্যাপারে আলোচনা করলেন, মুমিন যখন রোগাক্রান্ত হয় অতঃপর সুস্থ হয়ে যায় তার রোগব্যাধি গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ হয়। মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতঃপর সুস্থ হয় তার দৃষ্টান্ত উটের ন্যায়। যে উটকে মালিক বধেছে অতঃপর ছেড়ে দিয়েছে, উটের এটা জানা নেই যে, ওকে কেন বাঁধা হল এবং কেন ছেড়ে দেয়া হল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল– এয়া রাসূলাল্লাহ! রোগ-ব্যাধি কি? আমি তো কখনো অসুস্থ হইনি। ফরমালেন, আমাদের নিকট থেকে উঠে যাও, তুমি আমাদের দলভুক্ত নও।

হাদীস (১৭) ইমাম আহমদ শাদ্দাদ বিন আওস (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, যখন আমি আমার বান্দাকে বিপদে ফেলি, এবং সে এ পরীক্ষায় আমার প্রশংসা করে সে তার কবরস্থল থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে যেমন ঐদিনে সে স্বীয় মাতা হতে ভূমিষ্ট হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দাকে বন্দী ও পরীক্ষা করেছি ওর আমল এভাবে লিপিবদ্ধ কর, যেমনটি সুস্থাবস্থায় ছিল। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষায় গমন করা সুন্নাত। হাদীসে এর অসংখ্য ফজীলত বিবৃত হয়েছে।

রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করার ফজিলত

হাদীস (১) বোখারী, মুসলিম; আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে (১) সালামের উত্তর দেয়া, (২) রোগীর সেবা শুশ্রূষায় যাওয়া (৩) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা (৪) দাওয়াত কবুল করা (৫) হাঁচির উত্তর দেয়া (যখন আলহামদু লিল্লাহ বলবে উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)

হাদীস (২) বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে হযরত বারা বিন আযিব (রঃ) বলেন, আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, উপরে পাঁচটি বর্ণিত বিষয় (৬) শপথ গ্রহণকারীর শপথ পূর্ণ করা (৭) মজলুমকে সাহায্য করা।

হাদীস (৩) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সওবান (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মুসলমান যখন আপন রোগাক্রান্ত মুসলিম ভাইয়ের সেবায় গমন করবে, ফিরে আসা পর্যন্ত সর্বদা জান্নাতের ফল নির্বাচনে থাকবে।

হাদীস (৪) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিবসে ফরমাবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম তোমরা আমার সেবা শুশ্রূষা করনি, আরজ করা হবে, তোমার সেবা কিভাবে করবো, তুমি তো বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, অর্থাৎ আল্লাহর রোগ-ব্যাধি কিভাবে হয় যে, তার সেবা করা হবে? এরশাদ করবেন, তোমার কি জানা নেই যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জান না? যে, তুমি যদি তার সেবায় গমন করতে আমাকে তার নিকট পেতে। আরো ফরমাবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাদ্য তলব করেছি তুমি দান করনি, আরজ করা হবে, তোমাকে কিভাবে খাদ্য দিব, তুমি তো রাব্বুল আলামীন। এরশাদ করবেন, তোমার কি জানা নেই যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেছে, তুমি দান করনি। তোমার কি জানা নেই যে, তুমি যদি তাকে খাদ্য দান করতে এর ছওয়াব আমার নিকট গ্রহণ করতে। ফরমাবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি তলব করেছিলাম তুমি দান করনি, আরজ করা হবে, তোমাকে কিভাবে পানি দান করবো, তুমি তো রাব্বুল আলামীন। এরশাদ করবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি তলব করেছে, তুমি তাকে পানি পান করাওনি, যদি তুমি তাকে পান করাতে এখানে বিনিময় পাওয়া যেতো।

হাদীস (৫) সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর আকদস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা এক বেদুঈন রোগীকে দেখতে গেলেন হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার পবিত্র অভ্যাস ছিলো যে, যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন ফরমাতেন,

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

অর্থাৎ ইন্শাআল্লাহ কোন ভয় নেই, এ রোগ গুনাহ সমূহ থেকে পবিত্রকারী। বেদুঈনকেও বললেন,

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

হাদীস (৬) আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আমিরুল মুমেনীন মওলা আলী (রঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মুসলমান অপর মুসলিম রোগীকে দেখতে ভোরে গমন করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশ্তা ওর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, সন্ধ্যায় গমন করলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেস্তা ওর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে আর ওর জন্য জান্নাতে একটি উদ্যান হবে।

হাদীস (৭) আবু দাউদ শরীফে হযরত আনস (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে উত্তমরূপে অযু করে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে আপন রোগাক্রান্ত মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে জাহান্নাম হতে ষাট বৎসর পথ দূরত্ব করা হবে।

হাদীস (৮) তিরমিযী শরীফে হাসন সূত্রে ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) হতে বর্ণিত। হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায়, আসমান থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করেন, তুমি উত্তম, তোমার চলা উত্তম, জান্নাতের একটি মনযিলকে তুমি ঠিকানা করেছো।

হাদীস (৯) ইবনে মাজাহ শরীফে আমিরুল মুমেনীন হযরত ফারুকে আজম (রঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তুমি কোন রোগীকে দেখতে যাবে, তাকে বলবে যেন তোমার জন্য দোয়া করে। রোগীর দোয়া ফেরেস্তার দোয়ার অনুরূপ।

হাদীস (১০) বায়হাকী মুরসাল সূত্রে সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রোগীর উত্তম সেবা হলো, তাকে দেখা মাত্র দ্রুত চলে আসা। অনুরূপ হাদীস হযরত আনাস (রঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

হাদীস (১১) তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কোন রোগীর নিকট যাবে প্রাণভরে তার সাথে জীবনকাল সম্পর্কে কথা বলো, সে কোন কিছু প্রত্যাখ্যান করবে না তার নিকট ভাল লাগবে।

হাদীস (১২) ইবনে খাব্বান স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) থেকে

বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, পাঁচটি কাজ যে একদিনে করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেস্তবাসীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করবেন। (১) রোগী দেখতে যাবে। (২) জানাযায় অংশ গ্রহণ করবে (৩) যে রোজা রাখবে (৪) যে জুমআয় গমন করবে (৫) যে ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে।

হাদীস (১৩-১৪) আহমদ, তবরানী আবু ইয়ালা ইবনে খোজায়মা, ইবনে খাব্বান, মায়াজ বিন জাবাল, দাউদ, আবু উমাম (রঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, পাঁচটি কাজ যে ব্যক্তি এর মধ্যে একটিও করবে আল্লাহ তার জিম্মা গ্রহণ করবেন (১) যিনি রোগীর সেবা করবে (২) জানাযায় উপস্থিত হয় (৩) ইসলামী জিহাদে হাজির হবে (৪) ইমামের কাছে তাঁর সম্মানার্থে গমন করবে (৫) নিজ ঘরে বসে থাকবে, যেন লোকেরা তার অত্যাচার হতে নিরাপদ থাকে নিজেও যেন শান্তিতে থাকে।

হাদীস (১৫) ইবনে খোজায়মা স্বীয় সহীহ হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর আকদস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আজকে তোমাদের মধ্যে রোজাদার কে? হযরত আবু বকর (রঃ) আরজ করলেন– এয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। এরশাদ করলেন, আজকে তোমাদের মধ্যে কে মিসকীনকে খাদ্য দান করেছো? আরজ করলেন– আমি। আজকে কে জানাযায় উপস্থিত হয়েছো? আরজ করলেন, আমি। এরশাদ করলেন, আজকে কে রোগীকে দেখতে গেছো? আরজ করলেন, আমি। হুজুর এরশাদ করেন, যে কারো মধ্যে এ অভ্যাসগুলো থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীস (১৬) আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যাবে, তখন সাতবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বেঃ

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

অর্থাৎ দয়াময় আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে তোমার রোগ মুক্তির প্রার্থনা করছি।

যদি মৃত্যু না হয় তার রোগ মুক্তি লাভ হবে।

মৃত্যুর বর্ণনা

পার্থিব জগত একদিন ত্যাগ করতেই হবে। জীবন শেষে একদিন মৃত্যু অবধারিত; ইহকাল থেকে যখন চলে যেতেই হবে সেহেতু পরকালের প্রস্তুতি নেয়া বাঞ্চনীয়। যেখানে সর্বদা অবস্থান করতে হবে, সে সময়ের কথাটা সব সময় মনে জাগরুক রাখা চাই। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস কর যেমন মুসাফির বসবাস করে থাকে। মুসাফির যেমন একজন অপরিচিত ব্যক্তি হয়ে থাকে পথ চলে মাত্র যাত্রাপথে– কোন খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করে না। এতে তার পথ দেরী হলে গন্তব্য স্থলে যথাসময়ে পৌছতে ব্যর্থ হবে। অনুরূপ মুসলমানদের উচিত দুনিয়ার ফাঁদে আটকিয়ে না পড়া। এরকম সম্পর্কও যেন সৃষ্টি না করে যা গন্তব্য স্থলে যাত্রাপথে পৌছতে বাধার সৃষ্টি করবে। মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করবে। কারণ অধিকহারে মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়ার সম্পর্কের গোঁড়া কেটে দেয়। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ

اَكْثِرُوْا ذِكْرَهَا ذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

অর্থাৎ, স্বাদসমূহ কর্তনকারী মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ কর। কিন্তু কোন বিপদকালে মৃত্যু কামনা কর না। এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। একান্ত বাধ্য হয়ে যদি করতেই হয় তাহলে এরূপ বলবে, হে আল্লাহ আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ জীবন আমার জন্য মঙ্গলময় হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর যখন মৃত্যু আমার জন্য উত্তম হয়। অনুরূপ হাদীস বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে।

মুসলমানদের উচিত আল্লাহ তায়ালার প্রতি সদা ভাল ধারণা পোষণ করা এবং আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হওয়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ না করা পর্যন্ত কেউ যেন মৃত্যু বরণ না করে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ

অর্থাৎ, আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা রাখে আমি তার সাথে অনুরূপ আচরণ করি।

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের কাছে তাশরীফ নিলেন। যুবকটি তখন মৃত্যুর সন্নিকট ছিল, প্রিয় নবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজকে কেমন অবস্থায় মনে করছ? আরজ করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর প্রতি আশাবাদী এবং নিজের গুনাহের ব্যাপারে ভয় করছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন এ দু'টো (আশা ও ভয়) যে বান্দার অন্তরে বিরাজ করবে, আল্লাহ তাকে যেটা প্রত্যাশা করেন তা দান করবেন এবং তাকে নিরাপদ রাখবে যেটার থেকে সে ভয় করে। রূহ কবজা হওয়ার সময়টি বড় কঠিন সময়। যাবতীয় সমুদয় আমল এ সময়টার উপর নির্ভরশীল। এমনকি ঈমানের পরিপূর্ণ পরকালীন ফলাফল শেষ মুহূর্তের উপর নির্ভরশীল। অভিশপ্ত শয়তান এ সময় ঈমান হননের চিন্তায় তৎপর থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা করেন এবং ঈমানের সাথে সফল সমাপ্তি নসীব করেন।

إِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيْمِ

অর্থাৎ, কার্যের ফলাফল শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ

হে আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম পরিসমাপ্তি দান কর।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যার শেষ বাক্য হবে لا إله إلا الله অর্থাৎ কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে যে মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

ফিকহী মাসায়েলঃ

মৃত্যুর সময় যখন সন্নিকট হবে লক্ষণ সমূহ পাওয়া যাবে, তখন সুন্নত হলো– ডান পাশ করে শোয়াবে, কেবলামুখী করে দেয়া এবং চিৎ করে শয়ন করানোও জায়েয আছে। পাদ্বয় কিবলার দিকে রাখবে। এরূপ অবস্থায় কেবলার দিকে মুখ হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় মাথা সামান্য উঁচু করে রাখবে। কেবলামুখী করানোটা যদি কষ্টকর হয় তাহলে যেরকম আছে সে রকম রাখবে।

মাসআলাঃ সকরাতের সময় যতক্ষণ রূহ ওষ্ঠাগত না হয় ততক্ষণ ওকে যেন তলকীন করে, অর্থাৎ ওর পার্শ্বে উচ্চ স্বরে কলেমা পাঠ করবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

তবে ওকে বলার জন্য নির্দেশ দিবে না। (ফিক্হর কিতাব সমূহ)

মাসআলাঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি যখন কলেমা পাঠ করে নিলে তালকীন বন্ধ রাখবে। তবে কলেমা পাঠের পর যদি কোন কথা বলে তাহলে পুনরায় তলকীন করাবে। নিম্নোক্ত কলেমা যেন তার শেষ বাক্য হয়।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (আলমগীরি)

মাসআলাঃ তলকীনকারী ব্যক্তি যেন নেক্কার হয়। এমন ব্যক্তি যেন না হয় যার কাছে ওর মৃত্যুটা আনন্দদায়ক। এমন সময় ওর পাশে নেক্কার ও পরহেজগার লোক উপস্থিত থাকা খুবই উত্তম। সে সময় ওখানে সূরা ইয়াসিন শরীফ তেলাওয়াত করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা যেমন লোবান আগরবাতি জ্বালানো মুস্তাহাব। (আলামগীরি)

মাসআলাঃ মৃত্যুর সময় মৃত্যু শয্যায় শায়িতের কাছে ঋতুবতী হায়েজ নিফাস সম্পন্ন মহিলা উপস্থিত থাকতে পারে। (আলমগীরি) কিন্তু যে মহিলার হায়েজ নেফাস বন্ধ হয়ে গেছে এখনো গোসল করেনি, এ ধরনের মহিলা আসা উচিৎ নয়। চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় ঘরে যেন কোন কুকুর বা ফটো না থাকে। এসব কিছু থাকলে সঙ্গে সঙ্গে যেন সরিয়ে ফেলা হয়। কারণ যে স্থানে এসব কিছু থাকে সেখানে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না। সকরাতের সময় নিজের জন্য এবং ওর জন্য দোয়া করতে থাকবে। মুখ দিয়ে যেন কোন মন্দ শব্দ বের না হয়। কারণ এ সময় যা কিছু বলা হয় ফেরেস্তারা এর উপর আমীন বলতে থাকে। সকরাতের সময় মুসীবত ও কষ্ট হতে দেখলে সূরা ইয়াসিন ও সূরা রাআদ পড়বে।

মাসআলাঃ যখন রূহ বের হয়ে যায় তখন একটি চওড়া কাপড় দ্বারা চোয়ালের নীচ থেকে মাথার উপর দিয়ে পেচায়ে গিরা বাঁধবে। যেন মুখ খোলা না থাকে। চোখ যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। হাত-পাত সোজা করে দেবে। এ কাজগুলো পরিবারের যিনি সবচেয়ে নমনীয় করতে পারে পিতা হোক পুত্র হোক তিনি করবে। (জাওহেরা নায়্যারা)

মাসআলাঃ চোখ বন্ধ করার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَابَعْدَهُ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَاخَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ (در المختار)

অর্থাৎ, আল্লাহর নাম সহকারে এবং রাসূলুল্লাহর ধর্মের উপর হে আল্লাহ্ ওর কাজ কে তুমি সহজ করে দাও। তার পরবর্তী কাজগুলো ওর জন্য সহজ করে দাও। তোমার সাক্ষাৎ দ্বারা ওকে মহিমান্বিত কর। যেদিকে বের করেছ ওটাকে উত্তম কর। যেখান থেকে বের হয়েছে ওখান থেকে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃতব্যক্তির পেটের উপর লোহা, নরম মাটি বা অন্য কোন ভারী জিনিষ রাখবে, যেন পেট ফুলে না যায়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন ভারী না হয়, যা ওর জন্য কষ্টের কারণ হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃতের সম্পূর্ণ দেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবে। ওকে খাটে বা আসন জাতীয় কোন উচু জিনিসের উপর রাখবে, যেন মাটির আদ্রতা না লাগে (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মৃত্যুর সময় (আল্লাহ মাফ করুক!) ওর মুখ দিয়ে কুফরী শব্দ বের হলে তাহলে কুফরীর হুকুম প্রয়োগ করবে না। হয়তঃ মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এ ধরনের শব্দ মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। (দুর্রুল মোখতার) এ রকম হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, পূর্ণ কথাটা বুঝে আসেনি। এমন কঠিন মুহূর্তে পরিষ্কারভাবে কথা বলা মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

মাসআলাঃ মৃতের জিম্মায় ঋণ বা কোন প্রকার দেনা পাওনা থাকলে তাড়াতাড়ি আদায় করে ফেলবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যু ব্যক্তি স্বীয় কর্জের জন্য বন্দী থাকে। অন্য বর্ণনায় এসেছে মৃতের রূহ্ ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কর্জ আদায় করা না হয়।

মাসআলাঃ মৃতের কাছে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা জায়েয, যদি তার সম্পূর্ণ দেহ কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। তাসবীহ্ ও অন্যান্য জিকির আযকার পাঠ করায় ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ গোসল, কাফন, দাফন তাড়াতাড়ি করবে হাদীস শরীফে এব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ দেয়া হয়েছে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধব মহলে মৃত সংবাদ পৌছাবে যেন জানাযা

আদায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মৃতের জন্য দোয়া করবে। তাদের উপর হক হল- মৃতের নামায পড়া ও ওর জন্য দোয়া করা।(আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ বাজারে ও সাধারণ সড়কে বা জনসাধারণের চলাচলের পথে মৃত্যু সংবাদ পৌছায়ে দেয়ার জন্য উচ্চ স্বরে প্রচার করা কতিপয় ওলামাগণ মাকরূহ বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো এতে ক্ষতি নেই। তবে জাহেলী যুগের প্রথানুসারে বড় বড় শব্দ যোগে বজ্রকণ্ঠে যেন না হয়। (জাওহেরা নায়্যারা, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে কাফন দাফনের প্রস্তুতি ব্যবস্থা মূলতবী রাখবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মহিলার মৃত্যু হল ওর পেটে শিশু নড়াচড়া করছে তখন বামদিকের পেট কেটে যেন শিশু বের করা হয়। আর যদি মহিলা জীবিত থাকে ওর পেটে শিশু যদি মারা যায় মহিলার জীবন হুমকির সম্মুখীন হলে শিশুকে কেটে বের করা যাবে। আর যদি শিশুও জীবিত থাকে মহিলার যতই কষ্ট হোক না কেন শিশুকে কেটে বের করা জায়েয নেই। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ কেউ যদি ইচ্ছাকৃত কারো মাল গ্রাস করলো এবং মারা গেল, এতটুকু পরিমাণ মাল রেখে গেল, যদ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে। তাহলে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। অন্যথায় পেট কেটে মাল বের করবে। অনিচ্ছায় হলে পেট কাটা যাবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ গর্ভবতী মহিলা মারা গেল এবং দাফন করা হলো কেউ স্বপ্ন দেখল যে, ওর শিশু জন্ম হয়েছে। নিছক স্বপ্নের ভিত্তিতে কবর খনন করা জায়েয নেই। (আলমগীরি)

মৃত ব্যক্তির গোসলের বর্ণনা

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরজে কেফায়া। কয়েকজন মিলে গোসল দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গোসল করানোর নিয়ম হচ্ছে- যে খাটে বা আসনে বা তক্তায় গোসল দেয়ার ইচ্ছা হয় সেটাকে তিন, পাঁচ বা সাতবার ধৌত করে নেবে। অর্থাৎযে জিনিষে সে সুগন্ধিটা জ্বালানো হবে সেটার চারিদিকে তিন বা পাঁচ বা সাতবার ঘুরাবে এবং

সেটার উপর মৃত ব্যক্তিকে শোয়ায়ে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখবে। অতঃপর গোসলদানকারী নিজ হাতে কাপড় জড়ায়ে প্রথমে শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করাবে। এরপর নামাযের ওযুর মত অযু করাবে। অর্থাৎ মুখ এরপর কনুই সহ হাত ধুইয়ে দিবে। অতঃপর মাথা মুসেহ করাবে। অতঃপর পা ধুইয়ে দিবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির অযুতে প্রথমে কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করা কুলি করা ও নাকে পানি দিতে হবে না। তবে কোন কাপড় বা রুই এর পুটলি ভিজায়ে দাঁত, মাড়ি, ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিবে। অতঃপর চুল ও দাঁড়ি থাকলে গোলাপজল দ্বারা ধুয়ে দিবে। গোলাপজল পাওয়া না গেলে পবিত্র সাবান যা মুসলমানদের ফ্যাকটরীতে প্রস্তুতকৃত বা বেসন অথবা অন্য কোন জিনিষ দ্বারা ধুইবে। কিছুই পাওয়া না গেলে পানিই যথেষ্ট। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পাশ করে শোয়ায়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুল পাতার সিদ্ধ পানি ঢেলে দিবে। যেন তক্তা পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর ডান পাশ করে শোয়ায়ে একই নিয়মে পানি ঢালবে। কুল পাতার সিদ্ধ পানি পাওয়া না গেলে বিশুদ্ধ মৃদু গরম পানিই যথেষ্ট। অতঃপর হেলান করে বসায়ে আস্তে আস্তে পেটের উপর হাত দ্বারা চাপ দিতে থাকবে। পেট থেকে কিছু বের হলে ধুয়ে পরিস্কার করে নিবে। পুনরায় অযু গোসল করাতে হবে না। এরপর আপাদমস্তক সারা শরীরে কার্পুরের পানি ঢেলে দিবে অতঃপর কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা শরীর ধীরে ধীরে মুছে দিবে।

মাসআলাঃ সম্পূর্ণ শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরজ। তিনবার করা সুন্নত। গোসল দেয়ার স্থান পর্দাবৃত করা মুস্তাহব যেন গোসলদানকারী ও সহযোগী ছাড়া কেউ দেখতে না পায়। গোসল দেয়ার সময় এমনভাবে শোয়াবে যেমন কবরে শোয়ায়ে রাখা হয়। অথবা ক্বেবলার দিকে না করে বা যেভাবে সহজ হয় সেভাবে শোয়াবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গোসলদানকারী যেন পবিত্র থাকে, নাপাক বা ঋতুবতী মহিলা গোসল করালে মাকরূহ হবে। তবে গোসল হয়ে যাবে। অজুহীন ব্যক্তি গোসল করালে মাকরূহও হবে না। তবে উত্তম হলো গোসলদানকারী যেন মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয় হয়। তা না হলে অথবা এমন ব্যক্তি গোসল দিতে না জানলে তাহলে অন্য যে কোন বিশ্বস্ত পরহেজগার ব্যক্তি গোসল করাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গোসলদানকারী যেন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য লোক হয় যিনি পূর্ণরূপে গোসল করাবে। যদি ভাল কিছু দেখা যায় যেমন মৃত ব্যক্তির চেহারা আলোকিত

হয়ে উঠল, অথবা মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে সুগন্ধি বের হল, তাহলে ওসব কথা গোসলদানকারী মানুষদের বলে দিবে। আর মন্দ কিছু দেখতে পেলে যেমন চেহারা কালো হয়ে গেল বা শরীর হতে দুর্গন্ধ বের হল অথবা আকৃতি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকৃত ঘটল তাহলে এসব বিষয় কাউকে বলবে না এবং এসব কথা বলাও জায়েয নেই। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে– তোমরা মৃতদের ব্যাপারে উত্তম আলোচনা কর। ওদের মন্দ বিষয় থেকে বিরত থাক। (জাওহেরো নায়্যারা)

মাসআলাঃ যদি কোন বদ মযহাব বা বদ আক্বীদা সম্পন্ন লোক মারা যায় এবং তার রংও যদি কালো হয়ে যায় তার থেকে যদি মন্দ কোন বিষয় প্রকাশ পায় তা লোক সমাজে বলা উচিৎ যেন মানুষ এর থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গোসল দানকারীর নিকটে সুগন্ধি জালানো মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে কোন দুর্গন্ধ বের হলে তা যেন গোসলদানকারী উপলব্ধি না করে এবং ভয় না করে। তার উচিৎ প্রয়োজনানুসারে মৃতের দেহের অঙ্গের দিকে তাকা। বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গের প্রতি তাকাবে না। হয়তঃ ওর শরীরের কোথাও দোষত্রুটি থাকতে পারে– যা জীবদ্দশায় ঢেকে রাখতো। (জাওহেরো)

মাসআলাঃ ওখানে যদি গোসলদানকারী ব্যতীত আরো একাধিক গোসলদানকারী লোক থাকে তাহলে গোসল করানোর পারিশ্রমিক নিতে পারবে। কিন্তু না নেয়াটা উত্তম। আর যদি অন্য কোন গোসলদানকারী না থাকে তাহলে পারিশ্রমিক নেয়াটা জায়েয নেই। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ নাপাক অথবা হায়েজ নেফাস সম্পন্ন মহিলা মারা গেলে তাহলে একবার গোসল করালেই যথেষ্ট হবে। গোসল ওয়াজিব হওয়ার যত কারণই বিদ্যমান থাকুক একবার গোসল করালেই তা আদায় হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ পুরুষ পুরুষকে গোসল করাবে। মহিলা মহিলাকে গোসল করাবে। মৃত ব্যক্তি যদি ছোট বালক হয় তাহলে মহিলাও গোসল করাতে পারে এবং ছোট বালিকাকেও পুরুষ গোসল করাতে পারে। ছোট বলতে কামভাবাপন্ন না হওয়া অথবা নাবালেগকে বুঝানো হয়েছে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে পুরুষের পুরুষাঙ্গ বা অন্ডকোষ কেটে নেয়া হয়েছে। সে পুরুষ

হিসেবেই গণ্য। অর্থাৎ পুরুষ ওকে গোসল করাতে পারবে। অথবা ওর স্ত্রী গোসল করাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারে যদি মৃত্যুর পূর্বে বা পরে এমন কোন ঘটনার সৃষ্টি না হয় যদ্বারা বিবাহ বাতিল হয়ে যায় যেমন স্বামীর ছেলেকে বা পিতাকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করেছে বা চুম্বন করেছে। অথবা খোদা না করুক মুরতাদ ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। যদিওবা গোসলের পূর্বেই মুসলমান হয়ে যায় এসব কারণে বিবাহ বাতিল হয়ে যায়– এবং অপবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এমন স্ত্রী গোসল দিতে পারে না। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ স্ত্রীকে রজয়ী তালাক দিল এখনো ইদ্দতে রয়েছে স্বামীর ইন্তেকাল হলে স্ত্রী গোসল দিতে পারবে। আর যদি বায়েন তালাক দেয় যদিও ইদ্দতে থাকে স্ত্রী গোসল দিতে পারবে না। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ উম্মে ওয়ালদ, মুদাব্বিরাহ্ বা মুকাতিবাহ্ এসব ক্রীতদাসীরা স্বীয় মুনীবকে গোসল দিতে পারে না। কারণ এরা মুনিবের মালিকানা থেকে বেরিয়ে গেছে। অনুরূপভাবে যদি এসব ক্রীতদাসীরা মারা যায় মুনিবও ওদেরকে গোসল দিতে পারে না। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবে না, স্পর্শও করতে পারবে না, তবে দেখা নিষেধ নহে। (দুর্রুল মোখতার)

জনসাধারণে এটি প্রসিদ্ধ যে, স্বামী তার স্ত্রীর জানাযা কাঁধে নিতে পারবে না, কবরে নামাতে পারবে না, মুখ দেখতে পারবে না, এটা নিছক ভুল, কেবল গোসল করাবে না ও বিনা আবরনে শরীরের উপর হাত রাখা নিষেধ।

মাসআলাঃ কোন মহিলা মারা গেল, ওখানে অন্য কোন মহিলাও নেই যিনি গোসল করাবেন, তখন তায়াম্মুম করানো যাবে তায়াম্মুমকারী যদি মুহরিম হয়, হাতে তায়াম্মুম করাবে। আর যদি অপরিচিত হয় হাতে কাপড় জড়ায়ে আটা জাতীয় বস্তুর উপর হাত মারবে এবং তায়াম্মুম করাবে। স্বামী ব্যতীত যদি অন্য কোন অপরিচিত হয় হাতের কব্জির দিকে থাকাবে না। স্বামী হলে এ বিষয়টি প্রয়োজন নেই। এ মাসআলায় যুবক ও বৃদ্ধা একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কোন পুরুষ মারা গেল, ওখানে আর অন্য কোন পুরুষ নেই এবং ওর

স্ত্রীও নেই, তাহলে যে মহিলা উপস্থিত আছে সে তায়াম্মুম করাবে মহিলা যদি ওর ক্রীতদাসী বা মুহরিম হয় তাহলে তায়াম্মুম করানোর সময় হাতে কাপড় জড়ানোর প্রয়োজন নেই। আর অপরিচিত হলে হাতে কাপড় জড়ায়ে তায়াম্মুম করাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পুরুষ সফরে মারা গেলে ওর সাথে মহিলাও আছে এবং কাফের পুরুষ আছে কিন্তু মুসলমান কোন পুরুষ ওখানে নেই, তাহলে মহিলা কাফের ব্যক্তিকে গোসল করানোর নিয়ম শিক্ষা দিবে এবং সে গোসল করাবে। আর যদি কোন পুরুষ না থাকে বরং ছোট মেয়ে লোক সফরসঙ্গী থাকে যিনি গোসল করানোর শক্তি রাখে তাহলে মহিলারা ওকে পদ্ধতি শিখাবে এবং সে গোসল করাবে। অনুরূপভাবে যদি মহিলা মারা যায় এবং অন্য কোন মুসলমান মহিলা না থাকে বরং কাফের মহিলা উপস্থিত থাকে তখন কাফির মহিলাকে গোসলের শিক্ষা দিবে এবং ওর দ্বারা গোসল করাবে। অথবা যদি ছোট ছেলে গোসল করানোর উপযুক্ত হলে ওকে বলে দিবে, সে গোসল করাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন জায়গায় মারা যায় যেখানে পানি পাওয়া যায় না, তখন তায়াম্মুম করায়ে জানাযার নামাজ পড়াবে। নামাজের পর দাফনের পূর্বে যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে গোসল করায়ে নামাজ পুনরায় পড়বে। (আলমগীরি দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ খুনছা ব্যক্তি মারা গেলে ওকে পুরুষ বা মহিলা গোসল করাতে পারবে না, বরং তায়াম্মুম করানো যাবে। তায়াম্মুমকারী যদি অপরিচিত হয়, হাতে কাপড় জড়ায়ে তায়াম্মুম করাবে। হাতের কব্জির দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। অনুরূপভাবে খুনছা মুশকাল কোন পুরুষ বা মহিলাকে গোসল দিতে পারবে না। (আলমগীরি) খুনছা যদি ছোট ছেলে হয় তাহলে ওকে পুরুষও গোসল করাতে পারবে। মহিলারাও পারবে। অনুরূপ বিপরীত হলেও পারবে।

মাসআলাঃ কোন মুসলমান ইন্তেকাল করল, ওর পিতা কাফের তখন ওকে মুসলমান ব্যক্তি গোসল করাবে ওর পিতার নিয়ন্ত্রণে দিবে না। কাফের মুসলমান হল, ওর স্ত্রী কাফের, যদি কিতাবিয়া মহিলা হয় গোসল করাতে পারবে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ওর দ্বারা গোসল করানোটা খুবই মন্দ। আর যদি মহিলা অগ্নিপূজারী বা প্রতিমা পূজারী হয় এবং ওর ইন্তেকালের পর মুসলমান হয়ে যায় গোসল করাতে

পারবে। তবে বিবাহ বিদ্যমান থাকাটা শর্ত। অন্যথায় হবে না। বিবাহ বহাল থাকার পদ্ধতি এই যে, যদি ইসলামী রাষ্ট্রে হয় তখন ইসলামী শাসক স্বামী মুসলমান হবার পর স্ত্রীর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে যদি ইসলাম গ্রহণ করে ভাল, অন্যথায় দ্রুত বিবাহ বন্ধন থেকে বেরিয়ে যাবে। আর যদি ইসলামী রাষ্ট্রে না হয়, তখন স্বামীর মুসলমান হবার পর স্ত্রীকে তিন হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়সীমার মধ্যে মুসলমান হলে ভাল, অন্যথায় বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং উভয় অবস্থায় যদি পুনরায় মুসলমান হয়ে যায় গোসল দিতে পারবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির গোসল যদি বাদ যায়, ওর নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য নিয়ত এবং কাজ শর্ত নয় এমনকি মৃত ব্যক্তি যদি পানিতে পতিত হয় বা ওর উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয় যদ্বারা সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত হয় গোসল হয়ে যাবে। কিন্তু জীবিতদের উপর মৃতকে গোসল দেয়া ওয়াজিব। গোসল দিলে তখন দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং মৃত ব্যক্তি যদি পানিতে পাওয়া যায়, তাহলে গোসলের নিয়তে ওকে তিনবার পানিতে নড়াচড়া করবে, তাহলে সুন্নাত গোসল আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একবার নাড়া দেয় ওয়াজিব আদায় হবে। কিন্তু সুন্নত আদায়ে তৎপর হতে হবে। নিয়তবিহীন গোসল করালে দায়িত্বমুক্ত হবে তবে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন কাউকে শিখানোর নিয়তে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিল, ওয়াজিব রহিত হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির গোসলের ছওয়াব পাওয়া যাবে না। উপরন্তু গোসল হওয়ার জন্য এটাও আবশ্যক নয় যে, গোসলকারী শরীয়তের বিধান আরোপ যোগ্য ব্যক্তি বা নিয়ত সম্পন্ন হতে হবে। বিধায় নাবালেগ বা কাফের ব্যক্তি গোসল করালেও আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি অপরিচিত মহিলা পুরুষকে বা অপরিচিত পুরুষ মহিলাকে গোসল দিল, গোসল আদায় হবে যদিও ওদের গোসল করানো জায়েয ছিল না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন মুসলমানের দেহের অর্ধাংশের অধিক পাওয়া গেল, তাহলে গোসল ও কাফন দিবে। জানাযার নামাজ পড়াবে, নামাজের পর যদি অবশিষ্টাংশটুকুও পাওয়া যায় এর জন্য দ্বিতীয়বার নামাজ পড়বে না। যে অর্ধাংশ পাওয়া গেছে এর মধ্যে যদি মস্তকও থাকে তখনও একই হুকুম। আর যদি মাথা না থাকে বা দৈর্ঘ বা আপাদ মস্তক ডান বা বাম দিকের এক পার্শ্বের অংশ পাওয়া যায়, উভয় অবস্থায় গোসল ও কাফন দিতেহবে না। নামাজও পড়তে হবে না। বরং একটি কাপড়ে জড়ায়ে দাফন করবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মৃত লাশ পাওয়া গেল, তবে এটা জানা নেই যে, মৃত ব্যক্তি মুসলমান না কাফের, তাহলে ওর কর্তন স্থান যদি মুসলমানের হয় অথবা যদি এমন কোন চিহ্ন থাকে যদ্বারা মুসলমান হওয়াটা প্রমাণ করে বা মুসলমান সমাজে পাওয়া যায়, তাহলে গোসল করাবে এবং নামাজ পড়বে অন্যথায় নহে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসলমান মৃত লাশ যদি কাফেরদের সাথে একত্র হয়ে যায় তাহলে খৎনা বা অন্য কোন চিহ্ন দ্বারা যদি পরিচয় করা যায় তাহলে মুসলমানদেরকে পৃথকভাবে করাবে এবং গোসল ও কাফন দিবে এবং নামায পড়বে। আর যদি পার্থক্য করতে না পারে গোসল দিবে এবং নামাজে মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার নিয়ত করবে এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যদি অধিক হয় তাহলে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে অন্যথায় আলাদাভাবে দাফন করবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি কাফের হলে এর গোসল, কাফন ও দাফন নেই বরং চটে মুড়ায়ে গর্তে পুতে ফেলতে হবে, তাও তখন করবে যখন ওর সধর্মী কেউ না থাকে বা ওকে নিয়ে না যায়, অন্যথায় মুসলমান ওর গায়ে হাত লাগাবে না এবং এর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় শরীক হবে না। আর যদি প্রতিবেশী হওয়ার কারণে শরীক হতে হয় তাও দূরে দূরে থাকবে। আর মুসলমান মাত্রই যদি ওর পওতিবেশী হয় এবং ওর সধর্মী কেউ না থাকে, বা কেউ নিয়ে না যায় এমতাবস্থায় প্রতিবেশীর খাতিরে গোসল কাফন ও দাফন করলে জায়েয হবে। কিন্তু কোন কাজে সুন্নাত তরীকা মত করবে না বরং অপবিত্রতা ধৌত করার ন্যায় ওর উপর পানি প্রবাহিত করবে এবং চটে জড়ায়ে অপ্রসস্ত গর্তে পুতে দিবে। এ বিধান প্রকৃত কাফেরদের ক্ষেতে প্রযোজ্য, তবে মুরতাদ বা ধর্ম ত্যাগীর বিধান হলো, ওকে গোসল কাফন কিছুই করবে না বরং কুকুরের মত কোন অপ্রসস্ত গর্তের মধ্যে দাবিয়ে আটি দিয়ে বিনা আবরণে চাপা দিবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ অমুসলিম মহিলার গর্ভে যদি মুসলমানের সন্তান থাকে এবং গর্ভবতী মহিলা যদি মারা যায় তখন ওকে মুসলমানদের কবরস্থান হতে পৃথক করে দাফন করবে ওর পিট কিবলার দিকে করবে যেন ছেলের মুখ ওদিকে হয় যেহেতু ছেলে যখন পেটে থাকে তখন ওর মুখ মায়ের পিটের দিকে থাকে (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃতের শরীর যদি এমন হয় যে, হাত লাগালে চামড়া উঠে যাচ্ছে

তাহলে হাত লাগাবে না। কেবল পানি প্রবাহিত করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গোসল করানোর পর যদি নাক কান মুখ এবং অন্যান্য ছিদ্র সমূহে যদি রুই রাখা হয় ক্ষতি নেই কিন্তু না রাখাটা উত্তম। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি বা মাথার চুল আচড়ানো বা নখ কাটা অন্য কোন স্থানের পশম মুন্ডানো, আচড়ানো, উপড়ানো নাজায়েয ও মাকরূহ তাহরীমি। বরং বিধান হল, যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখে দাফন করবে। তবে নখ যদি ভেঙ্গে যায় নিতে পারবে। নখ বা চুল কাটলে কাফনে রেখে দিবে। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির দু'হাত পাশে রাখবে বুকের উপর রাখবে না। কারণ বুকের উপর রাখাটা কাফিরদের নিয়ম (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ অনেকজায়গায় নাভীর নিচে এমনভবে রাখা হয় যেমন নামাজে দন্ডায়মান অবস্থায় রাখা হয় এরূপও করবে না।

মাসআলাঃ অনেক জায়গায় প্রথা হয়ে গেছে যে, সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়ার জন্য পাত্র, ঘড়া, কলসি ব্যবহার করা হয় এর কোন প্রয়োজন নেই। ঘরের ব্যবহৃত ঘড়া, কলসী, বদ্না দ্বারাও গোসল দেওয়া যাবে। অনেকেই মূর্খতা বশতঃ এসব আসবাবপত্র ও জিনিষ পত্র ভেঙ্গে ফেলে। এটা নাজায়েয ও হারাম। এটা সম্পদের অপচয়, আর যদি ধারণা করে থাকে যে, এগুলো নাপাক হয়েছে তাও নিছক বেহুদা ধারণা প্রথমতঃ এসব পানিতে পানির ছিটকা পড়েনি। আর যদিও পড়ে থাকে তথাপি প্রণিধানযোগ্য কথা হল যে, মৃতের গোসল নাজাসাতে হুকুমি বা অপ্রকৃত নাপাকী দূর করার জন্য হয়ে থাকে এতে ব্যবহৃত পানির ছিট্কা পড়ে থাকলে অসুবিধা নেই। যেহেতু ব্যবহৃত পানি নাপাক নয়। যেমন জীবিতদের অজু গোসলের পানি। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, নাপাক পানির ছিট্কা পড়েছে তাহলে ধুইয়ে নেবে। ধুইয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যাবে। অধিকাংশ স্থানে ওসব লোটা কলসি মসজিদে রেখে দেয়া হয়, এর দ্বারা যদি নামাজীদের উপকার উদ্দেশ্য হয় এবং মৃতের ছওয়াব পৌছানো উদ্দেশ্য হয় এটা ভাল নিয়ত। এরূপ রাখা উত্তম। আর যদি এ ধারণায় রাখা হয় যে, ঘরে রাখাটা অমঙ্গলজনক, তা হবে অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। অনেক লোক কলসির পানি ফেলে দেয় এটাও হারাম।

কাফনের বর্ণনা

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়াটা ফরজে কেফায়া, কাফনের স্তর তিনটি (১) জরুরত (২) কেফায়ত (৩) সুন্নাত। পুরুষের জন্য সুন্নাত হচ্ছে তিনটি কাপড়, লেফাফা, ইযার, কোর্তা। মহিলার জন্য কাফনে সুন্নাত হচ্ছে পাঁচটি উপরোক্ত তিনটি ছাড়াও আরো দু'টি উড়না এবং সীনাবন্দ।

পুরুষের জন্য কেফায়ত কাফন হচ্ছে দু'টি কাপড়, লেফাফা ও ইযার এবং মহিলার জন্য কাফনে কেফায়ত হচ্ছে তিনটি কাপড়, লেফাফা, ইযার, উড়নী অথবা লেফাফা কামীছ, উড়নী পুরুষ ও মহিলার জন্য কাফনে জরুরত হচ্ছে যতটুকু পাওয়া যায় তবে কমপক্ষে এতটুকু পরিমাণ কাপড় হওয়া চাই যদ্বারা শরীর আবৃত করা যায়। (দুর্রুল মোখতার , আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ লেফাফা অর্থাৎ চাদর, মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে এতটুকু পরিমাণ অধিক লম্বা হওয়া প্রয়োজন যেটুকুতে উভয় দিকে বাঁধা যায়, ইযার অর্থাৎ তেহবন্দ পা থেকে মাথা পর্যন্ত হতে হবে। এটা লেফাফা থেকে ততটুকু ছোট যা লেফাফা বাঁধার জন্য অতিরিক্ত থাকে, কামীছ যাকে কাফনী বলা হয় এটা গলা থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত লম্বা রাখতে হয়। সামনে পিছনে উভয় দিকে সমান হতে হবে। মূর্খ লোকদের মধ্যে পিছনে কম রাখার যে প্রথা প্রচলন রয়েছে তা ভ্রান্ত। কামীছ অর্থাৎ কোর্তার আস্তিন ও কলি না হওয়া চায়। পুরুষ ও মহিলার কামীছে পার্থক্য রয়েছে, পুরুষের কামীছ কাঁধের উপর, মহিলার কামীছ বুকের উপর ছিড়া হতে হবে। উড়না তিন হাত পরিমাণ হতে হবে। সীনাবন্দ বুক থেকে নাভী পর্যন্ত হতে হবে। তবে রান বা উরু পর্যন্ত হওয়া উত্তম। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ বিনা প্রয়োজনে কাফনে কেফায়াত থেকে কম করা নাজায়েয ও মাকরূহ। (দুর্রুল মোখতার)

অনেক অভাবী লোক কাফনে জরুরতে সক্ষম কিন্তু কাফনে সুন্নাতে সক্ষম নয় ওর জন্য কাফনে সুন্নাতের সাহায্যের আবেদন করা নাজায়েয। বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু সাহায্য চাওয়া জায়েয নেই। তবে বিনা আবেদনে কোন মুসলমান যদি স্বয়ং কাফনে সুন্নাতের চাহিদা পূর্ণ করে, ইনশাআল্লাহ পূর্ণ ছওয়াব পাবে। (ফত্ওয়ায়ে রিজভীয়্যাহ)

মাসআলাঃ ওয়ারিশদের মধ্যে মতানৈক্য হল– যেমন কেউ বলছে দু'টি কাপড় কেউ তিনটি কাপড় দেয়ার জন্য, তাহলে তিনটি কাপড়ে কাফন দিবে। এটা সুন্নাত

অথবা এরূপ করবে যে, যদি অধিক সম্পদের মালিক এবং ওয়ারিশ কম হয় তাহলে কাফনে সুন্নাত দিবে। আর যদি সম্পদ কম হয় ওয়ারিশ বেশী হয় তাহলে কাফনে কেফায়ত দিবে। (জাওহেরা ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কাফনে উত্তম কাপড় হওয়া চায় অর্থাৎ পুরুষ দু'ঈদ ও জুমার জন্য যে ধরনের কাপড় পড়তো এবং মহিলা যে ধরনের কাপড় পড়ে বাপের বাড়ীতে যাতায়ত করতো সে মূল্যমানের হওয়া চায়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে পুরুষদেরকে উত্তম কাফন পরিধান করাও কারণ তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং ভাল কাফনের জন্য গর্ব করে। অর্থাৎ আনন্দিত হয়। সাদা কাফন উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি-ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিজেদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ের কাফন পরিধান করাও। (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কুসুম বা জাফ্রান দ্বারা রঙ্গিত কাফন বা রেশমের কাফন পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। তবে মহিলার জন্য জায়েয। অর্থাৎ জীবদ্দশায় যে কাপড় পরা যায় সে কাপড়ের কাফন দেয়া যায়। জীবদ্দশায় যে কাপড় পরিধান নাজায়েজ সে কাপড় দ্বারা কাফন দেয়াও নাজায়েজ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ খুনছা মুশকালকে মহিলার অনুরূপ পাঁচ কাপড় দ্বারা কাফন দিতে হবে। কিন্তু কুসুম বা জাফ্রান দ্বারা রঙিত বা রেশমী কাপড় দ্বারা ওকে কাফন দেয়া নাজায়েয। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কেউ যদি দু'কাপড়ে কাফন দেয়ার জন্য ওসীয়ত করে যায় ওর ওসীয়ত পালন করবে না। তিনটি কাপড় দ্বারা ওকে কাফন দিবে। অনুরূপ যদি হাজার টাকার কাফন দেয়ার ওসীয়ত করলে এটাও পালন করবে না, বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কামভাবাপন্ন স্তরে উপনীত, সেও প্রাপ্ত বয়স্কদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ককে যে পরিমাণ কাপড় দিয়ে কাফন দিবে ওকেও সে পরিমাণ কাপড় দিবে। এর চেয়ে ছোট ছেলেকে এক কাপড়ে ছোট মেয়েকে দু'কাপড়ে দেয়া যায়। ছেলেকেও যদি দু'টি কাপড়ে কাফন দেয়া যায় তাহলে উত্তম। উত্তম হলো উভয়কে পূর্ণ কাফন দিবে। যদিও একদিন বয়সের শিশু হয়। (রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ পুরাতন কাপড় দ্বারাও কাফন দেয়া যায়। তবে পুরানো হলে পূর্বে ধৌত করে নেবে, কাফন পরিষ্কার হওয়া পছন্দনীয় (জাওহেরা)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি যদি কিছু সম্পদ রেখে যায়। তাহলে কাফন ওর সম্পদ থেকে হওয়া চায়। যদি ঋনগ্রস্ত হয় ঋনগ্রস্ততা কাফনে কেফায়তের অধিককে নিষেধ করে। নিষেধ না করলে কাফনে কেফায়তের অধিক দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। (রদ্দুল মোখতার) তবে ঋনগ্রস্থতার কারণে কাফনে কেফায়তের নিষিদ্ধতা তখন বিবেচ্য হবে যখন ওর সম্পূর্ণ সম্পদ ঋন নির্ভর হয়ে পড়ে।

মাসআলাঃ কর্জ, ওসীয়ত, মীরাচ, এসব থেকে কাফনের অগ্রাধিকার রয়েছে, কর্জ ওসীয়তের উপর অগ্রাধিকার, ওসীয়ত মীরাছের উপর অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রথমে কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে এরপর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে কর্জ আদায় করবে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে এক তৃতীয়াংশ দ্বারা ওসীয়ত পূর্ণ করবে। এরপর যা থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করবে। (জওহেরা)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে জীবদ্দশায় যার উপর ওর ভরণ পোষণের দায়িত্ব ছিল সে কাফনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। এরকম কেউ না থাকলে বা থাকলেও অপারগ হলে বায়তুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে দিতে হবে। আর যদি বায়তুল মালের ব্যবস্থা না থাকে, যেমন হিন্দুস্তানে এরকম কোন ব্যবস্থা নেই। তাহলে ওখানকার মুসলমানদের উপর কাফন দেয়াটা ফরজ। জেনে শুনে না দিলে সকলে গুনাহগার হবে। ওদের কাছেও যদি না থাকে তাহলে এক কাপড় পরিমাণ কাফন অন্য লোকদের থেকে সাহায্য চাইবে। (জাওহেরা, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মহিলা যদিও সম্পদ রেখে যায় তথাপি ওর কাফনের দায়িত্ব স্বামীর উপর। তবে শর্ত হলো যে মৃত্যুর আগে এরকম কোন ঘটনা না হওয়া চায় যদ্বারা স্ত্রী-স্বামীর ভরণ পোষণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে ওর স্ত্রী সম্পদশালী হলেও ওর উপর কাফন প্রদান করা ওয়াজিব নয়। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ উপরে যা বর্ণিত হয়েছে যে, অমুকের উপর কাফন ওয়াজিব, এর দ্বারা শরয়ী কাফন বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য জিনিষপত্র যেমন সুগন্ধি, গোসলদানকারী ও বহনকারীর পারিশ্রমিক এবং কাফনের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে শরয়ী পরিমাণ ধর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য খরচাদি যা মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে খরচ করা হয়েছে তা যদি প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশগণের অনুমতি সাপেক্ষ হয় তাহলে জায়েয। অন্যথায় খরচকারীর জিম্মায় বর্তাবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কাফনের জন্য সাহায্য চেয়ে কাপড় নিয়েছে, এর থেকে কিছু কাপড়

অবশিষ্ট রয়ে গেল, যদি জানা থাকে যে, অমুক ব্যক্তি দিয়েছে তাহলে ওকে ফিরায়ে দিবে। নতুবা অন্য কোন অভাবী লোকের কাফনে ব্যবহার করবে। এটাও না হলে সাদকা করে দিবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত লোক যদি এমন স্থানে হয় ওখানে মাত্র একজন লোকই আছে ওর কাছে মাত্র একটি কাপড় আছে তাহলে কাফনের জন্য নিজের কাপড় দেয়াটা ওর জন্য জরুরী নয়। (দুর্রুল মোখতার)

কাফন পরিধানের নিয়ম

কাফন পরিধানের নিয়ম হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর ধীরে ধীরে কোন কাপড় দ্বারা মুছে নিবে। কাপড় যেন ভিজে না যায়। কাফনকে একবার তিনবার পাঁচবার বা সাতবার আগরবাতি এ জাতীয় বস্তু দ্বারা ধোয়া দিবে। এর অধিক নয়। অতঃপর কাফন এমনভাবে বিছাবে যে, প্রথমে বড় চাদর এরপর তেহবন্দ, অতঃপর কামীচ বিছাবে। তারপর মৃত বক্তিকে ওটার উপরে শোয়াবে এবং কামীচ বা কোর্তা পরিধান করাবে। তার দাঁড়ি ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগাবে এবং সিজদার অঙ্গসমূহ অর্থাৎ মস্তক, নাক হাত হাটু ও পায়ে কর্পুর লাগাবে। তারপর লেফাফা প্রথমে বামদিক থেকে পরে ডান দিক থেকে পরে ডান দিক থেকে জড়াবে। যেন ডান দিকটা উপরে থাকে। অতঃপর চুল ও পায়ের দিক বাধবে যাতে উড়ার আশংকা না থাকে। মহিলাকে কামীচ অর্থাৎ কাফনী পরিধান করানোর পর ওর চুলকে দু'ভাগ করে কাফনীর উপর বুক বরাবর রেখে দিবে এবং উড়নী অর্ধ পিটের নীচ থেকে বিছায়ে মাথা পর্যন্ত এনে মুখের উপর নেকাবের মত রাখবে। যেন বুক পর্যন্ত আবৃত থাকে। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে অর্ধপিট থেকে বুক পর্যন্ত এর প্রস্থ হচ্ছে এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লাত পর্যন্ত, যেসব লোকেরা বলে থাকে যে, জীবদ্দশার ন্যায় ঢেকে রাখতে হবে এটা নিছক অনর্থক ও সুন্নাতের বিপরীত। অতঃপর নিয়মানুসারে ইযার ও লেফাফা জড়াবে। শেষে সবগুলোর উপর সীনাবন্দ স্তনে উপর থেকে রান পর্যন্ত এনে বাধবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ পুরুষের দেহে এমন সুগন্ধি লাগানো জায়েয নেই, যার মধ্যে জাফরানের গন্ধ আছে মহিলার জন্য জায়েয। যিনি ইহরাম বেধেছে ওর শরীরেও সুগন্ধি লাগানো যাবে। ওর মুখ ও মাথা কাফন দ্বারা আবৃত রাখবে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মৃতের কাফন যদি চুরি হয়ে যায়, লাশ এখনো তাজা আছে তাহলে

পুনরায় কাফন দিবে। মৃতের সম্পদ যথা নিয়মে বহাল থাকলে, ওর সম্পদ থেকে কাফন দিবে, আর যদি ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন হয়ে যায় তাহলে কাফনের দায়িত্ব ওয়ারিশানের উপর। আর যদি ওসীয়ত পালন বা কর্জ আদায় করে ফেলা হয়, তাহলে ওদের উপর বর্তাবে না। পরিত্যক্ত সম্পত্তি যদি কর্জবদ্ধ হয়ে পড়ে কর্জদাতারা এখনো কব্জা করেনি, তাহলে কর্জের সম্পদ থেকে দিবে। আর যদি কব্জা করে ফেলে তখন ওদের থেকে ফেরৎ নিবে না। বরং এমতাবস্থায় মাল না থাকা অবস্থায় যার উপর কাফনের দায়িত্ব বর্তাবে এখনো এমন ব্যক্তির জিম্মায় থাকবে।

উপরোক্ত অবস্থায় লাশ যদি ফেটে যায়, সুন্নতী কাফনের প্রয়োজন নেই, একটি কাপড় হলেই যথেষ্ট। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত লোককে কোন প্রাণী খেয়ে ফেলল, কাফন পাওয়া গেল, কাফন যদি মৃতের সম্পদ থেকে হয়ে থাকে তাহলে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে গণ্য হবে। যদি অন্য কেউ দিয়ে থাকে অপরিচিত হোক বা প্রতিবেশী হোক, তাহলে যিনি দাতা তিনি হলেন কাফনের মালিক, তিনি যা ইচ্ছা করবেন। (আলমগীরি)

জরুরী মাসাঈল সমূহ

হিন্দুস্তানের জনসাধারণে প্রচলিত যে, সুন্নতী কাফন ছাড়াও উপরে আর একটি চাদর দেয়া হয় যা কোন মিসকীনকে সাদকা করে দেয়া হয়, একটি জায়নামাজ যার উপর ইমাম জানাযা নামাজ পড়েন। সেটাও সাদকা করে দেয়া হয় এ চাদর ও জায়নামাজ যদি মৃতের সম্পদ থেকে না হয়, বরং অন্য কেউ নিজের পক্ষ থেকে দিয়েছে। সাধারণত যিনি কাফন দেন তিনিই দিয়ে থাকেন বরং কাফনের জন্য যে কাপড় নেয়া হয় সেটা সে পরিমাণ হিসেবে নেয়া হয়, যদ্বারা চাদর ও জায়নামাজ দু'টিই হয়ে যায়। এটাতো স্পষ্ট যে, এর অনুমতি আছে। এতে কোন অসুবিধা নেই। যদি মৃতের সম্পদ থেকে হয়, তাহলে এর দু' অবস্থা. এক হয়তঃ ওর ওয়ারিশগণ সবাই প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সকলের অনুমতিক্রমে হলে তখনও জায়েয হবে। আর যদি তারা অনুমতি না দেয় তাহলে যিনি মৃতের সম্পদ থেকে এটি খরচ করেছে বা সাদকা করেছে এ দুটি জিনিষ ওর জিম্মায় থাকবে। অর্থাৎ এ দু'টির মূল্যে সম্পদের মধ্যে গণ্য হবে। দু'টির মূল্য খরচকারী নিজের পক্ষ থেকে প্রদান করবে। দ্বিতীয়তঃ ওয়ারিশগণ প্রত্যেকে বা কতিপয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে, তাহলে কোন অবস্থায় এ দু'টির মূল্যে মৃতের সম্পদ থেকে দেয়া যাবে না। মৃতের নাবালেগ ছেলেরা অনুমতি প্রদান করুক না কেন? নাবালেগ ছেলে মেয়ের সম্পদ ভোগ করা খরচ করা হারাম। লোটা কলসী থাকা সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য ক্রয়

করলে এক্ষেত্রেও এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। মৃতের তৃতীয় দিবসে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠান দশম দিবসে চল্লিশ, ষান্মাষিক, বার্ষিক অনুষ্ঠানাদির ব্যয়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। নিজের সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা খরচ করবে এবং মৃতের আত্মায় ছওয়াব পৌঁছাবে। মৃতের সম্পদ থেকে এসব খরচাদি তখনই ব্যয় করতে পারবে। যখন ওর ওয়ারিশগণ সকলে বালেগ হবে এবং সকলের অনুমতি পাওয়া গেলে, অন্যথায় নয়। কিন্তু যিনি প্রাপ্তবয়স্ক তিনি নিজের অংশ থেকে করতে পারবে। আর একটি দিক আছে যে, মৃত ব্যক্তি ওসীয়ত করলে কর্জ আদায়ের পর যা বাঁচবে এর এক তৃতীয়াংশ দিয়ে ওসীয়ত কার্যকর করবে। অধিকাংশ লোক এ কাজে বিমুখ, উদাসীন। বা অনবগত। এ প্রকারের সব ব্যয় নির্বাহের পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে এগুলোকে পরিত্যক্ত সম্পদ মনে করে। এসব খরচাদির ক্ষেত্রে ওয়ারিশগণের পক্ষ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে না এবং নাবালেগের ওয়ারিশ হওয়াটা ক্ষতিকর মনে করে, এটা মারাত্মক ভুল, একথার দ্বারা কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, মৃতের কল্যাণার্থে অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। এটাতো ইসালে ছওয়াব, এটাকে কে নিষেধ করবে? যিনি ওহাবী মতাবলম্বী তিনি নিষেধ করতে পারে বরং নাজায়েয পন্থায় এসব ক্ষেত্রে যা খরচ করা হয় এর থেকে নিষেধ করা যায়। নিজের সম্পদ থেকে করুক বা ওয়ারিশগণ প্রাপ্তবয়স্ক হলে ওদের অনুমতিক্রমে করা হোক, তাহলে বাধা নেই।

জানাযা নিয়ে চলার বর্ণনা

মাসআলাঃ জানাযা কাঁধে নেয়া এবাদত, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ ইবাদতে অলসতা না করা। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ বিন মুয়াজের জানাযা বহন করেছিলেন। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ সুন্নাত হলো চার ব্যক্তি জানাযা বহন করা, প্রতিজন একটি করে পায়া কাঁধে নিবে। কেবল দু'জন ব্যক্তি জানাযা বহন করল, বা একজন সামনের অগ্রভাগে একজন পিছনের পশ্চাদ ভাগে বহন করলে বিনা প্রয়োজনে মাকরূহ। যদি প্রয়োজনে হয় যেমন জায়গার স্বল্পতা বা সংকীর্ণতার কারণে হলে কোন অসুবিধা নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পর্যায়ক্রমে একের পর এক খাটিয়ার চারদিক কাঁধে নেয়া এবং প্রত্যেকবার দশ কদম যাওয়া সুন্নাত। পুর্ণ সুন্নাত হচ্ছে প্রথমে মাথার ডান দিক কাঁধে নিবে, এরপর পায়ের ডান দিক অতঃপর মাথার বাম দিক। শেষে পায়ের বাম দিক, প্রতিবার দশ কদম করে মোট চল্লিশ কদম নিয়ে যাবে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, যে চল্লিশ কদম জানাযা বহন করে নিয়ে যাবে ওর চল্লিশটি কবীরা

গুনাহ বিলুপ্ত হবে।

হাদীস শরীফে আরো এরশাদ হয়েছে, যে জানাযার চারদিক কাঁধে নিবে আল্লাহ তাআ'লা ওকে চূড়ান্ত মাগফেরাত দান করবেন। (জাওহেরা, আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ জানাযা নিয়ে যাবার সময় চারদিকের হাতলকে হাতে ধরে কাঁধের উপর রাখবে, আসবাব পত্রের মত গর্দান বা পিটের উপর রাখা মাকরূহ। চতুষ্পদ জন্তুর উপর রেখে নিয়ে যাওয়াটাও মাকরূহ। (আলমগীরি, গুনীয়া, দুররুল মোখতার) ঠেলা গাড়ী করে নিয়ে যাওয়াটাও একই হুকুম।

মাসআলাঃ ছোট ছেলে দুগ্ধদানকারী বা সবেমাত্র দুধ ছেড়েছে অথবা এর চেয়ে সামান্য বড় এমন মৃত ছেলেকে যদি একজন হাতে করে উঠায়ে নেয়, এতে কোন অসুবিধা নেই। একের পর এক লোকেরা হাতে নিতে থাকলে, আর যদি কোন ব্যক্তি বাহনের উপর হয় এবং ছোট ছেলের লাশকে হাতে নিলেও অসুবিধা নেই, মৃত ব্যক্তি যদি এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে চার খাটিয়ার উপর বহন করে নিয়ে যাবে। (গুনীয়া, আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ জানাযা দ্রুততার সাথে নিয়ে যাবে, তবে মৃত ব্যক্তির উপর যেন কোন ধাক্কা না লাগে। জানাযার সাথে গমনকারীদের জন্য জানাযার পিছে যাওয়াটা উত্তম। জানাযার ডানে বামে চলবে না, কেউ যদি আগে গমন করে তার উচিৎ হবে যেন এতটুকু দূরত্ব বজায় রেখে চলে যাতে জানাযায় গমনকারীদের সাথে গণ্য করা না হয়। সকলে যদি জানাযার আগে থাকে, তাহলে মাকরূহ হবে। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে যাওয়াটা উত্তম। বাহনযোগে হলে আগে চলা মাকরূহ, আগে চললে যেন জানাযা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। (আলমগীরি, ছগিরী)

মাসআলাঃ মহিলারা জানাযার সাথে গমন করা নাজায়েয ও নিষিদ্ধ। ক্রন্দনকারী মহিলা সাথে থাকলে ওকে কঠোরভাবে নিষেধ করতে হবে। যদি না মানে ওর কারণে জানাযার সাথে গমন করাটা বর্জন করবে না। ওর নাজায়েয কাজের দরুন সুন্নাত কেন বর্জন করবে? বরং অন্তরের সাথে ওকে খারাপ মনে করবে এবং জানাযায় শরীক হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মহিলারা যদি জানাযার পিছনে থাকে এবং পুরুষদের আশংকা হয় যে, পিছনে চললে মহিলাদের সাথে মেলামেশা হবে, অথবা ওদের মধ্যে কোন

ক্রন্দনকারীনি থাকলে এসব অবস্থায় পুরুষ আগে গমন করা উত্তম। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জানাযা নিয়ে যাবার সময় মাথার দিকটা সামনে হওয়া চায়, জানাযার সাথে আগুন নিয়ে যাওয়া নিষেধ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ জানাযার সাথে গমনকারীদের চুপ থাকা চায়। মৃত্যু ও মৃতের ভয়াবহতা ও কবরের ভয়ঙ্কর অবস্থাকে সামনে মনে ধারণ করবে, দুনিয়াবী কথা বলবে না, হাসি ঠাট্টা করবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে জানাযার সাথে হাসতে দেখলেন,বললেন, তুমি জানাযায় হাসছো? তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না। এ সময় জিকির করতে ইচ্ছা করলে মনে মনে করবে। বর্তমান যুগে ওলামায়ে কেরাম প্রকাশ্য জিকর করার ব্যাপারেও অনুমতি দিয়েছেন। (ছগিরী, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যতক্ষণ জানাযা কাঁধ থেকে রাখা না হয়, বসাটা মাকরূহ। রাখার পর অপ্রয়োজনে দাঁড়িয়ে থাকবে না। লোকেরা যদি বসা থাকে এবং সেস্থানে যদি নামাজের জন্য জানাযা বা লাশ নেয়া হয়। যতক্ষণ কাঁধ থেকে রাখা না হয় ততক্ষণ লোকেরা দাঁড়াবে না। অনুরূপ যদি কোন স্থানে লোক বসা আছে ওখান দিয়ে জানাযা অতিক্রম করলে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা জরুরী নয়। তবে যে ব্যক্তি উঠে যেতে ইচ্ছুক সে দাঁড়িয়ে উঠে যাবে। যখন জানাযা রাখা হয় তখন পা কেবলামুখী করে রাখবে না, বা মাথা রাখবে না বরং আড়াল করে রাখবে যেন ডান পার্শ্বে কেবলা হয়। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ জানাযা বহনে পারিশ্রমিক দেয়া নেয়া জায়েয। যদি বহনকারী আরো লোক মওজুদ থাকে (আলমগীরি) কিন্তু হাদীস শরীফে জানাযা বহনে যে ছওয়াব পাওয়ার কথা বর্ণনা হয়েছে তা পাওয়া যাবে না। কারণ সেতো বিনিময় গ্রহণ করে নিয়েছে।

মাসআলাঃ মৃত যদি প্রতিবেশী বা নিকটাত্মীয় বা কোন সৎ মানুষ হলে তার জ নাযার সাথে গমন করাটা নফল নামায পড়া থেকে উত্তম। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে থাকবে ওর নামাজ পড়া ব্যতীত ফিরে আসাটা উচিৎ নয়। নামাজের পর মৃতের অলীর অনুমতি নিয়ে ফিরে আসতে পারবে। কাফনের পর মৃত ব্যক্তির অলীর অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। (আলমগীরি)

জানাযা নামাজের বর্ণনা

মাসআলাঃ জানাযা নামাজ ফরযে কেফায়া, একজনও যদি আদায় করে সবাই দায়িত্বমুক্ত হবে। অন্যথায় যাদের কাছে সংবাদ পৌছেছে নামাজ পড়েনি তারা গুনাহগার হবে। জানাযা ফরজ হওয়াকে যে অস্বীকার করবে সে কাফের। (ফকাহর সব কিতাবসমূহ)

মাসআলাঃ জানাযা নামাজের জন্য জামাত শর্ত নয়। এক ব্যক্তিও যদি পড়ে নেয়, আদায় হয়ে-গেল। (আলমগীরি)

জানাযা নামাযের শর্তাবলী

মাসআলাঃ অন্যান্য নামাজের জন্য যেসব শর্তাবলী রয়েছে জানাযা নামাজের জন্য একই শর্তাবলী প্রযোজ্য। অর্থাৎ (১) নামাজ আদায়ে সক্ষম হওয়া (২) বালেগ হওয়া (৩) জ্ঞানী, বিবেকবান হওয়া (৪) মুসলমান হওয়া এতে একটি বিষয় অতিরিক্ত রয়েছে অর্থাৎ মৃত্যুর সংবাদ প্রচার হওয়া (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জানাযা নামাজে দু' প্রকারের শর্ত রয়েছে এক প্রকার হচ্ছে নামাজ আদায়কারী সম্পর্কে দ্বিতীয় হচ্ছেঃ মৃত, ব্যক্তি সম্পর্কে, নামাজ আদায়কারী সম্পর্কে ওসব শর্ত রয়েছে যা মুতলাক বা সাধারণ নামাজের ক্ষেত্রে রয়েছে অর্থাৎ নামাজী নাজাসাতে হুকমী (বিধানগত নাপাকী) নাজাসাতে হাকিকী (প্রকৃত নাপাকী) থেকে পবিত্র হওয়া, নামাজীর কাপড় পবিত্র হওয়া, নামাজের জায়গা পবিত্র হওয়া, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া, নিয়ত করা, জানাযার হন্য সময় শর্ত নয়, তাকবীর তাহরীমা হচ্ছে রুকন, শর্ত নয়। যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। (রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

অনেক লোক জুতা পরিধান করে অনেকে জুতার উপর দাড়িয়ে জানাযার নামাজ পড়ে থাকে। যদি জুতা পরিধান করে পড়া হয় তাহলে জুতা এবং জুতার নীচের মাটি উভয়টি পবিত্র হওয়া আবশ্যক। নাপাকী নিষিদ্ধ পরিমাণ হলে ওর নামাজ হবে না। জুতার উপর দাড়িয়ে পড়লে জুতা পবিত্র হওয়া জরুরী।

মাসআলাঃ জানাযা প্রস্তুত অযু বা গোসল করতে গেলে জানাযা নামাজ হয়ে যাবে মনে হলে তায়াম্মুম করে পড়ে নিবে। এর বিস্তারিত বিবরণ তায়াম্মুম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে

মাসআলাঃ ইমাম পবিত্র ছিল না, তাহলে নামাজ পুনরায় পড়বে। যদিও মুক্তাদি পবিত্র ছিল। যখন ইমামের হল না কাহারো হবে না। আর যদি ইমাম পবিত্র ছিল

কিন্তু মুক্তাদি পবিত্র ছিল না, তখন পুনরায় পড়তে হবে না। যদিও বা মুক্তাদিদের হয়নি ইমামের হয়ে গেছে, অনুরূপ যদি মহিলা নামাজ পড়ায় এবং পুরুষরা ওর এক্তেদা করল, তাহলে পুনরায় পড়বে না। যদিও বা পুরুষদের এক্তেদা সঠিক ছিল না। কিন্তু মহিলার নামাজ হয়েছে এটাই যথেষ্ট। জানাযা নামাজ পুনর্বার পড়া জায়েয নেই। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ বাহনের উপর জানাযার নামাজ পড়লে হবে না। ইমাম বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত, ইমাম পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। নাবালেগ নামাজ পড়ালে হবে না। (দুর্রুল মোখতার, আলমগীরি) জানাযার নামাজে মৃতের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি শর্ত (১) মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি বলতে যিনি জীবিত জন্মগ্রহণ করে অতঃপর মারা গেল, তাকে বুঝানো হয়েছে, আর যদি মৃত্যু জন্ম গ্রহণ করে বরং অর্ধেকেরও কম বের হয়েছে এমন সময় জীবিত ছিল বের হবার পূর্বে মারা গেল, ওর নামাজ পড়তে হবে না। এ মাসআলার আরো বিবরণ সামনে আসছে।

মাসআলাঃ ছোট শিশু, পিতা মাতা দু'জন মুসলমান অথবা একজন মুসলমান তাহলে শিশুও মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। ওর নামাজ পড়া যাবে। আর যদি পিতা মাতা উভয়ই কাফের হয়, শিশুর নামাজ পড়া যাবে না। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মুসলমান, অমুসলিম রাষ্ট্রে কোন ছোট ছেলেকে একা পেল এবং ওকে নিয়ে এল মুসলমানের ওখানে এসে মারা গেল ওর নামাজ পড়া যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ প্রত্যেক মুসলমানের নামাজ পড়া যাবে। যদিও বা যে কোন প্রকারের গুনাহগার হোক না কেন এবং কবীরা গুনাহকারী হোক না কেন! কিন্তু কয়েক প্রকার লোকের নামাজ পড়া যাবে না। (১) বিদ্রোহী, যে ন্যায়পরায়ন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলো এবং সে বিদ্রোহ অবস্থায় যদি মারা যায়। (২) ডাকাত, যে ডাকাতি অবস্থায় মারা যায় ওকে গোসল দেয়া যাবে না। ওর জানাযাও হবে না। তবে ইসলামী শাসক যদি ওদের বন্দী করে এবং হত্যা করে তাহলে গোসল ও নামায হবে। অথবা ওকে ধরা হয়নি বা মারা হয়নি বরং এমনিতে মারা যায় তখনও গোসল দেয়া যাবে এবং নামাজ পড়ানো যাবে। (৩) যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করেছে বরং যে ব্যক্তি ওদের তামাশা দেখছে এবং ছুটে আসা পাথর লেগে মারা গেল ওদেরও নামাজ নেই তবে ঘটনাস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মারা গেলে নামাজ পড়া যাবে। (৪) যে, কয়েকজনকে গলা টিপে মেরেছে ওর নামাজ পড়া

যাবে না। (৫) শহরের রাত্রে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুটপাট সন্ত্রাস করলে সেও ডাকাত, সন্ত্রাস অবস্থায় মারা গেলে ওর নামাজও পড়া যাবে না। (৬) যে নিজের পিতামাতাকে হত্যা করেছে ওর নামাজও পড়া যাবে না। (৭) যে কারো মাল ছিনতাই কালে মারা গেল ওর নামাজও পড়া যাবে না। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যে আত্মহত্যা করেছে অথচ এটা মারাত্মক গুনাহ কিন্তু ওর জানাযা নামাজ পড়া যাবে। যদিও ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করেছে। যাকে পাথর ছুড়ে মারা হয়েছে বা কিসাস অর্থাৎ হত্যার বদলায় হত্যা করা হয়েছে, ওকেও গোসল দেয়া যাবে নামাজও পড়া যাবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

দ্বিতীয় শর্তঃ মৃত ব্যক্তির শরীর ও কাফন পবিত্র হওয়াঃ

মাসআলাঃ শরীর পাক করা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যেন ওকে গোসল দেয়া হয় বা গোসল করা অসম্ভব অবস্থায় যেন তায়াম্মুম করা হয়। কাফন পরিধানের পূর্বে শরীর থেকে নাপাকী বের হলে তা ধুয়ে দিবে। কাফন পরিধানের পর বের হলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই। কাফন পবিত্র হওয়া বলতে এটা বুঝানো হয়েছে যে, যেন পবিত্র কাফন পরিধান করা হয়। পরে যদি নাপাকী বের হয় এবং কাফন অপবিত্র হয় এতে কোন অসুবিধা নেই। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ গোসল বিহীন জানাযা নামাজ পড়লে হবে না। ওকে গোসল দিয়ে পুনরায় পড়তে হবে। কবরে রাখা হয়েছে এখনো মাটি চাপা দেয়া হয়নি, তাহলে কবর থেকে বের করে নিবে এবং গোসল দিয়ে নামাজ পড়বে। আর যদি মাটি চাপা দিয়ে ফেলা হয়, তাহলে বের করবে না। তখন ওর কবরের নিকট নামাজ পড়বে। কারণ গোসল বিহীন হওয়ায় প্রথমবারের নামাজ হয়নি এখন যেহেতু গোসল দেয়াটা অসম্ভব সুতরাং নামাজ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

তৃতীয় শর্তঃ জানাযা সে স্থানে উপস্থিত থাকা অথাৎ পূর্ণ বা অধিকাংশ বা মাথার অধিকাংশ সহ উপস্থিত থাকা। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযা নামাজ হবে না।

চতুর্থ শর্তঃ জানাযা মাটির উপর রাখা বা হাতের উপর হওয়া, যদি কোন প্রাণী ইত্যাদির গোবরের উপর হয়, নামাজ হবে না।

পঞ্চম শর্তঃ জানাযা বা লাশ নামাজীর আগে কিবলামুখী হওয়া, যদি নামাজীর পিছনে হয় নামাজ সহীহ হবে না।

মাসআলাঃ জানাযা যদি উল্টো করে রাখা হয় অর্থাৎ ইমামের ডানে যদি মৃত

ব্যক্তির পা রাখে নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করলে গুনাহগার হবে। (দুরুল মোখতার)

মাসআলাঃ কিবলা নির্ধারণে ভুল হলে অথাৎ মৃত ব্যাক্তকে নিজ ধারণানুসারে কেবলামুখী রাখা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবলামুখী হয়নি, তাহলে অনুসন্ধান ও চিন্তা ভাবনা করলে নামাজ হবে। অন্যথায় হবে না। (দুর্রুল মোখতার)

ষষ্ঠ শর্তঃ মৃত ব্যক্তির দেহের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরজ তা ঢেকে রাখা।

সপ্তম শর্তঃ মৃত ব্যক্তি ইমামের সামনা সামনি হওয়া, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি একজন হয়, তাহলে ওর দেহের কোন অংশ যেন ইমামের সামনা সামনি করা হয়, আর যদি মৃতের সংখ্যা কয়েকজন হয়, তাহলে দেহের যে কোন এক অংশ ইমামের সামনা সামনি বরাবর হলেই যথেষ্ট। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জানাযার নামাজে রুকন দু'টি (১) চারবার তাকবীর বলা (২) দাড়িয়ে নামাজ পড়া। বিনা ওজরে বসে বা বাহনের উপর জানাযার নামাজ পড়লে হবে না। আর যদি অলী বা ইমাম অসুস্থ ছিল সে বসে পড়লে মুক্তাদিগণ দাড়িয়ে পড়ল হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ জানাযা নামাজে সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ তিনটি (১) আল্লাহ্ তায়ালার ছানা পাঠ, (২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা (৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা। জানাযা নামাজ পড়ার নিয়ম হচ্ছে যে, জানাযার নামাজের নিয়ত করে কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে আল্লাহু আকবর বলে হাত নামিয়ে যথারীতি নাভীর নীচে হাত বেঁধে নিবে এবং ছানা পড়বে যেমনঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ সোবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়াজাল্লা ছানাউকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা। এরপর হাত না উঠায়ে আল্লাহু আকবর বলবে এবং দরুদ শরীফ পড়বে এবং সে দরুদ শরীফ পাড়াটা উত্তম, যে দরুদ নামাজে পড়া হয়, যদি অন্য কোন দরুদ শরীফ পড়া হয় তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এরপর পুনর্বার আল্লাহ্ আকবর বলে নিজের ও মৃত ব্যক্তির জন্য এবং সকল মুসলিম নর নারীর জন্য দোয়া করবে। হাদীসে উল্লেখিত দোয়া পড়া উত্তম। হাদীসে বর্ণিত দোয়া যদি ভালভাবে পড়তে না পারে যেটি ইচ্ছা পড়া যাবে। তবে দোয়াটি যেন এমন হয় যা পরকালের বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত। (জাওহেরো নায়্যারা, আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

জানাযার চৌদ্দটি দোআ

হাদীসে উল্লেখিত কতিপয় দোয়া নিচে বর্ণিত হলোঃ

(১) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ – اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহ্ মিন্না ফাআহ ইহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহ্ মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহ্ আলাল ঈমান।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাদের জীবিত, মৃত, আমাদের উপস্থিত, অনুপস্থিত, আমাদের ছোট, বড়, আমাদের নর-নারী সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের থেকে যাদেরকে তুমি জীবিত রাখ ওদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ। আমাদের থেকে যাদেরকে তুমি মৃত্যু দান কর ওকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত কর না এর পরে আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ কর না।

(২) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণঃ (২) আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়াফিহি ওয়াউফু আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়াওসসি মুদখালাহু ওয়া আগসিলহু বিলমায়ি ওয়াসসালজে ওয়াল বারদে ওয়া নাক্কিহু মিনাল খাতায়া কামা নাক্কাইতুস ছওবাল আবয়াদা মিনাদ দানাসে ওয়াআবদিলহু দারান খায়রাম মিন দারিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহি ওয়া জাওযান খায়রাম মিন জওযিহি ওয়া আদ্খিলহুল জান্নাতা ওয়া আঈদহু মিন আযাবিল কাবরি ওয়ামিন ফিতনাতিল ক্বাবরি ওয়া আযাবিন নারি।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, সুস্থতা দান কর এবং মার্জনা কর,

সম্মানের অথিতি কর, এস্থানকে প্রশস্থ কর এবং তাকে পানি, বরফ ও ঠাণ্ডা দিয়ে ধৌত কর এবং তার গুনাহকে পবিত্র কর, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে অপরিষ্কার হ্তে পবিত্র করেছো এর বিনিময়ে তাকে তার ঘরের চেয়ে উত্তম ঘর দাও, তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দাও, স্ত্রীর পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দাও, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। ক্বরের আযাব ক্বরের ফিত্না জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(٣) اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ وَبِنْتُ أَمَتِكَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ يَشْهَدُ وَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ (اَصْبَحَ اَصْبَحَتْ فَقِيْرًا فَقِيْرَةً) إِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهٖ (تَخَلّٰى تَخَلَّتْ) مِنَ الدُّنْيَا وَاَهْلِهَا (اِنْ كَانَ كَانَتْ) (زَاكِيًا زَاكِيَةً) فَزَكِّهٖ (وَاِنْ كَانَ كَانَتْ) مُخْطِئًا مُخْطِئَةً فَاغْفِرْلَهٗ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ

উচ্চারণঃ (৩) আল্লাহুম্মা আবদুকা ওয়াউবনু ওয়া বিনতু আমাতিকা ইয়াশহাদু আন লাইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লাশরীকা লাকা ইয়াশহাদু/তাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা আসবাহা ফরিকান/আসবাহাত ফকিরাতান, ইলা রাহমাতিকা ওয়াসবাহ্তা গনিয়্যান আন আযাবিহি তাখাল্লা/তাখাল্লাত মিনাদ্দুনিয়া ওয়া আহ্লিহা ইনকানা /কানাত মুখতিয়ান/মুখতিয়াতান ফাগফিরলাহু আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আযরাহু ওয়ালাতুদ্বিল্লানা বাদাহু

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা, তোমার বান্দীর পুত্র স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি একক তোমর কোন অংশীদার নেই। স্বাক্ষী দিচ্ছে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমার বান্দা এবং রাসূল। এ অধম তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী, তুমি তার তার শাস্তির অমুখাপেক্ষী। সে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী থেকে পৃথক হয়েছে। তুমি তাকে পাক-পবিত্রকর। যদি গুনাহ্গার হয় ক্ষমা র হে আল্লাহ! এর প্রতিদান থেকে আমাদের বঞ্চিত কর না, এরপর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট কর না।

(٤) اَللّٰهُمَّ هٰذَا هٰذِهٖ عَبْدُكَ اَمَتُكَ اِبْنُ بِنْتُ اَمَتِكَ مَاضٍ فِيْهِ حُكْمُكَ خَلَقْتَهٗ وَلَمْ يَكُ تَكُ شَيْئًا مَذْكُوْرًا (نَزَلَ نَزَلَتْ) بِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهٖ اَللّٰهُ لَقِّنْهُ حُجَّتَهٗ وَاَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (اَفْتَقَرَ اَفْتَقَرَتْ) اِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ (كَانَ كَانَتْ) يَشْهَدُ تَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَاغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ

اَللّٰهُمَّ اِنْ (كَانَ كَانَتْ) اَللّٰهُمَّ اِنْ (كَانَ كَانَتْ) (زَاكِيًا زَاكِيَةً) فَزَكِّهٖ وَاِنْ (كَانَ كَانَتْ) خَاطِئًا خَاطِئَةً فَاغْفِرْ لَهٗ

উচ্চারণঃ (৪) আল্লাহুম্মা হাজা/হাজিহি আবদুকা/আমাতুকা ইবনু/বিনতু আবদিকা ইবনু/বিনতু আমাতিকা মাযিন ফিহি হুকুমুকা খালাকতাহু ওয়ালাম য়াকু। তাকু শায়য়াম মাযকুরা নযলা/নযলাত বিকা ওয়ানতা খায়রু মানযলিন বিহি আল্লাহ লাক্কিনহু হুজ্জাতাহু ওয়ালহিকহু বিনাবিয়্যিহি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা ওয়াসাব্বিতহু বিল কাউলিস সাবিতি ফাইন্নাহু আফতাকারা আফতাকারাত, ইলাইকা ওয়াসতাগনাইতা আনহু কানা/কানাত ইয়াশহাদু/তাশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ফাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ওয়ালাতাহরিমনা আযরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বাদাহু আল্লাহুম্মা ইন কানা/কানাত জাকিয়্যান/জাকিয়্যাতান নাক্কিহু ওয়াইনকানা/কানাত খাতিয়ান/খতিয়্যাতান ফাগফিরলাহু।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা, তোমার বান্দা ও বান্দীর পুত্র তার ব্যাপারে তোমার নির্দেশ কার্যকর, তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। অথচ সে স্মরণযোগ্য ছিল না। তোমার নিকট এসেছে তুমি সবচেয়ে উত্তম। যার নিকট অবতরণ করা যায়। হে আল্লাহ! তাকে তালকীন প্রমাণ শিক্ষা দাও এবং তাকে তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাথে সাক্ষাৎ করাও, প্রতিষ্ঠিত বাণীর উপর তাকে অটুট রাখ। কেননা সে তোমার মুখাপেক্ষী তুমি এর মুখাপেক্ষী নও। সে স্বাক্ষী দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাকে ক্ষমা কর এবং দয়া কর এর প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত কর না। এরপরে আমাদেরকে বিপদে নিক্ষেপ কর না। হে আল্লাহ! সে যদি পাক হয় তুমি পাক কর, গুনাহগার হলে তুমি তাকে ক্ষমা কর।

(٥) اَللّٰهُمَّ (عَبْدُكَ اَمَتُكَ) (وَابْنُ بِنْتُ) اَمَتِكَ اَحْتَاجَ اَحْتَاجَتْ اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهٖ اِنْ (كَانَ كَانَتْ) مُحْسِنًا مُحْسِنَةً) فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ (كَانَ كَانَتْ) مُسِيْئًا مُسِيْئَةً) فَتَجَاوَزْ عَنْهُ

(৫) আল্লাহুম্মা আবদুকা/আমাতুকা ওয়া ইবনু/বিনতু আমাতিকা আহতাযাযাত ইলা রাহমাতিকা ওয়ানতা গনিয়্যান আন আযাবিহি ইন কানা/কানাত মুহ্‌ছিনান/মুহ্‌ছিনাতান ফাযিদনি এহসানিহি ওয়াইন কানা/কানাত মুসিয়ান/মুসিয়াতান ফাতাযাওয়ায আনহু।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ এ হচ্ছে তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। তুমি তার শাস্তির অমুখাপেক্ষী যদি পূণ্যবান হয় তাকে অধিক পূণ্য দান কর, গুনাহগার হলে ক্ষমা কর।

(٦) اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ/اَمَتُكَ (وَابْنُ/بِنْتُ) عَبْدِكَ (كَانَ كَانَتْ) (يَشْهَدُ تَشْهَدُ) اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنَّا اِنْ (كَانَ كَانَتْ) مُحْسِنًا مُحْسِنَةً فَزِدْ فِىْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ (كَانَ كَانَتْ) مُسِيْئًا مُسِيْئَةً) فَاغْفِرْلَهٗ وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.

উচ্চারণঃ (৬) আল্লাহুম্মা আবদুকা/আমাতুকা উবনু/বিনতু আবদিকা কানা/কানাত ইয়াশহাদু/তাশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়ারাসুলুকা সাল্লাল্লাহু তাআ'লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ওয়ানতা আ'লামু বিহি মিন্না ইনকানা/কানাত মুহছিনান/মুহছিনাতান ফাযিদ্‌নি এহছানিহি ওয়াইন কানা/কানাত মুসিয়্যান/মুসিয়্যাতান ফাগফিরলাহু ওয়ালা তাহ্‌রিমনা আযরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা'দাহু।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! সে তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দার পুত্র, সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা তোমার রাসূল। তুমি বান্দাদের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অধিক জান, যদি পূণ্যবান হয় আরো অধিক পূণ্যবান কর। যদি গুনাহগার হয় ক্ষমা কর এবং এর প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত কর না। এরপর আমাদেরকে বিপদে ফেল না।

(٧) اَصْبَحَ عَبْدُكَ (هٰذَا هٰذِهٖ) قَدْ (تَخَلّٰى تَخَلَّتْ) عَنِ الدُّنْيَا (وَتَرَكَهَا تَرَكَتْهَا) لِاَهْلِهَا (وَافْتَقَرَ وَافْتَقَرَتْ) اِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ وَقَدْ (كَانَ كَانَتْ) (يَشْهَدُ تَشْهَدُ) اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَاَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণঃ (৭) আসবাহা আবদুকা হাযা/হাযিহি ক্বাদ তাখাল্লা/তাখাল্লাত আনিদ্দুনিয়া ওয়া তারাকাহা/তারাকতাহা লিআহলিহা ওয়াফতাকারা/আফতারকারাত ইলাইকা ওয়াসতাগনাইতা আনহু ওয়াক্বাদ কানা/কানাত ইয়াশহাদু/তাশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলাকা সাল্লাল্লাহু তাআ'লা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুম্মাগফির্‌লাহু ওয়াতাযাওয়ায আনহু ওয়ালহিক্‌হু বিনাবিয়্যিহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা।

অর্থাৎ- তোমার এ বান্দা আজকে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল, দুনিয়াকে দুনিয়াবাসীর জন্য ছেড়ে চলে গেল, সে তোমার মুখাপেক্ষী, তুমি তার প্রতি মুখাপেক্ষী নও। সে স্বাক্ষী দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা তোমার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার অপরাধ মার্জনা কর। তাঁকে তার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাথে যুক্ত কর।

(٨) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْلَهَا.

উচ্চারণঃ (৮) আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বুহা ওয়াআনতা খালাকতাহা ওয়াআনতা হাদায়তাহা লিল ইসলামি, ওয়ানতা কাবযতা রুহাহা ওয়ানতা আলামু বিছিররিহা ওয়া আ'লা নিয়্যাতিহা ফিইনা শোফাআ ফাগফিরলাহা।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ তুমি তার প্রতিপালক! তুমি তাকে সৃষ্টি করেছো, তুমি তাকে ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছো, তুমি তার রুহকে কব্জ করেছো, তুমি তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জান। আমরা সুপারিশের জন্য এসেছি, তাকে ক্ষমা কর।

(٩) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاِخْوَانِنَا وَاَخَوَاتِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا اَللّٰهُمَّ (هٰذَا/ هٰذِهٖ) عَبْدُكَ اَمَتُكَ) فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَلَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ.

(৯) আল্লাহুম্মাগফির লী লিইহওয়া নিনা ওয়াইহওয়াতিনা ওয়াছলিহ্‌ যাতা বাইনিনা ওয়াআল্লিফ বাইনা কুলুবিনা আল্লাহুম্মা হাযা/হাযিহি আবদুকা/আমাতুকা ফুলান উবনু ফুলানিন, ওয়ালা নাআলামু ইল্লা খায়রান ওয়ানতা আলামু বিহি মিন্না ফাগফিরলানা ওয়ালাহু।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদের ভাই-বোনদের ক্ষমা কর আমাদের পরস্পরিক অবস্থাকে সংশোধন করে দাও, আমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। তোমার এ বান্দা অমুকের পুত্র অমুক আমরা তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছু জানি না। তুমি তার সম্পর্কে সঠিক জান। তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর।

(١٠) اَللّٰهُمَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِنْتُ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(১০) আল্লাহুম্মা ফুলান উবনু ফুলানিন/ফুলান বিনতি ফুলানিন ফি যিম্মাতিকা ওয়াহাবলু

যাওয়ারিকা ফিক্বহি মিন ফিতনাতিল কাব্রি ওয়া আযাবিন্নার ওয়ানতা আহ্লুল ওয়াফায়ি ওয়াল হামদি আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রাহীম।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার জিম্মায় রয়েছে এবং তোমার হেফাজতে রয়েছে। তাকে কবরের বিপদ, জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি অঙ্গীকার পূর্ণতা ও প্রশংসার যোগ্য, হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(١١) اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا.

উচ্চারণঃ (১১) আল্লাহুম্মা আযিরনা মিনাশ শায়তানি ওয়া আযাবিল ক্ববরি আল্লাহুম্মা যাফিল আরদ্বা আন যানবযনিহা ওয়া ছায়্যিদ রুহাহা ওয়ালাক্ক্বিহা মিনকা রিদ্বওয়ানান।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান ও কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ দাও। হে আল্লাহ! তার দু পার্শ্বে জমীনকে প্রশস্ত করে দাও। তার আত্মাকে উন্নত কর এবং তোমার সন্তুষ্টি দান কর।

(١٢) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَنَحْنُ عِبَادُكَ وَاَنْتَ رَبُّنَا وَاِلَيْكَ مَعَادُنَا.

উচ্চারণঃ (১২) আল্লাহুম্মা ইন্নাকা খালাকতানা ওয়া নাহনু ইবাদুকা ওয়ানতা রাব্বুনা ওয়া ইলাইকা মাআদুনা।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমরা তোমার বান্দা, তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করবো।

(١٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.

উচ্চারণঃ (১৩) আল্লাহুম্মাগফির লিআউয়্যালিনা ওয়াআখিরিনা ওয়াহায়্যিনা ওয়ামাইয়্যিতিনা ওয়াযাকারিনা ওয়া উনসানা ওয়াসগিরীনা ওয়া কবিরীনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবীনা আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আযরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বাদাহু।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা কর। আমাদের জীবিত ও মৃতদেরকে, আমাদের নর-নারীকে, আমাদের ছোট-বড়কে, আমাদের উপস্থিত অনুপস্থিতকে ক্ষমা কর। এর প্রতিদান থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না। এরপর আমাদেরকে বিপদে ফেল না।

(١٤) اَللّٰهُمَّ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَابَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْكَرِيْمَ اِذَا اَمَرَ بِالسُّؤَالِ لَمْ يَرُدَّهٗ اَبَدًا وَقَدْ اَمَرْتَنَا فَدَعَوْنَا وَاَذِنْتَ لَنَا فَشَفَعْنَا وَاَنْتَ اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ فَشَفِّعْنَا فِيْهِ وَارْحَمْهُ فِيْ وَحْدَتِهٖ وَارْحَمْهُ فِيْ وَحْشَتِهٖ وَارْحَمْهُ فِيْ غُرْبَتِهٖ وَارْحَمْهُ فِيْ كُرْبَتِهٖ وَاَعْظِمْ لَهٗ اَجْرَهٗ وَنَوِّرْ لَهٗ وَبَيِّضْ لَهٗ وَجْهَهٗ وَبَرِّدْ لَهٗ مُضْجَعَهٗ وَعَطِّرْ لَهٗ مَنْزِلَهٗ وَاَكْرِمْ لَهٗ نُزُلَهٗ يَاخَيْرَ الْمُنْزِلِيْنَ وَيَاخَيْرَ الْغَافِرِيْنَ وَيَاخَيْرَ الرَّاحِمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِ الشَّافِعِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ (১৪) আল্লাহুম্মা এয়া আরহামার রাহিমীন। এয়া আরহামার রাহিমীন। এয়া আরহামার রাহিমীন এয়া হাইয়্যু এয়া কাইয়্যুমু এয়া বাদিয়্যুস ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি এয়া যালযিলালে ওয়াল ইকরামি ইন্নি আস্আলুকা বিআন্নি আশহাদু আন্নাকা আনতা আল্লাহু আলআহাদু আস্সামাদু আল্লাযি লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়্যান আহাদ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ওয়াইলাইকা বিনাবিয়্যিকা মুহাম্মদীন নাবিয়্যির রাহমাতি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা আল্লাহুম্মা ইন্নাল কারীমা ইযা আমারা বিস্সুওয়ালি লাম ইয়ারুদ্দাহু আবাদান ওয়াক্বাদ আমারতানা ফাদাওয়ানা, ওয়াআযিনতা লানা ফাশাফআনা ওয়াআনতা আকরামুল আকরামীন, ফাশাফ্ফিইনা ফিহি ওয়ারহামহু ফি ওয়াহদাতিহি ওয়ারহামহু ফি ওয়াহশাতিহি ওয়ার হামহু ফি গুরবাতিহী ওয়ারহামহু ফি ক্বুরবাতিহী ওয়াআযিন লাহু আযরাহু ওয়া নাব্বির লাহু, ওয়ারহামহু ওয়া বায়্যিাদ লাহু ওয়াযহাহু ওয়াবাররিদ লাহু মুদযাআহু ওয়া আত্তির লাহু মানযিলাহু ওয়া আকরিম লাহু নুযুলাহু এয়া খায়রাল মুযিলিনা ওয়া ইয়া খায়রাল গাফিরিনা ওয়া খায়রার রাহিমীনা আমীন। আমীন। আমীন সাল্লি ওয়াসাল্লিম ওয়াবারিক আ'লা সায়্যিদিশ শাফিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালিহি ওয়াসহাবিহি আজমাঈন ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু! হে পরম করুণাময়! হে মহান দয়াময়! হে চিরঞ্জীব! হে সর্বনিয়ন্তা! হে নভোমণ্ডলের স্রষ্টা! হে পরাক্রমশালী-সম্মানিত সত্ত্বা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ

একক, অমুখাপেক্ষী যিনি কাউকে জন্ম দেননি। তিনিও কারো থেকে জন্ম হননি তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং তোমার রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ওসীলায় তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি। হে আল্লাহ্ দয়াময়! যখন প্রার্থনার নির্দেশ করেন, কখনো ফিরিয়ে দেন না, তুমি আমাদেরকে নির্দেশ করেছো, আমরা প্রার্থনা করেছি তুমি আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছো, আমরা সুপারিশ করেছি। তুমি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু তার ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ কবুল কর। তার একাকিত্ব অবস্থায় তাকে দয়া কর। তার ভয়ঙ্কর অবস্থায় তাকে অনুগ্রহ কর। তার দারিদ্রতায় দয়া কর, তার অস্থিরতার সময় দয়া কর। তাকে মহান প্রতিদান দান কর। তার কুবরকে আলোকিত কর তার চেহারায় শুভ্রতা দান কর তার নিদ্রাস্থানকে শীতল কর। তার বাসস্থানকে সুগন্ধিময় কর, আর তাকে উত্তম অতিথির পাথেয় দান কর। হে উত্তম অবতরণকারী! হে উত্তম ক্ষমালী! হে উত্তম করুণাময়! আমীন-আমীন-আমীন। দরুদ-সালাম ও বরকত বর্ষণ কর শাফাআতকারীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রতি তাঁর বংশধরদের প্রতি, ছাহাবাদের প্রতি সকলের প্রতি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।

বিঃ দ্রঃ উপরে বর্ণিত দোয়া সমূহে মহিলা হলে, হু এর স্থলে হা শব্দ বলতে হবে। (অনুবাদক)

ফায়েদাঃ নবম ও দশম দোয়া পাঠকালে মৃত ব্যক্তির পিতার নাম জানা না থাকলে এর স্থলে আদম (আঃ) এর নাম বলবে। কারণ তিনি সকল মানুষের পিতা, আর যদি স্বয়ং মৃত ব্যক্তির নামও জানা না থাকে তখন নবম দোয়ায় هٰذَا عَبْدُكَ হাযা আবদুকা অথবা هٰذِهٖ اَمَتُكَ হাযিহি আমাতুকা বলবে فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِاِسْمِهٖ ছেড়ে দিবে, দশম দোয়ায় এর স্থলে عَبْدُكَ هٰذَا (আবদুকা হাযা) বলবে, মহিলা হলে اَمَتُكَ هٰذِهٖ (আমাতুকা হাযিহি) বলবে।

ফায়েদাঃ মৃত ব্যক্তি ফাসিক হলে এবং ফাসিক হওয়াটা জানা গেলে নবম দোয়ায় لَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا এর স্থলে قَدْ عَلِمْنَا مِنْهُ خَيْرًا বলবে। যেহেতু ইসলাম সর্বপ্রকার উত্তম থেকে উত্তম।

মাসআলাঃ উপরোক্ত দোয়াসমূহে কতেক বিষয়ের পুণরাবৃত্তি হয়েছে, দোয়ার মধ্যে পুণরাবৃত্তি করা মুস্তাহসান বা উত্তম, সবগুলো দোয়া যদি স্মরণ থাকে সময়ও

যদি থাকে সবগুলো পড়া উত্তম। অন্যথায় যেটা ইচ্ছা পড়বে। ইমাম যতক্ষণ এ দোআগুলো পড়বে মুক্তাদি আমীন বলবে। মুক্তাদির যদি স্মরণ না থাকে, তাহলে প্রথম দোআর পর আমীন আমীন বলতে থাকবে।

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি যদি মাতাল বা নাবালেগ হয় তাহলে তৃতীয় তাকবীরের পর এ দোয়াটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজআলহু লানা ফারতান ওয়াযআলহু লানা আজরাও ওয়া যুখরা ওয়াজআলহু লানা শাফিআও ওয়া মুশাফ্ফাআ।

মাইয়্যিত অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে হলে اِجْعَلْهُ এর স্থলে اِجْعَلْهَا বলবে شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا এর স্থলে شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً বলতে হবে। পাগল বলতে এমন পাগলকে বুঝান হয়েছে, যে বালেগ হওয়ার আগে পাগল হয়ে গেছে, সেতো কখনো শরীয়তের বিধান আরোপ যোগ্যই হয়নি। আর পাগল যদি অস্থায়ী হয় ওর মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করবে, যেমন অন্যদের জন্য দোয়া করা হয়, পাগল হওয়ার আগে তো সে মুকাল্লাদ বা শরীয়তের বিধান প্রয়োগযোগ্য ছিল। পাগল হওয়ার পূর্বের গুনাহ পাগল হওয়ার কারণে চলে যায় না। (গুনীয়া)

মাসআলাঃ চতুর্থ তাকবীরের পর কোন দোয়া পড়া ব্যতীত হাত খুলে সালাম ফিরাবে। সালামে মৃত ব্যক্তি ফেরেস্তাগণ এবং নামাযে উপস্থিত লোকদের নিয়ত করবে এমনিভাবে করবে যেভাবে অন্যান্য নামাজে করা হয়। এক্ষেত্রে মৃত বক্তির নিয়্যতটা অতিরিক্ত থাকবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ তাকবীর ও সালাম ইমাম উচ্চস্বরে বলবে। বাকী সবগুলো নিম্নস্বরে পড়বে। কেবল প্রথমবারে আল্লাহু আকবর বলার সময় হাত উঠাবে তার পর হাত উঠাবে না। (জাওহেরা দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে কুরআন পাঠের নিয়্যতে বা তাশাহহুদ পড়া নিষেধ। তবে দোয়া ও ছানার নিয়তে আলহামদু ইত্যাদি আয়াত পড়া জায়েয (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ জানাযার নামাযে তিন কাতার করা উত্তম। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, যার নামায তিন কাতারে পড়া হবে ওর মাগফেরাত হয়ে যাবে। যদি সর্বমোট সাতজন হলে একজন ইমাম হবেন তিনজন পথম কাতারে দুইজন দ্বিতীয়

কাতারে একজন তৃতীয় কাতারে দাঁড়াবে। (গুণীয়া)

মাসআলাঃ জানাযার নামাজে পিছনের কাতারের ফজীলত সব কাতারের ফজীলতের উপর (দুরর্রুল মোখতার)

জানাযার নামায কে পড়াবে?

মাসআলাঃ জানাযার নামাজে সর্বাগ্রে ইমামতির হকদার হচ্ছে ইসলামী শাসক। অতঃপর কাজী, অতঃপর জুমার ইমামের এরপর মহল্লার ইমামের তারপর অলির, অলির উপর মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। তবে মহল্লার ইমাম অলি থেকে উত্তম হতে হবে। অন্যথায় অলি উত্তম। (গুণীয়া, দুরর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ অলি বলতে মৃত ব্যক্তির আপনজন বুঝানো হয়েছে, নামাজ পড়ানোর ব্যাপারে অলিদের ক্ষেত্রে সে তারতীবই প্রযোজ্য যা বিবাহের বেলায় প্রযোজ্য, তবে পার্থক্য হল এতটুকু যে, জানাযার নামাজে মৃত ব্যক্তির পিতাকে ছেলের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, অবশ্য পিতা যদি আলেম না হয় এবং ছেলে যদি আলেম হয় তাহলে জানাযার বেলায়ও ছেলেকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যদি আপনজন না থাকে তাহলে আত্মীয়-স্বজনকে অন্যান্যদের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। (দুরর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটাত্মীয় অনুপস্থিত এবং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত রয়েছে, এক্ষেত্রে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ই নামাজ পড়াবে। অনুপস্থিত বলতে এতটুকু দূরত্বকে বুঝানো হয় যেখান থেকে আসার অপেক্ষায় থাকাটা ক্ষতিকর (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মহিলার কোন অলি না থাকলে স্বামী নামাজ পড়াবে। স্বামীও না থাকলে প্রতিবেশী পড়াবে। অনুরূপ পুরুষের ক্ষেত্রেও অলি না থাকলে প্রতিবেশী অন্যান্যদের উপর অগ্রাধিকার পাবে। (দুরর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্রীতদাস মারা গেল। তাহলে মৃত ব্যক্তির মুনিব ওর ছেলে ও পিতার উপর অগ্রাধিকার পাবে। যদিও বা দু'জনই স্বাধীন হোক না কেন। ক্রীতদাস যদি স্বাধীন হয় পিতা-পুত্র ও অন্যান্য উত্তরাধিকারী লোকেরা মুনিবের উপর অগ্রাধিকার পাবে। (দুরর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুকাতিব বা চুক্তিবদ্ধ গোলামের পুত্র বা গোলাম মারা গেল, তাহলে

মুকাতিব নামাজ পড়ানোর হকদার, তবে ওর মুনিব উপস্থিত থাকলে ইচ্ছা করলে মুনিবের দ্বারাও পড়ানো যাবে। মুকাতিব গোলাম যদি মারা যায় এবং এতটুকু পরিমাণ সম্পদ রেখে যায় যেটুকুতে বিনিময় চুক্তি পরিশোধ করা যাবে এবং সম্পদ যদি ওস্থানে উপস্থিত থাকে তাহলে ওর পুত্র নামাজ পড়াবে আর সম্পদ উপস্থিত না থাকলে মুনিব পড়াবে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ মহিলা ও ছোট ছেলে জানাযা পড়াবার অধিকার নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অলি, (মৃত ব্যক্তির গার্জিয়ান) এবং ইসলামী শাসকের এখতিয়ার আছে। অন্য কাউকে জানাযা নামাজ পড়াবার অনুমতি দিতে পারবে। (দুরর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় ও দূর সম্পর্কীয় উভয়ই উপস্থিত রয়েছে, তাহলে নিকট আত্মীয়ের এখতিয়ার আছে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো দ্বারা পড়ানো যাবে। তবে অলির দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কে নিষেধ করার এখতিয়ার নেই, নিকটাত্মীয় যদি অনুপস্থিত হয় এবং এতটুকু দূরত্বে থাকে যে ওর আগমনের অপেক্ষা করা যাবে না। তাহলে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো দ্বারা পড়াতে ইচ্ছা করলে দূর সম্পর্কীয় অলিকে নিষেধ করার এখতিয়ার আছে। মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় অলি উপস্থিত আছে, কিন্তু অসুস্থ, তাহলে যে কারো দ্বারা ইচ্ছা পড়ানো যাবে। দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কে নিষেধ করার এখতিয়ার নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্ত্রী মারা গেল, স্বামী এবং যুবক পুত্র রেখে গেল, তাহলে পুত্র হবে গার্জিয়ান, স্বামী নয়। অবশ্য যদি এ ছেলে উক্ত স্বামীর হয়ে থাকলে তাহলে পিতার অগ্রবর্তী হওয়া মাকরূহ। পিতার দ্বারা পড়ানো ওর উচিৎ হবে।

আর যদি ছেলে অন্য স্বামীর হলে তাহলে সৎ পিতার অগ্রবর্তী হওয়া যাবে এতে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি ছেলে বালেগ না হয়, তাহলে স্ত্রীর অন্য যেসব গার্জিয়ান রয়েছে ওদের হক, স্বামীর নয় (জাওহেরা, আলমগীরি)

মাসআলাঃ দু'জন বা কয়েক ব্যক্তি যদি একই স্তরের অলি বা গার্জিয়ান হয়, তাহলে যিনি অধিক বয়স্ক তিনি হকদার, তবে কারো জন্য এ অধিকার নেই যে, দ্বিতীয় অলী বা গার্জিয়ান ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা ওর অনুমতি ব্যতীত পড়াবে। যদি এরকম করে অর্থাৎ নিজে পড়ায়নি অন্য কাউকে পড়াবার অনুমতি দিয়ে দিল,

এমতাবস্থায় অন্য অলি বা গার্জিয়ানের নিষেধ করার অধিকার আছে। যদিও বা দ্বিতীয় অলি বয়সে ছোট হয়। আর যদি অলি একজনকে অনুমতি দিল, দ্বিতীয় অলি অন্যজনকে অনুমতি দিল, তাহলে বয়স্ক অলি যাকে অনুমতি দিয়েছে তিনি পড়ানো উত্তম। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তি ওসীয়ত করেছে যে, আমার নামাজ অমুক পড়াবে ব আমাকে অমুক ব্যক্তি গোসল দিবে এসব ওসীয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ ওসীয়ত দ্বারা অলি বা গার্জিয়ানের হক বাতিল হবে না। তবে অলির এখতিয়ার আছে যে, সে নিজে পড়াবে না। ওকে পড়াতে দিবে। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ অলি বা গার্জিয়ান ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নামাজ পড়াল, যিনি অলির উপর প্রাধান্য পাবার যোগ্য নয়,অলি ওকে অনুমতিও দেননি, তাহলে অলি নামাজে শরীক না হলে, নামাজ পুনরায় পড়া যাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে ফেলা হয় তাহলে কবরের উপর নামাজ পড়া যাবে। আর যদি অলির চেয়ে প্রাধান্য পাবার যোগ্য হয়, যেমন, শাসক, বিচারক, মহল্লাহর ইমাম তারা অলি থেকে উত্তম হলে অলি নামাজ পুনরায় পড়তে পারবে না। যদি একজন অলি বা গার্জিয়ান (পিতা বা পুত্র পর্যায়ক্রমে) নামাজ পড়ায়ে দিল, তাহলে অন্যান্য অলিগণ নামাজ পনুরায় পড়াতে পারবে না। সর্বাবস্থায় সে ব্যক্তি যিনি প্রথমে নামাজে শরীক ছিল না সে অলির সাথে পড়তে পারবে। আর যে প্রথমে শরীক ছিল সে অলির সাথে পড়তে পারবে না। জানাযা দু'বার পড়া জায়েয নেই। কেবলমাত্র অলি বা গার্জিয়ান ব্যতীত অন্য কেউ গার্জিয়ানের অনুমতি ব্যতীত পড়ালে দ্বিতীয়বার পড়া যাবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যেসব কারণে অন্যান্য নামাজ ভঙ্গ হয় ওসব কারণে জানাযার নামাজও ভঙ্গ হয়। তবে একটি বিষয় ব্যতীত যে, মহিলা পুরুষের সামনাসামনি হয়ে গেলে জানাযা নামাজ হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমাম মৃত ব্যক্তির সিনার সামনে দাড়ানো মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তির দূরে দাড়াবে না। মৃত পুরুষ বা মহিলা হোক, বালেগ হোক নাবালেগ হোক এটা সে সময় যখন একজন মৃত ব্যক্তির নামাজ পড়ানো হয়, আর যদি কয়েক জনের হয়, তাহলে একজনের সিনা বরাবর নিকটে দাড়াবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম পাঁচ তাকবীর বলবে, মুক্তাদিগণ পাঁচ তাকবীরে ইমামের

অনুকরণ করবে না। বরং চুপ করে দাড়ায়ে থাকবে। যখন ইমাম সালাম ফিরাবে ওর সাথে সালাম ফিরাবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ কয়েক তাকবীর বাদ পড়েছে অর্থাৎ এমন সময় আসলো যে সময় কয়েক তাকবীর হয়ে গেছে, তাহলে দ্রুত শামিল হবে না, যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন শরীক হবে, আর যদি অপেক্ষা করা না হয়, বরং দ্রুত শামিল হয়ে গেল, তাহলে ইমাম তাকবীর বলার পূর্বে যা আদায় করা হয়েছে তা গণ্য হবে না। ওস্থানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাকবীর তাহরীমার সময় ইমামের সাথে আল্লাহ্ আকবর বলেনি অলসতার কারণে দেরী করেছে অথবা নিয়তই না করে বসা ছিল, তাহলে এ ব্যক্তি ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। বরং দ্রুত শামিল হয়ে যাবে। (দুর্রুল মোখতার, গুনীয়া)

মাসআলাঃ মাসবুক অর্থাৎ যার তাকবীর সমূহ বাদ পড়েছে, সে বাকী তাকবীরগুলো ইমাম সালাম ফিরানোর পর বাদ পড়া তাকবীরগুলো বলে নিবে। আর যদি আশংকা হয় যে, দোয়া পড়তে গেলে দোয়া পূর্ণ করার আগে লোকেরা মুর্দাকে কাঁধে উঠায়ে নিবে, তাহলে কেবল তাকবীর বলে নিবে, দোয়া বাদ দিবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ লাহেক অর্থাৎ যিনি শুরুতে শামিল ছিল, কিন্তু কোন কারণে মাঝখানের কিছু তাকবীর বাদ পড়ে গেল যেমন প্রথম তাকবীর ইমামের সাথে বলেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তাকবীর বাদ পড়ে গেল, তাহলে ইমামের চতুর্থ তাকবীরের আগে বাদ পড়া তাকবীরগুলো বলে নিবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ চতুর্থ তাকবীর বলার পর যে ব্যক্তি আসলো, ইমাম তখনো সালাম ফিরায়নি, তাহলে জামাতে শামিল হয়ে যাবে এবং ইমাম সালাম ফিরানোর পর তিনবার আল্লাহ্ আকবর বলে নিবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ কয়েকটি জানাযা একত্রিত হল, একসাথে সবগুলো জানাযা পড়া যাবে। অর্থাৎ একই নামাজে সবার নিয়ত করে নিবে তবে সবগুলো পৃথক পৃথক করে পড়া উত্তম। যখন পৃথক করে পড়া হবে, তখন ওদের মধ্যে যিনি উত্তম ওর জানাযা প্রথমে পড়বে এরপর পর্যায়ক্রমে যিনি উত্তম ওর নামাজ পড়বে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ কয়েকটি জানাযা একসাথে পড়ালে সবগুলো আগে পিছে করে রাখার

এখতিয়ার আছে অর্থাৎ সবার সিনা ইমামের সামনে বা বরাবর করে রাখবে। অর্থাৎ একজনের পায়ের দিক বা মাথার দিকটা দ্বিতীয় জনের দিকে দ্বিতীয় জনের পায়ের দিক বা মাথার দিক তৃতীয়জনের দিকে করে রাখবে পর্যায়ক্রমে এ ভিত্তিতে যদি আগে পিছে রাখা হয়, জানাযার মধ্যে যিনি উত্তম ওর খাট ইমামের নিকটে রাখবে এরপর যিনি উত্তম। এভাবে পর্যায়ক্রমে, আর যদি মর্যাদার দিক দিয়ে সমান হয়, তাহলে যিনি বয়সের দিক দিয়ে বেশী ওকে ইমামের নিকটে রাখবে। এ নিয়ম তখন প্রযোজ্য হবে যখন সব ব্যক্তি যদি একই জাতীয় হয়, আর যদি বিভিন্ন জাতীয় হয়, তাহলে ইমামের নিকটে থাকবে পুরুষ। এরপর ছেলে এরপর খুনছা, অতঃপর মহিলা, এরপর মরাহিকা তথা প্রাপ্ত বয়স্কের দ্বারপ্রান্তের বালক অর্থাৎ নামাজে যেমন মুক্তাদিদের কাতারের তারতীব রয়েছে এখানে এর বিপরীত আর যদি স্বাধীন ও ক্রীতদাসের জানাযা হয়, তাহলে স্বাধীন ব্যক্তিকে ইমামের নিকটে রাখবে। যদিও বা নাবালেগ হয়, এপর ক্রতীদাসকে কোন প্রয়োজনে একই কবরে কয়েকজন মুর্দা দাফন করলে তাহলে তারতীবের বিপরীত করবে। অর্থাৎ যখন সবাই পুরুষ বা মহিলা হবে যিনি উত্তম ওকে ক্বিবলার দিকে রাখবে। অন্যথায় পুরুষকে কিবলার দিকে এরপর ছেলেকে অতঃপর খুনছা হিজড়া নপুংসক অতঃপর মহিলা তারপর প্রাপ্ত বয়স্কের দারপ্রান্তের লোক। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ একটি জানাযার নামাজ শুরু করলো ইতিমধ্যে দ্বিতীয় আর একটি আসলো তাহলে প্রথমটি আগে সম্পন্ন করবে। দ্বিতীয় তাকবীরে যদি উভয়টির নিয়ত করে নেয় তবুও প্রথমটিই হবে, আর যদি কেবল দ্বিতীয়টির নিয়ত করে তাহলে দ্বিতীয়টির হবে। দ্বিতীয়টি সমাপ্ত করে প্রথমটির পুনরায় পড়বে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ জানাযার নামাজে ইমাম অজুহীন হয়ে গেল, অন্য কাউকে স্বীয় খলীফা নিযুক্ত করল জায়েয হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে জানাযা নামাজ পড়া ব্যতীত দাফন করা হল, মাটিও চাপা দেয়া হল, তাহলে ওর কবরে নামাজ পড়া যাবে, যতক্ষণ ফেটে যাবার আশংকা না হয় এবং মাটিও চাপা দেয়া না হয় বের করে নেয়া যাবে। এবং নামাজ পড়ে দাফন করবে। কবরে নামাজ পড়ার ব্যাপারে দিনের সংখ্যা প্রসঙ্গে কোন নির্দিষ্ট বিধান নেই। কতদিন পর্যন্ত পড়া যাবে এটা নির্ভর করবে ঋতু, মাটি এবং মৃত ব্যক্তির

শরীরের অঙ্গ ও ব্যাধির বিভিন্নতার উপর। গ্রীষ্মকালে দ্রুত ফেটে যাবে। শীতকালে বিলম্বে ফাটবে। লবনাক্ত মাটিতে দ্রুত ফাটবে, শুকনো মাটিতে দেরীতে ফাটবে। মোটা শরীর দ্রুত ফাটবে, হালকা পাতলা শরীর দেরীতে ফাটবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কুপে পড়ে মারা গেল, অথবা কুপে ঘর পড়ে গেল। মৃত ব্যক্তিকে বের করা যাচ্ছে না, তাহলে ওস্থানে মৃতের নামাজ পড়বে। সাগরে ডুবে মারা গেল, বের করা যাচ্ছে না ওর নামাজ পড়া যাবে না। কারণ মৃত ব্যক্তি নামাজীর আগে হওয়ার বিষয়টি জানা নেই। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে কোন অবস্থায় মসজিদে জানাযা নামাজ মাকরূহ তাহরিমী, লাশ মসজিদের ভিতরে হোক বা বাইরে হোক সব নামাজী মসজিদের ভিতরে হোক বা কিছু হোক মসজিদের ভিতরে, এভাবে জানাযা নামাজ পড়ার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। (দুরুল মোখতার) জনগণের চলার পথে এবং অন্যের জমিনে জানাযা নামাজ পড়া নিষেধ। অর্থাৎ জমিনের মালিক যখন নিষেধ করে।

মাসআলাঃ জুমার দিন কেউ ইন্তেকাল করলে জুমার পূর্বে কাফন দাফন সেরে নিতে পারলে আগে করে নিবে।জুমার পর লোক জমায়েত বেশী হবে এ ধারণায় রেখে নেয়া মাকরূহ। (রদ্দুল মোখতার, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মাগরিবের নামাজের সময় জানাযা আসলো, তাহলে ফরজ ও সুন্নাত পড়ার পর জানাযা পড়বে। অনুরূপ অন্যান্য ফরজ নামাজের সময় জানাযা আসলে এবং নামাজের জামাত যদি প্রস্তুত থাকে ফরজ সুন্নাত পড়ার পর জানাযা নামাজ পড়বে তবে জানাযার নামাজে বিলম্বতার কারণে শরীর নষ্ট না হওয়া শর্ত। শরীর নষ্ট হওয়ার আশংকা হলে আগে পড়ে নিবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ঈদের নামাজের সময় জানাযা আসলো, তাহলে প্রথমে ঈদের নামাজ পড়ে নিবে অতঃপর জানাযা পড়বে। তারপর ঈদের খোৎবা পড়বে। আর যদি চন্দ্র গ্রহণ সূর্য গ্রহণের নামাজের সময় জানাযা হাজির হয়, প্রথমে গ্রহণের নামাজ পড়বে অতঃপর জানাযা পড়বে। (দুর্রুল মোখতার,জাওহেরা)

মাসআলাঃ মুসলমানের শিশু বা মুসলমান মহিলার শিশু জীবিত জন্মগ্রহণ করল, অর্থাৎ দেহের অধিকাংশ বের হওয়ার সময় জীবিত ছিল, তারপর মারা গেল, তাহলে ওকে গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং ওর জানাযা পড়বে। আর যদি মৃত জন্ম হয় কেবল গোসল করায়ে একটি কাপড়ে জড়ায়ে দাফন করবে। ওর জন্য

সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই। ওর নামাজও পড়তে হবে না। এমনকি মাথা যখন বের হয়েছিল সে সময় চিৎকার করেছিল, কিন্তু অধিকাংশ বের হওয়ার পূর্বে মারা গেল, তাহলে নামাজ পড়বে না। অধিকাংশের পরিমাণ হলো এইযে, মাথার দিক থেকে হলে সিনা পর্যন্ত অধিকাংশে গণ্য করা হবে পায়ের দিক থেকে হলে কোমর পর্যন্ত গণ্য হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ শিশুর মাতা বা ধাত্রী জীবিত হওয়ার স্বাক্ষী দিল, তাহলে ওর জনাযা পড়া যাবে। কিন্তু ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে ওদের স্বাক্ষী বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ শিশুকে ওর মৃত পিতার ওয়ারিশ গণ্য করা হবে না। মাতাও শিশুর ওয়ারিশ হবে না এটা ওসময় প্রযোজ্য যখন শিশু স্বয়ং বেরিয়ে আসে এবং কেউ গর্ভবতীর পেটে আঘাত করল, শিশু মৃত অবস্থায় বের হল, তখন ওয়ারিশ হবে এবং ওয়ারিশ গণ্য করবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ শিশু জীবিত জন্ম হোক বা মৃত জন্ম হোক, গঠন পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ, সর্বাবস্থায় ওর নাম রাখতে হবে। কিয়ামতের দিবসে ওর হাশর হবে। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কাফিরের শিশুকে দারুল হারবে স্বীয় পিতা মাতার সাথে বা পরে বন্দী করা হল, অতঃপর মারা গেল ওর মাতা পিতার কেউ এখনো মুসলমান হয়নি তাহলে ওকে গোসল দিবে না। কাফনও দিবে না, দারুল হারবে মৃত্যু বরণ করুক বা দারুল ইসলামে মৃত্যুবরণ করুক দারুল ইসলামে যদি ওকে একা নিয়ে আসা হয় অর্থাৎ ওর মাতা পিতার কাউকে বন্দী করে নেয়া হয় সে নিজেও শিশুকে নেয়ার পূর্বে জিম্মী হয়ে আসে তাহলে শিশুকে গোসল ও কাফন দেয়া হবে এবং ওর নামাজ পড়া যাবে, যদি সে বিবেকবান হওয়ার পর কুফরী না করে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কাফেরের শিশুকে বন্দী করা হল, এখনো সে দারুল হারবে ছিল ওর পিতা দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রে এসে মুসলমান হল, তাহলে শিশুকে ও মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে। যদিও বা দারুল হারবে মারা যায়, তবুও ওকে গোসল ও কাফন দেয়া যাবে ওর নামাজ পড়া যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কাফেরের শিশুকে পিতা মাতার সাথে বন্দী করা হল, কিন্তু এরা উভয়ই দারুল হারবে মারা গেল, তাহলে ওদেরকে মুসলমান মনে করতে হবে।

পাগল বা বালেগকে বন্দী করা হল, ওদের হুকুমও শিশুর অনুরূপ। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ বিধর্মী মহিলা থেকে মুসলমানের শিশু জন্ম হলো এবং সে ওর বিবাহিত ছিল না শিশুটা ব্যাভিচারের জন্ম অবৈধ, ওর নামাজ পড়া যাবে। (রদ্দুল মোখতার)

কবর ও দাফনের বর্ণনা

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরজে কেফায়া, মৃত ব্যক্তিকে মাটির উপর রেখে চারদিকে দেওয়াল উঠায়ে বন্ধ করে দেয়া জায়েয নেই। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে স্থানে ইন্তেকাল করেছে সেস্থানে দাফন করবে না। এটা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এর বিশেষত্ব। বরং মুসলমানদের করবরস্থানে দাফন করবে। উদ্দেশ্য হল এটা যে, ওর জন্য যেন বিশেষ দাফন স্থান নির্মাণ করা না হয় মৃত ব্যক্তি বালেগ বা নাবালেগ হোক। (দর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কবরের দৈর্ঘ্য মৃত ব্যক্তির দেহের সমান হতে হবে। প্রস্থে অর্ধ দেহ পরিমাণ হতে হবে এবং গভীরতায় কমপক্ষে অর্ধদেহ পরিমাণ হতে হবে। দেহ পরিমাণ গভীরতা হওয়াটা উত্তম। সিনা বরাবর হওয়াটা মধ্যম পর্যায়ের (রদ্দুল মোখতার) এ গভীরতা বলতে লাহাদ বা সিন্ধুকের গভীরতা বুঝতে হবে। এমন নয় যে, যেখান থেকে খনন শুরু হয়েছে ওখান থেকে শেষ পরিমাণ পর্যন্ত গণ্য করা হবে।

মাসআলাঃ কবর দু'প্রকার, এক প্রকার লাহদ (বোগলী) যা কবরের ভিতর অংশ কিবলার দিকে লাশ রাখার জন্য খনন করা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সিন্ধুক কবর যেটা হিন্দুস্থানে সাধারণতঃ প্রচলিত, লাহদ কবর সুন্নাত। মাটি লাহাদ কবরের উপযোগী হলে লাহদ কবর খনন করবে। জমিন নরম হলে সিন্ধুক আকৃতিতে খনন করলে ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কবরে ছাটাই মাদুর ইত্যাদি বিছানো নাজায়েয। কারণ এটা অনর্থক সম্পদের অপচয়। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে শববাহী খাটে বা কোন কাঠ ইত্যাদির সিন্ধুকে রেখে দাফন করা মাকরূহ। কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে যেমন মাটি অধিক নরম হলে তখন ক্ষতি নেই এ সময় শববাহী খাটের খরচ মৃত্য ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ থেকে বহন করতে হবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ শববাহী খাটে রেখে দাফন করলে সুন্নাত হলো এই যে, এর মধ্যে মাটি বিছায়ে দিবে এবং ডানে বামে কাঁচা ইট লাগাবে। উপরে সিমেন্ট ও বালুর মিশ্রনে পোক্তা করে দিবে। ভিতর অংশে যেন লাহাদ কবরের মত হয়, লোহার সিন্ধুক মাকরূহ তবে কবরের মটি নরম হলে ধুলোবালি বা ছাই বিছায়ে দেয়া সুন্নাত। (ছগিরী, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কবরের যে অংশ মৃত ব্যক্তির শরীরের নিকটতর সেখানে পাকা ইট ব্যবহার করা মাকরূহ। ইট আগুন দ্বারা পাকা করা হয়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে আগুনের প্রভাব থেকে রক্ষা করুক। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ কবরে অবতরণের জন্য দুই তিনজন যতজন প্রয়োজন হয় অবতরণ করা যাবে, কোন সংখ্যা এতে নির্দিষ্ট নেই। তবে অবতরণকারী লোক শক্তিশালী, নেক্কার ও আমানতদার হওয়া বাঞ্ছনীয়, অসংগত কিছু দেখলে যেন লোকদের কাছে প্রকাশ না করে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কবরে লাশ কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব। কিবলার দিক থেকে লাশ কবরে নামাবে। এ রকম নয় যে, কবরের পায়ের দিকে রাখলো এবং মাথার দিক থেকে কবরে নামানো হলো। (দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মহিলার লাশ অবতরণকারীগণ মহিলার মুহরিম হতে হবে। কোন মুহরিম না থাকলে অন্য আত্মীয়গণ নামাবে। এরাও না থাকলে অপরিচিত বা পরহেজগার লোকেরা নামলেও কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াবিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি।

অপর এক বর্ণনায় بِسْمِ اللّٰهِ এরপর وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এর বর্ণনাও এসেছে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান পাশ করে শোয়াবে এবং মুখ কিবলার দিকে করে রাখবে, মুখ কিবলার দিকে করার কথা ভুলে গেল। তক্তা লাগানোর পর স্মরণ হলো, তক্তা সরায়ে কিবলামুখী করে দিবে আর যদি মাটি দেয়ার পর স্মরন হয় তখন আর করা যাবে না। অনুরূপ যদি বাম পাশ করে রাখা হয়, অথবা যেদিকে

মাথা রাখা উচিৎ ছিল সেদিকে পা রাখা হয়েছে। তাহলে মাটি দেয়ার আগে স্মরণ হলে ঠিক করে দিবে অন্যথায় নয়। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কবরে রাখার পর কাফনের বাধন খুলে দিবে এখন আর প্রয়োজন নেই। তবে বাধন না খুললেও ক্ষতি নেই। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ লাশ লাহদে রাখার পর কাঁচা ইটের দ্বারা বন্ধ করে দিবে। মাটি যদি নরম হয় তক্তা ব্যবহার করাও জায়েয। তক্তা সমূহের মাঝখানে ফাঁক রয়ে গেলে ঢিল ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ করে দিবে। সিন্ধুক কবরের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মহিলার লাশ হলে কবরে অবতরণ করা থেকে তক্তা লাগানো পর্যন্ত কবরকে কাপড় ইত্যাদি দ্বারা পর্দা করে রাখবে। কিন্তু পুরুষের লাশ দাফন করার সময় পর্দা করতে হবে না। অবশ্য বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে কোন অসুবিধা হলে ঢেকে রাখা জায়েয। মহিলার লাশও ঢেকে রাখবে। (জাওহেরা, দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ তক্তা ফিট করার পর মাটি ফেলবে। মুস্তাহাব হচ্ছে মাথার দিকে উভয় হাতে তিনবার মাটি ফেলবে। প্রথমবার مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ দ্বিতীয়বার وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ তৃতীয়বার وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى বলবে। অথবা প্রথমবার اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ দ্বিতীয়বার اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ তৃতীয়বার اَللّٰهُمَّ زَوِّجْهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ বলবে।

মৃত যদি মহিলা হয় তৃতীয়বার এরূপ বলবেঃ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

অবশিষ্ট মাটিগুলো হাত অথবা টুকরী ইত্যাদি যেটার দ্বারা সম্ভব কবরে ঢেলে দিবে। তবে কবর থেকে যতটুকু মাটি বের করা হয়েছে এর অধিক কবরে ফেলা মাকরূহ। (জাওহেরা, আলমগীরি)

মাসআলাঃ হাতে যে মাটি লেগেছে সেটা ঝেড়ে ফেলা বা ধুয়ে ফেলার এখতিয়ার রয়েছে।

মাসআলাঃ কবরকে সমতল করবে না বরং ঢালু করবে। উটের পিটের মত ঢালু রাখবে এতে পানি ছিটকাতে অসুবিধা নেই বরং ভাল। কবর এক বিঘত বা এর থেকে সামান্য উচ্চ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কেউ জাহাজে ইন্তেকাল করল, সমুদ্রের তীরও নিকটে নয়, তখন গোসল কাফন দিয়ে নামাজ পড়ে সমুদ্রে ডুবায়ে দিবে। (গুনীয়া, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ওলামায়ে কেরাম ও সৈয়দ বংশীয় লোকদের কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণে কোন ক্ষতি নেই। তবে কবরকে যেন পাকা করা না হয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার) অর্থাৎ ভিতরে পাকা করা যাবে না। তবে ভিতরে কাঁচা ও উপরে পাকা হলে ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ প্রয়োজন হলে কবরের উপর নিদর্শনের জন্য কিছু লিখা যাবে। তবে এমন স্থানে লিখবে না যেস্থানে বেআদবী হবে নেককার বান্দাদের কবর রয়েছে এমন কবরস্থানে দাফন করা উত্তম। (জাওহেরা, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুস্তাহাব হলো দাফনের পর কবরের পার্শ্বে সুরা বাকারার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। মাথার দিক الم থেকে مفلحون পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে آمن الرسول থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়বে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ দাফনের পর কবরের পার্শ্বে ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করা মুস্তাহাব একটি উট জবেহ করার পর মাংস বন্টন করা পর্যন্ত যতক্ষণ সময় লাগে। এরা অবস্থান করলে মৃত ব্যক্তি শান্তি পাবে। এবং মুনকির নকীরের উত্তর দানে ভয় হবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত, মৃতের জন্য দোয়া এস্তেগফার করবে এবং মুনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তর দানে অটল অবিচল থাকার জন্যও দোয়া করবে। (জাওহেরা, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ অপ্রয়োজনে এক কবরে একজনের অধিক দাফন করা জায়েয নেই। প্রয়োজন হলে করতে পারে। কিন্তু দুই মৃত ব্যক্তির মাঝখানে মাটি ইত্যাদি দ্বারা আড়াল করে দিবে। কাকে আগে দেয়া হবে কাকে পিছনে দেয়া হবে, তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে শহরে বা গ্রামে বা অন্য কোথাও ইন্তেকাল করেছে তাহলে ওখানকার কবরস্থানে দাফন করা মুস্তাহাব। যদিওবা ওখানে বসবাস করে না। বরং যে বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছে সে বাড়ী ওয়ালার কবরস্থানে দাফন করবে। দু'এক মাইল বাহিরে নিতে হলে কোন অসুবিধা নেই। শহরের কবরস্থান অধিকাংশ এতটুকু দূরত্বে হয়ে থাকে। অন্য শহরে যদি লাশ উঠায়ে নেয়া হয় এ ব্যাপারে

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম নিষেধ করেছেন। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা হচ্ছে দাফনের পূর্বে নিতে চাইলে, দাফনের পর তো মোটেই স্থানান্তর করা যাবে না। সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কতিপয় অবস্থা ব্যতীত যা বর্ণনা করা হবে। (আলমগীরি)

আর কতেক লোকের যে নিয়ম যে, মাটিতে সোপর্দ করার পর পুনরায় ওখান থেকে বের করে অন্যত্র দাফন করে থাকে, এটা নাজায়েয। এবং রাফেজী সম্প্রদায়ের তরীকা।

মাসআলাঃ অন্য লোকের জমিনে মালিকের অনুমতি ব্যতীত দাফন করে দিল, তখন মালিকের এখতিয়ার থাকবে, সে মৃতের গার্জিয়ানকে বলতে পারবে যে, তোমার মুর্দা বের করে নাও, অথবা মালিক জমিন সমান করে এর মধ্যে ক্ষেত করতে পারবে। আর যদি জমিন শোফায় বন্টনের ভিত্তিতে নিল। অথবা ছিনতাইকৃত কাপড় দিয়ে মুর্দাকে কাফন দিল এমতাবস্থায় মালিক মুর্দাকে বের করে নিতে পারবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ওয়াকফকৃত কবরস্থানে কেউ কবর প্রস্তুত করাল, এতে অন্যজন মুর্দা দাফন রকতে ইচ্ছা করল কবরস্থানে জায়গা আছে এমতাবস্থায় মাকরূহ, আর যদি দাফন করে ফেলে, মুর্দাকে বের করে দিতে পারবে না। যা খরচ হয়েছে তা নিয়ে নিবে। (আলমগীরি. দররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন ওয়ারিশ মহিলাকে অলংকার সহ দাফন করে দিল, কতেক ওয়ারিশ উপস্থিত ছিল না, অনুপস্থিত ওয়ারিশগণ কবর খনন করার অনুমতি দিয়েছে কারো কিছু সম্পদ মাল , কবরে পড়ে গেল, মাটি চাপা দেয়ার পর স্মরণ হল, তাহলে কবর খনন করে বের করে নিতে পারবে। যদিও তা এক দিরহাম পরিমাণের হোক। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নিজের জন্য কাফন প্রস্তুত করে রাখলে কোন ক্ষতি নেই, তবে কবর খনন করে রাখা অনর্থক। সেকি জানে? কোথায় মারা যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কবরের উপর বসা শোয়া চলা পায়খানা প্রস্রাব করা হারাম। কবরস্থানের উপর দিয়ে নতুন রাস্তা নিমাণ করা হলে সেটা দিয়ে চলাফেরা নাজায়েয। নতুন রাস্তা হওয়াটা ওর জানা থাকুক বা ধারণা হোক। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ নিজের কোন আত্মীয়ের কবরের নিকট যেতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু অন্যদের কবরের উপর দিয়ে যেতে হবে। তাহলে ওখান পর্যন্ত যাওয়া নিষেধ। দূর

থেকে ফাতেহা পড়ে যিয়ারত করবে। কবরস্থানে জুতা পরিধান করে যাবে না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এক ব্যক্তিকে জুতা পরিহিত দেখে এরশাদ করেছিলেন, জুতা খুলে ফেল, তুমি কবরবাসীকে কষ্ট দিবে না। ওরাও যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়।

মাসআলাঃ কবর পাড়ে কুরআন মজীদ পড়ার জন্য হাফেজ নিযুক্ত করা জায়েয। (দুররুল মোখতার) অর্থাৎ পাঠকারী যখন কুরআন পড়ার বিনিময় না নিবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন মজীদ পড়া এবং পড়ানো নাজায়েয। যদি বিনিময়ে পড়াতে চায় তাহলে নিজের কাজের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করে এ কাজ আদায় করে নিবে (তবে পরবর্তী ওলামাগণ পুণ্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন) - অনুবাদক)

মাসআলাঃ শাজরা অথবা আহাদ নামা কবরে রাখা জায়েয। উত্তম হলো যে, মৈয়্যতের মুখের সামনে কিবলার দিকে তাক খনন করে এর মধ্যে রাখবে। দুররুল মোখতার গ্রন্থে কাফনের উপর আহাদ নামা লিখা জায়েয বলেছেন। আরো উল্লেখ করা হয়েছে এর দ্বারা মাগফেরাতের আশা করা যায়। মৈয়্যতের সিনা ও কপালের উপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা জায়েয। এক ব্যক্তি অসিয়ত করেছিলেন, যেন তার বুকে ও কপালে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখে দেয়া হয়, ইন্তেকালের পর ওর বুকে ও কপালে বিসমিল্লাহ্ শরীফ লিখা হয়েছিল। কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলেন, কি অবস্থায় আছে জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে বললেন, যখন আমাকে কবরে রাখা হয় আযাবের ফিরিস্তারা এসেছিল, যখন কপালের উপর বিসমিল্লাহ শরীফ লিখা দেখেছে বললেন, তুমি আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে গেছ। (দুররুল মোখতার, গুনীয়া, তাতারখানিয়া)

এটাও করা যায় যে, কপালের উপর বিসমিল্লাহ্ শরীফ লিখবে বুকের উপরে কলেমা তৈয়্যব لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লিখবে। কিন্তু গোসল করানোর পর কাফন পরিধানের পূর্বে আঙ্গুল দিয়ে লিখবে কালি দিয়ে লিখবে না। (রদ্দুল মোখতার)

কবর যিয়ারতের বর্ণনা

মাসআলাঃ কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব, প্রতি সপ্তাহে একদিন যিয়ারত করবে শুক্র বৃহস্পতি, শনি ও সোমবার যিয়ারত করা উচিৎ। সবচেয়ে উত্তম হলো জুমার দিন সকাল বেলা যিয়ারত করা।

আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র মাজার সমূহে সফর করে যাওয়া জায়েয। ওরা যিয়ারতকারীদের উপকার সাধন করেন। আর ওখানে যদি শরীয়ত গর্হিত কাজ হয়েও থাকে। যেমন মহিলাদের সমাগম, এসব কারণে যিয়ারত বর্জন করা যাবে না। এসব কথাবার্তা ও কাজের দরুন পূণ্য কাজ বাদ দেয়া যায় না। বরং ওসব কাজ কে মন্দ জানবে। সম্ভব হলে গর্হিত কাজ, শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড দূরীভূত করবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কতেক ওলামাগণ মহিলাদের জন্যও কবর যিয়ারতকে জায়েয বলেছেন। (দুররুল মোখতার প্রণেতা এ উক্তিটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রিয়জনদের কবরে গেলে এরা ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে এ কারণে ওদের জন্য কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ। বুজুর্গানে দ্বীনের কবরে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ মহিলাগণ গমন করলে ক্ষতি নেই। যুবতী মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ। সর্বসম্মত কথা হলো মহিলাদের জন্য সাধারণভাবে নিষেধ। ওরা তো আপনজনদের কবর যিয়ারতে ধৈর্যহীন ও অস্থির হয়ে যায়, আর বুজুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারতে সীমা অতিক্রম করে বসে বা বেআদবী প্রকাশ পায়। মহিলাদের মধ্যে এ দু'টি বিষয় অধিকহারে পাওয়া যায়। (ফতোয়ায়ে রিজভীয়্যাহ)

মাসআলাঃ কবর যিয়ারতে নিয়মহলো, পায়ের দিক থেকে গিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে দাঁড়াবে। মাথার দিক থেকে আসবে না। এটা মৃত ব্যক্তির জন্য কষ্টের কারণ হয়। অর্থাৎ মৃতকে আগমনকারী কে। তা গর্দান ফিরায়ে দেখতে হয়। এ দোয়াটি পড়বেঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ اَدْخِلْ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مِنْكَ رَوْحًا وَّرَيْحَانًا وَّمِنَّا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا.

উচ্চারণঃ আস্সালামু আলাইকুম আহ্লা দারে কাওমীন মুমিনীনা আনতুম লানা সালাফুন ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহ্ বিকুম লাহেকুন নাস্আলুল্লাহ্ লানা ওয়ালাকুমুল আফ্ওয়া ওয়াল আফিয়াতা ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদেমীনা মিন্না ওয়াল মোসতাখেরীনা আল্লাহুম্মা রাব্বাল আরওয়াহিল ফানিয়াতি ওয়াল আযছাদিল বালিয়াতি, ওয়াল এজামিন্নাখিরাতি আদ্খিল হাযিহিল কুবুরা মিনকা রওহান ওয়া

রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ওয়ামিন্না তাহিয়্যাতাও ওয়া সালামা।

অতঃপর সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। বসার ইচ্ছা হলে এতটুকু দূরত্বে বসবে যতটুকু দূরত্বে ওনার জীবদ্দশায় ওনার পাশে বসা হতো। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ কবরস্থানে গেলে আলহামদু শরীফ এবং الم থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত আয়াতুল কুরসী اٰمَنَ الرَّسُوْلُ সূরার শেষ পর্যন্ত সূরা ইয়াসীন, تَبَارَكَ الَّذِىْ এবং সূরা তাকাছুর একবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা এখলাস এক বার অথবা এগার অথবা সাত বা তিনবার পাঠ করবে। এবং এ সবের ছওয়াব মৃতদের রূহে পৌঁছাবে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে যে, এগারবার সূরা এখলাস পড়ে মৃতদেরকে ছওয়াব পৌঁছাবে। তাহলে সে মৃতদের সংখ্যা বরাবর ছওয়াব অর্জন করবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ নামাজ রোজা হজ্ব জাকাত এবং সব রকমের ইবাদত এবং সব ধরনের নেক আমল ফরজ ও নফলের ছওয়াব মৃতদেরকে পৌঁছানো যায়। ওদের সবার কাছে পৌঁছবে বরং প্রেরণকারীদের ছওয়াবের মধ্যে বিন্দুমাত্র কমতি হবে না। বরং আল্লাহর রহমতে আশা করা যায় যে, সবার পূর্ণ ছওয়াব হাসিল হবে এরকম নয় যে, সে ছওয়াব বন্টিত হয়ে অংশে অংশে লাভ করবে। (রদ্দুল মোখতার) বরং আশা করা যায় যে, সেই ছওয়াব প্রেরণকারীগণ কবরে শায়িত মৃতদের প্রাপ্ত ছওয়াবের সমষ্টি বরাবর ছওয়াব পাবে। যেমন কেউ কোন সৎকাজ করলো, যার ছওয়াব কমপক্ষে দশ সেই দশজন মৃতদের নিকট পৌঁছাল তাহলে প্রত্যেকে দশদশ লাভ করবে এবং ছওয়াব প্রেরণকারী একশ দশ ছওয়াব লাভ করবে। এক হাজার মৃতকে পৌঁছালে দশ হাজার ছওয়াব লাভ করবে। এ নিয়মানুসারে যত অধিক পৌঁছাবে ততোধিক লাভ করবে। (ফতওয়ায়ে রিজভীয়্যাহ)

মাসআলাঃ নাবালেগ কিছু পড়ে বা কোন নেক আমল করে এর ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছালে ইনশাআল্লাহ পৌঁছবে। (ফতওয়ায়ে রিজভীয়্যাহ)

মাসআলাঃ কবর চুমু দেয়া কতেক ওলামাগণ জায়েয বলেছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ মতে নিষেধ। (আশআতুল্লোমআত) এবং কবরে তাজিমী তাওয়াফ নিষেধ। বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে মাজারের পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু সাধারণ জনগণকে নিষেধ করা চায়। বরং জনসাধারণের সামনে করবেও না। কারণ এতে ওরা কিছু না কিছু ধারণা করবে।

দাফনের পর তলকীনের বর্ণনা

মাসআলাঃ দাফনের পর মুর্দাকে তালকীন করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে শরীয়ত সম্মত। (জাওহেরা) অধিকাংশ কিতাবে তালকীন না করার ব্যাপারে যা উল্লেখ রয়েছে এটা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মযহাব। ওরা আমাদের কিতাব সমূহে এটা অতিরিক্ত সংযোজন করে দিয়েছে, হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যখন তোমাদের কোন মুসলমান ভাই মৃত্যুবরণ করবে এবং ওকে যখন মাটি দিয়ে দিবে। তখন তোমাদের মধ্যে একজন কবরের পার্শ্বে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَة বলবে। শুনবে না এবং জওয়াব দিবে না অতঃপর বলবে يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَة তখন ওরা সোজা হয়ে বসবে অতঃপর বলবে يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَة ওরা বলতে থাকবে আমাদেরকে বলুন আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু ওদের বলাটা তোমরা জানতে পারবে না। অতঃপর তোমরা বলবে,

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا.

উচ্চারণঃ উযকুর মা খারায়তা মিনাদ্দুনিয়া শাহাদাতা আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা রাযিতা বিল্লাহি রাব্বান, ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনান ওয়াবিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা নবীয়্যান ওয়াবিল কুরআনি ইমামান।

এ দোয়া শিখায়ে দেয়ার পর মুনকির নকীর একে অপরকে হাত ধরে বলবে চলো, আমরা ওর পার্শ্বে কিভাবে বসবো? যাকে লোকেরা ওর প্রমাণ শিখায়ে দিচ্ছে এ বিষয়ে কেউ রাসূলুল্লাহর নিকট প্রশ্ন করলেন, যদি ওর মাতা পিতার নাম জানা না থাকে কি করবে? হুজুর এরশাদ করেন হযরত হাওয়া (আঃ) এর দিকে সম্পর্ক করবে। (তবরানী কবীর গ্রন্থে যিয়ারত আহকামে বর্ণনা করেছেন) কোন কোন শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও তাবেয়ীনগণ এরশাদ করেন, যখন কবরের উপর মাটি সমান করা হবে এবং লোকেরা যখন ফিরে যাবে তখন মুস্তাহাব হলো, মৃতের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে। يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তিনবার বলবে। অতঃপর বলবে,

قُلْ رَبِّیَ اللّٰهُ وَدِیْنِی الْإِسْلَامُ وَنَبِیِّ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) আরো একটু বৃদ্ধি করেছেনঃ

وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَیْنِ الَّذِیْنَ اَتَیَاكَ اَوْ یَاْتِیَانِكَ اِنَّمَا عَبْدَانِ اللّٰهِ لَا یَضُرَّانِ وَلَا یَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَاَشْهَدُ اَنَّ رَبَّكَ اللّٰهُ وَدِیْنَكَ الْاِسْلَامُ وَنَبِیَّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَاِیَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

উচ্চারণঃ ওয়ালাম আন্না হাযাইনে আল্লাযাইনে আতায়াকা আও ইয়াতিয়ানিকা ইন্নামা আবদানেল্লাহি লা ইয়াদুররানি ওয়ালা ইয়ানফাআনি ইল্লা বেইযনিল্লাহি ফালা তাখাফ ওয়ালা তাহযান ওয়াশহাদু আন্না রাব্বাকা আল্লাহু ওয়াদ্বীনকা আল ইসলামু ওয়া নবীয়্যাকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাব্বাতানাল্লাহু ওয়াইয়্যাকা বিল কাউলিস সাবিতি ফিল হায়াতিদ্দুনিয়া ওয়াবিল আখিরাতি ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহীম।

মাসআলাঃ কবরে ফুল দেয়া উত্তম। যতক্ষণ ফুল তাজা থাকবে ততক্ষণ তাসবীহ পাঠ করবে। এবং মৃতের আত্মা শান্তি পাবে। (রদ্দুল মোখতার) অনুরূপ জানাযায় খাটের ফুলের চাদর দিলে ক্ষতি নেই।

মাসআলাঃ কবর থেকে তাজা ঘাস উঠিয়ে ফেলা অনুচিত। কারণ ঘাসের তাসবীহ পাঠে রহমত অবতীর্ণ হয় এবং মৃত ব্যক্তির আরাম বোধ হয় আর ঘাস উঠিয়ে ফেললে মৃতের হক বিনষ্ট করা হয়। (রদ্দুল মোখতার)

শোক প্রকাশের বর্ণনা

মাসআলাঃ শোক প্রকাশ করা সুন্নাত। হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের বিপদে শোক প্রকাশ করে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্ তাআলা ওকে সম্মানের স্যুট পরিধান করাবেন ইবনে মাযাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী ও ইবনে মাযার অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সমবেদনা জ্ঞান করবে সে মুসবীতগ্রস্ত ব্যক্তির সমান ছওয়াব অর্জন করবে।

মাসআলাঃ শোক প্রকাশের সময় হচ্ছে মৃত্যুর পর থেকে তিনদিন পর্যন্ত এরপর মাকরূহ। এতে দুঃখবেদনা সতেজ হয়, কিন্তু শোক প্রকাশকারী বা যার শোক প্রকাশ করা হবে তিনি যদি উপস্থিত না থাকে, বা তথায় উপস্থিত আছে কিন্তু সে জানতো না, তাহলে পরে প্রকাশ করলে ক্ষতি নেই। (জাওহেরা, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ দাফনের আগেও শোক প্রকাশ জায়েয। কিন্তু দাফনের পরে করা

উত্তম। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন যদি অস্থির ও অধৈর্য হয়ে কান্নাকাটি করে তাহলে ওদের শান্তনার জন্য দাফনের আগেও করা যায়। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ মুস্তাহাব হলো, মৃত ব্যক্তির সকল নিকটাত্মীয় শোক প্রকাশ করবে। ছোট বড় পুরুষ মহিলা সকলে শোক প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু মহিলার জন্য ওর মুহরিমই শোক প্রকাশ করবে। শোক প্রকাশের সময় এরূপ বলবে আল্লাহ তাআলা মরহুমকে ক্ষমা করুক ওকে স্বীয় রহমতের মধ্যে আবৃত করুক, এবং তোমাদেরকে ধৈর্য দান করুক এবং বিপদের জন্য ছওয়াব দান করুক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লা নিম্নোক্ত শব্দ সমূহ দ্বারা শোক প্রকাশ করতেন।

لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَاَعْطٰی وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی

অর্থাৎ আল্লাহর জন্যই যেটা তিনি নিয়েছেন বা দিয়েছেন, তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ বিপদের সময় ধৈর্য যে ধারণ করে সে দু'টি ছওয়াব লাভ করে, একটি মুসীবতের দ্বিতীয়টি ধৈর্য অবলম্বনের, কান্নাকাটি করার দ্বারা উভয়টি বাদ পড়ে যায়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির ভাই বন্ধু আত্মীয়-স্বজন ঘরে বসা থাকবে, যেন লোকেরা ওদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য আসে এতে ক্ষতি নেই। ঘরের দরজায় বা জনসাধারণের চলাচলের পথে বিছানা বিছায়ে বসাটা মন্দ কাজ। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক সেই দিন ও রাতে মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার আনা উত্তম এবং ওদেরকে জোরপূর্বক খাওয়াবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির পরিবার কর্তৃক মৃত পরবর্তী কুলখানি চেহলাম ইত্যাদিতে লোকজন দাওয়াত করা নাজায়েয এবং খুবই মন্দ বিদআত। দাওয়াত তো খুশীর সময় শরীয়ত সম্মত। দুঃখ মুসীবতের সময় নয়। আর যদি ফকীর মিসকীনদের খাওয়ানো হয় তাহলে উত্তম। (ফতহুল কদীর)

মাসআলাঃ যেসব লোকজন দ্বারা কুরআন মজীদ বা কলেমা তৈয়্যেব পড়ানো হয়েছে, ওদের জন্য খানা তৈরী করা নাজায়েয। (রদ্দুল মোখতার) অর্থাৎ এরা যদি

জানাশুনা লোক হয় অথবা ওরা যদি সম্পদশালী হয়।

মাসআলাঃ কুলখানি ইত্যাদির খাবার পরিবেশন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে করে থাকে এতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, কোন নাবালেগ ওয়ারিশ যেন না থাকে, অন্যথায় কঠোর হারাম, অনুরূপ কিছু ওয়ারিশ উপস্থিত না থাকরণ তখনও নাজায়েয, যদি অনুপস্থিত ওয়ারিশদের থেকে অনুমতি নেয়া না হয়, আর যদি সবাই বালেগ হয় বা সবার অনুমতি সাপেক্ষে হয় বা কয়েকজন নাবালেগ বা অনুপস্থিত থাকে তাহলে উপস্থিত প্রাপ্ত বয়স্ক স্বীয় অংশ থেকে কুলখানি, ফাতেহা ইত্যাদি আয়োজন করলে ক্ষতি নেই। (খানিয়া ইত্যাদি)

মাসআলাঃ শোক প্রকাশের জন্য অধিকহারে মহিলা আত্মীয়-স্বজন একত্রিত হয় এবং অধিক আওয়াজ করে কান্নাকাটি করে ওদেরকে খাবার দিবে না। যেন গুনাহর কাজে সহায়তা না হয়। (কাশফুল গেতা)

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য যে খাবার পাঠানো হয় সে খাবার কেবল পরিবারের লোকজনই খাবে। ওদের প্রয়োজনাতিরিক্ত পাঠানো অনুচিত, অন্যান্যদের সে খাবার খাওয়া নিষেধ। (কাশফুল গেতা) কেবল প্রথম দিন খাবার পাঠানো সুন্নাত এরপর মাকরূহ। (আলমগীরি,)

মাসআলাঃ কবরস্থানে শোক প্রকাশ করা বিদআত (রদ্দুল মোখতার) দাফনের পর মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে আসা এবং শোক প্রকাশ করে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যাওয়াটা যদি তাৎক্ষণিক হয় ক্ষতি নেই। তবে এ ধরনের প্রথা চালু করা অনুচিত। মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে শোক প্রকাশের জন্য লোকজন সমাবেশ করা দাফনের পূর্বে হোক বা পরে সে সময়ে হোক বা অন্য সময়ে হোক তা খেলাফে আউলা, করলেও কোন গুনাহ হবে না।

মাসআলাঃ যে একবার শোক প্রকাশ করে এসেছে সে দ্বিতীয়বার শোক প্রকাশের জন্য গমন করাটা মাকরূহ। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ শোকের সময় কালো কাপড় পরিধান করা পুরুষদের জন্য নাজায়েয। (আলমগীরি) অনুরূপ কালো বেল্ট লাগানো নাজায়েয। এতে খৃষ্টানদের সাদৃশ্যতা রয়েছে।

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন তিনদিন পর্যন্ত এজন্য বসা থাকে যে, লোকজন আসবে এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করবে তা জায়েয। কিন্তু বর্জন করা

উত্তম। আর এটা তখনই হবে যদি বিছানা অন্যান্য ভূষণও সাজ সজ্জা না হয়। অন্যথায় নাজায়েয। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

বিলাপ ও ক্রন্দন করার বর্ণনা

মাসআলাঃ বিলাপ করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অতিরিক্ত গুণ কীর্তন করে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম, অনুরূপ হায় মুসিবত হায় মুসিবত বলে চিৎকার করাও হারাম। (জাওহেরা ইত্যাদি)

মাসালাঃ জামা কাপড় ছেড়া, মুখ আছড় দেয়া, চুল খুলে ফেলা মাথা চাপড়ানো বুকে ও রানে হস্তাঘাত করা সব মূর্খতার কাজ ও হারাম।

মাসআলাঃ তিনদিনের অধিক শোক প্রকাশ জায়েয নেই। কিন্তু মহিলা স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে। (হাদীস)

মাসআলাঃ শব্দ করে কান্নাকাটি করা নিষেধ আওয়াজ উচু না হলে ক্রন্দনে বাধা নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম (রাঃ) এর ইন্তেকালে ক্রন্দন করেছিলেন (জাওহেরা) এ বিষয়ে কতিপয় বর্ণিত হাদীস যা কান্নাকাটি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। তা যেন মুসলমানগণ গভীরভাবে দেখে এবং এখানকার মহিলাদেরকে জানাবেন এ বিপদ হিন্দুস্তানের মহিলাদের মধ্যে অধিকহারে পরিলক্ষিত হয়, যা হিন্দুদের অনুকরণের দরুন পাওয়া যায়।

হাদীস (১) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মুখে আঘাত করে জামার কলার ছিড়ে জাহেলী যুগের চিৎকারের মত চিৎকার করে অর্থাৎ বিলাপ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীস (২) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু বুরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে মাথা মুন্ডায়ে ফেলে আমি ওর থেকে দায়িত্বমুক্ত।

হাদীস (৩) সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি কাজ জাহেলী যুগের, যেগুলো তারা ত্যাগ করে না (১) বংশ কুল নিয়ে গর্ব করা (২) বংশ নিয়ে সমালোচনা করা (৩) এবং তারকা সমূহ হতে বৃষ্টি প্রার্থনা

করা এবং (৪) বিলাপ করা এবং এরশাদ করেন বিলাপকারিনী যদি মৃত্যের পূর্বে তাওবা না করে তাহলে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠাবে তার একটি জামা হবে, ফাতরানের আর একটি হবে, খোসা পাচরা খুজলিবিশিষ্ট।

হাদীস (৪) বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরতআবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, চোখের পানি ও মনের দুঃখের কারণে আল্লাহ তাআ'লা শাস্তি দিবেন না মুখের দিকে ইশারা করে বলেন, মুখে কারণে আযাব রহমত প্রদান করেন এবং পরিবারের ক্রন্দনকারীদের কারণে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হয়। অর্থাৎ যদি সে ওসীয়ত করে থাকে বা ওখানে ক্রন্দন করার প্রথা চালু রয়েছে এবং ওকে নিষেধও করা হয়নি। (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত) অথবা এর অর্থ হলো ওদের ক্রন্দনের দরুন মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয় অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে, হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা মৃতদেরকে কষ্ট দিও না, তোমরা যখন কান্নাকাটি করে থাক ওরাও তখন ক্রন্দন করে।

হাদীস (৫) বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যার উপর ক্রন্দন করা হয়েছে, কিয়ামতের দিবসে ক্রন্দনের দরুন তার উপর শাস্তি হবে। অর্থাৎ ওদের আকৃতিতে।

হাদীস (৬) সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, যখন আবু সালমা (রাঃ) এর ইন্তেকাল হল, আমি বললাম সফররত ও প্রবাসে ইন্তেকাল করেছে ওর ইন্তেকালে এমনভাবে ক্রন্দন হয়েছে, যেটা প্রচলিত ছিল, আমি ক্রন্দনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এক মহিলাও আমাকে সাহায্য করার জন্য আসলো, রাসূলুল্লাহ মহিলাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা যে ঘর থেকে শয়তানকে দু'বার বের করেছে তুমি সেথায় শয়তানকে প্রবেশ করাতে ইচ্ছা করছো। তিনি বলেন এরপর আমি কান্নাকাটি হতে বিরত রইলাম এবং ক্রন্দন করলাম না।

হাদীস (৭) তিরমিযী শরীফে আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যিনি মৃত্যবরণ করেছেন এবং ক্রন্দনকারী ওর গুণাবলী বর্ণনা করে ক্রন্দন করেছে আল্লাহ তাআলা সে মৃত ব্যক্তির উপর দু'জন ফেরেস্তা নিযুক্ত করেন, যারা ওকে কুচলাতে থাকেন এবং বলেন, তুমি কি এরূপ ছিলে?

হাদীস (৮) ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যদি প্রথম বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ কর এবং ছওয়াবের সন্ধানী হয়ে থাক তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন ছওয়াব দানে সন্তুষ্ট নই।

হাদীস (৯) আহমদ বায়হাকী, ইমাম হোসাইন বিন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে মুসলমান পুরুষ বা মহিলার উপর কোন মুসীবত আসলো সেটা স্মরণ করে ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন বলবে, যদিও মুসীবতের সময়কাল দীর্ঘায়িত হয় আল্লাহ তাআলা এর জন্য নতুন ছওয়াব দান করেন, এমন ছওয়াব দান করেন, যেমন মুসীবত পৌছার দিনে দিয়েছিল।

শহীদের বর্ণনা

আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

অর্থাৎ এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত হ্যাঁ তোমাদের খবর নেই। (সূরা বাকারা পারা২, আয়াত- ১৫৪)

আরো এরশাদ করেনঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.

অর্থঃ এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে,কখনো তাদেরকে মৃতবলে ধারণা করো না। বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছে জীবিকা পায় তারা উৎফুল্ল এরই উপর যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহক্রমে দান করেছেন এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করেছে, তাদের পরবর্তীদের জন্য যারা এখনো তাদেরসাথে মিলিত হয়নি। এ কারণে যে, তাদের না কোন আশংকা আছে এবং না কোন দুঃখ। তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করে আল্লাহর নি'মাত ও অনুগ্রহের উপর এবং এজন্য যে, আল্লাহ মুসলমানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

জিহাদে নিহত হওয়া ছাড়াও যারা শহীদের ছওয়াব পাবে তাদের বর্ণনা

হাদীস শরীফে শহীদের অসংখ্য ফজীলত বর্ণিত হয়েছে, কেবল জিহাদে নিহত হলে তার নাম শহীদ নয় বরং এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, এছাড়াও আরো সাত প্রকারের শহীদ রয়েছে।

(১) যে প্লেগে মারা যায় (২) যে পানিতে ডুবে মারা যায়। (৩) গোসল ওয়াজিব হয়েছে এমন অবস্থায় মারা গেলে সে শহীদ (৪) আগুনে পুড়ে মারা গেলে সে শহীদ (৫) পেটের রোগে যিনি মারা যাবেন, তিনি শহীদ (৬) উপর থেকে দেওয়াল চাপা পড়ে যিনি মারা যায় সে শহীদ (৭) যে নারী সন্তান প্রসবকালে মারা যায় বা (৮) কুমারিত্ব অবস্থায় মারা যায় সে শহীদ।

এ হাদীসটি ইমাম মালেক, আবু দাউদ, মাসউদ প্রমুখ হযরত জাবির বিন আবিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, মহামারী প্লেগ থেকে পলায়নকারী জিহাদ হতে পলায়নকারীর ন্যায়। যিনি ধৈর্য ধারণ করবেন, তার জন্য শহীদের ছওয়াব রয়েছে।

আহমদ, নাসাঈ এরবায বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন যে প্লেগ মহামারীতে মারা যাবে ওর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মোকাদ্দমা পেশ হবে। শহীদগণ বলবে ইনি আমাদের ভাই, ইনি সেভাবে নিহত হয়েছেন যেভাবে আমরা হয়েছি। বিছানায় মৃত্যুবরণকারীগণ বলবে ইনি আমাদের ভাই ইনি স্বীয় বিছানায় মারা যায় যেভাবে আমরা মৃত্যুবরণ করেছি, তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, ওর আঘাত দেখো ওর আঘাত যদি নিহতদের সাদৃশ হয়, তাহলে সে শহীদের অন্তর্ভুক্ত এবং শহীদের সাথে থাকবে। তখন ফেরেশ্তারা দেখবে ওর আঘাত শহীদদের আঘাতের অনুরূপ পাবে তখন তাকে শহীদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা শাহাদতের মৃত্যু। এছাড়াও আরো অনেক আমল রয়েছে, যেগুলোতে শহীদের-ছওয়াব পাওয়া যায়।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ ইমামগণ এসব বিষয় উল্লেখ করেছেন, আংশিক নিম্ন বর্ণিত হলোঃ

(৯) অর্ধাংগ রোগে মৃত্যু হলে, (১০) বাহনের উপর থেকে পড়ে মারা গেল, (১১)

জ্বরাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে। (১২,১৩, ১৪, ১৫) জান অথবা মাল অথবা সন্তান সন্ততি পরিবার বা কারো হক রক্ষা বা হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হলে। (১৬) চরিত্র নিঃকলূষ অবস্থায় গভীর ভালবাসার কারণে মৃত্যুবরণ করলে। (১৭) কোন পশু পাখি কর্তৃক ফেটে ছিড়ে ভক্ষণ করলে (১৮) অন্যায়ভাবে কোন শাসক কর্তৃক বন্দীকরলে। (১৯) অন্যায়ভাবে কোন শাসক কর্তৃক মারা হলে এবং মারা গেলে (২০) কোন হিংস্র প্রাণীর আঘাতের দরুন মৃত্যু হলে (২১) ইলমেদ্বীন শিক্ষারত অবস্থায় মারা গেলে (২২) ছওয়াবের উদ্দেশ্যে আজান প্রদানকারী মুয়াজ্জিন আজানরত অবস্থায় মারা গেলে (২৩) ব্যবসায়ী পথিমধ্যে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হলে (২৪) সামুদ্রিক সফরে বমি বমি ভাব সৃষ্টি হলে শহীদের ছওয়াব পাবে (২৫) যে স্বীয় সন্তান সন্ততির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ওদের মধ্যে আল্লাহর বিধান জারী করে এবং ওদেরকে হালাল জীবিকা খাওয়ালে শাহাদাতের ছওয়াব পাবে। (২৬) প্রতিদিন পঁচিশবার নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করলেঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِى الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

(২৭) যে চাশতের নামাজ পড়ে এবং প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখে সফর কালীন ও অবস্থাকালীন সময়ে যিনি বিতর ত্যাগ করেন না। (২৮) উম্মতের ফিৎনা ফাসাদের সময়ে যিনি সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে। তিনি একশত শহীদের ছওয়াব পাবে। (২৯) অসুস্থ অবস্থায় যিনি একচল্লিশবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

পড়বে এবং এ রোগে যদি মারা যায় শহীদের ছওয়াব পাবে আর যদি রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেন তার গুনাহ্ ক্ষমা করাহবে। (৩০) কাফেরদের সাথে মোকাবিলার জন্য সীমান্তে ঘোড়া মোতায়েনকারী (৩১) প্রতি রাতে যে সূরা ইয়াসীন শরীফ পাঠ করে। (৩২) অজু সহকারে নিদ্রা গেলে এবং মারা গেলে (৩৩) যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার উপর একশত বার দরুদ শরীফ পাঠ করে। (৩৪) যে বিশুদ্ধ নিয়্যাতে আল্লাহর পথে নিহত হওয়ার প্রার্থনা করে। (৩৫) জুমার দিনে যে মৃত্যু বরণ করে। (৩৬) যে ভোরে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ তিনবার পড়া পর পর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে। আল্লাহ্ তাআলার ওর জন্য সত্তর হাজার ফেরেস্তা নিযুক্ত করবেন যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত ওর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সেদিনে যদি মারা যায় শহীদ হিসেবে মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে ভোর পর্যন্ত ওর জন্য একই হুকুম।

শহীদের সংজ্ঞা ও বিধান

ফকিহী মাসায়েলঃ ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় শহীদ বলা হয় প্রত্যেক বিবেকবান প্রাপ্তবয়স্ক পবিত্র মুসলমানকে যাকে অন্যায়ভাবে কোন আঘাতকারী যন্ত্র বা অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে এবং সে হত্যার কারণে হত্যাকারীর উপর কোন মাল ওয়াজিব হয় না এবং হত্যার কারণে পার্থিব কোন স্বার্থ বা উপকারিতা ভোগ করেনি। শরীয়ত মতে সে শহীদের পর্যায়ভুক্ত হবে। শহীদের হুকুম হলো যে, শহীদকে গোসল দেয়া যাবে না। ওর রক্ত সহ দাফন করা হবে। যেখানে এ হুকুম পাওয়া যাবে ফোকাহায়ে কেরাম তাকে শহীদ বলেছেন, অন্যথায় শহীদের পর্যায়ভুক্ত হবে না। কিন্তু ফকিহী বিধানমতে শহীদ না হলেও এটা নয় যে, শহীদের ছওয়াবও পাবে না। এক্ষেত্রে পার্থক্য হলো কেবল তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাতে হবে, তবে সে শহীদের ছওয়াব পাবে।

মাসআলাঃ নাবালেগ ও পাগলকে গোসল দিতে হবে। যেভাবেই তাকে হত্যা করা হোক না কেন। জুনুবী (যার উপর গোসল ফরজ) হায়েজ নেফাস সম্পন্ন মহিলা এখনো হায়েজ নেফাস গ্রস্ত রয়েছে, বা শেষ হয়েছে কিন্তু এখনো গোসলকরেনি তাহলে এদের সবাইকে গোসল দিতে হবে। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ হায়েজ শুরু হয়েছে এখনো তিনদিন পূর্ণ হয়নি ওকে হত্যা করা হয়েছে, তাকে গোসল দিবে না, তখন ঋতুগ্রস্ত এটা বলা যাবে না। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ জুনুবী (যার উপর গোসল ফরজ) হওয়াটা এভাবে জানা যাবে যে, হয়তঃ নিহত হওয়ার পূর্বে যে নিজেই বলে দিয়েছে, অথবা তার স্ত্রী বলে দিয়েছে (জাওহেরা)

মাসআলাঃ যখমকারী যন্ত্র হচ্ছে সেটা যেটার দ্বারা হত্যা করার দরুন হত্যাকারীর উপর কেসাস (শরীয়তের বিচারে হত্যার বিনিময় হত্যা) ওয়াজিব হয়, অর্থাৎ যেটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক করে ফেলে যেমন তলোয়ার, বন্দুককেও যখমকারী যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে হত্যার কারণে হত্যাকারীর উপর কেসাস ওয়াজিব হয় না বরং মাল ওয়াজিব হয়। এমন মৃতকে গোসল দিতে হবে। যেমন লাঠি দিয়ে মেরেছে, অথবা কতলে খাতা বা ভুলবশতঃ হত্যা যেমন নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যবস্তুতে মারছে কিন্তু ভুলবশতঃ কোন মানুষের দিকে ছুটে এসে মানুষ মারা গেল বা কোন মানুষ উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে নিদ্রা গেল, নিদ্রাবস্থায় তরবারিটি কোন মানুষের উপর গিয়ে পড়ল এবং মারা গেল, বা কোন শহরে বা গ্রামে বা পার্শবর্তী এলাকায় কোন নিহত ব্যক্তি পাওয়া গেল, যার হত্যাকরীর পরিচয় জানা যায়নি, এসব অবস্থায় গোসল

দিতে হবে, আর যদি নিহত ব্যক্তিকে শহরে বা কোথাও পাওয়া গেল জানা গেল যে, চোরেরা হত্যা করেছে, অস্ত্র দিয়ে হত্যা করুক বা অন্য কিছু দিয়ে হোক তাহলে গোসল দিবে না। যদি হত্যাকারী চোর নির্দিষ্টভাবে পরিচয় যদিও পাওয়া না যায়। আর যদি লাশ জঙ্গলে পাওয়া যায় এবং হত্যাকারী কে জানা যায়নি, তাহলে গোসল দিবে না। অনুরূপ যদি ডাকাতরা হত্যা করে তখনও গোসল দিবে না অস্ত্র শস্ত্র হাতিয়ার দ্বারা হত্যা করুক বা অন্য কিছু দ্বারা হত্যা করুক। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ আর যদি হত্যার বিনিময়ে মাল ওয়াজিব না হয় বরং মাল ওয়াজিব হওয়াটা অন্য কোন কারণে হলে যেমন হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তির গার্জিয়ানদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেল, অথবা পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে বা পিতা এমন কাউকে হত্যা করেছে যার উত্তরাধিকার হচ্ছে পুত্র। যেমন নিজ স্ত্রীকে হত্যা করেছে স্ত্রীর ওয়ারিশ হচ্ছে পুত্র। যে পুত্র ও স্বামীর ঘরের তাহলে কেসাসের মালিক হবে পুত্র। কিন্তু হত্যাকারী যেহেতু ওর পিতা কেসাস নেয়া যাবে না। এসব অবস্থায় গোসল দিতে হবে না। (রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ হত্যা যদি অন্যায়ভাবে না হয় বরং কেসাস (শরীয়তের বিচারে হত্যার বিনিময়ে হত্যা) অথবা হদ (শরীয়তের শাস্তি) অথবা তাযিরের বিনিময়ে হত্যা করা হয় বা হিংস্র জন্তু কর্তৃক নিহত হলে, গোসল দিতে হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি অপহৃত হয়েছে কিন্তু এরপরও পার্থিব উপকারিতা ভোগ করেছে যেমন পানাহার করেছে নিদ্রা গিয়েছে বা চিকিৎসা করেছে যদিওবা স্বল্প পরিমাণ হোক অথবা তাবুতে অবস্থান করেছে অর্থাৎ যেখানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বা পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের সময় পরিমাণ অতিক্রম করেছে তবে শর্ত হলো নামাজ আদায়ে সক্ষম হতে হবে বা ওখান থেকে উঠে অন্যত্র সরে দাড়াল বা লোকেরা তাকে যুদ্ধ ময়দান থেকে উঠায়ে অন্যস্থানে নিয়ে গেল, জীবিত পাওয়া গেল বা পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করল বা দুনিয়াবী কোন বিষয়ে ওসীয়ত করেছে বা কিছু ক্রয় বিক্রয় করেছে বা অনেক কথা বলেছে এসব অবস্থায় গোসল দিতে হবে। তবে শর্ত হলো এ বিষয়গুলো যদি জিহাদের পর সংগঠিত হয় আর যদি যুদ্ধ চলাকালে হয় তাহলে এসব বিষয় শাহাদাতের অন্তরায় নয়, অর্থাৎ তাকে গোসল দিবে না। সে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। আর ওসীয়ত যদি আখেরাত সম্পর্কে হয় বা দু'একটি কথা বলেছে যদিও বা যুদ্ধের পর হোক শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। গোসল দিতে হবে না। আর যদি যুদ্ধে হত্যা করা না হয় বরং অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তাহলে উপরোক্ত কারণ সমূহের কোন একটি পাওয়া গেলে গোসল দিবে অন্যথায় দিতে হবে না। (দুর্রুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে মুসলমানকে কোন হরবী (কাফের সৈন্য) অথবা বাগী (হক

খেলাফতের বিদ্রোহকারী) অথবা ডাকাত কোন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে বা ওদের প্রাণীগুলো যদি তাকে দলিত মথিত পিষ্ট করে যদিও বা সে নিজে তার প্রাণীর উপর আরোহী ছিল বা হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বা প্রাণী যদি হাত পা দিয়ে তাকে আঘাত করে বা দাত দ্বারা কামড় দিলে, বা তার বাহনকে ওসব লোকেরা উত্তেজিত করেছে বা বাহনের উপর থেকে পড়ে মারা গেল, বা ওরা বাহনের দিকে আগুনে নিক্ষেপ করল। বা ওখান থেকে বাতাসে আগুন উড়ে এসেছে অথবা ওরা কোন কাঠের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিল, যার এক প্রান্ত ওদিকে ছিল, এমতাবস্থায় আগুন জ্বলে পুড়ে মারা গেল, বা যুদ্ধ ময়দানে নিহত পাওয়া গেল এবং শরীরে যখমের চিহ্ন পাওয়া গেল যেমন চোখ কান হাত থেকে রক্ত বের হয়েছে বা কন্ঠনালী হতে পরিষ্কার রক্ত নির্গত হয়েছে বা ওসব লোকেরা শহরের সীমানা থেকে ওকে বাহির করে দিল বা তার উপর দেওয়াল চাপা দিল বা পানিতে ডুবায়ে দিল, বা পানিবদ্ধ ছিল, ওরা পানি খুলে দিয়ে পানির প্রবাহে ভাসিয়ে দিল, ফলে পানিতে ডুবে গেল বা গলা চেপে ধরল, মূলতঃ যেভাবেই হোক মুসলমানকে হত্যা করা হলে বা যে বিষয়টি হত্যার কারণ হবে সে শহীদের পর্যায়ভুক্ত হবে। (আলমগীরি, দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ যুদ্ধ ময়দানে মৃত্যু পাওয়া গেল এবং হত্যার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অথবা ওর নাক অথবা পায়খানা প্রস্রাবের স্থান থেকে রক্ত নির্গত হয়েছে বা কন্ঠনালী হতে জমাট রক্ত বের হয়েছে বা শত্রুর ভয়ে মারা গেল, তাহলে গোসল দিতে হবে। (দুর্রুল মোখতার)

মাসআলাঃ নিজের জীবন, সম্পদ বা কোন মুসলমানকে রক্ষা করতে যুদ্ধ করল, এবং মারা গেল, তাহলে শহীদ হবে, লোহা পাথর অথবা কাঠ যে কোন জিনিষ দ্বারা নিহত হোক না কেন? (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুশরিকের ঘোড়া ছুটে পলায়ন করল, এর উপর কোন আরোহী নেই ঘোড়া কোন মুসলমানকে পিষ্ট করেছে মুসলমান কাফেরকে তীর ছুটল, তীর গিয়ে কোন মুসলমানের দেহে পড়ল, বা কাফেরের ঘোড়া মুসলমানের ঘোড়াকে ক্ষেপাল, ঘোড়া মুসলমান আরোহীকে ফেলিয়ে দিল (আল্লাহ ক্ষমা করুক) মুসলমানরা পলায়ন করল, কাফেররা মুসলমানদেরকে আগুন বা গর্তের দিকে যেতে বাধ্য করল বা মুসলমানরা নিজেদের আশে পাশে ক্ষুর বিছায়ে রাখল এর উপর দিয়ে চলার সময় মারা গেল, এসব অবস্থায় গোসল দিতে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যুদ্ধে কোন মুসলমানের ঘোড়া ক্ষুব্ধ হল, বা কাফেরদের পতাকা দেখে থমকালো, কিন্তু কাফেরগণ ঘোড়াকে ক্ষেপাল না, ঘোড়া আরোহীকে ফেলে দিল, আরোহী মারা গেল, অথবা কাফেরের দুর্গ বন্ধ ছিল, এবং মুসলমানের শহরে এসে

আশ্রয় নিল উপর থেকে কিছু পিছলিয়ে পড়ায় মারা গেল অথবা (আল্লাহ না করুক) মুসলমানদের পরাজয় হল এবং এক মুসলমানের বাহন অন্য মুসলমানের বাহনকে পিষ্ট করে দিল, মুসলমান এর উপর আরোহী হোক অথবা রশ্মি ধরে চলুক বা পিছন থেকে হাকিয়ে নিয়ে চলুক বা শত্রুর উপর আক্রমণ করল এবং ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেল, এসব অবস্থায় গোসল দিতে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ দু'দল সামনাসামনি হল, কিন্তু যুদ্ধের সুযোগ হল না, এক ব্যক্তিকে মৃত্যু অবস্থায় পাওয়া গেল, যখমকারী অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে মর্মে যতক্ষণ জানা না যায়, গোসল দিতে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ শহীদের শরীরে যে জিনিষগুলো কাফন জাতীয় নয় তা খুলে নিবে, যেমন চর্মনির্মিত পরিধেয় পোষাক লৌহবর্ম, যুদ্ধে ব্যবহৃত টুপি, অস্ত্র শস্ত্র কটনের কাপড়, সুন্নাত কাফনে কিছু কম পড়লে তা সংযোজন করা যাবে। পায়জামা খুলবে না। যদি কম হয় পূর্ণ করাতে ক্ষতি নেই। তখন চর্ম নির্মিত কাপড় এবং কটন এর কাপড় খুলবে না। শহীদের সব কাপড়খুলে নতুন কাপড় দেয়া মাকরূহ। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ অন্যান্য মৃতদেরকে যেভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করা যায় শহীদকেও লাগানো যাবে। শহীদের রক্ত ধুইবে না রক্ত সহ দাফন করবে। কাপড়ে যদি নাপাকী থাকে তা ধুয়ে নিবে। (আলমগীরি) শহীদের জানাযা নামাজ পড়তে হবে। (ফিকাহর কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ শত্রুর উপর আক্রমণ করল, আঘাত শত্রুর উপর পড়েনি বরং আক্রমনকারীর উপর পড়েছে এবং মারা গেল, আল্লাহর কাছে শহীদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু গোসল দিতে হবে এবং নামাজ পড়তে হবে। (জাওহেরা)

ক্বা'বা শরীফে নামাজ পড়ার বর্ণনা

সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে আছে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওসামা বিন যায়েদ ওসমান বিন তালহা, বেলাল বিন রাবাহ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুম প্রমুখ মক্কা মোয়াজ্জমার ভিতর প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দেয়া হল, সামান্য দেরীক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। যখন বাইরে তাশরীফ আনলেন, আমি হযরত বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম হুজুর কি করেছেন! বেলাল (রাঃ) বললেন, একটি স্তম্ভ বামদিকে নিলেন, দু'টি ডান দিকে এবং তিনটি পিছনে রাখলেন, অতঃপর নামাজ পড়লেন, সে যুগে বায়তুল্লাহ শরীফে ছয়টি স্তম্ভ ছিল।

মাসআলাঃ ক্বা'বা শরীফের ভিতর সব ধরনের নামাজ জায়েয, ফরজ হোক, নফল হোক, একাকী হোক বা জামাত সহকারে হোক যদিওবা ইমামের দিক এক দিকে হয় এবং মুক্তাদির দিক অন্যদিকে কিন্তু মুক্তাদির পিট যখন ইমামের সামনে হবে মুক্তাদির নামাজ হয়ে যাবেএবং মুক্তাদির মুখমন্ডল ইমামের সামনে হলে হয়ে যাবে। কিন্তু মাঝখানে যদি কোন বস্তু দ্বারা আড়াল করা না হলে মাকরূহ্ হবে। মুক্তাদির মুখমন্ডল যদি ইমামের পার্শ্ব দিকে হয় তাহলে মাকরূহবিহীন জায়েয। (জাওহেরা দুর্রুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসআলাঃ ক্বাবা শরীফের ছাদের উপর নামাজ পড়লেও একই হুকুম কিন্তু কাবা শরীফের ছাদে নামাজ পড়া মাকরূহ। (তানভীরুল আবছার)

মাসআলাঃ মসজিদে হেরেম শরীফে কাবা শরীফের পার্শ্বে জামাত করলে এবং কা'বা শরীফের চতুর্দিকে মুক্তাদি, দাড়ালো তখনও জায়েয হবে। যদিও বা ইমাম অপেক্ষা মুক্তাদি কাবা শরীফের নিকটবর্তী, তবে শর্ত হলো, মুক্তাদি যারা ইমাম অপেক্ষা ক্বাবা শরীফের নিকটতর ইমাম যেদিকে সেদিকে যেন না হয় বরং যেন অন্যদিকে হয়, যেদিকে ইমাম সেদিকে যদি এরা হয় এবং ইমাম অপেক্ষা অধিক নিকটতর হয় তাহলে নামাজ হবে না। (ফিকহ্র কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ ইমাম ক্বাবা শরীফের ভিতরে, মুক্তাদি বাহিরে এক্তেদা শুদ্ধ হবে। ইমাম ভিতরে একা হোক অথবা তার সাথে কয়েকজন মুক্তাদি হোক কিন্তু দরজা খোলা রাখা চায়। যেন মুক্তাদিগণ ইমামের রুকু সিজদার অবস্থা জানতে পারে। আর যদি দরজা বন্ধ থাকে কিন্তু ইমামের আওয়াজ বাইরে আসছে তাহলে ক্ষতি নেই। কিন্তু যে অবস্থায় ইমাম একা ভিতরে থাকবে তখন মাকরূহ্ হবে। ইমাম একা উপরস্থানে হলে তখনও মাকরূহ্ হবে। (দুর্রুল মোখতার রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইমাম বইরে মুক্তাদি ভিতরে তখনও নামাজ শুদ্ধ হবে। তবে শর্ত হলো মুক্তাদির পিট যেন ইমামের মুখোমুখী না হয়। (রদ্দুল মোখতার)

قد تم هذا الجزء بحمد الله تعالى وله الحمد اولا وآخرا وباطنا وظاهرا والصلوة والسلام
على من ارسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وآله
واصحابه. وابنه وحزبه اجمعين الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وانا الفقير الى
الغنى ابوالعلا امجد على الاعظمى غفرله ولوالديه آمين.

বাহারে শরীয়ত
৫ম খণ্ড

মূল

সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

প্রকাশক ঃ মোঃ মোহঃ সাঈদুর রহমান
সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক নিউ মার্কেট, রুম-৫০
ফোন - (০৩৫১২) ২৪৪১৪৮
মো- ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

প্রকাশক ঃ মোঃ মোঃ সাঈদুর রহমান

সাঈদ বুক ডিপো

নিউ মার্কেট, রুম নং-৫০

কালিয়াচক, মালদহ।

মোবাইল ঃ ৯৯৩৩৪৯৪৬৭০

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ লেখকের

মুদ্রণে ঃ নুর কম্পিউটার প্রেস, গুপ্ত মার্কেট (দ্বিতল), ৫তলা মসজিদ সামনে, কালিয়াচক, মালদা। মো. ৯৭৩৩৩০১০২২ (সালাউদ্দিন

تقریظ

امام اہل سنت مجدد مائۃ حاضرہ مؤید ملّت طاہرہ
اعلیحضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لاسیما علی الشارع المصطفی ومقتفیہ فی المشارع اولی الطاہرۃ والصفا

فقیر غفر لہ المولی القدیر نے یہ مبارک رسالہ بہار شریعت حصہ پنجم تصنیف لطیف اخی فی اللہ ذی المجد والجاہ والطبع السلیم والفکر القویم والفضل والعلی مولانا ابوالعلی مولوی حکیم محمد امجد علی قادری برکاتی اعظمی بالمذھب والمشرب السکنی رزقہ اللہ تعالی فی الدارین الحسنیٰ مطالعہ کیا۔ الحمد للہ مسائل صحیحہ رجیحہ محققہ منقحہ پر مشتمل پایا آجکل ایسے کتاب کی ضرورت تھی کہ، عوام بھائی سلیس اردو میں صحیح مسئلے پائیں اور گمراہی واغلاط کے مصنوع وملمع زیوروںکی طرف آنکہ نہ اٹھائے مولی عزوجل مصنف کی عمر وعلم وفیض میں برکت دے اور ہر باب میں اس کتاب کے اور حصص کافی وشافی ووافی تالیف کرنیکی توفیق بخشے اور انہیں اہل سنت میں شائع ومعمول اور دنیا وآخرت میں نافع ومقبول فرمائے ۔ آمین.

والحمد للہ رب العلمین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ اجمعین. آمین.

کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا
عفی عنہ بمحمدن المصطفے صلی اللہ علیہ وسلم

মোজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর

অভিমত

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অসংখ্য সালাম তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি, বিশেষতঃ শরীয়তের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি, পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার ধারক শরয়ী বিধানে তাঁর পদাংক অনুসারীদের প্রতি।

নগণ্য এ বান্দা (সর্বশক্তিমান মাওলা ক্ষমা করুন) এর বরকতময়গ্রন্থ 'বাহারে শরীয়ত' পঞ্চম খণ্ড (কৃতঃ মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আমজাদ আলী কাদেরী বরকাতী আজমী আল্লাহ তাআলা তাঁকে উভয় জাহানে সফলতা দান করুন) আমি পাঠ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! মাসআলা সমূহ বিশুদ্ধ, বিশ্লেষণধর্মী এবং চমৎকার পেয়েছি। বর্তমানে এমন কিতাবের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা ছিলো। যেন সর্বসাধারণ ভাইয়েরা বিশুদ্ধ উর্দুতে বিশুদ্ধ মাসআলা সমূহ পায় এবং ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ, ভুল, মনগড়া এবং বাহ্যিক চাকচিক্যময় মাসআলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে মহান আল্লাহ তাআলা রচয়িতার আয়ু, জ্ঞান এবং ফয়েজে বরকত দান করুন। এ কিতাবের প্রতিটি পরিচ্ছেদে বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ, ত্রুটিহীন, পবিত্র এবং সত্য মাসআলা লিপিবদ্ধ করার তাওফীক দান করুন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে এ কিতাবের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হোক এবং তা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী এবং মকবুল করুন। আমীন।

'ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, ওয়াসাল্লাল্লাহু আ'লা সৈয়্যাদানা ওয়ামাওলানা মুহাম্মদ, ওয়াআলিহি ওয়াছহাবিহি ওয়াইবনিহি ওয়াহিযবিহি আজমায়ীন।'

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিত ছাহাবীদের প্রতি উত্তমতর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আমীন।

আহমদ রেযা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা সৈয়্যাদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়ালিহি ওয়াসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম্

আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যার অফুরন্ত করুণায় বাহারে শরীয়ত ৫ম খণ্ডটি ভাষান্তর করে মুসলিম ভাই বোনদের খেদমতে পেশ করার সুযোগ হয়েছে, ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রের জগতে বাহারে শরীয়ত গ্রন্থের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। এই অনন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থটির প্রণেতা উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ সদ্রুশ শরীয়ত আল্লামা মুফ্‌তী আমজাদ আলী (রহঃ)। ২০ খণ্ডে লিখিত এ বিশাল গ্রন্থটি অতীব মূল্যবান ইসলামী সম্পদ, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটির ১ম ২য় ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড অনূদিত হয়ে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত খণ্ডগুলো আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। কিতাবটির প্রতিটি খণ্ড মুসলিম সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পর্যায়ক্রমে দীর্ঘদিন পর ৫ম খণ্ডটি আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো।

ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয়ের যথাক্রমে যাকাত ও রোজা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে ৫ম খণ্ডে। একজন মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলামী বিধান ভিত্তিক করণীয় দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিতাবটি অধ্যয়নে পাঠক সমাজ ইসলামের দুইটি রোকন বা স্তম্ভের বিস্তারিত বিধি-বিধান ইসলামী শরীয়তে যাকাত ও রোজার গুরুত্ব, তাৎপর্য সহ বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসআলার সঠিক ও বিশুদ্ধ সমাধান জানার সুযোগ পাবেন নিঃসন্দেহে। রেযা ইসলামিক একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী জনাব আলহাজ্ব খায়রুল বশর ছাহেবের আর্থিক সহায়তায় কিতাবখানা পাঠকের খেদমতে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। কিতাবখানা প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশেষতঃ বিশিষ্ট লেখক মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন হাজী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন প্রমুখ সকলের প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। ভাষান্তরের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না, ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি একান্ত কাম্য। পাঠক সমাজের সুচিন্তিত মতামত আমাদের পাথেয়। গ্রন্থখানা বহুল প্রচারে সম্মানিত বিক্রেতাগণ ও পাঠক মহলের আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে কাম্য। মুসলিম ভাই বোনেরা যদি এ গ্রন্থখানা পাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হন এ নগণ্য খিদমত স্বার্থক মনে করবো। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওসীলায় এ ক্ষুদ্র খিদমত কবুল করুন। আমীন। বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন।

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

প্রকাশকের কথা

রোজা ও যাকাত ইসলামের মৌলিক রোকন বা স্তম্ভ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, কলেমা, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। পাঁচটি বিধানের উপর পূর্ণাঙ্গ ঈমান স্থাপন করা মুসলিম মিল্লাতের ওপর অপরিহার্য, প্রতিটি বিধানের উপর যথাযথ ঈমান স্থাপন ও কর্মে বাস্তবায়ন মুমিনের পরিচায়ক, পক্ষান্তরে একটি গ্রহণ অপরটি বর্জন কুফরীর নামান্তর। কুরআন, সুন্নাহ, এজমা কিয়াসের আলোকে, মুজতাহিদ ইমাম ও ওলামায়েকেরামের প্রদত্ত ইসলামী সমাধান গ্রহণ ব্যতিরেকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের উপর আমল করা সম্ভব নয়, ইসলামী আইনজ্ঞদের প্রণীত ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে প্রদত্ত মাসআলা সমূহ্ মুসলিম সমাজের জন্য সঠিক নির্দেশিকা। বাহারে শরীয়ত কিতাবখানা, ফিকহ শাস্ত্রের জগতে একটি উঁচু মানের গ্রন্থ, ইসলামের সকল বিধি-বিধান নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী ছাহেব গ্রন্থটি অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছেন, রেযা ইসলামিক একাডেমীর পক্ষ হতে, ৪র্থ খণ্ড পর্যন্ত ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, মুসলিম সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে ৫ম খণ্ড প্রকাশনার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস, যাকাত ও রোজা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনে গ্রন্থটি দিশারীর ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি ভাষান্তরের জন্য মুহ্তারম অনুবাদককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনূদিত গ্রন্থটির প্রকাশক হতে পেরে আমি মহান আল্লাহর দরবারে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, আল্লাহ দ্বীনের এই ক্ষুদ্র খিদমত কবুল করুন, দুনিয়া ও আখেরাতে সকলকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। আমীন।

বিনীত

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

পঞ্চম খণ্ড

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সদ্রুশ শরীয়ত আল্লামা আমজাদ আলী (রহঃ) ও বাহারে শরীয়ত	৯
যাকাতের বর্ণনা	১৮
কোরআনের আলোকে যাকাত	১৮
হাদীসের আলোকে যাকাতের বর্ণনা	২১
ফিকহী মাসায়েল	২৭
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী	২৮
যাকাত সম্পর্কে চুয়াল্লিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল	৩৭
সাইমা পশুর যাকাতের বিবরণ	৪৬
উটের যাকাতের বর্ণনা	৪৭
গরুর যাকাতের বিবরণ	৪৮
ছাগলের যাকাতের বিবরণ	৪৯
স্বর্ণ রৌপ্য ও বাণিজ্যিক মালামালের যাকাতের বিবরণ	৫৪
স্বর্ণের নেসাবের বর্ণনা	৫৬
ঋণের যাকাত প্রসঙ্গে জরুরী মাসায়েল	৬০
আশেরের বর্ণনা	৬৪
খনি ও গুপ্ত ধনের বর্ণনা	৬৭
কৃষিদ্রব্য ও ফল ফলাদির যাকাতের বর্ণনা	৬৯
ফিকহী মাসায়েল	৭০
জমির প্রকারভেদ	৭০
খারাজ'র প্রকারভেদ	৭১
মালের যাকাত কোন্ প্রকারের লোকদেরকে দেয়া যায়	৭৭
যাকাতের খাত বর্ণনা	৭৯
সাদকায়ে ফিতরের বর্ণনা	৮৯
সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ	৯৩
ভিক্ষা করা কার জন্য হালাল আর কার জন্য হালাল নহে	৯৫
নফল সাদ্কা সমূহের বর্ণনা	১০২
হাদীসের আলোকে নফল সাদ্কার গুরুত্ব	১০২

বিষয় পৃষ্ঠা

রোজার বর্ণনা ১১৬
হাদীসের আলোকে সিয়ামের তাৎপর্য ১১৭
ফিকহী মাসায়েল ১২৫
রোজার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ১২৫
চাঁদ দেখার বর্ণনা ১৩২
চাঁদ দেখার শরয়ী বিধান ১৩৪
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন দ্বারা চাঁদ দেখার সংবাদ প্রসঙ্গে শরয়ী বিধান ১৩৯
যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না তার বর্ণনা ১৪০
রোজা ভঙ্গকারী বিষয় সমূহের বর্ণনা ১৪৪
রোজাবস্থায় হুক্কা, বিড়ি সিগারেট সুরুট ইত্যাদি পান করার মাসাআলা ১৪৫
ওসব অবস্থাদির বর্ণনা যেসব ক্ষেত্রে কেবল কাযা আবশ্যক ১৪৮
রোজা ভঙ্গের সেসব অবস্থাদির বর্ণনা যেসব অবস্থায় কাফ্ফারাও আবশ্যক ১৫০
রোজার মাকরূহ সমূহের বর্ণনা ১৫৪
সেহ্‌রী ও ইফতারের বর্ণনা ১৫৮
হাদীসের আলোকে ইফতারের দোয়া ১৬০
যেসব অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে ১৬১
নফল রোজার ফজীলত ১৬৮
আরফা অর্থাৎ জিলহজ্বের নবম তারিখের রোজা ১৬৯
শাওয়ালের ছয় রোজা ১৬৯
শাবানের রোজা এবং শাবানের ১৫ তারিখের ফজীলত ১৭০
প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা প্রসঙ্গ ১৭১
সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা ১৭২
মান্নতের রোজার বর্ণনা ১৭৪
মান্নতের ছয়টি ধরন ১৭৬
ইতিকাফের বর্ণনা ১৭৯
ইতিকাফের প্রকারভেদ ও বিধান ১৮১
ইতিকাফ সম্পর্কিত ছত্রিশটি মাসায়েল ১৮২-১৮৯

সদ্‌রুশ শরীয়ত আল্লামা আমজাদ আলী (রহঃ) ও বাহারে শরীয়ত

উপমহাদেশে জ্ঞান, গবেষণা, সাধনা, ধর্মীয় আক্বীদা বিশ্বাস ও ইসলামী ঐতিহ্য তুলে ধরার লক্ষ্যে যে কয়জন মনীষী নিরলসভাবে দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, সদ্‌রুশ শরীয়ত, আল্লামা মুফ্‌তী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন মাওলানা জামাল উদ্দীন ইবনে মাওলানা খোদা বখশ এর ঔরসে ১২৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের আজমগড় জিলায় ঘুসী থানার অন্তর্গত করীম উদ্দীন মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষার্জনঃ সম্মানিত পিতামহ-এর সান্নিধ্যে ধর্মীয় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর আপন বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক ও তদীয় ছাত্র মাওলানা হেদায়তুল্লাহ্ জৈনপুরী এর নিকট জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিষয়াদির প্রাথমিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। বৈষয়িক জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জনের পর শায়খুল হাদীস মাওলানা শাহ্ অসি আহমদ মুহাদ্দিস সুরতী (রঃ) (জন্ম ১৩৩৪ হিঃ, ১৯১৬ খৃঃ) এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং মাদরাসাতুল হাদীস (পিলিভেত) হতে হাদীস শাস্ত্রের সনদ অর্জন করেন। এরপর ১৩২৩ হিজরীতে হাকিম আবদুল আলীর নিকট চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ব করেন। ১৩২৪ হতে ১৩২৭ হিজরী পর্যন্ত হযরত মুহাদ্দিস সুরতীর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় পাঠ দান করেন। এরপর এক বৎসর পর্যন্ত মানব সেবার প্রত্যয়ে চিকিৎসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

বেরেলী শরীফে উপস্থিতিঃ ইতিমধ্যে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ)'র প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান মানযারুল ইসলাম বেরেলীতে শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দেয়, মাওলানা অসি আহমদ মুহাদ্দিস সুরতী আ'লা হযরত সমীপে মাওলানা আমজাদ আলী আজমীর নাম প্রস্তাব করলে আ'লা হযরত বেরেলভী (রহঃ) সানন্দে প্রস্তাবে সম্মত হন। মুহাদ্দিস সুরতীর পরামর্শমতে তিনি ডাক্তারী পেশা ছেড়ে বেরেলী শরীফ চলে যান। শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে আ'লা হযরতের পক্ষ থেকে মযহাবে আহ্‌লে সুন্নাতের প্রকাশনার দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। এছাড়া ফতোয়া প্রণয়নের দায়িত্বও পালন করতেন, স্বল্প সময়ে আ'লা হযরতের ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ নবীপ্রেম, সুন্নাতে রাসূলের বাস্তব অনুসরণ ও ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি অবিচলতা দেখে বিমোহিত

হন এবং আ'লা হযরতের হাতে বায়আত গ্রহণ করে সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় দীক্ষা লাভ করেন। তিনি যদিও আ'লা হযরতের নিকট কোন কিতাব পড়েননি কিন্তু সর্বদা বলতেন, যা কিছু তাঁর অর্জিত হয়েছে সবই আ'লা হযরতের মহান ফুয়ুজাতের ফলশ্রুতি। সুদীর্ঘ আটার বৎসর ব্যাপী স্বীয় মুর্শিদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। রূহানী ফুয়ুজাত ও বরকাতে নিজকে সমৃদ্ধ করেন। মুর্শিদের কৃপা দৃষ্টিতে তিনি মর্যাদা ও পূর্ণতায় ইনসানে কামিলে উপনীত হন। আ'লা হযরতের ওফাতের পর তিনি ১৯২৪ সনে প্রধান মুদাররিস হিসেবে আজমীর শরীফ দারুল উলুম মুঈনীয়ায় গমন করেন।

এক বিরল খিদমতঃ আ'লা হযরত মুজাহিদে দ্বীনো মিল্লাত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহঃ) কৃত ঐতিহাসিক তাফসীর গ্রন্থ 'কানযুল ঈমান ফী তরজুমাতিল কুরআন' (১৩৩০ হিঃ ১৯১১ খৃঃ) এক যথার্থ, সঠিক, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অনন্য পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ, যে অনুবাদের সার্থকতা ও যথার্থতা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এ অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন কাজে আল্লামা আমজাদ আলী (রহঃ) এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও নিরলস সাধনা অনস্বীকার্য।

আ'লা হযরত বিভিন্ন আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর অনুবাদের বিপরীতে একটি বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য কুরআনের অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করলেন। কিন্তু রচনা গবেষণা ও প্রকাশনা সহ বিবিধ ব্যস্ততার কারণে এ কাজে বিলম্ব হতে লাগলো, সদরুশ শরীয়াত একদিন দোয়াত, কলম ও কাগজ নিয়ে হাজির হলেন, তরজুমা শুরু করার আবেদন করেন, আ'লা হযরত তখনই তরজুমা শুরু করেন, প্রথম দিকে এক আয়াত এক আয়াত তরজুমা করতেন, এভাবে হতে থাকলে পূর্ণ অনুবাদ প্রণয়নে অনেক সময় হবে ভেবে এক এক রুকু তরজুমা করতেন, অনুবাদের সাথে সাথে সদরুশ শরীয়ত এবং অন্যান্য আলেমগণ নির্ভরযোগ্য তাফসীর শাস্ত্র অনুসন্ধানে কৃত অনুবাদের যথার্থতা ও বিশুদ্ধতা পর্যালোচনা করতেন, তাঁরা দেখে হতবাক হতো যে, আ'লা হযরত বিনা প্রস্তুতি ও অধ্যয়ন ছাড় যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণরূপে উল্লেখযোগ্য তাফসীর শাস্ত্র সমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে বিভিন্ন আয়াতের অর্থসমূহের সামঞ্জস্যতা অনুসন্ধানে অনেক সময় রাতের দুইটা পর্যন্ত নিরলস কাজ করতেন।

বেরেলী শরীফে দ্বীনি কাজের ব্যস্ততাঃ সদরুশ শরীয়াত, বেরেলী শরীফে অবস্থান কালে দিবারাত্রি দ্বীনি খেদমতে নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন। সকাল বেলা পাঠ দান

ও অধ্যয়ন দুপুর বেলা প্রেসে প্রকাশনা কাজ সম্পাদন, গ্রাহক বরাবরে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিতরণ ও প্রেরণ, দুপুরের পর আসর পর্যন্ত পুনরায় লেখা পড়ায় যোগদান, আসরের পর আ'লা হযরত (রহঃ)-এর নিকট বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত ফতওয়ার জবাব লিখন, মাগরিবের পর খাবার গ্রহণ, খাবারের পর পুনরায় অধ্যায়ন, এশার পর রাত ১ টা পর্যন্ত প্রেসের প্রকাশনা কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর সময় অতিবাহিত হতো, বাতিলপন্থীরা ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা ও আদর্শ বিরোধী বিভিন্ন প্রকার পত্র পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশনার দ্বারা ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত করতো, আ'লা হযরত ওসব বাতিল পন্থীদের স্বরূপ উন্মোচনে লিখিত পুস্তকাদি তৎক্ষণাত প্রকাশ করে মুসলিম মিল্লাতের ঈমান আক্বীদা রক্ষা করতেন, বাতিল শক্তির কুফরী আক্বীদা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ ও সতর্ক করতেন। এতোসব কাজের ব্যস্ততার মধ্যে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষান্ত হননি। ১৯৪৩ সন পর্যন্ত দাদওয়ায় অবস্থান করেন, এরপর এক বৎসর বেনারসে অতিবাহিত করেন, অতঃপর ১৯৪৫ সন পর্যন্ত দীর্ঘ দিন 'মানযারুল ইসলাম বেরেলী শরীফে ইলমে দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দেন। তাঁর অবিরাম খিদমতের বিনিময়ে একদল নিবেদিত প্রাণ, দ্বীনি প্রেরণায় উজ্জীবিত, ঈমানী চেতনায় শানিত সুযোগ্য আলেমে দ্বীন তৈরী হয়, যাঁদের অক্লান্ত ত্যাগের বিনিময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র আজ সত্যিকার জ্ঞান শিখা প্রজ্জলিত। ১৯২৪ সনে মানযারুল ইসলাম, বেরেলী শরীফে অবস্থানকালে একদা আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির দ্বীনীয়াত বিভাগের চেয়ারম্যান, হযরত মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান আশরাফ, দারুল উলুম মুঈনীয়া ওসমানিয়ায় (আজমীর শরীফ) প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দাওয়াত নামা সহ্ মীর নেসার আহমদ ছাহেবকে সদরুশ শরীয়তের কাছে পাঠালেন, কিন্তু তিনি প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের আস্তানা ত্যাগ করে অন্যত্র গমনে অপারগতা প্রকাশ করেন। বিষয়টি হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেযা খান বেরলভীর দৃষ্টিগোচর হলে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি আজমীর শরীফ গমন করেন। ঐকান্তিক আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও পূর্ণ সফলতার মাঝে তিনি তথায় স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন, এছাড়াও তিনি দ্বীনি শিক্ষার প্রচার প্রসার, সুন্নী আক্বীদা বিশ্বাসের প্রচলন ও ওহাবী, কাদিয়ানী, বাতিল মতাদর্শীদের খণ্ডন সহ্ বহুমুখী দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দেন। দ্বীনি দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থান সফর করেন। তাঁর শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সান্নিধ্যে অর্জনে ধন্য ছাত্রদের সংখ্যা অসংখ্য। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ছাত্ররা ছড়িয়ে আছেন।

ছাত্রবৃন্দঃ তার পাঠদানের মজলিসে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ছাত্রদের সমাবেশ ঘটতো। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বলখ, বোখারা, সমরকন্দ, আফগান, তুরস্ক, আফ্রিকা ও ইরান সহ পৃথিবীর অগণিত রাষ্ট্রের ছাত্ররা তাঁর সান্নিধ্যে এসে জ্ঞান লাভে পরিতৃপ্ত হতো। একদা বোখারা প্রদেশের কুস্তুনতুনিয়া হতে এক ছাত্র 'শরহে মোতালে' নিয়ে আসেন, ওখানে উক্ত কিতাব পড়াতে সক্ষম কোন ব্যক্তি তিনি পাননি, অন্যদিকে উর্দুও বুঝেন না, সদরুশ শরীয়ত পাঠদানের নির্ধারিত সময়সূচীর পর মানতিক শাস্ত্রের এ জটিল কিতাব তাঁকে ফার্সী ভাষায় পাঠদান করতেন।

নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কতিপয় ছাত্রদের নাম প্রদত্ত হলোঃ

※ হযরত মুহাদ্দিসে আজম পাকিস্তান মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ লায়লপুরী
※ মাওলানা হাশমত আলী খান লক্ষৌভী।
※ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ সিয়ালকোটি
※ মাওলানা মিহ্‌রাব দ্বীন পেশাওয়ারী
※ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, (তাঁর সুযোগ্য সন্তান)
※ মাওলানা আতাউল মোস্তফা, (তাঁর সুযোগ্য সন্তান)
※ মাওলানা গোলাম মহিউদ্দীন
※ মাওলানা হাকিম শামসুল হুদা, (তাঁর ছাহেবজাদা)
※ মাওলানা ক্বারী আবদুল জলীল এলাহাবাদী
※ মাওলানা এজাজ আলী খান
※ মাওলানা গোলাম ইযদানী
※ মাওলানা সৈয়দ গোলাম জিলানী মিরিটি, (বশীরুল কামেল শরহে মিয়াতু আমেল, বশীরুল কারী শরহে বোখারী গ্রন্থাবলীর প্রণেতা)
※ মাওলানা আবদুল আজীজ
※ মুজাহিদে আজম, মাওলানা হাবিবুর রহমান, (সদর অল ইণ্ডিয়া তাবলিগী সিরত)
※ মাওলানা ফোকত হোসাইন বিহারী
※ মাওলানা শামসুদ্দীন জৌনপুরী
※ মাওলানা মুফ্‌তী ওকার উদ্দীন ও তাঁর ভ্রাতা
※ মাওলানা ওলীয়ুন নবী
※ মাওলানা তাকাদ্দুস আলী খান (রাহিমাহুমুল্লাহ্ আলাইহিম)

রাজনীতিতে অবদানঃ সদরুশ শরীয়ত ছিলেন জাতির প্রকৃত পথপ্রদর্শক,

ইসলামের সত্যিকার প্রচারক, দ্বীনের অকৃত্রিম সেবক, বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর আদর্শ নেতা। জাতির ক্রান্তিকালে রাজনীতির ময়দানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বীয় মুর্শিদ আ'লা হযরত বেরলভী (রহঃ) ছিলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের পুরোধা। এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম জাতির জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে মুর্শিদের নির্দেশিত পথে তাঁর ভূমিকা ও অবদান ছিল অসাধারণ।

১৪ রজব, ২৪ মার্চ ১৩৩৯ হিজরী ১৯২১ খৃঃ বেরেলী শরীফে, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সহ শীর্ষস্থানীয় নেতারাও এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, জমিয়ত নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ছিলো তার হিন্দু, মুসলিম ঐক্যের বিরোধী ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতকে নিরুত্তর করে ছাড়বে। মাওলানা মুফ্‌তী আমজাদ আলী, জামায়াতে রেযায়ে মোস্তফা বেরেলী এর শিক্ষা বিভাগের প্রধান হিসাবে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কুফল সংক্রান্ত সত্তরটি প্রশ্ন সম্বলিত একটি স্মারক লিপি নেতৃবৃন্দ বরাবরে প্রেরণ করলেন, বারবার দাবী করা সত্ত্বেও তারা কোন সমাধান দিতে পারেননি। আবুল কালাম আজাদ বিদায়কালে বলেছিলেন, সুন্নী ওলামাদের যেসব অভিযোগ, তা বাস্তব এবং যথার্থ সঠিক। এমন ভুল কেন করা হয় যার উত্তর হতে পারে না এবং ওরাও কেন এ ধরনের পাকড়াও করার সুযোগ পাবে? (সূত্রঃ এত্‌মামে হুজ্জাতে তাম্মা (১৩৩৯ হিঃ), দাওয়ামিগুল হামির, মুদ্রিত হাসানী প্রেস, বেরেলী, পৃঃ ৪০-৪৬)

১৯ ও ২০ শাবান ১৩ ও ১৪ই অক্টোবর ১৩৫৮ হিজরী ১৯৩৯ সনে মুরাদাবাদে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেযাখান বেরেলভীর সভাপতিত্বে এক ঐতিহাসিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, 'মোতামারুল ওলামা' নামে একটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করা হয়। সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ) এ সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। এর লক্ষ্য ছিল ইসলাম বিরোধী চক্রান্তের সমূহ বিপদ থেকে মুসলমানদের জান মালের সংরক্ষণ, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ভ্রান্ত নীতির সংশোধন, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যে ও শক্তি সুসংহত করণ, ইসলাম বিরোধী অপশক্তির আক্রমণ প্রতিহতকরন, মুসলমানদেরকে ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে নির্দেশনা গ্রহণে ওলামা সমাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ, ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, সন্তান সন্ততির প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের দিক নির্দেশনা প্রদান এ সংস্থা

প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। হযরত সদ্রুশ শরীয়ত এতে গৌরবময় ভূমিকা ও খিদমত আঞ্জাম দেন।

এই সংস্থা পরবর্তীতে 'অল ইন্ডিয়া সুন্নী কনফারেন্স' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৬ সনে এপ্রিল মাসে বেনারসে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সুন্নী কনফারেন্স যেখানে কেবল দুই সহস্রাধিক ওলামা মাশায়েখ উপস্থিত ছিলেন, এ বৃহত্তম সমাবেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপরেখা ঘোষণা করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তবলী ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে একটি শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সদ্রুশ শরীয়ত আল্লামা মুফ্তী আজমাদ আলী (রহঃ)ও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি মযহাব ও মিল্লাতের সংরক্ষণ দেশ ও জাতির উন্নয়নে বহুমুখী অবদান রাখেন।

সন্তান সন্ততিঃ আল্লাহ্ তাআলা সদ্রুশ শরীয়তকে সৌভাগ্যবান সন্তান সন্ততি দানে ধন্য করেন। তিনি সকলকে দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শী করে তোলেন, তিন সন্তান সন্ততি তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। ২৫ রবিউল আউয়াল ১৩৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৪০ সনে মেঝ ছেলে মুহাম্মদ ইয়াহিয়া ইন্তেকাল করেন। ১০ই রমজানুল মোবারক ১৩৫৯ হিজরীতে মোতাবেক ১৯৪০ সনে বড় ছেলে মৌলভী হাকিম সামসুল হুদা ইন্তেকাল করেন। ৭ই শাবান ১৩৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৩৩৯ সনে তাঁর এক যুবতী কন্যা ইন্তেকাল করেন। ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ খৃঃ তাঁর চতুর্থ ছেলে আল্লামা আতাউল মোস্তফা আজমী ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর অন্য চারজন ছাহেবজাদার বড়জন বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন দারুল উলুম আমজদীয়ার (করাচী) শায়খুল হাদীস, আল্লামা আবদুল মোস্তফা আল-আজহারীও বিগত ১৬ রবিউল আউয়াল ১৮ অক্টোবর ১৪১০ হিজরী, মোতাবেক ১৯৮৯ খৃঃ ইহধাম ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা আযহারী জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তানের সুন্নী মুসলমানদের একক রাজনৈতিক সংগঠনের শীর্ষ পদে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্জাম খিদমত দেন। তিনি জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জাতীয় সাংসদ নির্বাচিত হন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে, সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি আনন্য অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লামা সদ্রুশ শরীয়তের অপর তিন জন ছাহেবজাদা বর্তমানে মযহাব ও মিল্লাতের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। যথাক্রমে, মাওলানা হাফেজ রেজাউল মোস্তফা করাচীর মেমন জামে মসজিদের খতীব। মাওলানা সানাউল মোস্তফা ও মাওলানা জিয়াউল মোস্তফা।

হজ্জে বায়তুল্লাহ ও জিয়ারতে মোস্তফায়।

সদ্রুশ শরীয়ত বেরেলী শরীফে অবস্থান কালে ১৩৩৭ হিজরীতে প্রথমবার হজ্ব ও জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

রচনাবলীঃ কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্হ, উসুল, মান্তেক, বালাগাত, দর্শন, তাসাউফ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্য ছিল অগাধ। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল, ফতোয়া প্রণয়ন ও ফিক্হ শাস্ত্রের জটিল কঠিন মাসআলার নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য সমাধানদানে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন, তিনি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা এক ডজনের অধিক।

বাহারে শরীয়তঃ বাহারে শরীয়ত গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত। কিতাবটি ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রের জগতে এক অমূল্য সম্পদ। এটাকে হানফী ফিক্হ শাস্ত্রের ইনসাইক্লোপিডিয়া তথা বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হবে না। এ পর্যন্ত এ গ্রন্থের ১৭খণ্ড প্রকাশিত হয়ে সর্বত্র সমাদৃত হয়ে আসছে।

এ কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড প্রথমে লিখা হয়েছে, পরবর্তীতে আকায়েদ সম্পর্কিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয় নিয়ে প্রথম খণ্ড লিখা হয়। এ গ্রন্থের ১ম খণ্ড থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত সবগুলো খণ্ড আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) আদ্যপান্ত শ্রবণ করেছেন, বিভিন্নস্থানে সংশোধন করেছেন এবং প্রতিটি খণ্ডে মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৩৩৪ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ খৃঃ কিতাবটির লিখার কাজ শুরু হয়। ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৪ খৃঃ রচনা কর্ম সমাপ্ত হয়। সদ্রুশ শরীয়ত কলমী জগতে দ্রুতগামী হওয়া সত্ত্বেও অধিক ব্যস্ততার কারণে বিলম্বতা সৃষ্টি হয়। গ্রন্থে মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কলেমা, নামাজ, রোজা ,হজ্ব, যাকাত, জিহাদ, বিবাহ শাদী, ব্যবসা বাণিজ্য, কাফন দাফন, জানাযা, সব বিষয়ের শরয়ী সমাধান আলোকপাত হয়েছে অত্যন্ত সুনিপুণ ও নিখুঁতভাবে।

বাহারে শরীয়তের প্রকাশিত ১৭টি খণ্ডে ফিকহ শাস্ত্রে ৩৮১টি শিরোনামের অধীনে ৯৯৯৩টি প্রায় দশ হাজার মাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে। এ দশ হাজার মাসআলা তিনি ৪৫টি প্রামান্য নির্ভরযোগ্য ফিক্হ শাস্ত্রের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতির আলোকে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞা ও দক্ষতার প্রমাণ মিলে। তিনি ৩৯৫টি কুরআনুল করীমের আয়াতের আলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম বিন্যাস করেন।

বাহারে শরীয়তে তিনি বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোনামের সাথে সম্পর্কিত ২২৩০টি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন। এ পর্যন্ত দেশ বিদেশের অসংখ্য খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও বিজ্ঞজনেরা বাহারে শরীয়তের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রচয়িতার অসাধারণ ফিকহী যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর প্রভূত দ্বীনি খিদমতের মূল্যায়ন করেছেন।

বৈশিষ্ট্যসমূহঃ বাহারে শরীয়ত গ্রন্থে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা একসাথে ফিকহ্ শাস্ত্রের অন্য কিতাবে পাওয়া যায় না। নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোকপাত হলোঃ

১. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা অতীব সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় এতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেন উপমহাদেশের মুসলমানদের মাসআলা অনুধাবনে অসুবিধা সৃষ্টি না হয়।

২. প্রতিটি অধ্যায়ে ফকিহী মাসআলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীসে রাসূল, অতঃপর মূল মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠক সমাজ পাঠ করা মাত্রই যেন বুঝতে পারে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ হচ্ছে ফিক্হে হানফীর মূল ভিত্তি। শুধু কিয়াসই ফিক্হ্ হানফীর ভিত্তি, এ প্রকার উক্তিকারী ও সমালোচকদের ভিত্তিহীন উক্তির অসারতা প্রমাণিত হবে, হানফী ফিকাহ্র প্রতি এটা তাদের জ্বলন্ত মিথ্যাচার ও জঘন্য অপবাদ বৈ কি?

৩. কুরআন ও হাদীস বর্ণনার পর ফিকহ্র আনুসাঙ্গিক আলোচনার পূর্বে অর্থপূর্ণ পারিভাষা এবং অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ফিকহ্ শাস্ত্রের কতিপয় মূলনীতির বর্ণনা আলোকপাত হয়েছে, যেন উক্ত মূলনীতির আলোকে, ভবিষ্যতে সৃষ্ট সমস্যাদির শরয়ী সমাধান বের করা যায়।

৪. ব্যাপক দলীল প্রমাণের চেয়েও মূল মাসআলা উপস্থাপনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যাতে দলীল প্রমাণের আধিক্যে পাঠক সমাজ যাতে মূল বিষয়টি হারিয়ে না ফেলে এবং মূল মাসআলা বুঝতে যেন কষ্ট না হয়।

৫. প্রতিটি মাসআলায় সঠিক, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়াটি উল্লেখ করা হয়েছে। কোন মাসআলা সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের মত বিরোধ উল্লেখ করা হয়নি, যেন জনসাধারণ সহজভাবে সর্বাধিক সঠিক ও বিশুদ্ধ মাসআলার উপর আমল করতে পারেন।

বাহারে শরীয়ত ফিক্হ্ শাস্ত্রের এক নির্ভরযোগ্য কিতাব। সর্বসাধারণ ছাত্র, শিক্ষক, আলেম সমাজ, মসজিদের সম্মানিত ইমাম ছাহেবান ও সর্বস্তরের মুসলিম নর নারীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ও উপকারী দ্বীনি গ্রন্থ।

ফাতোয়ায়ে আমজাদীয়াঃ

তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো তাঁর ফতোয়া সংকলন। এতে উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রশ্নাবলীর উত্তরমালা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে তিনি বহু যুগোপযুগী আধুনিক মাসআলা অন্তর্ভূক্ত করেছেন, গ্রন্থটি আজো অপ্রকাশিত, কিতাবটি প্রকাশিত হলে ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের জগতে নবতর অধ্যায় সংযোযিত হতো।

হাশিয়ায়ে শরহে মায়ানিউল আসারঃ আজমগড় অবস্থানকালে তিনি ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহঃ) (জন্মঃ ৩২১ হিজরী, ৯৩৩ খৃঃ) প্রণীত হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব, 'শরহে মায়ানিউল আসার' এর হাশিয়া টিকা টিপ্পনী লিখা শুরু করেন, সাত মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে ১ম অর্ধ খণ্ডের নির্ভরযোগ্য হাশিয়া গ্রন্থ রচনা করেন, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫০। (সূত্রঃ খোলাফায়ে ইমাম আহমদ রেযা, কৃতঃ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী)

ওফাতঃ মাউতুল আলিমে কামাউতিল আলম' একজন আলেমেদ্বীনের মৃত্যু যেন পৃথিবীর মৃত্যুর সমতূল্য। এ চিরন্তন বাস্তবতায় সাড়া দিয়ে এ মহান জ্ঞানসাধক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব ২রা জিলক্বদ ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৩৬৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে রাত এগার ঘটিকার সময় তাঁর মাওলায়ে হাকিকী পরম প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে চলে গেলেন, আবজাদ হিসাব মতে কুরআনুল করীমের নিম্নোক্ত আয়াত তাঁর ইন্তেকালের সন প্রমাণ করে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

অর্থঃ নিশ্চয় খোদাভীরু লোকেরা বাগান সমূহ ও ঝর্ণাসমূহে রয়েছে।

(সূরা যা-রিয়াত, পারা-২৬, আয়াত-১৫

١٣٦٧ھ - ১৩৬৭ হিজরী

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

زکوة کا بیان

যাকাতের বর্ণনা

কোরআনের আলোকে যাকাতঃ

মহান আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

অর্থঃ মুত্তাকী তারা যারা আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করেন।

আরো এরশাদ করেনঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا.

অর্থঃ তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যাতে এর মাধ্যমে তুমি সেগুলোকে পবিত্র এবং বরকতময় করতে পার। (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াতঃ ১০৩)

আরো এরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ.

অর্থঃ সফলতা অর্জন করে তারাই, যারা যাকাত আদায় করে থাকে। (সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াতঃ ৪)

আরো এরশাদ করেনঃ

مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

অর্থঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় আরো অধিক দেন, তিনি উত্তম রিযিকদাতা। (সূরা সাবা, আয়াতঃ ৪০)

আরো এরশাদ করেনঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ

كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ. وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ.

অর্থঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়, প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে, আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না। তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা, ঐ দান-খায়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। (সূরা আল-বাকারাহ্, আয়াতঃ ২৬১-২৬৪)

আরো এরশাদ করেনঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

অর্থঃ কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর, আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা জানেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ৯২-৯৩)

আরো এরশাদ করেনঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ. وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ. وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا. وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থঃ সৎ কর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর ফেরেস্তাদের উপর এবং

সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে-রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী আর তারাই পরহেজগার। (সূরা আল-বাকারা, আয়াতঃ ১৭৭)

আরো এরশাদ করেনঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে, যাতে তারা কার্পণ্য করে যে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৮০)

আরো এরশাদ করেনঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

অর্থঃ আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন, সেদিন জাহান্নামের আগুণে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তাদ্বারা তাদের ললাট পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।

এভাবে যাকাতের বিধান সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে, যদ্বারা যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হলঃ

হাদীসের আলোকে যাকাতের বর্ণনা

হাদীস-১-২ঃ সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা সাপ স্বরূপ বানানো হবে, যার চক্ষুর উপর দু'টি কালো বিন্দু থাকবে, কিয়ামতের দিন উহা তার গলায় বেড়ী স্বরূপ করা হবে, অতঃপর সাপ তার মুখের দুই দিকে কামড় দিয়ে ধরবে, তারপর বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সংরক্ষিত ধন, অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآية আয়াতটি পাঠ করলেন।

অনুরূপ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-৩ঃ ইমাম আহমদ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয়নি, কিয়ামতের দিন সে সম্পদ নেড়ে (চুলহীন) সাপ হবে, উহার মালিক উহার নিকট থেকে পলায়ন করবে, কিন্তু উহা তাকে আঘাত করতে থাকবে যতক্ষণ না তার আঙ্গুলগুলো (খাদ্যরূপে) উহার সাপের মুখে দিবে।

হাদীস-৪-৫ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, প্রত্যেক সোনা রূপার মালিক যে উহা হতে উহার হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন সমুপস্থিত হবে নিশ্চয়ই তার জন্য অনেক অনেক আগুনের পাত বানানো হবে এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তার পাজরে ললাটে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে, যখনই পৃথক করা হবে, আবার পুনরাবৃত্তি করা হবে। সেদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান, যতক্ষণ না বান্দার বিচারকার্য ফায়সালা হবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ রাস্তা ধরবে, চাই বেহেস্তের দিকে হোক বা দোযখের দিকে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উট সম্পর্কে বললেন, কোন উটের মালিক নেই যে উটের হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে, সেদিন তার একটি উটের বাচ্চাও

খোয়ানো যাবে না। সবগুলো মোটা মোটা হবে, সেগুলো তাকে ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে এবং মুখে কামড়াতে থাকবে। গরু ছাগল সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করলেন, যে গরু ছাগলের হক (যাকাত) আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তাকে সমতল মাঠের মধ্যে উপুড় করে ফেলা হবে, সবগুলোকে উপস্থিত করা হবে, একটিও নেড়ে শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না, সেগুলো তাকে শিং মারতে থাকবে এবং ক্ষুর দ্বারা পিষতে থাকবে। অনুরূপ হাদীস বোখারী ও মুসলিম শরীফে উট, গরু ও ছাগলের যাকাত না দেয়ার পরিণাম সম্পর্কে হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস-৬ঃ সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পর যখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন আরবের কিছু লোক কাফের হয়ে গেল। (অর্থাৎ যাকাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করল) ফলে খলিফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বললেন, আপনি লোকদের সাথে কিরূপে যুদ্ধ করবেন? অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন– আমাকে তখন পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (বিশ্বাস করে মুখে) বলে। যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, সে ব্যক্তি আমার কাছ হতে জান ও মাল নিরাপদ করে নিল। (তার অন্তরে কি আছে) তার হিসাব তার কাছে, তার হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর উপর সোপর্দ। আমার নহে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! যারা নামাজ ও যাকাতে পার্থক্য করে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। (অর্থাৎ নামাজ পড়তে স্বীকার করে কিন্তু যাকাত দানে অস্বীকার করে) কেননা যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চাও যাকাত হিসাবে প্রদানে অস্বীকার করে যা তারা রসূলুল্লাহ'র সময় প্রদান করত, আমি এর জন্যও তাদের সাথে যুদ্ধ করব। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের জন্য হযরত আবু বকরের (রাঃ) অন্তরকে প্রশস্ত করেছেন এবং এটাও বুঝতে পারলাম যে, তিনি সঠিক সিদ্ধান্তের উপর আছেন।

হাদীস-৭ঃ আবু দাউদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الآية

অর্থাৎ "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে...." আয়াতটি শেষ পর্যন্ত নাযিল হল, মুসলমানদের নিকট তা ভারী মনে হল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি আপনাদের চিন্তা দূর করে দিব। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী! এ আয়াত আপনার সাহাবাদের নিকট ভারী মনে হচ্ছে। একথা শুনে হুজুর বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যাকাত এজন্য ফরজ করেছেন যে, যাতে তিনি তোমাদের অবশিষ্ট মাল সম্পদকে পবিত্র করে দেন এবং মীরাস ফরজ করেছেন এজন্য যে, যেন সম্পদ তোমাদের পরবর্তীদের জন্য হয়। অর্থাৎ সাধারণভাবে সম্পদ জমা করা যদি হারাম হতো তাহলে তো যাকাত দ্বারা সম্পদ পবিত্র হতো না, বরং যাকাতবিহীন সম্পদ সঞ্চয় করা হচ্ছে হারাম। একথা শুনে হযরত ফারুকে আজম তকবীর বললেন।

হাদীস-৮ঃ ইমাম বোখারী স্বীয় তারিখে, ইমাম শাফেয়ী বাজ্জাজ ও বায়হাকী উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে মালে কখনো যাকাত মিশবে না, নিশ্চয়ই উহাকে ধ্বংস করে দিবে। কতিপয় ইমামগণ এ হাদীসের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, আদায় করেনি এবং সম্পদের সাথে মিলায়ে নিল, এটা হারাম, এটা হালালকেও ধ্বংস করবে। ইমাম আহমদ (রাঃ) এর অর্থ এরূপ বলেছেন যে, যে ধনী ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করল তার যাকাত তার মালকে ধ্বংস করবে, যাকাত তো দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য। এখানে উভয় অর্থ বিশুদ্ধ।

হাদীস-৯ঃ তিবরানী আওসাতে হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে গোত্র যাকাত আদায় করবে না, আল্লাহ তাআলা সে জাতিকে দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করবেন।

হাদীস-১০ঃ তিবরানী আওসাত-এ হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, জলে স্থলে যে সম্পদ ধ্বংস হয় তা যাকাত আদায় না করার কারণেই ধ্বংস হয়ে থাকে।

হাদীস-১১ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আহনফ বিন কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। সৈয়্যদানা আবু যর গিফারী (রাঃ) এরশাদ করেন, তাদের স্তনের উপর জাহান্নামের গরম পাথর রাখা হবে। সীনা ভেঙ্গে কাঁধ দিয়ে বের হয়ে যাবে, কাঁধের

হাড়ের উপর রাখা হবে, হাড় ভেঙ্গে সীনা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে এটাও রয়েছে যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বলতে শুনেছি, পিট ভেঙ্গে পার্শ্ব দিয়ে বের হবে এবং গ্রীবা ভেঙ্গে ললাট দিয়ে বের হবে।

হাদীস-১২ঃ তিবরানী শরীফে হযরত আমিরুল মু'মেনীন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, দরিদ্র লোকেরা কখনো উপবাসের যাতনা ভোগ করেন না, কিন্তু ধনীদের হাতেই তারা নির্যাতিত হয়। শুনো, এমন ধনীদের থেকে আল্লাহ্ কঠোর হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

হাদীস-১৩ঃ তিবরানী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে ধনীদের জন্য দরিদ্রদের পক্ষ থেকে অনিষ্ঠতা রয়েছে। দরিদ্র ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে আরজ করবে, হে আল্লাহ! তুমি তার উপর আমাদের যে হক ফরজ করেছো, সে অন্যায়ভাবে তা আমাদেরকে দেয়নি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ, আমি তোমাকে আমার নৈকট্য দান করব এবং তাকে দূরে রাখবো।

হাদীস-১৪ঃ ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি প্রথমে দোযখে যাবে, এর মধ্যে একজন হচ্ছে সেই ধনী যে স্বীয় সম্পদে আল্লাহর হক (যাকাত) আদায় করেনি।

হাদীস-১৫ঃ ইমাম আহমদ মসনদে হযরত আম্মারা বিন হাযম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আল্লাহপাক ইসলামে চারটি জিনিস ফরজ করেছেন, যে ব্যক্তি এর মধ্যে তিনটি আদায় করবে, তা তার কোন কাজে আসবে না, যতক্ষণ না চারটি যথাযথভাবে আদায় করা হয়, নামাজ, যাকাত, রমজানের রোজা, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ব।

হাদীস-১৬ঃ তিবরানী কবীরে বিশুদ্ধ সনদসূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেন নামাজ আদায় করি এবং যাকাত প্রদান করি, যে যাকাত প্রদান করবে না তার নামাজ কবুল হবে না।

হাদীস-১৭ঃ বোখারী, মুসলিম, মসনদে আহমদ, সুনান, তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকাত দেয়ার দরুন সম্পদ কমে না, আর বান্দা যখন কারো অপরাধ ক্ষমা করবে, আল্লাহ্ তাআলা মর্যাদা তাঁর বুলন্দ করবেন, আর যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী হবে, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

হাদীস-১৮ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, তাকে (পরকালে) বেহেস্তের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে। বেহেস্তের অনেকগুলো (আটটি) দরজা রয়েছে। সুতরাং যে নামাজী ছিল তাকে নামাজের দরজা হতে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ ছিল তাকে জিহাদের দরজা হতে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি দানকারী ছিল তাকে দান সদকার দরজা হতে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি রোজাদার ছিল তাকে (রাইয়্যান) তৃপ্তি নামক দরজা হতে আহ্বান করা হবে। ইহা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তিকে এসব দরজা হতে আহূত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এক দরজা হতে আহ্বান করলেই যথেষ্ট। তবে কি কেহ এ সকল দরজা হতে আহূত হবে! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, হ্যাঁ, আর আমার আশা যে, আপনি তাদের মধ্যে হবেন।

হাদীস-১৯ঃ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে খোযায়মা (রাঃ) প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হালাল রোজগার হতে একটি খেজুর সমান দান করল, আর আল্লাহ্ হালাল মাল ব্যতীত কবুল করেন না, আল্লাহ্ তাআলা তা নিজের (কুদরতী) ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর উহার মালিকের জন্য লালন পালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেহ নিজের ঘোড়ার বাচ্চা (যত্নসহকারে) লালন পালন করে থাক, যাতে ঐ দান পাহাড়ের মত বড় হয়।

হাদীস-২০-২১ঃ নাসাঈ, ইবনে মাযাহ সুনান গ্রন্থে, ইবনে খোজায়মা ও ইবনে হাব্বান স্বীয় সহীহ গ্রন্থে হাকেম সহীহ সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণণা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা খোৎবা পড়লেন এবং বললেন, শপথ ঐ মহান সত্ত্বার, যার কুদরতী হস্তে আমার প্রাণ, এভাবে তিনবার বললেন, অতঃপর মস্তক অবনত করলেন,

আমরাও মস্তক অবনত করলাম এবং ক্রন্দন শুরু করলাম। কি কারণে হুজুর শপথ করলেন আমাদের জানা ছিল না। অতঃপর হুজুর পাক মস্তক উত্তোলন করলেন এবং চেহারা মোবারকে খুশী প্রকাশ পাচ্ছিল, তখন আমাদের নিকট একথা লাল বর্ণের উটের চেয়েও প্রিয় মনে হল। হুজুর করীম এরশাদ করলেন, যে বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে, যাকাত দান করবে এবং সাত প্রকার কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে, তাঁর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে, শান্তিতে প্রবেশ করো।

হাদীস-২২ঃ ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় কর। যাকাত সম্পদকে পবিত্রকারী, তোমাকেও পবিত্র করবে। নিকটাত্মীয়দের সাথে সদাচরণ কর, মিসকীন, প্রতিবেশী ও ভিক্ষুকের হক আদায় কর।

হাদীস-২৩ঃ তিবরানী আওসাতে ও কবীরে হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যাকাত ইসলামের সেতু।

হাদীস-২৪ঃ তিবরানী আওসাতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে আমার জন্য ছয়টি জিনিসের জিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কি? এরশাদ করলেন, নামাজ, যাকাত, আমানত, লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা, পেটের পবিত্রতা, জিহ্বাকে সংযত করা।

হাদীস-২৫ঃ বাজ্জার, আলকামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী এরশাদ করেন, তোমাদের ইসলামের পূর্ণতা হলো এটা যে, তোমরা স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় কর।

হাদীস-২৬ঃ তিবরানী কবীরে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান রাখে সে যেন স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় করে। যে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান রাখে, সে যেন সত্য কথা বলে অথবা চুপ থাকে, অর্থাৎ মন্দ কথা মুখে উচ্চারণ করবে না। আর যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

হাদীস-২৭ঃ ইমাম আবু দাউদ হাসন বসরী (রাঃ) থেকে মুরসাল সূত্রে তিবরানী ও বায়হাকী এক দল সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যাকাত আদায় করে স্বীয় সম্পদকে সুদৃঢ় দূর্গে সংরক্ষিত করো, সাদকা দানের মাধ্যমে স্বীয় রোগীদের সেবা কর, অবতীর্ণ বিপদাপদ দূরীকরণার্থে দোয়া ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো।

হাদীস-২৮ঃ ইবনে খোজায়মা স্বীয় সহীহ, তিবরানী আওসাতে এবং হাকেম মুসতাদরেকে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় করল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার নিকট থেকে অনিষ্টতা দূর করে নিল।

ফিক্বহী মাসায়েল

শরীয়তে যাকাত হল, আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরীয়তের নির্ধারিত বিধানানুযায়ী নিজের মালের একাংশের স্বত্বাধিকার কোন অভাবী গরীবের প্রতি অর্পন করা। অভাবী গরীব হাশেমী বংশের লোক হতে পারবে না। হাশেমী বংশের আযাদ ক্রীতদাসও হতে পারবে না এবং এর লাভালাভ হতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যাকাত ফরজ। অস্বীকারকারী কাফির। যাকাত অনাদায়কারী ফাসিক, হত্যার যোগ্য। আদায়ে বিলম্বকারী গুনাহগার ও স্বাক্ষ্যের অনুপযোগী। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুবাহ হিসেবে দিলে যাকাত আদায় হবে না। যেমনঃ অভাবী গরীব লোককে যাকাতের নিয়তে খাবার খাওয়ানো হলে যাকাত আদায় হবে না। যেহেতু স্বত্বাধিকার অর্পণ করা পাওয়া যায়নি। আর যদি খাবার তাকে অর্পণ করা হয় সে খেয়ে থাক বা নিয়ে যাক, তাহলে আদায় হবে। অনুরূপভাবে যাকাতের নিয়তে অভাবী লোককে কাপড় দিল বা পরিধান করিয়ে দিল, আদায় হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফকীরকে যাকাতের নিয়তে বসবাসের জন্য বাসস্থান দিল, যাকাত আদায় হবে না। যেহেতু মালের কোন অংশ তাকে দেয়া হল না বরং উপকার ভোগের মালিক করা হল মাত্র। (দুররে মোখতার)।

মাসআলাঃ স্বত্বাধিকার অর্পনে এটাও আবশ্যক যে, এমন লোককে দিবে যে গ্রহণ

করতে জানবে, এমন যেন না হয় যিনি নিক্ষেপ করবে, বা প্রতারিত হবে, অন্যথায় আদায় হবে না। যেমন একেবারে ছোট ছেলে বা পাগলকে দেয়া হল, আর ছেলের যদি এতটুকু জ্ঞান না থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভাবী গরীব পিতা বা অসিয়তকারী অথবা যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে সে গ্রহণ করবে। (দুররে মোখতার, রদ্দুল মোহ্তার)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

মাসআলাঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তাবলী রয়েছে (১) মুসলমান হওয়া, কাফিরের উপর যাকাত ওয়াজিব নহে। অর্থাৎ যদি কোন কাফির মুসলমান হয় তাকে এ নির্দেশ দেয়া যাবে না যে, কুফরি থাকা অবস্থার যাকাত দিতে হবে। (ফিক্হর কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)। মাআজাল্লাহ! কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে গেল, তাকে মুসলিম থাকাবস্থায় যে যাকাত আদায় করেনি, তা তার থেকে রহিত হয়ে গেল। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কাফির দারুল হারবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) মুসলমান হল এবং ওখানে কয়েক বৎসর অবস্থান করল, অতঃপর মুসলিম রাষ্ট্রে আসল, একথা যদি তার জানা থাকে যে, ধনী মুসলমানের উপর যাকাত ওয়াজিব, তাহলে সে সময়ে তার উপর যাকাত ওয়াজিব, অন্যথায় নয়। আর যদি মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান হয় এবং কয়েক বৎসরের যাকাত আদায় করল না, তাহলে পিছনের বৎসরগুলার যাকাত ওয়াজিব হবে। যদিও বা বলে যে, যাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল না। যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্রে না জানাটা ওজর নহে। (আলমগীরি ইত্যাদি)

(২) বালেগ হওয়া (৩) বিবেকবান হওয়া। নাবালেগের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। পাগলের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি পূর্ণ বৎসর পাগল অবস্থায় থাকে, আর যদি বৎসরের প্রথম ভাগে ও শেষে ভাল হয়ে যায় যদিও বৎসরের বাকী সময় পাগল অবস্থায় থাকে তবুও ওয়াজিব। আর যদি জন্মসূত্রে পাগল হয়, অর্থাৎ পাগল অবস্থায় বালেগ হয়েছে, তাহলে তার বৎসর গণনা জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে শুরু হবে। অনুরূপ সাময়িক পাগলও যদি পাগল অবস্থায় পূর্ণ বৎসর অতিবাহিত করে তাহলে যখন ভাল হবে তখন থেকে বৎসর শুরু হবে। (জাওয়াহেরা, আলমগীরি, রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ বধিরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় যদি পুরো বছর অতিবাহিত হয়। কোন কোন সময় আরোগ্য হলে তখন যাকাত ওয়াজিব। যার

উপর সংজ্ঞাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে বা বেহুশ হয়েছে তার উপর যাকাত ওয়াজিব। যদিও বেহুশ অবস্থায় পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয়। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার)

(৪) আযাদ হওয়া, গোলামের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদিও অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মালিক তাকে ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে অথবা মাকাতিব (আর্থিক চুক্তিবদ্ধ গোলাম) বা উম্মেওয়ালাদ (সন্তান উৎপাদনকাল পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ বাঁদী) অথবা মুসতাসআ অর্থাৎ যুগ্ম গোলাম যাকে একজন অংশীদার আযাদ করেছে, যেহেতু সে ধনী নয়, এ কারণে অবশিষ্ট অংশীদাদের অংশ উপার্জন করে পূর্ণ করার হুকুম দেয়া হল, এসব গোলামকে যাকাত প্রদান করতে হবে না) (আলমগীরি ইত্যাদি)

মাসআলাঃ মালিকের অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম যা কিছু উপার্জন করেছে, তার উপার্জিত সম্পদের যাকাত তার উপরও বর্তাবে না, তার মালিকের উপরও বর্তাবে না।

যদি সম্পদ মালিককে দিয়ে দিল, তাহলে সে বৎসরগুলোর যাকাতও মালিক আদায় করবে, যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ঋণগ্রস্ত না হয়। তার উপার্জনের উপর সাধারণতঃ যাকাত ওয়াজিব নয়, উপার্জন মালিক গ্রহণের পূর্বে হোক বা পরে হোক। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মাকাতেব (আর্থিক চুক্তিবদ্ধ গোলাম) যা কিছু উপার্জন করেছে তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তার উপরও নয় তার মালিকের উপরও নয়। যদি মালিককে দিয়ে দেয় এবং বৎসর অতিক্রম করে তখন যাকাতের শর্ত মোতাবেক মালিকের উপর ওয়াজিব হবে এবং পিছনের বৎসরগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না। (রদ্দুল মোহতার)

(৫) নেসাব পরিমাণ সম্পদ তার মালকানায় হওয়া। নেসাব পরিমাণের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (তানভীর, আলমগীর)

(৬) পূর্ণভাবে মালিক হওয়া। অর্থাৎ তার নিয়ন্ত্রণে থাকা।

মাসআলাঃ যে মাল হারানো গেল, বা সমুদ্রে ডুবে গেল, বা কেউ আত্মসাৎ করলো, কিন্তু তার কাছে আত্মসাতের স্বাক্ষী নেই, বা জঙ্গলে পুতে রেখেছিল বা কোথায় পুতে রেখেছে স্মরণ নেই বা অপরিচিত লোকের নিকট আমানত রেখেছিল বা কার নিকট রাখলো তা স্মরণ নেই বা ঋণ গ্রহীতা ঋণের কথা অস্বীকার করলো এবং ওর কাছে কোন স্বাক্ষী নেই পরবর্তীতে এসব মাল পেয়েগেল, তাহলে যতদিন পর্যন্ত এ মাল হস্তগত হয়নি ততদিনের যাকাত ওয়াজিব নয়। (দুররুল

মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যদি ঋণ এমন লোককে দেয়া হয়, যে স্বীকার করছে কিন্তু আদায়ে বিলম্ব করছে বা অপারগ হয়েছে বা কাজীর দরবারে ওর দারিদ্রতার কথা প্রকাশ করছে বা কর্জ গ্রহণের কথা অস্বীকার করছে, কিন্তু ঋণদাতার কাছে স্বাক্ষী মওজুদ আছে– এমতাবস্থায় যখন মাল পাওয়া যাবে বিগত বৎসরগুলোর যাকাতও ওয়াজিব হবে। (তানভীর)

মাসআলাঃ চারণ ক্ষেত্রের প্রাণী কেউ আত্মসাৎ করলো, যদিও আত্মসাৎকারী স্বীকার করে, তবুও পাওয়া যাবার পরও সে সময়ের যাকাত ওয়াজিব হবে না। (খানিয়া)

মাসআলাঃ আত্মসাৎ কৃত বস্তুর যাকাত আত্মসাৎকারীর উপর ওয়াজিব নয়, যেহেতু সেগুলো ওর মাল নয়, বরং আত্মসাৎকারীর উপর ওয়াজিব হল যার সম্পদ তাকে ফেরত দেয়া, আত্মসাৎকারী যদি সে-মালকে নিজের মালের সাথে মিলায়ে ফেলে এবং পৃথক করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং তার সমুদয় মাল যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে সমস্ত মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ একজন অন্যজনের হাজার টাকা ছিনতাই করলো, অতঃপর অন্য ছিনতাইকারী ওর সে টাকা পুনরায় ছিনতাই করে নিয়ে খরচ করে ফেলছে এবং উভয় ছিনতাইকারীর মালিকানায় হাজার হাজার টাকা আছে, এমতাবস্থায় প্রথম ছিনতাইকারীর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, দ্বিতীয় জনের উপর নয়। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বন্ধকী জিনিসের যাকাত, বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা কারো উপর ওয়াজিব নয়। বন্ধক দাতা তো মালিকই নয় এবং বন্ধক গ্রহীতার মালিকানাও পূর্ণ নয়, যেহেতু জিনিস তার নিয়ন্ত্রণে নয় এবং বন্ধক ছেড়ে দেয়ার পর বন্ধককালীন সময়ের যাকাত ওয়াজিব নয়। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যে মাল ব্যবহারের জন্য ক্রয় করেছে এক বৎসর পর্যন্ত তা হস্তগত করেনি, তাহলে হস্তগত হওয়ার পূর্বে ক্রেতার উপর যাকাত ওয়াজিব নয় এবং হস্তগত করার পর সে বৎসরেরও যাকাত দেয়া ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

(৭) নেসাব ঋণমুক্ত হওয়া।

মাসআলাঃ নেসাবের মালিক বটে– কিন্তু ঋণ এতটুকু পরিমাণ রয়েছে যে, ঋণ পরিশোধ করার পর নেসাব পরিমাণ থাকে না, তখন যাকাত ওয়াজিব নয়। এ কর্জ বান্দার হোক যেমনঃ কর্জ, মূল্যবান স্বর্ণ, কোন বস্তুর জরিমানা বা আল্লাহর কর্জ

হোক যেমনঃ যাকাত, খিরাজ, যেমন কোন ব্যক্তি কেবল একটি নিসাবের মালিক এবং দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো, যাকাত আদায় করেনি, তাহলে কেবল প্রথম বছরের যাকাত ওয়াজিব, দ্বিতীয় বছরের নয়। কারণ প্রথম বৎসরের যাকাত ওর উপর কর্জ হিসেবে রয়ে গেল, যেটা বের করে ফেললে নেসাব পরিমাণ বাকী থাকে না, সুতরাং দ্বিতীয় বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হলো না। অনুরূপভাবে দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু তৃতীয় বৎসরের একদিন বাকী রয়ে গেল, আরো পাঁচ দিরহাম অর্জন হলো, তখনও প্রথম বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হবে। যেহেতু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের যাকাত বের করে ফেললে নিসাব পরিমাণ বাকী থাকে না, তবে যেদিনে পাঁচ দিরহাম অর্জন হয়েছে সেদিন থেকে এক বৎসর পর্যন্ত যদি নিসাব বাকী থাকে তাহলে সে বৎসর পূর্ণ হওয়াতে যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপ নিসাব পূর্ণ ছিল কিন্তু বৎসর সমাপনান্তে যাকাত দিল না, অতঃপর সম্পূর্ণ মাল নষ্ট করে দিল, অতঃপর আরো সম্পদ উপার্জন করলো, যা নিসাবের পরিমাণ ছিল, কিন্তু প্রথম বৎসরের যাকাত থেকে তার কর্জের টাকা বের করে নিলে নিসাব পরিমাণ বাকী থাকে না, সেক্ষেত্রে নতুন বৎসরের যাকাত ওয়াজিব নয়। আর প্রথম বারের মালকে ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করেনি বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, তখন তার যাকাত দিতে হবে না বিধায় তার যাকাত কর্জ নয়। এমতাবস্থায় নতুন বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ নিজে ঋণগ্রস্ত নয় বরং ঋণগ্রস্তের জিম্মাদার, জিম্মাদারীর টাকা বের করে ফেললে, নেসাব বাকী থাকে না, তখন যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন যায়েদের কাছে হাজার টাকা আছে, আমর কারো নিকট থেকে এক হাজার টাকা কর্জ নিল, যায়েদ তার জামিন হল, এমতাবস্থায় যায়েদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা যায়েদের কাছে যদিও টাকা রয়েছে, কিন্তু আমরের কর্জে আবদ্ধ। কর্জদাতার এখতিয়ার রয়েছে যে, যায়েদের কাছে তলব করতে পারে, টাকা পাওয়া না গেলে যায়েদকে আটক করার অধিকারও তার রয়েছে বিধায় যায়েদের এ টাকা কর্জে আবদ্ধ হয়ে আছে। সুতরাং যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি আমরের নিকট দশ ব্যক্তিও জামিন হয় এবং সকলের কাছে হাজার হাজার টাকাও রয়েছে, তখনও কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেহেতু কর্জদাতা যে কারো নিকট থেকে কর্জ তলব করতে পারে, আর পাওয়া না গেলে যাকে ইচ্ছে আটক করাতে পারে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যে কর্জ মেয়াদী হয়ে থাকে, বিশুদ্ধ মযহাব মতে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। (রদ্দুল মোহ্তার) সাধারণতঃ মোহরের কর্জ দাবী করা হয় না। সুতরাং স্বামীর যতই মোহরের কর্জ থাকুক না কেন যখন ওর নিকট নিসাব পরিমাণ মাল থাকে যাকাত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি) বিশেষতঃ বিলম্বে আদায়যোগ্য মোহর যেটা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, যা আদায়ের নির্দিষ্ট কোন সীমা থাকে না, তা তলব করার স্ত্রীর কোন অধিকারই নেই। যতক্ষণ না মৃত্যু হয় বা তালাক পতিত হয়।

মাসআলাঃ স্ত্রীর খরচাদি বহন করা স্বামীর উপর কর্জ হিসেবে ধার্য করা যাবে না। যতক্ষণ না কাজী নির্দেশ দিয়ে থাকে বা উভয়ে পরস্পর কোন একটি পরিমাণ নির্ধারণ না করবে। দু'টির কোনটি না হলে তখন যাকাত রহিত হয়ে যাবে। তা দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না বিধায় আত্মীয়ের খরচাদি বহন সে সময় কর্জ হবে, যখন এক মাসের কম সময় অতিবাহিত হয়। অথবা সে আত্মীয় কাজীর নির্দেশে কর্জ নিল, এ দু'টির কোনটি না হলে যাকাত রহিত হবে। তা যাকাতের প্রতিরোধক নয়। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলা ঃ কর্জ সে সময় যাকাত প্রতিরোধক হবে, যদি তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার আগের হয়ে থাকে। আর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর কর্জ হয়ে থাকে, তাহলে যাকাতের উপর কর্জের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। (অর্থাৎ যাকাত আদায় করতে হবে) (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যে কর্জ বান্দার নিকট থেকে করা হবে না তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়, অর্থাৎ সে কর্জ যাকাত প্রতিরোধক নয়। যেমনঃ মান্নত, কাফ্ফারা, সাদকা, ফিৎরা, হজ্ব কোরবানী। যদি এসবগুলোর খরচাদি নিসাব থেকে বের করে ফেলা হয় এবং নিসাব যদিও বাকী না থাকে যাকাত ওয়াজিব হবে। ওশর (একদশমাংশ) ও খিরাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য কর্জ প্রতিবন্ধক নয়। যদিও ঋণগ্রস্ত হয়; এসবগুলো, ওর উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যে কর্জ বৎসরের মাঝখানে গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ বৎসরের শুরুতে ঋণগ্রস্ত ছিল না, অতঃপর ঋণগ্রস্ত হয়ে গেল, অতঃপর বছর পূর্ণতায় কর্জ ব্যতীত নিসাবের মালিক হলো; মনে করুন, কর্জদাতা কর্জ ক্ষমা করে দিল, এখন

যেহেতু ওর জিম্মায় কর্জ নেই এবং বৎসরও পূর্ণ হয়েছে বিধায় ওয়াজিব হল এখনই যাকাত দিয়ে দেয়া, তবে তখন থেকে এক বৎসর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে তা নয়; আর বছরের শুরু হতে ঋণ গ্রস্ত ছিল, কর্জদাতা বছর সমাপনান্তে ঐ কর্জ ক্ষমা করে দিল তাহলে এখন যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরং এখন থেকেই এক বৎসর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত এবং কয়েকটি নিসাবের মালিক, প্রত্যেক প্রকার নিসাব দ্বারা কর্জ আদায় করা যায়, যেমন ওর নিকট টাকা, স্বর্ণ মুদ্রা, ব্যবসায়িক সরঞ্জাম, বিচরণের প্রাণীও রয়েছে, তখন টাকা ও স্বর্ণমুদ্রা কর্জের বিকল্প মনে করবে, অপরাপর জিনিসগুলোর যাকাত দিবে। আর যদি টাকা ও স্বর্ণমুদ্রা না থাকে এবং বিচরণশীল প্রাণীসমূহের কয়েক প্রকার নিসাব থাকে। যেমনঃ চল্লিশটি ছাগল, ত্রিশটি গাভী এবং পাঁচটি উট– তাহলে যাদ্বারা যাকাত সহজ হয় তা থেকে যাকাত দিবে, অন্যগুলো কর্জের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে। উপরোল্লেখিত অবস্থায় যদি ছাগল সমূহ বা উট সমূহের যাকাত দিতে চায় তাহলে একটি ছাগল দিতে হবে এবং গরুর যাকাতের ক্ষেত্রে এক বছরের গরুর বাছুর দিবে। প্রকাশ থাকে যে, একটি ছাগল দেয়া, একটি বাছুর দেয়ার চেয়ে সহজ বিধায় ছাগল দেয়া যাবে। আর যদি সমান হয় তখন এখতিয়ার থাকবে। যেমনঃ উট পাঁচটি এবং ছাগল চল্লিশটি উভয়টির যাকাত একটি ছাগল, তখন ওর এখতিয়ার থাকবে যে, যেটি ইচ্ছে কর্জের জন্য রাখবে, যেটার ইচ্ছা যাকাত দিবে। এসব বিবরণ সে সময়ের জন্য যখন বাদশাহর পক্ষ থেকে কোন যাকাত উসুলকারী আসে। অন্যথায় যদি নিজেই দিতে চায় তখন সর্বাবস্থায় এখতিয়ার থাকবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ একজনের উপর হাজার টাকা কর্জ আছে এবং ওর নিকট হাজার টাকা রয়েছে এবং একটি বাসস্থান ও খেদমতের গোলাম রয়েছে, যাকাত ওয়াজিব হবে না, যদিও বাসস্থান বা গোলাম দশ হাজার টাকা মূল্যের হয়। যেহেতু এসব বস্তু মৌলিক প্রয়োজনীয়। আর যদি টাকা মওজুদ থাকে কর্জের জন্য টাকা নির্ধারণ করবে, বাসস্থান ও গোলাম নয়। (আলমগীরি)

(৮) নেসাব প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া।

মাসআলাঃ মূল ব্যবহারিক সামগ্রী অর্থাৎ জীবন যাপনের জন্য মানুষের নিকট যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয়, ওসব জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমন বাসবাস করার ঘর, শীতে-গ্রীষ্মে পরিধানের কাপড়, গৃহের আসবাব সামগ্রী, বাহনের

জন্তু, খেদমতের বাঁদী গোলাম, যুদ্ধের হাতিয়ার, পেশাজীবিদের হাতিয়ার, বিদ্যান লোকদের প্রয়োজনীয় কিতাব, খাদ্যশষ্য। (হেদায়া, আলমগীরি, রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ কেহ এমন বস্তু যদি খরিদ করলো যা কোন কাজে ব্যবহার করবে। আর ঐ বস্তুর চিহ্ন যদি ঐ কাজে বিদ্যমান থাকে, যেমন চামড়া পরিষ্কার করার জন্য কেমিক্যাল সামগ্রী ও তৈল ইত্যাদি যদি এসব বস্তুর উপর বছর অতিক্রান্ত হয় যাকাত ওয়াজিব হবে। তেমনিভাবে কোন শিল্পী মূল্য নিয়ে কাপড় রঙিন করার জন্য মূল্যবান রং, জাফরান ইত্যাদি খরিদ করলে যদি তা নেসাব পরিমাণ হয় এবং বছরও অতিক্রান্ত হয় তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর এমন বস্তু সমগ্রী যার চিহ্ন অটুট থাকে না যেমন সাবান যদি তা নেসাব পরিমাণ হয় এবং বছরও অতিক্রান্ত হয়, তবুও যাকাত ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আতর বিক্রেতা আতর বিক্রির জন্য শিশি ক্রয় করেছে এগুলোর যাকাত দিতে হবে (রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ খরচ করার জন্য টাকাগুলো পয়সায় রূপান্তর করা হল, এগুলোও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। মৌলিক প্রয়োজনে খরচের জন্য টাকা রেখেছে বৎসরে যা খরচ হয়েছে তা খরচ হয়ে গেল, যা বাকী থাকে তা যদি নেসাব পরিমাণ হয়, এর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদিও এ নিয়্যতে রাখে যে আগামীতে মৌলিক প্রয়োজনে খরচ করা হবে, তাহলে বৎসর সমাপনান্তে মূল প্রয়োজনে খরচ করার প্রয়োজন পড়লে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ বিদ্যান ব্যক্তিদের জন্য কিতাবসমূহ মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তা অযোগ্য লোকের নিকট হয়, তখনও কিতাবের যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি ব্যবসার জন্য না হয়ে থাকে। পার্থক্য হল এতটুকু যে, বিদ্যান লোকের নিকট এ কিতাবগুলো ছাড়া মাল যদি নেসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে যাকাত নেয়াটা জায়েয। আর অযোগ্য লোকের জন্য নাজায়েয। যদি তাঁর কিতাবের মূল্য দুইশত দিরহামের সমপরিমাণ হয়, উপযুক্ত বিদ্যান বলতে তাকে বলা হয়, পড়তে, পড়াতে বা বিশুদ্ধ তার জন্য যার ওসব কিতাবের প্রয়োজন হয়। কিতাব বলতে ধর্মীয় কিতাবাদি, ফিক্হ তাফসীর, হাদীস যদি একটি কিতাবের কয়েকটি কপি থাকে, একের অতিরিক্ত যত কপি থাকে তা যদি দুইশত টাকা মূল্যের হয়, তখন যিনি যোগ্যতা সম্পন্ন তিনিও যাকাত নেয়া জায়েয হবে না। একই কিতাবের অতিরিক্ত কপি সে পরিমাণ মূল্যের

হোক অথবা একাধিক কিতাবের অতিরিক্ত কপির মূল্যে একত্রে সে পরিমাণ হোক। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ হাফেজের জন্য কোরআন শরীফ মূল ব্যবহারিক সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যিনি হাফেজ নন, একটির অতিরিক্ত কপি মূল প্রয়োজনের বহির্ভূত। অর্থাৎ কোরআন শরীফের হাদিয়া যদি দুইশত দিরহাম মূল্যের হয়, তাহলে যাকাত নেয়াটা জায়েয হবে না। (জাওহেরা, রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ চিকিৎসকের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। যদি তা লেখা-পড়ার প্রয়োজনে নিয়োজিত রাখে এবং দেখার প্রয়োজন হয়। নাহ, ছরফ, নক্ষত্র বিদ্যা, কাব্য ভাণ্ডার, গল্প ও উপন্যাসের গ্রন্থাবলী মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। উসুলে ফিক্হ, কালামশাস্ত্র, চরিত্র গঠনের সহায়ক গ্রন্থাবলী। যেমনঃ এহয়াউল উলুম, কিমিয়ায়ে সাদাত, ইত্যাদি গ্রন্থাবলী মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। (রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ কাফিরদের কুফরি ও বাতিল আক্বীদা সম্পন্ন লোকদের মতবাদ খণ্ডনে এবং আহ্লে সুন্নাতের সমর্থনে যেসব কিতাবাদি থাকবে তা মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে কোন আলেম যদি বাতিল আক্বীদার কিতাবাদি এজন্য রাখে যে, তা খণ্ডন করবে সেসব কিতাবাদিও মূল প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। যিনি আলেম নন তার জন্য সেসব কিতাবাদি দেখাও জায়েয নেই।

(৯) বর্দ্ধনশীল মাল হওয়াঃ অর্থাৎ বর্দ্ধনশীল প্রকৃত হোক বা বিধানগত হোক, অর্থাৎ বাড়ানোর ইচ্ছা করলে তবে বাড়াবে। অর্থাৎ ওর কাছে বা ওর প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণে হোক, প্রত্যেকটির দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, বস্তুটি যদি সৃষ্টিগত হয় যেমনঃ সোনা, চাঁদি এসব এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এর দ্বারা অন্য বস্তু ক্রয় করা যায় অথবা এজন্য সৃষ্টি নয় কিন্তু তবুও এ কাজ অর্জিত হয়, তাকে ক্রিয়াগত বা ফেলী বলা হয়। স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতীত সব বস্তু ক্রিয়াগত, ব্যবসার দ্বারা সবগুলোতে বর্ধিত হয়। স্বর্ণ রৌপ্য সাধারণভাবে যাকাত ওয়াজিব। যার নিকট নেসাব পরিমাণ রয়েছে, যদিও মাটিতে পুতে রাখে। ব্যবসা করুক বা না করুক। এছাড়া অন্য সব জিনিসের উপর যাকাত তখন ওয়াজিব হবে যখন ব্যবসার নিয়তে হবে, ব বিচরণশীল ছোট জন্তু। (ফিকাহর কিতাবসমূহ)

সারকথা হলো– তিন প্রকার মালের উপর যাকাত ওয়াজিব (১) অলংকার অর্থাৎ

সোনা, চাঁদি (২) ব্যবসায়িক সামগ্রী (৩) বিচরণকারী প্রাণী অর্থাৎ চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়া পশু। (ফিকাহর অধিকাংশ কিতাব দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ ব্যবসায়িক নিয়ত, কখনো প্রকাশ্য হয়ে থাকে, কখনো নির্দেশমূলক। প্রকাশ্য চুক্তির সময়ই ব্যবসার নিয়ত করে নিবে, চুক্তি বিক্রয় ভিত্তিক হোক বা ভাড়াভিত্তিক হোক, মূল্য টাকার ভিত্তিতে হোক বা স্বর্ণ মুদ্রার ভিত্তিতে হোক বা যে কোন সামগ্রীর দ্বারা হোক।

নির্দেশনামূলক পদ্ধতি হলো এটা যে, ব্যবসায়িক সূত্রে কোন জিনিষ ক্রয় করলো, বা বাসস্থান যা ব্যবসার জন্য, কোন কিছুর বিনিময়ে তা ভাড়া দিয়ে দিল, তাহলে এ সামগ্রী এবং ওসব ক্রয়কৃত বস্তু ব্যবসার জন্য হবে, যদিও প্রকাশ্যভাবে ব্যবসার নিয়ত করেনি, অনুরূপভাবে কারো নিকট থেকে কোন জিনিসের জন্য কর্জ নিল, তা-ও ব্যবসার জন্য হবে। যেমনঃ দু'শত দিরহামের মালিক, একমন গম ধার নিল তা যদি ব্যবসার জন্য না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। গমের দাম দু'শত দিরহামের দ্বারা বিনিময় করে নিলে, নিসাব বাকী থাকে না। আর যদি ব্যবসার জন্য হয়- তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

গমের মূল্যে দু'শত দিরহামের সাথে মিলাবে এবং পূর্ণটাই কর্জ গণ্য করবে, তাহলে দু'শত দিরহাম বাকী থাকবে, বিধায় যাকাত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ যে চুক্তিতে বিনিময়ই হয়নি, যেমনঃ দান করা, ওসিয়ত, সাদকা করা, অথবা বিনিময় হয় কিন্তু মাল দ্বারা বিনিময় হয় না, যেমনঃ কোন মেয়ে লোক মহর বাবদ কোন সম্পদ লাভ করে বা কোন পুরুষ খোলার বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে মাল লাভ করে বা কোন ক্রীতদাস হতে আযাদীর বিনিময়ে মাল লাভ করে- এ দু'প্রকার চুক্তির মাধ্যমে যদি কোন বস্তুর মালিক হয়, তাহলে ব্যবসার নিয়ত সহীহ হবে না। অর্থাৎ যদিও ব্যবসার নিয়ত করে যাকাত ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি এমন জিনিষ মিরাছ পায়, এর মধ্যেও ব্যবসার নিয়ত সহীহ্ হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মালিকের নিকট ব্যবসায়িক মাল ছিল, তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ ব্যবসার নিয়ত করল, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে বিচরণকারী পশু মিরাছী সম্পত্তি হিসেবে পাওয়া গেলে যাকাত ওয়াজিব হবে। বিচরণকারী হিসেবে রাখতে ইচ্ছা করুক বা না করুক। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ব্যবসার নিয়তের জন্য শর্ত হলো যে, চুক্তির সময়ই নিয়ত হতে হবে। যদি নির্দেশনামূলক হয়, চুক্তির পর নিয়ত করলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে রাখার জন্য কোন বস্তু নিল এবং নিয়ত করলো যে, যদি লাভ পাই- বিক্রি করে দিব, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন গোলামকে ক্রয় করলো, পরে তাকে খেদমতের জন্য ব্যবহার করার নিয়ত করলো, অতঃপর ব্যবসার নিয়ত করলো সেটা ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না বিক্রি করবে এমন জিনিসের বিনিময়ে যার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব। (আলমগিরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মণি মুক্তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদিও বা হাজার হাজার থাকে, তবে যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ জমিনের উৎপাদিত ফসলে ব্যবসায়িক নিয়ত করলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। জমিন ওশরী কৃষিজ পণ্যের হোক বা খাজনার হোক, নিজ মালিকানাধীন হোক বা ধার নেয়া হোক বা ভাড়ার ভিত্তিতে হোক, তবে জমিন যদি খাজানা ভিত্তিক ধার নেয়া বা ভাড়ার ভিত্তিতে নিল, কিন্তু ব্যবসার জন্য রাখা বীজ বপন করল, তাহলে উৎপাদিত ফসলে ব্যবসায়িক নিয়ত শুদ্ধ হবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মুদারিব মুদারাবা মাল থেকে যা কিছু ক্রয় করেছে যদিও ব্যবসার নিয়ত না থাকে, যদিও নিজে খরচ করার জন্য ক্রয় করে, এর উপর যাকাত ওয়াজিব। এমনকি মুদারাবা মাল থেকে গোলাম ক্রয় করলো, তারপর তার পরিধানের কাপড় এবং খাদ্যশষ্য ক্রয় করলো, তাহলে এসবগুলো ব্যবসার জন্যই হবে। সবগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

(১০) বছর অতিবাহিত হওয়াঃ

বছর বলতে চন্দ্র বৎসর বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চান্দ্রমাসের বার মাস। বছরের শুরুতে এবং বছরের শেষ নিসাব পূর্ণ ছিল, কিন্তু মাঝখানে নিসাব কমে গেল,তাহলে এ কম হওয়াটা কোন প্রভাব ফেলবে না। অর্থাৎ যাকাত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

যাকাত সম্পর্কে চুয়াল্লিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

মাসআলাঃ ব্যবসার মাল বা স্বর্ণ রৌপ্যকে বছরের মধ্যখানে একই জাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করে নিল। এ কারণে বছর অতিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে না। যদি বিচরণকারী পশু পরিবর্তন করে তাহলে বছর কেটে যাবে।

অর্থাৎ ঐ দিন থেকে বছর গণনা শুরু হবে যেদিন পরিবর্তন করেছে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক বছরের মধ্যখানে সে আরো কিছু একই জাতীয় মাল অর্জন করলো, তখন এ নতুন মাল পৃথক বছরে গণ্য হবে না বরং প্রথম মালের বছর সমাপ্তি এ মালের ক্ষেত্রে বছর পূর্ণতা হিসেবে গণ্য হবে, যদিও বছর পূর্ণ হওয়ার এক মিনিট পূর্বে অর্জন করেছে। চাই সে মাল তার পূর্বের মাল থেকে অর্জন হোক, বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হোক, অথবা দান হিসেবে অর্জন করুক, অথবা অন্য কোন বৈধ উপায়ে হস্তগত হোক। আর যদি মাল ভিন্ন জাতীয় হয় যেমন তার নিকট প্রথমে উট ছিল এখন ছাগল অর্জন হল, তাহলে তার জন্য নতুন বছর গণ্য হবে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ নেসাবের অধিকারী ব্যক্তি বছরের মাঝখানে কিছু মাল অর্জন করলো, তার নিকট দু'প্রকারের নেসাব রয়েছে– উভয়টির পৃথক পৃথক বছর রয়েছে, তাহলে যে মাল বছরের মাঝখানে অর্জন হল সেগুলো ওসব মালের সাথে মিলাবে সেসব মালের যাকাত প্রথমে ওয়াজিব হবে। যেমন তার নিকট এক হাজার টাকা রয়েছে এবং সায়েমা প্রাণীর মূল্যে যার যাকাত দেয়া হয়েছে, উভয়টি একত্রে মিলানো যাবে না। এখন বছরের মাঝখানে আরো এক হাজার টাকা অর্জন করল, তখন উভয়টির বছর পূর্ণতা তখনই হবে যদি প্রথমটির সাল পূর্ণতা পায়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কারো নিকট বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে, বছর সমাপনান্তে তার যাকাত দিল, তরপর তা টাকা দিয়ে বিক্রি করে দিল, তার নিকট প্রথম থেকেই নিসাব পরিমাণ টাকা ছিল, যা অর্ধ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এসব টাকা ওসব টাকার সাথে মিলাবে না। বরং এগুলোর জন্য সে সময় থেকে নতুন বছর হিসেবে শুরু করা হবে। এ বিধান তখন হবে যদি মূল্যমান জাতীয় টাকা নিসাব পরিমাণ হয়, নতুবা সর্বসম্মতিক্রমে ওসবের সাথে মিলানো যাবে। অর্থাৎ সেগুলোর যাকাত ওসব টাকার সাথে দেয়া যাবে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি সায়েমা বিচরণশীল পশু টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে বিক্রিত টাকা পূর্বের টাকার সাথে মিলায়ে নেবে– যা পূর্ব থেকে তার নিকট নেসাব পরিমাণ মওজুদ ছিল। অর্থাৎ ওসবের বছর সমাপনান্তে সেগুলোরও যাকাত দেয়া যাবে। ওসবের জন্য নতুন বছর শুরু করতে হবে না। অনুরূপ যদি পশু পশুর বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে এ পশুকে ঐ পশুর সাথে

মিলাবে যা পূর্ব থেকে তার নিকট আছে। সায়েমা পশুর যাকাত যদি দিয়ে ফেলা হয়, অতঃপর সায়েমা রাখেনি, তা বিক্রি করে দিল, তাহলে মূল্যগুলো পূর্বের মালের সাথে মিলায়ে নেবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ উট, গরু, ছাগল একটি অপরটির বিনিময়ে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিক্রি করে দিল, বিক্রির পর থেকে নতুন বছর শুরু হবে। এভাবে যদি ব্যবসার নিয়তে অন্য জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে বিক্রির পর থেকে এক বছর অতিক্রম করার পর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় অর্থাৎ উটকে উটের বিনিময়ে, গরুকে গরুর বিনিময়ে তখনও একই বিধান প্রযোজ্য। আর যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পর বিক্রি করে, তাহলে যে যাকাত ওয়াজিব হয়েছিল তাও তার জিম্মায় থাকবে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ বছরের মাঝখানে বিচরণশীল পশু বিক্রি করে দিল এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ক্রটির কারণে ক্রেতা তা ফিরায়ে দিল, তাহলে কাজী বা বিচারকের নির্দেশে যদি ফেরৎ দেয়া হয়, তখন নতুন বছর শুরু হবে না, অন্যথায় ফেরত দেয়ার পর থেকে নতুন বছর শুরু করবে। আর যদি দান করা হয় অতঃপর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ফেরত নেয়া হয়, নতুন বছর হিসেবে নেবে, কাজীর নির্দেশে ফেরত নেয়া হোক অথবা স্বেচ্ছায় নেয়া হোক। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ কারো নিকট খারাজী বা খাজনার জমি ছিল, খাজনা পরিশোধের পর বিক্রি করে দিল, তখন মূল্যগুলো মূল নেসাবের সাথে মিলায়ে নেবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কারো নিকট টাকা রয়েছে যেগুলোর যাকাত আদায় করা হয়েছে। অতঃপর এ টাকা দ্বারা বিচরণশীল প্রাণী ক্রয় করল এবং তার নিকট এ জাতীয় প্রাণী পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাহলে এগুলো পূর্বের প্রাণীর সাথে মিলাবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি কাউকে এক হাজার টাকা দান করল, বছর পূণ হওয়ার পূর্বে সে আরো এক হাজার টাকা অর্জন করল অতঃপর দানকারী ব্যক্তি তার প্রদত্ত টাকা কাজীর নির্দেশে ফিরিয়ে নিল। তখন তার উপর এ নতুন টাকার যাকাত ওয়াজিব নয়, যতক্ষণ না তা এক বছর অতিক্রম করে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কারো নিকট ব্যবসার ছাগল আছে, যার মূল্য দু'শ দিরহাম মূল্য

পরিমাণের, বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে একটি ছাগল মারা গেল, বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে ছাগলের চামড়া বের করে পরিশোধন করে নিল, চামড়া যদি নেসাবকে পূর্ণ করে যাকাত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যাকাত দেয়ার সময় অথবা যাকাতের মাল পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত শর্ত। নিয়ত অর্থ হলো, জিজ্ঞাস করা মাত্রই যেন বলতে পারে যে এটা যাকাত। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বছরব্যাপী দান খায়রাত করতেই আছে এখন নিয়ত করল যে, যা কিছু দিয়েছি তা যাকাত– যাকাত আদায় হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ এক ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করল, তাকে দেয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করেনি, কিন্তু উকিল ফকিরকে দেয়ার সময় উকিল নিযুক্তকারীর যাকাতের নিয়ত করে নিল, হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ দেয়ার সময় নিয়ত করেনি, পরে করেছে ঐ মাল যদি গ্রহীতার ফকিরের নিকট মওজুদ থাকে অর্থাৎ তার মালিকানায় থাকে, তাহলে এ নিয়ত যথেষ্ট হবে, তার নিকট না থাকলে এ নিয়ত হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যাকাত দেয়ার জন্য উকিল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করল এবং প্রতিনিধিকে যাকাতের নিয়তে মাল দিল, কিন্তু উকিল ফকিরকে দেয়ার সময় নিয়ত করেনি, আদায় হয়ে যাবে। এভাবে যাকাতের মাল জিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজা)কে দিল, সে যেন ফকিরকে দেয় এবং জিম্মীকে দেয়ার সময় নিয়ত করে থাকলে সে নিয়ত যথেষ্ট হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ উকিল বা প্রতিনিধিকে দেয়ার সময় বলেছে, নফল সাদকা বা কাফ্ফারা, কিন্তু এর পূর্বে প্রতিনিধি তা ফকিরকে দিয়ে দিল, সে যদি যাকাতের নিয়ত করে থাকে যাকাতই হবে, যদিও উকিল বা প্রতিনিধি নফল বা কাফ্ফারার নিয়তে ফকিরকে দিয়ে ফেলে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি কয়েকজন যাকাতদাতার প্রতিনিধি হল, সে সকলের যাকাত একত্র করে নিল, তখন তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। যা কিছু ফকিরদেরকে দেয়া হল তা হবে নিঃস্বার্থ দান, অর্থাৎ না মালিকের নিকট থেকে তার বিনিময় পাবে বা ফকিরদের থেকে। অবশ্য ফকিরদেরকে দেয়ার পূর্বে মালিক একত্রে মিলানোর অনুমতি দিয়ে থাকলে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। এভাবে ফকিরও যদি

যাকাত নেয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করল এবং সে মিলায়ে নিল, তাহলে ক্ষতিপূরণ তার উপর বর্তাবে না। তবে সে সময় এটা আবশ্যক যে, যদি একজন ফকিরের প্রতিনিধি হয় এবং কয়েক স্থান থেকে এতটুকু পরিমাণ যাকাত পেয়েছে, যার সমষ্টি নিসাব পরিমাণ হবে, এমতাবস্থায় যে তাকে জেনে শুনে যাকাত দিয়েছে তার যাকাত আদায় হবে না। অথবা কয়েকজন ফকিরের প্রতিনিধি হল এবং যাকাত এত পরিমাণ সংগ্রহ হয়েছে যে, প্রত্যেক জনের অংশ নিসাব পরিমাণ হবে তখন এমন প্রতিনিধিকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না। যেমনঃ তিনজন ফকিরের প্রতিনিধি হল এবং ছয়শত দিরহাম পাওয়া গেল, জনপ্রতি দু'শত দিরহাম হল যা নিসাব পরিমাণ আর যদি ছয়শত থেকে কম পায় তাহলে কারো পক্ষে নিসাব পরিমাণ হল না, আর প্রত্যেক ফকির যদি তাকে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিনিধি নিযুক্ত করল, তখন সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণে দেখবে না, বরং প্রতি একজনের যা পাওয়া গেল, তা দেখতে হবে, এমতাবস্থায় ফকিরদের অনুমতি ব্যতীত মিলানো জায়েয নেই। আর যদি মিলানো হয় তবুও যাকাত আদায় হবে এবং ফকিরদের ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি ফকিরদের প্রতিনিধি না হয়, তা দেয়া যাবে, যত নিসাবই তার নিকট একত্র হোক না কেন। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কয়েকটি ওয়াক্ফ এর মুতাওয়াল্লী হলে এক স্থানের আমদানী অন্যটির সাথে মিলানো জায়েয নেই। অনুরূপভাবে সওদাগর স্বর্ণ-পাত-মূল্যে বা বিক্রিত মাল মিশ্রিত করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে কয়েকজন ফকিরের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করল যা পাওয়া গেল, ফকিরের অনুমতি ব্যতীত মিশ্রিত করা জায়েয নেই। অনুরূপ আটা পেষণকারীর জন্য এটা জায়েয নেই যে, লোকের গমের সাথে মিলায়ে দেবে, তবে যেসব স্থানে মিলানো প্রচলিত আছে সেখানে মিলানো জায়েয আছে। এসব অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (খানিয়া)

মাসআলাঃ প্রতিনিধি নিযুক্তকারী স্পষ্টভাবে মিলানোর অনুমতি দেয়নি তবে প্রথা প্রচলিত হয়েছে যে, প্রতিনিধি মিলায়ে ফেলে, এটাকেও অনুমতি মনে করতে হবে। যদি প্রতিনিধি প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে অবগত থাকে তবে সওদাগরের জন্য মিশ্রিত করার অনুমতি নেই, যেহেতু এটা প্রচালন নেই। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ প্রতিনিধির এখতিয়ার রয়েছে যে, মালের যাকাত নিজ সন্তান ও স্ত্রীকে দিতে পারবে যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়। ছেলে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাকে দেয়ার জন্য স্বয়ং প্রতিনিধিকেও অভাবগ্রস্ত হওয়াটা জরুরী। কিন্তু নিজ সন্তান ও স্ত্রীকে তখনই

দিতে পারবে যদি প্রতিনিধি নিযুক্তকারী তাদের ব্যতীত অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য বলে না থাকলে। অন্যথায় নিজ সন্তান ও স্ত্রীকে দিতে পারবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ প্রতিনিধি নিজের জন্য গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই তবে যাকাতদাতা যদি বলে থাকে যে, যে স্থানে ইচ্ছা প্রদান করো, তাহলে নিতে পারবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যাকাতদাতা প্রতিনিধিকে হুকুম দেননি নিজেই যাকাতদাতার পক্ষ থেকে দিয়ে দিল, হবে না। যদিও পরে যাকাতদাতা অনুমতি দিয়ে থাকে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যাকাতাদাতা প্রতিনিধিকে যাকাতের টাকা দিল প্রতিনিধি তা রেখে দিল এবং নিজের টাকা জাকাতের জন্য দিলে জায়েয হবে। যদি এটা নিয়ত থাকে যে, এগুলোর বিনিময়ে মালিকের টাকা নিয়ে যাবে। আর যদি প্রথমে প্রতিনিধি যাকাতদাতার টাকা নিজে খরচ করে ফেলল, পরে নিজের টাকা যাকাতের জন্য দিল তাহলে যাকাত আদায় হবে না। বরং এটা হল প্রহসন, এতে প্রতিনিধিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ যাকাত প্রতিনিধির এখতিয়ার রয়েছে যে, মালিকের অনুমতি ব্যতীত সে অন্যকে প্রতিনিধি বানাতে পারবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি বলল, আমি যখন এ ঘরে যাব তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে একশত টাকা দান করব, অতঃপর ঘরে গেল, যাবার সময় নিয়ত করল যে, যাকাত থেকে দান করব, যাকাত থেকে দেয়া যাবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যাকাতের সম্পদ হাতে রাখল ফকিররা লুটে নিল আদায় হয়ে যাবে। হাত থেকে যদি পড়ে যায় এবং ফকিররা তুলে নিল, সে তাদেরকে চিনতে পারছে এতে সন্তুষ্ট হল মালও ক্ষতি হল না, আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আমানতদারের নিকট আমানত বিনষ্ট হয়ে গেল, সে মালিককে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য কিছু টাকা দিয়ে দিল দেয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করল, মালিক অভাবগ্রস্ত হলেও যাকাত আদায় হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মাল যাকাতের নিয়তে পৃথক করলেই দায়িত্বমুক্ত হয় না, যতক্ষণ না অভাবগ্রস্ত ফকিরদের হাতে দেয়া হয়, এমনকি মৃত্যুবরণ করলেও যাকাত রহিত হবে না। এতে উত্তরাধিকারত্ব জারী হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ বছর সমাপনান্তে পূর্ণ নিসাব দান করে দিল, যদিও যাকাতের নিয়ত করেনি, বরং নফলের নিয়ত করেছে বা কিছুই করেনি যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

সম্পূর্ণ নিসাব অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দিল। মান্নত অথবা অন্য কোন ওয়াজিব নিয়ত করল, সহীহ হবে। কিন্তু যাকাত তার দায়িত্বে থাকবে। রহিত হবে না। মালের কিছু অংশ দান করল, সে অংশটিরও যাকাত বাদ যাবে না। বরং তার দায়িত্বে থাকবে। আর যদি সম্পূর্ণ মাল নষ্ট হয়ে যায়– তাহলে সম্পূর্ণ যাকাত রহিত হবে। আর যদি আংশিক নষ্ট হয়, যতটুকু নষ্ট হয়েছে ততটুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মালের যাকাত ওয়াজিব। যদিও তা নিসাব পরিমাণ না হয়। হালাক বা নষ্ট হওয়া বলতে, নিজের কোন ক্রিয়া ছাড়াই নষ্ট হয়ে যাওয়া। যেমনঃ চুরি হয়ে গেল, বা কাউকে ঋণ বা ধার দিল সে অস্বীকার করল, কোন স্বাক্ষী নেই বা সে মারা গেল এবং পরিত্যাক্ত কোন সম্পদ রেখে যায়নি আর যদি নিজের ক্রিয়ার কারণে ধ্বংস হয় যেমনঃ খরচ করে ফেলল, বা নিক্ষেপ করল, বা ঋণী ব্যক্তিকে দান করে দিল তাহলে বিধিমতে পুনরায় যাকাত দেয়া ওয়াজিব। এক পয়সাও বাদ যাবে না। যদিও রিক্ত হস্ত হয়। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফকির বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে কর্জ দিল, সম্পূর্ণ কর্জ ক্ষমা করে দিল, যাকাত রহিত হবে। যদি আংশিক ক্ষমা করে যাকাত আংশিক রহিত হবে। এ অবস্থায় যদি নিয়ত করা হয় যে, সম্পূর্ণটা যাকাত হয়ে যাক, তাহলে হবে না। ধনীকে কর্জ দিল, কর্জ ক্ষমা করে দিল, যাকাত রহিত হবে না, বরং তার জিম্মায় থাকবে। ফকিরের নিকট কর্জ পাবে সম্পূর্ণ কর্জ ক্ষমা করে দিল এবং এটা নিয়ত করল যে, অমুকের উপর যে কর্জ রয়েছে, এটা তার যাকাত, আদায় হবে না। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কারো নিকট একজনের টাকা পাওনা আছে। ফকিরকে বলা হল যেন তার থেকে উসুল করে নেয়, যাকাতের নিয়ত করে নিল, গ্রহণের পর আদায় হয়ে যাবে। ফকিরের উপর কর্জ রয়েছে সে কর্জ মালের যাকাত হিসেবে পেতে চায় অর্থাৎ সে চায় যে, কর্জ ক্ষমা করা হোক এবং মালের যাকাত হিসেবে দেয়া হোক, এটা হতে পারে না। অবশ্য এটা হতে পারে যে, তাকে মালের যাকাত দিবে। কর্জ পরিশোধে অস্বীকার করলে হাত ধরে ছিনিয়ে নিবে। এতেও পাওয়া না গেলে, বিচারকের নিকট মুকাদ্দমা পেশ করবে বলবে যে, তার নিকট টাকা আছে আমাকে কর্জ পরিশোধ করছে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যাকাতের টাকা মৃত ব্যক্তির কাফনে দাফনে, মসজিদ নির্মাণ ও উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ এক্ষেত্রে ফকিরকে মালিক বানানো হচ্ছে না। এক্ষেত্রে খরচ করার নিয়ম হচ্ছে ফকিরকে মালিক বানিয়ে দেয়া। পরে সে যেন

ওসব কাজে খরচ করে। এতে উভয়ে ছওয়াব পাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি শত হাতে সাদকা বদল হয়, তাহলে সবাই দাতার মত ছওয়াব পাবে এবং দাতার ছওয়াবে হ্রাস পাবে না। (রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ যাকাত ঘোষণা সহকারে প্রকাশ্য দেয়া উত্তম। নফল ছদকা গোপনে দেয়া উত্তম। (আলমগীরি) যাকাত প্রকাশ্যে দেয়ার কারণ এই যে, গোপনে দিলে লোকজন অপবাদ ও মন্দ ধারণার সুযোগ পাবে, ঘোষণা সহকারে দিলে অন্যজন উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ হবে। তাকে দেখে অন্যজনও যাকাত দিতে উৎসাহিত হবে। তবে লৌকিকতা না থাকাটা জরুরী, এতে ছওয়াব বিনষ্ট হবে। বরঞ্চ তা হবে গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য।

মাসআলাঃ যাকাত দেয়ার সময় ফকীরকে যাকাত বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই, বরং যাকাতের নিয়তই যথেষ্ট। এমনকি যদি দান অথবা কর্জ বলে দেয়া হয় এবং যাকাতের নিয়ত করা হয়, আদায় হবে। (আলমগীরি)

এভাবে মান্নত, হাদিয়া, অথবা পান খাওয়ার জন্য অথবা শিশুদেরকে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য বা ঈদের জন্য বলে দিল আদায় হয়ে যাবে। অনেক অভাবী লোক যাকাতের টাকা নিতে চায় না, যাকাত শব্দ বলে দিতে চাইলে তারা নিবে না। এতে যাকাত শব্দের যেন ব্যবহার না করে।

মাসআলাঃ যাকাত আদায় করেনি, এখন অসুস্থ হয়ে পড়ল ওয়ারিশগণকে গোপনে দিয়ে দিবে। পূর্বে দেয়নি এখন দিতে চায় কিন্তু মাল নেই যদ্বারা আদায় করা যাবে, কর্জ করে যদি আদায় করতে চায় এবং কর্জ পরিশোধ করার যদি প্রবল ধারণা থাকে তাহলে কর্জ নিয়ে আদায় করাটা উত্তম। অন্যথায় নয়। যেহেতু বান্দার হক আল্লাহর হকের চেয়ে অধিক কঠোর। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ নেসাবের অধিকারী বছর সমাপ্তির পূর্বেও যাকাত দিতে পারবে, তবে শর্ত হলো, বছর সমাপ্তি পর্যন্ত নেসাবের অধিকারী হতে হবে। বছর শেষে যদি নেসাবের অধিকারী না থাকে অথবা বছরের মাঝখানে নেসাবের মাল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল, যা কিছু দিল তা হবে নফল। যে ব্যক্তি নেসাবের অধিকারী নয় সে যাকাত দিবে না। ভবিষ্যতে যদি নেসাবের অধিকারী হয়, তাহলে যা পূর্বে দিয়েছিল তা যাকাতের হিসেবে ধরা হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নেসাবের অধিকারী যদি পূর্ব থেকে কয়েক নেসাবের যাকাত দিতে চায় দিতে পারবে। বছরের শুরুতে এক নেসাবের মালিক ছিল, কিন্তু দু'তিন নেসাবের

যাকাত দিয়ে দিল বছর শেষে যত নেসাবের যাকাত দিয়েছিল তত নেসাবের মালিক হয়ে গেল এবং সব নেসাবের যাকাত আদায় হয়ে গেল, আর যদি সারা বছর এক নেসাবের মালিক রইল বছরের পর আরো অধিক মাল অর্জন করল, পরবর্তীগুলোর যাকাতের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নেসাবের অধিকারী কয়েক বছরের অগ্রিম যাকাত দিতে পারবে। (আলমগীরি) অল্প অল্প যাকাত দিতে থাকলে বছর শেষে হিসেব করবে এতে যাকাত পূর্ণ হলে ভাল, সামান্য কম হলে দ্রুত আদায় করে দিবে। আর অধিক দিয়ে দিলে আগামী বছরের সাথে মিলায়ে নিবে।

মাসআলাঃ এক হাজারের মালিক কিন্তু দু'হাজারের যাকাত দিল, নিয়ত করলো যে, বছরের মধ্যে আর এক হাজার হলে এটা সে এক হাজারের যাকাত, নতুবা আগামী বছরের হিসেবে ধরা হবে– এটা জায়েয। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পাঁচশত টাকা আছে ধারণা করে পাঁচশত টাকার যাকাত দিয়ে দিল, অতঃপর জানতে পারল যে, চারশত টাকা রয়েছে, তাহলে যা অধিক দেয়া হয়েছে তা পরবর্তী বছরের হিসেবে ধরা হবে। (খানিয়া)

মাসআলাঃ কারো নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য উভয়টি রয়েছে বছর সমাপ্তির পূর্বে একটির যাকাত দিল, তাহলে উভয়টির যাকাত হবে। অর্থাৎ বছরের মাঝখানে দু'টির একটি ধ্বংস হয়ে গেল, যদিও যেটার নিয়তে যাকাত দিয়েছিল, যেটা রয়ে গেল এটা হবে সেটার যাকাত।

যদি কারো নিকট গরু, ছাগল, উট সবগুলো নেসাব পরিমাণ রয়েছে এসব থেকে একটির যাকাত অগ্রিম দিল যেটার যাকাত দেয়া হয়েছে, সেটার যাকাত ধরা হবে। অন্যটির নয়। যদি বছরের মাঝখানে নেসাবের পরিমাণ না থাকে তাহলে তা অবশিষ্টগুলোর যাকাত হিসেবে নির্ধারণ করা যাবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বছরের মাঝখানে যে ফকিরকে যাকাত দেয়া হল, বছর শেষে সে ধনী হলে গেল বা মারা গেল বা (নাউযুবিল্লাহ) ধর্মত্যাগী হয়ে গেল, তাহলে যাকাতের উপর তার কোন প্রভাব নেই। তা আদায় হয়ে যাবে যে ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব সে যদি মারা যায়, যাকাত রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার সম্পদ থেকে যাকাত দেয়া জরুরী নয়। তবে যদি ওসিয়ত করে যায় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়ত কার্যকর হবে, আর যদি বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশগণ অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে

সম্পূর্ণ মাল থেকে যাকাত আদায় করা যাবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যাকাত দিয়েছে কি না যদি সন্দেহ হয় পুনরায় দিয়ে দিবে। (রদ্দুল মোহতার)

সাইমা পশুর যাকাতের বিবরণ

'সাইমা' (سائمہ) এমন প্রাণীকে বলা হয়– যাহা বছরের অধিকাংশ সময় মুক্তভাবে বিচরণ করে জীবন ধারণ করে, এর উদ্দেশ্য কেবল দুগ্ধ, বংশ বৃদ্ধি গোশ্ত চর্বি ইত্যাদি উৎপাদন। (তানভীর)

গৃহপালিত গবাদি পশু থাকে ঘরে, ঘাস এনে খাওয়ানো হয়, অথবা কৃষিকর্ম বা ভার বহন বা যানবাহন হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পালিত পশু যদিও বিচরণ করে আহার গ্রহণ করে তা সাইমা নহে। এসব পশুর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি মাংস খাওয়ার জন্য হয় তাও সাইমা নহে। যদিও জঙ্গলে বিচরণ করে। ব্যবসায়িক পশু মুক্তভাবে বিচরণ করলে তাও সাইমা নহে। বরং মূল্য নির্ধারণ করে তার যাকাত আদায় করতে হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ছয়মাস চারণক্ষেত্রে থাকে ছয় মাস মুক্ত বিচরণ করে থাকলে তাও সাইমা নয়। উদ্দেশ্য ছিল পশুকে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দিবে বা পশু থেকে কাজ নেবে কিন্তু তা করেনি, এমনকি বছর শেষ হয়ে গেল তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি ব্যবসার জন্য রেখেছিল এবং ছয়মাস বা ততোধিক সময় চারণক্ষেত্রে রেখেছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত সাইমা হিসেবে নিয়ত না করবে কেবল বিচরণ করলে সাইমা হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ব্যবসার জন্য ক্রয় করেছিল, অতঃপর সাইমা করে নিল তখন থেকে যাকাতের বছর শুরু হবে। ক্রয় করার সময় থেকে নয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ বছর সমাপ্তির পূর্বে সাইমা পশু কোন জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল, জিনিসটা যদি এমন জাতীয় হয় যার উপর যাকাত ওয়াজিব এবং প্রথম থেকে তার নেসাব ওর নিকট মওজুদ ছিল না, তাহলে সে সময় থেকে বছর গণনা শুরু করবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ওয়াক্ফকৃত প্রাণী এবং জেহাদের ঘোড়ার যাকাত নেই। এভাবে অন্ধ বা হাত-পা কর্তিত পশুর যাকাত নেই। অবশ্য অন্ধ পশু চারণক্ষেত্রে অবস্থান করলে

তাহলে ওয়াজিব। এভাবে যদি নেসাবে কম হয় এবং তার নিকট অন্ধ পশু আছে নেসাবের সাথে পশু মিলালে নেসাব পূর্ণ হলে তখন যাকাত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

তিন প্রকারের পশুর যাকাত ওয়াজিব, যদি তা সাইমা হয়। (১) উট (২) গরু (৩) ছাগল। এসবের নেসাব বিস্তারিত বর্ণনার পর অন্যান্য বিধান বর্ণনা করা হবে।

উটের যাকাতের বর্ণনা

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই। উটের যাকাতের বিস্তারিত বর্ণনা বোখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে– যা হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলাঃ উট পাঁচটির কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি পাঁচটি বা পাঁচটির অধিক হয় কিন্তু পঁচিশের কম হয় তখন প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি বকরী ছাগল ওয়াজিব। অর্থাৎ পাঁচটি হলে একটি বকরী, দশটি হলে দু'টি বকরী। এ হিসেবে গণ্য হবে। (রদ্দুল মোহতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যাকাতে যে বকরী দেয়া হবে তা যেন এক বছরের কম না হয়। বকরী হোক বা বকরা হোক এখতিয়ার রয়েছে। (রদ্দুল মোহতার ও অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ দু' নেসাবের মাঝখানে যা হবে তা ক্ষমাযোগ্য। অর্থাৎ এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। যেমনঃ সাতটি বা আটটি হলে সেক্ষেত্রে একটি বকরী দিতে হবে। (দুররুল মোখতার)

পঁচিশটি উট হলে একটি বিনতে মাখাদ (بنت مخاض) দিতে হবে। বিনতে মাখাদ বলা হয়– যেটা এক বছর হয়েছে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবককে। ৩৬ পর্যন্ত একই হুকুম অর্থাৎ বিনতে মাখাদ দিতে হবে।

৩৬ হতে ৪৫টি উটের যাকাত একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। বিনতে লাবুন (بنت لبون) যেটা দু' বছর হয়েছে, তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবককে বলা হয়।

৪৬ হতে ৬০টি পর্যন্ত উটের যাকাত একটি হিক্কাহ দিতে হবে। হিক্কাহ (حقہ) পূর্ণ তিন বছর অর্থাৎ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবককে বলা হয় হিক্কাহ।

৬১ হতে ৭৫টি পর্যন্ত উটের যাকাত একটি জাযআহ। (جذعہ) যেটা চার বছর

হয়েছে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী উষ্ট্রী শাবককে জাযআহ বলা হয়।

৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত উটের যাকাত দু'টি বিনতে লাবুন।

৯১ হতে ১২০টি পর্যন্ত উটের যাকাত দু'টি হিক্কাহ। এরপর একশত পয়তাল্লিশ পর্যন্ত দু'টি হিক্কাহ এবং প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি বকরী। যেমনঃ ১২৫টি হলে দু'টি হিক্কাহ ১টি বকরী। ১৩০টি হলে দু'টি হিক্কাহ দু'টি বকরী। এভাবে হিসেব চলতে থাকবে। তারপর ১৫০টি হলে তিনটি হিক্কাহ এরচেয়ে অধিক হলে তাহলে প্রথমের হিসাবানুযায়ী হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক পাঁচটিতে ১টি বকরী এবং পঁচিশটি হলে বিনতে মাখাদ, ৩৬টি হলে বিনতে লাবুন। এ পর্যন্ত একশত ছিয়াশি বরং একশত নব্বই পর্যন্ত হুকুম উপরোক্ত নিয়মে অর্থাৎ এ পর্যন্ত হলে তিনটি হিক্কাহ একটি বিনতে লাবুন অতঃপর ১৯৬ হতে ২০৪ পর্যন্ত ৪টি হিক্কাহ। পাঁচটি বিনতে লাবুন দেয়ারও এখতিয়ার আছে। দুইশত হওয়ার পর উপরোক্ত নিয়মে হবে, যে নিয়ম একশত পঞ্চাশের পর হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি উটে ১টি বকরী, পঁচিশে বিনতে মাখাদ, ছত্রিশে বিনতে লাবুন। অতঃপর ২৪৬ হতে ২৫০ পর্যন্ত পাঁচটি হিক্কাহ, এ নিয়মের ভিত্তিতে হিসেব হবে। (ফিক্বাহর সব কিতাব সমূহ)

মাসআলাঃ উটের যাকাতে যে ক্ষেত্রে এক, দুই তিন বা চার বছরের উষ্ট্রী শাবক দেয়া হবে, সেক্ষেত্রে মাদী শাবক হওয়া জরুরী। নর দিলে তা যেন মাদী শাবকের মূল্য পরিমাণ হয়, অন্যথায় নেয়া যাবে না। (দুররুল মোখতার)

গরুর যাকাতের বিবরণ

আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারমী প্রমুখ হযরত মায়াজ বিন জবল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করলেন, তখন এরশাদ করেছেন, "প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি নর বা মাদী বাচ্চা এবং প্রতি চল্লিশটির জন্য পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি নর বা মাদী বাচ্চা যাকাত হিসেবে প্রদেয় হবে। অনুরূপ হাদীস আবু দাউদ শরীফে হযরত আমিরুল মু'মেনীন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এতে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, চাষাবাদ, পরিবহণ বা পরিবারের দুধ সরবরাহ ইত্যাদি প্রয়োজনে পোষা গরুর উপর যাকাত ধার্য হবে না।

মাসআলাঃ গরু ত্রিশটির কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। গরু ত্রিশটি পূর্ণ হলে

১টি তাবী বা তাবীআহ দিতে হবে।

পূর্ণ এক বছর বয়সের নর বাচ্চাকে তাবী বলা হয়, পূর্ণ এক বছর বয়সের মাদী বাচ্চাকে তাবীআহ বলা হয়।

৪০টি গরুর যাকাত ১টি মুসিন বা মুসিন্না দিতে হবে। মুসিন বলা হয় সে নর গো-শাবককে যা দু'বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে।

মুসিন্না বলা হয় সে মাদী গো-শাবককে যা দু'বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। ৬৯টি পর্যন্ত এ হুকুম কার্যকর হবে।

৬০টি গরুর যাকাত দু'টি তাবী বা তাবীআহ। অতঃপর প্রতি ত্রিশটির জন্য ১টি তাবীআহ এবং প্রতি ৪০টির জন্য ১টি মুসিন বা মুসিন্না। যেমনঃ ৭০টি গরুর যাকাত ১টি তাবী বা তাবীআহ এবং ১টি মুসিন।

৮০টি গরুর যাকাত দু'টি মুসিন বা মুসিন্নাহ। এ নিয়মে চলবে। যেক্ষেত্রে ত্রিশ এবং চল্লিশ নেসাব হবে, সেক্ষেত্রে এখতিয়ার রয়েছে, যাকাতে তাবী দিবে বা মুসিন দিবে।

১২০টি গরুর যাকাতে এখতিয়ার আছে, চারটি তাবীআহ বা তিনটি মুসিন্নাহ দিবে। (ফিকহর কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ মহিষের যাকাত গরুর যাকাতের নিয়মে প্রদেয় হবে। যদি গরু মহিষ উভয়টি থাকে তাহলে যাকাত একত্রে দিতে পারবে। যেমনঃ বিশটি গরু এবং ১০টি মহিষ আছে তাহলে একত্রে মিলায়ে যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে।

যে পশুর সংখ্যা অধিক সেটার বাচ্চা যাকাতে দিতে হবে। অর্থাৎ গরু বেশী হলে গরুর বাচ্চা, মহিষ বেশী হলে মহিষের বাচ্চা দিয়ে যাকাত দিতে হবে। কোনটি যদি অধিক না হয় তাহলে এমন বাছুরটা নেয়া হবে যেটা মধ্যম আকৃতির। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গরু-মহিষের যাকাতে এখতিয়ার আছে, নর-মাদী উভয়টি দেয়া যাবে। গরু অধিক হলে মাদী বাচ্চা, নর অধিক হলে নর শাবক নেয়া উত্তম। (আলমগীরি)

ছাগলের যাকাতের বিবরণ

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) যখন তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামা কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ ছদকাসমূহ তাকে লিখে দিলেন, ওখানে বকরীর নেসাবের বর্ণনাও ছিল। এটাও ছিল যে, যাকাতে বৃদ্ধা বকরী, ক্রটিযুক্ত বকরী ও বকরা দেয়া যাবে না। তবে যাকাত উসুলকারী নিতে চাইলে নিতে পারবে। যাকাতের ভয়ে বিক্ষিপ্তগুলোকে একত্র করবে না, একত্রিত গুলোকে বিচ্ছিন্ন করবে না।

মাসআলাঃ চল্লিশের কম হলে ছাগলের কোন যাকাত নেই। চল্লিশ হলে একটি ছাগল। এ হুকুম একশত বিশ পর্যন্ত অর্থাৎ একশবিশ পর্যন্ত একটি ছাগল, একশ একুশে দু'টি ছাগল। দুইশত একে ৩টি ছ াগল এবং চারশতে চারটি ছাগল। অতঃপর প্রতি শতে একটি ছাগল। দু' নেসাবের মাঝখানে যা থাকে ওসবের যাকাত মাফ। (ফিকাহ্‌র কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ যাকাতে ছাগল বা ছাগী উভয়টা দেয়ার এখতিয়ার আছে। যেটা দেয়া হোক না কেন জরুরী হলো, যেন এক বছরের কম না হয়। যদি কম হয়, মূল্য হিসেবে যেন দেয়া হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ভেড়া, দুম্বা, ছাগলের অন্তর্ভুক্ত। এক প্রকার দ্বারা নেসাব পূর্ণ না হলে অন্য প্রকারের সাথে মিলায়ে একত্র করা যাবে এবং যাকাত হিসেবে ভেড়া দুম্বাও দেয়া যাবে, তবে বয়স যেন এক বছরের কম না হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ জন্তুর বংশ মায়ের দিক থেকে ধরতে হবে। তবে যদি হরিণ (পুঃ) দ্বারা বকরীর গর্ভে বাচ্চা হয় তবে তা বকরীর মধ্যে ধরা হবে। আর নেসাবে যদি একটি কম থাকে তা দিয়ে নেসাব পূর্ণ করবে। আর বক্‌রা (পুঃ) দ্বারা যদি হরিণীর গর্ভে বাচ্চা হয় তবে নিসাবে ধরা যাবে না। নীল গাভী (গভাল) ষাঁড় দ্বারা গর্ভবতী হয় তা গাভী হিসেবে ধরা হবে না। আর যদি নীল গাভী (পুঃ) দ্বারা গাভী গর্ভবতী হয় তা গরু বা গাভী হিসেবে ধরা হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যেসব পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব ওসব যেন কমপক্ষে এক বছর হয়। সবগুলো যদি এক বছরের কম বয়সের বাচুর হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব নয়। ওসবের মধ্যে একটিও যদি এক বছর বয়সের থাকে তাহলে সবগুলো ওটির অনুগামী হবে বিধায় যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন বকরীর চল্লিশটি বাচুর এক বছরের চেয়েও কম বয়সে ক্রয় করল, তাহলে ক্রয় করার সময় থেকে এক বছরে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেহেতু সে সময় নেসাবের উপযুক্ত ছিল না। বরং

ওসবের মধ্যে কোনটি যদি এক বছর বয়সের হয়ে যায় তখন থেকে বছর হিসেব করবে। এভাবে যদি কারো নিকট নেসাব পরিমাণ ছাগল ছিল, ছয়মাস অতিক্রম করার পর ওসবের চল্লিশটি বাচুর হল অতঃপর ছাগল ছিল না বাচুরগুলো ছিল তাহলে বছর সমাপ্তিতে বাচুরগুলো যেহেতু নেসাবের উপযুক্ত হয়নি বিধায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ কারো নিকট উট, গরু, ছাগল সবগুলো আছে। কিন্তু নেসাবের চেয়ে কম অথবা আংশিক, তাহলে নেসাব পূর্ণ করার জন্য সবগুলো একত্রিত করা যাবে না। এবং যাকাতও ওয়াজিব হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যাকাতে মধ্যম ধরনের পশু গ্রহণ করবে। নির্বাচন করে উৎকৃষ্টগুলো নিবে না। তবে তার নিকট সবগুলো উন্নতমানের হলে নিতে পারবে এবং এমন পশুটি নিবে না যেটাকে খাওয়ার জন্য মোটাতাজা করা হয়েছে এবং এমন মাদীকেও নিবে না যেটা স্বীয় বাচুরকে দুগ্ধ পান করায়। ছাগীও নিবে না। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যে বয়সের পশু যাকাত দেয়া ওয়াজিব ওর কাছে সে বয়সের নেই এর চেয়ে বড় থাকলে তা দিয়ে দেবে। অতিরিক্ত মূল্য ফিরিয়ে নেবে, কিন্তু যাকাত উসুলকারীর জন্য নেয়াটা ওয়াজিব নয়, যাকাত উসুলকারী যদি বড়টি নিতে না চায় যেটা ওয়াজিব হয়েছিল সেটা তলব করবে বা তার মূল্য নিবে। এক্ষেত্রে তার এখতিয়ার রয়েছে, যে ধরনের পশু ওয়াজিব হয়েছিল তা নেই এর চেয়ে কম বয়সের রয়েছে তাহলে সেটা দিয়ে দিবে। যতটুকু কম হবে ততটুকুর মূল্য দিয়ে দিবে। অথবা ওয়াজিব পশুটির মূল্য দিবে। উভয়টি করতে পারবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ঘোড়া, গাধা, খচ্চর বিচরণশীল হলে তার যাকাত নেই। তবে যদি ব্যবসার জন্য হয়, তাহলে ওসবের মূল্য নির্ধারণ করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য ফিক্‌হের কিতাব)

মাসআলাঃ দু' নেসাবের মাঝখানেরগুলো মাফ। তার যাকাত নেই অর্থাৎ বছর সমাপ্তির পর যা মাফ করা হয়েছে তা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে যাকাতে কম দেয়া যাবে না। ওয়াজিব হওয়ার পর নেসাব যদি ধ্বংস হয়ে যায় তার যাকাত রহিত হয়ে যাবে। ধ্বংস হওয়াটা মাফের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর থাকলে বাকী নেসাবের সাথে যুক্ত হবে। এভাবে চলতে থাকবে। যেমনঃ ৮০টি ছাগল ছিল, ৪০টি মারা গেল তখনও একটি বকরী ওয়াজিব হবে। চল্লিশের পর দ্বিতীয় চল্লিশটি মাফ।

চল্লিশটি উট থেকে পনেরটি মারা গেল, তাহলে একটি বিনতে মাখাদ দেয়া ওয়াজিব। চল্লিশের মধ্যে চারটি অতিরিক্ত তা বের করে নিবে। এরপর ৩৬টি নেসাব তাও যথেষ্ট নয় আরো ১১টি বের করে নিবে ২৫টি থাকবে পঁচিশটির মধ্যে একটি বিনতে মাখাদ দিতে হবে। এভাবে প্রদান করবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যাকাতে দু'টি বকরী ওয়াজিব হল একটি মোটাতাজা বকরা দিবে যেটার মূল্যে দু'টির সমান এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ বছর সমাপ্তির পর নেসাবের অধিকারী নিজে নেসাব ধ্বংস করে দিয়েছে যাকাত রহিত হবে না। যেমনঃ পশুকে ঘাস পানি দেয়নি ফলে মারা গেল। তবুও যাকাত দিতে হবে। এভাবে কারো নিকট সে কর্জ পাবে কর্জ গ্রহীতা ধনী ব্যক্তি ছিল, বছর সমাপ্তির পর কর্জদাতা কর্জ মাফ করে দিল এটা ধ্বংসের পর্যায়ভুক্ত, বিধায় যাকাত দিতে হবে। আর যদি কর্জ গ্রহীতা অপারগ বা দুর্বল হয় এবং তাকে মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে যাকাত রহিত হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ নেসাবের অধিকারী বছর সমাপ্তির পর কর্জ দিয়ে দিল বা ধার দিল, বা ব্যবসার মালকে ব্যবসার বিনিময়ে বিক্রয় করল, যাকে দেয়া হল সে অস্বীকার করে দিল, বা ওর নিকট কোন প্রমাণ নেই বা গ্রহীতা মারা গেল এবং উত্তরাধিকার রেখে যায়নি, তাহলে এটা ধ্বংস করা নয় বিধায় যাকাত রহিত হবে। আর যদি বছর সমাপ্তির পর ব্যবসার মালকে ব্যবসার মাল ভিন্ন অন্য জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করল, অর্থাৎ মালের বিনিময়ে যেটা নিল সেটার দ্বারা ব্যবসা উদ্দেশ্য নয়। যেমনঃ সেবার জন্য গোলাম বা পরিধানের জন্য কাপড় ক্রয় করল, বা সাইমা পশু সাইমা পশুর পরিবর্তে বিক্রি করল, যার হাতে বিক্রয় করল, সে অস্বীকার করল, বিক্রেতার নিকট কোন সাক্ষী নেই বা ক্রেতা মারা গেল এবং পরিত্যক্ত কোন সম্পদ রেখে যায়নি, তাহলে এটা ধ্বংস হওয়া নয় বরং ধ্বংস করা হবে বিধায় যাকাত ওয়াজিব হবে। বছর সমাপ্তির পর ব্যবসার মালকে স্ত্রীর মোহরানায় দিয়ে দিল বা স্ত্রী স্বীয় নেসাবের বিনিময়ে স্ত্রী নিজকে স্বামী থেকে মুক্ত করে নিল, তাহলে যাকাত দিতে হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কারো নিকট মুদ্রা ছিল যা এক বছর অতিক্রম করেছে কিন্তু এখনো যাকাত দেয়নি এগুলোর বিনিময়ে ব্যবসার জন্য কোন জিনিস ক্রয় করে নিল, জি

নিসগুলো ধ্বংস হয়ে গেল, তাহলে যাকাত রহিত হবে। কিন্তু যদি এতটুকু গচ্চা দিয়ে খরিদ করা হয় যে, এতটুকু লোকসান দিয়ে লোকেরা ক্রয় করছে না, তাহলে এর আসল মূল্যের চেয়ে যতটুকু অতিরিক্ত দেয়া হয়েছে ওর যাকাত রহিত হবে না। যেহেতু সেটা নিজে ধ্বংস করার মত হল। আর যদি ব্যবসার জন্য না হয় যেমনঃ সেবার জন্য গোলাম খরিদ করল গোলামটি মারা গেল, তাহলে সে টাকার যাকাত রহিত হবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইসলামী শাসক যদিও অত্যাচারী বা বিদ্রোহী হোক, সাইমা পশুর যাকাত নিয়ে নিল, বা দশমাংশ উসুল করে নিল এবং ওখানেই খরচ করে দিল, তাহলে পুনরায় নেয়ার প্রয়োজন নেই। ওখানে খরচ করেনি তাহলে পুনরায় নিতে পারবে। আর খারাজ বা খাজনা নিয়ে নিলে সাধারণতঃ পুনরায় দেয়ার প্রয়োজন নেই। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যাকাত উসুলকারীর সাইমা পশু বিক্রি করে দিল, তাহলে যাকাত উসুলকারীর এখতিয়ার রয়েছে ইচ্ছে করলে যাকাত পরিমাণ মূল্য ওর নিকট থেকে নিয়ে নেবে। এক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর ইচ্ছে করলে যে পশু ওয়াজিব হয়েছিল সেটা নেবে, ওসময় যেটা নিয়েছিল সেক্ষেত্রে বাঈ বাতিল হয়ে যাবে। যাকাত উসুলকারী ওখানে উপস্থিত ছিল না বরং এমন সময় এসেছিল যে সময় ক্রয় বিক্রয় চুক্তি থেকে উভয়ই পৃথক হয়ে পড়েছে তাহলে পশু নিতে পারবে না। যে পশু ওয়াজিব হয়েছিল সেটার মূল্য নেবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে শস্যের উপর দশমাংশ ওয়াজিব হয়েছিল তা বিক্রি করে দিল, তাহলে যাকাত উসুলকারীর এখতিয়ার থাকবে ইচ্ছে করলে বিক্রেতা হতে মূল্য নিয়ে নেবে বা ক্রেতা থেকে সে পরিমাণ শষ্য নিয়ে নেবে। এ বেচা-কেনা তার সামনে হোক বা দু'জন পৃথক হয়ে যাওয়ার পর যাকাত উসুলকারী এসে থাকুক। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ৮০টি ছাগল থাকলে একটি ছাগল যাকাত দেয়া ওয়াজিব। চল্লিশ চল্লিশ দু'টি দল করে দু'টি বকরা যাকাত নেয়া যাবে না। দুই অংশে চল্লিশটি চল্লিশটি বকরী রয়েছে দুই অংশের সবগুলো একত্র করে এক দল করে একটি বকরী যাকাত দেয়া যাবে না। বরং প্রতি দল থেকে একটি করে নিতে হবে। এভাবে একজনের নিকট ৩৯টি বকরী রয়েছে, আর একজনের নিকট চল্লিশটি রয়েছে, তাহলে ৩৯টি বকরীর মালিক থেকে কিছু নেয়া যাবে না। মূল কথা হলো,

যেগুলো একত্রে আছে সেগুলো পৃথক করা যাবে না আর পৃথকগুলোকে একত্র করা যাবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গবাদি পশু বিভিন্ন প্রকার হলে যাকাতে কোন প্রভাব পড়ে না। পশু যে প্রকারের হোক না কেন, প্রতিটির অংশ যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে উভয়টির উপর পূর্ণরূপে যাকাত ওয়াজিব। একটির অংশ নেসাব পরিমাণ অন্যটির নয় তাহলে যেটির নেসাব আছে সেটির উপর ওয়াজিব। অন্যটির উপর নয়। যেমনঃ একজনের চল্লিশটি বকরী অন্যজনের ত্রিশটি-চল্লিশটির মালিকের উপর একটি বকরী ওয়াজিব। ত্রিশটির মালিকের উপর কিছু ওয়াজিব নয়। যদি কোনটি নেসাব পরিমাণ না হয় বরং সমষ্টিগতভাবে নেসাব হলে তাহলে কারো উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ৮০টি বকরীতে ৮১ জন অংশীদার রয়েছে একজন ব্যক্তি প্রতিটি বকরীর অর্ধাংশের অংশীদার এবং প্রতি বকরীর দ্বিতীয় অংশের অংশীদার তাদের মধ্যে এক এক জন সবগুলো অংশের সমষ্টি চল্লিশের সমান, এরা সকলেই অর্ধেক অর্ধেক বকরীর অংশীদার, কারো উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ অংশীদারী গবাদি পশুর যাকাত দিলে প্রত্যেককে নিজ অংশ অনুযায়ী দিতে হবে। অংশের অতিরিক্ত দেয়া হলে সেটা শরীকদার থেকে ফিরায়ে নেবে। যেমনঃ একজনের ৪১টি বকরী আছে অন্যজনের ৮২টি, মোট ১২৩টি, দু'টি যাকাত দেয়া হল, অর্থাৎ প্রতিজন থেকে একটি করে একজন যেহেতু এক তৃতীয়াংশের অংশীদার, দ্বিতীয়জন দুই তৃতীয়াংশের, বিধায় দুই তৃতীয়াংশের মালিককে দুই তৃতীয়াংশ দিতে হবে, যার সমষ্টি এক তৃতীয়াংশ ও একটি বকরী এবং এক তৃতীয়াংশের অধিকারীকে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে। যার সমষ্টি দুই তৃতীয়াংশ এবং ওর উপর একটি বকরী ওয়াজিব বিধায় দুই তৃতীয়াংশের অধিকারী এক তৃতীয়াংশের অধিকারী থেকে তৃতীয়াংশ নেয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। সর্বমোট ৮০টি বকরী রয়েছে একজন দুই তৃতীয়াংশের মালিক, অন্যজন এক তৃতীয়াংশের যাকাতে একটি বকরী নেয়া হলে, তৃতীয়াংশের অধিকারী নিজ অংশীদার থেকে তৃতীয়াংশ বকরীর মূল্য নিয়ে যাবে। যেহেতু তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। (রদ্দুল মোহতার)

স্বর্ণ রৌপ্য ও বাণিজ্যিক মালামালের যাকাতের বিবরণ

সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আমিরুল মু'মেনীন হযরত মওলা আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ

করেছেন, ঘোড়া, ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাসের যাকাত আমি ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তোমরা রৌপ্যের যাকাত দিবে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম। আর একশত নব্বই দিরহামেও যাকাত নেই। যখন রৌপ্য দুইশত দিরহামে উপনীত হয়, তখন পাঁচ দিরহাম যাকাত দাও। আবু দাউদ শরীফের অপর একটি বর্ণনায় হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিবে। আর যতক্ষণ দুইশত দিরহাম পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর যাকাত নেই। যখন কারো নিকট পূর্ণ দুইশত দিরহাম হবে তখন উহাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে। অতঃপর যত বেশী হবে এ হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিবে।

তিরমিযী শরীফে হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট আসল, তখন তাদের দু'হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এসবের যাকাত আদায় কর? উত্তর দিল, না। তখন রাসূলুল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে আগুনের বালা পরাবেন? তারা বললেন, কখনও না। হুজুর বললেন, তাহলে তোমরা এগুলোর যাকাত প্রদান করবে।

ইমাম মালেক ও আবু দাউদ উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি স্বর্ণের বালা পরিধান করতাম, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি সেই গুপ্তধনের অন্তর্ভুক্ত, যে বিষয়ে কোরআনে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, যা যাকাতের নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তার যাকাত দেয়া হয় তা গুপ্তধন বা কন্‌জ নহে।

ইমাম আহমেদ হাসান সূত্রে আসমা বিনতে ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ও আমার খালা রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতে উপস্থিত হলাম, আমরা স্বর্ণের বালা পরিধান করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ এরশাদ করলেন, তোমরা এসবের যাকাত দিয়েছ কি? বললাম না। এরশাদ করলেন তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? তিনি তোমাদের আগুনের বালা পরিধান করাবেন, তোমরা এসবের যাকাত আদায় কর।

আবু দাউদ শরীফে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাদেরকে আদেশ করতেন যে, আমরা যা বিক্রির জন্য তৈরী করি তার যেন (সাদকা) যাকাত দেই।

স্বর্ণের নেসাবের বর্ণনা

মাসআলাঃ স্বর্ণের নেসাব হচ্ছে বিশ মিছকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা এবং রৌপ্যের নেসাব হচ্ছে দু'শ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা। অর্থাৎ তোলা বলতে প্রচলিত টাকানুযায়ী এক ভরি দশ আনা ধরা হবে। স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতে ওজনই বিবেচ্য, মূল্য ধর্তব্য নয়। যেমনঃ সাত তোলা স্বর্ণ বা এর কম ওজনের অলংকার বা পাত্র তৈরী করা হলে কারিগরী খরচ সহ দু'শ দিরহামের অধিক হয়ে যায় আজকাল সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যে রৌপ্যের নেসাবের সমতুল্য হবে। মোট কথা পরিমাপে যদি নেসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব নয়। মূল্য যা হোক না কেন, অনুরূপ স্বর্ণের যাকাত স্বর্ণ দ্বারা আর রৌপ্যের যাকাত রৌপ্য দ্বারা যদি দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে মূল্য নয়, ওজনই ধর্তব্য হবে। যদিও বা কারিগরী খরচসহ এর মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে করুন রৌপ্যের বাজার দর ভরি (তোলা) দশ আনা এবং যাকাত বাবদ এক ভরি ওজনের একটি রূপার টাকা দিল যা ষোল আনা সমতুল্য কিন্তু যাকাতের বেলায় এক ভরি তথা দশ আনাই ধরা হবে। টাকার মূল্যমাণ হিসেবে অতিরিক্ত ছয় আনার কোন হিসেব ধরা হবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ পূর্বে যা বলা হয়েছে যে, যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মূল্য ধর্তব্য নয়, এটা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোন জিনিসের যাকাত স্বজাতীয় বস্তু দ্বারা আদায় করা হয়। যদি স্বর্ণের যাকাত রৌপ্য দ্বারা রৌপ্যের যাকাত স্বর্ণ দ্বারা আদায় করা হয়, তখন মূল্যই ধর্তব্য হবে। যেমনঃ স্বর্ণের যাকাতে রৌপ্যর কোন বস্তু দেয়া হল, যার মূল্য এক স্বর্ণমুদ্রা, তাহলে এক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে, যদিও বা ওই বস্তুর রৌপ্য পনের টাকা বরাবরও না হয়। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ স্বর্ণ রৌপ্য যখন নেসাব পরিমাণ হয়, তখন এগুলোর যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। ওগুলো এমনিই হোক বা ওসবের মুদ্রা যেমনঃ রূপার টাকা বা স্বর্ণের আশরাফী ওগুলো দ্বারা কোন বস্তু প্রস্তুত করা হোক; ওগুলোর ব্যবহার জায়েয হোক, যেমন মহিলার জন্য অলংকার বা পুরুষের জন্য সাড়ে চার মাশার চেয়ে কম রূপার আংটি বা চেইন ব্যতীত সোনা রূপার বোতাম। বা ব্যবহার করা নাজায়েয হোক, যেমন রৌপ্য বা স্বর্ণের বরতন, ঘড়ি, সুরমাদানি, এসবের ব্যবহার পুরুষ ও মহিলা সবার জন্য হারাম বা পুরুষের জন্য সোনা রূপার সেলাইকৃত অলংকার বা স্বর্ণের আংটি বা সাড়ে চার মাশার চেয়ে অতিরিক্ত রূপার

আংটি বা কয়েকটি আংটি বা কয়েকটি পাথরের আংটি– মোটকথা যে রকমই হোক যাকাত ওয়াজিব। যেমনঃ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ আছে, তাহলে দু'মাশা যাকাত ওয়াজিব বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা আছে, তাহলে এক তোলা তিন মাশা ছয় রতি যাকাত ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতীত ব্যবসার কোন জিনিষ আছে, এর মূল্য যদি স্বর্ণ রৌপ্যের নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে সেটার উপরও যাকাত ওয়াজিব। অর্থাৎ ওই জিনিষের মূল্যের চল্লিশ ভাগের একাংশ। আর যদি ব্যবসার জিনিষের মূল্য নেসাব পরিমাণ না হয় কিন্তু ওর কাছে ব্যবসার জিনিষ ছাড়া স্বর্ণ রৌপ্যও আছে, তাহলে ব্যবসার জিনিষ ও স্বর্ণ রৌপ্য মূল্য মিলে যদি নেসাব পরিমাণ হয়, যাকাত ওয়াজিব। ব্যবসার জিনিষের মূল্য এমন মুদ্রা দ্বারা নির্ধারণ করবে, যেটার প্রচলন বেশী। যেমনঃ হিন্দুস্থানে চান্দির টাকা প্রচলন বেশী। ওখানে সেটা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করবে। যদি কোন স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার সমান প্রচলন থাকে, তাহলে যে কোন একটা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা যাবে। আর যদি টাকা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করলে নেসাব পরিমাণ না হয়, আশরাফী দ্বারা নিধারণ করলে নেসাব পরিমাণ হয়, অথবা আশরাফী মুদ্রা দ্বারা হয় না, টাকা দ্বারা হয়, তাহলে যেটা দ্বারা নেসাব পূর্ণ হয় সেটা দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করবে, উভয়টি দ্বারা যদি নেসাব পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু একটাতে নেসাব ছাড়াও নেসাবের এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়, তাহলে সেটা দ্বারাই মূল্য নির্ধারণ করবে যেটার হিসেবে নেসাব ছাড়া নেসাবের এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ নেসাবের অতিরিক্ত মাল আছে এবং তা যদি নেসাবের এক পঞ্চমাংশ হয় তাহলে ওটার যাকাত ওয়াজিব হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ২৪০ দিরহাম অর্থাৎ ৬৩ তোলা রৌপ্য আছে, তাহলে ছয় দিরহাম অর্থাৎ ১ তোলা ৬ মাশা ৭৫/১ রত্তি যাকাত ওয়াজিব। অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলার পর প্রতি সাড়ে দশ তোলায় ৩ মাশা ১৫/১ রত্তি বৃদ্ধি করা হবে। অনুরূপ স্বর্ণ ৯ তোলা থাকলে ২ মাশা ৫/৩ রত্তি যাকাত ওয়াজিব। অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলার পর প্রতি দেড় তোলায় ৫-৩/৩ রত্তি বৃদ্ধি করা হবে। তবে এক পঞ্চমাংশের কম হলে মাফ। অর্থাৎ স্বর্ণ ৯ তোলা থেকে যদি এক রত্তিও কম হয়, তাহলে কেবল সাড়ে সাত তোলারই ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ ২ মাশা যাকাত দিতে হবে। অনুরূপ রৌপ্য যদি ৬৩ তোলা থেকে এক রত্তিও কম হয়, যাকাত শুধু সাড়ে বায়ান্ন তোলারই দিতে হবে। অর্থাৎ ১

তোলা ৩ মাশা ৬ রত্তি ওয়াজিব হবে। অনুরূপ এক পঞ্চমাংশের পর যা অতিরিক্ত হয় তাও যদি এক পঞ্চমাংশ হয়, তাহলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে, অন্যথায় মাফ। এ নিয়মানুযায়ী জারী হবে। ব্যবসার মালেরও একই হুকুম। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্বর্ণ-রৌপ্যে যদি খাদ থাকে তবে স্বর্ণ-রৌপ্যের অংশ বেশী, তাহলে স্বর্ণ-রৌপ্য হিসেবে নির্ধারণ করবে এবং সবটার উপর যাকাত ওয়াজিব। অনুরূপ খাদ যদি স্বর্ণ-রৌপ্যের সমান হয়, তখনও যাকাত ওয়াজিব। আর যদি অধিক হয়, তখন স্বর্ণ-রৌপ্য হিসেবে ধর্তব্য হবে না। এমতাবস্থায় কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে যেমন– স্বর্ণ-রৌপ্য যদি এতটুকু পরিমাণ হয় যে, পৃথক করলে নেসাব পরিমাণ হবে। অথবা নেসাব পরিমাণ হচ্ছে না। তবে ওর নিকট আরো মাল রয়েছে ওসব মাল একত্র করলে নেসাব পরিমাণ হয়ে যাবে। অথবা তা যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয়, এসব অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব। উপরোক্ত দিক সমূহের কোনটি যদি না হয়, তাহলে এর দ্বারা যদি ব্যবসা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ব্যবসার শর্তাবলীর ভিত্তিতে ওসবকে ব্যবসার মাল হিসেবে গণ্য করবে এবং ওসবের মূল্যে যদি স্বয়ং অথবা অন্য জিনিষের সাথে মিলানোর পর নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্বর্ণ-রৌপ্য উভয়টা পরস্পর মিলায়ে নিল, স্বর্ণ বেশী হলে, স্বর্ণ হিসেবে ধরবে, উভয়টা যদি সমান হয় অথবা স্বর্ণ নেসাব পরিমাণ আছে, পৃথক বা রৌপ্যের সাথে মিলানোর পর, তখনও স্বর্ণ হিসেবে ধরবে। আর যদি রৌপ্য বেশী হয় রৌপ্য হিসেবে ধরবে। নেসাব পরিমাণ হলে রৌপ্যের হিসেব অনুযায়ী যাকাত দিবে। কিন্তু যতটুকু স্বর্ণ আছে তা যদি রৌপ্যের মূল্যের চেয়ে অধিক হয়, তাহলে সম্পূর্ণটাই স্বর্ণ হিসেবে নির্ধারণ করবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কারো কাছে স্বর্ণও আছে রৌপ্যও আছে এবং উভয়টা নেসাব পরিমাণ রয়েছে, তাহলে স্বর্ণকে রৌপ্য বা রৌপ্যকে স্বর্ণ ধার্য করে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই, বরং প্রত্যেকটির পৃথক পৃথকভাবে যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে যাকাত দাতা উভয় নেসাবের যাকাত একই বস্তু দ্বারা আদায় করার ইচ্ছা করলে আদায় করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে ফকীরের লাভের দিক বিবেচনা করে মূল্য ধার্য করা ওয়াজিব। যেমনঃ হিন্দুস্থানে মুদ্রার চেয়ে চান্দির টাকার প্রচলন বেশী, তাই স্বর্ণের মূল্য চান্দির দ্বারা নির্ধারণ করে চান্দি যাকাত দিবে।

স্বর্ণ-চান্দি উভয়টার কোনটাই নেসাব পরিমাণ নেই, তাহলে স্বর্ণের মূল্যকে চান্দির সাথে মিলাবে বা চান্দির মূল্যকে স্বর্ণের সাথে মিলাবে। একীভূত করার পর নেসাব পরিমাণ না হলে কোন যাকাত নেই। আর যদি স্বর্ণের মূল্য চান্দির সাথে একীভূত করার পর নেসাব পরিমাণ হয়ে যায় আর চান্দির মূল্য স্বর্ণের সাথে মিলালে নেসাব পরিমাণ না হয়, বা এর বিপরীত হয়, তাহলে যেটাতে নেসাব পূর্ণ হবে সেটাই করা ওয়াজিব। আর যদি উভয়টার ক্ষেত্রে নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তখন যেটা ইচ্ছা সেটা করবে। কিন্তু যদি একটির ক্ষেত্রে নেসাবের অতিরিক্ত পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পায়, তখন সেটাই গ্রহণ করা ওয়াজিব।

যেমনঃ সোয়া চব্বিশ তোলা চান্দি আছে এবং পৌনে চার তোলা স্বর্ণ আছে; যদি পৌনে চার তোলা স্বর্ণের মূল্য সোয়া চব্বিশ তোলা চান্দির মূল্যের সাথে একীভূত করা হয়। তাহলে চান্দিকে স্বর্ণ, বা স্বর্ণকে চান্দি হিসেবে ধরা যায় আর যদি পৌনে চার তোলা স্বর্ণের পরিবর্তে ৩৭ তোলা চান্দি পাওয়া যায় কিন্তু সোয়া চব্বিশ তোলা চান্দি পৌনে চার তোলা স্বর্ণ পাওয়া না যায় তাহলে স্বর্ণকে চান্দি হিসেবে ধার্য করা ওয়াজিব। কারণ এক্ষেত্রে নেসাব পূর্ণ হয়ে যায় বরং এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত হয়। অথচ অন্যক্ষেত্রে নেসাবও পূর্ণ হয় না। অনুরূপ যদি প্রত্যেক নেসাবে কিছু অতিরিক্ত হয় এবং অতিরিক্তটা নেসাবের এক পঞ্চমাংশ হয় তাহলে ওটারও যাকাত দিতে হবে। আর যদি প্রত্যেক নেসাবের এক পঞ্চমাংশের কম অতিরিক্ত থাকে তাহলে উভয়টা একীভূত করার পরও এক পঞ্চমাংশ নেসাবের সমান না হলে তাহলে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি উভয়টা মিলে নেসাব বা নেসাবের এক পঞ্চমাংশ হয়, তখন এখতিয়ার রয়েছে। তবে যদি একটাতে নেসাব পরিমাণ হয় অন্যটাতে এক পঞ্চমাংশ হয় তাহলে সেটাই গ্রহণ করবে, যেটাতে নেসাব পরিমাণ হয়ে থাকে। যদি একটাতে নেসাব বা এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে, অন্যটাতে নয়, তখন যেটাতে নেসাব পরিমাণ বা এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে সেটা করা ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ স্বর্ণ চান্দির পয়সা যদি প্রচলিত থাকে তা যদি দুইশত দিরহাম বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা চান্দি, বিশ মিসকাল বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য বরাবর থাকলে যাকাত ওয়াজিব, আর যদি অচল হয়ে যায় ব্যবসার জন্য না হয়ে থাকলে যাকাত ওয়াজিব নয়। (ফতোয়ায়ে কারীউল হেদায়া)

কাগজের টাকারও যাকাত ওয়াজিব যতদিন টাকা প্রচলিত ও চালু থাকে, এটাও পারিভাষিক মুদ্রা, এটাও পয়সার হুকুমের পর্যায়ভুক্ত।

ঋণের যাকাত প্রসঙ্গে জরুরী মাসায়েল

মাসআলাঃ যে মাল কাউকে ঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছে, তার যাকাত কার উপর ওয়াজিব এবং কখন ওয়াজিব এ বিষয়ে তিনটি পদ্ধতি আছে।

ঋণ যদি বৃহৎ হয় যেমনঃ কর্জ যেটাকে প্রচলিত অর্থে দান বলা হয় এবং ব্যবসার মালের মূল্য উদাহারণ স্বরূপ কোন মাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হল, তা কারো হাতে বাকীতে বিক্রি করল, বা ব্যবসার মালের ভাড়া যেমন, কোন জায়গা বা জমিন ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছে তা কাউকে বসবাস করতে বা কৃষি চাষ করার জন্য ভাড়া দিল, এ ভাড়া যদি ঋণ হিসেবে থেকে যায়, এটা হবে শক্তিশালী ঋণ, শক্তিশালী ঋণের যাকাত ঋণগ্রস্ত অবস্থায়ই বছর বছর প্রদান করা ওয়াজিব। তবে আদায় করা তখন ওয়াজিব হবে যদি নেসাবের এক পঞ্চমাংশ উসুল হয়ে যায়, তবে যতটুকু উসুল হবে ততটুকুর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে অর্থাৎ চল্লিশ দিরহাম আদায় হলে এক দিরহাম দেয়া ওয়াজিব। আশি দিরহাম আদায় হলে দুই দিরহাম দেয়া ওয়াজিব হবে, এ নিয়মানুসারে দেবে। দ্বিতীয় প্রকার মধ্যবর্তী ঋণ, ব্যবসার জন্য নয় এমন কোন মালের পরিবর্তে হওয়া যেমনঃ ঘরের শষ্য ফসল বা বাহনের ঘোড়া বা সেবার ক্রীতদাস, অথবা অন্য কোন মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু বিক্রি করে দিল, দাম ক্রেতার নিকট বাকী রয়েছে, এমতাবস্থায় যাকাত দেয়া তখন জরুরী হবে যদি দু'শত দিরহাম আয়ত্বে এসে যায়।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ওয়ারিশীসূত্রে পেল, যদিও ব্যবসার মালের বিনিময়ে হয়, তাহলে ওয়ারিশ দু'শত দিরহাম হস্তগত করলে এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর বছর অতিক্রম হলে, ওয়ারিশের উপর যাকাত দেয়া জরুরী। তৃতীয় প্রকার ঋণ হচ্ছে দুর্বল ঋণ, যে ঋণ মালের পরিবর্তে হয়। যেমনঃ স্ত্রীর মোহরানা, খোলা তালাকের বিনিময়, দিয়ত, চুক্তিবদ্ধ গোলামের বিনিময়, দোকান বা জায়গা ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করেনি এগুলোর ভাড়া ভাড়াটিয়ার উপর বর্তাবে। এসবগুলোর যাকাত তখন ওয়াজিব হবে, যদি নেসাব পরিমাণ আয়ত্বে আসার পর বছর অতিক্রান্ত হয়, বা ওর কাছে একই জাতীয় অন্য নেসাব যদি থাকে এবং এক বছর পূর্ণ হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব।

মাসআলাঃ বৃহৎ ঋণ বা মধ্যবর্তী ঋণ কয়েক বছর পর উসুল হলে তাহলে পূর্বের বছর সমূহের যাকাত যা তার উপর ঋণ হিসেবে ছিল তা পরবর্তী বছরের হিসাবে পূর্বে নিয়মানুসারে আদায় করবে। উদাহারণ হিসাবে বলা যায় যে, আমরের নিকট যায়েদ তিনশত দিরহাম কর্জ পাবে পাঁচ বছর পর চল্লিশ দিরহামের চেয়েও কম পরিশোধ হল, তাহলে কিছু দিতে হবে না। চল্লিশ দিরহাম উসুল হলে এক দিরহাম

দেয়া ওয়াজিব। এখন উনচল্লিশ অবশিষ্ট আছে যা নেসাবের এক পঞ্চমাংশেরও কম বিধায় বাকী বছরসমূহের যাকাত এখনো ওয়াজিব হয়নি। আর যদি তিনশত দিরহাম ঋণ দেয়া থাকে, তাহলে যতক্ষণ দু'শত দিরহাম উসুল না হবে কিছু দিতে হবে না। পাঁচ বছর পর দু'শত দিরহাম উসুল হলে, তাহলে একুশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। প্রথম বছরে পাঁচ দিরহাম দেয়া হল, আর আছে ১৯৫ দিরহাম এর মধ্যে ৩৫ দিরহাম নেসাবের এক পঞ্চমাংশেরও কম হওয়ার কারণে, এর যাকাত মাফ। আর আছে একশত ষাট। এতে চার দিরহাম যাকাত ওয়াজিব, তৃতীয় বছরে অবশিষ্ট আছে একশত একানব্বই দিরহাম– এতেও চার দিরহাম ওয়াজিব। চতুর্থ বছরে চার দিরহাম বাদ দিলে বাকী থাকবে ১৮৭ দিরহাম। এতে চার দিরহাম দিতে হবে। পঞ্চম বছরে থাকবে ১৮৩ দিরহাম। এতেও চার দিরহাম দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং সর্বমোট একুশ দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ঋণগ্রস্ত হওয়ার পূর্বের বছর নেসাব জারী ছিল, তাহলে বছরের মাঝখানে যে ঋণ কারো উপর অর্পিত হল, এ বছরকেও পূর্বে বছর থেকে যেটা জারী ছিল সেটাই ধার্য করা হবে। ঋণগ্রস্ত হওয়ার সময় থেকে নয়। ঋণগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে এ জাতীয় নেসাবের বছর চালু না থাকলে ঋণগ্রস্ত হওয়ার সময় থেকে গণ্য হবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কারো উপর বৃহৎ ঋণ বা মধ্যম পর্যায়ের ঋণ ছিল, ঋণদাতা মারা গেল মৃত্যুর সময় এ ঋণের যাকাতের ওসীয়ত করা জরুরী নয়, এ প্রকার ঋণের যাকাত আদায় করা ওয়াজিবই হয়নি। ওয়ারিশের উপর যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে যখন মৃত ব্যক্তির এক বছর অতিক্রম হবে এবং বৃহৎ ঋণে চল্লিশ দিরহাম আর মধ্যম ঋণে দু'শত দিরহাম উসুল হবে।

মাসআলাঃ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ঋণদাতা ঋণ ক্ষমা করেছিল, অথবা বছর পূর্ণতার পূর্বে যাকাতের মাল দান করে দিল, তাহলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্ত্রী মোহরের টাকা উসুল করে নিল, বছর অতিক্রম করার পর স্বামী সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিল তাহলে অর্ধেক মোহর ফিরিয়ে দিতে হবে এবং পূর্ণ মোহরের যাকাত ওয়াজিব হবে। স্বামীর জন্য মোহরের টাকা ফিরায়ে দেয়ার পর থেকে বছর ধার্য হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি একথা স্বীকার করল যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে কর্জ

পাবে এবং ওকে দিয়ে দিয়েছি অতঃপর পূর্ণ বছর অতিক্রম হওয়ার পর দু'জনই বলল যে, কর্জ ছিল না, তাহলে কারো উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। (আলমগীরি)

তবে বিশুদ্ধ কথা হলো এটাই যে, এ প্রসঙ্গ তখনই হবে, যদি তার স্মরণে ঋণের কথা থাকে। নতুবা নিছক যাকাত রহিত করার জন্য এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করলে আল্লাহর নিকট শাস্তির যোগ্য হবে।

মাসআলাঃ ব্যবসার মালে বছর অতিক্রম করার পর যে মূল্য হবে তা ধার্য করা হবে, তবে শর্ত হলো যে, বছরের শুরুতে মালের মূল্য যেন দুইশত দিরহামের কম না হয়, আর যদি বিভিন্ন প্রকারের মালসামগ্রী হয়, তাহলে মূল্যের সমষ্টি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের পরিমাণ হতে হবে (আলমগীরি) অর্থাৎ যদি ওর কাছে এ পরিমাণের মাল থাকে, ওর কাছে যদি স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্য মাল থাকলে তা স্বর্ণ-রৌপ্যের সাথে মিলাবে।

মাসআলাঃ শষ্য অথবা কোন ব্যবসার মাল বছর সমাপ্তিতে দুইশত দিরহামের ছিল। অতঃপর বাজার দর বেড়ে গেল বা কমে গেল, তাহলে ওসব মালের যাকাত দিতে চাইলে তাহলে ওদিন যতটাকা ছিল এর এক চল্লিশাংশ দেবে। আর যদি একই মূল্যের অন্য কোন জিনিষ দিতে চাইলে তাহলে বছর পূর্ণ হওয়ার দিন যেটা ছিল সেটা দিবে। বছর পূর্ণ হওয়ার দিন বস্তুটি তরল ছিল এখন শুকনা হয়ে গেল, তখনও সে মূল্য ধার্য করবে যেটা ওদিন ছিল। আর যদি বছর পূর্ণতার দিনে বস্তুটি শুকনা ছিল, তখন ভেজা হয়ে গেলে, তাহলে আজকের মূল্য ধার্য করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মাল যে স্থানের মূল্য ও সে স্থানের হওয়াটা সমীচীন। যদি জঙ্গলের মাল হয়, তাহলে নিকটস্থ আবাদী স্থানে যে মূল্য আছে সেটা ধার্য করবে (আলমগীরি) এটা এমন মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে জঙ্গলে বেচা-কেনা হয় না, আর যদি জঙ্গলে ক্রেতা যায় যেমনঃ জ্বালানী কাঠ এবং ওসব– বস্তু যা জঙ্গলে তৈরী হয়– ওসব মাল যতক্ষণ ওখানে পড়ে থাকবে ততক্ষণ ওখানের মূল্য ধার্য করবে।

মাসআলাঃ ভাড়ার ভিত্তিতে বহনের জন্য দেয়া হলে ওসব বস্তুর যাকাত নেই। অনুরূপ ভাড়ার ঘরের যাকাত নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ঘোড়ার ব্যবসায়ী ঝুল, লেগাম (মুখবন্ধনী) এবং রশি ইত্যাদি এজন্য ক্রয় করেছে যে, এসব কিছু ঘোড়া সংরক্ষণে কাজে আসবে তাহলে ওসবের

যাকাত নেই। আর যদি এজন্য ক্রয় করা হয় যে, ঘোড়ার সাথে এসবও বিক্রি করবে, তাহলে এসবের যাকাত দিতে হবে। নানরুটি প্রস্তুতকারক রুটি পাকানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ক্রয় করেছে বা রুটিতে দেয়ার জন্য লবন ক্রয় করেছে এসবের যাকাত দিতে হবে না। রুটিতে ছিটকে দেয়ার জন্য তৈল ক্রয় করেছে, তাহলে তেলের যাকাত দেয়া ওয়াজিব। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি নিজ জায়গা বছরে তিনশত দিরহাম ভাড়ার ভিত্তিতে তিন বছরের জন্য ভাড়াতে দিল, তার কাছে আর কিছু নেই, ভাড়াতে যা আসে তা সংরক্ষণ করে থাকলে আট মাস অতিক্রম করলে নেসাবের মালিক হবে। আট মাসে দুইশত দিরহাম ভাড়া এসেছে বছরের যাকাত তখন থেকেই শুরু হবে। বছর পূর্ণ হলে পাঁচশত দিরহামের যাকাত দিবে। বিশ মাসের ভাড়া পাঁচশত দিরহাম হবে। এরপর আর এক বছর অতিক্রম করল, তখন আটশত দিরহামের যাকাত দিবে। তবে প্রথম বছরের যাকাতে সাড়ে বার দিরহাম কম দেবে (আলমগীরি) বরং আটশত দিরহামে চল্লিশের কম যাকাত ওয়াজিব হবে। চল্লিশ দিরহামের কমে যাকাত নেই, বরং মাফ।

মাসআলাঃ এক ব্যক্তির কাছে মাত্র এক হাজার দিরহাম আছে আর কোন মাল নেই ওই ব্যক্তি বার্ষিক একশত দিরহাম ভাড়ার ভিত্তিতে দশ বছরের জন্য জায়গা ভাড়া নিল, সম্পূর্ণ টাকা জায়গার মালিককে দিয়ে দিল, তাহলে প্রথম বছরে নয়শত দিরহামের যাকাত দিবে। একশত টাকা ভাড়াতে চলে যাবে। দ্বিতীয় বছর আটশত দিরহামের বরং প্রথম বছরের যাকাতের সাড়ে বাইশ দিরহাম আটশত দিরহাম থেকে কমে যাবে বাকী টাকা যাকাত দিবে। অনুরূপভাবে প্রতি বছর একশত দিরহাম এবং বিগত বছরের প্রদেয় যাকাতের দিরহাম কমে যাবে বাকী দিরহামের যাকাত দেবে। জায়গার মালিকের কাছেও যদি ভাড়ার এক হাজার দিরহাম ছাড়া কিছু না থাকে দু'বছর পর্যন্ত কিছু দিতে হবে না। দু'বছর অতিক্রম করার পর দু'শত দিরহামের অধিকারী হল, তিন বছর তিনশত দিরহামের যাকাত দেবে, অনুরূপ প্রতি বছর একশত দিরহামের যাকাত বৃদ্ধি পাবে। তবে বিগত বছরের যাকাতের পরিমাণ কমে যাওয়ার পর অবশিষ্ট যাকাত ওয়াজিব হবে। উল্লেখিত পদ্ধতিতে এ প্রকারের ফল জাতীয় বৃক্ষ ভাড়া দিলে ভাড়াটিয়ার দায়িত্বে কিছু ওয়াজিব নয়। জায়গার মালিকের উপর অনুরূপ ওয়াজিব যেভাবে দিরহামের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়েছে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ দুইশত দিরহাম মূল্যের ক্রীতদাস ব্যবসার জন্য ক্রয় করল, মূল্য বিক্রেতাকে দিয়ে দিল, ক্রীতদাস যদি আয়ত্বে না আসে, এক বছর অতিক্রম করল,

এভাবে বিক্রেতার নিকট মারা গেল, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের উপর দুইশত দিরহাম করে যাকাত ওয়াজিব। ক্রীতদাস যদি দুইশত দিরহামের চেয়ে কম মূল্যের হয়ে থাকে অথচ ক্রেতা দুইশত দিরহাম দিয়ে দিল, তাহলে বিক্রেতা দুইশত দিরহামের যাকাত দিবে। ক্রেতাকে কিছু দিতে হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সেবার ক্রীতদাস এক হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করল এবং মূল্য গ্রহণ করল, বছর পূর্ণতার পর দানের ত্রুটি প্রকাশ পেল এ কারণে ফিরায়ে দিল, বিচারক ফিরায়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে বা বিক্রেতা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়ে নিল, তাহলে এক হাজার টাকা যাকাত দিতে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ টাকার বিনিময়ে খাদ্য শষ্য, কাপড় ইত্যাদি ফকিরকে দিয়ে মালিক করে দিল, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে এসব বস্তুর মূল্য যেটা বাজারে প্রচলিত যাকাত সেটা ধার্য করবে, প্রাসঙ্গিক ব্যয় বাদ দেবে। যেমন বাজার থেকে বহনকারী শ্রমিককে যা দেয়া হয়েছে বা গ্রাম থেকে আনা হয়েছে ভাড়া বা বখশিশ যা দেয়া হয়েছে তা হিসেবে আনবে না। অথবা রান্না করে দেয়া হয়েছে, রান্না করা বা জালানী কাঠের মূল্যে হিসেবে ধরবে না। বরং ওই রান্নাকৃত জিনিষের বাজার মূল্য ধার্য করবে। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

عاشر کا بیان

আশেরের বর্ণনা

মাসআলাঃ আশের এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ইসলামী শাসক কর্তৃক রাস্তায় নিযুক্ত, ব্যবসায়ীরা মালামাল নিয়ে অতিক্রমকালে তিনি ওদের থেকে যাকাত আদায় করে থাকেন, আশেরের জন্য শর্ত হলো যে, তিনি মুসলমান হবেন, স্বাধীন হবেন, হাশেমী বংশের হবেন না। চোর ডাকাত থেকে মালামাল সংরক্ষণে সক্ষম হবেন। (বাহার)

মাসআলাঃ যে পথিক বলবে যে, আমার এ মালামাল উপরন্তু যে মাল ঘরে আছে কোনটি বছর অতিক্রম করেনি, অথবা একথা বলছে যে, আমি এ মাল দ্বারা ব্যবসার নিয়ত করিনি, অথবা একথা বলছে যে, এগুলো আমার মাল নয়, আমার কাছে মুদারাবা ভিত্তিতে আমানত রয়েছে। এ শর্তে রাখা হয়েছে যে, যেন একটুকু

লাভ না হয় যা নেসাব পরিমাণ পৌছবে।

অথবা নিজেকে শ্রমিক বা চুক্তিবদ্ধ গোলাম বা মুনিবের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম বলেছে, অথবা এতটুকু বলেছে যে, এ মালে যাকাত নেই যদিও কারণ উল্লেখ না করে অথবা বলেছে যে, আমার কাছে মালের সমান কর্জ আছে অথবা এতটুকু বলেছে যে, কর্জ পরিশোধ করলে নেসাব পরিমাণ থাকবে না। অথবা বলছে যে, অন্য কোন আশেরকে যাকাত দিয়ে দিয়েছে, যাকে দেয়া হয়েছে বলা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তিনি আশের এবং এ আশের ওই আশের সম্পর্কে অবগত অথবা বলছে যে, শহরের ফকিরদেরকে যাকাত দিয়ে দিয়েছে এবং নিজ বর্ণনার প্রেক্ষিতে যদি শপথ করা হয়, তখন ওর কথা মেনে নেবে।

তার নিকট থেকে রশিদ তলব করার প্রয়োজন নেই। রশিদ কখনো জাল হয়ে থাকে, কখনো ভুলক্রমে রশিদ নেয়া হয় না, কখনো রশিদ হারিয়ে যায়, রশিদ যদি পেশ করা হয়, রশিদে যদি উসুলকারী আশেরের নাম না থাকে যার নাম যাকাতা দাতা বলেছে, তখনও শপথ করবে, শপথ করলে ওর কথা মেনে নেবে। কয়েক বছর অতিক্রম করার পর জানা গেল যে, সে মিথ্যা বলেছে। তাহলে ওর থেকে তখন যাকাত নিতে হবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যদি ওই মালের উপর বছর অতিক্রান্ত না হয়। কিন্তু ওর বাড়ীতে যে মাল রয়েছে ওই মালে বছর অতিক্রম হয়েছে, তাহলে এ মালকে ওই মালের সাথে মিলাবে, ওর কথা মানা যাবে না।

অনুরূপ যদি এমন উসুলকারী আশের'র নাম বলা হয়, যাকে সে চিনে না, অথবা বলছে যে, কোন বদ মযহাব লোককে যাকাত দিয়েছে, অথবা বলেছে যে, শহরের ফকিরকে দেয়া হয়নি, বরং শহরের বাইরে গিয়ে দেয়া হয়েছে, তাহলে ওসব অবস্থায় ওর কথা মানা যাবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ সাইমা এবং গুপ্ত সম্পদের ব্যাপারে ওর কথা মানা যাবে না, যেসব বিষয়ে মুসলমানের কথা মানা যাবে ওসব বিষয়ে জিম্মী কাফেরের কথাও মানা যাবে। কিন্তু সে যদি বলে যে, শহরে ফকিরকে দেয়া হয়েছে, তাহলে ওর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ হরবী কাফেরের কথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। যদি যা বলছে তার উপর সাক্ষী পেশ করে থাকে বা যদি ক্রীত দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বলে বা ক্রীত

দাসকে নিজ সন্তান বলে এবং ওর বয়স এতটুকু দেখাচ্ছে যে, ওটা ওর ছেলে হতে পারে, অথবা বলছে যে, আমি অন্যজনকে দিয়ে দিয়েছি এবং যার নাম বলছে সে ওখানে উপস্থিত আছে ওসব অবস্থায় হরবীর কথাও গ্রহণযোগ্য হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি দু'শত দিরহামের কম মাল নিয়ে অতিক্রম করবে আশের উসুলকারী ওর কাছ থেকে কিছু নেবে না। সে মুসলমান হোক বা জিম্মী বা হরবী হোক। ওর ঘরে আরো মাল থাকাটা জানা হোক বা না হোক। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসলমান থেকে চল্লিশাংশ নেবে, জিম্মী থেকে বিশাংশ নেবে, হরবী থেকে দশমাংশ নেবে। (তানভীর)

হরবী হতে দশমাংশ তখন নেবে যখন জানতে পারবে যে, হরবীরা মুসলমান থেকে কি পরিমাণ নিয়েছে, যতটুকু মুসলমান থেকে নিয়েছে তা যদি জানা যায় ততটুকু ওদের থেকে নেবে। কিন্তু হরবী বা বিধর্মী কাফের যদি মুসলমানের সম্পূর্ণ মাল নিয়ে ফেলে, মুসলমান কিন্তু ওর সম্পূর্ণ মাল নেবে না। বরং এতটুকু ছেড়ে দেবে যেন নিজ ঠিকানা পর্যন্ত পৌছতে পারে। হরবী বা বিধর্মী যদি মুসলমান থেকে কিছু না নিয়ে থাকে, মুসলমানও কিছু নেবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ হরবী বা বিধর্মী শিশু সন্তান এবং চুক্তিবদ্ধ মুকাতিব গোলাম থেকে কিছু নিবে না। কিন্তু মুসলমানেরা শিশু সন্তান এবং মাকাতিব গোলাম থেকে ওরা নিয়ে থাকলে তাহলে মুসলমানরাও ওদের থেকে নেবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ একবার হরবী থেকে নিয়ে থাকলে একই বছর দ্বিতীয়বার নেবে না। কিন্তু নেয়ার পর দারুল হরবে ফিরে গেলে এবং পুনরায় দারুল হরব থেকে ফিরে আসলে, তাহলে দ্বিতীয়বার নিতে হবে। (তানভীরুল আবছার)

মাসআলাঃ হরবী বা বিধর্মী ইসলামী রাষ্ট্রে আসল এবং চলে গেল, কিন্তু যাকাত উসুলকারী সংবাদ পায়নি অতঃপর দারুল হরব থেকে পুনরায় আসল, তাহলে প্রথম বারে নেবে না। আর যদি মুসলমান বা জিম্মী ব্যক্তির আসা-যাওয়ার সংবাদ পাওয়া না যায়, তখন দ্বিতীয়বার এসেছে, তাহলে প্রথমবারেরটা নিয়ে নেবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের সাথে মালিকও আছে ওর এত কর্জ নেই যে, যা ওর সত্ব ও মালকে অন্তর্ভুক্ত করবে, তাহলে উসুলকারী ওর থেকে যাকাত

নেবে।(দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ আশের উসুলকারীর কাছ দিয়ে এমন জিনিষ নিয়ে অতিক্রম করল, যা দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যাবে, যেমন ফল, তরকারী, তরমুজ, খরবুজা, দুধ ইত্যাদি যদিও ওসব কিছুর মূল্য নেসাব পরিমাণ হয় কিন্তু ওশর বা দশমাংশ নেবে না। তবে ওখানে যদি ফকির থাকে, তাহলে নিয়ে ফকিরকে বন্টন করে দেবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ আশের উসুলকারী মাল বেশী মনে করে যাকাত নিল, অতঃপর অবগত হল যে, মাল ততটুকু ছিল না, তাহলে যতটুকু বেশী নেয়া হয়েছে, পরবর্তী বছরের হিসেবে ধরা হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত অধিক দেয়া হয়, তা যাকাতে হিসেব হবে না। এটা জুলুম হবে। (খানিয়া)

খনি ও গুপ্তধনের বর্ণনা

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, রেকাযে (গুপ্তধন) এক পঞ্চমাংশে রয়েছে।

মাসআলাঃ খনি হতে প্রাপ্ত লোহা, শীশা, তামা, পিতল, সোনা, চান্দিতে, খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ দিতে হবে। অবশিষ্টগুলো যিনি পেয়েছেন তিনি অধিকারী হবেন। যিনি পেয়েছেন তিনি স্বাধীন হোক, ক্রীতদাস হোক, মুসলমান হোক, জিম্মী হোক, পুরুষ হোক, মহিলা হোক, প্রাপ্ত বয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক। যে জমিতে পাওয়া গেছে তা ওশরী জমি হোক বা খারাজী হোক (আলমগীরি)। এটা তখন প্রযোজ্য হবে যদি জমি কারো মালিকানা ভুক্ত না হয়। যেমনঃ জঙ্গল বা পাহাড়। আর যদি জমি মালিকানাধীন হয়, সমুদয় জমিনের মালিককে দেবে, তখন খুমুস বা এক পঞ্চমাংশও নেবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফিরোজা (নীল সবুজ দামী পাথর) ইয়াকুত (পদ্মরাগমণি চুনি) যমুররদ (মূল্যবান সবুজ পাথর) অন্যান্য মুক্তা, সুরমা, ফিটকিরি চুনা, মুক্তা, লবন ইত্যাদি ভাসমান খুমুস বস্তুতে বা এক পঞ্চমাংশ যাকাত নেই। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ বাড়ীতে বা দোকানে খনি পাওয়া গেলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নেবে না, বরং সম্পূর্ণ মালিককে দেবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ফিরোজা পাথর ইয়াকুত পাতর যুমরদ পাথর ইত্যাদি মণিমুক্তা

ইসলামী রাজত্বের পূর্ব থেকে পুতিয়া রেখেছিল, পরে পাওয়া গেল, তাহলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নিতে হবে। এটা হবে গণীমতের মাল। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুক্তা এবং এছাড়া আরো যতকিছু সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়, যদিও স্বর্ণ হয় পানির তলদেশে ছিল তাহলে যিনি পেয়েছেন তিনিই মালিক হবেন। তবে শর্ত হলো, স্বর্ণে যদি কোন ইসলামী নিদর্শন না থাকে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে গুপ্তধনে ইসলামী নিদর্শন পাওয়া যায়, তা মুক্তা হোক বা হাতিয়ার হোক বা গৃহস্থালীর সামগ্রী হোক এসবগুলো পরিত্যক্ত মালের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মসজিদে, বাজারে সর্বত্র এতদিন পর্যন্ত প্রচার করতে থাকবে, যাতে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এর অনুসন্ধানকারী পাওয়া যাবে না। অতঃপর মিসকীনদেরকে দিয়ে দেবে। নিজে যদি দরিদ্র হয়, নিজে ব্যয় করতে পারবে। আর যদি এতে কুফরীর নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমনঃ প্রতীমার ছবি বা কাফের বাদশাহর নাম এর উপর লিখিত আছে এর থেকে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নিতে হবে। অবশিষ্ট পাওনাদারকে দিবে, নিজের জমি থেকে প্রাপ্ত হোক বা অন্যজনের জমিন থেকে হোক বা মালিকানাবিহীন জমি থেকে হোক। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ হরবী কাফের গুপ্তধন প্রকাশ করেছে, তখন ওকে কিছু দেয়া যাবে না। যা কিছু সে নিয়েছে তা ফেরৎ নিতে হবে। তবে যদি ইসলামী শাসকের নির্দেশে খনন করে থাকে, তাহলে যা বাঁকা তা দেবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ দু'ব্যক্তি গুপ্তধন সন্ধানে কাজ করেছে, তাহলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট ওকে দেবে যিনি পেয়েছে। যদিও উভয়ে যৌথভাবে কাজ করে। কিন্তু এটা শিরকাতে ফাসেদা। আর যদি যৌথ অংশ গ্রহণে উভয়ে পেয়ে থাকে, এটা জানা নেই যে, কে কতটুকু পেয়েছে, তাহলে অর্ধেক অর্ধেক অংশীদার হবে। এ অবস্থায় যদি একজনে পেয়ে থাকে অন্যজনে সাহায্য করে থাকে, তাহলে যিনি পেয়েছেন তার হবে। সাহায্যকারীকে কাজের মজুরী দিতে হবে। আর যদি গুপ্তধন বের করার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাহলে যা বের হবে তা শ্রমিক পাবে, মুস্তাজির বা মালিক কিছু পাবে না। এটাকে ফাসেদ ইজারা বলা হয়। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গুপ্তধনে ইসলামী নিদর্শনও নেই, কুফরী নিদর্শনও নেই, তাহলে কাফেরদের যুগের মনে করতে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অমুসলিম রাষ্ট্রের মরুভূমিতে যা কিছু পাওয়া যাবে, সংরক্ষিত খনি হোক বা গুপ্তধন হোক এতে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নেয়া যাবে না। বরং সম্পূর্ণটা যিনি পেয়েছেন তার হবে। আর যদি অনেক লোক একত্রে বিজয় বেশে বের করে, তাহলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নিতে হবে, এটা হবে গণীমত। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসলমান, অমুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা নিয়ে গমন করল, ওখানে কারো মালিকানাধীন জমি থেকে ভান্ডার বা খনি পেল, তাহলে জমিনের মালিককে ফেরৎ দিতে হবে। ফেরৎ দিল না, বরং ইসলামী রাষ্ট্রে ফিরে আসল, তাহলে মুসলমানই মালিক হবে। তবে তা হবে অসৎ বা অপবিত্র মালিকানা। সুতরাং সাদকা করে দিলে বা বিক্রি করলে বিক্রি শুদ্ধ হবে। তবে ক্রেতার জন্যও তা হবে অপবিত্র। আর যদি নিরাপত্তা নিয়ে গমন না করে, তাহলে এ মাল ওর জন্য হালাল, ফেরৎ দেবে না এবং খুমুস বা একপঞ্চমাংশও দেবে না। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ খুমুস বা এক পঞ্চমাংশে মিসকীনদের হক বা অধিকার, ইসলামী শাসক ব্যয় করতে পারবে। যদি সে স্বেচ্ছায় মিসকীনদেরকে দিয়ে দেয়, তখনও জায়েয। বাদশার নিকট খবর পৌঁছলে তা স্থগিত রাখবে এবং বাদশাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে। প্রাপক ব্যক্তি নিজে দরিদ্র হলে প্রয়োজনানুসারে নিজের ব্যয়ের জন্য রাখতে পারবে। খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট যদি দু'শত দিরহাম পরিমাণ হয়, তাহলে খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ নিজে রাখতে পারবে না। যেহেতু সে ফকির নয়, তবে যদি ঋণগ্রস্ত হয়, ঋণ বাদ দিয়ে দু'শত দিরহাম পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকলে, তাহলে খুমুস নিজ ব্যয়ের জন্য নিতে পারবে। আর যদি পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি যারা মিসকীন আছে ওদেরকে খুমুস দিলে তখনও জায়েয হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

কৃষিদ্রব্য ও ফল ফলাদির যাকাতের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

অর্থঃ ফসল কর্তনের দিন তার হক আদায় কর। বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে জমি বৃষ্টি, নদী বা কূপের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, বা জমীন ওশরী হলে, অর্থাৎ নদীর পানি দ্বারা যদি সিঞ্চন করা হয়, তাহলে উৎপন্ন ফসলের এক

দশমাংশ আর যে জমীনে পানি সেচের জন্য পশু দ্বারা পানি আনা হয়, সেখানে দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ।

ইবনে নাজ্জার হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তু যা জমীন থেকে উৎপাদিত তাতে দশমাংশ বা দশমাংশের অর্ধেক দিতে হবে।

ফিক্‌হী মাসায়েল

জমির প্রকারভেদঃ

জমি তিন প্রকার (১) ওশরী (২) খারাজী (৩) ওশরীও নয় খারাজীও নয়। প্রথম ও তৃতীয় উভয়টির বিধান একই রকম, অর্থাৎ দশমাংশ দিতে হবে।

হিন্দুস্থানে মুসলমানদের জমিকে খারাজী মনে করবে না, যতক্ষণ না কোন বিশেষ জমি খারাজ হওয়া বিষয়টি শরয়ী প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়।

জমি ওশরী হওয়ার বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমনঃ মুসলমানরা জয় করেছে এবং জমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন হল, অথবা ওখানকার লোকেরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হল যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি, বা ওশরী জমির নিকটে হওয়ায় তা চাষাবাদে লাগাল, বা ওশরী ও খারাজীর উভয়টি নিকট বা দূরত্বের দিক দিয়ে সমান বা ক্ষেতকে ওশরী পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হল, অথবা ওশরী বা খারাজী উভয়টি বা মুসলমানরা নিজেদের বাড়ীর জায়গাকে বাগান করল, বা ক্ষেত বানাল এবং ওশরী পানি দ্বারা সেচ দিল, অথবা ওশরী বা খারাজী উভয়টি বা ওশরী জমি, জিম্মী কাফির ক্রয় করল, মুসলমান শোফার ভিত্তিতে তা নিয়ে নিল বা ক্রয় বিক্রয় ফাসেদ হল, বা খেয়ারে শর্ত খেয়ারে রুইয়তের কারণে ফিরিয়ে দেয়া হল, বা ত্রুটিজনিত কারণে বিচারকের নির্দেশে ফিরিয়ে দেয়া হল, এছাড়া খারাজী হওয়ার আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যেমনঃ দেশ বিজয়ের পর ওখানকার বাসিন্দাদেরকে অনুগ্রহ করে দেয়া হল, বা অন্য কোন কাফেরকে দিয়ে দিল অথবা সন্ধির ভিত্তিতে রাষ্ট্র জয় করল, বা জিম্মী লোক মুসলমান থেকে ওশরী জমিন ক্রয় করল, বা মূল্যমান খারাজী জমি ক্রয় করল, বা কোন জিম্মী লোক মুসলমান শাষকের নির্দেশে অনাবাদী জমি আবাদ করল, বা অনাবাদী ভূমি জিম্মীকে দেয়া হল, অথবা মুসলমান তা আবাদ করল, অথবা তা খারাজীর জমির নিকটতর হলে, অথবা খারাজী পানি দ্বারা সিঞ্চন করলে খারাজী ভূমি যদিও ওশরী পানি দ্বারা সেচ দেয়া খারাজী হিসেবেই গণ্য হবে। খারাজী ও ওশরী উভয়টি না হলে, যেমনঃ মুসলমানরা দেশ জয়ের পর নিজের জন্য স্থায়ী করে

নিয়েছে, বা ভূমির মালিক মৃত্যুবরণ করল জমি বায়তুল মালের মালিকানাধীন– এ অবস্থায় জমি ওশরীও নয় খারাজীও নয়।

খারাজ'র প্রকারভেদ

মাসআলাঃ খারাজ দু'প্রকার (১) খারাজে মুকাসামা (২) খারাজে ওয়াজীফা।

উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ হিসাবে নির্ধারণ করা হলে তাকে খারাজে মুকাস্‌সামা বলে।

জমির পরিমাণের ভিত্তিতে নগদ অর্থে যে খাজনা ধার্য করা হয়, তাকে খারাজে ওয়াজীফা বলে।

খারাজে মুকাসামা উৎপাদিত অর্ধাংশ, এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করা। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা খায়বার এলাকার ইয়াহুদীদের উপর নির্ধারণ করেছেন।

খারাজে ওয়াজীফা হল, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিত্তিক অর্থ আবশ্যক করে দেয়া।

বিঘা প্রতি বার্ষিক এক টাকা, দু'টাকা নগদ অর্থ আরো কিছু অধিক যেমনঃ হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নির্ধারণ করেছিলেন।

মাসআলাঃ যদি জানা থাকে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে এতটুকু খাজনা নির্ধারণ ছিল, তাহলে সেটাই প্রদান করবে। যদি তা হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের বেশী না হয় এবং জমিনের অতটুকু উৎপাদনের উর্বরা শক্তি থাকাও শর্ত। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইসলামী রাষ্ট্রে নির্ধারিত খাজনার পরিমাণ যদি জানা না থাকে, তাহলে যেসব ক্ষেত্রে হযরত ফারুক আজম রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক নির্ধারিত আছে সেটা প্রদান করবে। আর যেখানে নির্ধারিত নেই সেখানে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দেবে। (ফতোয়ায়ে রিজভীয়া)

মাসআলাঃ হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু নির্ধারণ করেছেন যে, প্রত্যেক প্রকার শস্যে এক জরিপে এক দিরহাম এবং সংশ্লিষ্ট শস্যের এক 'সা' দিতে হবে। তরমুজ, বাঙ্গী, কিরা, শষা, বেগুন ইত্যাদি সব রকমের তরকারীর প্রতি জরিপে পাঁচ দিরহাম। আঙ্গুর, খোরমার ঘন বাগানে কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, ওসব দ্রব্যের দশ

জমির ভোগ ব্যবহারের বিনিময়ে রাষ্ট্রকে প্রদত্ত অর্থ বা মালকে খারাজ বলে। (অনুবাদক)

দরহাম, অতঃপর ভূমি অনুপাতে এবং ব্যক্তির সামর্থ অনুসারে দিতে হবে। উৎপাদক কি বপন করেছে সেটা বিবেচ্য নয়, অথচ যে ভূমি যে বস্তুর উৎপন্নের উপযোগী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সে বস্তু বপন করতে সক্ষম, তাহলে সে অনুসারে খাজনা দিতে হবে। যেমনঃ ভূমি যদি আঙ্গুর উৎপাদনের উপযুক্ত হয়, আঙ্গুরের খাজ না দিতে হবে– যদিও গম বপন করা হয়। আর যদি গম বপনের উপযুক্ত হয়, তাহলে গমের খাজনা দিতে হবে– যদিও যব বপন করা হয়।

জরিপের পরিমাণ ইংরেজী হিসাব অনুসারে দৈর্ঘ্য ৩৫ গজ, প্রস্ত ৩৫ গজ। আর 'সা' হলো ২৮৮। ....?

মাসআলাঃ যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র নেই, ওখানকার লোকেরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় ফকির ইত্যাদিকে যারা খারাজের হকদার তাদের দিয়ে দিবে।

মাসআলাঃ ওশরী জমি থেকে এমন জিনিষ উৎপন্ন হল, যে জিনিসের চাষ করার উদ্দেশ্য হল, ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করা, তাহলে এমন ভূমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত ফরজ। এ প্রকার যাকাতের নাম ওশর, অর্থাৎ দশমাংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দশমাংশ ফরজ। যদিও কতেক অবস্থায় দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয়। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য বিবেকবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। পাগল ও নাবালেগের জমিনে যা কিছু উৎপন্ন হয়, ওটাতে দশমাংশ ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্বেচ্ছায় ওশর না দিলে ইসলামী শাসক জোরপূর্বক নিতে পারবে। এ অবস্থায়ও ওশর আদায় হবে। কিন্তু ছওয়াবের অধিকারী হবে না। সন্তুষ্টচিত্তে দিলে ছওয়াবের অধিকারী হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যার উপর ওশর ওয়াজিব হলো, সে মৃত্যুবরণ করল, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য মওজুদ আছে, তাহলে ওটা থেকে ওশর (দশমাংশ) নেয়া হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ওশরের ক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। একই জমিনে যদি বছরে কয়েকবার শষ্য উৎপন্ন হয়, প্রত্যেকবার ওশর (দশমাংশ) ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ওশরে নেসাব শর্ত নয়। উৎপন্ন দ্রব্য যদি এক কেজি পরিমাণও হয় ওশর ওয়াজিব হবে। উৎপন্ন দ্রব্য স্থায়ী থাকাও শর্ত নয়। চাষী ভূমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়, এমনকি চুক্তিবদ্ধ গোলাম বা মুনিবের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম চাষাবাদ করল তখনও উৎপন্ন দ্রব্যে ওশর দশমাংশ ওয়াজিব। ওয়াকফের জমিতে শষ্য উৎপন্ন হলে

ওটাতেও ওশর ওয়াজিব। শষ্য উৎপন্নকারী ওয়াক্ফের যোগ্য হোক বা ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করা হোক। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যদি এমন জিনিষ হয়, যা উৎপন্ন হওয়ার দরুন ভূমির উর্বরা শক্তি উদ্দেশ্য নয়, ওটাতে ওশর ওয়াজিব নয়। যেমনঃ জ্বালানী কাঠ, ঘাস, নারিকেল, ঝাউ (সমুদ্র তীরের এক প্রকার উদ্ভিদ), খেজুর পাতা, খতমী (উদ্ভিদ বিশেষ যদ্বারা ঔষধ তৈরী করা হয়) কার্পাস তুলা (তুলার চারা), বেগুন গাছ, তরমুজ, খিরা, শসা ইত্যাদির বীজ, অনুরূপ প্রত্যেক প্রকার তরকারীর বীজ, এসবের ক্ষেত দ্বারা তরকারী উদ্দেশ্য, বীজ উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ যেসব বীজ ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ কালোজিরা, মেথী (এক প্রকার সজি)। আর যদি নারিকেল, ঘাস, বেত, ঝাউ ইত্যাদি উৎপন্ন দ্বারা যদি ভূমির উপকার উদ্দেশ্য হয় এবং এসবের জন্য জমি খালি রাখা হয়, ওটাতেও ওশর ওয়াজিব হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যে ক্ষেত, বৃষ্টি বা নদী নালার পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হয়, ওটাতে ওশর বা দশমাংশ ওয়াজিব হবে। যে ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন সেচন বা বালতি দ্বারা করতে হয়, সেক্ষেত্রে অর্ধ উশর অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যের বিশাংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি পানি খরিদ করে সিঞ্চন করা হয়, অর্থাৎ কারো মালিকানাধীন পানি ক্রয় করে সেচ দিলে, তখনও অর্ধ উশর ওয়াজিব হবে। আর যদি কিছুদিন বৃষ্টির পানির দ্বারা কিছু দিন বালতি বা সেচন বস্তু দ্বারা সিঞ্চন করা হয়, আর যদি বৃষ্টির পানির দ্বারা বেশী সিঞ্চন করা হয়, মাঝেমধ্যে বালতি বা সেচবস্তু দ্বারা সিঞ্চন করা হয়, তখন দশমাংশ ওয়াজিব হবে, অন্যথায় অর্ধ উশর বা দশমাংশের অর্ধেক। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ উশরী জমিনে বা পাহাড় ও জঙ্গলে মধু পাওয়া গেল, ওটাতে উশর বা দশমাংশ ওয়াজিব হবে। অনুরূপ পাহাড়ের ও জঙ্গলের ফল সমূহের ক্ষেত্রেও উশর বা দশমাংশ ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো যে, ইসলামী শাসক কাফির, ডাকাত এবং বিদ্রোহীদের থেকে যদি এগুলো হেফাজত করে অন্যথায় ওয়াজিব হবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোখতার)

মাসআলাঃ গম, যব, ভুট্টা, বাজরা, ধান এবং সব রকমের শষ্য আখরোট, বাদাম, সব রকমের ফল, তুলা, ফুল, ইক্ষু, তরমুজ, বাঙ্গী, কিরা শষা, বেগুন সব রকমের তরকারীর উপর উশর ওয়াজিব। উৎপন্ন কম হোক বা বেশী হোক। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যে উশর বা অর্ধ উশর ওয়াজিব হয়েছে, সেখানে উৎপাদিত দ্রব্যের সম্পূর্ণটার দশমাংশ বা দশমাংশের অর্ধেক গ্রহণ করলে তা আদায় হবে না। কৃষিজ খাতে চাষাবাদ সংরক্ষণকারী ও কাজ সম্পাদনকারীদের পারিশ্রমিক বা বীজ ইত্যাদির মূল্যে বাদ দিয়ে উশরী দশমাংশ বা অর্ধ উশর দশমাংশের অর্ধেক দিতে হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ উশর কেবল মুসলমানদের থেকে নেয়া হবে। এমনকি উশরী জমিন মুসলমান থেকে অমুসলিম লোকেরা ক্রয় করে নিল, দখলও করে নিল, তাহলে অমুসলিম থেকে উশর বা দশমাংশ নেয়া যাবে না। বরঞ্চ ধার্যকৃত খারাজ (কর) নেয়া যাবে। মুসলমান যদি অমুসলিম থেকে খারাজী জমি ক্রয় করে নিলে তা খারাজী হিসেবেই গণ্য হবে। তখন সে মুসলমানে থেকে উশর বা দশমাংশ নেয়া যাবে না বরং খারাজ (কর) নেয়া যাবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কোন জিম্মী মুসলমান থেকে উশরী জমি খরিদ করলো, অতঃপর কোন মুসলমান শোফার ভিত্তিতে উক্ত জমি নিয়ে নিল, অথবা কোন কারণে ক্রয় বিক্রয় অশুদ্ধ হয়ে গেল, বিক্রেতার নিকট ফিরে গেল বা বিক্রেতার খেয়ারে শর্ত বা দেখার পর রাখা না রাখার এখতিয়ার ছিল এ কারণে ফিরিয়ে দিল, বা ক্রেতার এখতিয়ার ছিল বিচারকের সিদ্ধান্ত মতে ফিরিয়ে দেওয়া হল, উপরোক্ত অবস্থায় তা পুনরায় ক্রেতার বলেই গণ্য হবে। আর ত্রুটিজনিত এখতিয়ারে বিচারকের সিদ্ধান্তবিহীন যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে খারাজী হিসেবেই গণ্য হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মুসলমান নিজ ঘরকে বাগান করলো, এতে যদি উশরী পানি সিঞ্চন করা হয় উশরী হিসেবে গণ্য হবে। খারাজী পানি সিঞ্চন করলে তাহলে খারাজী জমি হিসেবে গণ্য হবে।[১]

উভয় প্রকার পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হলেও উশরী হিসেবে গণ্য হবে। জিম্মী লোক যদি ঘরকে বাগান তৈরী করে, তাহলে খারাজই নেয়া হবে। আকাশের পানি, কুপ, ঝর্ণা ও সমুদ্রের পানি উশরী পানি আর যেসব নদী অনারবরা খনন করেছে– ওটার পানি খারাজী হিসেবে গণ্য হবে। কাফিররা কুপ খনন করেছিলো, এখন মুসলমানদের কব্জায় এসে গেল বা খারাজী জমিনে কুপ খনন করা হলো ওটা পানি ও খারাজী হিসেবে গণ্য হবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ বাড়ীতে বা কবরস্থানে যা উৎপন্ন হয়, ওটাতে উশরও নেই খারাজও নেই। (দুররুল মোখতার)

বিঃ দ্রঃ * উশরী জমিতে সঞ্চিত বৃষ্টির পানি, উশরী জমিতে অবস্থিত কুপ ও পুকুরের পানি এবং ব্যক্তি মালিকানাহীন খাল, বিল, নদী ও সমুদ্রের পানিকে উশরী পানি বলা হয়।
* খারাজী ভূমিতে অবস্থিত কুপ, পুকুর ও ঝর্ণার পানিকে খারাজী পানি বলা হয়।

মাসআলাঃ কালো আঠা বিশেষ এবং নিফ্‌ত গম জাতীয় শস্য ঝর্ণা দ্বারা সেচকৃত উশরী জমিনে হোক বা খারাজী জমিনে হোক, এগুলোতে কিছুই নেয়া যাবে না। অবশ্যই যদি খারাজী জমিনে হয়, তাহলে যতক্ষণ না আশেপাশের জমিন কৃষিকাজের উপযোগী হয়, তাহলে ঐ জমিনের খারাজ নিতে হবে, ঝর্ণা সমূহের নয়। উশরী জমিনে হলে তাহলে যতক্ষণ আশেপাশের জমিনে ক্ষেত ফসল উৎপন্ন না হয়, কিছুই নেয়া যাবে না। নিছক ক্ষেতের উপযুক্ত হওয়াটা যথেষ্ট নয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে জিনিস জমিনের অনুগামী যেমন বৃক্ষ এবং যেসব জিনিষ বৃক্ষ থেকে বের হয় যেমন, আঠা/খামির ওটাতে উশর বা দশমাংশ নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ উশর বা দশমাংশ তখনই নেয়া হবে যখন ফল বের হবে এবং পরিপক্ক হবে নষ্ট হওয়ার আশংকাও দূরীভূত হয়। যদিও বা এখনো ছিড়ার উপযোগী হয়নি (জাওহেরো নাইয়্যোরা)

মাসআলাঃ খারাজ আদায় করার পূর্বে ওটার উৎপন্ন দ্রব্য খাওয়া হালাল হবে না। অনুরূপ উশর বা দশমাংশ আদায় করার পূর্বে মালিকেরও খাওয়া হালাল নহে। খেলে ক্ষতিপূরণ দেবে। অনুরূপ অন্যকে খাওয়ালে ততটুকু উশর বা দশমাংশ ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি ইচ্ছে থাকে যে, সম্পূর্ণটার উশর বা দশমাংশ আদায় করবে, তাহলে খাওয়া হালাল হবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইসলামী শাসকের এখতিয়ার আছে যে, শষ্যকে আটক রাখা, মালিককে খরচ করতে না দেয়া। যদি কয়েক বৎসরে খারাজ না দিয়ে থাকে, অক্ষম হলে, বিগত বৎসরগুলোর খারাজ ক্ষমা করে দেবে। অক্ষম না হলে নিয়ে নেবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কৃষিজ ফসল উৎপাদনে সক্ষম, বপন কিছু করেনি, তখন খারাজ ওয়াজিব হবে, চাষাবাদ না করা পর্যন্ত এবং শষ্য উৎপন্ন না হলে উশর বা দশমাংশ ওয়াজিব হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ক্ষেত বুনল, কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য ধ্বংস হয়ে গেল, যেমন ক্ষেত ডুবে গেল, বা আগুনে জ্বলে গেল বা পোকা খেয়ে ফেলল, তখন উশর ও খারাজ দু'টিই রহিত হয়ে যাবে– যদি সবগুলো নষ্ট হয় বা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহলে অবশিষ্টাংশের উশর গ্রহণ করবে, আর যদি চতুষ্পদ প্রাণী খেয়ে ফেলে রহিত হবে না। রহিত হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, এরপর একই বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় কোন

শষ্য উৎপন্ন হয়নি, এটাও শর্ত যে, ভেঙ্গে ফেলা ও কর্তন করার পূর্বে ধ্বংস হওয়া। অন্যথায় রহিত হবে না। (রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ খারাজী জমি কেউ দখল করে নিল, তখন দখলকে অস্বীকার করছে, মালিকের কাছে স্বাক্ষীও নেই, তাহলে চাষাবাদ করলে খারাজ দখলকারীর উপর বর্তাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ 'বাঈ ওফা' অর্থাৎ যে ক্রয় বিক্রয়ে শর্ত হবে যে, বিক্রেতা যখন মূল্য ক্রেতাকে ফিরিয়ে দিবে, তখন ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তু ফিরিয়ে দেবে। খারাজী জমি এ নিয়মে যদি কারো নিকট বিক্রয় এবং বিক্রেতার কব্জায় জমি থাকলে খারাজ বিক্রেতার উপর বর্তাবে। ক্রেতার কব্জায় থাকলে ক্রেতা নিজে রোপনও করে থাকলে তখন খারাজ ক্রেতার উপর বর্তাবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রয় করে দিল তাহলে উশর বা দশমাংশ ক্রেতার উপর বর্তাবে। যদিও ক্রেতা শর্ত আরোপ করে যে, পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত ফসল কাটতে পারবে না। বরং ক্ষেতে থাকবে, বিক্রয়ের সময় ফসল পরিপক্ক হল তাহলে উশর বা দশমাংশ বিক্রেতার উপর বর্তাবে। আর যদি জমি ও ফসল দু'টিই অথবা কেবলমাত্র জমিন বিক্রয় করলে এমতাবস্থায় বৎসর পূর্ণ হতে এতটুকু সময় বাকী রয়েছে যে, যতটুকুতে ফসল পরিপক্ক হবে, তাহলে খারাজ ক্রেতার উপর বর্তাবে। অন্যথায় বিক্রেতার উপর। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ ক্রেতা জমি ধার দিল, তাহলে উশর বা দশমাংশ চাষীর উপর বর্তাবে। মালিকের উপর নহে। জমি যদি কাফিরকে ধার দেয়া হয় উশর মালিকের উপর বর্তাবে। (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ উশরী জমি যদি বর্গা হিসেবে দেয়া হয়, তাহলে উভয়ের উপর উশর (দশমাংশ) আর যদি খারাজী জমি বর্গা হিসাবে দেয়া হয় তাহলে মালিকের উপর খারাজ (খাজনা) বর্তাবে। (রদ্দুল মোহ্তার)

মাসআলাঃ যে জমি নগদ টাকার ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য দেয়া হয়, ইমাম আজমের মতে ওটার উশর (দশমাংশ) জমিদারের উপর বর্তাবে। সাহ্বাঈনের মতে চাষীর উপর বর্তাবে, আল্লামা শামী'র ব্যাখ্যা মতে যুগের চাহিদা মতে সাহ্বাঈনের উক্তির উপর আমল করবে।

মাসআলাঃ সরকারকে যে খাজনা দেয়া হয়, ওটার দ্বারা খারাজে শরয়ী আদায় হয় না বরং ওটা মালিকের জিম্মায় বর্তাবে যা আদায় করা আবশ্যক। খারাজের হকদার

কেবল ইসলামী ফৌজ নয় বরং সাধারণ মুসলমানদের সব রকমের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে, যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, মসজিদের ব্যয়ভার বহন করা, ইমাম মুয়াজ্জিনের বেতন ভাতা প্রদান করা, দ্বীনি শিক্ষার শিক্ষকদের বেতনাদি, দ্বীনি শিক্ষার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা, উলামায়ে আহ্লে সুন্নাতের খেদমতে ব্যয় করা– যারা দ্বীনি সাহায্যকারী যারা ওয়াজ নছীহত করে থাকে, ইল্মে দ্বীন শিক্ষা দেয় এবং ফতওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে, সেতু, মুসাফিরখানা নির্মাণেও ব্যয় করা যাবে। (ফতওয়ায়ে রিজভীয়্যাহ)

মাসআলাঃ উশর নেয়ার পূর্বে ফসল বিক্রয় করে দিল, তখন যাকাত উত্তলকারীর এখতিয়ার থাকবে। উশর হয়তঃ ক্রেতা থেকে নেবে অথবা বিক্রেতা থেকে নেবে। মূল্য যতটুকু হওয়া উচিৎ যদি তার চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রি করে থাকলে সাদকা উত্তলকারীর এখতিয়ার থাকবে যে, ফসলের উশর নেবে। অথবা মূল্যের উশর (দশমাংশ) নেবে। আর যদি কম মূল্যে বিক্রি করে এবং এত বেশী কম হয় যে, লোকেরা সাধারনত এতটুকু লোকসান দিয়ে বিক্রি করে না, তখন ফসলেরই উশর নেবে, ফসল যদি না থাকে ফসলের উশর নির্ধারণ করে বিক্রেতা থেকে নেবে, অথবা নির্ধারিত মূল্যে নেবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আঙ্গুর বিক্রয় করলে, মূল্যের উশর (দশমাংশ) নেবে, আর যদি শীরা করে বিক্রয় করে তখন মূল্যের উশর নেবে। (আলমগীরি)

মালের যাকাত কোন প্রকারের লোকদেরকে দেয়া যায়

আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ যাকাত তো এসব লোকেরই জন্য যারা অভাবগ্রস্ত, নিতান্ত নিঃস্ব, যারা তা সংগ্রহ করে আনে, যাদের অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, ক্রীতদাস মুক্তির মধ্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য এটা বিধান আল্লাহর। আর আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

হাদীস-১ ঃ সুনানে আবু দাউদে যায়েদ বিন হারেস সাদাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আল্লাহ্ যাকাতকে নবী অথবা অন্য কারো হুকুমের উপর নির্ধারণ করেননি, বরং তিনি (আল্লাহ্) নিজেই

ওটার বিধান বর্ণনা করেছেন এবং যাকাতকে আট খাতে বিভক্ত করেছেন।

হাদীস– ২ ঃ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয়, তবে হ্যাঁ পাঁচ ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল। তারা হল– (১) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী (২) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী (৩) সাময়িকভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (৪) এমন ব্যক্তি যে নিজের মাল দ্বারা যাকাতের মাল খরিদ করেছে (৫) এমন ব্যক্তি যার প্রতিবেশী মিসকীন সেই মিসকীনকে কেহ্ যাকাত দিয়েছে আর সে মিসকীন ব্যক্তি সম্পদশালীকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। আহমদ ও বায়হাকীর অপর বর্ণনায় আছে যে, মুসাফিরের জন্যও জায়েয উল্লেখ হয়েছে।

াদীস– ৩ ঃ বায়হাকী শরীফে হযরত মাওলা আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি ‌লেন, ফরজ যাকাত সমূহে সন্তান সন্ততি ও সম্পদশালীর হক নেই।

হাদীস– ৪ঃ তিবরানী কবীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদের আত্মার উপর ধৈর্যধারণ করো, যাকাত মানুষের মালের ময়লা।

হাদীস– ৫-৭ ঃ ইমাম আহমদ, মুসলিম হযরত আবদুল মুত্তালিব ইবনে রবীয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরিবার পরিজনের জন্য সাদকা হালাল নয়। এগুলো মানুষের মালের ময়লা। ইবনে সাদ, হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (রাঃ) থেকে র্বণা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আল্লাহ্ আমার উপর এবং আমার আহ্লে বাইতের উপর সাদকা হারাম করে দিয়েছেন। তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ হযরত আবু রাফে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আমাদের জন্য সাদকা হালাল নয়। আর কোন গোত্রের আযাদকৃত দাসও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস– ৮ ঃ বোখারী, মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) সাদকার খোরমা নিয়ে মুখে দিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, ছিঃ ছিঃ ওটা নিক্ষেপ করো, অতঃপর এরশাদ করেন, তোমার কি জানা নেই যে, আমরা সাদকা ভক্ষণ করি না। তেহমান বাহ্জ বিন হাকিম, বারা, যায়েদ বিন আরকাম, আমর বিন হারেসা,

সালমান, আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা, মায়মুন, কায়সান, হরমুজ, হারেসা বিন আমর মুগীরা, আনস রাব্বিআল্লাহ্ তাআলা আনহুম প্রমুখ থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরিবার পরিজন (আহ্লে বাইতের) এর জন্য সাদকা জায়েয নেই।

যাকাতের খাত বর্ণন।

মাসআলাঃ যাকাতের খাত ৭টি। (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত উশুলকারী (৪) মুক্তিপনের শর্তযুক্ত গোলাম (৫) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (৬) আল্লাহর রাস্তায় (৭) মুসাফির।

মাসআলাঃ ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে কিছু আছে, কিন্তু তা নেসাব পরিমাণ নয়, অথবা নেসাব পরিমাণ আছে, কিন্তু তা মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত যেমন, বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়, সেবার দাসী, ইলম শিক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির ধর্মীয় কিতাবাদি, তা যদি নিজের প্রয়োজনের অধিক না হয় যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ যদি ঋণগ্রস্ত হয় ঋণ পরিশোধের পর যদি নিসাব পরিমাণ অবশিষ্ট না থাকে তখন ফকীর হিসেবে গণ্য হবে। যদিও ওর একটি নয় কয়েকটি নেসাব থাকলেও ফকীর হিসেবে গণ্য হবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ফকীর যদি আলেম হয়, তাকে দেয়া জাহেল বা মূর্খকে দেয়ার চেয়ে উত্তম। (আলমগীরি) তবে আলেমকে দিলে তাঁর সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আদব সহকারে দিবে, যেমন ছোটরা বড়দেরকে নজরানা দিয়ে থাকে। (মা'আজাল্লাহ) আলেমের প্রতি তাচ্ছিল্যতা যদি অন্তরে আসে এটা ধ্বংসের কারণ এবং ভয়াবহ ধ্বংসের কারণ।

মাসআলাঃ মিসকীন বলা হয় যার কাছে কিছুই নেই। এমনকি খাবার ও শরীর আবৃত করার জন্য মুখাপেক্ষী হতে হয়। মানুষের কাছে হাত পাততে হয় ওর জন্য সাহায্য চাওয়া হালাল। তবে ফকীরের সাহায্য প্রার্থনা নাজায়েয, যার কাছে খাবার ও শরীর ঢাকার কাপড় আছে ওর জন্য অপ্রয়োজনে ও অপারগতা ছাড়া সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ আমেল বলা হয়, যাকে ইসলামী শাসক যাকাত এবং উশর উশুল করার জন্য নিয়োগ করেছে, ওকে কাজ অনুপাতে এতটুকু পরিমাণ দিতে হবে যেন তিনি ও তার সাহায্যকারীদের জন্য মধ্যম পন্থায় যথেষ্ট হয়। তবে উশুলকৃত টাকার অর্ধেকের অধিক যেন না হয়। (দুররুল মোখতার, অন্যান্য কিতাব)

মাসআলাঃ যাকাত উশুলকারক যদিও সম্পদশালী হয় স্বীয় কাজের বিনিময় নিতে পারবে। হাশেমী বংশীয় হলে ওকে যাকাতের মাল থেকে দেয়াও নাজায়েয ও তিনি গ্রহণ করাও নাজায়েয। তবে যদি অন্য কোন উপায়ে দেয়া হয়, নিলে অসুবিধা নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যাকাতের মাল যদি উশুলকারকের হাত ছাড়া হয়ে যায়, তখন তিনি কিছু পাবে না। কিন্তু যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি স্বীয় মালের যাকাত নিজে সাথে নিয়ে বায়তুল মালে প্রদান করলে উশুলকারক এটার বিনিময় পাবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সময়ের পূর্বে বিনিময় নিয়ে নিল, বা কাজী ওকে দিয়ে দিল, জায়েয হবে। তবে পূর্বে না দেওয়া উত্তম। আর প্রথমে উশুলকৃত মাল যদি ধ্বংস হয়ে যায়, প্রদত্ত বিনিময় ফেরৎ নিবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ রিকাবের মর্মার্থ হলো মুক্তিপণের শর্তযুক্ত ক্রীতদাসকে দেয়া, যেন সে মালের বিনিময়ে মুক্তিপন আদায় করে মুনীবের গোলামী থেকে মুক্তি পেতে পারে। (প্রায় সব কিতাবে দ্রষ্টব্য)

সম্পদশালীর চুক্তিবদ্ধ গোলামকেও যাকাতের মাল দেয়া যাবে, যদিও জানা যায় যে, তিনি ধনী ব্যক্তির গোলাম। গোলাম যদি সম্পূর্ণ মুক্তিপন আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং পুনরায় নিয়মিত গোলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, তখন যে পরিমাণ যাকাতের মাল সে নিয়েছে সে পরিমাণ মুনীবের কাজে ব্যবহার করা যাবে, যদিও মুনিব ধনী হয়। (দুররুল মোখতার, অন্যান্য)

মাসআলাঃ মুক্তিপনের শর্তযুক্ত গোলামকে যে যাকাত দেয়া হয়েছে, তা গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তবে গোলামের এখতিয়ার থাকবে, অন্য খাতেও তিনি এ টাকা ব্যয় করতে পারবে। মুকাতিব গোলামের কাছে যদি নেসাব পরিমাণ মাল আছে এবং তা যদি মুক্তিপন বিনিময়ের চেয়েও বেশী হয় তবুও যাকাত দেয়া যাবে। তবে হাশেমী বংশীয় মুনীবের মুক্তিপনের শর্তযুক্ত গোলামকে যাকাত দেয়া যাবে না। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ গারেম অর্থ ঋণগ্রস্ত, অর্থাৎ যার উপর এতটুকু কর্জ আছে, তা বের করে নিলে নেসাব পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে না। যদিও অন্যান্যদের নিকট তার আরো বাকী আছে, কিন্তু তা নিতে সক্ষম নয়– এমন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হিসেবে গণ্য হবে। তবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হাশেমী না হওয়া শর্ত। (দুররুল মোখতার, অন্যান্য)

মাসআলাঃ 'ফী সাবিলিল্লাহি' অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, এর কয়েকটি দিক রয়েছে, যেমন কোন ব্যক্তি জিহাদে গমনে ইচ্ছুক, কিন্তু তার বাহন এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেই তখন ওকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে। এটা আল্লাহর রাস্তায় দান হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে উপার্জনে সক্ষম হয় বা কেউ হজ্বে যেতে ইচ্ছুক তার কাছে টাকা নেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে। কিন্তু হজ্বের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয নেই। তালেবে ইলম বা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারী ছাত্র যিনি ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী বা পড়তে আগ্রহী তাকে দেয়া যাবে। এটাও আল্লাহর পথে দান হিসেবে গণ্য হবে। বরং দ্বীনি শিক্ষার্থী সাহায্য প্রার্থনা করেও যাকাতের মাল নিতে পারবে। যদি সে নিজে নিজকে সেই কাজের জন্য নিয়োজিত রাখে, যদিও উপার্জনে সক্ষম হয়, অনুরূপ প্রত্যেক ভাল কাজে যাকাত দান করাটা আল্লাহর রাস্তায় বুঝাবে। যদি মালিকানা সত্ত্ব দান করা বুঝায়। মালিকানা সত্ত্ব প্রদান ছাড়া যাকাত আদায় হবে না। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ অনেক লোক যাকাতের মাল ইসলামী মাদ্রাসা সমূহে পাঠিয়ে দেয়, ওদের উচিৎ হবে যেন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে বলে দেয়া হয় যে, এটা মালের যাকাত, কর্তৃপক্ষ যেন এ মালকে পৃথক করে রাখেন। অন্য মালের সাথে যেন একত্র না করেন। দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে ব্যয় করবে, তারা কোন কাজের বেতন দিবে না। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

মাসআলাঃ 'ইবনুস সাবিল' অর্থাৎ মুসাফির– যার কাছে মাল নেই যাকাত নিতে পারবে, যদিও বা তার ঘরে মাল বিদ্যমান থাকে কিন্তু ততটুকু পরিমাণ নিবে যতটুকুতে প্রয়োজন পূরণ হয়, অতিরিক্ত নেয়ার অনুমতি নেই। অনুরূপ যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের মাল কোন সময়সীমা পর্যন্ত অন্যের কাছে কর্জ হিসেবে থাকে, তখনো মেয়াদ পূর্ণ হয়নি, কিন্তু তার যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে অথবা যার জিম্মায় রয়েছে সে যদি উপস্থিত না থাকে, অথবা উপস্থিত আছে, কিন্তু অসচ্ছল বা অস্বীকার করছে যদিও এসবের প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকে, তবুও উপরোক্ত সব অবস্থায় প্রয়োজন অনুপাতে যাকাত নিতে পারবে। কিন্তু উত্তম হলো কর্জ পাওয়া গেলে কর্জ নিয়ে কাজ সেরে নিবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

'দাইনে মুয়াজ্জাল' বাকী কর্জ হলে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে এবং ঋণ গ্রহীতা ধনী হলে এবং উপস্থিত থাকলে স্বীকার করেছে, তাহলে যাকাত নিতে পারবে না। তার থেকে নিয়ে নিজের প্রয়োজনে খরচ করা যাবে বিধায় অভাবী রইল না। স্মরণ রাখা

চাই যে, কর্জ যেটাকে প্রচলিত ক্ষেত্রে হাত বদল বলা হয় শরয়ীভাবে সর্বদা মুয়াজ্জল হয়ে থাকে যখন ইচ্ছা দাবী করতে পারবে। যদি হাজার অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এটার মেয়াদ নির্ধারিত হয় যে, এতদিন পর দেয়া হবে। যদিও লিখিত হয় যে মেয়াদের পূর্বে দাবী করার এখতিয়ার থাকবে না। যদি তলব করে তা বাতিল হবে এবং শ্রবণযোগ্য হবে না। এসব শর্তাবলী বাতিল হবে। কর্জ দানকারীর যে কোন সময় দাবী করার এখতিয়ার থাকবে। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য ফিকাহর কিতাব)

মাসআলাঃ মুসাফির অথবা সেই নেসাবের মালিক যার নিজ মাল অন্যের নিকট কর্জ রয়েছে, প্রয়োজনের সময় যাকাতের মাল, প্রয়োজন পরিমাণ নিল, অতঃপর এর নিজের মাল একত্রিত হলো, যেমন, মুসাফির ঘরে পৌঁছলো বা নেসাবের মালিকের কর্জ উসুল হয়ে গেল, তখন যাকাতের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, এখনো তা নিজের খরচে নিতে পারবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যাকাত দাতার এখতিয়ার আছে ইচ্ছা করলে সাত প্রকারকে দিতে পারবে অথবা ওখান থেকে যে কোন এক প্রকারকে দিতে পারবে। এক প্রকারের কয়েক ব্যক্তিকে হোক বা একজনকে হোক, দেয়া যাবে। যাকাতের মাল যদি নিসাব পরিমাণ না হয়, একজনকে দেয়া উত্তম হবে। এক ব্যক্তিকে নেসাব পরিমাণ দেয়াটা মাকরূহ হবে। তবে দিয়ে দিলে আদায় হবে। এক ব্যক্তিকে নেসাব পরিমাণ দেয়া তখনই মাকরূহ হবে যদি দরিদ্র লোকটি ঋণগ্রস্ত না হয়, আর যদি ঋণগ্রস্ত হয় তখন এতটুকু দেয়া যে, ঋণ শোধ করার পর উদ্বৃত্ত না থাকলে বা নেসাবের চেয়ে কম উদ্বৃত্ত থাকলে মাকরূহ হবে না। অনুরূপ দরিদ্র লোকটি যদি সন্তান সন্ততির অধিকারী হয় যদিও নেসাব অতিরিক্ত আছে, কিন্তু পরিবার পরিজনকে বন্টন করে দিলে এবং সকলের অংশ যদি নেসাবের চেয়ে কম হয়, এমতাবস্থায়ও কোন ক্ষতি নেই। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যাকাত আদায় করার সময় জরুরী হলো যাকে দেয়া হবে তাকে সত্ব দান করা, অনুমতি যথেষ্ট নয়। তাই যাকাতের মাল মসজিদে খরচ করা, বা মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া বা মৃত ব্যক্তির কর্জ শোধ করা, বা গোলাম আজাদ করা, সেতু নির্মাণ করা, খাল বা কূপ খনন করা, সড়ক তৈরী করা, নদী বা কূপ খনন করা, এসব কাজে ব্যয় করা অথবা কিতাব ইত্যাদি কোন বস্তু ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দিলে আদায় হবে না। (জাওহেরা, তানভীর, আলমগীরি)

মাসআলাঃ ফকীরের কর্জ আছে তার কথা মতে যাকাতের মাল থেকে কর্জ আদায় করা হল, যাকাত আদায় হবে। আর যদি তার হুকুমে না হয় যাকাত আদায় হবে না। ফকীর অনুমতি দিল, কিন্তু আদায়ের পূর্বে সে মারা গেল, তখন এ কর্জ যদি যাকাতের মাল থেকে আদায় করা হয়, যাকাত আদায় হবে না। (দুররুল মোখতার)

উপরোক্ত বিষয়ে যাকাতের মাল ব্যয় করার উপায় আমি উপরে বর্ণনা করেছি, পন্থা অবলম্বন করার ইচ্ছা থাকলে করতে পারেন।

মাসআলাঃ নিজের মূল যেমন, মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমুখ আর যাদের আওলাদ আছে, নিজের আওলাদ, পুত্র, কন্যা, নাতি নাতনী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রমুখকে যাকাত দেয়া যাবে না। অনুরূপ সাদকা ফিত্রা, নজর, কাফ্ফারা ও ওদেরকে দেয়া যাবে না। তবে নফল সাদকা ওদের দেয়া যাবে, বরং দেয়াটা উত্তম। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার, অন্যান্য)

মাসআলাঃ জারজ সন্তান যেটা নিজ বীর্য থেকে সৃষ্টি অথবা সেই সন্তান যেটা তার বিবাহিত স্ত্রী থেকে বিবাহকালে জন্ম হয়েছে, কিন্তু সে বলেছে এটা আমার নয়, ওদের দেয়া যাবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ পুত্র বধু, জামাতা, সৎ মা, সৎ পিতা (মায়ের পূর্বের স্বামী) স্ত্রীর পূর্বের ঘরের সন্তান বা স্বামীর পূর্বের ঘরের সন্তানকে যাকাত দেয়া যাবে। যেসব আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব যাকাত দাতার উপর ওদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, যাকাত যদি ভরণ পোষণের হিসাবে গণ্য করা না হয়। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মাতা পিতা অভাবী (হিলা) কৌশল করে যাকাত দিতে চাইলে, প্রথমে ফকীরকে দেবে, ফকীর পুনরায় ওদেরকে দেবে, তবে এটা মাকরূহ। (রদ্দুল মোহতার) অনুরূপ হিলা করে নিজের সন্তানদের দেয়াও মাকরূহ।

মাসআলাঃ নিজের বা নিজের মূলের বা শাখার নিজ স্বামী বা নিজ স্ত্রীর গোলাম মুকাতিব মুদাব্বির, বা উম্মে ওয়ালাদ বা সেই গোলামকে যার কোন অংশের মালিক হয়েছে যদিও কিছু অংশ আজাদ হয়েছে, তাদের যাকাত দেয়া যাবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না। যদিও বাইন তালাক এবং তিন তিন তালাক প্রদত্ত হয়– যতক্ষণ ইদ্দতে থাকবে দেয়া যাবে না। ইদ্দত পূর্ণ হলে, দেয়া যাবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, যদি তা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, যেমন, ঘর, আসবাবপত্র পরিধানের কাপড়, সেবক, আরোহনের জন্তু হাতিয়ার, জ্ঞানী ব্যক্তির কিতাবাদি যা তার কাজে ব্যবহৃত, এসবগুলো মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। ওসব বস্তু এগুলো ছাড়া হলে যদিও বৎসর অতিক্রান্ত না হয় (যদিও সে সম্পদ বর্ধনশীল না হয়) ওদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। এখানে নেসাব অর্থ হল, এর মূল্য দুইশত দিরহাম হওয়া। যদিও বা এতটুকু না হয় যে, যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন কারো কাছে ছয় তোলা স্বর্ণ আছে যার মূল্য দুইশত দিরহাম যদিও বা ওর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যেহেতু স্বর্ণের নেসাব সাড়ে সাত তোলা। ওকে যাকাত দেয়া যাবে না। বা তার নিকট ত্রিশটি বকরী বা বিশটি গাভী আছে যার মূল্য দুইশত দিরহাম ওকে যাকাত দেয়া যাবে না, যদিও বিশটি গাভীর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অথবা ওর কাছে প্রয়োজন অতিরিক্ত আসবাব পত্র আছে– যা ব্যবসার জন্যও নয়, তা যদি দুইশত দিরহাম পরিমাণের হয় ওকে যাকাত দেয়া যাবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ সুস্থ সবল ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে যদিও উপার্জনের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ওর জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নেই। (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, ওর গোলামকেও যাকাত দেয়া যাবে না। যদিও গোলাম পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয় এবং ওর মুনীব ওকে খেতেও দিচ্ছে না, বা ওর মালিক অনুপস্থিত থাকলেও একই হুকুম। কিন্তু নেসাবের মালিকের মুকাতিব ও মাযুন গোলামকে দেয়া যাবে। ধনী ব্যক্তির প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান যদি ফকীর হয় ওকে যাকাত দেয়া যাবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ধনী ব্যক্তির স্ত্রীকে দেয়া যাবে, যদি নেসাবের মালিক না হয়। অনুরূপ ধনীর পিতাকে দেয়া যাবে যদি ফকীর হয়। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে স্ত্রীর মোহরানার কর্জ স্বামীর নিকট বাকী আছে যদিও তা নেসাব পরিমাণ হয়, স্বামী যদিও ধনবান হয় আদায় করতে সক্ষম হয় ওকে যাকাত দেয়া যাবে। (জাওহেরা নাইয়্যোরা)

মাসআলাঃ যে সন্তানের মাতা নেসাবের মালিক যদিও তার পিতা জীবিত না থাকে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যার কাছে দোকান বা ঘর আছে যেটা ভাড়ার ভিত্তিতে হয় এবং যেটার

মূল্য যদি তিন হাজার হয় কিন্তু তত টাকা যদি না থাকে যত টাকায় ছেলে মেয়ের ভরণ পোষণ যথেষ্ট হবে, তাহলে ওকে যাকাত দেয়া যাবে। অনুরূপ তার স্বত্বাধিকারে যদি ক্ষেত থাকে যাতে চাষ হয়, কিন্তু উৎপাদন যদি পূর্ণ বৎসরের খোরাক পরিমাণ না হয়, তাকে যাকাত দেয়া যাবে যদিও ক্ষেতের মূল্য দুইশত দিরহাম বা অতিরিক্ত হয়। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যার কাছে খাদ্যশষ্য আছে, যার মূল্যে দুইশত দিরহাম, সে শষ্য ফসল যদি পূর্ণ বৎসরের জন্য যথেষ্ট হয়, তবুও তাকে যাকাত দিলে হালাল হবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ শীতের কাপড়, গ্রীষ্মকালে যা প্রয়োজন হয় তা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত, সেই কাপড় যদিও অধিক মূল্যের হয়, তবুও যাকাত নিতে পারবে। যার নিকট বসবাসের ঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে, অর্থাৎ সব ঘরে তার বসবাস হয় না– সেই ব্যক্তি যাকাত নিতে পারবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ স্ত্রী, মাতা-পিতার পক্ষ থেকে যা প্রাপ্ত হয়, সেটার মালিক হবে স্ত্রী। এতে দু'ধরনের জিনিষ আছে, এক প্রকার প্রয়োজনীয় যেমন, গৃহ সমগ্রী, পরিধানের কাপড়, ব্যবহারের পাত্র, এ প্রকারের বস্তু যতই মূল্যবান হোক সেগুলো দ্বারা স্ত্রী ধনী হিসেবে গণ্য হবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে সেসব জিনিষ যেগুলো মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা সৌন্দর্যের জন্য দেয়া হয়। যেমন অলংকারাদি এবং প্রয়োজন ছাড়া সামগ্রী পাত্র, যাতায়াতের ভারী বাহন, এসব জিনিসের মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয় স্ত্রী ধনী হিসেবে গণ্য হবে, যাকাত নিতে পারবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মনিমুক্তা ইত্যাদি যার কাছে আছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যদি না হয়, সেটার যাকাত ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি নেসাবের মূল্যে পরিমাণ হয় তখন যাকাত নিতে পারবে না। (দুররুল মোহতার)

মাসআলাঃ যার ঘরে নেসাব পরিমাণ মূল্যের বাগান আছে, বাগানের ভিতর ঘরের প্রয়োজনীয় স্থান, রান্নাঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি নেই, তাহলে যাকাত নেয়াটা জায়েয হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বনী হাশেমকে যাকাত দেয়া যাবে না, না অন্য কেহ দেবে, না এক হাশেমী হাশেমী গোত্রের লোককে দেবে। বনী হাশেম হযরত আলী, জাফর, আকিল, হযরত আব্বাস, হযরত হারেস বিন আবদুল মুত্তালিব এর বংশধরকে বুঝায়,

এছাড়া যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সাহায্য করেনি, যেমন আবু লাহাব যদিও ওই কাফির হযরত আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কিন্তু তার আওলাদ বনী হাশিমীদের মধ্যে গণ্য হবে না। (আলমগীরি, অন্যান্য)

মাসআলাঃ বনী হাশেমের আজাদকৃত গোলামদেরকেও যাকাত দেয়া যায় না, তবে যেসব গোলাম ওদের মালিকানায় আছে ওদেরকে না দেয়াটা, প্রথম পর্যায়ের নাজায়েয। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য কিতাবসমূহ)

মাসআলাঃ মাতা হাশেমী বরং সৈয়্যদা, পিতা হাশেমী নয়, তাহলে হাশেমী হিসেবে গণ্য হবে না। শরীয়তে বংশধারা পিতা থেকে হয়, তাই এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে, যদি অন্য কোন বাধা না থাকে।

মাসআলাঃ নফল সাদকা এবং ওয়াক্‌ফের আমদানী বনী হাশেমকে দেয়া যাবে, ওয়াক্‌ফকারী ওদের জন্য নির্দিষ্ট করুক বা না করুক। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ জিম্মি কাফিরকে যাকাত দেয়া যাবে না, সাদকায়ে ওয়াজিবাও দেয়া যাবে না। যেমন মান্নত, কাফ্‌ফারা, সাদকায়ে ফিতর দেয়া যাবে না। হরবী বা আশ্রয়প্রাপ্ত কাফিরকে কোন প্রকার সাদকা দেয়া জায়েয নেই। ওয়াজিবও নয় নফলও নয়। যদিও সে ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী শাসক থেকে নিরাপত্তা নিয়ে আসে। (দুররুল মোখতার)

হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম, কিন্তু এখানকার কাফির জিম্মি নয়, ওদেরকে নফল সাদকাসমূহ যেমন হাদিয়া ইত্যাদি দেয়া জায়েয।

ফায়েদাঃ যেসব লোকদের যাকাত দেয়া নাজায়েয ওদেরকে অন্য সাদকায়ে ওয়াজিব, মান্নত, কাফ্‌ফারা ও ফিতরা দেয়াটা নাজায়েয নয়। গুপ্তধন ও খনিজ সম্পদ ব্যতীত ওসবের পঞ্চমাংশ নিজের মাতা পিতা ও সন্তান সন্ততিকেও দেয়া যায়। বরং অনেক সময় নিজের জন্যও খরচ করা যায়। যে সম্পর্কে উপরে বর্ণিত হয়েছে। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ যেসব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, তবে ওদেরকে ফকীর হওয়া শর্ত। যাকাত উশুলকারী ব্যতীত ওর জন্য ফকীর হওয়া শর্ত নয়। মুসাফির যদিও ধনী হয় কিন্তু সে সময় ফকীরের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট কাউকে যদি ফকীর না হয় যাকাত দেয়া যাবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত সে নিজ ভাইকে যাকাত দিল সেই ভাই হলো তার উত্তরাধিকার। তাই আল্লাহর নিকট যাকাত আদায় হবে। কিন্তু অন্য ওয়ারিশদের এখতিয়ার থাকবে যে, তার থেকে যাকাত ফিরিয়ে নিবে এটা ওসীয়তের পর্যায়ভুক্ত। এক ওয়ারিশের জন্য অনুমতি ব্যতীত অন্য ওয়ারিশের ওসীয়ত সহীহ নয়। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি কারো সেবা করছে, অথবা কারো নিকট কাজ করছে, ওকে যাকাত দিল, অথবা যিনি সুসংবাদ শুনালো তাকে দিল, বা ওকে দিল যিনি তার নিকট হাদিয়া প্রেরণ করলো, ওসব অবস্থায় জায়েয। তবে বিনিময়ের কথা উল্লেখ করে দিলে আদায় হবে না। রমজানের ঈদ কোরবানীর ঈদে পুরুষ মহিলা সেবক সেবিকাকে ঈদের কথা উল্লেখ করে দিলে আদায় হবে। (জাওহেরা, আলমগীরি)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি চিন্তা করল এবং অন্তরে একথা ধারণ করল, ওকে যাকাত দেয়া যায় এবং যাকাত দিয়ে দিল পরবর্তীতে প্রকাশ পেল, তিনি যাকাতের উপযুক্ত বা কোন অবস্থা জানা গেল না, আদায় হয়ে যাবে। যদি পরে জানতে পারে যে সে ধনী বা ওর পিতামাতার কেউ ছিল, বা নিজের সন্তান ছিলো, বা স্বামী ছিলো, বা স্ত্রী বা হাশেমী বংশের গোলাম ছিলো, বা আশ্রয়প্রাপ্ত কাফির ছিলো, তবুও আদায় হবে। আর যদি এটা জানা যায় যে, ওর গোলাম ছিলো, অথবা হরবী কাফির ছিলো, তখন আদায় হবে না। পুনরায় আদায় করবে এবং তা চিন্তা গবেষণার পর্যায়ভুক্ত হবে যে, সে কাউকে ধনী মনে না করে দিয়ে দিল বা ফকীরদের জামাতে ফকীরদের দলভুক্ত মনে করে দিয়ে দিল। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যদি চিন্তা-ভাবনা ছাড়া দিয়ে দিল, এটা ধারণায়ও এলো না যে, ওদের দেয়া যাবে কি না! পরে জানা গেল যে, ওদের দেয়া যাবে না আদায় হবে না, অন্যথায় হবে। দেয়ার সময় সন্দিহান ছিল, চিন্তা করেনি অথবা করেছে কিন্তু কোন দিকে অন্তরের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়নি, চিন্তা করেছে প্রবল ধারণা হলো যে, সে যাকাতের উপযুক্ত নয় এবং দিয়ে দিল উপরোক্ত অবস্থায় আদায় হবে না। কিন্তু দেয়ার পর যখন এটা প্রকাশ হল যে, বাস্তবিকই সে যাকাতের খাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তাহলে আদায় হবে। (আলমগীরি, অন্যান্য)

মাসআলাঃ যাকাত ইত্যাদি সাদকা সমূহে উত্তম হলো যে, প্রথমে নিজ ভাইদের বোনদের দিয়ে, অতঃপর ওদের সন্তানদের, অতঃপর চাচা ও ফুফুদের অতঃপর ওদের সন্তান-সন্ততিদেরকে, অতঃপর মামা ও খালাদেরকে তারপর ওদের সন্তান

সন্তুতিদেরকে, অতঃপর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনদেরকে, অতঃপর প্রতিবেশীদেরকে, তারপর নিজের সম্মুখদেরকে, অতঃপর নিজ শহর ও গ্রামে বসবাসকারীদেরকে দেয়া। (জাওহেরা, আলমগীরি)

হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মত! ঐ সত্তার শপথ যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির সাদকা কবুল করবেন না, যার আত্মীয়-স্বজন ওর সাহায্য ও সদাচার না পাওয়ার মুখাপেক্ষী কিন্তু সে অন্যদেরকে দান করে, কসম ঐ সত্তার যার কুদরতী হতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিবসে তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ অন্য শহরে যাকাত প্রেরণ করা মাকরূহ। তবে যদি ওখানে ওর আত্মীয়-স্বজন থাকে তখন ওদের জন্য প্রেরণ করা যাবে। অথবা ওখানকার লোকেরা যদি অধিক অভাবী হয় অথবা অধিক খোদাভীরু হয়, অথবা মুসলমানদের কল্যাণে ওখানে প্রেরণ করা অধিক উপকারী হয় অথবা দ্বীনি শিক্ষার্থীর জন্য প্রেরণ করা হলে বা মুত্তাকী লোকদের জন্য অথবা দারুল হারব, অমুসলিম রাষ্ট্র থাকলে এবং যাকাত দারুল ইসলামে পাঠালে, বা বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই প্রেরণ করা হলে উপরোক্ত সব অবস্থায় অন্য শহরে প্রেরণ করা মাকরূহ বিহীন জায়েয। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ শহর বলতে ঐ শহরকে বুঝানো হয়, যেখানে মাল আছে। যদি নিজে এক শহরে মাল অন্য শহরে তাহলে মাল যে শহরে ওখানকার ফকীরদেরকে যাকাত দেবে। আর সাদকা ফিতর এর ক্ষেত্রে ঐ শহর বুঝাবে, যে শহরে নিজে আছে, যদি নিজে এক শহরে এবং ওর ছোট ছেলেমেয়ে এবং গোলাম অন্য শহরে থাকে, তাহলে যেখানে নিজে থাকবে ওখানকার ফকীরদের মধ্যে সাদকায়ে ফিতর বন্টন করে দেবে। (জাওহেরা, আলমগীরি)

মাসআলাঃ বদ মযহাবীকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। (দুররুল মোখতার) বদ মযহাবীর যখন এ হুকুম, তাহলে বর্তমান যুগের ওহাবীরা যারা আল্লাহর প্রতি অসম্মান ও শানে রেসালাতে যারা মানহানি উক্তি করে এবং প্রচার করে যাদেরকে (মক্কা মদীনা) পবিত্র দুই হেরমের শীর্ষ ওলামারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির ও ধর্মচ্যুত আখ্যায়িত করেছেন, যদিও বা তারা নিজেরদেরকে মুসলমান বলে থাকে ওদেরকে যাকাত দেয়া হারাম, কঠোর হারাম, আর দিলে তা কখনো আদায় হবে না।

মাসআলাঃ যার কাছে আজকের খাবার মওজুদ আছে বা সুস্থ সবল ব্যক্তি উপার্জন করতে পারে ওর খাওয়ার জন্য ভিক্ষা করা হালাল হবে না। ভিক্ষা ছাড়া কেউ স্বেচ্ছায় দিলে নেয়াটা জায়েয। খাবার আছে পরিধানের কাপড় নেই, কাপড়ের জন্য ভিক্ষা চাইতে পারবে। অনুরূপ জিহাদ বা ইলমে দ্বীন অন্বেষণে নিয়োজিত যদিওবা সুস্থ সবল উপার্জনে সক্ষম, ওর জন্য ভিক্ষা করার অনুমতি আছে। যার জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নেই সে ভিক্ষা করলে দেয়াটাও জায়েয নেই। ওদেরকে দিলে দানকারীও গুনাহগার হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুস্তাহাব হলো, এক ব্যক্তিকে এতটুকু দেবে যেন ঐদিন ওর ভিক্ষা করা আর প্রয়োজন না হয়। এ বিষয়টি ফকীরের অবস্থা অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ওর খাবার অধিক সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা করে প্রদান করবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

সাদকায়ে ফিতরের বর্ণনা

হাদীস– ১ঃ সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা গোলাম, স্বাধীন, নারী পুরুষ, ছোট বড় সকল মুসলমানের উপর সাদকায়ে ফিতর হিসেবে এক সা খেজুর অথবা এক সা যব নির্ধারণ করেছেন এবং নামাজে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীস– ২ ঃ আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রমজানের শেষের দিকে বলেছেন, তোমরা তোমাদের রোজার সাদকা আদায় কর। এ সাদকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এক সা খেজুর বা যব, বা অর্ধ সা গম।

হাদীস– ৩ ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে তিনি পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একবার মক্কার গলিসমূহে ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করালেন যে, সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

হাদীস– ৪ ঃ আবু দাউদ ও ইবনে মাযাহ ও হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সাদকায়ে ফিতর রোজাকে অনর্থক কথাবার্তা ও অশালীন কথা হতে পবিত্র করার জন্য এবং নিঃস্বদের মুখে খাদ্য দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

হাদীস- ৫ ঃ দায়লামী, খতীব ও ইবনে আসাকির আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, বান্দার রোজা আসমান ও জমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে যতক্ষণ সাদকায়ে ফিতর আদায় না করে।

মাসআলাঃ সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব, সারা জীবন এর সময়। অর্থাৎ যদি আদায় না করে থাকে তাহলে এখন আদায় করা যাবে। আদায় না করলে রহিত হবে না। এবং যখনই আদায় করা হয় কাযা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং আদায় হিসেবে গণ্য হবে। যদিও ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করা সুন্নাত। (দুররুল মোখতার, অন্যান্য)

মাসআলাঃ সাদকায়ে ফিতর প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, মালের উপর নয়। তাই মারা গেলে ওর মাল থেকে আদায় করা যাবে না। তবে ওয়ারিশ যদি অনুগ্রহ পূর্বক নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে আদায় করতে পারে, তার উপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। আর যদি ওসীয়ত করে যায় যে, তখন তৃতীয়াংশ মাল থেকে অবশ্যই আদায় করবে। যদিও ওয়ারিশ অনুমতি না দেয়। (জাওহেরা, অন্যান্য)

মাসআলাঃ ঈদের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে মারা যায় বা ধনী, গরীব হয়ে গেল তখন ওয়াজিব হবে না। আর যদি সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর মারা যায় বা সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্বে কাফির মুসলমান হল বা শিশু জন্ম নিল বা ফকীর ছিল ধনী হল, তখন ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সাদকায়ে ফিতর প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমান নেসাব পরিমাণ মালিকের উপর মূল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত যার পূর্ণ নেসাব থাকে, তার উপর ওয়াজিব, এতে বিবেকবান প্রাপ্ত বয়স্ক, বর্ধনশীল মাল হওয়া শর্ত নয়। (দুররুল মোখতার) বর্ধনশীল মাল মূল প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বর্ণনা উপরে বর্ণিত হয়েছে, এক্ষেত্রে উক্ত বর্ণনা জেনে নেবে।

মাসআলাঃ নাবালেগ বা পাগল যদি নেসাবের অধিকারী হয় ওদের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে, ওদের অভিভাবক তাদের সম্পদ থেকে আদায় করে দেবে। (ওলী) অভিভাবক যদি আদায় না করে নাবালেগ বালেগ হয়ে যায় বা পাগল যদি সুস্থ হয়ে যায়, তখন তারা নিজেরাই আদায় করবে আর যদি নেসাবের অধিকারী না হয় ওলীও আদায় করেনি, তখন বালেগ হওয়া বা সংজ্ঞা ফিরে এলেও ওদের দায়িত্বে আদায় করতে হবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ সদকায়ে ফিতর আদায় করার জন্য মাল জমা থাকা শর্ত নয়, মাল ধ্বংস হওয়ার পরও সাদকা ওয়াজিব হিসেবে থাকবে, রহিত হবে না। যাকাত ও উশর এর বিপরীত, এ দুটি মাল ধ্বংস হওয়ার পর রহিত হয়ে যায়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ নেসাবের অধিকারী পুরুষের উপর নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে ফিত্‌রা দেয়া ওয়াজিব। ছেলে যদি স্বয়ং নেসাবের অধিকারী না হয়, অন্যথায় ওর সাদকা ওর মাল থেকে আদায় করতে হবে। পাগল সন্তান যদিও বালেগ হয়, ধানী না হলে ওর সাদকা ওর পিতার পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব। আর ধনী হলে ওর সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে। পাগল প্রকৃত হোক, অর্থাৎ প্রকৃত পাগল অবস্থায় বালেগ হল, বা পূর্ববর্তীতে কোন কারণে পাগল হল উভয় অবস্থায় একই হুকুম। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য রোজা রাখা শর্ত নয়। যদি কোন ওজর, সফর, রোগব্যাধি বা বার্ধক্যের কারণে (আল্লাহ না করুক) বা বিনা ওজরে রোজা রাখলো না, তবুও ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা যে স্বামীর খেদমত করার উপযুক্ত হয়েছে তাকে বিবাহ দিল, স্বামীর নিকট ওকে পাঠিয়েও দিল, তখন কারো উপর তার পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়, স্বামীর উপরও নয় পিতার উপরও নয়। আর যদি খেদমতের উপযুক্ত না হয়, বা স্বামীর কাছে তাকে পাঠানো হয়নি, তখন নিয়ম মোতাবেক পিতার উপর ওয়াজিব। এসব অবস্থায় তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি মেয়ে লোকটি নিজে নেসাবের অধিকারী না হয়। অন্যথায় সর্বাবস্থায় ওর সাদকায়ে ফিতর ওর মাল থেকে আদায় করতে হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ পিতা না থাকলে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ নিজের দরিদ্র এতিম, নাতি নাতনীর পক্ষ থেকে তার উপর সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মাতার উপর নিজের ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ খেদমতের গোলাম, মুদাব্বির, উম্মেওয়ালাদ এর পক্ষ থেকে মালিকের উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব যদিও গোলাম ঋণী হয়। যদিও কর্জের মধ্যে লিপ্ত গোলাম যদি বন্ধক রাখা হয়, মালিকের কাছে মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া এতটুকু আছে যে, কর্জ শোধ করে দিলেই নেসাবের মালিক থাকবে তখন মালিকের উপর ওর পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ ব্যবসায়িক গোলামের সাদকায়ে ফিতর মালিকের উপর ওয়াজিব নয়। যদিও ওর মূল্যে নেসাব পরিমাণ না হয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ গোলাম ধার দিল, বা কারো নিকট আমানত হিসেবে রাখলো তাহলে মালিকের উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। আর যদি অসিয়ত করে যায় যে, গোলামটি অমুকের কাজ করবে এবং আমার পর অমুক ব্যক্তি তার মালিক হবে, তখন ফিতরা মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। যার নিয়ন্ত্রণে আছে তার উপর নয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ পলাতক গোলাম এবং ঐ গোলাম যাকে অমুসলিমরা বন্দী করেছে ওদের পক্ষ থেকে সাদকা মালিকের উপর দিতে হবে না। অনুরূপ কেউ যদি ছিনতাই করে নেয় ছিনতাইকারী যদি অস্বীকার করে ওর কাছে স্বাক্ষীও নেই তখন তার ফিতরাও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যখন ফেরৎ পাওয়া যাবে তখন ওর পক্ষ থেকে বিগত বৎসর সমূহের ফিতরা দিতে হবে। কিন্তু অমুসলিম যদি গোলামের মালিক হয়ে যায়, তাহলে ফিরে পাওয়ার পরও তার ফিতরা দিতে হবে না। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মুকাতিব গোলামের ফিতরা মুকাতিবের উপরও নয় তার মালিককেও দিতে হবে না। অনুরূপ মুকাতিব ও মাযুনের গোলামের ক্ষেত্রে একই হুকুম। মুকাতিব যদি বিনিময় আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন মালিকের উপর বিগত বৎসর সমূহের ফিতরা দিতে হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ দু' বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোলাম যদি যুক্ত থাকে, তার ফিতরা দেয়া কারো উপর দায়িত্ব নয়। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গোলাম বিক্রয় করে দিল, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে ফেরতের এখতিয়ার রাখলো, ঈদুল ফিতর এসে গেল, এখতিয়ারের সময়সীমাও শেষ হলো না তখন তার ফিতরা স্থগিত থাকবে, বেচা কেনা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ক্রেতা দেবে, অন্যথায় বিক্রেতা দেবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ যদি ক্রেতা ত্রুটিজনিত কারণ বা দেখার শর্ত জনিত কারণে ফেরৎ দিল, এমতাবস্থায় গ্রহণ করে নিলে ক্রেতার উপর, অন্যথায় বিক্রেতার উপর। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গোলাম বিক্রি করলো, কিন্তু ক্রয় বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেল, ক্রেতা গ্রহণ করে ফেরত দিল বা ঈদের পর গ্রহণ করে স্বাধীন করে দিল তখন বিক্রেতার উপর, আর যদি ঈদের পূর্বে গ্রহণ করে এবং ঈদের পর স্বাধীন করে দেয় তখন

ক্রেতাকে ফিতরা দিতে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মালিক গোলামকে বললো, ঈদের দিন আসলে তুমি আজাদ, ঈদের দিন গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। মালিকের উপর তার ফিতরা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নিজ স্ত্রী বা বিবেকবান বালেগ সন্তান সন্ততির ফিতরা তার জিম্মায় নয়, যদিও পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হয়, যদি তার খরচাদি ওর দায়িত্বে হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্ত্রী বা বালেগ সন্তানের ফিতরা ওদের অনুমতি বিহীন আদায় করে দিল, আদায় হবে। তবে শর্ত হলো সন্তান সন্ততি যদি তার পরিবারে থাকে অর্থাৎ ওদের ব্যয়ভার ইত্যাদি যদি তার জিম্মায় হয়, অন্যথায় সন্তানের পক্ষ থেকে অনুমতি বিহীন আদায় হবে না। স্ত্রী স্বামীর ফিতরা বিনা হুকুমে আদায় করে দিল, আদায় হবে না। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার, অন্যান্য)

মাসআলাঃ মাতা পিতা, দাদা-দাদী, নাবালেগ ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ফিতরা তার জিম্মায় নয় এবং বিনা হুকুমে আদায়ও করতে পারবে না। (আলমগীরি, জাওহেরা)

সাদকায়ে ফিতর'র পরিমাণ

মাসআলাঃ সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হলো, গম বা গমের আটা বা সাতু অর্ধ 'সা, খেজুর, মোনাক্কা বা যব বা যবের আটা বা সাতু এক 'সা। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ গম, যব, মোনাক্কা, খেজুর দিলে, এগুলোর মূল্যে ধর্তব্য হবে না। যেমন, অর্ধ 'সা উত্তম যব যার মূল্যে এক সা যব এর সমান বা চতুর্থ 'সা ক্ষুরা গম যা মূল্যের অনুপাতে অর্ধ 'সা গমের সমান অথবা অর্ধ 'সা খেজুর দিবে যা এক 'সা যব বা অর্ধ 'সা গমের মূল্যের সমান হবে– এসব নাজায়েয, যতটুকু দিল ততটুকু আদায় হল অবশিষ্ট ওর জিম্মায় ওয়াজিব, আদায় করতে হবে। (আলমগীরি, ইত্যাদি)

মাসআলাঃ অর্ধ 'সা যব বা চার কেজি গম, বা অর্ধ 'সা খেজুর দিল তবুও জায়েয হবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ গম ও যব একসাথে মিশ্রিত হলে গম অধিক হলে তখন অর্ধ 'সা দেবে, অন্যথায় এক 'সা দেবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ গম বা যব দেয়ার চেয়ে সেটার আটা দেয়া উত্তম, তার চেয়ে মূল্যে দেয়াটা উত্তম। তা গমের হোক যবের বা খেজুরের মূল্য হোক। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় মূল্যে দেয়ার চেয়ে খাদ্য সামগ্রী দেয়াটা উত্তম।

আর যদি নিম্নমানের গম বা যবের মূল্য দেয়া হয়, তাহলে ভাল গম বা যবের মূল্য থেকে যা কম হবে, তা পূর্ণ করে দেবে। (দুররুল মোখতার রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ উক্ত চার বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করতে চাইলে যেমন চাউল, বাজরা (একপ্রকার শষ্য) অন্য কোন শষ্য অথবা অন্য আর কোন জিনিষ দিতে চাইলে মূল্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে, অর্থাৎ ঐ বস্তু অর্ধ 'সা গম বা এক 'সা যবের মূল্য পরিমান যেন হয়।এমনকি রুটি দিলে সেক্ষেত্রেও মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যদিও বা গমের বা যবের রুটি হোক। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলা ঃ চুড়ান্ত গবেষণার আলোকে প্রমাণিত যে, সতর্কতা হচ্ছে এক সা র ওজন হচ্ছে তিনশ' একান্ন টাকার ওজনের সমপরিমান, অর্ধ 'সা র ওজন হচ্ছে একশ পচাত্তর টাকার আটআনা ওজনের সমান।(ফতোয়ায়ে রিজভিয়্যাহ)

মাসআলা ঃ অগ্রিম ফিতরা দেয়া সাধারণতঃ জায়েয আছে । যার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যদিও উপস্থিত থাকে। যদিও রমজানের আগে আদায় করা হয়। ফিতরা আদায় করেছিল তখন নেসাবের মালিক ছিলনা পরে মালিক হয়েছে ফিতরা আদায় শুদ্ধ হবে।তবে উত্তম হলে ঈদের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার পর ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা। (দররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলা ঃ এক ব্যাক্তির ফিতরা একজন মিসকীনকে দেয়া উত্তম। কয়েকজন মিসকীনকে দিলে তবুও জায়েজ হবে। অনুরূপ একজন মিসকীনকে কয়েকজনের ফিতরা দেয়াটাও মতভেদবিহীন জায়েয। যদিও বা সব ফিতরা একত্র হয়ে যায়। (দুরুল মোখতার, রদুল মোখতার)

মাসআলা ঃ স্বামী, স্ত্রীকে নিজের ফিতরা আদায় করার হুকুম দিল, সে স্বামীর ফিতরার গম নিজের ফিতরার গম সাথে মিলায়ে ফকিরকে দিল কিন্তু স্বামী মিলানের হুকুম দেননি এতে স্ত্রীর ফিতরা আদায় হবে, স্বামীর আদায় হবেনা। কিন্তু মিলায়ে দেয়াটা যদি প্রচলন থাকে তখন স্বামীরটাও আদায় হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার রদ্দুল মোহতার)

মাসআলা ঃ স্ত্রী স্বামীকে নিজের ফিতরা আদায় করার অনুমতি দিল সেই স্ত্রীর গম নিজের গমের সাথে মিশায়ে সকলের নিয়ত করে ফকীরকে দিল জায়েজ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ সাদকায়ে ফিতর ব্যয়ের খাত হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো যাকাত দানের খাত, যাদেরকে যাকাত দেয়া যায় ওদেরকে ফিতরাও দেয়া যাবে।যাদেরকে যাকাত দেয়া যায় না ওদেরকে ফিতরাও দেয়া যাবে না। তবে আমিল বা যাকাত উশুলকারক ব্যতীত, তাকে যাকাত দেয়া যাবে ফিতরা দেয়া যাবে না। (দররুল মোখতার রদ্দুল মোহতার)

মাসআলা ঃ স্বীয় গোলামের স্ত্রীকে ফিতরা দেয়া যাবে। যদিও তার ব্যয়ভার মালিকের উপর হয়। (দুররুল মোখতার)

ভিক্ষা করা কার জন্য হালাল আর কার জন্য হালাল নহে

আজকাল একটি ব্যধি সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, এক শ্রেনীর সুস্থ সবল মানুষ নিজে খেয়ে অন্যদেরকেও খাওয়াবে। কিন্তু যারা নিজের অস্তিত্বকে অর্থহীন করে রেখেছে, তাদের চিন্তাধারা পরিশ্রম ও কষ্ট পোহাবে কেন? বিনা কষ্টে যখন পাওয়া যায় তাহলে কষ্ট কেন সহ্য করবে? অবৈধ পন্থায় তারা ভিক্ষা করতে থাকে। ভিক্ষা করে পেট ভর্তি করে থাকে। অনেকে এমন আছে যারা পরিশ্রম দুরে থাক্ ছোট খাট ব্যবসা বানিজ্য করাকে তারা লজ্জা মনে করে এমন লোকের পক্ষে ভিক্ষা করা প্রকৃতপক্ষে লজ্জাজনক ও অপমানকর। এ ঘৃন্য কাজকে তারা সম্মানজনক মনে করে অনেকে ভিক্ষা করাকে নিজের পেশা হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছে। ঘরে হাজার টাকা সুদের কারবার করে থাকে। ক্ষেত ফসল কৃষি কাজ ইত্যাদি করে থাকে, কিন্তু ভিক্ষা করা পরিত্যাগ করে নাই। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিয়ে বসে যে এটা আমাদের পেশা। জনাব আমরা কি আমাদের পেশা ছেড়ে দেব? অথচ ভিক্ষা করা তাদের জন্য হারাম। যেসব লোক ওদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ওদের পক্ষে তাদেরকে দান করা জায়েয নেই। এখন কয়েকটি হাদীস শ্রবণ করুন। দেখুন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এমন ভিক্ষুকদের ব্যাপারে কি এরশাদ করেছেন।

হাদীস– (১) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন: মানুষ

সর্বদা লোকের কাছে সওয়াল বা ভিক্ষা করতে থাকে এমনকি কিয়ামতের দিন আসবে যখন তার মুখে গোশতের একটু প্রলেপও থাকবে না অর্থাৎ বেইজ্জত অবস্থায় উঠবে।

হাদীস– (২-৪) ঃ আবু দাউদ তিরমিযী নাসাঈ ইবনে হাব্বান সামুরা বিন জুনদব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যাচ্না হল এক প্রকার জখম স্বরূপ, যদ্বারা যাচনাকারী নিজের মুখ মন্ডলকে জখম করে থাকে, যে চায় নিজ মুখ মন্ডলকে অক্ষত রাখতে পারে, আর যে চায় জখম হওয়ার জন্য ছেড়ে দিতেও পারে। তবে হ্যাঁ কোন ব্যক্তি দেশের সরকারের কাছে কিছু যাচ্না করতে পারে (যার কাছে জনগণের অধিকার রয়েছে) অথবা এমন বিষয়ে যাচ্না করতে পারে যা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। (এমতাবস্থায় জায়েয) অনুরূপ হাদীস ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং তিবরানী জাবের বিন আবদুল্লাহ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস– (৫) ঃ বায়হাকী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সওয়াল করে অথচ তার না অভাব আছে না এ পরিমাণ সন্তান সন্ততি আছে যেগুলোর সামর্থ তার নেই, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে, তার মুখের মধ্যে গোশত থাকবে না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরো এরশাদ করেন, যার অভাব নেই এমন সন্তান সন্ততিও নেই যে সবের সামর্থ তার নেই, সে যদি সওয়ালের দ্বার উম্মুক্ত করে আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দ্বার উম্মুক্ত করবেন এমন স্থান থেকে যা তার খেয়ালেও নেই।

হাদীস– (৬–৭) ঃ ইমাম নাসাঈ আয়েজ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যদি লোকেরা জানতে পারতো ভিক্ষা করাতে কি রয়েছে তাহলে কেউ কারো নিকটে ভিক্ষা করতে যেতো না। অনুরূপ হাদীস তিবরানী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

হাদীস– (৮–৯) ঃ অভাবমুক্ত ব্যক্তি ভিক্ষা করলে কিয়ামতের দিবসে তার চেহারায় দোষ দেখা দেবে। বাজ্জাজ এর বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, ধনী ব্যক্তির ভিক্ষা আগুন, যদি সামান্য দেওয়া হয় তা সামান্য রূপ লাভ করবে, অধিক দেওয়া হলে তা অধিক রূপ নেবে। অনুরূপ হাদীস ইমাম আহমদ বাজ্জাজ তিবরানী সওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

হাদীস– (১০) ঃ তিবরানী কবীরে, ইবনে খোজায়মা স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে তিরমিযী ও বায়হাকী শরীফে হাবশী বিন জুনাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিনা অভাবে ভিক্ষা করে সে যেন অঙ্গার ভক্ষন করছে।

হাদীস– (১১) ঃ মুসলিম শরীফে ও ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের মাল বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে যাচ্না করবে, সে যেন গরম বস্তু খণ্ডের যাচ্না করছে (তবুও) সে ইচ্ছা করলে যাচ্না বেশী করুক বা যাচ্না কম করুক।

হাদীস)– (১২) ঃ আবু দাউদ ইবনে হাব্বান ইবনে খোজায়মা হযরত সাহল বিন হানজালাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিছু যাচ্না করে অথচ তার কাছে এতটুকু সম্পদ আছে যা তাকে অমুখাপেক্ষী করে নিশ্চয়ই সে আগুন অধিক সংগ্রহ করছে। হুজুরকে জিজ্ঞেস করা হল– ধনাঢ্যতার সীমা কতটুকু? রাসুলুল্লাহ এরশাদ করেন, সকাল বিকালের খাদ্য পরিমাণ।

হাদীস– (১৩) ঃ ইবনে হাব্বান স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে, আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মাল বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে যাচ্না করে তা হচ্ছে, জাহান্নামের গরম প্রস্থর খণ্ড, এতদসত্বেও তার এখতিয়ার রয়েছে, চায় সে কম যাচ্না করুক, চায় বেশী যাচ্না করুক।

হাদীস– (১৪-১৫) ঃ ইমাম আহমদ, আবু আলা, বাজ্জাজ, আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে তিবরানী ছগীরে, হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, সাদকা দ্বারা সম্পদ কম হয় না, হক ক্ষমা করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। বান্দা ভিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করবে না, আল্লাহ তার মুখাপেক্ষীতার দরজা খুলবেন।

হাদীস– (১৬) ঃ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ শরীফে হযরত কোবায়জা ইবনে মুবারক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি দেনার জামিন হলাম, উক্ত

কর্জ পরিশোধ করনার্থে কিছু চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ'র নিকট আসলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, আমার কাছে যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, তখন তোমাকে কিছু দিতে আদেশ করব, অতঃপর বললেন, হে কোবায়সা! তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন লোকের পক্ষে সওয়াল করা হালাল নহে, এক- ঐ ব্যক্তি যে অপরের দেনার জামিন হয়েছে, তার জন্য যাচ্না করা হালাল, যতক্ষণ না সে দেনা পরিশোধ করে। অতঃপর সে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখবে। আর ঐ ব্যক্তি যার উপর এমন বিপদ এসেছে যা তার সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে, তার জন্য সওয়াল করা হালাল, যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণ করার মত অথবা তিনি বলেছেন, বেচে থাকার মত কিছু অর্জন করে, আর একজন ঐ ব্যক্তি যে অভাবে পড়েছে এমনকি তার গোত্রের তিনজন প্রতিবেশী সাক্ষ্য দিবে যে, সত্যিই সে অভাবগ্রস্ত, তার জন্য সওয়াল করা হালাল, যতক্ষণ না সে তার জীবিকা নির্বাহের মত অথবা বেচে থাকার মত কিছু অর্জন করে এ তিন অবস্থায় সওয়াল ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার সওয়াল হারাম। হে কোবায়সা, সওয়ালকারী সওয়ালের দ্বারা যা ভক্ষণ করে তা হারাম।

হাদীস- (১৭-১৮) ঃ ইমাম বোখারী, ইবনে মাযাহ্ যুবাইর বিন আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তোমাদের কেহ রশি নিয়ে লাকড়ীর বোঝা নিজের পিঠে বহন করে আনবে এবং তা বিক্রি করবে, আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা তার ইজ্জত রক্ষা করবেন, এটা তার জন্য সেটা হতে উত্তম যে, সে লোকের কাছে যাচ্না করবে আর লোক তাকে কিছু দিবে অথবা নিষেধ করবে। অনুরূপ হাদীস ইমাম বোখারী, মুসলিম, ইমাম মালেক, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস- (১৯) ঃ ইমাম মালেক, ইমাম বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, তিনি তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাদকা এবং সওয়াল হতে বিরত থাকা সম্পর্কে বলতেছেন, উপরের হাত নিচের হাত হতে শ্রেয়। উপরের হাত হল দাতার হাত, নীচের হাত হল ভিক্ষুকের হাত।

হাদীস- (২০) ঃ ইমাম মালেক, ইমাম বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য হতে একদল লোক রাসূলুল্লাহর কাছে কিছু চাইলেন, হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে দিলেন, অতঃপর তারা আবারও চাইলেন, এবারও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে দিলেন। এভাবে যা ছিল নিঃশেষ হল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আমার নিকট যে মাল থাকবে আমি তা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখব না। (মনে রেখো) যে ব্যক্তি সওয়াল হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেঁচে থাকার পথ করে দেন। যে কারো মুখাপেক্ষী না হতে চায় আল্লাহ তাকে পর, মুখাপেক্ষী করেন না। যে ধৈর্য্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্য্য ধারণ করার সামর্থ দান করেন। মনে রেখো, ধৈর্য্য ধারণ হতে উত্তম ও প্রশস্ত কোন দান কাউকে দেয়া হয় না।

হাদীস- (২১) ঃ হযরত আমিরুল মুমেনীন ফারুকে আজম ওমর (রাঃ) বলেন, লোভ হচ্ছে মুখাপেক্ষীতার কারণ। নৈরাশ্যতা হচ্ছে প্রাচুর্যতা। মানুষ যখন কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তখন তার পর্দা থাকে না।

হাদীস- (২২) ঃ ইমাম বোখারী, মুসলিম হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামা যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি আরজ করতাম, এমন কাউকে দিন যিনি আমার চেয়ে অধিক অভাবী। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন তুমি ইহা লও এবং নিজের মালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আর তা থেকে দান কর। আর যে মাল তোমার কাছে আসে অথচ তুমি তার লালসা এবং উহার জন্য যাচ্নাও করনি, তা নিয়ে নাও, আর যা এভাবে আসে না তার পিছনে নিজের মনকে নিয়োজিত করো না।

হাদীস- (২৩) ঃ আবু দাউদ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারীদের এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে কিছু সওয়াল করতে আসল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? সে বলল, জি হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে এর এক অংশ আমরা গায়ে দেই এবং অপর অংশ বিছাই। আর একটি পেয়ালা আছে যা দিয়ে আমরা পানি পান করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ঐ দু'টি আমার কাছে নিয়ে আস। সে উভয়টি তাঁর নিকট নিয়ে আসল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উভয়টি নিজের হাতে নিয়ে বললেন, এ দু'টি কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এ দু'টি এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে চাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, কে এক দিরহামের বেশী

দিতে পার? এ কথা তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন, এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টি দু'দিরহামে নিতে পারি। তিনি উভয়টি তাকে দিলেন এবং দু'দিরহাম নিলেন এবং আনসারীকে দিরহাম দু'টি দিয়ে বললেন, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনবে এবং তা নিজের পরিবারকে দিবে এবং অপর দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনবে। তা নিয়ে আমার কাছে আসবে, (আদেশমত) সে তা নিয়ে নবীর কাছে আসল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজের হাতে ইহাতে কাঠের বাঁট লাগিয়ে দিলেন, অতঃপর বললেন, তুমি এটা নিয়ে যাও এবং (জঙ্গলে গিয়ে) কাঠ কাটতে থাক এবং বিক্রি কর। আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে আর না দেখি, অতঃপর সে (পনের দিন পর) হুজুরের কাছে আসল, তখন সে দশ দিরহামের মালিক। কিছু দিরহাম দ্বারা সে কাপড় ছোপড় খরিদ করল, আর কিছু দ্বারা খাদ্যদ্রব্য। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, এটা তোমার জন্য কিছু চাওয়া হতে উত্তম। সাওয়াল (ভিক্ষা) কিয়ামতের দিন তোমার মুখ মন্ডলে দাগ স্বরূপ হবে। স্মরণ রেখো, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে কিছু যাচ্না করা উচিৎ নহে, (এক) মাটিতে মিশায়ে দেয় এমন অভাবী (দুই) চরম লাঞ্ছিত দেনাদার (তিন) পীড়াদায়ক রক্তপন বা দিয়তের জন্য কষ্টের স্বীকার।

হাদীস– (২৪-২৫) : আবু দাউদ, তিরমিযী সহীহ ও হাসান সূত্রে, হাকেম সহীহ সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে অভাবে পড়ল এবং তা লোকদের কাছে প্রকাশ করল, তার অভাব-মোচন হবে না। আর যে আল্লাহ তা'আলার কাছে নিবেদন করল, অদুর ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন, শীঘ্রই তার মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা বিলম্বে তাকে ধনী করার মাধ্যমে। তিবরানী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অথবা অভাবী এবং তা মানুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছে আল্লাহর দরবারে নিবেদন করছে, তখন আল্লাহর হক ঐ লোকের জন্য এক বৎসরের হালাল জীবিকা প্রশস্ত করে দিবে। কতেক ভিক্ষুক বলে থাকে যে, আল্লাহর জন্য দাও, খোদার ওয়াস্তে দিন, অথচ এসব ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এক হাদীসে এদেরকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে, আর এক হাদীসে, সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। আর কেউ যদি এ ধরনের যাচ্না করে যতক্ষণ না মন্দ কথার সওয়াল করবে, অথবা স্বয়ং সওয়াল যদি খারাপ না হয় যেমন, ধনী বা এমন ব্যক্তির যাচ্না করা যিনি সক্ষম সুস্থ উপার্জনে সক্ষম,

সওয়ালকে বিনা কষ্টে পূর্ণ করতে পারলে পূর্ণ করাটা হবে আদব। বাহ্যিকভাবে হাদীসের আলোকে যেন শাস্তির যোগ্য না হয়, হ্যাঁ ভিক্ষুক যদি নাছোড় হয় দিবে না, উপরন্তু এটাও স্মরণ রাখবে যে, মসজিদে সওয়াল বা ভিক্ষা করবে না। বিশেষতঃ জুমার দিনে মানুষের কাঁধ অতিক্রম করে সওয়াল করা হারাম, বরঞ্চ কতেক ওলামারা বলেছেন যে, মসজিদে ভিক্ষুক কে এক পয়সা দিলে আরো সত্তর পয়সা খায়রাত করতে হবে। যা এক পয়সার কাফ্ফারা স্বরূপ। হযরত মাওলা আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে আরাফার দিবসে আরাফাতে সওয়াল করতে দেখছেন, তাকে বেত্রাঘাত করেছেন, বললেন, এ দিনে এ স্থানে গায়রুল্লাহ থেকে সওয়াল করতেছ? উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে জানা হল যে, ভিক্ষা করা নিতান্ত অপমানকর কাজ। অপ্রয়োজনে সওয়াল করবে না, প্রয়োজনাবস্থায়ও সেসব বিষয়াদি সজাগ দৃষ্টিতে স্মরণ রাখবে যেসব ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সওয়াল করা যদি একান্ত প্রয়োজনও হয়ে পড়ে, সীমা লংঘন করবে না, না নিয়ে পিছ পা হবে না বা ছাড়বে না, এটারও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

তিবরানী, মু'জমে কবীরে হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন

مَلْعُوْنٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللّٰهِ وَمَلْعُوْنٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللّٰهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَالَمْ يَسْأَلْ هُجْرًا.

অর্থাৎ, অভিশপ্ত সে, যে আল্লাহর ওয়াস্তে ভিক্ষা করেছে ভিক্ষুককে দেয়া হয়নি, যতক্ষণ না সওয়াল করা পরিত্যাগ করে ।

তাজনীসে নাসেরী, তাতারখানিয়া, হিন্দিয়া গ্রন্থে আছে–

إِذَا قَالَ السَّائِلُ بِحَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى أَوْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْطِيَنِيْ كَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَالْأَحْسَنُ فِي الْمُرُوَّةِ أَنْ يُعْطِيَهُ وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ يُعْجِبُنِيْ إِذَا سَأَلَ بِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى أَنْ لَا يُعْطٰى.

অর্থাৎ যখন কোন ভিক্ষুক আল্লাহর ওয়াস্তে, অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ওয়াস্তে বললো, আমাকে এই জিনিষটা দান করুন, তার উপর উপরোক্ত বিধান আরোপ উত্তম হবে না, মানবিক কারণে তাকে দান করা উত্তম। মুবারক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাওয়া হয়. তখন না দেয়াটা আমাকে আশ্চার্যান্বিত করে।

নফল সাদকা সমূহের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করা অত্যন্ত উত্তম কাজ। মাল যদি তোমার উপকারে না আসে, তোমার কি কাজ হবে? যেটা ভক্ষণ করেছো, পরিধান করেছো এবং আখেরাতের জন্য ব্যয় করেছো, সেটাই তো কাজে আসল, যেটা সঞ্চয় করেছো বা অন্যদের জন্য রেখে গেছো সেটা নয়। দান সম্পর্কিত ফজীলত প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস শুনুন, এর উপর আমল করুন, আল্লাহ্ তৌফিক দানকারী।

হাদীসের আলোকে নফল সাদকা'র গুরুত্ব

হাদীস- (১) ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, বান্দা বলে থাকে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, তার সম্পদ দ্বারা তার তিন প্রকার উপকার- যা খেয়ে নিঃশেষ করেছে, পরিধান করে পুরাতন করেছে, বা দান করে আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করেছে, এসব ছাড়া অন্যগুলো গমনকারী অন্যদের জন্য ছেড়ে যাবে।

হাদীস- (২) ঃ বোখারী ও নাসাঈ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন- নিজের মালের চেয়ে ওয়ারিশের মাল নিজের কাছে বেশী প্রিয় তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে? ছাহাবারা আরজ করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এরকম কেউ নেই, যার নিকট নিজের মাল প্রিয় নয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, নিজের মাল তো সেটাই যেটা পূর্বে খরচ করা হয়েছে, যেটা পিছনে ছেড়ে রাখা হয়েছে, সেটা ওয়ারিশের মাল।

হাদীস- (৩) ঃ বোখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে তবে আমি এটাই পছন্দ করব যে, আমার তিন রাত্র অতিক্রম করতে না করতেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যদ্বারা আমি কর্জ পরিশোধ করব।

হাদীস- (৪-৫) ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন- যখনই আল্লাহর বান্দারা ঘুম হতে সকালে উঠে, আসমান হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, একজন বলেন হে আল্লাহ! দাতার প্রতিদান দাও, অপরজন বলেন, তুমি কৃপণকে সর্বনাশ

কর। অনুরূপ হাদীস ইমাম আহমদ বিন হাব্বান হাকেম প্রমুখ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস- (৬) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)কে বলেন, খরচ করতে থাক? হিসাব করো না! তাহলে আল্লাহ তোমাকে দিতে হিসাব করবেন। ধরে রেখো না, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার ব্যাপারে ধরে রাখবেন, যতটুকু সম্ভব দান করতে থাক।

হাদীস- (৭) বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি (আমার উদ্দেশ্যে) খরচ কর, আমি তোমাকে দান করব।

হাদীস- (৮) ঃ সহীহ্ মুসলিম, সুনান, তিরমিযী শরীফে হযরত আবু ওসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা আছে তা দান করবে। এটা তোমার জন্য উত্তম। আর যদি ধরে রাখ তা হবে তোমার জন্য অকল্যাণ। তুমি নিন্দার যোগ্য হবে না, যদি জীবন ধারণ উপযোগী সম্পদ ধরে রাখ, আর দানের ব্যাপারে তোমার পোষ্যদের থেকে আরম্ভ করবে।

হাদীস- (৯) ঃ বোখারী, মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত দু' ব্যক্তির মত যাদের শরীরে দু'টি লৌহবর্ম আছে যার দরুন তাদের দু'হাত তাদের দু'বুকের ছাতি ও ঘাড়ের সাথে মিশিয়ে আছে, দানশীল যখনই দান করার ইচ্ছা করে হাত খুলে যায়। আর কৃপণ যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন তা' আরো কষে যায় এবং প্রতিটি কড়া নিজ নিজ স্থানে চলে যায়। সে প্রশস্ত করতে চাইলেও প্রশস্ত হয় না।

হাদীস- (১০) ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, জুলুম হতে বেঁচে থাকবে, কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে, কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে ধ্বংস করেছে, তাদেরকে রক্ত পাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

হাদীস– (১১) ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, এয়া রাসূলাল্লাহ! সওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান বড়? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, যখন তুমি দান কর এমন অবস্থায় যে তুমি সুস্থ মালের প্রতি রক্ষণশীল, তুমি দরিদ্রকে ভয় কর, ধনী হওয়ার আশা পোষণ কর, সুতরাং তুমি এ ব্যাপারে ঢিল দিবে না। যতক্ষণ না তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুককে দাও, এ মাল অমুককে দাও, অথচ এটা অমুকের জন্য হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ওয়ারিশের জন্য।

হাদীস– (১২) ঃ বোখারী, মুসলিম শরীফে হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকটে পৌছলাম, তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় বসেছিলেন। যখন তিনি আমাকে দেখলেন বলে উঠলেন, কা'বা গৃহের প্রভুর শপথ! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত! ইহা শুনে আমি বললাম, আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য কোরবানী হোক। হুজুর তারা কারা? হুজুর বললেন, যাদের কাছে অনেক মাল সম্পদ আছে কিন্তু যে এরূপ বা এরূপ বা এরূপ করে (অর্থাৎ দান করে) সামনের দিকে পিছন দিকে ডান দিকে ও বাম দিকে (তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়) আর এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম।

হাদীস– (১৩) ঃ সুনান, তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে, বেহেশতের নিকটে, মানুষের কাছাকাছি, দোযখ হতে দূরে। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হতে দূরে, বেহেশত হতে দূরে, মানুষ হতেও দূরে, কিন্তু দোযখের নিকটে। মূর্খ দানশীল ব্যক্তি কৃপণ এবাদতকারী হতে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

হাদীস– (১৪) ঃ সুনানে আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করার চাইতে তার জন্য উত্তম।

হাদীস– (১৫) ঃ ইমাম আহমদ, নাসাঈ, দারামী তিরমিযী হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে দান করে বা দাসদাসী মুক্ত করে সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে নিজে পরিতৃপ্তির সাথে খাইয়ে অন্যকে উপহার দেয়।

হাদীস– (১৬) ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি জঙ্গলে ছিল, সে মেঘের মধ্যে একটি শব্দ শুনতে পেল, অমুকের বাগান পানিতে সিক্ত কর, তখন মেঘ একদিকে চলে গেল এবং এক প্রস্তরময় স্থানে পানি বর্ষণ করল, তখন দেখা গেল নালা সমূহের মধ্যে একটি নালা পানির সম্পূর্ণটা নিজের মধ্যে জমা করে নিল, লোকটি পানির অনুসরণ করে দেখল যে, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে এবং কোদাল দ্বারা পানিগুলো নিজের বাগানে ভাসিয়ে দিচ্ছে, সে তাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা আপনার নাম কি? সে জবাবে বলল অমুক? সে সেই নামটি শুনল যা সে মেঘের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন? তখন (প্রথমোক্ত ব্যক্তি) বললেন, আমি মেঘের ভিতর একটি শব্দ শুনেছি যে, মেঘ হতে এ পানি বর্ষিত হয়েছে বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে পানি বর্ষাও। যেখানে আপনার নাম বলা হয়েছে। আপনি এ বাগানে কি করেন? সে বলল যখন আপনি এরূপ বলেছেন তবে শুনুন– এ বাগানে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা আমি দেখি, এর এক তৃতীয়াংশে আমি দান করি এক তৃতীয়াংশে আমি ও আমার সন্তানাদি খায় অপর এক তৃতীয়াংশ এ জমীনের বপনের কাজে লাগাই।

হাদীস– (১৭) ঃ সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি ছিল, একজন কুষ্ঠরোগী একজন মাথায় টাকপড়া এবং একজন অন্ধ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন, তাদের কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন, ফেরেশতা কুষ্ঠরোগীর কাছে আসল এবং তাকে বলল, তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বলল রং উত্তম, চর্ম আর আমার সেই ব্যাধি দূর হয়ে যাওয়া যে কারণে লোক আমাকে ঘৃণা করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলালেন তার ঘৃণার বস্তু দূর হয়ে গেল। অতি সুন্দর রং ও উত্তম চর্ম দেয়া হল। ফেরেশতা বললেন, তোমার নিকট কোন মাল অধিক প্রিয়? লোকটি বলল, উট অথবা গাভী। বর্ণনকারী ইসহাকের সন্দেহ হয় কুষ্ঠরোগী অথবা মাথায় টাকপড়া ব্যক্তির একজন উটের কথা বলল এবং অপরজন গরুর কথা বলল, হুজুর বললেন, তাকে দশ মাসের গর্ভবতী উট দেয়া হল এবং তাকে বললেন, আল্লাহ এর দ্বারা

তোমাকে বরকত দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, তারপর ফেরেশতা মাথায় টাকপড়া ব্যক্তির নিকট আসলেন এবং বললেন, কোন জিনিষ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল– উত্তম চুল এবং আমার থেকে সেই ত্রুটি দূর হয়ে যাওয়া যার কারণে লোকে আমাকে ঘৃণা করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, তখন ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলালেন, তার টাক দূর হয়ে গেল এবং তাকে উত্তম চুল দান করা হল। ফেরেশতা বললেন, কোন মাল তোমার কাছে অধিক প্রিয়? লোকটি বলল, গরু। তখন তাকে একটি গাভীন গরু দেয়া হল এবং ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ এর দ্বারা তোমাকে বরকত দিন। হুজুর বললেন, অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কোন জিনিষ সবচাইতে প্রিয়? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যেন আমি লোকদের দেখতে পাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলালেন, আল্লাহ তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশ্‌তা বললেন, তোমার কাছে কোন্‌ মাল বেশী প্রিয়? সে বলল, ছাগল ভেড়া। তখন তাকে একটি গাভীন বকরী দেয়া হল। অতঃপর উট ও গরু বাচ্চা প্রসব করল এবং ছাগল ছানা প্রসব করল যাতে সকলের মালই বৃদ্ধি পেল (শ্বেত কুষ্ঠ রোগীর) এক মাঠ উটে ভরে গেল, (টেকো ব্যক্তির) এক মাঠ গরুতে ভরে গেল এবং অন্ধ ব্যক্তির ছাগল ভেড়ায় মাঠ ভরে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, অতঃপর (ফেরেশতা) আপন পূর্ব অবয়ব ও আকৃতিতে সেই শ্বেত কুষ্ঠ ব্যক্তির নিকট আসল এবং বলল, আমি একজন গরীব মিসকীন ব্যক্তি, সফরে আমার সমস্ত সম্বল শেষ হয়েছে, এখন আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আমার ঘরে পৌছার কোন উপায় নেই, আপনার কাছে সেই আল্লাহর নামে সাহায্য চাই, যিনি আপনাকে উত্তম রং উত্তম চর্ম ও এতসব উট দান করেছেন, আমাকে একটি উট দান করুন। যেন আমি গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারি। তখন লোকটি বলল, আমার অনেক দেনা আছে, তখন সে (ফেরেশতা) বলল, মনে হয় আমি তোমাকে চিনি, তুমি কি শ্বেত কুষ্ঠ রোগী ছিলে না? যাকে লোকে ঘৃণা করত, তুমি গরীব ছিলে, আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তখন লোকটি বলল, আমি তো এ মাল বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। তখন তিনি (ফেরেশতা) বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, অতঃপর সে (ফেরেশতা) মাথায়

টাকপড়া লোকটির কাছে আসলেন এবং তার পূর্ব আকৃতি ধারণ করলেন এবং প্রথম ব্যক্তির নিকট যা জ্ঞাপন করেছিলেন তা জ্ঞাপন করলেন। সেও পূর্বের ব্যক্তির মত উত্তর দিল, তখন তিনি (ফেরেশতা) বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন, যে অবস্থায় তুমি ছিলে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, অতঃপর তিনি (ফেরেশতা) তার পূর্ব অবয়ব আকৃতিতে অন্ধ ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব পথিক, আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে, আল্লাহ ব্যতীত আজ আমার গন্তব্যস্থলে পৌছার কোন উপায় নেই, আমি সেই আল্লাহর নামে আপনার কাছে একটি ছাগল চাই, যিনি আপনাকে চক্ষুর জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন, যদ্বারা আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারব। তখন সে বলল, সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা ইচ্ছা নিয়ে নিন এবং যা ইচ্ছা রেখে যান। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাস্তায় আপনি যা নিতে চান আমি অস্বীকার করব না এবং আপনাকে কষ্ট দিব না। তিনি (ফেরেশতা) বললেন, তুমি তোমার মাল রেখে দাও, তোমাকে পরীক্ষা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সঙ্গীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

হাদীস– (১৮) ঃ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী হযরত উম্মে বুজাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ! দরজায় মিসকীন দাঁড়িয়ে থাকে, আমার লজ্জা আসে, ঘরে কিছু নেই যে, তাকে দেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করলেন– সওয়ালকারীকে কিছু দাও যদিও পোড়া খুর হয়।

হাদীস– (১৯) বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, একদা উম্মুল মুমেনীন, হযরত উম্মে সালমাকে এক খণ্ড অংশ হাদিয়া দেয়া হয়েছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট গোশ্‌ত খুব পছন্দনীয় ছিল, উম্মে সালমা তাঁর খাদেমাকে বললেন, তুমি তা ঘরে রেখে দাও, সম্ভবতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তা খেতে পারেন। তখন খাদেম তা ঘরের একটি রেকাবে রেখে দিল। এমন সময় এক ভিক্ষুক আসল এবং দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে কিছু দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে বরকত দিবেন। তখন তারা বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, তখন ভিক্ষুকটি চলে গেল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, উম্মে

সালমা! তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি? যা আমি খেতে পারি। তখন উম্মে সালমা বললেন, জি হ্যাঁ, আছে। তিনি খাদেমাকে বললেন, যাও ঐ মাংসগুলো রাসূলুল্লাহকে এনে দাও। সে গিয়ে দেখল, মাংস এক খণ্ড পাথরে পরিণত হল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই খণ্ডই পাথরে পরিণত হয়েছে, কেননা তোমরা তা ভিক্ষুককে দাওনি।

হাদীস- (২০) বায়হাকী তাঁর শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, দানশীলতা বেহেশতের একটি বৃক্ষ বিশেষ, যে দানশীল সে বৃক্ষের একটি শাখা রয়েছে, আর শাখা তাকে ছাড়বে না যতক্ষণ না তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবে। আর কৃপণতা তাকে দোযখে প্রবেশ করাবে।

হাদীস- (২১) হযরত রযীন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তোমরা দান সাদকার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে, কেননা বালা মুসিবত ইহাকে (দান) অতিক্রম করতে পারে না।

হাদীস- ২২ ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদকা করা আবশ্যক। সাহাবাগণ আরজ করলেন, যদি সে কিছু না পায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, তবে সে যেন নিজের হাতের কাজ করে। তাতে নিজের উপকার হবে এবং অন্যকে দান করতে পারবে। সাহাবাগণ আবারও জিজ্ঞেস করলেন- যদি (কাজ করবার) ক্ষমতা না রাখে, অথবা করতে না পারে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তবে সে চিন্তাগ্রস্ত কোন ঠেকা ব্যক্তির (শারিরীক) সাহায্য করবে। সাহাবাগণ পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন- যদি তাও করতে না পারে । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, তবে সে ভাল কাজের আদেশ করবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, যদি তাও করতে না পারে? তবে সে যেন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। কেননা ইহাও তার জন্য সাদকা বিশেষ।

হাদীস - (২৩) ঃ বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, দু' ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় বিচার করা সাদকা বিশেষ। কাউকে বাহনের উপর আরোহণে সাহায্য করা সাদকা স্বরূপ। কারো আসবাবপত্র বাহনে উঠিয়ে দেয়া সাদকা স্বরূপ। ভাল কথা বলা সাদকা বিশেষ। নামাজের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা বিশেষ। রাস্তা থেকে

কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সাদকা বিশেষ।

হাদীস- (২৪) ঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে কোন মুসলমান একটি বৃক্ষ রোপন করবে, অথবা কোন ফসল উৎপন্ন করে, অতঃপর তা হতে কোন মানুষ পাখি বা পশু যাকিছু খাবে, তা তার জন্য সাদকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীস- (২৫-২৬) ঃ সুনানে তিরমিযী শরীফে হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার স্মিত হাসি একটি সাদকা। কারো প্রতি ভাল কাজের উপদেশ দান সাদকা বিশেষ। কোন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাও সাদকা বিশেষ। পথ হারানো লোককে পথ প্রদর্শন করা সাদকা। দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে তোমার সাহায্য করাও একটি সাদকা। রাস্তা হতে তোমার পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকা বিশেষ। তোমার বালতি হতে তোমার অপর ভাইয়ের বালতিতে পানি ভর্তি করিয়ে দেয়া তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ। অনুরূপ হাদীস ইমাম আহমদ তিরমিযী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস- (২৭) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু-হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পতিত একটি বৃক্ষের ডালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, সে বলল, আমি এটাকে মুসলমানের পথ থেকে দূর করে ফেলব, যেন তাদেরকে কষ্ট না দেয়। অতঃপর সে তা-ই করল, ফলে তাকে হেহেশ্তে প্রবেশ করানো হল।

হাদীস- (২৮) ঃ আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে কোন মুসলমান কোন মুসলমান বিবস্ত্রকে বস্ত্র পরাবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে বেহেশ্তের সবুজ পোষাক পরিধান করাবেন। যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য খাওয়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশ্তের ফল খাওয়াবেন, আর যে কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে তার পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করাবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে (পরকালে) মুখে সীল মোহর করা পাত্র হতে স্বচ্ছ শরাব পান করাবেন।

হাদীস- (২৯) ঃ ইমাম আহমদ, তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে একটি কাপড় পরাবে, সে (দাতা) ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হেফাজতে থাঁকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত (গ্রহীতার) পরিধানে ঐ কাপড়ের এক টুকরাও থাকবে।

হাদীস- (৩০) ঃ তিরমিযী, ইবনে হাব্বান হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই দান সাদকা আল্লাহ তাআলার ক্রোধাগ্নিকে প্রশমিত করে এবং খারাপ মৃত্যু রোধ করে। অনুরূপ হাদীস হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস- (৩১) ঃ তিরমিযী শরীফে সহীহ সূত্রে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তাঁরা একটি বকরী জবেহ করলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জিজ্ঞেস করলেন, আর কতটুকু বাকী আছে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, উহার একটি কাঁধ ছাড়া আর কিছু বাকী নেই। হুজুর বললেন, উহার একটি কাঁধ ছাড়া সবই বাকী আছে।

হাদীস- (৩২) ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খোযায়মা, ইবনে হাব্বান প্রমুখ হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন, এবং তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন, তাঁরা হলেন, (এক) কোন ব্যক্তি একদল লোকের নিকট এসে আল্লাহর নাম বলে কিছু চাইল. তার ও তাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এর কারণে তাদের কাছে চায়নি। তারা তাকে না বলে দিল, আর এক ব্যক্তি তার দলকে পিছনে ফেলে চুপে অগ্রসর হল এবং গোপনে তাকে দান করল। তার দান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ও যাকে দান করা হয়েছে সে ব্যতীত আর কেউ জানল না, (দুই) একদল লোক সারারাত পথ চলল, যখন নিদ্রা তাদের কাছে সবচাইতে প্রিয়তর হল, তারা সকলেই নিজেদের মাথা জমিনে রাখল, তখন সে উঠে দাড়াল, আমার সমীপে অনুনয় বিনয় করল এবং আমার আয়াত পাঠ করল। (তিন) সেই ব্যক্তি যে কোন সৈন্যদলে ছিল এবং শত্রুর মোকাবিলা করল অতঃপর দলের লোকেরা পরাজিত হল (অর্থাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করল) আর সে একাই নিজের বুক পেতে সম্মুখে অগ্রসর হল, যাবৎ না নিহত হল অথবা জয়লাভ করল।

সেই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন (এক) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (দুই) দরিদ্র অহংকারী (তিন) ধনী অত্যাচারী।

হাদীস- (৩৩-৩৪) ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন জমীন সৃষ্টি করলেন, তখন তা কাঁপতে শুরু করল, তখন পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং জমীনের উপর কীলক স্বরূপ মারলেন, এতে জমীন স্থির হয়ে গেল। পাহাড়ের শক্তি দেখে ফেরেশ্‌তারা বিস্মিত হলেন এবং বললেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড় হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ তাআলা বললেন. হ্যাঁ আছে লোহা, তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে লোহা হতে শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে আগুন। অতঃপর তারা আবারও জিজ্ঞেস করল, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে আগুন হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, পানি। আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পানি হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, বাতাস। তখনও তারা জিজ্ঞেস করলেন হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে বাতাস অপেক্ষা শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, আদম সন্তান, যে তার ডান হাতে সাদকা করে আর বাম হাত হতেও তা গোপন রাখে।

হাদীস- (৩৫) ঃ নাসাঈ শরীফে হযরত গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে মুসলমান বান্দা আল্লাহর রাস্তায় তার প্রত্যেক প্রকারের মাল হতে এক জোড়া করে দান করবে বেহেশ্‌তের দারোয়ানগণ তাকে অভ্যার্থনা জানাবেন, তাদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের নিকট যা আছে তার দিকে ডাকবেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম- ইহার (এক জোড়া দান) পদ্ধতি কি এয়া রাসূলাল্লাহ! হুজুর বললেন, যদি উট থাকে তবে দু'টি উট দান করবে, আর যদি গরু থাকে তবে দু'টি গরু দান করবে।

হাদীস- (৩৬) ঃ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত মায়াজ ইবনে জাবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, সাদকা গুনাহকে এমনভাবে দূরীভূত করে যেমনিভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয়।

হাদীস- (৩৭) ঃ ইমাম আহমদ কোন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, মুসলমানের সাদকা কিয়ামতের দিন তার জন্য ছায়া স্বরূপ হবে।

হাদীস– (৩৮) ঃ সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা ও হাকিম বিন হেযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, উত্তম সাদকা হলো যার পরেও প্রাচুর্যতা বাকী থাকে; প্রথমে তোমার পরিবার থেকে আরম্ভ করবে, অর্থাৎ প্রথমে তাদেরকে দাও, অতঃপর অন্যদেরকে দাও।

হাদীস– (৩৯) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, মুসলমান যা কিছু নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করে যদি ছওয়াবের জন্য হয় তা-ও সাদকা হবে।

হাদীস– (৪০) ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদের স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) হতে বর্ণিত, বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জিজ্ঞেস করেছেন, স্বামীদের প্রতি এবং তাদের পোষ্য এতিমদের প্রতি সাদকা করলে তাদের জন্য যথেষ্ট হবে কি না? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, তাদের জন্য দু'টি সওয়াব রয়েছে– একটি নিকট আত্মীয় হওয়ার সওয়াব, অপরটি সাদকার সওয়াব।

হাদীস– (৪১) ঃ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ্ দারেমী প্রমুখ হযরত সোলায়মান ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, নিঃস্বকে দান করা হল শুধু দান আর তা যদি আত্মীয়ের প্রতি করা হয় দু'রকম কাজ এক দান, আর এক আত্মীয়তা রক্ষা করা। (অর্থাৎ দু'গুন সওয়াব পাওয়া যাবে)

হাদীস– (৪২) ঃ ইমাম বোখারী ও মুসলিম উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যখন কোন মহিলা ঘরের খাদ্য হতে অপব্যয় ব্যতিরেকে কোন কিছু দান করে তার এ দানের জন্য সওয়াব রয়েছে। আর তার স্বামীর জন্য রয়েছে তা উপার্জন করার সাওয়াব। এমনিভাবে মাল রক্ষক খাজাঞ্জীর জন্যও রয়েছে অনুরূপ সওয়াব। এতে একে অন্যের সওয়াবের কিছু হ্রাস করবে না। অর্থাৎ এটা যদি এমন পরিবেশে হয় যে, যেখানে স্ত্রী দান করে স্বামী যদি নিষেধ না করে থাকে, আর তা যদি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হয়, যেমন একটি দু'টি রুটি যেমন হিন্দুস্তানে ব্যাপক প্রচলন আছে। আর যদি স্বামী নিষেধ করে থাকে, সেখানে যদি প্রচলনও না থাকে তাহলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দেয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয নেই। তিরমিযী শরীফে হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামা বিদায় হজ্বের ভাষণে এরশাদ করেছেন, স্ত্রী যেন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে কিছু ব্যয় না করে। জিজ্ঞেস করা হল, খাদ্যও কি দেওয়া যাবে না? হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, এটা তো উত্তম মাল।

হাদীস– (৪৩) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, মুসলমান আমানতদার খাজাঞ্জী যাকে (মালিক কর্তৃক) যে পরিমাণ মাল দানের নির্দেশ দেয়া হয়, সে তা মনের খুশীর সাথে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করে আর সেই ব্যক্তিকেই প্রদান করবে যাকে দেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে, সেও দাতাদের একজন।

হাদীস– (৪৪) ঃ হাকেম ও তিবরানী আওসাতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, এক লোকমা রুটি অথবা একমুষ্ঠি খোরমা অথবা অনুরূপ এমন কোন বস্তু যদ্বারা মিসকীন উপকৃত হয় এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এ তিন প্রকার লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (এক) গৃহকর্তা যিনি নির্দেশ দিয়েছেন। (দ্বিতীয়) স্ত্রী যিনি তা তৈয়ার করেছেন। (তৃতীয়তঃ) খাদেম যিনি মিসকীনকে পরিবেশন করেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের খাদেমদেরকেও ছাড়েননি। (অর্থাৎ খাদেমকেও, বেহেশ্‌ত দান করবেন)

হাদীস– (৪৫) ঃ ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা খোৎবায় এরশাদ করেছেন, হে লোকেরা! আল্লাহর দিকে ফিরে যাও এবং ব্যস্ততার পূর্বে সৎ কাজের প্রতি অগ্রগামী হও। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সাদকা দিয়ে নিজের ও প্রভুর মাঝখানে সম্পর্ক সৃষ্টি কর। তাহলে তোমাকে জীবিকা দান করা হবে এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে। তোমাদের দারিদ্রতা দূর করা হবে।

হাদীস– (৪৬) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন, তাঁর এবং আল্লাহর মাঝখানে কোন মধ্যস্থতাকারী হবে না। সে নিজের ডান দিকে দেখবে, যা কিছু পূর্বে করেছে দেখানো হবে। অতঃপর বাম দিকে দেখবে, তা-ই দেখবে যা ইতিপূর্বে করেছে। অতঃপর নিজের সামনে দেখবে। তখন মুখের সামনে আগুন দেখানো হবে, আগুন

থেকে বাঁচো, যদিও খোরমার একটি টুকরা দান করে হোক। অনুরূপ হাদীস হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ, হযরত সিদ্দীকে আকবর, উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা সিদ্দীকা হযরত আনাস, আবু হুরায়রা আবু উমামা, নুমান বিন বশীর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুম বর্ণনা করেছেন।

হাদীস- (৪৭) ঃ আবু ইয়ালা, জাবের ও তিরমিযী মায়ায বিন জাবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, দান সাদকা, গুনাহকে এমনভাবে মুছিয়ে ফেলে, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।

হাদীস- (৪৮) ঃ ইমাম আহমদ, ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান, হাকেম প্রমুখ ওকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিজ সাদকার ছায়াতলে থাকবে, যতক্ষণ না মানুষদের মধ্যে বিচারকার্য মীমাংসা হয়। তিবরানীর বর্ণনায় আরো রয়েছে যে, সাদকা কবরের উত্তপ্ততা দূর করবে।

হাদীস- (৪৯) ঃ তিবরানী ও বায়হাকী শরীফে হাসান বসরী (রাঃ) মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! নিজ ভান্ডার থেকে আমার কাছে কিছু জমা করো, যা জ্বলবেনা ডুবে যাবে না, চুরিও হবে না, আমি তোমাকে পূর্ণভাবে দিব। এমন সময় দেব যখন তুমি এর অধিক মুখাপেক্ষী হবে।

হাদীস- (৫০-৫১) ঃ ইমাম আহমদ, বাজ্জাজ, তিবরানী, ইবনে খোজায়মা, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখ বোরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মানুষ যখনই কোন কিছু সাদকা বের করেন, তখন গ্রীবা ফেটে শয়তান বেরিয়ে পড়ে।

হাদীস- (৫২) ঃ তিবরানী শরীফে হযরত আমর বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামা এরশাদ করেন- মুসলমানের দান সাদকা আয়ু বৃদ্ধির কারণ এবং খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহ এর বিনিময় অহংকার গৌরব দূরীভূত করেন;

হাদীস- (৫৩) ঃ তিবরানী কবীরে হযরত রাফে বিন খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, সাদকা খারাপের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেন।

হাদীস- (৫৪) ঃ তিরমিযী, ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান হাকেম প্রমুখ হযরত

হারেছ আশ্‌য়ারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া আলাইহিমাস সালাম এর উপর পাঁচটি বিষয়ে ওহী প্রেরণ করেছিলেন, নিজেরা যেন আমল করে এবং বনী ইসরাঈলদের প্রতিও যেন নির্দেশ করে যে, তারাও যেন আমল করে। এর মধ্যে একটি ছিল যে, আল্লাহ তোমাদেরকে সাদকার নির্দেশ দিয়েছেন এর দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মত যাকে কোন শত্রু বন্দী করেছে এবং তার হাত কাঁধের সাথে একত্রে বেঁধে তাকে প্রহারের জন্য আনা হল, সেই সময় যা কিছু ছিল সবকিছু দিয়ে প্রাণে রক্ষা পেল।

হাদীস- (৫৫) ঃ ইবনে খোজায়মা ইবনে খাব্বান, হাকেম হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে হারাম মাল সঞ্চয় করেছে এবং তা হতে সাদকা করেছে, তার জন্য কোন সওয়াব নেই বরং গুনাহ রয়েছে।

হাদীস- (৫৬) ঃ আবু দাউদ ইবনে খোজায়মা হাকেম প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি আরজ করলেন এয়া রাসূলুল্লাহ! কোন সাদকা উত্তম? হুজুর বললেন, দরিদ্রের কষ্টের দান।

হাদীস- (৫৭) ঃ নাসাঈ ইবনে খোজায়মা ইবনে খাব্বান প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুযুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন- এক দিরহাম লক্ষ দিরহামের চেয়ে বৃদ্ধি পেল। কেউ আরজ করল, এয়া রাসূলাল্লাহ! তা কিরূপে? এরশাদ করলেন, এক ব্যক্তির নিকট অনেক মাল রয়েছে সেই তা হতে লক্ষ দিরহাম নিয়ে সাদকা করেছে আর এক ব্যক্তির নিকট মাত্র দু দিরহাম রয়েছে সেই এর থেকে এক দিরহাম সাদকা করল।

রোজার বর্ণনা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهٗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ
الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ - اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ
الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا
مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي
الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার, গননার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্য যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পুরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনদের খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোজা রাখ তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর। যদি তোমরা তা বুঝতে পার। রমজান মাসই হল সে মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন– যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেহ এ মাসটি পাবে যেন এ মাসের

রোজা রাখবে আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না। যাতে তোমরা গণনা পুরন কর এবং তোমাদের হেদায়ত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা কর। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে যারা আমার কাছে প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস তোমার জন্য হালাল করা হয়েছে, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ– আল্লাহ অবগত রয়েছেন। যে তোমরা আত্ম প্রতারনা করেছিলে সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য দান করেছেন, তা আহরণ কর আর পানাহার কর যতক্ষন না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত আর যতক্ষন তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশোনা, এটা আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা অতএব এর কাছেও যেয়ো না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে। সূরা আল-বাক্বারা ১৮৩-১৮৭

হাদীসের আলোকে সিয়াম'র তাৎপর্য

হাদীস (১) ঃ সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন যখন রমজান মাস আসে আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে বেহেস্তের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। অপর বর্ণনায় আছে, রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলে বন্দী করা হয়।

ইমাম আহমদ তিরমিযী ইবনে মাযাহ প্রমুখের বর্ণনায় আছে– যখন রমজান মাসের প্রথম রাত্রি হয় শয়তানসমুহ ও অবাধ্য জ্বিনসমূহকে শৃংখলিত করা হয়। দোজখের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর দোজখের একটি দরজাও খোলা হয়। এবং বেহেস্তের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর এর একটিও বন্ধ করা হয়না।

এক আহবানকারী আহবান করতে থাকেন, হে পূন্যের অন্বেষণকারী সম্মুখে অগ্রসর হও। আর হে মন্দের অন্বেষণকারী থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ তা'আলা অনেককে দোজখের অগ্নি থেকে মুক্তি দেন আর এরূপ প্রত্যেক রাত্রেই সংগঠিত হয়।

ইমাম আহমদ নাসাঈ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তোমাদের নিকট রমজানের মাস এসেছে এর রোজা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দোজখের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয়, এতে অবাধ্য শয়তানসমূহকে শৃংখলিত করা হয়। এতে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও শ্রেয়। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে সে প্রকৃত পক্ষেই বঞ্চিত হয়েছে।

হাদীস- (২) ঃ ইবনে মাযাহ্ শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রমজান মাস আসল, তখন রসুলুল্লাহ বললেন- এই মাস তোমাদের কাছে এসেছে এতে একটি রাত রয়েছে- যা হাজার মাসের চাইতেও শ্রেয়। যে ব্যক্তি তা হতে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল প্রকার কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হয়েছে। মুলত: এর কল্যাণ হতে চির বঞ্চিত ব্যক্তিরাই বঞ্চিত হয়।

হাদীস- (৩) ঃ বায়হাকী শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই রমাজান মাস আসত রসুলুল্লাহ সকল বন্দিকে মুক্ত করে দিতেন এবং সকল প্রার্থনাকারীকেই দান করতেন।

হাদীস- (৪) ঃ বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, বৎসরের প্রথম হতে পরের বৎসর পর্যন্ত রমজানের জন্য বেহেস্ত সুসজ্জিত করা হয়। যখন রমজান মাসের প্রথম দিন হয় আরশের নীচে বেহেস্তের বৃক্ষের পাতা হতে ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের প্রতি এক হাওয়া প্রবাহিত হয় তখন তারা (হুরগন) বলেন, হে প্রতিপালক তোমার বান্দাদের মধ্যে হতে আমাদের জন্য এমন সব সাক্ষী নির্ধারণ কর যাদের দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হবে আর আমাদের দেখে তাদের চক্ষু শীতল হবে।

হাদীস- (৫) ঃ ইমাম আহমদ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন- তাঁর উম্মতকে রমজান

মাসের শেষ রাত্রে ক্ষমা করা হয়, জিজ্ঞেস করা হল- এয়া রাসুলাল্লাহ! এটা কি কদরের রাত্রি? হুযুর বললেন, না। বরং কর্মচারীকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় যখনই সে তার কর্ম পূর্ণরূপে সম্পাদন করে।

হাদীস- (৬) ঃ বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত সালমান ফারেসী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার শা'বান মাসের শেষ দিনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন- হে মানব মন্ডলী! তোমাদের উপর এক মহান মাস, এক কল্যাণময় মাস ছায়া বিস্তার করেছে, ইহা এমন এক মাস যাতে এমন একটি রাত রয়েছে- যা হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেয়। আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের জন্য) এ মাসের রোজাকে ফরজ করেছেন এবং রাত্রে নামায পড়াকে নফল করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলে একটি নেক কাজ করবে সে ঐ ব্যক্তির সমান হবে যে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ সম্পন্ন করল, আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরজ কাজ সম্পন্ন করবে সে ঐ ব্যক্তির সমান হবে যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করল। এটা ধৈর্য্যের মাস, আর ধৈর্য এমন একটি গুণ যার প্রতিদান হল বেহেস্ত। এটা পারস্পরিক সহানুভুতির মাস, এটা সেই মাস যাতে মুমিন ব্যক্তির রিযিক বৃদ্ধি করা হয়, এমাসে যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে এটা তার পক্ষে তার গুনাহ সমূহের জন্য ক্ষমা স্বরূপ হবে এবং নিজকে দোজখের অগ্নি থেকে মুক্তির কারণ হবে। আর তাকে রোজাদারের সমান সওয়াব দান করা হবে অথচ রোজাদারের সওয়াব হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। রাবী বলেন, আমরা বললাম এয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এমন সামর্থ রাখেনা যাহারা রোজাদারকে ইফতার করাতে পারে। তখন রাসুলুল্লাহ বললেন- আল্লাহ তায়ালা এ সওয়াব ঐ ব্যক্তিকেও দান করেন, যে কোন রোযাদারকে এক ঢোক দুধ দ্বারা, একটি খেজুর দ্বারা অথবা এক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করায়। যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে পরিতৃপ্তির সাথে ভোজন করাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার হাউজ (কাওসার) হতে পানীয় পান করাবেন, বেহেস্তে প্রবেশ হওয়া পর্যন্ত সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। এটা এমন একটি মাস যার প্রথম অংশ রহমত, মধ্যম অংশ ক্ষমা, এবং শেষ অংশ দোযখ হতে মুক্তি। যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের দাস দাসীদের কর্মভার হালকা করে দিবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এবং তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করবেন।

হাদীস- (৭) ঃ বোখারী মুসলিম সুনানে তিরমিযী নাসাঈ সহীহ্ ইবনে খোজায়মা প্রমুখ গ্রন্থে হযরত সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, বেহেশ্‌তের আটটি দরজা দিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবেন।

হাদীস- (৮) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখে তার পূর্বের সমুদয় গুনাহ (সগীরা) মাফ করা হবে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রাত্রে ইবাদতে কাটাবে তারও পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তারও পূর্বেকৃত পাপরাশি ক্ষমা করা হবে।

হাদীস- (৯) ঃ ইমাম আহমদ, হাকেম, তিবরানী, কবীর গ্রন্থে ইবনে আবিদ দুনিয়া এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, রোজা এবং কোরআন (কিয়ামতের দিন) বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তাকে খাদ্য ও কাম প্রবৃত্তি হতে দিনের বেলায় বাঁধা প্রদান করেছি, সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তাকে রাত্রিকালে নিদ্রা হতে বাধা প্রদান করেছি, সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর, তখন উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

হাদীস- (১০) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ্ বলেন, কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম, কেননা রোজা একমাত্র আমারই জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব। বান্দার নিজের প্রবৃত্তির দাবীকে অগ্রাহ্য করা এবং পানাহার পরিহার করা আমারই জন্য হয়ে থাকে, রোজাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি ইফতারের সময় অপরটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়। রোজা হল ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোজার দিন আসে সে অশ্লীল কথাবার্তা বলবে না এবং গণ্ডগোল করবে না। তাকে যদি কেউ

কটু কথা বলে অথবা লড়াই করতে চায় তবে সে যেন বলে আমি একজন রোজাদার।

অনুরূপ হাদীস ইমাম মালেক, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে খোজায়মা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস- (১১) ঃ তিবরানী আওসাতে বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমলসমূহ সাত প্রকারের, দু'টি আমল ওয়াজিবকারী, দু'টির প্রতিদান সমান। একটি আমলের প্রতিদান দশগুণ এবং একটি আমলের বিনিময় সাতশত গুণ। একটি আমলের প্রতিদান যার সওয়াব সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত, দু'টি ওয়াজিবকারী আমলের একটি হল এই যে, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে ইবাদতরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে গমন করেছে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। দ্বিতীয়টি হল এই যে, যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করেছে এমতাবস্থায় যে সে শরীক করেছে, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব। যে ব্যক্তি অন্যায় করেছে, তাকে অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নেকীর আশা পোষণ করেছে কিন্তু আমল করেনি, তাকে একটি নেকীর বিনিময় দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নেক কাজ করেছে, তাকে দশ গুণ সওয়াব দেয়া হবে। যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেছে, সে সাতশত গুণ সাওয়াব পাবে। এক দিরহামের বিনিময়ে সাতশত দিরহাম এবং এক দিনারের বিনিময়ে সাতশত দিনারের সাওয়াব পাবে। রোজা আল্লাহ্‌রই জন্য এর সওয়াব আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানেন না।

হাদীস- (১২-১৫) ঃ ইমাম আহমদ হাসন সূত্রে এবং বায়হাকী বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, রোজা ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের জন্য সুদৃঢ় দূর্গ স্বরূপ। অনুরূপ অভিন্ন হাদীস জাবের (রাঃ) ওসমান ইবনে আবুল আস ও হযরত মুয়াজ ইবনে জাবল (রাঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

হাদীস- (১৬-১৭) ঃ আবু ইয়ালা, বায়হাকী, সালমা ইবনে কায়েস, আহমদ ও বাজ্জাজ প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোজা রাখল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে এভাবে দূরত্বে রাখবেন, যেমন কাক শিশুকাল থেকে যেভাবে উড়তেছিল এমনকি বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু পর্যন্ত।

হাদীস- (১৮) ঃ আবু ইয়ালা, তিবরানী, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যদি কেউ একটি নফল রোজা রাখল, জমিন ভর্তি তাকে স্বর্ণ দেয়া হলেও তার সওয়াব পূর্ণ হবে না। তার সওয়াব কিয়ামতের দিবসেই পাওয়া যাবে।

হাদীস- (১৯) ঃ ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তুর যাকাত রয়েছে, শরীরের যাকাত হচ্ছে রোজা। রোজা ধৈর্য্যের অর্ধেক।

হাদীস- (২০) ঃ নাসাঈ, ইবনে খোজায়মা হাকেম আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি আরজ করেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন আমলের নির্দেশ দিন, এরশাদ করলেন, রোজাকে অপরিহার্য কর। এর সমতুল্য কোন আমল নেই, অতঃপর আরজ করলাম, আমাকে কোন আমল সম্পর্কে বলুন! এরশাদ করলেন, রোজাকে অপরিহার্য কর। এর সমতুল্য কোন আমল নেই। তিনি পুনরায় আরজ করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পুনরায় তা এরশাদ করেছেন।

হাদীস- (২১-২৬) ঃ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে দোযখ থেকে সত্তর বৎসরের রাস্তার দূরত্ব সৃষ্টি করবেন, অনুরূপ হাদীস নাসাঈ, তিরমিযী ইবনে মাযাহ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিবরানী, আবু দারদা, তিরমিযী, আবু ওমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তার এবং জাহান্নামের মাঝখানে আল্লাহ তা'আলা এত বড় পরিখা করে দেবেন যতটুকু আসমান ও জমীনের দূরত্ব। তিবরানীর অপর বর্ণনায় হযরত মুয়াজ ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রমজান ছাড়াও যে ব্যক্তি রোজা রাখল সে দ্রুতগামী ঘোড়ায় শত বৎসরের ব্যবধানে জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবেন।

হাদীস- (২৭) ঃ বায়হাকী শরীফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস, (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, রোজাদারের দোয়া ইফতারের সময় ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

হাদীসঃ (২৮) ঃ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, ইবনে খোজায়মা, ইবনে

হাব্বান হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না (কবূল হয়)। ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া, ন্যায় বিচারক বাদশাহর দোয়া, মজলুম ব্যক্তির দোয়া। আল্লাহ তাকে মেঘমালা চেয়ে উপরে বলুন্দ করে, তার জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করবো যদিও কিছুকাল পরে হয়।

হাদীস- (২৯) ঃ ইবনে হাব্বান বায়হাকী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে রমজানের রোজা রাখল, এর সীমারেখা জানল, যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিৎ তা থেকে বিরত রইলো, তাহলে পূর্বে যা করেছে, তার কাফ্‌ফারা স্বরূপ হবে।

হাদীস- (৩০) ঃ ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রমজান মাসের রোজা পেল, রোজা রাখল, রাতে যতটুকু সম্ভব জাগ্রত রইল, আল্লাহ তার জন্য এবং স্থানের ওসীলায় একলক্ষ রমজানের সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন, প্রতিদিন একজন ক্রীতদাস আজাদ করার সওয়াব, প্রতিরাতে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব, প্রতিদিন জেহাদে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে জিহাদ করার সওয়াব প্রতিদিন সওয়াব এবং প্রতিরাতে সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন।

হাদীস- (৩১) ঃ বায়হাকী শরীফে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আমার উম্মতকে রমজান মাসে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি। প্রথমঃ যখন রমজানের প্রথম রাত্রি হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন (আল্লাহ) যার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন তাকে কখনো শাস্তি দেবেন না।

দ্বিতীয়ঃ সন্ধ্যার সময় তার মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধের চেয়ে অধিক সুগন্ধময় হয়।

তৃতীয়ঃ প্রতিদিন ও প্রতিরাতে ফেরেশ্‌তা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

চতুর্থঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে হুকুম দেন যে, প্রস্তুত হয়ে যদি আমার বান্দাদের জন্য সুসজ্জিত হও, অচিরেই তারা দুনিয়ার কষ্ট থেকে এখানে এসে আরাম করবে।

পঞ্চমঃ যখন শেষ রাত হয়, সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কেউ আরজ করলেন, ঐ রাত কি শবে কদরের রাত? এরশাদ করলেন– না। তুমি কি দেখছ না? শ্রমিক যখন কাজ সম্পন্ন করে তখন সে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

হাদীস– (৩২-৩৪) ঃ হাকেম কা'ব বিন আযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, সকল লোক মিম্বরের নিকট উপস্থিত হও! আমরা হাজির হলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মিম্বরের প্রথম ধাপে (সিঁড়িতে) আরোহণ করলেন, বললেন, আমীন, দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলেন, বললেন আমীন। তৃতীয় ধাপে আরোহণ করলেন, বললেন, আমীন। যখন মিম্বর থেকে নীচে অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা আজ হুজুরের কাছে এমন কথা শুনলাম ইতিপূর্বে শুনিনি। এরশাদ করলেন, জিবরাঈল (আঃ) এসে আরজ করলেন, ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত হোক যে রমজান পেয়েছে অথচ স্বীয় গুনাহ ক্ষমা করাতে পারেনি। আমি বললাম, আমীন। যখন আমি দ্বিতীয় ধাপে চড়লাম বললেন, ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত হোক যার নিকট আমার নাম উল্লেখ হয়েছে সে আমার উপর দরূদ পাঠ করেনি। আমি বললাম, আমীন। যখন আমি তৃতীয় ধাপে চড়লাম বললেন, ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত, যে পিতা মাতা দু'জনকে অথবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে অথচ তাদের খেদমত করে জান্নাতে যেতে পারেনি। আমি বললাম, আমীন। অনুরূপ হাদীস হযরত আবু হুরায়রা হাসন বিন মালেক বিন খোয়রস রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ থেকে হযরত ইবনে হাব্বান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

হাদীস– (৩৫) ঃ ইসবাহানী আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যখন রমজানের প্রথম রাত্রি হয়, তখন আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যখন আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তখন তাকে কখনো আযাব দেবেন না। প্রতিদিন দশ লক্ষ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। যখন রমজানের ঊনত্রিশতম রাত্রি হয়, তখন মাসব্যাপী যত আজাদ করেছে তার সমান এক রাত্রেই আজাদ করে থাকেন, অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত আসে তখন ফেরেশ্তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নূরের বিশেষ তাজাল্লী নিক্ষেপ করেন, ফেরেশ্তাদের বলেন, ওহে ফেরেশ্তার দল! ঐ শ্রমিকের বিনিময় কি হতে পারে যে পূর্ণরূপে কাজ করেছে, ফেরেশ্তারা আরজ করেন, তাকে পরিপূর্ণ প্রাপ্য দেয়া উচিৎ। আল্লাহ

তা'আলা বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করছি যে, আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম।

হাদীস– (৩৬) ঃ ইবনে খোজায়মা, আবু মসউদ গিফারী (রাঃ) হতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন, এতে একথাও রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, রমজান কি জিনিস! তা যদি বান্দারা জানতো, তাহলে আমার উম্মতরা পূর্ণ বৎসর রমজান হওয়াটা কামনা করতো।

হাদীস– (৩৭) ঃ বাজ্জাজ ইবনে খোজায়মা ইবনে হাব্বান প্রমুখ আমর ইবনে মাররা জুহানী (রা:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করলেন এয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বলুন, আমি যদি স্বাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর রাসুল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ব, যাকাত আদায় করব। রমজানের রোযা রাখব রমজানের রাতসমূহে জাগ্রত থাকব (ইবাদত করব) তখন আমি কোন লোকদের অন্তর্ভূক্ত হব? হুযুর এরশাদ করলেন, সিদ্দীকিন ও শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

ফিক্হী মাসায়েল

রোজার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদঃ

রোজার সংজ্ঞা ঃ শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের নিয়তে মুসলমান সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাগতভাবে পানাহার, স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা, মহিলার জন্য ঋতুস্রাব ও নিফাস থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত। (ফিকাহর কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)

মাসআলা ঃ রোজার তিনটি স্তর আছে। এক. সাধারণ লোকের রোজা– এটা হচ্ছে পেট ও লজ্জাস্থানকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রাখা।

দ্বিতীয় : বিশেষ শ্রেণীর রোজা– পানাহার স্ত্রী সম্ভোগ ছাড়াও চক্ষু, জিহ্বা, হাত পা এবং সকল অঙ্গকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা।

তৃতীয় : বিশেষ শ্রেণীদের রোজা ঃ-

আল্লাহ ছাড়া সকল কিছু থেকে নিজকে পূর্ণাঙ্গরূপে মুক্ত রেখে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। (জাওহেরা নাইয়্যারা)

মাসআলা : রোজা পাঁচ প্রকার (১) ফরজ (২) ওয়াজিব (৩) নফল (৪) মাকরূহ তানযিহী (৫) মাকরূহ তাহরীমি।

ফরজ ও ওয়াজিব প্রত্যেকটি দুপ্রকার– নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট। নিদ্দিষ্ট ফরজ রোজা যেমন রমজানের রোজা যথাসময়ে আদায় করা।

অনির্দিষ্ট ফরজ রোজা : রমজানের কাযা রোজা, কাফফারার রোজা

নির্দিষ্ট ওয়াজিব রোজা : যেমন নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা

অনির্দিষ্ট ওয়াজিব রোজা : যেমন সাধারণ মান্নতের রোজা।

নফল দু'প্রকার – নফলে মসনুন আর নফলে মুস্তাহাব।

যেমন আশুরা, মহররমের দশ তারিখের রোজা, এর সাথে নয় তারিখের রোজা। প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ, পনের তারিখের রোজা, আরফার দিবসের রোজা, সোমবার ও শুক্রবারে রোজা, ঈদের ছয় রোজা, সওমে দাউদ আলাইহিস সালাম। অর্থাৎ- একদিন রোজা রাখা একদিন ইফতার করা।

মাকরূহ তানযিহী : কেবল শনিবার দিন রোজা রাখা, নওরোজ ও মেহেরজান উৎসবের দিন রোজা রাখা।

সওমে দাহর অর্থাৎ সবসময় রোজা রাখা। সওমে সকুত অর্থাৎ- রোজা রেখে কোন কথা না বলা।

সওমে বেসাল অর্থাৎ ইফতার বিহীন রোজা রাখা ইফতার না করে পরদিন পুনরায় রোজা রাখা। এসব মাকরূহে তানযিহী।

আর মাকরূহ তাহরিমী যেমন ঈদের দিন রোজা রাখা এবং আইয়্যামে তাশরীকে রোজা রাখা। (আলমগীরি দুররুল মোখতার রুদ্দুল মোহতার)

মাসআলা - রোজার বিভিন্ন কারণ আছে। রমজানের রোজার কারণ হলো, রমজান মাস আগমন করা। মান্নতের রোজার কারণ হলো, মান্নত করা। কাফফারার রোজার কারণ হলো– শপথ ভঙ্গ করা,-হত্যা করা বা জিহার রক্ষা করা ইত্যাদি (আলমগীরি)

মাসআলা - রমজানের মাসের রোজা যখন ফরজ হবে, যে সময় রোজা শুরু করতে হয় অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। এরপর রোজার নিয়্যত হবে না, এর নিয়ত করলে হবে না, রাত্রে নিয়্যত করা যায়। কিন্তু রোজা রাখা যায় না। বিধায় পাগল যদি রমজানের কোন রাত্রে সংজ্ঞা ফিরে পেল। সকালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হল বা দ্বিপ্রহরের পর কোন একদিন সংজ্ঞা ফিরে এল, তখন তার উপর রমজানের রোজার কাযা নেই। যদি পূর্ণ রমজান মাস পাগল অবস্থায় অতিবাহিত

হয়। আর যদি মাসের কোন একদিনে এমন সময় জ্ঞান ফিরে আসে– যে সময়টাতে রোজার নিয়ত করা যায় তাহলে পূর্ণ রমজান মাসের রোজা কাযা দেয়া অপরিহার্য (দুররুল মোখতার রদ্দুল মোহতার)

মাসআলা- রাত্রে রোজার নিয়ত করলো সংজ্ঞাহীন থাকা অবস্থায় সকাল হল তার সংজ্ঞাহীনতা কয়েকদিন ছিল তাহলে কেবল প্রথম দিনের রোজা হবে। অবশিষ্ট দিন সমূহের রোজা কাযা করবে যদিও পূর্ণ রমজান সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল এবং নিয়ত করার সময় পায়নি। (জাওহেরা, দুররুল মোখতার)

মাসআলা- রমজানের রোজা আদায় ও নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা এবং নফল রোজা সমূহের নিয়তের সময় হলো সূর্যাস্ত থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে নিয়ত করে নিলে রোযা হয়ে যাবে। সুতরাং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে নিয়ত করল যে, আগামী কাল রোজা রাখব অত:পর বেহুশ হয়ে পড়ল আর দ্বি প্রহরের পর সংজ্ঞা ফিরে এলো রোজা হবে না। আর যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর করে থাকে রোজা হবে। (দুররুল মোখতার রদ্দুল মোহতার)

মাসআলা- দ্বি-প্রহর নিয়তের সময় নয় বরং এর পূর্বেই নিয়ত করা জরুরী। আর যদি বিশেষভাবে সে সময় অর্থাৎ যে সময় সূর্য শরয়ী অর্ধদিবসের রেখা পর্যন্ত পৌছেছে তখন নিয়ত করলে রোজা হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলা– নিয়ত সম্পর্কে নফল ও সকল সুন্নাত মুস্তাহাব মাকরূহ সব অন্তর্ভূক্ত সবগুলোর নিয়তের সময় একটাই (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলা– যেরূপ অন্যত্র বর্ণনা হয়েছে যে, নিয়ত অন্তরের সংকল্পের নাম, মুখে বলা শর্ত নয়। এখানেও একই উদ্দেশ্য। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করাটা মুস্তাহাব। যদি রাত্রে নিয়ত করা হয় এরূপ বলবে।

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

অর্থাৎঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়ত করছি যে. আগামী কাল রমজানের ফরজ রোজা রাখবো :

দিনে নিয়ত করলে নিম্নরূপ বলবে–

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

অর্থাৎ- আমি নিয়ত করেছি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য আজকে রমজানের ফরজ

রোজা রাখবো। আর যদি বরকত ও তৌফিক প্রার্থনার নিয়তে ইনশাআল্লাহ্ তায়ালা শব্দও যোগ করে কোন ক্ষতি নেই, যদি পূর্ণ ইচ্ছা না থাকে দুদোল্যমান হয় নিয়তই কোথায় হল? (জাওহেরো নাইয়্যারা)

মাসআলা– দিনে নিয়ত করলে জরুরী হলো এটা নিয়ত করবে যে, আমি সকাল থেকে রোজাদার হব, আর যদি নিয়ত করে যে, আমি এখনি থেকে রোজাদার সকাল থেকে নয়– রোজা হবে না। (জাওহেরো, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলা– যদিও উপরোক্ত তিনপ্রকার রোজার নিয়ত দিনেও করা যায় কিন্তু রাত্রে করে নেয়াটা মুস্তাহাব। (জাওহেরো)

মাসআলা– এরূপ নিয়ত করলো যে আগামীকাল কোথাও দাওয়াত হলে রোজা নয়, দাওয়াত না হলে রোজা– এরূপ নিয়ত শুদ্ধ নয়, সে রোজাদার হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলা– রমজানের দিনে রোজার নিয়তও করেনি, রোজা না রাখার নিয়তও করেনি, যদিও জানা থাকে যে, এটা রমজানের মাস তাহলে রোজা হবেনা। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রাত্রে নিয়ত করলো নিয়ত করার পর রাতেই পানাহার করল নিয়ত ভঙ্গ হবেনা প্রথম নিয়তই যথেষ্ট, পুনরায় নিয়ত করা জরুরী নয়। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ মহিলা ঋতুস্রাব ও নিফাসগ্রস্থ ছিল, সে রাত্রিতে আগামীকাল রোজা রাখার নিয়ত করল। সুবেহ্ সাদিকের পূর্বে হায়েজ নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেল তাহলে রোজা শুদ্ধ হবে। (জাওহেরো)

মাসআলাঃ দিনের সেই নিয়ত কাজে আসবে সুব্হে সাদিক থেকে নিয়ত করার সময় পর্যন্ত রোজা ভঙ্গকারী কোন কাজ পাওয়া যায়নি। সুতরাং সুবহে সাদিকের পর ভুলক্রমেও পানাহার করে নিল বা সহবাস করল তখন নিয়ত হবেনা। (জাওহেরো) কিন্তু এটা নির্ভরযোগ্য যে, ভুলে যাওয়া অবস্থায় এখনো নিয়ত শুদ্ধ আছে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যে নামাযে কথা বলার নিয়ত করেছে কিন্তু কথা বলেনি নামায ফাছেদ হবে না। অনুরূপ রোজা ভঙ্গ করার নিয়ত করলেও রোজা ভঙ্গ হবেনা যতক্ষণ রোজাভঙ্গকারী কাজ না করবে। (জাওহেরো)

মাসআলাঃ রাত্রে রোজার নিয়ত করলো, অতঃপর দৃঢ় সংকল্প করলো যে,

রাখবেনা, নিয়ত বাতিল হবে। যদিও নতুন নিয়ত না করে এবং পূর্ণদিন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকে এবং সহবাস থেকে বিরত রইলো তবুও রোজা হবেনা। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ সেহেরী খাওয়া সুন্নাত, রমজানের রোজার জন্য হোক অথবা অন্য কোন রোজার জন্য হোক, কিন্তু সেহেরী খাওয়ার সময় যদি ইচ্ছা থাকে যে সকালে রোজা হবেনা তাহলে সেহেরী খাওয়াটা নিয়ত হবে না। (জওহেরো দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ রমজানের প্রত্যেক রোজার জন্য নতুনভাবে নিয়ত করা জরুরী। প্রথম তারিখ বা অন্য কোন তারিখে পূর্ণ রমজানের রোজার নিয়ত করে নিল তাহলে উক্ত নিয়ত শুধু একদিনের জন্য হবে, অবশিষ্ট দিনসমূহের জন্য হবেনা। (জওহেরো)

মাসআলাঃ উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থাৎ রমজানের আদায় রোজা নফল এবং নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা সাধারণ রোজার নিয়তে হয়ে যাবে। বিশেষভাবে ওগুলোর নিয়ত জরুরী নয়। অনুরূপ নফলের নিয়তেও আদায় হবে বরং সুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির রমজানে অন্য কোন ওয়াজিব রোজার নিয়ত করলো, তবুও রমজানের রোজাই হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ মুসাফির এবং রুগ্ন ব্যক্তি যদি রমজান শরীফে নফল বা অন্য কোন ওয়াজিব রোজার নিয়ত করল, তাহলে যেটার নিয়ত করেছে, সেটা হবে, রমজানের হবে না। (তানভীরুল আবছার) আর যদি অনির্দিষ্ট রোজার নিয়ত করে, তাহলে রমজানের আদায় হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ নির্দিষ্ট মান্নত অর্থাৎ অমুক দিন রাখবো, সেই দিন যদি অন্য ওয়াজিবের নিয়তে রোজা রাখলো, তাহলে যেটার নিয়তে রোজা রাখলো, তাহলে যেটার নিয়তে রোজা রেখেছে সেটা হবে, মান্নত কাযা করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রমজান মাসে অন্য কোন রোজা রাখলো, এটা যে রমজান মাস তার জানা ছিল না তবুও রমজানের রোজাই হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন মুসলমান অমুসলিম রাষ্ট্রে বন্দি ছিল, প্রত্যেক বৎসর সিদ্ধান্ত নিতো যে, রমজান মাস আসলে রমজানের রোজা রাখবে। পরে জানলো যে কোন বৎসরও রমজানে হয়নি, বরং প্রতিবৎসরের সূচনা রমজানের পূর্বেই হয়। তাহলে প্রথম বৎসরের মোটেই হয়নি। যেহেতু রমজানের পূর্বে রমজানের রোজা হতে পারে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের যদি অনির্দিষ্ট রমজানের নিয়ত করলো, তাহলে

প্রত্যেক বৎসরের রোজা বিগত বৎসরের রোজা সমূহের কাযা হবে। আর যদি সেই বৎসরের রমজানের নিয়তে রাখে, কোন বৎসরের হয়নি। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ উপরোক্ত অবস্থায় চিন্তা করলো এবং অন্তরে একথা বদ্ধমূল হলো যে, এটা রমজান মাস। রোজা রাখলো, মূলতঃ রোজা শাওয়াল মাসে হয়ে গেলো, তাহলে যদি রাত্রের নিয়ত করে থাকেন হবে, কেননা কাযার মধ্যে কাযার নিয়ত শর্ত নয়। বরং আদার নিয়তেও কাযা হয়। অতঃপর যদি রমজান ও শাওয়াল উভয়টি ত্রিশ দিনে হয় বা উনত্রিশ দিনে হয়, তাহলে আর একটি রোজা রাখবে। ঈদের দিন রোজা নিষিদ্ধ। রমজান যদি ত্রিশে হয়, শাওয়াল উনত্রিশে হয়, তাহলে আরো দু'টি রাখবে। রমজান উনত্রিশে ছিল, শাওয়াল ত্রিশে পূর্ণ হয়ে গেলো, মাসটি জিলহজ্ব হয়ে থাকলে উভয়টি যদি ত্রিশে বা উনত্রিশে হয় তাহলে আরো চারটি রোজা রাখবে। রমজান ত্রিশে ছিল বা উনত্রিশে, তাহলে পাঁচটি আর যদি বিপরীত হয় তিনটি রাখবে। মূলকথা নিষিদ্ধ রোজা বের করে সেই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। রমজান যত দিনের ছিলো। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রমজানের আদায় রোজা, নির্দিষ্ট মান্নত রোজা এবং নফল ছাড়া অবশিষ্ট রোজা যেমন, রমজানের কাযা, অনির্দিষ্ট মান্নত রোজা, নফলের কাযা, (অর্থাৎ নফল রোজা রেখে ভঙ্গ করেছে সেটার রোজা) নির্দিষ্ট মান্নতের কাযা, কাফ্ফারার রোজা, হেরেমে শিকার করার কারণে যে রোজা ওয়াজিব হয়েছে, হজ্বে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মাথা মুন্ডানোর রোজা, তামাত্তু হজ্বের রোজা, এসবগুলোতে চক্ষু জাগ্রত হওয়ার মাত্র সকালে বা রাত্রে নিয়ত করা জরুরী এবং এটাও জরুরী যে, যে রোজা রাখবে নির্দিষ্টভাবে সে রোজার নিয়ত করবে। ওসব রোজার নিয়ত দিনে করেছে তাহলে নফল হবে। পুনরায় তা পূর্ণ করা জরুরী। ভঙ্গ করলে কাযা দেয়া ওয়াজিব। যদিও তার জানা থাকে যে, যে রোজা রাখার ইচ্ছে করেছে এটাতো সে রোজা হবে না। বরং নফল হবে। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ নিজের জিম্মায় কাযা রোজা ছিল, ধারণা করে রোজা রাখলো, পরে জানলো যে ধারণা ভুল ছিল, তাহলে তাৎক্ষণিক ভঙ্গ করলে ভঙ্গ করতে পারবে, যদিও পূর্ণ করা উত্তম। তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ করল না, পরে আর ভাঙ্গা যাবে না, ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ রাত্রে কাযা রোজার নিয়ত করলো সকালে তা নফল করতে চাইলে করা যাবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ নামায পড়া অবস্থায় রোজা নিয়ত করেছে, নিয়ত সহীহ হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কয়েকটি রোজার কাযা হয়ে গেলো, তাহলে নিয়তে এরূপ হওয়া চাই যে, এই রমজানের পূর্বের রোজার কাযা, দ্বিতীয়টির কাযা, আর যদি কিছু সেই বৎসরের কাযা হল, কিছু বিগত বৎসরের অনাদায়ী ছিল, তখন এটা নিয়ত হওয়া চাই যে, এই রমজানের এবং ঐ রমজানের কাযা, আর যদি দিন ও বৎসর নির্দিষ্ট করা না হয় তবুও হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রমজানের রোজা ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করলো, তার উপর রোজার কাযা এবং ৬০টি রোজার কাফ্ফারা দিতে হবে। তিনি একষট্টিটি রোজা রাখলো, কাযার দিন নির্দিষ্ট করেনি– হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ সন্দেহের দিন অর্থাৎ শাবান মাসের ত্রিশ তারিখে বিশেষ নফল রোজা রাখা নিয়ত করতে পারবে। নফল ছাড়া অন্য কোন রোজা রাখা মাকরূহ। অনির্দিষ্ট রোজার নিয়ত হোক বা ফরজ বা কোন ওয়াজিব নির্দিষ্ট নিয়ত করা হোক অথবা সন্দেহপরায়ন হয়ে হোক– এসব অবস্থায় মাকরূহ। অতঃপর রমজানের নিয়ত করলে তা মাকরূহ তাহ্‌রিমী হবে। অন্যথায় মুকীমের জন্য তানযিহী। মুসাফির যদি কোন ওয়াজিবের নিয়ত করে মাকরূহ নয়। অতঃপর সে দিন যদি রমজান হওয়াটা প্রমাণ হয়, তাহলে মুকীমের জন্য সর্বাবস্থায় রমজানের রোজা। আর যদি প্রকাশ হয় যে, সেই দিনটি শা'বানের দিন ছিল এবং কোন ওয়াজিবের নিয়ত করেছিল, তাহলে যে ওয়াজিবের নিয়ত করেছিল সেটা হবে। আর যদি কোন অবস্থা প্রকাশ না পায় ওয়াজিবের নিয়ত ব্যর্থ হল। মুসাফির যেটার নিয়ত করেছে, সর্বাবস্থায় সেটাই হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যদি ত্রিশ তারিখটি এমন দিন হলো, যেদিনে রোজা রাখতে অভ্যস্ত। তাহলে সেই রোজা রাখা উত্তম। যেমন কোন ব্যক্তি সোমবার বা বৃহস্পতিবারে রোজা রাখেন। সেদিনই ত্রিশ তারিখ হলো, তাহলে রোজা রাখা উত্তম। অনুরূপ কয়েকদিন পূর্ব থেকে রাখছিল, তাহলে সন্দেহের দিনে মাকরুহ হবে না। মাকরূহ হচ্ছে সেই অবস্থায় যদি রমজানে এক বা দুই দিন পূর্ব থেকে রোজা রাখা হয় অর্থাৎ শুধু ত্রিশে শাবান অথবা উনত্রিশ বা ত্রিশে শাবানে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ সেই দিন রোজা রাখতে অভ্যস্থও নয় বা কয়েক দিন পূর্ব থেকে রোজাও রাখেনি, তাহলে বিশেষ লোকেরা রোজা রাখবে। সাধারণ জনগণ রাখবে না বরং

সাধারণ জনগণের জন্য হুকুম হলো, দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রোজাদারের মত থাকবে। যদি এ সময় পর্যন্ত চাঁদের প্রমাণ পাওয়া যায় রোজার নিয়ত করে নেবে। অন্যথায় পানাহার করবে। এখানে বিশেষ শ্রেণী বলতে শুধু ওলামারা নয় বরং যেসব লোকেরা জানে যে, সন্দেহের দিনে এধরনের রোজা রাখা যায়, তারা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অন্যথায় সাধারণ জনগণের অন্তর্ভুক্ত। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ সন্দেহের দিনের রোজায় দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, এটা নফল রোজা, দুলোল্যমান যেন না হয়। এমন যেন না হয় যে, যদি রমজান হয়, এ রোজা রমজানের অন্যথায় নফল। অথবা এরূপ বলা যে, আজকে রমজান হলে, তাহলে এটা রমজানের রোজা অন্যথায় অন্য কোন ওয়াজিব রোজা– এ উভয় নিয়ম মাকরূহ। অতঃপর সেই দিন যদি রমজান হওয়া প্রমাণিত হয়, রমজানের ফরজ আদায় হবে, অন্যথায় উভয় অবস্থায় নফল হবে।

এরূপ নিয়ত করাতে সর্বাবস্থায় গুনাহগার হলো। এ ধরনের নিয়তও করবে না যে, যদি এদিন রমজান হয় তবে রমজানের রোজা আর না হলে রোজা নয়– এ অবস্থায় নিয়তও হয়নি রোজা হল না। আর যদি পূর্ণভাবে নফলের ইচ্ছা থাকে কিন্তু কখনো কখনো অন্তরে এ ধারণা বিরাজ করে যে, আজকে যদি রমজানের দিন হতো, এতে অসুবিধা নেই। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ সাধারণ জনগণকে যে বিধান দেয়া হলো যে, দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে, যারা সেটার উপর আমল করলো, কিন্তু ভুলবশতঃ খেয়ে নিল অতঃপর সেইদিন রমজান হওয়া প্রমাণ হল, তখন রোজার নিয়ত করে নিলে, হয়ে যাবে। অপেক্ষাকারী রোজাদারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ভুলবশতঃ খাওয়ায় দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। (দুররুল মোখতার)

চাঁদ দেখার বর্ণনা

মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ - قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

অর্থঃ হে হাবীব! আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে (তারা) জিজ্ঞাসা করছে, আপনি বলে দিন যে, সেটা সময়ের কতগুলো প্রতীক, মানব জাতি ও হজ্বের জন্য। (সূরা বাকরা, পারা-২, আয়াত-১৮৯)

হাদীস– (১) ঃ সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, (রমজান মাসের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোজা রেখো না, আর চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ইফতার করো না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে (শাবান) মাসের দিনগুলো পূর্ণ করবে।

হাদীস– (২) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো, আর চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে শা'বান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করো।

হাদীস– (৩) ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, দারেমী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট এক বেদুঈন এসে বললো, আমি রমজানের চাঁদ দেখেছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জিজ্ঞেস করলেন,, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই; সে বলল, হ্যাঁ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি স্বাক্ষ্য দাও যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর রাসূল। সে বলল, হ্যাঁ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, হে বেলাল! লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন আগামীকাল রোজা রাখে।

হাদীস– (৪) ঃ আবু দাউদ, দারেমী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সমবেত লোকেরা চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগলো, কে সংবাদ দিল যে, আমি চাঁদ দেখেছি, হুজুরও রোজা রাখলেন। লোকদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।

হাদীস– (৫) ঃ আবু দাউদ শরীফে, হযরত উম্মুল মোমেনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শা'বান মাসের হিসাব যেমনভাবে রাখতেন, তেমন হিসাব অন্য কোন মাসে রাখতেন না, অতঃপর রমজানের চাঁদ দেখে রোজা রাখতেন, যদি আকাশ মেঘলা থাকতো শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করতেন, অতঃপর রোজা রাখতেন।

হাদীস– (৬) ঃ মসুলিম শরীফে আবুল বাখ্তারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমরা ওমরার জন্য যখন বাতনে নাখলা নামক স্থানে পৌছলাম, চাঁদ দেখে কেউ বললো, তিন দিনের চাঁদ আর কেউ বললো দু'দিনের চাঁদ, আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিন জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন রাত্রে দেখেছো? আমরা বললাম, অমুক রাত্রে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যে রাত্রে দেখতেন, সে রাত্রে তারিখ গণনা করতেন, সুতরাং তোমরা যে রাত্রে তা দেখেছো, তা সে রাত্রের চাঁদ হিসেবে নির্ধারিত হবে।

চাঁদ দেখার শরয়ী বিধান

মাসআলাঃ পাঁচটি মাসের চাঁদ দেখা ওয়াজিবে কেফায়া, শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলক্বদ, জিলহজ্ব। কারণ হলো যে, রমজানের চাঁদ দেখতে যদি আকাশ মেঘলা থাকে তাহলে শাবানের মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে রমজান শুরু করবে। রমজানের রোজা রাখার জন্য শাওয়ালের রোজা শেষ করার জন্য, জিলক্বদ হিসেবে রাখবে জিলহজ্জের জন্য, জিলহজ্ব হিসেবে রাখবে, বকরা ঈদের হিসেবের জন্য। (ফতোয়ায়ে রিজভীয়্যাহ)

মাসআলাঃ কেউ চাঁদ বা ঈদের চাঁদ দেখলো, কিন্তু ওর স্বাক্ষী কোন শরয়ী কারণে প্রত্যাহৃত হলো, যেমন ফাসিক ব্যক্তি চাঁদ দেখার কথা বলল, বা ঈদের চাঁদ সে একা দেখল, তার জন্য হুকুম হলো সে রোজা রাখবে যদিও নিজে নিজে ঈদের চাঁদ দেখেছে এবং তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা জায়েয নেই। কিন্তু ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা জরুরী নয়। এ ধরনের যদি রমজানের চাঁদের ক্ষেত্রে হয় এবং সে নিজের হিসেব অনুযায়ী ত্রিশ রোজা পূর্ণ করেছে, কিন্তু ঈদের চাঁদ দেখার সময় যদি আকাশ মেঘলা থাকে তাহলে আরো একদিন রোজা রাখার হুকুম রয়েছে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ চাঁদ দেখে রোজা রেখেছে অতঃপর রোজা ভেঙ্গে দিল, অথবা ওখানকার কাযীর নিকট স্বাক্ষীও দিয়েছে, এখনো কাযী ওর স্বাক্ষীর ব্যাপারে হুকুম প্রদান করেনি, তিনি রোজা ভঙ্গ করে দিলেন তখনও কাফ্ফারা অবশ্যক নহে, শুধু ঐ রোজার কাযা দেবে। কাযী যদি ওর স্বাক্ষী কবুল করে এরপর রোজা ভঙ্গ করল, তাহলে কাফ্ফারা আবশ্যক। যদিও সে ফাসিক হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিবিদ্যায় জ্ঞানী, সে যদি স্বীয় জ্যোতিবিদ্যার আলোকে একথা বলে যে, আজকে চাঁদ উদিত হয়েছে বা হয়নি, হলেও তা ধর্তব্য নয়, যদিও

সে ন্যায়পরায়ন হয়, যদিও একাধিক লোক এরূপ বলে। যেহেতু শরীয়তে চাঁদ দেখা বা স্বাক্ষী দ্বারা প্রমাণই বিবেচ্য। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ প্রত্যেক স্বাক্ষ্যতে একথা বলা প্রয়োজন যে, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, এ শব্দ ছাড়া স্বাক্ষ্য হয় না। কিন্তু মেঘলা দিনে রমজানের চাঁদের স্বাক্ষ্যের ব্যাপারে তা বলা জরুরী নয়। এতটুকু বললেই যথেষ্ট যে, আমি এ রমজানের চাঁদ নিজের চোখে আজ বা কাল বা অমুক দিন দেখেছি।

অনুরূপ ওর স্বাক্ষ্যের মধ্যে দাবী, মজলিসের সিদ্ধান্ত এবং বিচারকের আদেশও শর্ত নয়। এমনকি যদি কেউ বিচারকের নিকট স্বাক্ষী দিন যে, যিনি ওর স্বাক্ষ্য শ্রবণ করেছে ওকে বাহ্যিকভাবে নীতিবান মনে হয়েছে তাহলে ওর উপর রোজা রাখা জরুরী যদিও বিচারকের হুকুম তিনি শুনেননি। হয়তঃ তিনি হুকুম দেয়ার পূর্বেই চলে গেলেন। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অপরিস্কার হলে রমজানের চাঁদ দেখার প্রমাণ একজন বিবেকবান মুসলমান, মাসতুর, বালেগ বা ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির স্বাক্ষ্য দ্বারা হবে। পুরুষ হোক মহিলা হোক, স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস/দাসী হোক বা ব্যাভিচারের অপবাদে দণ্ডিত ব্যক্তি হোক, যদি তাওবা করে থাকে। ন্যায়পরায়ন বলতে কম্পক্ষে মুত্তাকী হওয়া অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন এমন ব্যক্তি এবং যিনি ছগীরা গুনাহ বারংবার না করেন এবং এমন কাজও না করেন যে কাজ মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। যেমন; বাজারে খাবার খাওয়া। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ফাসিক যদিও রমজানের চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দেয়, তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ওর দায়িত্বে স্বাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য কি না? কাজী ওর স্বাক্ষ্য কবুল করার ব্যাপারে যদি আশা করা যায়, তাহলে স্বাক্ষ্য দেয়া ওর জন্য জরুরী। মসতুর অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা শরীয়ত মুতাবিক, কিন্তু আভ্যান্তরীন অবস্থা অজ্ঞাত, ওর স্বাক্ষ্য রমজান ছাড়াও গ্রহণযোগ্য নয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যে ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখন, তার উপর ওয়াজিব হলো সে রাতেই জানিয়ে দেয়া। এমনকি ক্রীতদাসী বা পর্দানশীন মহিলা চাঁদ দেখল তার উপর ওয়াজিব হলো সেই রাতেই জানিয়ে দেয়া। ক্রীতদাসীর জন্য মুনিবের অনুমতি লাভের প্রয়োজন নেই। অনুরূপ স্বাধীন মহিলাও স্বাক্ষ্য দেবে। এজন্য

স্বাক্ষীর অনুমতি লাভের প্রয়োজন নেই। তবে এ হুকুম তখনই হবে যদি তার স্বাক্ষ্যের উপর চাঁদ দেখার প্রমাণ নির্ভরশীল হয়। তার স্বাক্ষ্য ছাড়া হচ্ছে না, অন্যথায় প্রয়োজন নেই। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যার নিকট রমজানের চাঁদের স্বাক্ষ্যের সংবাদ পৌঁছেছে, তার জন্য এ কথা জিজ্ঞেস করা জরুরী নয় যে, তুমি কোথায় দেখেছো? চাঁদ কোনদিকে ছিল! কতটুকু উঁচুতে ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। (আলমগীরি, অন্যান্য) কিন্তু বর্ণনা যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তখন প্রশ্ন করবে। শেষতঃ ঈদের ব্যাপারে, লোকেরা ঈদের চাঁদ দেখে নেবে।

মাসআলাঃ ইমাম একাকী (ইসলামী শাসক) বা কাজী চাঁদ দেখেছে, তার জন্য এখতিয়ার রয়েছে হয়তঃ নিজেই রোজা রাখার নির্দেশ দেবে, অথবা কাউকে স্বাক্ষ্য নেয়ার জন্য নিযুক্ত করবে এবং ওর নিকট স্বাক্ষ্য পেশ করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ গ্রামে চাঁদ দেখেছে, ওখানে এমন কেউ নেই যে, যার নিকট স্বাক্ষ্য দেবে তখন গ্রামবাসীদেরকে একত্রিত করে যখন স্বাক্ষ্য দেয়া, সাক্ষীদাতা যদি ন্যায়পরায়ন হয় তহালে সকলের উপর রোজা রাখা অপরিহার্য। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কেউ নিজে চাঁদ দেখেনি, দর্শনকারী ওকে নিজের সাক্ষী করেছে, তাহলে ওর স্বাক্ষীর হুকুম অনুরূপ যেরূপ চাঁদ দর্শনকারীর স্বাক্ষ্যের হুকুম। যদি স্বাক্ষ্যের উপর স্বাক্ষীর সকল শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে। (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ চাঁদ উদয়ের স্থান যদি পরিষ্কার হয় তাহলে অনেক লোক স্বাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত চাঁদ দেখার প্রমাণিত হতে পারে না। এর জন্য কতজন লোকের প্রয়োজন সেটা নির্ভর করবে কাজীর রায়ের উপর। যতজন স্বাক্ষ্যে ওর দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় ততজনের স্বাক্ষ্য নিয়ে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেবে। যদি শহরের বাইরে বা উঁচুস্থানে থেকে চাঁদ দেখার বর্ণনা দেয়। সেক্ষেত্রে একজন মসতুর ব্যক্তির কথাও চাঁদ দেখার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। (দুররুল মোখতার, অন্যান্য)

মাসআলাঃ অধিক সংখ্যা লোকের শর্ত তখন প্রযোজ্য যখন রোজা রাখা বা ঈদ করার জন্য স্বাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়বে, অন্য কোন লেনদেনের জন্য দুইজন পুরুষ, অথবা একজন পুরুষ, দুইজন মহিলার বিশ্বস্ত স্বাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। কাজী স্বাক্ষীর ভিত্তিতে আদেশ দিল, তাহলে এ স্বাক্ষ্য যথেষ্ট। রোজা রাখা ও ঈদ করার জন্য এটা প্রমাণ স্বরূপ হয়ে গেল। যেমন একজন ব্যক্তি অন্যের উপর দাবী করল যে, আমি

অমুকের নিকট এত টাকা কর্জ পাব। ওটার সময়সীমাও নির্ধারণ করেছে যে রমজান আসলে কর্জ পরিশোধ করবে কিন্তু রমজান এসে গেল, কিন্তু টাকা দিচ্ছে না প্রতিপক্ষ বলেছে, নিশ্চয়ই আমার উপর ওর পাওনা আছে এবং সময়সীমাও এটাই ছিল। কিন্তু এখনো রমজান আসেনি এ দাবীর স্বপক্ষে তিনি দুইজন স্বাক্ষীও পেশ করলো, যারা চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দিচ্ছে কাজী সিদ্ধান্ত দিল যে, কর্জ পরিশোধ করো, তাহলে যদিও উদয়ের স্থান পরিষ্কার ছিল, দুইজন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যও হলো, কিন্তু এখন রোজা রাখা বা ঈদ করার ব্যাপারেও এ দুইজন স্বাক্ষীই যথেষ্ট হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ একস্থানে চাঁদ উদয় স্থান পরিষ্কার অন্য জায়গায় পরিষ্কার নয়, ওখানে কাজীর সামনে স্বাক্ষ্য পেশ করা হলো, কাজী চাঁদ দেখার হুকুম দিল, তখন দুইজন বা কয়েকজন লোক ওখানে, যেখানে উদয়স্থান পরিষ্কার ছিল, একথার স্বাক্ষ্য দিল যে, অমুক কাজীর দু'জন ব্যক্তি অমুক রাত্রে চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দিল এবং কাজী আমাদের সামনে হুকুম দিল এবং দাবীর শর্তাবলীও বিদ্যমান থাকে তখন ওখানকার কাজীও ওসব স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদেশ দিতে পারবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কিছু লোক যদি একথা বলে যে, অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গেছে বরং যদি এরূপ স্বাক্ষ্য দিল যে, অমুক অমুক চাঁদ দেখেছে এবং যদি এ স্বাক্ষ্য দেয় যে, কাজী রোজা বা ইফ্তারের জন্য সকলকে আদেশ করেছে, এসব পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কোন শহরে চাঁদ দেখা গেল, ওখানকার কয়েকটি কাফেলা, অন্য শহরে আসলো এবং সকলে সংবাদ দিলো যে, ওখানে অমুক দিনে চাঁদ দেখা গেছে, শহরের সর্বত্র যদি একথা প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ওখানকার লোকেরা দেখার ভিত্তিতে অমুক দিন হতে রোজা শুরু করেছে, তাহলে অন্যদের জন্যও প্রমাণ স্বরূপ হয়ে গেলো। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ রমজানের চাঁদের রাতে আকাশ মেঘলা ছিল, এক ব্যক্তি স্বাক্ষ্য দিল তার স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোজার আদেশ দেয়া হলো, এখন ঈদের চাঁদ যদি আকাশ মেঘলার কারণে দেখা না যায়, তাহলে ত্রিশ রোজা পূর্ণ করে ঈদ করবে. আর যদি উদয়স্থান পরিষ্কার হয়, ঈদ করবে না, কিন্তু যদি দু'জন ন্যায়পরায়ন সাক্ষীর দ্বারা রমজানের প্রমাণ মিলে, রোজা রাখবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ চাঁদ উদয়ের স্থান পরিষ্কার না হয় তাহলে রমজান ছাড়া শাওয়াল, জিলহজ্ব বরং সকল মাসের জন্য দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা স্বাক্ষ্য দেবে। সকলে যেন আদিল (ন্যায়পরায়ন) হয় এবং স্বাধীন হয়, ওদের কেউ যেন ব্যাভিচারের অপবাদে দণ্ডিত না হয়। যদিও তাওবা করা হয় এবং এটাও শর্ত যে, স্বাক্ষী স্বাক্ষ্য দেয়ার সময় যেন এ শব্দ সমূহ বলে যে, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি। (ফিকাহর কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ গ্রামে দু'জন ব্যক্তি ঈদের চাঁদ দেখল, উদয়স্থান পরিষ্কার ছিল, ওখানে এমন কেউ ছিল না যে, যার নিকট স্বাক্ষ্য দেবে। তাহলে গ্রামবাসীদেরকে বলবে তিনি যদি ন্যায়পরায়ন হন সকলে ঈদ করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইমাম বা কাজী একাকী ঈদের চাঁদ দেখল, তখন ওর জন্য ঈদ করা বা ঈদের ঘোষণা দেয়া জায়েয নেই। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ উনত্রিশে রমজান কিছু লোক স্বাক্ষ্য দিল যে, আমরা অন্য লোকদের একদিন পূর্বে চাঁদ দেখেছি, সে হিসেবে আজ হচ্ছে ত্রিশে রমজান, তাহলে ওসব লোক যদি ওখানে থাকে ওদের স্বাক্ষ্য কবুল হবে না। যেহেতু তারা সময়মত স্বাক্ষ্য কেন দিল না? আর যদি তারা ওখানে না থাকে এবং তারা যদি আদিল ন্যায়পরায়ন হয় কবুল হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রমজানের চাঁদ দেখা যায়নি, শা'বান মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ করে রোজা শুরু করবে। আঠাশদিন রোজা রাখতেই ঈদের চাঁদ দেখা দিল তাহলে শা'বানের চাঁদ দেখে ত্রিশ দিনে মাস সাব্যস্ত করায় একটি রোজা কাজা করবে। আর যদি শা'বানের চাঁদও দেখা যায়নি, বরং রজবের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করে শা'বান মাস শুরু করেছে, তাহলে দু'টি রোজা কাজা দেবে। (আলমগরি)

মাসআলাঃ যদি দিনে চাঁদ দেখা যায়, দ্বিপ্রহরের আগে হোক বা পরে যে কোন অবস্থায় সেটাকে আগত রাতের চাঁদ ধরতে হবে। অর্থাৎ যে রাতটা আসবে যেটা থেকে মাস শুরু হবে যদি ত্রিশে রমজানের দিনে দেখা যায়, তাহলে দিনটি রমজানের অন্তর্ভুক্ত। শাওয়ালের নয়। রোজা পূর্ণ করা ফরজ। আর যদি ত্রিশে শা'বান দিনে দেখা যায়, সেটা শা'বানের দিন রমজানের নয়, সুতরাং সেদিনের রোজা ফরজ নয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ একস্থানে চাঁদ দেখা গেল, সেটা কেবল সেস্থানের জন্য নয় বরং সারা

পৃথিবীর জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যস্থানের বাসিন্দাদের জন্য সেই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন অন্য এলাকাবাসীর জন্য ঐ দিন চাঁদ দখার শরয়ী প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য পাওয়া গেল বা কাজীর আদেশের সাক্ষ্য পাওয়া গেল বা বিভিন্ন কাফেলা ওখান থেকে এসে সংবাদ দিল যে, অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গেছে বা ওখানকার লোকেরা রোজা রেখেছে বা ঈদ করেছে। (দুররুল মোখতার)

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন দ্বারা চাঁদ দেখার সংবাদ প্রসঙ্গে শরয়ী বিধান

মাসআলাঃ টেলিগ্রাফ, টেলিফোন দ্বারা চাঁদ দেখার সংবাদ প্রমাণিত হবে না। বাজারের গুজব কথামালা, পত্রিকা বা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ দ্বারাও চাঁদ দেখা প্রমাণ হবে না। বর্তমানে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, উনত্রিশে রমজান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একস্থান হতে অন্যস্থানে টেলিফোনযোগে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, চাঁদ দেখা গেল বা গেল না, যদি কোনস্থান থেকে টেলিফোন এসে যায়, ঠিক কালই ঈদ, এটা নিছক নাজায়েয ও হারাম। টেলিফোন/টেলিগ্রাফ কি বস্তু? প্রথমতঃ এটা অজ্ঞাত যে, যার নাম লিখিত প্রকৃতপক্ষে ওর প্রেরিত কি না। মনে করুন তুনার হলেও তোমার কাছে ওটার প্রমাণ কি? এটাও হতে পারে টেলিগ্রাফে অধিক ভুল কথা পরিবেশিত হয়ে থাকে। হ্যাঁ কে না বলা, না কে হ্যাঁ বলার সাধারণ বিষয়। সম্পূর্ণ সঠিক মনে করে মেনে নিল এটা নিছক একটি সংবাদ, স্বাক্ষ্য নয়, তাও কিন্তু বিশটি মাধ্যম অতিক্রম করে। টেলিগ্রাফকারী যদি ইংরেজী পড়ুয়া না হয় হতে পারে অন্য কারো দ্বারা লিখিয়েছে, জানা নেই যে, কি লিখা হয়েছে বা কি লিখেছে। কোন লোককে দিল কে টেলিগ্রাফম্যানকে দিল এখন সে টেলিগ্রাফ বাড়ীতে পৌছিল, সে বন্টনকারীকে দিল সেই অন্য আরেকজনকে সোপর্দ করল, জানা নেই এভাবে কতস্তর অতিক্রম করে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌছেছে, যদিও তাকে দেয়া হয় কয়টি স্তর অতিক্রম করা হয়েছে। এখন দেখুন মসতুর মুসলমান যার আদিল বা ফাসিক হওয়াটা অজানা, এ পর্যায়ের স্বাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব স্তর অতিক্রম করে টেলিগ্রাফ পৌছেছে সকল স্তরের লোকেরা মুসলমান হওয়াটাও নিশ্চিত নয়। এটা বিবেক গ্রাহ্য যে, যার অস্তিত্ব অজানা এবং পত্র প্রাপক ব্যক্তি যদি ইংরেজী পড়ুয়া না হয়, কারো দ্বারা পড়ায়ে নেয়া হয়, যদি কোন কাফির কর্তৃক পড়িত হয়, কিভাবে নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ হবে। আর যদি মুসলমান কর্তৃক হয় বিশুদ্ধ পড়ার ব্যাপারে ও কিরূপে আস্থাবান হওয়া যায়? উদ্দেশ্য সাবধান হও, এমন অনেক দিক আছে যা বার্তাযোগে হারিয়ে যায়। ফকীহগণ তো চিঠিপত্রকে গুরুত্বও দেয়নি।

যদিও লেখকের লেখা ও স্বাক্ষর পরিচয় করা যায় এবং ওটাতে তার সীলও যদি দেয়া হয়।

اَلْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ وَالْخَاتَمُ يُشْبِهُ الْخَاتَمَ

চিঠি চিঠির মত হয়, মোহর মোহরের অনুরূপ। তাহলে তারবার্তার কি অবস্থা।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

মাসআলাঃ নতুন চাঁদ দেখে চাঁদের দিকে ইংগিত করা মাকরূহ, যদিও অন্যকে বলার জন্য হয়। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না তার বর্ণনা

হাদীস- (১) ঃ সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে রোজা অবস্থায় ভুলবশতঃ কিছু খেয়েছে বা পান করেছে, সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে, কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে পানাহার করায়েছেন।

হাদীস- (২) ঃ আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, রোজা অবস্থায় যার বমি হয়েছে তার উপর কাযা আবশ্যক নয়। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করেছে সে যেন তা কাজা করে।

হাদীস- (৩) ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হুজুর! আমার দু'চক্ষু ব্যথা করে, আমি কি রোজা অবস্থায় সুরমা লাগাতে পারি? হুজুর বললেন, হ্যাঁ।

হাদীস- (৪) ঃ তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, তিন জিনিষ রোজাদারের রোজাকে ভঙ্গ করে না। শিংগা লওয়া, বমি করা এবং স্বপ্নদোষ হওয়া।

সতর্কতাঃ এ অধ্যায়ে যেসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, সেসব কাজ দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না। তবে অবশিষ্ট রইলো ওসব কাজ দ্বারা রোজা মাকরূহ হবে কি না? এর সাথে এ অধ্যায়ের কোন সম্পর্ক নেই। ঐ কাজগুলো জায়েয কি না? এটার সাথেও এ অধ্যায়ের সম্পর্ক নেই।

মাসআলাঃ ভুলবশতঃ খেয়েছে বা পান করেছে বা সহবাস করেছে, রোজা ভঙ্গ হবে না। ফরজ রোজা হোক বা নফল রোজা।

রোজার নিয়তের পূর্বে বা পরে এসব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও স্মরণ হল না যে, তিনি রোজাদার তখন রোজা ভঙ্গ হবে। তবে স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর ওসব কার্যাদি, যা সংগঠিত হয়। কিন্তু এমতাবস্থায় কাফ্ফারা আবশ্যক নয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কোন রোজাদারকে উক্ত কার্যাদি করতে দেখলে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। স্মরণ করিয়ে না দিলে গুনাহগার হবে। কিন্তু রোজাদার যদি অধিক দুর্বল হয় যে, স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি খাবার ছেড়ে দেবে এবং দুর্বলতা এত বেশী বৃদ্ধি পাবে যে, রোজা রাখা কষ্টকর হবে। খেয়ে নিলে রোজাও ভালমতে পূর্ণ করতে পারবে এবং অন্যান্য ইবাদতও ভালভাবে করতে পারবে। এমতাবস্থায় স্মরণ করিয়ে না দেয়া উত্তম। কতেক মাশায়েখগণ বলেন, যুবকদের দেখলে স্মরণ করিয়ে দেবে, বৃদ্ধদেরকে দেখলে স্মরণ করিয়ে না দিলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এ বিধান অধিকাংশের বিবেচনায়। যেহেতু যুবক অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়, বৃদ্ধরা অধিকাংশ দুর্বল হয়, তবে মূল বিধান হলো এই যে, যুবক বা বৃদ্ধ হওয়াটা বিবেচ্য নয় বরং সামর্থ ও দুর্বলতাই বিবেচ্য। বিধায় যদি যুবক এতটুকু দুর্বল হয় যে, স্মরণ করিয়ে না দিলে অসুবিধা নেই। আর বৃদ্ধ যদি শক্তিশালী হয় স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মাছি, ধোয়া, বা ধুলাবালি কণ্ঠনালীতে পৌছলে রোজা ভঙ্গ হবে না। আটার বালি হোক বা চাক্কি পিষতে বা আটা চালনার সময় উড়ে বা ফসল শষ্যের বালি বা বাতাসে উড়ন্ত বালি, বা প্রাণীর ক্ষুর বা পা থেকে বালি উড়ে কণ্ঠনালীতে পৌছলো, রোজাদার হওয়াটা যদিও স্মরণে ছিল আর যদি ইচ্ছাকৃত ধোয়া পৌছায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে- যদি রোজাদার হওয়াটা স্মরণ থাকে, যে কোন ধরনের ধোয়া হোক না কেন, যে কোনভাবেই পৌছুক। এমনকি আগর বাতি ইত্যাদির সুগন্ধি আহরণ করছে মুখ নিকটে করে ধোয়া যদি নাক দিয়ে টানে রোজা ভঙ্গ হবে। অনরূপ হুক্কা পান করলেও রোজা ভঙ্গ হবে। রোজা স্মরণ থাকাবস্থায় হুক্কা পান করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ শিংগা লাগানো বা তৈল অথবা সুরমা লাগালে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও বা তেল বা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভুত হয়। বরং থুথুর মধ্যে সুরমার রং দৃশ্যমান হলেও রোজা ভঙ্গ হবে না। (জাওহেরা নাইয়্যারা)

মাসআলাঃ চুম্বন করল, কিন্তু বীর্যপাত হয়নি রোজা ভঙ্গ হয়নি। অনুরূপ স্ত্রীর প্রতি বরং তার লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করলো, হাত দ্বারা স্পর্শ করেনি বীর্যপাত হল যদিও বারবার দৃষ্টিপাত করা বা সহবাস ইত্যাদির খেয়াল করার দরুন বীর্যপাত হয়েছে, যদিও দীর্ঘক্ষণ এ ধরনের খেয়াল করায় এরূপ হয়েছে, এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে না। (জাওহেরা, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ গোসল করল, পানির আদ্রতা ভিতরে অনুভূত হলো বা কুল্লি করল, পানি সম্পূর্ণরূপে বাইরে নিক্ষেপ করেছে, কেবল সামান্য আর্দ্রতা মুখে বাকী ছিল থুথুর সাথে তা-ও বের হয়ে গেল বা ঔষধ সেবন করছে কণ্ঠনালীতে তার স্বাদ অনুভব করেছে, অথবা হাড় চোষণ করেছে এবং থুথু বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু থুথুর সাথে হাড়ের কোন কিছু কণ্ঠনালীতে পৌছেনি বা কানে পৌছলো, অথবা খড়কুটা দ্বারা কান খুজুলালো, এতে কানের ময়লা লেগে গেল, অতঃপর ঐ ময়লাযুক্ত খড়কুটো কানের ভিতর ঢুকলো- যদিও কয়েকবার করা হয় বা দাঁত বা মুখে পাতলা জিনিষ অজ্ঞাতে রয়ে গেল, লালা বা শ্লেষার সাথে অমনিতে বেরিয়ে পড়বে এবং বেরিয়ে গেছে, বা দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছেছে, কিন্তু কণ্ঠনালীর নীচে যায়নি। উপরোক্ত অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে না। (দুররুল মোখতার, ফতহুল কাদীর)

মাসআলাঃ রোজাদারের পেটে কেউ তীর বা বর্শা বিদ্ধ করেছে যদিও বর্শার খণ্ডাংশ অথবা ফলা পেটের ভিতর পৌছেছে, রোজা ভঙ্গ হবে না। আর যদি নিজে এসব কাজ করে এবং বর্শার ফলা বা খণ্ডাংশ যদি ভিতরে থেকে যায় রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কথা বলতে থুথু এসে ঠোঁট ভিজে গেছে এবং তা পান করে নিয়েছে, অথবা মুখ থেকে লালা টপকে পড়েছে, কিন্তু একেবারে পড়ে যায়নি, তা তুলে পান করে ফেলা হল বা নাকে শ্লেষা আসলো, বরং নাকের বাইরে এসে গেল, কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না তা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসলো, বা কাশির আওয়াজে কাঁথারী মুখে আসলো এবং রেখে দিল, যতটুকই হোক না কেন, রোজা ভঙ্গ হবে না। তবে এসব ব্যাপারে সতর্কতা অপরিহার্য। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মাছি কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে গেছে, রোজা ভঙ্গ হবে না। ইচ্ছাকৃত হলে রোজা ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি)

ভুলবশতঃ সহবাস করতেছিল, স্মরণ হওয়া মাত্রই পৃথক হয়ে গেল বা সুবহে সাদিকের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত ছিল, সুবহে সাদেক হওয়া মাত্রই পৃথক হয়ে গেল রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও উভয় অবস্থায় পৃথক হওয়াটা স্মরণ হওয়া এবং সুবহে সাদেক হওয়া মাত্রই হয়েছে পৃথক হওয়ায় নড়াছড়ায় সহবাস হয়নি, যদি স্মরণ হওয়া অথবা সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই পৃথক হয়নি, কেবল স্থির হয়ে আছে, নড়াছড়া করেনি, রোজা ভঙ্গ হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ভুলবশতঃ খাবার খাচ্ছিল, স্মরণ হওয়া মাত্রই গ্রাস নিক্ষেপ করেছে বা সুবহে সাদিকের পূর্বে ভক্ষণ করতেছিল সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই রেখে দিল, রোজা ভঙ্গ হবে না। আর যদি বেরিয়ে আনে, উভয় অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ দু'দ্বার ভিন্ন অন্য পথে সহবাস করেছে, যতক্ষণ বীর্যপাত হয়নি রোজা ভঙ্গ হবে না, অনুরূপ হস্তমৈথুন দ্বারা বীর্য বের করলে, যদিও এটা কঠোর হারাম। হাদীস শরীফে হস্তমৈথুনকারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ চতুষ্পদ প্রাণী বা মৃতের সাথে সহবাস করেছে বীর্যপাত হয়নি, রোজা ভঙ্গ হবে না বীর্যপাত হলে রোজা ভঙ্গ হবে। প্রাণীকে চুম্বন করল বা তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করল রোজা ভঙ্গ হবে না, যদিও বীর্যপাত হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্বপ্নদোষ হল বা গীবত করল, রোজা ভঙ্গ হবে না যদিও গীবত করা কঠোর কবীরা গুনাহ। কোরআন মজীদে গীবত সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেমন নিজের মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা, হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে গীবত জেনা'র চেয়েও অধিক শক্ত খারাপ কাজ। যদিও গীবতের কারণে রোজার নূরানীয়ত দূরীভূত হয়ে যায়। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ স্ত্রী সহবাসে শুক্রক্ষরণ জনিত অপবিত্রতা অবস্থায় সকাল করেছে বরং যদি গোটা দিনই অপবিত্র থাকে, রোজা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু দেরীক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত গোসল না করা যাতে নামাজ কাজা হয়, গুনাহ ও হারাম। হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে, অপবিত্র যে ঘরে থাকবে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসে না। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ জ্বীন অর্থাৎ পরীর সাথে সহবাস করেছে যতক্ষণ বীর্যপাত হবে না রোজা ভঙ্গ হবে না। (দুররুল মোখতার) অর্থাৎ যদি মানুষের আকৃতিতে না হয়। আর যদি

মানুষের আকৃতিতে হয়, তাহলে মানুষের সাথে সহবাস করলে যে হুকুম এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম।

মাসআলাঃ তিল বা তিল পরিমাণ কোন বস্তু চিবেছে এবং থুথুর সাথে কণ্ঠনালীর ভিতর প্রবেশ করেছে রোজা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এর স্বাদ যদি কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয় তখন রোজা ভঙ্গ হবে। (ফাতহুল কাদীর)

রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা

হাদীস- (১) : বোখারী, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ দারেমী প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমজানের এক দিনের রোজা কোন ওজর বা রোগ ব্যতীত ভাঙ্গবে, সারা জীবনের রোজা তার ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সারা জীবন রোজা রাখে। অর্থাৎ রমজানে রাখলে যে ফজীলত কোনভাবে তা অর্জন করতে পারবে না। রোজা না রাখলে যদি এ ধরনের কঠোর শাস্তি তাহলে রোজা রাখার পর ভেঙ্গে ফেললে তার চেয়েও কঠোর শাস্তি হবে।

হাদীস- ২ : ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান স্বীয় সহীহ গ্রন্থে, হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি নিদ্রিত ছিলাম দু'জন লোক উপস্থিত হলেন এবং আমার বাহু ধরে একটি পাহাড়ের নিকটে নিয়ে গেলেন, আমাকে বললো চড়ুন, আমি বললাম, একাজে আমার শক্তি নেই, তারা বললো আমরা সহজ করে দিব, আমি আরোহন করলাম, যখন পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছলাম তখন বজ্রধ্বনির মত শুনা গেল, আমি বললাম এটা কোন ধরণের আওয়াজ? তারা বললো, এটা জাহান্নামীদের আওয়াজ, অতঃপর আমাকে সম্মুখে নেয়া হল, আমি একদল লোককে দেখতে পেলাম, তাদেরকে উল্টো ঝুলিয়ে রাখা হল, তাদের ঠোঁটের কিনারায় ছিঁড়ে যাচ্ছে যেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা কারা? বললেন এরা যারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ইফতার করে।

হাদীস- ৩ : হযরত আবু ইয়ালা হাসান সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইসলামের খুঁটি এবং দ্বীনের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি যেগুলোর উপর ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তার একটি বর্জন করবে সে কাফির, তার রক্ত হালাল

কলেমা তৌহিদের স্বাক্ষ্য দেয়া, ফরজ নামায এবং রমজানের রোজা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে উক্ত তিনটির একটি অর্জন করবে, সে আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, তার ফরজ, নফল, কিছু কবুল হবেনা।

মাসআলা : পানাহার ও সঙ্গম করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয়ে যায় যদি রোজাদার হওয়াটা তার স্মরণ থাকে (ফিক্হার সব কিতাব দ্রষ্টব্য)

রোজাবস্থায় হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, সুরুট ইত্যাদি পান করার মাসআলা

মাসআলা : হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, সুরুট ইত্যাদি পান করলে রোজা ভঙ্গ হবে, যদিও নিজ ধারণা মতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধোয়া না পৌছে এবং পান, তামাক খেলেও রোজা ভঙ্গ হবে, যদিওবা থথুতে পিক ফেলে দেয়া হয় এগুলোর সুক্ষ অংশ সমূহ অবশ্যাই কণ্ঠনালীতে পৌছে যায়। চিনি গুড়া ইত্যাদি এমনসব জিনিষ যা মুখে রাখলে গলে যায়, মুখে রাখলো, থুথুতে বেরিয়ে গেল, রোজা ভঙ্গ হবে। অনুরূপ দাতের মাঝখানে চনাবুট পরিমান কোন জিনিষ বা অতিরিক্ত লেগে থাকলে এবং তা খেয়ে ফেললে, অথবা পরিমান কম ছিল, কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে নিল, অথবা দাঁতসমূহ থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালীর নীচে গেল রক্ত থুথুর চেয়ে বেশী বা সমান বা কম ছিল, কিন্তু তার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভুত হলো, উপরোক্ত সব অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে। আর যদি কম হয়ে থাকে স্বাদও অনুভুত হয়নি তাহলে, রোজা ভঙ্গ হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলা : রোজা অবস্থায় দাঁত উপড়িয়ে ফেললো, এবং রক্ত বের হয়ে কণ্ঠ নালীর নীচে গেল, যদিও বা নিদ্রা যাওয়ার সময় এমন হয়। রোজার কাযা দেয়া ওয়াজিব। (দুররুল মোখতাব)

মাসাআলা : কোন জিনিষ পায়খানা মলদ্বারের স্থানে রাখলো, তার অন্য অংশ যদি বাইরে থাকে রোজা ভঙ্গ হবে না, অন্যথায় ভঙ্গ হবে। আর তা যদি হয় এবং আদ্রতা মলদ্বারের অভ্যান্তরে পৌছালো, তাহলে সাধারণ নিয়মে রোজা ভঙ্গ হবে। মহিলাদের লজ্জাস্থানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম, লজ্জাস্থান বলতে যৌনদ্বার অন্তভূক্ত। অনুরূপ, সুতলীতে বুটি বেধে বের করেছে, সুতলীর অন্য অংশ বাইরে ছিল, তা দ্রুত বের করে নিবে যেন গলে না যায় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবেনা, আর যদি দ্বিতীয় অংশটিও অভ্যান্তরে ঢুকে যায় বা বুটির কিছু অংশ ভিতরে রয়ে গেল,. তখন রোজা ভঙ্গ হবে। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলা ঃ মহিলা প্রস্রাবের স্থানে তুলা বা কাপড় রাখলো তা মোটেই বাইরে ছিল না, রোজা ভঙ্গ হবে। শুকনো আঙ্গুল মলদ্বারে রাখলো বা মহিলা লজ্জাস্থানে রাখলো রোজা ভঙ্গ হবে না। আঙ্গুলি ভিজা হলে বা এতে কিছু লেগে থাকলে তখন তো রোজা ভঙ্গ হবে, তবে শর্ত হলো পায়খানার দ্বারে এমনস্থানে রাখলে যেখানে পায়খানা করার জন্য ডুস লাগানো হয়। (আলমগীরি দুররুল মোখতার)

মাসআলা ঃ এমন অধিকহারে শৌচকার্য করা হলো, যার ফলে মলদ্বারের অভ্যন্তরে পানি পৌছে গেল, রোজা ভঙ্গ হবে, এতে অতিরিক্ত শৌচকার্য না করা উচিৎ এতে জটিল রোগের আশঙ্কা দেখা দেয়। (দুররুল মোখতার)

মাসাআলা ঃ পুরুষ প্রস্রাবের ছিদ্রে পানি বা তেল প্রবেশ করাল, রোজা ভঙ্গ হবে না, যদিও বা মূত্রথলী পর্যন্ত পৌছে যায়, আর মহিলা যদি তদ্রূপ প্রবেশ করায় রোজা ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ নশ টানলো বা নাকের ছিদ্রে ঔষধ প্রবেশ করালো বা কানে তেল দিল বা তেল ভিতরে ঢুকে গেল রোজা ভঙ্গ হবে। কানে পানি ঢুকলো বা পানি দিল রোজা ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরি)

মাসাআলা ঃ কুল্লি করছিল অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে গেল, বা নাকে পানি দিচ্ছিল পানি মস্তিষ্কে গেল, রোজা ভঙ্গ হবে, কিন্তু যদি রোজা রাখার কথা ভুলে যায় ভঙ্গ হবেনা। যদিওবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমনি কোন ব্যক্তি রোজাদারের প্রতি কোন জিনিষ নিক্ষেপ করলো, তা যদি তার কণ্ঠনালীর নীচে চলে যায় রোজা ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ নিদ্রা অবস্থায় পানি পান করলো বা কোনকিছু খেয়েনিল, অথবা মুখ খোলা, পানির ফোটা বা বৃষ্টি কণ্ঠনালীর ভিতরে ঢুকলো, রোজা ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি, জাওয়াহেরা)

মাসআলা ঃ অন্যজনের থুথু গিলে নিল, বা নিজের থুথু হাতে নিয়ে গিলে নিল, রোজা ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ মুখে রঙ্গিন সুতা রাখলো ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেল, এবং সেই থুথু গিলে নিলে রোজা ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ সুতা গেঁথেছে তা ভিজায়ে নেয়ার জন্য মুখে দিল দুবার, তিনবার

অনুরূপ করলো, রোজা ভঙ্গ হবেনা, কিন্তু সুতো থেকে কিছু অদ্রতা পৃথক হয়ে যদি মুখে থাকে, এবং থুথু গিলে ফেললে রোজা ভঙ্গ হবে। (জাওহেরা)

মাসআলা ঃ চোখের অশ্রু মুখে পড়লো এবং তা গিলে নিল, যদি এককোটা দু'ফোটা হয় রোজা ভঙ্গ হবেনা, আর যদি অধিক হয় এবং লবনাক্ততা দেহে অনুভূত হয় তখন রোজা ভঙ্গ হবে। ঘামের হুকুমও অনুরূপ। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ পায়খানার রাস্তা বেরিয়ে এলো, তখন কাপড় দ্বারা রক্ত মুছে নিবে, যেন অদ্রতা বিন্দুমাত্র বাকী না থাকে আর কিছু পানি যদি অবশিষ্ট থাকে, দাঁড়ালে পানি ভিতরে ঢুকে যাবে। তখন রোজা ভঙ্গ হবে।এ কারণে ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, রোজাদার শৌচকার্য করার সময় যেন নিঃশ্বাস না টানে। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ স্ত্রীকে চুম্বন করলো বা স্পর্শ করলো অথবা সহবাস করলো, বা জড়িয়ে ধরলো এবং বীর্যপাত হলো, রোজা ভঙ্গ হবে। মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করলো, পুরুষের বীর্যপাত হলো, রোজা ভঙ্গ হবেনা, মহিলাকে কাপড়ের উপরিভাগ থেকে স্পর্শ করলো, কাপড় এত অধিক মোটা যে, শরীরের তাপ অনুভূত হয়নি, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিওবা বীর্যপাত হয়। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি করলো রোজাদার হওয়াটাও স্মরণ আছে তাহলে সাধারণ নিয়মে রোজা ভঙ্গ হল, আর যদি মুখভর্তি থেকে কম হয়, এবং অনিচ্ছাকৃত বমি হয় তাহলে মুখভর্তি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তা কণ্ঠ নালীর মধ্যে পৌছে গেল, বা নিজে স্বয়ং কণ্ঠনালীর ভিতর প্রবেশ করাল বা নিজে প্রবেশ করালনা, তাহলে মুখ ভর্তি না হলে রোজা ভঙ্গ হবেনা, যদিও ঢুকে পড়ে বা সে নিজে ঢুকাল। আর যদি মুখভর্তি হয় এবং নিজে কণ্ঠনালীর ভিতর ঢুকাল যদিও বা এর থেকে চনাবুট পরিমান কণ্ঠনালীর ভিতরে গেল, তখন রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে, অন্যথায় রোজা ভঙ্গ হবে না। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসআলা ঃ বমির উপরোক্ত হুকুম সেই সময় প্রয়োগ হবে যদি বমির দ্বারা খাবার বেরিয়ে আসে বা পিওরস কিংবা রক্ত আসে, আর যদি কফ আসে রোজা ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ রমজান শরীফে যে ব্যক্তি বিনা ওজরে প্রকাশ্যে পানাহার করে তাকে কতল করার নির্দেশ রয়েছে (রদ্দুল মোহতার)

ওসব অবস্থাদির বর্ণনা যেসব ক্ষেত্রে কেবল কাযা আবশ্যক

মাসাআলা ঃ এটা ধারণা ছিলো যে, সুব্হে সাদিক হয়নি পানাদার করলো বা সহবাস করলো, পরে জানতে পেরেছে যে, সুব্হি সাদিক হয়েছিল বা পানাহারে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ শররী বাধ্যবাধকতা পাওয়া গেল, যদিও বা নিজ হাতে খেয়ে থাকে তাহলে কেবল কাযা আবশ্যক হবে, অর্থাৎ এই রোজার পরিবর্তে একটি রোজা রাখতে হবে। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসআলা ঃ ভুলবশত: পানাহার করলো বা সংগম করলো বা দৃষ্টিপাত করার দরুন বীর্যপাত হলো, বা স্বপ্নদোষ হল বা বমি হলো, উপরোক্ত অবস্থায় ধারণা করলো যে রোজা ভঙ্গ হয়েছে তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ে নিল তাহলে কেবল কাযা দেয়া ফরজ। (দুররুল মোখতার)

মাসআলা ঃ কানে তেল দিল, বা পেট বা মস্তিষ্কের পাতলা চামড়া পর্যন্ত আহত ছিল, এতে ঔষধ দিল, ঔষধ পেটে বা মস্তিষ্কে পৌছে গেল, বা নশ টানলো, বা নাকে ঔষধ দিল, অথবা পাথর, কংকর, মাটি, তুলা, কাগজ, ঘাস ইত্যাদি এমন সব জিনিষ খেয়ে নিল যেগুলো লোকেরা ঘৃণা করে বা রমজান মাসে নিয়ত ছাড়া রোজা রাখলো, 'রোজার মতো রইল বা সকালে নিয়ত করেনি, দিবসে দ্বিপহরের পূর্বে নিয়ত করেছে নিয়তের পর খেয়ে নিল, বা রোজার নিয়ত ছিল, কিন্তু রমজানের রোজার নিয়ত ছিলনা, বা কণ্ঠনালীতে বৃষ্টির ফোটা প্রবেশ করলো, প্রথমেই ঢুকে পড়লো অধিক ঘাম বা অশ্রু গিলে ফেললো, বা অত্যন্ত ছোট মেয়ের সাথে সংগম করলো যে সংগমের যোগ্য ছিল না, বা মৃত অথবা প্রাণীর সাথে সংগম করলো, বা উরুতে বা পেটের উপর সংগম করলো অথবা চুম্বন দিল বা মহিলার ঠোঁট চুষলো, বা মহিলার শরীর স্পর্শ করলো, যদি কোন কাপড় অন্তরায় হয়, তারপরও দেহের তাপ অনুভূত হলো, উপরোক্ত অবস্থায় বীর্যপাতও ঘটলো বা হস্তমৈথুন দ্বারা বীর্য বের করলো, বা শ্লীলতাহানির দ্বারা বীর্যপাত হলো, বা রমজানের রোজা ছাড়া অন্য যে কোন রোজা ভঙ্গ করলো যদিও বা সেটা রমাজানের কাযা রোজাও হয়ে থাকে, বা নিদ্রিত মহিলার সাথে সংগম করা হলো, অথবা সুব্হে সাদিকের সময় সুস্থ ছিল এবং রোজার নিয়ত করেছিল, অতঃপর পাগল হয়ে গেল এবং এই অবস্থায় তার সাথে সংগম করা হলো অথবা এ ধারণা করলো যে, রাত তখনো বাকী আছে সেহেরী খেয়ে নিল, অথবা সুব্হে সাদিক হয়ে গিয়েছিল,

অথবা ধারণা করলো যে, সূর্য অস্ত গেছে ইফতার করে নিল অথচ সূর্য ডুবেনি, অথবা দুই ব্যক্তি স্বাক্ষ্য দিল যে, সূর্য অস্ত গেলো, আর দুজন স্বাক্ষ্য দিল এখনো দিন বাকী আছে, রোজাদার ইফতার করে নিল পরে জানলো যে, তখনও অস্ত যায়নি উপরোক্ত অবস্থায় কেবল কাযা আবশ্যক কাফফারা নহে (দুররুল মোখতার, অন্যান্য)

মাসআলা ঃ মুসাফির সফর শেষে মুকীম হলো হায়েজ নিফাজ বিশিষ্টা মহিলা পবিত্র হলো, পাগল সুস্থ হলো, রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য হল, কেউ কারো রোজা চাপসৃষ্টি করে ভাঙ্গালো, বা ভুলবশত পানি ইত্যাদি কোন বস্তু কণ্ঠনালীর ভিতর ঢুকে গেল, কাফির ছিল মুসলমান হলো, প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলো বালেগ হলো, রাত মনে করে সেহেরী খেয়েছিল, অথচ সুব্হে সাদিক হয়ে গেল, সূর্য অস্ত গেল মনে করে ইফতার করে নিল, অথচ দিন বাকী ছিল। উপরোক্ত সব অবস্থায় দিনের যে অংশটুকু বাকী থাকে সেটা রোজার মত অতিবাহিত করা ওয়াজিব। নাবালেগ যে বালেগ হলো, কাফির যে মুসলমান হলো ওদের উপর উক্ত দিনের রোজার কাযা ওয়াজিব নয় অন্য সকলের উপর কাযা ওয়াজিব। (দুররুল মোখতার)

মাসাআলা ঃ নাবালেগ দিনে বালেগ হলো, বা কাফির দিনে মুসলমান হলো, আর ওটা সময় এমন ছিলো, যে সময়ে রোজার নিয়ত করা যায় এবং নিয়তও করে নিল অতঃপর রোজা ভঙ্গ করে দিল, তাইলে ওই দিনের কাযা ওয়াজিব নহে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলা ঃ শিশুর বয়স যখন দশ বৎসর হয় রোজা রাখার সামর্থও যদি থাকে ওর দ্বারা যেন রোজা রাখানো হয় আর রাখতে না চাহলে প্রহার করবে আর যদি পূর্ণ সামর্থ দেখা যায় এবং রাখার পর ভেঙ্গে ফেললো তখন কাযা করার হুকুম দিবে না, নামায ভঙ্গ করলে পনুরায় পড়ার নির্দেশ দিবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলা ঃ হায়েজ ও নিফাস সম্পন্না মহিলা সুব্হে সাদিকের পর পবিত্র হলো, যদি দ্বিপ্রহরের পূর্বে আরো রোজার নিয়ত করলো, তাহলে সেদিনকার রোজা হবেনা; ফরজ ও হবেনা নফলও হবেনা, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির নিয়ত করলো বা পাগল ছিলো সুস্থ হওয়ার পর নিয়ত করলো ওদের সকলের রোজা হবে, (দুররুল মোখতার)

মাসাআলা ঃ সুব্হে সাদিকের পূর্বে ভুলবশত সংগমে লিপ্ত ছিল. সকাল হওয়া মাত্র স্মরণ হলে দ্রুত পৃথক হয়ে গেল, তাহলে কোন কাযা দিতে হবে না, আর যদি ওই

অবস্থায় বহাল থাকে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলা ঃ মৃত ব্যক্তির রোজা কাযা হয়ে গেল, ওর ওলিকে ওর পক্ষ থেকে ফিদয়া আদায় করতে হবে। যদি মৃত ব্যক্তি এ ব্যপারে অসীয়ত করে যায় এবং মাল সম্পদও রেখে যায়। অন্যথায় ওলির উপর ফিদয়া দেয়া জরুরী নহে, তবে করলে তা হবে উত্তম।

রোযা ভঙ্গের সেসব অবস্থাদির বর্ননা যে সব অবস্থায় কাফফারা ও আবশ্যক

মাসআলা ঃ রমজানে শরীয়তের পক্ষ থেকে অদিষ্ট রোজাদার মুকীম ব্যক্তি রমজানের রোযা আদায়ের নিয়তে রোযা রাখল, কোন ব্যক্তির সাথে কামভাবে সম্মুখ বা পশ্চাৎ দিক দিয়ে সঙ্গম করল, বীর্যপাত হোক বা না হোক বা রোজাদারের সাথে সঙ্গম করল, অথবা কোন খাদ্য বা ঔষধ খেয়েনিল বা পানি পান করল বা কোন বস্তুর স্বাদ উপভোগের জন্য ভক্ষণ করল, বা এমন কোন কাজ করল যদ্বারা রোজা ভঙ্গ ধারণা করা হয়না, সে ধারণা করে নিল যে, রোজা ভেঙ্গে গেছে, অতঃপর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে নিল, যেমন সিঙ্গা লাগাল, বা সুরমা লাগালো, বা কোন প্রাণীর সঙ্গে সঙ্গম করল, বা স্ত্রীকে স্পর্শ করল বা চুম্বন করল বা একসঙ্গে শয়ন করল, বা অশ্লীলভাবে সঙ্গম করল কিন্তু উপরোক্ত অবস্থায় বীর্যপাত হয়নি, বা পায়খানার রাস্তায় শুকনা আঙ্গুলী রাখল, ওসব কার্যাদির পর ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ে নিল উপরোক্ত সব অবস্থায় রোজার কাযা এবং কাফফারা উভয়টি আবশ্যক। আর যদি উপরোক্ত অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হওয়ার ধারণা ছিলনা, সে ধারণা করে নিল এবং কোন মুফতি সাহেব ফতোয়া দিল যে, রোজা ভঙ্গ হয়ে গেছে। মুফতি যদি এমন হয় যে, শহরবাসী ওর উপর আস্থাশীল, তার ফতোয়ার কারনে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ে নিল, বা সে কোন হাদীস শুনেছে, যে হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝেনি। ভুল অর্থের ভিত্তিতে বুঝে নিল যে, রোজা ভেঙ্গে গেছে এবং ইচ্ছাকৃত খেয়ে নিল, তখন কাফফারা আবশ্যক হবেনা যদিও মুফতি ভুল ফতোয়া দিয়েছে বা যে হাদীস সে শুনেছে তা যদি প্রমানিত না হয়, (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসাআলা ঃ যে স্থানে রোজা ভঙ্গের কারনে কাফফারা আবশ্যক হয় সেক্ষেত্রে শর্ত হলো যে, রাত্রি হতেই রমজানের রোজার নিয়ত করা, যদি দিনের বেলায়

নিয়ত করে তার রোজা ভেঙ্গে ফেলে তখন কাফফারা আবশ্যক নয়, (জাওহেরা)

মাসআলা ঃ মুসাফির সকালের পর দ্বিপ্রহরের পূর্বে দেশে ফিরলো এবং রোজার নিয়ত করে নিলো, অতঃপর ভেঙ্গে ফেলল, অথবা এমন সময় পাগলের সংজ্ঞা ফিরে এলো, রোজার নিয়ত করে পুনরায় ভেঙ্গে ফেললো, তখন কাফফারা আবশ্যক হবে। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ কাফফারা আবশ্যক হওয়ার জন্য এটাও জরুরী যে, ভঙ্গ হওয়ার পর এমন কোন কাজ প্রকাশ না পাওয়া বা রোজা পরিপন্থি বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ পাওয়া না যাওয়া, যার কারনে রোজা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে। যেমন মহিলার ঐদিনই হায়েজ বা নিফাস হলো, বা রোজা ভঙ্গ হওয়ার পর ঐদিনই এমন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো যদ্বারা রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তখন কাফফারা রহিত হবে, কিন্তু মুসাফির হলে রহিত হবেনা, যেহেতু এটা ইচ্ছাধীন কাজ ছিল, অনুরূপ যদি নিজকে নিজে আহত করে নিল ফলে অবস্থা এমন হলো যে, রোজা রাখতে পারছেনা তাহলে কাফফারা বাদ যাবেনা। (জাওহেরা) এমন কাজ করলো যদ্বারা কাফফারা ওয়াজিব, অতঃপর যদি সফরে বাধ্য করে কাফফারা বাদ যাবে না। (আলমগীরি)

মাসাআলা ঃ পুরুষকে বাধ্য করে সঙ্গম করালো, বা পুরুষ মহিলাকে বাধ্য করলো অতঃপর সঙ্গমকালে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে লিপ্ত রইলে তখন কাফফারা আবশ্যক নহে, যেহেতু রোজা তো প্রথমেই ভেঙ্গে গেছে (জাওহেরা) বাধ্য করা বলতে শরয়ী বাধ্যবাধকতা যেমন হত্যা করা, অঙ্গ কর্তন করা, বা অধিক প্রহার করার সঠিক অর্থে হুমকী দেয়া হয় এবং রোজাদার ও মনে করলো যে, আমি যদি ওর কথা না মানি তাহলে তিনি যা বলেছেন তাই করবে।

মাসআলা ঃ কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য পেটভর্তি খাওয়া জরুরী নহে, অল্প খাবার খেলেও ওয়াজিব হয়ে যাবে, (জাওহেরা)

মাসাআলা ঃ তৈল লাগানো, বা গীবত করলো, ধারণা করলো যে এতে রোজা ভেঙ্গে গেছে বা কোন আলেম রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার ফতোয়া দিল ফতোয়ার কারনে সে পানাহার করে নিল, তখনও কাফফারা আবশ্যক হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসাআলা ঃ বমি আসলো বা ভুলবশত : খেয়ে নিল, বা সঙ্গম করলো ওসব অবস্থায় তার জানাছিল যে, রোজা ভঙ্গ হয়নি, তার পরও খেয়ে নিল, কাফফারা

আবশ্যক হবেনা, যদি স্বপ্নদোষ হয় এবং ওর জানা ছিল যে, রোজা ভঙ্গ হয়নি, তার পরও খেয়ে নিল, তখন কাফফারা আবশ্যক হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসাআলা ঃ লালা থুক করে চেটে নিল, বা অন্য কারো থুথু গিলে ফেললো, তখন কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু প্রিয়জনের স্বাদ ও দ্বীনী বরকতের জন্য থুথু গিলে ফেললো, তখন কাফফারা জরুরী হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলা ঃ যেসব অবস্থায় রোজা ভঙ্গের দরুন কাফফারা আবশ্যক হয় না, সেক্ষেত্রে শর্ত হলো এ রকম যদি তখন হয়ে থাকে, এবং গুনাহর ইচ্ছা ছিল না, অন্যথায় কাফ্ফারা দিতে হবে, (দুররুল মোখতার)

মাসাআলা ঃ কাঁচা মাংস ভক্ষণ করলো, যদি মৃতের হয় কাফফারা আবশ্যক হবে। কিন্তু যদি দুর্গন্ধ যুক্ত হয় বা এতে পিপড়া পড়েছে তখন কাফফারা আবশ্যক হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসাআলা ঃ মাটি ভক্ষণ করলে, কাফফারা ওয়াজিব নহে, কিন্তু গুল বা এমন মাটি যা খেতে সে অভ্যস্থ, এমন মাটি খেলে কাফফারা ওয়াজিব, লবন যদি অল্প খায় কাফফারা ওয়াজিব হবে, অধিক খেলে কাফফারা ওয়াজিব নয়। (জাওহেরো আলমগীরি)

মাসআলাঃ নাপাক শুরবায় রুটি ভিজায়ে খেয়ে নিল, বা কারো কোন জিনিষ ডাকাতি করে খেল, তখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। থুথুতে রক্ত ছিল, যদিও রক্ত অধিক হয়, গিলে ফেললো, বা রক্ত পান করে নিল, তখন কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (জাওহেরো)

মাসআলাঃ কাঁচা অপরিপক্ক পোস্তা বা খাঁচ আখরোট বা শুকনো বাদাম গিলে ফেললো বা চিল্‌কা সহ ডিম বা চিল্‌কা সহ আনার খেয়ে নিল, তাহলে কাফ্ফারা নেই, আর শুকনো পোস্তা বা শুকনো বাদাম যদি চিবিয়ে খায় এতে যদি মাজাও থাকে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, পূর্ণটাই গিলে ফেললে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়, যদিও ফেটে যায়, ভিজা বাদাম সম্পূর্ণ গিলে ফেললেও কাফ্ফারা আবশ্যক। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ চনার খোসা খেয়েছে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, বৃক্ষের পাতারও অনুরূপ হুকুম। যদি খেয়ে ফেলা হয়, অন্যথায় নয়।

মাসআলাঃ খরবুজা বা তরমুজের খোসা খেয়ে নিল যদি শুকনো হয় অথবা যদি এমন হয় যে, যা খেতে লোকেরা ঘৃণা করে তখন কাফ্ফারা আবশ্যক নয়, অন্যথায় আবশ্যক, কাঁচা চাউল, বাজরা, মত্তর, ডাল খেয়ে নিল কাফ্ফারা নেই। এ হুকুম কাঁচা যবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভুনা হলে তখন কাফ্ফারা আবশ্যক। (আলমগীরি)

মাসআলা ঃ তিল বা তিল বরাবর কোন খাবারের জিনিষ বাহির থেকে মুখে দিয়ে চর্বন করা ব্যতীত গিলে ফেললো, রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ অন্যজন গ্রাস চর্বন করে দিল, সে খেয়ে নিল সে নিজে মুখ থেকে বের করে খেয়ে নিল, কাফ্ফারা আবশ্যক নয় (আলমগীরি)। তবে শর্তহলো তার চর্বন করা খাদ্যকে যেন স্বাদ তাবাররুক মনে করা না হয়।

মাসআলাঃ সেহেরীর গ্রাস মুখে ছিল, সকাল উদিত হল, বা ভুলবশতঃ খেতেছিল, গ্রাস মুখে ছিল স্মরণ হলো এবং গিলে ফেললো, উভয় অবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি মুখ থেকে বের করে পুনরায় ভক্ষণ করলো, তখন কেবল কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব নহে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্ত্রীলোক নাবালেগ বা পাগলের দ্বারা সঙ্গম করালো বা পুরুষকে সঙ্গমে বাধ্য করলো, তখন স্ত্রীলোকের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পুরুষের উপর নয়। (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ মেশ্‌ক, জাফরান, কাপুর, সিরকা খেয়ে নিল, বা খরবুজা, তরমুজ, কাকড়ি, ক্ষিরা, তরমুজের পানি পান করলো, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রমজানে রোজাদারকে হত্যার জন্য হাজির করা হল, সে পানি চাইল, কেউ তাকে পানি পান করাল, তারপর তাকে ছেড়ে দেয়া হল তখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পালা বন্টনের দিবসে জ্বর এসে থাকে, আজকে হলো পালার দিন, সে ধারণা করেছে যে, জ্বর আসবে রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে দিল, এমতাবস্থায় কাফ্ফারা রাদ যাবে, অনুরূপ স্ত্রীলোকের নির্ধারিত তারিখে ঋতুস্রাব হয় আজকে ঋতুস্রাবের

দিবস, সে ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভেঙ্গে ফেললো, ঋতস্রাব হল না, কাফ্ফারা বাদ যাবে। অনুরূপ যদি সে নিশ্চিত ছিল যে, আজ শত্রুর সাথে মুকাবিলার দিন, রোজা ভেঙ্গে ফেললো, মুকাবিলা হল না, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ রোজা ভঙ্গের কাফ্ফারা হলো, সম্ভব হলে একজন ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস আজাদ করবে, এটা করতে না পারলে যেমন ওর কাছে ক্রীতদাস/দাসী নেই, বা ক্রয় করার মতো সম্পদও নেই বা সম্পদ আছে, কিন্তু দাস/দাসী সহজ লভ্য নহে, যেমন বর্তমানে ভারতবর্ষে বিরতিহীনভাবে ষাটটি রোজা রাখা হয় এটাও করতে না পারলে ষাটজন মিসকীনকে পেট ভরে দু'বেলা খাবার খাওয়াবে। রোজা আদায়ের পর্যায়ে যদি মাঝখানে একদিনও বাদ যায় তখন পুনরায় ষাটটি রোজা রাখতে হবে। পূর্বের রোজা হিসেবে গণ্য হবে না। যদিও উনষাটটি রাখা হয় যদিও অসুস্থতা ইত্যাদি কোন ওজরের কারণে ছেড়ে দেয়া হয়, কিন্তু মহিলার যদি ঋতুস্রব হয় তাহলে ঋতুস্রাবের কারণে যতটা বাদ পড়েছে, সেটা গণ্য হবে না। পূর্বের রোজা এবং ঋতুস্রাবের পরের রোজা উভয়টি মিলায়ে একত্রে ষাটটি হলে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। (বিভিন্ন কিতাব দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ যদি দু'টি রোজা ভঙ্গ করা হয় দু'টির জন্য দু'টি কাফ্ফারা দিবে, যদিও প্রথমটির কাফ্ফারা এখনো আদায় করা হয়নি (রদ্দুল মোহতার)। অর্থাৎ দু'টি যদি দুই রমজানের হয় আর উভয়টি যদি একই রমজানের হয় প্রথমটির কাফ্ফারা যদি আদায় করা না হয় তাহলে একটি কাফ্ফারা উভয়টির জন্য যথেষ্ট (জাওহেরা)। কাফ্ফারা সম্পর্কিত অন্যান্য আনুসাঙ্গিক আলোচনা তালাক পর্ব জিহার অধ্যায়ে ইন্‌শাআল্লাহ্ জানতে পারবে।

মাসআলাঃ স্বাধীন, ক্রীতদাস, পুরুষ, মহিলা, ধনী, দরিদ্র সকলের উপর রোজা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এমনকি ক্রীতদাসীর জানা ছিল যে, সকাল হয়েছে সে তার মুনীবকে সংবাদ দিল, এখনো সকাল হয়নি, সে ওর সাথে সঙ্গম করলো, তাহলে ক্রীতদাসীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। মুনীবের উপর কেবল কাযা দিতে হবে, কাফ্ফারা নহে। (রদ্দুল মোহতার)

রোজার মাকরূহ সমূহের বর্ণনা

হাদীস– (১-২) ঃ বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি

ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে মন্দ কথা বলা এবং এর উপর আমল করা পরিত্যাগ না করবে, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপ হাদীস তিবরানী হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস– (৩-৪) ঃ ইবনে মাযাহ, নাসঈ, ইবনে খোজায়মা, হাকেম, বায়হাকী, দারেমী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, অনেক রোজাদার আছে যাদের রোজা পিপাসা ছাড়া কিছুই নহে, অনেক বিনিদ্র রাত জাগরণকারী এমন আছেন তাদের জাগ্রত থাকা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না। অনুরূপ হাদীস তিবরানী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

হাদীস (৫-৬) ঃ বায়হাকী শরীফে আবু উবায়দা তিবরানী শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, রোজা একটি সেতু যদি তার মধ্যে ফাটল না হয়, জিজ্ঞেস করা হলো কিসে ফাটল হয়? এরশাদ করলেন, মিথ্যা এবং গীবত দ্বারা।

হাদীস – (৭) ঃ ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান, হাকেম (রাঃ) প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। হুজুর করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন। পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোজা নহে, রোজা হচ্ছে অযথা ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা।

হাদীস– (৮) ঃ আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট রোজাদারের সঙ্গম করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর অন্য একজন উপস্থিত হয়ে অনুরূপ জিজ্ঞেস করলেন, তাকে নিষেধ করেছেন, যাকে অনুমতি দিয়েছেন, তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, যাকে নিষেধ করেছেন তিনি ছিলেন যুবক।

হাদীস (৯) ঃ আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আমের বিন রবীআ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অসংখ্যবার নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে রোজাবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি।

মাসআলাঃ মিথ্যাচার, গীবত, চুগলখুরী, গালি দেয়া, বেহুদা কথা বলা, কাউকে কষ্ট দেয়া, এসব কাজ তো এমনিতেই নাজায়েয ও হারাম। রোজাতে আরো অধিক হারাম। ওসবের দ্বারা রোজাও মাকরূহ হয়।

মাসআলাঃ রোজাদারের বিনা ওজরে কোন জিনিসের স্বাদ দেখা, চিবানো মাকরূহ স্বাদ দেখার ওজর হলো যেমন স্বামী বা মুনীব বদ মেজাজী। লবন বেশ কম হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। এজন্য স্বাদ দেখলে কোন ক্ষতি নেই।

চিবানোর ওজর হচ্ছে, যেমন ছোট শিশু যে রুটি খেতে পারে না এবং ওকে খাওয়ানোর জন্য কোন নরম জাতীয় খাদ্যও নেই এমন কোন রোজাদারও নেই যে রুটিটা চিবায়ে দিবে এমতাবস্থায় শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরূহ হবে না। (দুররুল মোখতার ও অন্যান্য)

স্বাদ দেখার অর্থ যা আজকাল প্রচলিত তা নয় স্বাদ বুঝার নামে কোন কিছু খেয়ে নেয়া এরকম স্বাদ দেখলে রোজা শুধু মাকরূহ হবে তা নয় বরং রোজা ভঙ্গ হবে। এক্ষেত্রে কাফ্ফারার শর্তসমূহ পাওয়া গেলে কাফ্ফারাও আবশ্যক হবে। প্রকৃতপক্ষে স্বাদ দেখা অর্থ হচ্ছে, মুখে রেখে স্বাদ অনুভব করা, পরে থুথু ফেলে দেয়া যাতে কণ্ঠনালীর ভিতরে ওখান থেকে কিছু প্রবেশ করতে না পারে।

মাসআলাঃ এমন কোন জিনিষ ক্রয় করলো যার স্বাদ দেখা প্রয়োজন, স্বাদ না দেখলে ক্ষতি হতে পারে। তাহলে স্বাদ দেখতে ক্ষতি নেই অন্যথায় মাকরূহ। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ বিনা ওজরে স্বাদ নেয়া যা মাকরূহ বলা হয়েছে, এটা ফরজ রোজার হুকুম, নফল রোজার ক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না। যদি ওর প্রয়োজন হয়। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মহিলাকে চুম্বন করা, গলায় জড়ায়ে ধরা, শরীর স্পর্শ করা মাকরূহ, যদি বীর্যপাত হওয়ার আশংকা থাকে বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার ভয় হয় ঠোঁট এবং মুখে চুম্বণ করাটা মাকরূহ। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ গোলাপ বা মেশ্‌ক ইত্যাদির ঘ্রাণ লওয়া দাড়ি গোঁফে তৈল লাগানো, সুরমা লাগানো মাকরূহ নহে। কিন্তু যদি রূপ চর্চার জন্য যদি সুরমা লাগানো হয় তৈল এজন্য লাগানো হয় যে, যেন দাড়ি বেড়ে যায় অথচ দাড়ি এক মুষ্টি বরাবর আছে, এ দু'টি কাজ রোজা ছাড়াও মাকরূহ হবে। রোজাতে এ কাজ করলে আরো অধিক মাকরূহ হবে। (দুররুল মোখতার)

মাআলাঃ রোজাতে মিসওয়াক করা মাকরূহ নহে। বরং অন্যদিনে যেরূপ সুন্নত

রোজাতেও সুন্নাত মিসওয়াক শুকনো হোক বা আদ্র হোক. যদিও পানি দ্বারা ভিজা হয় দ্বিপ্রহরের পূর্বে করা হোক বা পরে মাকরূহ হবে না। (বিভিন্ন কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, রোজাদারের জন্য দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরূহ এটা আমাদের মযহাবের বিপরীত।

মাসআলাঃ রগ থেকে রক্ত বের করা শিংগা লাগানো মাকরূহ নহে। যদি দুর্বল হওয়ার ভয় হলে মাকরূহ। ওর উচিৎ হবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেরী করা। (আলমগীরি)

রোজাদারের কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত করা মাকরূহ, কুল্লির মধ্যে অতিরিক্ত করার অর্থ হচ্ছে, মুখ ভর্তি পানি নেয়া, ওজু ও গোসল করা ব্যতীত ঠান্ডা পৌছানোর উদ্দেশ্যে কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া বা ঠান্ডার জন্য গোসল করা বরং শরীরে ভিজা কাপড় জড়ানো মাকরুহ নহে। তবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য শরীরে ভিজা কাপড় জড়ানো মাকরূহ, ইবাদতে মনক্ষুণ্ন করা ভাল কাজ নয়। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ পানির ভিতরে বায়ু নির্গত করলে রোজা ভঙ্গ হবে, তবে মকারূহ হবে। রোজাদারের এস্তিঞ্জাতে অতিরিক্ত করা মাকরূহ (আলমগীরি) অর্থাৎ অন্যদিন সমূহে এ বিধান রয়েছে যে, এস্তেঞ্জা করার সময় যেন নীচের দিকে জোর দেয়া হয়, রোজাতে এরূপ করা মাকরূহ।

মাসআলাঃ মুখে থুথু একত্র করে গিলে ফেলা, রোজা ছাড়াও অপছন্দনীয় কাজ। রোজাতে এরূপ করা মাকরূহ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রোজার দিনে এমন কাজ করা জায়েয নেই, যদ্বারা এমন দুর্বলতা আসবে যে, রোজা ভেঙ্গে ফেলার ধারণা প্রবল হবে, বিধায় উচিৎ হবে, দুপুর পর্যন্ত রুটি পাকাবে, অতঃপর দিনে অবশিষ্টাংশে বিশ্রাম করবে (দুররুল মোখতার) এই হুকুম কৃষক শ্রমিক ও পরিশ্রমের কাজ সম্পাদনকারীদের জন্য, অধিক দুর্বলতার ভয় হলে কাজ কম করবে, যেন রোজা আদায় করা যায়।

মাসআলাঃ যদি রোজা রাখা হয় দুর্বল হয়ে পড়বে দাড়িয়ে নামাজ পড়তে পারবে না, তখন হুকুম হলো রোজা রাখলে নামাজ বসে পড়বে (দুররুল মোখতার) দাড়িয়ে নামায পড়তে যদি একটুক অক্ষম হয়ে পড়ে যা রুগ্ন ব্যক্তি নামাজের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলাঃ সেহেরী খাওয়া সুন্নাত এতে দেরী করা মুস্তাহাব। কিন্তু এতটুকু দেরী করা মাকরূহ। কিন্তু সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হওয়ার মত বিলম্ব করা মাকরূহ। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব কিন্তু ইফতার এমন সময়ে করবে, যেন সূর্যাস্ত সম্পর্কে প্রবল ধারণা করা যায়, যতক্ষণ ধারণা প্রবল না হবে ইফতার করবে না। যদিও মুয়াজ্জিন আজান দিয়ে দেয়। মেঘলা দিনে ইফতার তাড়াতাড়ি করা অনুচিৎ। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ একজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির কথানুযায়ী ইফতার করা যায়। যদি ওর কথা সত্য মনে হয়, যদি তা সত্য মনে না হয়, তাহলে ওর কথা মতে ইফতার করবে না। অনুরূপ অজ্ঞান ব্যক্তির কথায়ও ইফতার করবে না। বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে ইফতারের সময় সাইরেন দেয়ার প্রথা চালু আছে এর ভিত্তিতে ইফতার করা যাবে। যদি সাইরেন পরিচালনাকারী ফাসিক না হয়। যদি কোন বিজ্ঞ আলেম পরহেজগার নক্ষত্র জ্ঞানবিশারদ আলেমের নির্দেশে দেয়া হয় আজকাল সাধারণ আলেমগণ এ বিষয়ে অজ্ঞ। পঞ্জিকায়ও অধিকাংশ ভুল হয়ে থাকে, এর উপর আমল করা নাজায়েয। অনুরূপ সেহেরীর সময় অনেকস্থানে তোপ বাজানো হয় শর্তের ভিত্তিতে তার উপর নির্ভর করা যায় যদিও চালনাকারী যেই হোক না কেন।

মাসআলাঃ সেহেরীর সময় মোরগের আজানের উপর নির্ভর করা যাবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সুবহে সাদিকের অনেক পূর্বে আজান শুরু করে দেয় বরং শীতকালে অনেক মোরগ দুইটার সময় আজান শুরু করে দেয় অথচ এমন সময় সুবহে সাদিক হওয়ার অনেক সময় বাকী থাকে, এভাবে কথা বার্তা শুনে এবং আলো দেখে আজান বলে থাকে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ সুবহে সাদিককে সাধারণতঃ রাতের ষষ্টাংশ বা সপ্তমাংশ মনে করা ভুল। সুবহে সাদিক কখন থেকে শুরু হয় তা আমরা ৩য় খণ্ড নামাজের সময় সমূহের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি, ওখান থেকে জেনে নিনঃ

সেহ্‌রী ও ইফ্‌তারের বর্ণনা

হাদীস- (১) ঃ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, সেহ্‌রী খাও, সেহ্‌রী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে।

হাদীস- (২) ঃ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ইবনে খোজায়মা প্রমুখ হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আমাদের এবং আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)দের রোজার মধ্যে পার্থক্য হল সেহ্‌রী খাওয়া।

হাদীস- (৩) ঃ তিরমিযী, কবিরে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিষে বরকত রয়েছে, জামাত, সরীদ, (এক জাতীয় খাদ্য) এবং সেহ্‌রীতে।

হাদীস- (৪) ঃ তিবরানী আওসাতে এবং ইবনে হাব্বান সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আল্লাহ এবং ফেরেশ্‌তারা সেহ্‌রী ভক্ষণকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

হাদীস- (৫) ঃ ইবনে মাযাহ, ইবনে খোজায়মা, বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, সেহ্‌রী খেয়ে দিনের রোজাকে সাহায্য করো, কায়লুলা বা (জোহরের পর বিশ্রাম করে) রাত জাগরণে সাহায্য করো।

হাদীস- (৬) ঃ নাসাঈ শরীফে হাসন সূত্রে এক ছাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হলাম, হুজুর সেহ্‌রী খেতেছিলেন, এরশাদ করলেন, এটা বরকত, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তোমরা তা ছাড়বে না।

হাদীস- (৭) ঃ তিবরানী, কবীরে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির খাবারে ইন্‌শাআল্লাহ তাআলা হিসাব হবে না। রোজাদার যদি হালাল ভক্ষণ করেন, সেহ্‌রী ভক্ষণকারী এবং সীমান্তে ঘোড়া আবদ্ধকারী।

হাদীস- (৮-১০) ঃ ইমাম আহমদ, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, সেহ্‌রীর সম্পূর্ণটাই বরকত, তা পরিত্যাগ করবে না, যদিও এক অঞ্জলী পানি হয়, তা পান করো, কেননা সেহ্‌রী ভক্ষণকারীর উপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তারা রহমত বর্ষণ করেন, অনুরূপ আবদুল্লাহ বিন আমর সায়িব বিন ইয়াযিদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও একই প্রকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস- (১১) ঃ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী শরীফে হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন মানুষ সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে যতদিন তারা ইফতার শীঘ্র শীঘ্র করবে।

হাদীস- (১২) ঃ ইবনে হাব্বান সহীহ কিতাবে হযরত সাহ্‌ল বিন সাদ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, আমার উম্মত আমার সুন্নতের উপর থাকবে। যতক্ষণ তারা ইফতারের সময় নক্ষত্রসমূহের অপেক্ষা না করবে।

হাদীস- (১৩) ঃ আহমদ তিরমিযী, ইবনে খোজায়মা ও ইবনে হাব্বান প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার অধিক প্রিয় সেই বান্দা যিনি শীঘ্র ইফতার করে।

হাদীস- (১৪) ঃ তিবরানী আওসাতে ইয়ালা বিন মাররা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনটি জিনিষ আল্লাহ্ ভালবাসেন, শীঘ্র ইফতার করা, দেরীতে সেহ্‌রী খাওয়া, নামাজে হাতের উপর হাত রাখা।

হাদীস- (১৫) ঃ আবু দাউদ ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, এই দ্বীন সর্বদা জয়যুক্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করবে, কেননা ইহুদী ও নাসারাগণ দেরীতে ইফতার করে

হাদীস- (১৬) ঃ ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, দারেমী সালমান বিন আমের দব্বী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোন রোজাদার ইফতার করে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে, কেননা এতে বরকত আছে, আর যদি খেজুর পাওয়া না যায়, তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে। কেননা পানি পবিত্রকারী।

হাদীসের আলোকে ইফ্‌তারের দোয়া

হাদীস- (১৭) ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা নামাজের পূর্বেই কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন, যদি তাজা খেজুর পাওয়া না যেত তবে কয়েকটি শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন, আর যদি শুকনা খেজুরও পাওয়া না যেত কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।

ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইফতারের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণঃ 'আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়ালা রিযকিকা আফতারতু' অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমারই জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।

হাদীস- (১৮) ঃ নাসাঈ, ইবনে খোজায়মা হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহনী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে অথবা কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সামগ্রী ঠিক করে দেবে তার জন্যও অনুরূপ সওয়াব রয়েছে।

হাদীস- (১৯) ঃ তিবরানী কবীরে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য বা পানি দিয়ে রোজাদারকে ইফতার করাবে, ফেরেশ্‌তারা রমজান মাসের সময়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, জিব্রাঈল (আঃ) শবে কদরে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অপর এক বর্ণনায় আছে, যে হালাল উপার্জন দিয়ে রোজাদারকে ইফতার করাবে রমজানের সকল রাত্র সমূহে ফেরেশ্‌তারা তার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, শবে কদরে জিব্রাইল (আঃ) তার সাথে করমর্দন করেন, অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে রোজাদারকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাআলা তাকে আমার হাউজে কাউসার হতে পানি পান করাবে।

যেসব অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে

হাদীস- (১) ঃ বোখারী, মুসলিম শরীফে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে বেশী বেশী রোজা রাখত, আমি কি সফরে থাকাকালে রোজা রাখব? তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, যদি চাও তবে রোজা রাখতে পার, আর যদি চাও রোজা নাও রাখতে পার।

হাদীস- (২) ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রমজানের ষোল তারিখ অন্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে জিহাদে লিপ্ত ছিলাম, আমাদের মধ্যে কেহ্ রোজা রেখেছিল আর কেহ্ কেহ্ রোজা রাখেনি, কিন্তু রোজাদার বেরোজাদারের উপর এবং বে রোজাদার রোজাদারের উপর কোন দোষারোপ করেনি।

হাদীস- (৩) ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ শরীফে, হযরত আনাস ইবনে মালেক কাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা মুসাফির হতে অর্ধেক নামায এবং মুসাফির স্তন্যদায়িনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে রোজা মাফ করে দিয়েছেন, (তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে সে সময় রাখবে না, পরবর্তীতে সে সংখ্যা পূর্ণ করে দিবে)

মাসআলাঃ সফর, গর্ভাবস্থায়, শিশুকে দুগ্ধ পান, রোগাক্রান্ত অবস্থায় বাধ্যক্যজনিত ভয় শরয়ী বাধ্যবাধকতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, জিহাদ এসব হচ্ছে রোজা না রাখার ওজর। এসব বিষয়ের কারণে কেউ যদি রোজা না রাখে গুনাহগার হবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ সফর বলতে শরয়ী সফর বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ এতটুকু দূরত্বে গমনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া যে স্থানের দূরত্ব তিন দিনের পথ, যদিও বা সফর কোন নাজায়েয কাজের জন্য হয়ে থাকে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ দিনের বেলা সফর করলো, তাহলে সেই দিনের রোজা ভঙ্গ করার জন্য আজকের সফর ওজর বা অজুহাত নয়। অবশ্য যদি রোজা ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না কিন্তু গুনাহগার হবে। আর যদি সফর করার আগে ভঙ্গ করে তাহলে কাফ্ফারাও আবশ্যক হবে, দিনে সফর করলো. নিজ স্থানে বা ঘরে কোন জিনিষ ভুল বশতঃ ফেলে গেলে ওটা নেয়ার জন্য ফিরে আসলো এবং ঘরে এসে রোজা ভঙ্গ করে ফেললো, তখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুসাফির শরয়ী অর্ধ দিবসের পূর্বে ফিরে আসলো তখনও কিছু খায়নি, তাহলে রোজার নিয়ত করে নেয়া ওয়াজিব। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ যদি গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী মহিলার নিজের প্রাণের বা শিশুর বাস্তব আশংকা হয় তাহলে সেসময় রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সেই দগ্ধদান

কারিনী মহিলা শিশুর মা হোক বা ধাত্রী হোক। যদিও বা রমজান মাসে দুধ পান করানোর চাকুরী নিয়ে থাকে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়া বা বিলম্বে আরোগ্য লাভ করা, বা সুস্থ ব্যক্তি রোগাগ্রস্থ হওয়ার প্রবল ধারণা হলে, বা সেবক সেবিকার ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হলে তাহলে ওদের সকলের জন্য সেদিনের রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। (জাওহেরা, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ উপরোক্ত অবস্থাসমূহে প্রবল দৃঢ় ধারণার প্রয়োজন, কল্পনা যথেষ্ট নয়, প্রবল ধারণার তিনটি ধরন রয়েছে হয়তো বাহ্যিক লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে অথবা ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে বা এমন কোন বিজ্ঞ ডাক্তার বলেছেন যিনি ফাসিক নন, যদি বাহ্যিক কোন লক্ষণ পাওয়া না যায় বা অভিজ্ঞতাও না থাকে, বা ডাক্তারও কিছু বলেননি, তাহলে রোজা ভঙ্গ করা জায়েয নহে। বরং নিচক ধারণা বা কাফির অথবা ফাসিক চিকিৎসকের কথানুযায়ী রোজা ভেঙ্গে ফেললে কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। (রদ্দুল মোহতার)

বর্তমানে অধিকাংশ চিকিৎসকরা কাফির না হলেও নিশ্চয় ফাসিক, তাছাড়া অভিজ্ঞ চিকিৎসক খুবই বিরল, এদের কথার উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করা যায় না, ওদের কথা মতে রোজা ভঙ্গ করবে না। ওসব ডাক্তারদের দেখা যায় সাধারণ রোগের জন্যও রোজা রাখাকে নিষেধ করে এতটুকু পার্থক্য করে না যে, কোন্ রোগের জন্য রোজা ক্ষতিকর কোন রোগের জন্য ক্ষতিকর নয়।

মাসআলাঃ ক্রীতদাসী যদি মুনীবের সেবার জন্য ফরজ ইবাদত করার সুযোগ না পায় সেটা কোন অজুহাত নয়। ফরজ সমূহ আদায় করে নিবে, ততক্ষণ দেরী পর্যন্ত সেবা করবে না যেমন ফরজ নামাজের সময় চলে যাচ্ছে, এসময় কাজ ছেড়ে দেবে, ফরজ আদায় করে নেবে, আর যদি মুনীবের কাজ করতে থাকে রোজা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে কাফ্ফারা দিতে হবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মহিলার যদি হায়েজ নিফাস হলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে, হায়েজ থেকে পূর্ণ দশ দিন পর রাতে পবিত্র হলে সর্বাবস্থায় সবগুলো রোজা রাখতে হবে। আর যদি দশ দিনের কম সময়ে পবিত্র হয় এবং সকাল হতে যদি এতটুকু বাকী থাকে যে, গোসল করে সামান্য সময় বাকী থাকলে তখনও রোজা রাখবে, আর যদি গোসল শেষ করার সময় সকাল আলোকিত হয় তাহলে রোজা রাখবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ হায়েজ ও নিফাস সম্পন্না মহিলার জন্য চুপে চুপে খাওয়ার অনুমতি আছে, অথবা বাহ্যিকভাবে রোজার ন্যায় থাকা তাদের উপর জরুরী নহে। (জাওহেরা) কিন্তু চুপে খাওয়াটা উত্তম। বিশেষতঃ ঋতুবতী মহিলার জন্য।

মাসআলাঃ ক্ষুধা ও পিপাসা যদি এমন হয়, প্রাণহানির বাস্তব আশংকা হয়, বা মস্তিষ্ক বিকৃতির ভয় হয় তাহলে রোজা রাখবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রোজা ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য করা হলো, তখন এখতিয়ার থাকবে, তবে ধৈর্য্য ধারণ করলে সওয়াব পাবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ সর্প দংশন করলো, এবং প্রাণহানির ভয় হলো, তখন রোজা ভেঙ্গে ফেলবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যেসব লোকেরা উপরোক্ত অজুহাতের কারণে রোজা ভঙ্গ করলো, তাদের উপর ফরজ তা কাযা দেয়া। তবে ওসব কাযা রোজায় তারতীব বা পর্যায়ক্রমিক ফরজ নয়। বিধায় ওসব রোজার আগে যদি নফল রোজা রাখে তাহলে এগুলো নফল রোজা হবে। তবে বিধান হলো ওজর দূরীভূত হওয়ার পর দ্বিতীয় রমজান আসার পূর্বে কাযা রোজাকে আদায় করে নেবে।

হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যার উপর পূর্বের রমজানের কাযা রোজা বাকী রয়েছে, তা রাখেনি, তার রমজানের রোজা কবুল হবে না। আর যদি রোজা রাখেনি দ্বিতীয় রমজান এসে গেল, তাহলে প্রথমে রমজানের রোজা রাখবে কাযাগুলো রাখবে না, তবে যদি অসুস্থ ও মুসাফির ছাড়া অন্য ব্যক্তি কাযার নিয়ত করেছে, তবুও কাযা হবে না। রমজানের রোজাই আদায় হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি মুসাফির এবং তার সঙ্গীদের রোজা রাখতে কষ্ট না হয় তাহলে সফরে রোজা রাখা উত্তম। অন্যথায় না রাখা উত্তম। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ যদি সেই লোক উপরোক্ত অজুহাতে মারা গেল, কাযা রাখার সুযোগও হয়নি, তার উপর ফিদয়ার ওসীয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব নহে, তবুও ওসীয়ত করে গেলে সম্পদের এক তৃতীয়াংশে ওসীয়ত কার্যকর হবে। আর যদি এতটুকু সুযোগ ছিল কাযা রোজা রাখার কিন্তু রাখেনি তখন ওসীয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না রেখে থাকে তাহলে ওসীয়ত করে যাওয়াটা আরো অধিক ওয়াজিব। ওসীয়ত করেনি ওলী নিজের পক্ষ থেকে দান করেছে তখনও জায়েয হবে। কিন্তু দান করাটা ওলীর উপর ওয়াজিব ছিল না। (দররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ প্রত্যেক রোজার ফিদ্য়া সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ মালের তৃতীয়াংশে ওসীয়ত তখন কার্যকর হবে যখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশও থাকে, আর যদি ওয়ারিশ না থাকে সবগুলো মাল দ্বারা ফিদ্য়া আদায়যোগ্য হলে সবগুলো ফিদয়াও খরচ করে দেয়া আবশ্যক। অনুরূপ ওয়ারিশ যদি কেবল স্বামী বা স্ত্রী থাকে তখন এক তৃতীয়াংশ বের করার পর ওদের হক দিতে হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে যদি ফিদ্য়াতে ব্যয় করা যায় ব্যয় করে ফেলবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ওসীয়ত করা কেবল তত দিনের জন্য ওয়াজিব হবে যত দিনের উপর সক্ষম হয়, যেমন, দশটি রোজা কাযা হয়েছে, ওজর চলে যাওয়ার পর পাঁচটি রাখতে সক্ষম হলো এরপর ইন্তেকাল করলো, তাহলে পাঁচটির ওসীয়ত ওয়াজিব হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তি রোজা রাখতে পারবে না। (ফিক্হের বিভিন্ন কিতাব দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ ওয়াজিব ইতিকাফ ও সাদকায়ে ফিতরের বদলা যদি ওয়ারিশ আদায় করে দেয় জায়েয হবে। তার পরিমাণ হবে সাদকায়ে ফিতরের অনুরূপ পরিমাণ। যাকাত দিতে চাইলে যতটুকু ওয়াজিব ছিল ততটুকু সম্পদ থেকে বের করে নেবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ অতিশয় বৃদ্ধ অর্থাৎ যার বয়স এমন হয়েছে যে, দিনের পর দিন দুর্বল হচ্ছে যদি রোজা রাখতে অক্ষম হয় এখনো রাখতে পারছে না, ভবিষ্যতেও রাখতে পারবে আশা করা যাচ্ছে না, তখন তার জন্য রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর পরিমাণ মিসকিনকে দিয়া দিবে।

(দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ এ ধরনের বৃদ্ধ যদি গরম কালে গরমের কারণে রোজা রাখতে না পারে, কিন্তু শীতকালে রাখতে পারে, তাহলে গরমকালে রোজা ভেঙ্গে ফেলবে। এবং এর পরিবর্তে শীতকালে রোজা রাখা ফরজ। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ফিদ্য়া আদায় করার পর রোজা আদায় করার মত শক্তি এসে গেল, তখন রোজার কাযা আদায় করা ওয়াজিব, ফিদ্য়া নফল সাদকা হিসেবে গণ্য হয়ে গেল। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রমজানের শুরুতেই পূর্ণ রমজানের ফিদ্‌য়া একসাথে দিয়ে দেয়া অথবা শেষে দেয়ার বেলায় এখতিয়ার রয়েছে, এতে মালিক বানানো শর্ত নয় বরং মুবাহ হিসেবে যথেষ্ট। এটাও জরুরী নয় যে, যতটি ফিদ্‌য়া ততজন মিসকীনকে দিতে হবে বরং একজন মিসকীনকে কয়েক দিনের দিতে পারবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ শপথ বা হত্যার কাফ্‌ফারা হিসেবে তার জিম্মায় রোজা রয়েছে, বার্ধক্যের দরুন রোজা রাখতে পারছে না, সেই রোজার ফিদ্‌য়া দিতে হবে না, রোজা ভঙ্গ করলে বা জিহার করলে তার কাফ্‌ফারা বর্তাবে। রোজা যদি রাখতে না পারে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কেউ সর্বদা রোজা রাখার মান্নত করলো এবং বরাবর রোজা রাখলে কোন কাজও করতে পারবে না. যদ্বারা জীবন নির্বাহ করা যায়, তাহলে ওর জন্য প্রয়োজন পরিমাণ রোজা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে, প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া দিবে এর সামর্থও না থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ নফল রোজা ইচ্ছাকৃত শুরু করার দ্বারা আবশ্যক হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে, কাযা ওয়াজিব হবে। সে ধারণা করেছে যে, ওর জিম্মায় কোন রোজা আছে রোজা রাখা শুরু করেছে পরে স্মরণ হলো জিম্মায় কোন রোজা নেই, তাহলে যদি তাৎক্ষনিক রোজা ভঙ্গ করে ফেললে তাহলে কিছু দিতে হবে না। জানার পর যদি ভঙ্গ না করে এখন ভঙ্গ করতে পারবে না, ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ নফল রোজা ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করেনি বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে গেল, যেমন, রোজার মাঝখানে হায়েজ হয়ে গেল, তখনও কাযা ওয়াজিব হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ঈদদ্বয় বা কুরবানী ঈদের পরবর্তী দিন কেউ নফল রোজা রাখলো, তাহলে রোজা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। ওটা ভেঙ্গে ফেললেও কাযা ওয়াজিব নয় বরং ওই রোজা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। আর যদি এই দিন সমূহে রোজার মান্নত করে মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব। তবে ঐ দিন সমূহে নয় বরং অন্য দিন সমূহে পূর্ণ করা ওয়াজিব। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ নফল রোজা বিনা ওজরে ভেঙ্গে ফেলা নাজায়েয। মেহমানের সাথে যদি মেজবান খাবার না খেলে মেজবান অসন্তুষ্ট হবে, অথবা মেহমান খাবার না খেলে মেজবান কষ্ট পাবে, তাহলে নফল রোজা ভঙ্গ করার জন্য এটা অজুহাত। তবে ওটা কাযা রাখার শর্তে ভেঙ্গে ফেলা যাবে। আরো শর্ত হলো, দ্বিপ্রহরের পূর্বে ভঙ্গ করা যাবে, পরে নয়। দ্বিপ্রহরের পর পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে ভেঙ্গে ফেলা যাবে। এতে আসরের পূর্ব পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে আসরের পর নয়। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ কেউ শপথ করলো যে, তুমি যদি রোজা ভঙ্গ না কর, তাহলে আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে ওর শপথ সত্য পরিণত করা উচিৎ হবে। অর্থাৎ রোজা ভেঙ্গে ফেলবে, যদিও কাযা রোজা হয়, যদিও দ্বিপ্রহরের পর হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ কোন ভাই দাওয়াত করলো, তাহলে দ্বিপ্রহরের পূর্বে নফল রোজা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল, মান্নত ও শপথের রোজা রাখবে না, আর যদি রাখে স্বামী ভঙ্গ করাতে পারবে। কিন্তু ভঙ্গ করালে কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু সেটার কাযাতেও স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। অথবা স্বামী এবং ওর মাঝখানে যদি পৃথকতা সৃষ্ট হয় অর্থাৎ বিচ্ছেদ তালাক দেয়, বা মৃত্যু বরণ করে তবে রোজা রাখাতে স্বামীর যদি কোন ক্ষতি না হয়, যেমন স্বামী সফরে বা অসুস্থ বা ইহরাম পরিহিত, উপরোক্ত অবস্থায় অনুমতি বিহীনও কাযা রাখতে পারবে। বরং স্বামী নিষেধ করলে তবুও। ওসব দিনেও তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা রাখতে পারবে না।

রমজান ও রমজানের কাযার জন্য স্বামীর অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই বরং তার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাখবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ক্রীতদাস দাসীও ফরজ রোজা ছাড়া অন্য রোজা মুনীবের অনুমতি ব্যতীত রাখতে পারবে না, মুনিব ইচ্ছা করলে ভঙ্গ করাতে পারবে। অতঃপর সেটার কাযা মুনিবের অনুমতি হলে বা স্বাধীন হওয়ার পর রাখবে। অবশ্য গোলাম যদি স্বীয় স্ত্রীর সাথে জিহার করে তাহলে কাফ্‌ফারার রোজা মুনীবের অনুমতি ব্যতীত রাখতে পারবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ শ্রমিক বা চাকর যদি নফল রোজা রাখে কাজ পূর্ণভাবে করতে পারবে না, তাহলে যার শ্রমিক বা যিনি পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করেছেন ওর অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। আর যদি কাজ পূর্ণরূপে করতে পারে অনুমতির প্রয়োজন নেই। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মেয়েকে পিতার, মাতাকে পুত্রের, বোনকে ভাইয়ের, অনুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মাতাপিতা যদি ছেলেদেরকে নফল রোজা থেকে নিষেধ করে, রোগের ভয়ের কারণে, তাহলে মাতা পিতার কথা মানবে। (রদ্দুল মোহতার)

নফল রোজার ফজীলত

আশুরা অর্থাৎ দশই মহররমের রোজা এবং মহররমের নবম তারিখের রোজা রাখা উত্তম।

হাদীস- (১) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আশুরার রোজা নিজে রেখেছেন এবং রাখার আদেশ করেছেন।

হাদীস- (২) ঃ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ শরীফে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, রমজানের পর আল্লাহর মাস মহররমের রোজাই হল শ্রেষ্ঠ রোজা এবং ফরজ নামাজের পর রাত্রের নামাজই হলো সর্বোত্তম নামাজ।

হাদীস- (৩) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে এই আশুরার দিন এবং এই রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোন দিনের রোজা রাখাকে এত অধিক সওয়াবের বলে ধারণা করতে এবং অপরাপর দিন সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে দেখিনি।

হাদীস- (৪) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, দেখতে পেলেন যে, ইহুদীগণ আশুরার দিবসে রোজা রাখছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এদিন কেন রোজা রাখছ? তারা বললো, এ দিনটি একটি মহান দিন, এদিন আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হযরত মুসা (আঃ) এদিনে রোজা রেখেছেন, তাই আমরাও এদিনে রোজা রাখি। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, আমরা তোমাদের চাইতে হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার বেশী হকদার ও অধিক যোগ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সেই দিন নিজে রোজা রাখলেন

এবং আমাদেরকেও রোজা রাখার আদেশ করলেন।

হাদীস- (৫) ঃ সহীহ মুসলিম শরীফে, হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আল্লাহর উপর আমার বিশ্বাস আছে যে, আশুরার রোজা এক বৎসর পূর্বের গুনাহ মিটায়ে দেন।

আরফা অর্থাৎ জিলহজ্বের নবম তারিখের রোজা

হাদীস- (৬-১০) ঃ সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ শরীফে, হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আমার বিশ্বাস, আরাফা দিবসের রোজা এক বৎসর পূর্বের এবং এক বৎসর পরের গুনাহ মিটায়ে দেন। অনুরূপ হাদীস সাহল বিন সাদ (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।

হাদীস- (১১) ঃ উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরাফাত দিবসের রোজা হাজারের সমান জানতেন, কিন্তু হজ্ব পালনকারীর জন্য যিনি আরাফাতে অবস্থান করেন, তাঁর জন্য আরাফাত দিবসের রোজা রাখা মাকরূহ। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে খোজায়মা প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরাফাত দিবসে রোজা রাখা নিষেধ করেছেন।

শাওয়ালের ছয় রোজা যেগুলো লোকেরা ঈদের ছয় রোজা বলে থাকে

হাদীস- (১২-১৩) ঃ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, তিবরানী শরীফে, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে রমজানের রোজা রাখলো, এরপর শাওয়ালের ছয় দিন রাখলো, সে যেন পূর্ণ বৎসর রোজা রাখলো, অনুরূপ হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস- (১৪-১৫) ঃ নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে খোজায়মা, ইবনে হাব্বান প্রমুখ সওবান (রাঃ) হতে এবং ইমাম আহমদ তিবরানী ও বাজ্জাজ (রাঃ) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে ঈদুল ফিতরের পর ছয় রোজা রাখলো, সে পূর্ণ বৎসরের

রোজা রাখলো, যে একটি সৎ কাজ করলো, সে দশটি প্রতিদান পাবে, রমজান মাসের রোজা দশ মাসের সমান এবং ছয় দিনের রোজা দুই মাসের সমান পূর্ণ এক বৎসরের রোজা হয়ে গেল।°

হাদীস– (১৬) ঃ তিবরানী আওসাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে রমজান মাসের রোজা রাখলো, অতঃপর শাওয়ালে ছয়দিন রাখলো, সে গুনাহ হতে এমনভাবে বেরিয়ে গেল, যেমন আজ মায়ের পেট হতে জন্ম হয়েছে।

৪. শাবানের রোজা এবং শাবানের ১৫ তারিখের ফজীলতঃ

হাদীস– (১৭) ঃ তিবরানী, ইবনে হাব্বান, মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, শাবানের ১৫ তারিখের রাত্রিতে আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, সকলকে ক্ষমা করেন, কিন্তু কাফির ও শত্রুতাকারীদেরকে ক্ষমা করেন না।

°১. টিকাঃ উক্ত হাদীস হতে প্রতীয়মান হলো যে, যে দিবসে মহান আল্লাহপাক কোন বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন, সেদিনকে স্মরণীয় করে রাখা সঠিক ও উত্তম কাজ। যেন বিশেষ নেয়ামতের কথা স্মরণ হয় এবং এ কৃতজ্ঞতা আদায় করার কারণ হয়। কুরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছে, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতের দিনসমূহকে স্মরণ করো। আমরা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর প্রিয়নবী সৈয়্যদে আলম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শুভাগমনের দিবস থেকে অধিক উত্তম দিবস আর কি হতে পারে? স্মরণীয় দিবস উদ্‌যাপন করবে। সকল নেয়ামতরাজি সে দিবসের ওসীলায় প্রাপ্ত, সেই দিবসটি ঈদের চেয়েও উত্তম। সে দিনের ওসীলায় ঈদ ঈদ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে এ কারণে সোমবার দিবসে রোজা রাখার কারণ এরশাদ হয়েছে, فِيهِ وُلِدْتُ অর্থাৎ সেই দিবসে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

২.উত্তম হলো উক্ত ছয় রোজা পৃথকভাবে রাখবে, ঈদের পর লাগাতার ছয় দিন একসাথে রাখলেও কোন ক্ষতি নেই।

৩. যে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে দুনিয়াবী শত্রুতা রয়েছে, সেই রাত আসার পূর্বেই তাদের উচিত হবে প্রত্যেকে একে অপরের সাথে মিলে যাওয়া, একে অন্যের ত্রুটি ক্ষমা করা, যেন আল্লাহর ক্ষমা ওদেরও নসীব হয়। এটাই হাদীসের ভিত্তি, আল্লাহর শুকরিয়া, এখানে বেরেলী শরীফে আলা হযরত ক্বেবলা (রাঃ) এই নিয়ম বারবার বলতেন যে, শাবানের ১৪ তারিখ আসার পূর্বেই যেন মুসলমান পরস্পর মিলে যায়। একে অন্যের ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়, অন্য স্থানের মুসলমানরাও এ আদর্শ অনুসরণ করলে অধিক সঙ্গত ও উত্তম হবে।

৪. আরবে বনী কালব একটি গোত্র রয়েছে, ওদের ওখানে ছাগলসমূহ অধিকহারে দেয়া যায়।

হাদীস– (১৮-১৯) ঃ বায়হাকী শরীফে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আমার কাছে জিব্রাইল (আঃ) এসেছেন এবং বলেছেন যে, এটা হচ্ছে শাবানের পনের তারিখের রাত। এ রাতে আল্লাহ তাআলা এত অধিক লোক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন, যতটুকু বনী কালব গোত্রের বকরী সমূহের পশম রয়েছে, কিন্তু কাফির, শত্রুতাকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, পিতামাতার অবাধ্যকারী, নিয়মিত মদ্যপানকারীদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না।

ইমাম আহমদ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, সেখানে হত্যাকারীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস– (২০) ঃ বায়হাকী শরীফে, উম্মুল মোমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, আল্লাহ জাল্লাশানুহু শাবানের পনের তারিখ রাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন, রহমত তলবকারীদের প্রতি দয়া করেন, শত্রুতাকারীদের যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ছেড়ে দেন।

হাদীস– (২১) ঃ ইবনে মাযাহ শরীফে, হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যখন শাবানের পনের তারিখ রাত আসে, বিনিদ্র রজনী যাপন করো, দিনে রোজা রাখো, আল্লাহ তাআলা সূর্যাস্তের পর থেকে দুনিয়ার মাঝখানে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং এরশাদ করেন, ক্ষমা প্রার্থনাকারী কেউ আছো কি? তাকে ক্ষমা করবো, রিযিক প্রার্থনাকারী কেউ আছো কি? তাকে রিযিক দান করবো, কেউ রোগাক্রান্ত আছো কি? তাকে আরোগ্য দান করবো, এমন কেউ আছো? কেউ এমন আছো কি? ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন।

হাদীস– (২২) ঃ উম্মুল মোমেনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে অধিক রোজা রাখতে দেখিনি।

৫. প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা বিশেষতঃ আইয়্যামে বীযের রোজা, তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোজা।

হাদীস– (২৩-২৪) ঃ বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ শরীফে, আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং

মুসলিম শরীফে, আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেছেন, এর মধ্যে একটি হলো, প্রত্যেক মাসে যেন তিনটি রোজা রাখি।

হাদীস- (২৫-২৬) ঃ সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মাসে তিন দিনের রোজা হচ্ছে, যেমন সর্বদা রোজা রাখা। অনুরূপ হাদীস কুরবিন আয়াস (রাঃ) হতে বর্ণিত।

হাদীস- (২৭-২৮) ঃ ইমাম আহমদ বিন হাব্বান, ইবনে আব্বাস এবং বাজ্জাজ মওলা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, রমজানের রোজা এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোজা সীনার অনিষ্ঠতা দূর করে ফেলে।

হাদীস- (২৯) ঃ তিরমিযী শরীফে, মায়মুনা বিনতে সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যেভাবে হোক প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখবে। প্রত্যেক রোজা দশটি গুনাহ্ মিটায়ে দেয়, গুনাহ্ হতে এমনভাবে পবিত্র করে, যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে।

হাদীস- (৩০) ঃ ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ শরীফে, হযরত আবু জর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যখন মাসের মধ্যে তিনটি রোজা রাখবে তের, চৌদ্দ, পনের তারিখে রাখো।

হাদীস- (৩১) ঃ নাসাঈ শরীফে, উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা চারটি বিষয় ছাড়তেন নাঃ (১) আশুরা, (২) জিলহজ্বের দশ তারিখের রোজা (৩) এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোজা, (৪) ফজরের পূর্বের দুই রাকাত।

হাদীস- (৩২) ঃ নাসাঈ শরীফে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আইয়্যামে বীযে রোজা বিহীন হতেন না, সফরে হোক অবস্থানে হোক।

৬. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজাঃ

হাদীস- (৩৩-৩৫) ঃ সুনানে তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আমল সমূহ পেশ করা হয়, আমি পছন্দ করি আমার আমল যেন এমন সময় পেশ করা হয়, যখন আমি রোজাদার হই। অনুরূপ হাদীস উমামা বিন যায়েদ জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস- (৩৬) ঃ ইবনে মাযাহ শরীফে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, এই দু'টি দিনে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করেন, কিন্তু সেই দুইব্যক্তি যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ওদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের বলা হয়, ওদের ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তারা উভয়ই সংশোধন করে নেয়।

হাদীস- (৩৭) ঃ তিরমিযী শরীফে, উম্মুল মোমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সোমবার ও বৃহস্পতিবারকে স্মরণ রেখে রোজা রাখতেন।

হাদীস- (৩৮) ঃ সহীহ্ মুসলিম শরীফে, হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সোমবার দিবসে রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে এরশাদ করেছেন, সেই দিবসে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সেই দিনে আমার ওপর ওহী নাজিল করা হয়েছে।

৭. অন্য দিন সমূহে রোজাঃ

হাদীস- (৩৯) ঃ আবু ইয়ালা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখবে, তার জন্য দোযখের মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে।

হাদীস- (৪০-৪২) ঃ তিবরানী আওসাতে হযরত আবু ইয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বুধবার বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, রোজা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে এবং ভিতরের অংশ বাইর থেকে দেখা যাবে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে জান্নাতে মণিমুক্তা, ইয়াকুত ও যবরযদ পাথর দ্বারা মহল নির্মাণ করা হবে এবং তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি উপরোক্ত তিন দিবসে রোজা রাখবে, অতঃপর জুমার দিবসে অল্প বা অধিক সাদকা দিবে, যা গুনাহ হয়েছে তা ক্ষমা করা হবে, গুনাহ থেকে এমন

পবিত্র হয়ে যাবে যেন সেই দিন স্বীয় মাতার পেট থেকে জন্ম হয়েছে কিন্তু বিশেষভাবে জুমার দিবসে রোজা রাখা মাকরূহ।

হাদীস- (৪৩) ঃ মুসলিম ও নাসাঈ শরীফে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, জুমার রাতকে জাগরণের জন্য এবং দিন সমূহ থেকে জুমার দিনকে রোজার জন্য নির্দিষ্ট করো না, কেউ কোন প্রকার রোজা রাখলো, জুমার দিবসে রোজা অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ করলো, তাহলে ক্ষতি নেই।

হাদীস- (৪৪) ঃ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ্ ও ইবনে খোজায়মা প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, জুমার দিবসে কোন রোজা রাখবে না, কিন্তু এর পূর্বে অথবা পরে একদিন সহ রাখবে ইবনে খোজায়মার বর্ণনায় আছে, জুমার দিন হচ্ছে ঈদ, সুতরাং ঈদের দিনকে রোজার দিন করো না, কিন্তু তার পূর্বে বা পরের দিন রোজা রাখো।

হাদীস- (৪৫) ঃ সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে মুহাম্মদ বিন উব্বাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত জাবের (রাঃ) পবিত্র কাবা শরীফের তওয়াফ করতেছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জুমার দিবসে রোজা রাখতে কি নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন,হ্যাঁ এই ঘরের প্রভুর শপথ।

মান্নতের রোজার বর্ণনা

শরয়ী মান্নত হচ্ছে যা মান্নত করলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে পূর্ণ করা ওয়াজিব। এর জন্য সাধারণত কয়েকটি শর্ত রয়েছে।

১. এমন বস্তুর মান্নত হতে হবে যেন ঐ জাতীয় বস্তু থেকে কোন কিছু ওয়াজিব হয়। অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শশ্রুষা, মসজিদে গমন করা এবং জানাযার সাথে গমনের মান্নত হবে না।

২. মূল ইবাদত যেন উদ্দেশ্য হয়, অন্য কোন ইবাদতের জন্য যেন ওসীলা না হয়, যেমন ওজু, গোসল, কুরআন শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করার মান্নত শুদ্ধ হবে না।

৩. এমন বস্তুর মান্নত হতে পারবে না, যা শরীয়ত এমনিতেই ওর উপর ওয়াজিব করেছে, বর্তমানে হোক বা ভবিষ্যতে, যেমন আজকের জোহরের বা কোন ফরজ

নামাজের মান্নত সহীহ্ হবে না। যেহেতু এসব ইবাদত তো এমনতিই ওয়াজিব।

৪. যে বস্তুর মান্নত করা হয়- সেটা যেন স্বয়ং কোন গুনাহর কথা না হয়, যদি অন্য কোন কারণে গুনাহ হয়, তাহলে মান্নত শুদ্ধ হবে, যেমন ঈদের দিন রোজা রাখা নিষেধ, যদি রোজা রাখার মান্নত করে, মান্নত হয়ে যাবে, যদিও হুকুম হচ্ছে ঈদের দিন রাখবে না, বরং অন্য কোন দিন রাখবে। এ নিষিদ্ধতা আনুসাঙ্গিক অর্থাৎ ঈদের দিন হওয়ার কারণে। স্বয়ং রোজা হচ্ছে একটি বৈধ ইবাদত।

৫. এমন বস্তুর মান্নত যেন করা না হয়, যার বাস্তবায়ন অসম্ভব, যেমন মান্নত করল যে, আমি গতকাল রোজা রাখবো, এ ধরনের মান্নত শুদ্ধ হবে না।

মাসআলাঃ মান্নত শুদ্ধ হওয়ার জন্য এমন কিছু জরুরী নয় যে, অন্তরে মান্নতের সংকল্পও থাকতে হবে। যদি কিছু বলার ইচ্ছা করেছে মুখ থেকে মান্নতের শব্দ বেরিয়ে গেল, মান্নত শুদ্ধ হবে। অথবা এটা বলতে চাচ্ছে যে, আল্লাহর জন্য এক দিনের রোজা রাখবো, মুখ থেকে এক মাস বের হয়ে গেল, এক মাসের রোজা ওয়াজিব হয়ে গেল। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ নিষিদ্ধ দিনসমূহ অর্থাৎ রমজানের ঈদ, কুরবানীর ঈদ, জিলহজ্বের এগার, বার, তের তারিখে রোজা রাখার মান্নত করলো এবং ওই দিনসমূহে রেখে ফেলেছে, যদিও তা গুনাহ হয়, কিন্তু মান্নত হয়ে যাবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ এই বৎসরের রোজার মান্নত করলো, তাহলে নিষিদ্ধ দিনসমূহ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দিনগুলোতে রোজা রাখবে এবং নিষিদ্ধ দিনসমূহের পরিবর্তে অন্য দিনে রাখবে, আর যদি নিষিদ্ধ দিন সমূহে রেখেও ফেলে তবুও মান্নত পূর্ণ হবে। কিন্তু গুনাহগার হবে। এ হুকুম প্রযোজ্য হবে যদি নিষিদ্ধ দিন সমূহের পূর্বে মান্নত করে থাকে। আর যদি নিষিদ্ধ দিন সমূহের পর যেমন জিলহজ্বের চৌদ্দ তারিখ রাত্রে এই বৎসরের রোজার মান্নত করলো, তাহলে জিলহজ্বের সমাপ্তি পর্যন্ত রোজা রাখলে মান্নত পূর্ণ হবে।

জিলহজ্ব মাসের সমাপ্তিতে বৎসর সমাপ্ত হয়। রমজানের পূর্বে রমজানের বৎসরের রোজার মান্নত করেছে তাহলে রমজানের পরিবর্তে রোজা রাখা তার জিম্মায় থাকবে না। মান্নতের সময় যদি পরপর রোজা রাখার শর্ত বা নিয়ত করে, তবুও যেসব দিনসমূহে রোজা রাখা নিষেধ ওসব দিনে রোজা রাখবে না। কিন্তু পরবর্তীতে ওসব দিন সমূহের রোজা পরপর রাখবে। একদিনও যদি রোজা বিহীন থাকে তাহলে ঐ

দিনের পূর্বে যতদিন রোজা ছিল সবগুলো পুনরায় রাখতে হবে। আর যদি এক বৎসর রোজা রাখার মান্নত করে তাহলে পূর্ণ বৎসর রোজা রাখার পর আরো পঁয়ত্রিশ বা চৌত্রিশ দিন অতিরিক্ত রাখবে, অর্থাৎ রমজান মাস এবং নিষিদ্ধ পাঁচ দিন সমূহের নিষিদ্ধ দিন সমূহের রোজার পরিবর্তে। যদিও ওসব দিনে তিনি রোজা রেখেছেন, এ অবস্থায় এটাই যথেষ্ট। অবশ্য যদি এরূপ বলে যে, এক বৎসরের রোজা পরপর রাখবো, তাহলে পঁয়ত্রিশ রোজা রাখার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এ অবস্থায় যদি পরপর রাখা না হয় তাহলে শুরু থেকে পুনরায় রাখতে হবে। কিন্তু নিষিদ্ধ দিন সমূহে রাখবে না। বরং বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর লাগাতার পাঁচদিন রাখবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মান্নতের ছয়টি ধরণ

মাসআলাঃ মান্নতের শব্দের মধ্যে শপথের সম্ভাবনাও রয়েছে, এখানে ছয়টি ধরন রয়েছে–

১. কেবল শব্দ দ্বারা কোন নিয়ত করেনি, না মান্নতের না শপথের।

২. কেবল মান্নতের নিয়ত করেছে, অর্থাৎ শপথ হওয়া না হওয়া কোনটার ইচ্ছা করেনি, ৩. মান্নতের নিয়ত করেছে, শপথের নিয়ত করেনি, ৪. শপথের নিয়ত করেছে, এটা মান্নত নয়। ৫. মান্নত ও শপথ উভয়টির নিয়ত করেছে, ৬. কেবল শপথের নিয়ত করেছে মান্নত হওয়া না হওয়া কোনটির নিয়ত করেনি, প্রথম তিন অবস্থায় কেবল মান্নত হবে। পূর্ণ না করলে কাযা দিবে, চতুর্থ অবস্থায় শপথ হবে পূর্ণ না করলে কাফফারা দিতে হবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থায় মান্নত ও শপথ উভয়টি হবে, পূর্ণ না করলে মান্নতের কাযা দিবে। শপথের কাফফারা দিবে। (তানভীরুল আবছার)

মাসআলাঃ এমন মাসে রোজার মান্নত করেছে, যে মাসে নিষিদ্ধ দিন রয়েছে তাহলে ওসব নিষিদ্ধ দিনে রোজা রাখবে না, বরং এর পরিবর্তে পরে রাখবে, যদি রোজা রাখে, গুনাহগার হবে। কিন্তু মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় পূর্ণ এক মাসের রোজা ওয়াজিব নয়। বরং মান্নত করার সময় থেকে ওই মাসে যতদিন বাকী আছে, ততদিন রোজা ওয়াজিব। যদি সেটা রমজানের মাস হয়, তাহলে মান্নতই হবে না। রমজানের রোজা তো এমনিতেই ফরজ। রমজান মাসের রোজার মান্নত করলো, রমজান আসার পূর্বেই মারা গেল, তাহলে এক মাস পর্যন্ত মিসকীনকে

খাবার খাওয়ানোর ওসীয়ত করা ওয়াজিব। আর যদি কোন নির্দিষ্ট মাসের মান্নত করে যেমন রজব অথবা শাবান মাসে, তাহলে পূর্ণ মাস রোজা রাখা আবশ্যক। এই মাস উনত্রিশে হলে উনত্রিশ রোজা, ত্রিশে হলে ত্রিশ রোজা রাখবে। মাঝখানে বিরতি করবে না। কোন রোজা যদি বাদ পড়ে, সেটা পরে পূর্ণ করে নিলে পূর্ণ মাস পুনরায় রাখার প্রয়োজন নেই। (রদ্দুল মোহতার ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ এক মাসের রোজার মান্নত করেছে, তাহলে পূর্ণ ত্রিশ দিন রোজা রাখা ওয়াজিব হবে। যদিও যে মাসে রাখে সেটা উনত্রিশে মাস হয় এবং এটাও আবশ্যক যে, কোন রোজা যেন নিষিদ্ধ দিন সমূহে না হয়। এ অবস্থায় যদি নিষিদ্ধ দিনে রোজা রাখে গুনাহগার হবেই ওই রোজাই যথেষ্ট হবে না। পরপর রাখার শর্ত থাকলে বা অন্তরে নিয়্যত করেছে, তাহলে জরুরী হলো যেন মাঝখানে বিরতি না হয়, যদি বিরতি হয় যদিও নিষিদ্ধ দিনসমূহে তাহলে তখন থেকে পুনরায় লাগাতার এক মাস রোজা রাখতে হবে। অর্থাৎ এটা জরুরী যে. সেই ত্রিশ দিনে কোন দিন যেন এমন না হয় যে দিনে রোজা রাখা নিষেধ এর লাগাতার রোজা রাখার শর্তও যেন পাওয়া না যায়। নিয়্যতেও যেন না থাকে। পৃথক পৃথকভাবে ত্রিশটি রাখলেও মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে। স্ত্রী লোক এক মাস লাগাতার রোজা রাখার মান্নত করেছে, তাহলে এক মাস অথবা ততোধিক পবিত্রাবস্থায় যদি থাকে, তখন জরুরী হবে। এমন সময় রোজা শুরু করবে, যেন ঋতুস্রাব হওয়ার পূর্বে ত্রিশ দিন পূর্ণ হয়ে যায়। অন্যথায় হায়েজ আসার পর নতুনভাবে ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে। আর যদি মাস পূর্ণ হওয়া শেষে হায়েজ এসে যায়, তাহলে হায়েজ আসার পূর্বে যতটি রোজা রেখেছে তা হিসেব রাখবে, যতটি অবশিষ্ট রয়েছে, ততটি রোজা হায়েজ শেষ হওয়ার পর লাগাতার বিরতিহীনভাবে পূর্ণ করবে। (দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ লাগাতার রোজার মান্নত করেছে, সে সময় বিরতি করা জায়েয হবে না, আর পৃথকভাবে যেমন দশটি রোজার মান্নত করেছে, তখন লাগাতার রাখা জায়েয হবে। (বাহার)

মাসআলাঃ মান্নত দুই প্রকার, একটি শর্তযুক্ত যেমন আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে বা অমুক ব্যক্তি সফর থেকে আসলে তাহলে আমি আল্লাহর জন্য এতটি রোজা বা নামায অথবা সাদকা ইত্যাদি আদায় করবো, দ্বিতীয়টি শর্তবিহীন, যেটা কোন কাজ হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং এরূপ বলা যে, আল্লাহর জন্য আমি নিজের উপর এতটি রোজা বা নামাজ অথবা সাদকা ইত্যাদি ওয়াজিব করছি,

শর্তবিহীন অবস্থায় যদিও সময় বা স্থান ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে, কিন্তু মান্নত পূর্ণ করার জন্য এগুলো আবশ্যক নহে। এর পূর্বে বা এর বিপরীতে হবে না তা নয়। বরং সে সময়ের পূর্বেও রোজা রেখে ফেলেছে বা নামাজ পড়ে নিল ইত্যাদি, তখনও মান্নত পূর্ণ হবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ এই রজবে রোজার মান্নত করেছে, কিন্তু জমাদিউস সানীতে রোজা রেখে ফেলেছে, এটা রজব মাসের হবে। রজব ও যদি উনত্রিশে হয় পূর্ণ হয়ে যাবে। আর একটি রোজা রাখার প্রয়োজন নেই, আর যদি ত্রিশে হয় আর একটি রোজা রাখবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ রজবে রোজার মান্নত করলো, রজবে অসুস্থ হয়ে পড়লো, অন্যদিন সমূহে সেটা কাযা করে নিবে। কাযা রাখার সময় এখতিয়ার থাকবে, লাগাতার রোজা রাখুক বা বিরতি দিয়ে রাখুক, এখতিয়ার রয়েছে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ শর্তযুক্ত অবস্থায় শর্ত পাওয়া যাওয়ার পূর্বে মান্নত পূর্ণ করতে পারবে না। যদি প্রথমেই রোজা রেখে দিল, পরে শর্ত পাওয়া গেল, তাহলে পুনরায় রাখা ওয়াজিব। প্রথমের রোজা ওটার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ একদিন রোজা রাখার মান্নত করলো, তাহলে এখতিয়ার রয়েছে, নিষিদ্ধ দিন সমূহ ছাড়া যেদিন রাখার ইচ্ছা করবে, রাখতে পারবে। অনুরূপ দুই দিন তিন দিনেও এখতিয়ার রয়েছে, অবশ্য যদি এক্ষেত্রে পরপর রাখার নিয়ত করে তাহলে পরপর লাগাতার রাখা ওয়াজিব। অন্যথায় এক সাথে রাখা বা বিরতি দিয়ে রাখার এখতিয়ার রয়েছে। পৃথকভাবে রাখার নিয়্যত করেছিল, লাগাতার রেখে ফেলল, তবুও জায়েয হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ একসাথে দশটি রোজার নিয়ত করেছে, পনেরটি রোজা রেখে দিল, মধ্যখানে একদিন রোজা, রাখলো না এবং কোন্ দিন তা স্মরণ নেই, তাহলে পুনরায় লাগাতার পাঁচদিন রাখতে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ রুগ্ন ব্যক্তি এক মাস রোজা রাখার মান্নত করলো, সুস্থ হল না, মারা গেল তার উপর কিছু দিতে হবে না। যদি এক দিনের জন্য হলেও সুস্থ হয়, কিন্তু রোজা রাখলো না, তাহলে পূর্ণ মাসের ফিদ্য়া দান করার ওসীয়ত করা ওয়াজিব। সুস্থ দিনে রোজা রেখেছিল, তাহলে অবশিষ্ট দিন সমূহের জন্যও ওসীয়ত করে যেতে হবে। অনুরূপ সুস্থ ব্যক্তি মান্নত করেছে, মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা গেল, তার উপরও ওসীয়ত করা ওয়াজিব। আর যদি রাত্রে মান্নত করে এবং রাত্রেই মারা

গেল, তখনও ওসীয়ত করে যাওয়া উচিৎ। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মান্নত করেছে যে, অমুক ব্যক্তি যেদিন আসবে সেদিন আল্লাহর জন্য আমার উপর রোজা রাখা ওয়াজিব। যদি সে দ্বিপ্রহরের পূর্বে আসে এবং সে কিছু পানাহার করেনি, তাহলে রোজা রেখে দিবে। আর যদি রাত্রে আসে কোন কিছু করতে হবে না। অনুরূপ যদি দ্বিপ্রহরের পর এসেছে বা খাবারের পর এসেছে বা মান্নতকারী মহিলা ছিল, ঐ দিন তার হায়েজ ছিল, উপরোক্ত অবস্থায়ও কিছু করতে হবে না। এ ধরনের বললো যে, যে দিন অমুক আসবে ঐ দিন আল্লাহর জন্য আমার উপর সর্বদা রোজা রাখা দায়িত্ব, যদি খাবার খাওয়ার পর আসে তাহলে ঐ দিনের রোজা তো হল না কিন্তু পরবর্তী প্রতি সপ্তাহে ঐ দিনে রোজা রাখা ওয়াজিব হয়ে গেল। যেমন যদি সোমবারে আসে প্রত্যেক সোমবারে রোজা রাখবে। (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ এ ধরনের মান্নত করলো-যে, যে দিন অমুক আসবে ঐ দিনের রোজা আমার উপর সর্বদা হবে, দ্বিতীয় মান্নত এ ধরনের করলো যে, যেদিন অমুক সুস্থ হবে ঐ দিনের রোজা আমার উপর সব সময় হবে। ঘটনাক্রমে যেদিন সে আসলো, ঐ দিন সেই সুস্থও হয়ে গেল, তাহলে প্রতি সপ্তাহে কেবল এক দিন রোজা রাখা তার জন্য সব সময় ওয়াজিব। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ অর্ধ দিনের রোজার মান্নত করলো এ ধরনের মান্নত শুদ্ধ নহে। (আলমগীরি)

ইতিকাফের বর্ণনা

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেনঃ

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

অর্থঃ স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করো না যখন তোমরা মসজিদগুলোতে ইতিকাফরত থাকো। (সূরা বাক্বারা, পারাঃ২, আয়াতঃ ১৮৭)

হাদীস– (১) ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে উম্মুল মোমেনীন আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রমজানের শেষ দশক পর্যন্ত ইতিকাফ করতেন।

হাদীস– (২) ঃ আবু দাউদ শরীফে, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, ইতিকাফ পালনকারীর জন্য এই সুন্নাত পালন করা আবশ্যক, সে কোন রোগীকে দেখতে যাবে না, জানাযা নামাজে হাজির হবে না, স্ত্রী সহবাস করবে না, তার সাথে মেলামেশাও করবে না, কিন্তু একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বের হবে না। রোজা ব্যতীত ইতিকাফ হয় না এবং জামে মসজিদ ব্যতীতও ইতিকাফ হয় না।

হাদীস- (৩) **:** ইবনে মাযাহ্ শরীফে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইতিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ্ সমূহ হতে বিরত থাকে, (বাইরে থেকে) যারা নেক কাজ করে এবং নেক কাজ সমূহ দ্বারা এ পরিমাণ সওয়াব পাবে যেন নেক কাজ সমূহ করেছে।

হাদীস- বায়হাকী শরীফে, হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, যে রমজানে দশ দিনের ইতিকাফ করলো, সে যেন দুইটি হজ্ব ও দুইটি ওমরা আদায় করলো।

মাসআলাঃ মসজিদে আল্লাহর ওয়াস্তে নিয়ত সহকারে অবস্থান করা হচ্ছে ইতিকাফ। ইতিকাফের জন্য মুসলমান, বুদ্ধিমান, নাপাক, হায়েজ নিফাস হতে পবিত্র হওয়া শর্ত। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নহে। বরং নাবালেগ যিনি পার্থক্য করতে পারে যদি ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করে তাহলে এই ইতিকাফ সহীহ্ হবে। আজাদ বা স্বাধীন হওয়াটা শর্ত নহে, সুতরাং ক্রীতদাসও ইতিকাফ করতে পারবে। কিন্তু মুনীবের অনুমতি নিতে হবে। মুনীবের সর্বাবস্থায় নিষেধ করার অধিকার আছে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইতিকাফের জন্য জামে মসজিদ হওয়া শর্ত নহে, বরং যে মসজিদে জামাত হয় সেটাতেও ইতিকাফ করা যাবে। জামাত বিশিষ্ট মসজিদ হচ্ছে সেটা যেখানে ইমাম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত রয়েছে। যদিও এতে পাঞ্জেগানা নামাজ না হয়, তবে সহজ হচ্ছে সাধারণতঃ প্রত্যেক মসজিদে ইতিকাফ সহীহ্ যদিও সেটা জামাত বিশিষ্ট মসজিদ না হয়, বিশেষতঃ বর্তমানে অনেক মসজিদ এমন রয়েছে, যেখানে ইমামও নেই, মুয়াজ্জিনও নেই। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মসজিদে হেরেম শরীফে ইতিকাফ থাকা সর্বোত্তম। অতঃপর মসজিদে নববীতে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) তারপর মসজিদুল আকাসায়, অতঃপর যেখানে বড় জামাত হয়। (জাওহেরা)

মাসআলাঃ মহিলারা মসজিদে ইতিকাফ থাকা মাকরূহ। বরং ঘরের মধ্যে তারা ইতিকাফ করবে। তবে এমন স্থানে করবে, যা নামাজ পড়ার জন্য নির্ধারিত রেখেছে। যেটাকে ঘরের মসজিদ বলা হয়। মহিলার জন্য এটাও মুস্তাহাব যে, ঘরে নামাজের জন্য কোন একটি স্থান নির্ধারণ করবে এবং সে স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিৎ, উত্তম হলো ঐ স্থানটি প্লাটফর্মের ন্যায় উঁচু করবে, পুরুষের জন্যও উচিৎ নফলের জন্য ঘরে কোন একটি স্থান নির্ধারণ করা। নফল নামাজ ঘরে পড়া উত্তম। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ স্ত্রী লোক নামাজের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করে রাখেনি, তাহলে ঘরে ইতিকাফ করতে পারবে না, অবশ্য যে সময় ইতিকাফের ইচ্ছা করেছে, সে সময় কোন স্থানকে নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিল, তাহলে সে স্থানে ইতিকাফ করতে পারবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ খুনসা ঘরের কোণায় ইতিকাফ করতে পারবে না। (দুররুল মোখতার)

ইতিকাফের প্রকারভেদ ও বিধান

মাসআলাঃ ইতিকাফ তিন প্রকারঃ ১. ওয়াজিব, ইতিকাফের মান্নত করল, অর্থাৎ মুখে বলবে, নিছক অন্তরের ইচ্ছায় ওয়াজিব হবে না।

২. সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, রমজানের পূর্ণ শেষ দশকের ইতিকাফ, অর্থাৎ শেষের দশ দিন ইতিকাফ করবে। অর্থাৎ রমজানের বিশ তারিখ সূর্যাস্তের সময় ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করবে এবং ত্রিশে রমজান সূর্যাস্তের পর বা উনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখার পর মসজিদ থেকে বের হবে। যদি বিশ তারিখ মাগরিব নামাজের পর ইতিকাফের নিয়ত করলো, তাহলে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা আদায় হবে না, ইতিকাফ হচ্ছে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা কেফায়া, সকলে বর্জন করলে সকলে দায়ী হবে। আর যদি শহরের একজন পালন করে, সকলে দায়মুক্ত হবে। এছাড়া যেসব ইতিকাফ পালন করা হয়, তা হবে মুস্তাহাব ও সুন্নাতে গায়রে মোয়াক্কাদা। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ মুস্তাহাব ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত নহে। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণও শর্ত নয়। বরং যখন মসজিদে ইতিকাফের নিয়ত করল, যতক্ষণ পর্যন্ত

মসজিদে থাকবে ইতিকাফকারী হবে। বের হলে ইতিকাফ শেষ হয়ে যাবে। (আলমগীরি ও অন্যান্য) এটাতে পরিশ্রম ব্যতিরেকে সওয়াব পাওয়া যায়, কেবল নিয়ত করলেই ইতিকাফের সওয়াব পাওয়া যায়, মসিজদে ওকে বলা উচিৎ হবে না, যদি দরজায় লিখে দেয়া হয় যে, ইতিকাফের নিয়ত করে নাও, সওয়াব পাবে। তা করা হলে উত্তম হবে। যিনি অনবগত তিনিও যেন অবগত হয়। আর যিনি অবগত তিনি যেন স্মরণ করে নেন।

মাসআলাঃ সুন্নাত ইতিকাফ অর্থাৎ রমজান শরীফের শেষ দশকের যে ইতিকাফ পালন করা হয়, সেটাতে রোজা শর্ত। বিধায় কোন রুগ্ন ব্যক্তি অথবা মুসাফির ইতিকাফ করেছে, কিন্তু রোজা রাখেনি, সুন্নাত আদায় হল না, বরং নফল হবে। (রদ্দুল মোহতার)

ইতিকাফ সম্পর্কিত ছত্রিশটি মাসায়েল

মাসআলাঃ মান্নতের ইতিকাফেও রোজা রাখা শর্ত। এমনকি যদি এক মাস ইতিকাফের মান্নত করলো এবং বললো, রোজা রাখবে না, তবুও রোজা রাখা ওয়াজিব। আর যদি রাত্রে ইতিকাফের মান্নত করে, এ ধরনের মান্নত শুদ্ধ নহে, রাত্রে রোজা হয় না। যদি এ রকম বলে যে, একদিন রাত আমার উপর ইতিকাফ, এ ধরনের মান্নত সহীহ্ হবে। আজকে ইতিকাফের মান্নত করেছে এবং খাবার খেয়ে ফেলছে, মান্নত-সহীহ্ হবে না। (দুররুল মোখতার, আলমগীরি)

অনুরূপ যদি দ্বিপ্রহরের পর মান্নত করে রোজা ছিল না এ ধরনের মান্নত সহীহ্ হবে না, তখন রোজার নিয়ত করতে পারবে না। বরং যদি রোজার নিয়ত করাও যায় যেমন দ্বিপ্রহরের পূর্বে, তখনও মান্নত হবে না। এ রোজা নফল হবে। আর ঐ ধরনের ইতিকাফে রোজা হচ্ছে ওয়াজিব, প্রয়োজন।

মাসআলাঃ এটা আবশ্যক যে, বিশেষ ইতিকাফের জন্যই রোজা রাখতে হবে বরং রোজাদার হওয়া জরুরী, যদিও ইতিকাফের নিয়তে না হয়। যেমন এই রমজানের ইতিকাফের মান্নত করেছে, ঐ রমজানের রোজা এ ইতিকাফের জন্য যথেষ্ট। আর যদি রমজানের রোজা রেখেছে কিন্তু ইতিকাফ করেনি, তাহলে তখন এক মাস রোজা রাখবে এবং রোজার সাথে ইতিকাফ করবে। যদি এরূপ না করে অর্থাৎ রোজা রেখে ইতিকাফ করেনি দ্বিতীয় রমজান এসে গেল, তাহলে ঐ রমজানের রোজা ঐ ইতিকাফের জন্য যথেষ্ট হবে না।

অনুরূপ যদি কেউ অন্য ওয়াজিব রোজা রাখলো, তাহলে এ ইতিকাফ ঐ রোজার সাথেও আদায় হবে না। বরং সেটার জন্য নির্দিষ্ট ইতিকাফের নিয়তে রোজা রাখা আবশ্যক। আর যদি এ অবস্থায় রমজানের ইতিকাফের মান্নত করেছে, রোজাও রাখেনি, ইতিকাফও করেনি তখন ঐ রোজা সমূহের কাযা আদায় করছে। তাহলে ঐ কাযা রোজার সাথে ওই এতেকাফের মান্নতও পূর্ণ করতে পারবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ নফল রোজা রেখেছে ঐ দিনের ইতিকাফের মান্নত করেছে, ঐ মান্নত সহীহ্ হবে না। যেহেতু ইতিকাফ ওয়াজিব রোজার জন্য এতে নফল রোজা যথেষ্ট নহে এবং এই রোজা ওয়াজিব হতে পারে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ এক মাসের ইতিকাফের মান্নত করেছে, এ মান্নত রমজানে পূর্ণ করতে পারবে না। বরং ঐ এতেকাফের জন্য, বিশেষ রোজা রাখতে হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্ত্রীলোক ইতিকাফের মান্নত করেছে, স্বামী মান্নত পূর্ণতায় নিষেধ করতে পারবে। তাহলে বিচ্ছেদ হওয়ার পর বা স্বামীর মৃত্যুর পর মান্নত পূর্ণ করবে। অনুরূপ ক্রীতদাস দাসীকে ওর মুনীব বাধা দিতে পারবে। তখন স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ণ করবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্বামী, স্ত্রীকে ইতিকাফের অনুমতি দিল, এখন বাধা দিতে চাইলে বাধা দিতে পারবে না। মুনীব দাস-দাসীকে অনুমতি দেয়ার পরও বাধা দিতে পারবে। এরপর বাধা দিলে গুনাহগার হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ স্বামী এক মাসের ইতিকাফের অনুমতি দিল, স্ত্রী লাগাতার পূর্ণ একমাস ইতিকাফ করতে চাইলে, তখন স্বামীর এখতিয়ার থাকবে অল্প অল্প করে এক মাস পূর্ণ করার আদেশ করতে পারবে। আর যদি নির্দিষ্ট কোন মাসে অনুমতি দেয় তাহলে এখতিয়ার থাকবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ওয়াজিব ইতিকাফে ইতিকাফ পালনকারী বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বের হওয়া হারাম। যদি বের হয় যদিও ভুলবশত হয় অনুরূপ সুন্নাত ইতিকাফও বিনা ওজরে বের হলে ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ মহিলা ঘরের মসজিদে ওয়াজিব ইতিকাফ বা সুন্নাত ইতিকাফ করেছে, তাহলে বিনা ওজরে ওখান থেকে বের হতে পারবে না, যদি ওখান থেকে বের হয় যদিও ঘরেই থাকে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে

যাবে। (আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইতিকাফ পালনকারী মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুইটি অজুহাত আছে, একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক হাজত, যা মসজিদে সমাধা হয় না, যেমন– পায়খানা, প্রস্রাব, এস্তেঞ্জা, ওজু ও গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করবে। কিন্তু গোসল ও অজুতে শর্ত হলো যে, যেন মসজিদে না হয়, অর্থাৎ এমন কোন জিনিষ যদি না থাকে, যেখানে অজু ও গোসলের পানি রাখা যায়, অনুরূপ মসজিদে যেন পানির ফোটাও না পড়ে যেহেতু অজু গোসলের পানি মসজিদে ফেলা নাজায়েয। আর যদি চিলমচি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে যদ্বারা অজু এমনভাবে করা যায় যেন মসজিদে কোন ছিটকে না পড়ে, তাহলে অজুর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয হবে না। বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে। অনুরূপ মসজিদে অজু গোসলের জন্য জায়গা নির্মিত আছে বা হাউজ আছে, তাহলে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই।

দ্বিতীয়ঃ শরয়ী হাজতঃ যেমন, ঈদ বা জুমার জন্য যাওয়া, বা আজান দেয়ার জন্য মিনারায় গমন করা, যদি মিনারায় গমনের জন্য বাইর থেকে যদি রাস্তা হয়, আর যদি মিনারার রাস্তা ভিতর দিকে হয়, তখন মুয়াজ্জিন ছাড়া অন্য লোকও মিনারায় যেতে পারবে। মুয়াজ্জিনের জন্য নির্দিষ্ট নয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ হাজত সমাধার জন্য বেরিয়েছে পবিত্র হয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবে, বাইরে দাড়ানোর অনুমতি নেই। আর যদি ইতিকাফ পালনকারীর বাসস্থান মসজিদ থেকে দূর হয়, বন্ধুর বাসস্থান নিকটে হয়, তাহলে বন্ধুর ওখানে হাজত সমাধার জন্য যাওয়াটা জরুরী নহে বরং নিজের ঘরেও যেতে পারবে। আর যদি তার দুইটি ঘর থাকে একটি নিকটে অন্যটি দূরে, তাহলে নিকটের ঘরে যাবে। কতেক মাশায়েখ বলেছেন, দূরবর্তী ঘরে গেলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মোহতার, আলমগীরি)

মাসআলাঃ নিকটতম মসজিদে যদি জুমা হয়, তাহলে সূর্য সরে পড়ার এমন সময়ে যাবে, যেন দ্বিতীয় আজানের পূর্বে সুন্নাত পড়া যায়, আর যদি দূরে হয়, তখন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বেও যেতে পারবে। তবে এমন সময়ে যাবে যেন দ্বিতীয় আজানের পূর্বে সুন্নাত সমূহ পড়া যায়। বেশী আগে যাবে না।এ বিষয়টি রায়ের উপর নির্ভরশীল। যদি বুঝে আসে যে, পৌছার পর কেবল সুন্নাতের সময় থাকবে তখন চলে যাবে এবং জুমার ফরজের পর চার বা ছয় রাকাত সুন্নাত পড়ার পর ফিরে

আসবে, জোহর যদি সর্তকতার সাথে পড়তে অভ্যস্ত হয়, তাহলে ইতিকাফ পালনের মসজিদে এসে পড়ে নিবে। আর যদি পরবর্তী সুন্নাত পড়ার পর ফিরে আসেনি জামে মসজিদে দাড়িয়ে আছে, যদিও এক রাত পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করে অথবা স্বীয় ইতিকাফ ওখানে পূর্ণ করেছে তখনও ঐ ইতিকাফ নষ্ট হবে না। কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ। উপরোক্ত সব অবস্থা তখন প্রযোজ্য হবে, যদি যে মসজিদে ইতিকাফ পালন করেছে ওখানে যদি জুমা না হয়। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ যদি এমন মসজিদে ইতিকাফ করে, যেখানে জামাত হয় না, তাহলে জামাতের জন্য বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইতিকাফ কালে হজ্ব অথবা ওমরার ইহরাম বাঁধলো, তাহলে ইতিকাফ পূর্ণ করে যাবে। আর সময় যদি কম হয়, ইতিকাফ পূর্ণকরলে হজ্ব বাদ যাবে তখন হজ্বে চলে যাবে। অতঃপর শুরু থেকে ইতিকাফ করবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মসজিদ যদি ভেঙ্গে যায় বা কেউ জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দিল। তাৎক্ষণিক অন্য মসজিদে চলে গেল, তাহলে ইতিকাফ ফাসিদ হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ পানিতে ডুবে যাচ্ছে বা জ্বলে যাচ্ছে এমন লোককে বাঁচানোর জন্য মসজিদ হতে বের হল, বা সাক্ষী দেয়ার জন্য গেল, বা জিহাদে সকলকে আহ্বান করা হয়েছে, তিনি বেরিয়ে গেলো, বা রোগীর সেবার জন্য অথবা জানাযা নামজের জন্য বের হল, যদিও পড়ার জন্য অন্য কোন লোক না থাকে, উপরোক্ত সব অবস্থায় ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে। (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ স্ত্রীলোক মসজিদে ইতিকাফ পালনকারিনী ছিল, তাকে তালাক দেয়া হলো, তখন ঘরে চলে যাবে এবং ইতিকাফকে পূর্ণ করে নিবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ মান্নত করার সময় এটা শর্ত করেছিল যে, রোগীর সেবা, জানাযা নামাজ, ইলমের মজলিসে উপস্থিত হবে এ ধরনের শর্ত জায়েয। যদি ওসব কাজের জন্য যায় ইতিকাফ ফাসিদ হবে না। তবে অন্তরে নিয়ত করে নেয়াটা যথেষ্ট নয় বরং মুখে বলে নেয়াটা আবশ্যক। (আলমগীরি, রদ্দুল মোখতার ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ পায়খানা প্রস্রাবের জন্য বের হল, কর্জ পাওনাদার পাকড়াও করলো. ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইতিকাফ পালনকারী সহবাস করা, স্ত্রীকে চুম্বন করা বা স্পর্শ করা বা জড়িয়ে ধরা হারাম। সঙ্গম করলে সর্বাবস্থায় ইতিকাফ ফাসিদ হবে! বীর্যপাত হোক বা না হোক ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশতঃ হোক, মসজিদে হোক বা বাইরে হোক। রাত্রে হোক বা দিনে হোক, সঙ্গম ছাড়া অন্যসব অবস্থায় যদি বীর্যপাত হয় ইতিকাফ ভঙ্গ হবে। অন্যথায় হবে না। স্বপ্নদোষ হল বা স্মরণ সৃষ্টি হলে বা দৃষ্টিপাত করার দরুন বীর্যপাত হলে ইতিকাফ ফাসিদ হবে না। (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ ইতিকাফ পালনকারী দিনের বেলা ভুলক্রমে খেয়ে নিল, ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না। গালিগালাজ ঝগড়া বিবাদ করার দরুন ইতিকাফ বিনষ্ট হবে না। কিন্তু নূরবিহীন ও বরকতবিহীন হবে। (আলমগীরি ও অন্যান্য)

মাসআলাঃ ইতিকাফকারী বিবাহ করতে পারবে, স্ত্রীকে রজয়ী তালাক দিলে তা প্রত্যাহারও করতে পারবে। কিন্তু ওসব কাজের জন্য যদি মসজিদ হতে বের হয় ইতিকাফ ভঙ্গ হবে। (আলমগীরি, দুররুল মোখতার) কিন্তু সহবাস এবং চুম্বন ইত্যাদি দ্বারা তাকে ফিরিয়ে আনা হারাম, যদিও রাজায়াত হয়ে যায়।

মাসআলাঃ ইতিকাফকারী হারাম মাল বা নেশাজাতীয় বস্তু রাত্রে ভক্ষণ করল, ইতিকাফ ফাসিদ হবে না। (আলমগীরি) কিন্তু হারামের কারণে গুনাহ্ হবে, তাওবা করতে হবে।

মাসআলাঃ সংজ্ঞাহীনতা ও পাগলামী যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, যদ্বারা রোজা হয় না, তাহলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। যদিও কয়েক বৎসর পর সুস্থ হয় আর যদি বধির হয়ে যায় তখনও সুস্থ হওয়ার পর কাযা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ ইতিকাফ পালনকারী মসজিদে পানাহার করবে, নিদ্রা যাবে, ওসব কাজের জন্য যদি মসজিদের বাহির হয় ইতিকাফ ভঙ্গ হবে। (দুররুল মোখতার, ইত্যাদি) কিন্তু পানাহারের বেলায় সতর্কতা অপরিহার্য। যেন মসজিদ অপরিষ্কার না হয়।

মাসআলাঃ ইতিকাফ পালনকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য মসজিদে পানাহার করার, অনুমতি নেই, এসব কাজ করতে চাইলে ইতিকাফের নিয়ত করে মসজিদে যেতে হবে এবং নামাজ পড়বে। অথবা আল্লাহর জিকির করবে। অতঃপর এসব করতে পারবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইতিকাফ পালনকারী নিজের বা ছেলে সন্তানদের প্রয়োজনে মসজিদে কোন জিনিষ বেচা কেনা করা জায়েয আছে, তবে শর্ত হলো জিনিষ যেন মসজিদে না হয় অথবা মসজিদে হলে তা যেন অল্প হয়, যেন জায়গা বেষ্টন না করে। আর যদি ক্রয় বিক্রয় ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে জায়েয, যদিও তা মসজিদে না হয়। (দররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইতিকাফ পালনকারী ইবাদতের নিয়তে যদি চুপ থাকে, অর্থাৎ চুপ থাকাকে যদি সওয়াব মনে করে তাহলে মাকরূহ তাহরিমী হবে। চুপ থাকাটা সওয়াব মনে করে না হলে কোন ক্ষতি নেই। মন্দ কথা থেকে চুপ থাকলে মাকরূহ হবে না। বরং এটা উত্তম পর্যায়ের কথা, কেননা মন্দ কথা মুখ থেকে বের না করা ওয়াজিব। যে কথায় সওয়াবও হবে না গুনাহও হবে না। অর্থাৎ মুবাহ কথা ও ইতিকাফ পালনকারীর জন্য মাকরূহ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় বলা যাবে। অপ্রয়োজনে মসজিদে মুবাহ কথা বলা সওয়াব সমূহকে এমনভাবে ভক্ষণ করে যেমন আগুন লাকড়ীকে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ইতিকাফ পালনকারী চুপও থাকবে না, কথাও বলবে না, তাহলে কি করবে, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করবে, হাদীস শরীফ পাঠ অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ, ইলমে দ্বীনের পাঠ দান ও গ্রহণ আলোচনা করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও অন্যান্য নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) জীবনী গ্রন্থ আউলিয়ায়ে কেরাম ও পূণ্যাত্ম বান্দাদের ঘটনাবলী এবং দ্বীন সম্পর্কে লিখিত বিষয়াদি পাঠ করবে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ এক দিনে ইতিকাফের মান্নত করলো, এতে রাত অন্তর্ভুক্ত হবে না। ফজর উদয়ের পূর্বে মসজিদে গমন করবে এবং সূর্যাস্তের পর ফিরে আসবে। আর যদি দুই দিন বা তিন দিন বা ততোধিক দিন মান্নত করে অথবা দুই দিন বা তিন বা ততোধিক রাতের ইতিকাফ মান্নত করলো, তাহলে উপরোক্ত উভয় অবস্থায় যদি কেবল দিন বা রাত সমূহ উদ্দেশ্য করলে নিয়ত সহীহ হবে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় মান্নত শুদ্ধ হবে এবং কেবল দিনে ইতিকাফ ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় এখতিয়ার থাকবে যে, উক্ত দিন সমূহের ইতিকাফ লাগাতার রাখবে বা পৃথকভাবে রাখতে পারবে। দ্বিতীয় অবস্থায় মান্নত সহীহ হবে না। ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত এবং রাত্রে রোজা হতে পারে না আর উভয় অবস্থায় দিন রাত উভয়টি উদ্দেশ্য হলে বা কোন নিয়ত করেনি, তাহলে উভয় অবস্থায় দিন ও রাত উভয়ের ইতিকাফ ওয়াজিব

এবং লাগাতার তত দিনের ইতিকাফ থাকা আবশ্যক। পৃথকভাবে ইতিকাফ করতে পারবে না, উপরন্তু এ অবস্থায় এটাও আবশ্যক যে, দিনের পূর্বে যে রাত হয় সে রাতে যেন হয়, বিধায় যেন সূর্যাস্তের পূর্বেই ইতিকাফে চলে যাওয়া হয়, যেদিন পূর্ণ হবে সূর্যাস্তের পর বের হয়ে যাবে, আর যদি দিনের ইতিকাফ মান্নত করে এবং যদি একথা বলে যে, আমি দিন বলে রাতকে উদ্দেশ্য করেছি তাহলে এ ধরনের নিয়ত সহীহ্ হবে না। দিন এবং রাত দুইটির ইতিকাফ ওয়াজিব হবে। (জাওহেরা, আলমগীরি, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ ঈদের দিনের ইতিকাফের মান্নত করল, তাহলে অন্য দিন, যেদিন রোজা রাখা জায়েয সেটা কাযা করবে। আর যদি শপথের নিয়তে করে, তাহলে কাফ্ফারা আদায় করবে। আর ঈদের দিনেই যদি ইতিকাফ পালন করে নেয় মান্নত পূর্ণ হবে। কিন্তু গুনাহগার হল। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ কোন দিন কোন মাসের ইতিকাফের মান্নত করলো, তাহলে এর পূর্বেই ঐ মান্নত পূর্ণ করতে পারবে। অর্থাৎ যদি শর্তযুক্ত না হয়, মসজিদে হেরেম শরীফে ইতিকাফ করার মান্নত করলো, তাহলে অন্য মসজিদেও ইতিকাফ করতে পারবে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ বিগত মাসের ইতিকাফের মান্নত করলো, মান্নত সহীহ্ হবে না। মান্নত করার পর (মায়াজাল্লাহ) মুরতাদ ধর্মত্যাগী হয়ে গেল, মান্নত রহিত হয়ে যাবে। পুনরায় মুসলমান হলে সেটার কাযা ওয়াজিব নহে। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ এক মাসের ইতিকাফের মান্নত করলো এবং মারা গেল, তাহলে প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর পরিমাণ মিসকীনকে দান করবে। যদি ওসীয়ত করে এবং ওসীয়ত করে যাওয়াটা ওর জন্য ওয়াজিব। ওসীয়ত করেনি কিন্তু ওয়ারিশগণ তার পক্ষ থেকে ফিদ্য়া দিয়ে দিল সেটাও জায়েয হবে। রুগ্ন ব্যক্তি মান্নত করলো এবং মারা গেল, তাহলে এক দিনের জন্য হলেও সুস্থ হয়ে থাকলে, প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান করতে হবে। আর এক দিনের জন্য হলেও সুস্থ না হলে কিছু ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি)

মাসআলাঃ একটি ইতিকাফ মান্নত করলো, তাহলে ওই বিষয়ে তার এখতিয়ার থাকবে, যে মাসে ইচ্ছা করবে ইতিকাফ পালন করবে, কিন্তু লাগাতার ইতিকাফ পালন করা ওয়াজিব। আর যদি একথা বলে যে, আমার উদ্দেশ্য এক মাস দ্বারা

কেবল দিন ছিল রাত নয়, তাহলে একথা গ্রহণ করা হবে না, দিন এবং রাত উভয়টির ইতিকাফ ওয়াজিব হবে এবং ত্রিশ দিন বলে থাকলে তখনও একই হুকুম। অবশ্য যদি মান্নত করার সময় একথা বলে ছিল, যে এক মাসের দিনের ইতিকাফ মান্নত করেছি, রাতের নয়, তাহলে কেবল দিনের ইতিকাফ ওয়াজিব হবে। তখন এটাও এখতিয়ার থাকবে যে, পৃথক পৃথকভাবেও ত্রিশ দিনের ইতিকাফ পালন করতে পারবে।

আর যদি এরূপ বলেছিল যে, এক মাসের রাতের ইতিকাফ মান্নত করছি, দিনের নয়, তাহলে কিছু ওয়াজিব হবে না। (জাওহেরা, দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ নফল ইতিকাফ ছেড়ে দিলে সেটার কাযা নেই। ঐ পর্যন্ত সেটা শেষ হবে। সুন্নাত ইতিকাফ রমজানের শেষ দশ তারিখ পর্যন্ত বসেছিল সেটা ভঙ্গ করলে তাহলে যেদিনটির ইতিকাফ ভঙ্গ করলো কেবল সেই দিনটির কাযা করবে। দশ দিনের কাযা করা ওয়াজিব নহে। মান্নতের ইতিকাফ ভঙ্গ করলো, যদি কোন নির্দিষ্ট মাসের মান্নত হয়ে থাকে তাহলে অবশিষ্ট দিন সমূহের কাযা দিবে। অন্যথায় লাগাতার ওয়াজিব হয়ে থাকলে শুরু থেকে ইতিকাফ পালন করবে। আর লাগাতার ওয়াজিব না হয়ে থাকলে অবশিষ্ট দিন সমূহের ইতিকাফ করবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ ইতিকাফের কাযা কেবল ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করলে নয় বরং যদি ওজরের কারণেও ছেড়ে দেয়া হয়, যেমন অসুস্থ হয়ে পড়লো, অথবা অনিচ্ছাকৃত ছেড়ে দিল, যেমন মহিলার হায়েজ নিফাস হল, অথবা দীর্ঘ পাগলামী বা অথবা সংজ্ঞাহীনতা সৃষ্টি হল, ওসব অবস্থায়ও কাযা ওয়াজিব। ওসবের মধ্যে যদি কয়েকটি বাদ যায় তাহলে প্রত্যেকটি কাযা দেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং কয়েকটি কাযা দিবে। আর যদি সবগুলো বাদ যায় সবগুলো কাযা দিতে হবে। মান্নতে লাগাতার ওয়াজিব হয়েছিল, তাহলে লাগাতার সবটির কাযা দিবে। (রদ্দুল মোহতার)

والحمد لله على آلائه والصلوة والسلام على افضل انبيائه وعلى آله وصحبه واوليائه وعلينا معهم يارحم الراحمين – وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

সমাপ্ত